সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ত্রিচত্বারিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কলিকাতা

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

১৩৪৩

ত্রিচত্বারিংশ ভাগের

সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ত্রিচত্বারিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কলিকাতা

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

১৩৪৩

ত্রিচত্বারিংশ ভাগের

সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[ত্রিচত্বারিংশ ভাগ]

মারাঠা জাতির অভ্যুদয় ✱

আমাদের এই বাঙ্গালার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের সম্বন্ধ একটি আশ্চর্য জিনিষ। দেশ দুটি ভারতের বিপরীত দিকে স্থিত। ভাষা ও সাহিত্যে তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বাঙ্গালীরা মাছ, মাংস খায়, শাক্ত ব্রাহ্মণ পর্যন্ত; কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে মাংস ত দূরে থাকুক, মাছ পর্যন্ত খাইলে সে বাড়ীতে জলাচরণীয় চাকর থাকিবে না। একমাত্র মারাঠা অর্থাৎ কৃষি বা অসিজীবী জাতের হিন্দুদের মধ্যে পাঁঠার মাংস এমন কি মনু-নিষিদ্ধ পক্ষীর মাংস পর্যন্ত খাইবার প্রথা আছে, কিন্তু ভদ্রভোজ ও সার্ব্বজনীন নিমন্ত্রণে নিরামিষ খাদ্য বিনা চলে না।

অথচ বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেমন প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে তেমন অন্য কোন দুই প্রদেশের মধ্যে হয় নাই। নবাবী আমলে বর্গীর হাঙ্গামা ঝড়ের মত বাঙ্গালার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল ও চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে মতিলাল ঘোষ ও তিলকের অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব, বা বঙ্গীয় শিক্ষিত জনমতের উপর গোখলের রাজত্ব না ধরিয়া, এখানে সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই দুই জাতির সমন্বয় একটু ভাবিয়া দেখুন। রাজপুতানার পরই মহারাষ্ট্র-ইতিহাস বাঙ্গালা-সাহিত্যকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করিয়াছে। রমেশ দত্ত রাজপুত-জীবনসন্ধ্যার পরই মারাঠা-জীবনপ্রভাতের কিরণ দেখিয়া উৎফুল্ল হন। বঙ্গীয় কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

> মহারাষ্ট্র জাতি—শয়নে ও যার
> শিয়রে তুরঙ্গ, কটিবন্ধে অসি,
> যুবরাজ, আজি সে জাতি কোথায় ?

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম বৃহৎ সাহিত্য-প্রচেষ্টা মহারাষ্ট্র দেশে। রবীন্দ্রনাথ মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রান্তে কারওয়ার বন্দরে সেই "তোমায় চিনি ওগো বিদেশিনী"-কে দেখিয়াছিলেন, গুজরাতের আহমদাবাদের শাহীবাগের পুরাতন প্রাসাদে ক্ষুধিত পাষাণের মধ্যে অতীতের জীবন্ত চলচ্চিত্র দেখিয়া "সব ঝুঠা হ্যায়" এই সত্য বুঝিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রের কর্মজীবন একটি মারাঠী রাজ্যেই অবশেষ হয়। আর বঙ্কিমের অনুবাদক ও অনুকারিগণ মারাঠা

সাহিত্যে এক যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে। অল্পদিন আগে পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে বাঙ্গালীর বড় আদর ছিল, যেমন ৩০ বৎসর পূর্বে পঞ্জাবে ছিল।

ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগের শেষে মারাঠা জাতির রাজনৈতিক আবির্ভাব ও শক্তিবিস্তার একটি অতুলনীয় ঘটনা। আমরা সাধারণতঃ শিখ স্বাধীনতা ও মারাঠা শক্তির উদয়কে এক রকম ঘটনা বলিয়া মনে করি, কিন্তু দুটির মধ্যে পার্থক্য বড় বেশী। শিখেরা একটি মাত্র প্রদেশে আবদ্ধ ছিল, তাহাদের সংগ্রাম মুঘল রাজশক্তির সঙ্গে হয় নাই, আফগান দুর্‌রাণী রাজের সঙ্গে হয়; এবং শিখ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং স্বাধীনতা অর্ধ শতাব্দীরও কম সময় স্থায়ী ছিল। অপর পক্ষে, মারাঠা শক্তি দিল্লীশ্বরের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুঝিয়া অবশেষে দিল্লীতে রাজার উপর রাজা হইয়া বসে; এই শক্তির প্রভাব সমস্ত ভারতকে আচ্ছন্ন করে; আর মারাঠা স্বাধীন রাজত্ব ১৬৬৭ হইতে ১৮১৭ পর্যন্ত ১৫০ বৎসর ব্যাপিয়া জীবিত ছিল। বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ে সত্যই গর্ব করিয়াছেন "মারাঠারা তাহাদের বিজয়দুন্দুভি আটক হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বাজাইয়াছিল।" ভারতের অন্তিম উত্তর-পূর্বে বঙ্গ, দক্ষিণ-পশ্চিমে গোয়া পর্যন্ত মারাঠা-শক্তির তেজ অনুভব করিয়াছিল।

তাহা ভিন্ন, আর একটা পার্থক্য আছে। শিখসংগঠন একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের মাত্র কাজ, মারাঠা রাষ্ট্র একটি জাতি বা নেশনের সৃষ্টি, ইহা সর্ব ধর্মের, সর্ব জাতের অর্থাৎ বর্ণের মিলনের ফল। আর রাষ্ট্র-নীতি-শাস্ত্রের দিক দিয়া দেখিলে মারাঠী শাসন-পদ্ধতি ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান শিখদের সৃষ্টি অপেক্ষা অনেক উচ্চ দরের ও অধিক কর্মক্ষম। ফলতঃ শিখেরা যোদ্ধামাত্র ছিল, শাসনকর্তা নহে, কিন্তু মারাঠারা এ উভয় ক্ষেত্রেই অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

কিন্তু যদিও মারাঠাদের উদয় মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতির শেষ যুগে মাত্র ঘটিয়াছিল, তথাপি উহারা অখ্যাত নগণ্য নবীন ভুঁইফোড় জাতি নহে। এই জাতির গরিমাময় অতীত ইতিহাস ছিল। সম্ভবতঃ অশোক এবং খরবেলের শিলালেখের রাষ্ট্রি জাতি এই মহারাষ্ট্র-বাসিগণ। তাহার পরবর্তী যুগে রাষ্ট্রকূট রাজগণ নিজেদের বিখ্যাত রাজ্য স্থাপন করিয়া উত্তর-ভারত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহারও পরে, যাদব বংশ মহারাষ্ট্র দেশ ব্যাপিয়া শেষ হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন, এবং এই বংশ মুসলমান আক্রমণে নষ্ট হইলেও, ইহার অনেক শাখা নানা স্থানে জমিদারের মত বহুদিন পর্যন্ত টিঁকিয়া থাকিয়া পূর্বপুরুষদের গৌরব-স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছিল। যাদব বংশের এইরূপ একটি শাখায় শিবাজীর মাতা জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই বলেন যে যাদব এবং বিজয়নগর এই দুইটি স্বাধীন কিন্তু তৎকালে বিধ্বস্ত বিখ্যাত হিন্দুরাজ্যের স্মৃতিই শিবাজীকে স্বাধীন স্বরাজ্য স্থাপন করিতে অনুপ্রাণিত করে। বিজয়নগরের প্রভাব সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। তাহার সহিত শিবাজীর সম্বন্ধ যোজনা করা কঠিন।

যাহা হউক, মারাঠা জাতি ও মারাঠা সরদার—স্বাধীন রাজা না হইলেও— আবহমান কাল হইতে ঐ দেশে ছিল। মারাঠী প্রধানগণ, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ

নিজামশাহী সুলতানদের সেনা-বিভাগে কাজ করেন এবং জাগীর ভোগ করেন। কিন্তু এসব বিক্ষিপ্ত, অপ্রধান, প্রায় অবজ্ঞাত মারাঠা সরদারগণ রাজ্যগঠনে অক্ষম ছিলেন, এবং সেরূপ কাজের কল্পনাও করেন নাই।

মুসলমান যুগে মারাঠা সামরিক শক্তির আদর এবং বৃদ্ধি আরম্ভ হইল, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে, ঠিক আকবরের মৃত্যুর পর, যখন জাহাঙ্গীরের দুর্বলতার সুযোগ পাইয়া মালিক অম্বর অশেষ বাধা ও বিপত্তি জয় করিয়া নিজামশাহী রাজবংশকে খাড়া করিয়া রাখিলেন। বিজাপুরের সুলতান প্রথম প্রথম তাঁহার সহায়ক ছিলেন; অম্বর মুঘলদের সঙ্গে মহাযুদ্ধ করেন এবং এই সব যুদ্ধে মিতাহারী দ্রুতগামী হালকা মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য লাগাইয়া মুঘলদের ভারি বর্মাবৃত ধীরগামী বিলাসপ্রিয় অশ্বারোহী সৈন্যদের রোধ করিতে, তাহাদের রসদ লুটিতে এবং পথচলা বন্ধ করিতে সক্ষম হন। তখন মারাঠারা সেই নবীন যুগেও নিজেদের যে একটা সামরিক মূল্য আছে তাহা প্রত্যক্ষ জানিতে পারিল। উচ্চ বেতন পাওয়ায় তাহাদের সরদারগণ নিজ নিজ অনুচর দলের সংখ্যাও ক্রমে বেশ বাড়াইলেন।

আর সেই সময়েই মারাঠা সরদারদের হাত করিয়া স্বপক্ষে আনিবার জন্য অহমদ-নগরের সুলতান এবং মুঘল বাদশার স্থানীয় প্রতিনিধির মধ্যে নিলাম চলিতে লাগিল। শাহজীর শ্বশুর, শাহজীর খুড়া প্রভৃতি, এবং পরে স্বয়ং শাহজী একবার এপক্ষে যোগ দেন, আবার বেশী জাগীর ও টাকার প্রলোভনে ওপক্ষে সৈন্যদল লইয়া পার হন। এইরূপ কাজ জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালময় চলিয়াছিল। ফলে মারাঠা নেতা ক'জন অত্যন্ত বড় এবং দেশমান্য হইয়া উঠিলেন, শাহজী তাহারই চরম সীমায় পৌঁছিয়া, মালিক অম্বর ও তাহার পুত্রের মৃত্যুর পর অহমদনগরের বিনষ্ট-প্রায় রাজবংশে 'কিং-মেকার' অর্থাৎ ইচ্ছামত রাজ-পুত্তলিকা-সৃষ্টিকর্তা হইয়া দাঁড়াইলেন; ঠিক মালিক অম্বরের পর শাহজীর মত কোন প্রবল ও প্রধান শত্রু মুঘলদের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে মাথা তুলে নাই। সমস্ত দেশটা তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিত।

শাহজীর এই মহত্ত্ব ১৬২৯ হইতে ১৬৩৬ পর্যন্ত সাত বৎসর মাত্র ছিল। তাহার পর বাদশাহ শাহজহান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আসিয়া, তিনটি বৃহৎ সুচালিত সেনাদলের মিলিত চেষ্টার ফলে সব শত্রুকে দমন করিয়া, শাহজীকে প্রায় পথের ভিখারীর মত দশায় আনিয়া মহারাষ্ট্র হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

তাঁহার মহারাষ্ট্র দেশে রাজা হইবার আশা সমূলে নষ্ট হইল। তিনি পুণা জেলার জাগীর পুত্রকে দিয়া নিজে নিজামশাহী-রাজ্য ত্যাগ করিয়া বিজাপুর রাজের চাকরি লইলেন, এবং মহারাষ্ট্র হইতে অতিদূরে কর্ণাটক প্রদেশে—অর্থাৎ মহীশূর, আর্কট জেলা এবং বেলগাঁও অঞ্চলে, জাগীর অর্জন করিলেন। তিনি বিজাপুর রাজ্যে সর্বপ্রধান হিন্দু সামন্তের পদে উঠিলেন বটে, কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে তাঁহার কোন ক্ষমতাই রহিল না। স্বদেশে স্বরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন যদি তাঁহার কখন ছিল, তবে তাহা ১৬৩৬ সালে একেবারে দূর হয়।

কিন্তু মারাঠা জাতীয় অভ্যুদয়কে শুধু কোন মহাপুরুষের কর্ম বলিলে অসত্য হইবে। একথা মানি যে, মহাপুরুষ না জন্মিলে এই কার্য সফল হইত না, এবং যখন মহারাষ্ট্রের নেতাদের মধ্যে মহাপুরুষের অভাব হইল তখনই মারাঠা স্বাধীনতা অস্ত গেল। কিন্তু একথাও সমান সত্য যে জাতীয় জন-সমষ্টির মধ্যে কতকগুলি গুণ না থাকিলে, সমস্ত দেশময় একটা জাগরণ দেখা না দিলে, প্রবল মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মারাঠাদের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ এবং সাম্রাজ্য-স্থাপন সম্ভব হইত না। দেড় শ বৎসরের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব শক্তি শুধু একজন মানুষের উপর, মাত্র একপুরুষব্যাপী কর্মীর উপর, নির্ভর করিয়া টিঁকিতে পারে না,—যেমন রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর ছয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হইল, কারণ শিখরাজ্য শুধু ব্যক্তিগত সৃষ্টি ছিল।

সুতরাং মারাঠাদের রাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়ের বীজমন্ত্র হইতেছে মারাঠা জাতীয় চরিত্র। ইহাই আমরা এখানে ভাল করিয়া দেখিব। মারাঠা চরিত্রে আত্মনির্ভরতা, সাহস, অধ্যবসায়, কঠোর আড়ম্বর শূন্যতা, সাদাসিদে ব্যবহার, সামাজিক সাম্য এবং প্রত্যেক মানবেরই আত্মসম্মানবোধ এবং স্বাধীনতাপ্রিয়তা, এই সব মহাগুণ জন্মিয়াছিল। তের শ বৎসর আগে চীনা পর্যটক ইউয়ান চুয়াং মারাঠা জাতিকে এইরূপই চক্ষে দেখিয়াছিলেন; তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—'এই দেশের অধিবাসীরা তেজী ও যুদ্ধপ্রিয়; উপকার করিলে কৃতজ্ঞ থাকে; অপকার করিলে প্রতিহিংসা খোঁজে। কেহ বিপদে পড়িয়া আশ্রয় চাহিলে তাহারা তজ্জন্য ত্যাগস্বীকার করে, আর কেহ অপমান করিলে তাহাকে বধ না করিয়া ছাড়ে না।'

"মারাঠা সৈন্যগণ সাহসী, বুদ্ধিমান্ এবং পরিশ্রমী, রাত্রে নিঃশব্দে আক্রমণ করা, অথবা শত্রুর জন্য ফাঁদ পাতিয়া লুকাইয়া থাকা, সেনাপতির মুখ না চাহিয়া নিজ বুদ্ধিবলে নিজকে বিপদ হইতে মুক্ত করা, এবং যুদ্ধের অবস্থা বদলানর সঙ্গে সঙ্গে রণ-প্রণালী বদলানর ক্ষমতা—একাধারে এই গুণগুলি একমাত্র আফগান এবং মারাঠা জাতি ভিন্ন এশিয়া মহাদেশে অন্য কোন জাতির নাই।···স্ত্রী স্বাধীনতার ফলে মহারাষ্ট্র দেশে জাতীয় শক্তি দ্বিগুণ হইল এবং সামাজিক জীবন অধিকতর পবিত্র ও সরস হইল। দেশের ধর্মও এই সামাজিক সাম্যভাব বাড়াইয়া দিল। এইরূপে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখা গেল যে মহারাষ্ট্র দেশে ভাষায় ধর্মে চিন্তায় জীবনে এক আশ্চর্য একতা ও সাম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু রাষ্ট্রীয় একতার অভাব ছিল; তাহাও পূরণ করিলেন শিবাজী।"

উপরের কথাগুলি দ্বারা আমি অনেক পূর্বের এক গ্রন্থে মারাঠা চরিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করি। এ কথাগুলি এখনও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু রাষ্ট্রগঠনের মত গুরুতর কার্যের পক্ষে এইসব ব্যক্তিগত গুণ ছাড়া আরও মূল্যবান্ কয়েকটি সুবিধা আবশ্যক; তাহা ছিল বলিয়াই মারাঠারা সফলতায় পৌঁছিতে পারিয়াছিল। সেই সুবিধাগুলির প্রথমে ইংরাজী নাম দিয়া পরে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিব—self-sufficing villages, experience of communal labour, local autonomy অর্থাৎ মহারাষ্ট্রে প্রত্যেক গ্রামে নানা বর্ণের

ব্যাপার সম্পন্ন করিত ; রাজাকে গ্রামের মোট খাজানা দিয়াই তাহারা খালাস, আর সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপার তাহারা নিজেরাই সর্বোচ্চ অধিকারী রূপে নির্বাহ করিত, বাহিরের কাহারও মুখ চাহিয়া থাকিতে হইত না, বাহিরের কেহ গ্রামের জীবনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। এইগুলিকে Indian Village Communities বলা হয়, ইহার প্রত্যেকটি একটি ছোট প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের মত, a petty republic. ইউরোপে মধ্যযুগের মাঝামাঝি এইরূপ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় ; ইটালিতে এইরূপ নাগরিক গণতন্ত্র প্রচুর খ্যাতিলাভ করে, কিন্তু সেগুলি আকারে জন-সংখ্যায় এবং যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষমতায় ছোট ছোট রাজ্যের সমান ছিল। মহারাষ্ট্রে প্রতি গ্রামে গ্রাম্য কর্মচারিগণের পদ পুরুষানুক্রমে চলিত, কখন কখন বা বিক্রয় হইত। কিন্তু তাহাতে গ্রামের জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটিত না। গ্রামবাসীরাই জুরী হইয়া ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলার নিষ্পত্তি করিত এবং জুরীর সিদ্ধান্তে সকলে সহি বা ঢেড়া দিয়া (নিরক্ষর লোকের পক্ষে লাঙ্গল বা ছোরার ছবি আঁকিয়া) তাহা দলিলে পরিণত করিত। এগুলির ফার্সী নাম মহজর-নামা। মধ্যযুগের ইংলণ্ডের গ্রাণ্ড জুরীর মত, কোন কোন মারাঠী মহজরে ৫০।৬০ জন লোকের স্বাক্ষর বা টীপ আছে।

সুতরাং প্রতি গ্রামই বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রায় ত্যাগ করিয়া নিজ গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া থাকিয়া পুরুষানুক্রমে সময় কাটাইত। গ্রামের লোকজন দৈনিক স্বায়ত্তশাসন করিয়া করিয়া পাকা হইয়া গিয়াছিল। জনসঙ্ঘ একত্র হইয়া সাধারণের হিতকর কার্যগুলি কিরূপে করিতে হয় তাহার অভিজ্ঞতা এই জাতির গ্রামবাসীদের মজ্জাগত হইয়াছিল। সংগঠন বলিয়া যে একটা কথা আজকাল আমরা শুনিতেছি, তাহা মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে অতি পুরাতন, অতি অভ্যস্ত জিনিষ ছিল। রাষ্ট্রশাসন ও নেশন-গঠনের পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক ও শ্রেষ্ঠ উপকরণ। মহারাষ্ট্রে ইহা পূর্ণমাত্রায় ছিল। রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পর ইউরোপে এইরূপ কমিউন্ উদ্ভব হয়, তাহার বিবরণ Vinogradoffএর লেখায় সকলে জানিতে পারিবেন। কিন্তু তাহা মহারাষ্ট্রের মত বহু শতাব্দী ধরিয়া টেঁকে নাই।

এইরূপে মহারাষ্ট্রে সমাজ, নীচু হইতে গঠিত হইয়া উঠে। এইরূপ গঠনই স্থায়ী এবং লোকহিতকর। উপরের সর্বশক্তিমান্ কর্তা কোন মুসোলিনী বা আলাউদ্দীন খিলজী, হুকুম দিয়া সমস্ত দেশবাসীদের ক্রীতদাসের মত একটি পথবিশেষে চালাইলেন, ইহাতে নেশন গঠিত হয় না, এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থায়ী হয় না—উহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জিনিষ। সে দুর্ভাগ্য মারাঠা জাতির হয় নাই ; তাই আজ ব্রিটিশ বিজয়ের পরও মারাঠা জাতি ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রসর জাতির সমকক্ষ হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত জনশক্তি ও সঙ্ঘপ্রাণ কখনও বিলোপ পায় না।

এই ত গেল ঐ লোকদের জাতীয় চরিত্র, এখন ইতিহাসে ইহার ফল দেখা যাক্। অতি আধুনিক মারাঠা লেখকগণ বলেন যে মহারাষ্ট্র দেশে হিন্দু স্বরাজ বা স্বাধীন মারাঠী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা ও চেষ্টা শাহজী হইতে আরম্ভ হয়, এবং শিবাজী পিতার এই নীতিটি

চুরি করিয়া তাঁহারই আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু শাহজীকে এই গৌরব দিতে ইতিহাস অস্বীকার করে। তিনি কোন বিষয়েই শিবাজীর পথ-প্রদর্শক ছিলেন না এবং অনেক বিষয়ে ঠিক বিপরীত। শিবাজীর কীর্তির মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রহিবে।

এখন দেখা যাউক, এই মারাঠা জাতিকে লইয়া শাহজী কি করিলেন। তাঁহার জীবনের প্রথমাংশে তিনি অহমদনগরের স্থলতানদের কর্মচারী মাত্র ছিলেন, এবং সেই রাজবংশে অবনতি ধরিবার পর মালিক অম্বর যেমন একটা রাজপুত্তলিকা খাড়া করিয়া নিজে নামে রাজপ্রতিনিধি থাকিয়া কার্যতঃ সমস্ত রাজশক্তি চালাইতেন, সেই মত মালিক অম্বরের মৃত্যু হইলে শাহজীও অপর এক রাজপুত্রকে খাড়া করিয়া তাহার মাথায় রাজছত্র ধরিয়া, নিজে দেওয়ানরূপে যতটা পারিলেন দেশ শাসন করিতে লাগিলেন অর্থাৎ তিনি কখনও নিজেকে রাজা বা স্বাধীন শক্তি বলিয়া ঘোষণা করেন নাই, সর্বত্রই পরের চাকর এই আখ্যা দেন। আর তাঁহার জীবনের এই প্রথম অংশে (১৬২৯-৩৫) তিনি মালিক অম্বরের মতই বিজাপুররাজ হইতে অনেক সাহায্য পান, এবং সেই সহায়তার বলেই নিজ নবজাত ক্ষুদ্র শক্তিকে মুঘল বাদশার বিরুদ্ধে খাড়া করিতে সাহসী হন।

শাহজহান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আসিয়া, মারাঠা নেতার এই চেষ্টা সমূলে নষ্ট করিয়া, তাঁহাকে জীবনের শেষ পর্যন্ত মহারাষ্ট্র হইতে বিতাড়িত ও কর্ণাটকে আবদ্ধ থাকিবার জন্য সন্ধি করান (১৬৩৬ খৃঃ)। এই শেষ জীবনে (১৬৩৬-৬৪) শাহজী বিজাপুরের জাগীরদার মাত্র থাকিয়া প্রভুর নামে কর্ণাটকের নানা স্থান (তাঞ্জোর নহে—তাঁহার কর্তৃক তাঞ্জোর জয় হয় এটা পুরাতন ভ্রান্তবিশ্বাস) জয় করিয়া তাহার কিয়দংশ নিজ জাগীররূপে পান। কিন্তু এখনও তিনি চাকর মাত্র, স্বাধীন রাজা নহেন। এই সময়ে তাঁহাকে ঠিক গোলকুণ্ডার দেওয়ান মির জুমলার সমান পদস্থ বলিয়া বর্ণনা করিলে সত্য হইবে।

ফলতঃ, যদিও শাহজী শেষ বয়সে খুব ধনী ও ক্ষমতাশালী হন, যদিও মুরার জগদেবের মৃত্যুর পরে বিজাপুর স্থলতানের রাজ্যে শাহজীই হিন্দু জাগীরদারদের মধ্যে সর্বপ্রথম বলিয়া গণ্য হন, যদিও তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র একোজী তাঞ্জোর রাজ্যের রাজা হন, তথাপি শাহজীকে হিন্দু-স্বরাজের প্রতিষ্ঠাতা, ছত্রপতিত্বের আদর্শ, বলিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

বিখ্যাত বিজয়নগর সাম্রাজ্য ১৫৬৫ সালের পর আরও সত্তর বৎসর হীন-প্রভায় ও খণ্ডাকারে চলিতেছিল, কিন্তু ক্রমেই উহার রাজশক্তির দুর্বলতা, মণ্ডলদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ প্রভৃতি বাড়িয়া গিয়া উহার রক্ষা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। স্থতরাং যখন শাহজহান ১৬৩৬ সালের সন্ধি দ্বারা বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার স্থলতানদের উত্তর ও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবার পথ বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন এই দুইটি মুসলমান রাজার পক্ষে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে অভিযান পাঠাইয়া কর্ণাটক জয় করিয়া রাজ্য বিস্তার করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় রহিল না। অর্থাৎ ভূতপূর্ব বিজয়নগর রাজ্যের খণ্ড প্রদেশগুলি লইয়া এই দুই স্থলতানের মধ্যে কাড়াকাড়ি মারামারি এবং প্রভু মুঘলবাদশার নিকট কাঁদিয়া নালিশ করা আরম্ভ হইল। এই সব অভিযান ১৬৩৭ সাল হইতে ১৬৫০ সাল পর্যন্ত বেগে

চলিয়াছিল। তাহার পর বিজাপুর রাজশক্তিতে ঘুণ ধরিল, আদিলশাহী ক্ষমতা-বিস্তার মন্দ মন্দ গতিতে চলিয়া শেষে থামিয়া গেল; শুধু শাহজী মহীশূরে এবং অপর ক'জন সরদার পূর্ব-কর্ণাটকে অর্থাৎ আর্কট জেলা দুইটিতে কোন কোন স্থান জয় করিয়া জাগীর স্থাপন করিলেন। গোলকুণ্ডা রাজ্যেও মিরজুমলার কর্মত্যাগ (১৬৫৬), কুমার আওরংজীবের আক্রমণ এবং রাজপরিবারে কলহের ফলে বিজয়বাহিনী থামিয়া গেল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শাহজী কর্তৃক হিন্দু স্বরাজ স্থাপনের চেষ্টা ত হয়ই নাই, বরং তিনি হিন্দু সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ লুঠ ও ভাগাভাগি কাজে সুলতানদের অন্যান্য কর্মচারিগণের সহিত প্রচুর সহায়তা করেন। ইহাকে শিবাজীর জীবনের আদর্শ বলা যাইতে পারে না।

নিজ মহারাষ্ট্র দেশের সঙ্গে শাহজীর সম্বন্ধ প্রথম সামান্য মাত্র—অর্থাৎ মুসলমান সুলতানের ভৃত্যরূপে ছিল; এবং ১৬৩৬ হইতে এই সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়। তাঁহার জন্মভূমিতে শুধু দেড় লাখ টাকার জাগীর মাত্র অবশিষ্ট রহিল, তাহা তিনি পুত্র শিবাজীকে দিয়া চলিয়া গেলেন। জন্মভূমিতে তিনি কখনও নিজ মাথার উপর রাজছত্র ধারণ করেন নাই, জমিদার মাত্র ছিলেন; পুণা, চাকণ, সুপা, বারামতী এই গ্রামগুলি তাঁহার থানা মাত্র ছিল, ১৬২৯—১৬৩৫ সালের মধ্যে তাঁহার অধিকার করা সব দুর্গ মুঘলেরা কাড়িয়া লইয়াছিল।

শাহজী ও শিবাজী যে এক মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হন নাই, তাঁহাদের জীবনের কাজ যে পৃথক পৃথক্ শ্রেণীর, তাহা একটি বিষয় ভাবিলেই সুস্পষ্ট হইবে। ১৬৫৪ সালের পর হইতে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক গগনে মুঘল সূর্য অসহ্য দীপ্তিতে বিরাজমান ছিল, ছোটবড় সকলেই বুঝিল যে দিল্লীর বাদশাহই আমাদের সর্বেসর্বা প্রভু, নামে অন্য কেহ সুলতান হউন না কেন। শাহজী ১৬৩৬ সালের পর হইতে কখনও মুঘলদের সংঘর্ষে আসেন নাই, এমন কি বিজাপুর সুলতানেরও বিরুদ্ধে কখনও দাঁড়ান নাই। এরূপ রাজভক্ত জাগীরদার কিরূপে বিদ্রোহী স্বাধীন শিবাজীর পথ-প্রদর্শক হইবেন?

সুতরাং "হিন্দবী স্বরাজ" শিবাজীর নিজস্ব কল্পনা, একমাত্র শিবাজীর সফল প্রচেষ্টা। তাহা শিবাজীর জীবন সম্যক্ আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব।

শ্রীযদুনাথ সরকার

শিবাজী *

মহারাষ্ট্র দেশের সর্বজনপূজ্য সাধু রামদাস স্বামী নিজ দীর্ঘ জীবনের অন্তে তাঁহার শেষ পত্রে লিখিয়াছিলেন—

শিব রাজার রূপ স্মরণ কর,
শিব রাজার দৃঢ় সাধনা স্মরণ কর,
শিব রাজার কীর্তি স্মরণ কর,
ভূমণ্ডলে।
সকল সুখ ত্যজিয়া,
যোগ সাধন করিয়া,
রাজ্য সাধনায় তিনি কেমন
দ্রুত অগ্রসর হন।
শিব রাজাকে স্মরণ রাখিও,
জীবনকে তৃণ সমান মনে করিও,
[তবেই] ইহলোকে পরলোকে তরিবে,
কীর্তিরূপে।

আড়াই শ বৎসরেরও অধিক কাল হইল এই কথাগুলি লিখিত হয়, কিন্তু আজও বিপুল মারাঠা জাতীয় জনসমাজে ইহা জপ-মন্ত্র স্বরূপ হইয়া আছে। অন্যপ্রদেশীয় নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকও ইহার সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ফলতঃ যদি আমরা শিবাজীর আরম্ভের পুঁজিপাটার সহিত তাঁহার জীবনশেষে সঞ্চিত কীর্তিকলাপ তুলনা করি, অথবা তাঁহার দেহত্যাগের পরও তাঁহার মৃত্যুহীন আত্মা ও স্মৃতির জীবন্ত প্রভাব স্মরণ করি, তবে জগৎ ইতিহাসের সর্বোচ্চ কয়েকজন মহাপুরুষের মধ্যে তাঁহাকে স্থান দিতেই হইবে।

মারাঠাজাতির মধ্যে শিবাজীর স্মৃতি দেবতুল্য সম্মানের সহিত পূজা করা হয়। তাঁহার জাত্ অর্থাৎ বর্ণ ছিল মারাঠা; যদিও মারাঠাদের বড় লোকেরা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে, তথাপি ইহাদের অনেকে কৃষিজীবী বা প্রহরীর কাজ করিয়া দিন কাটায়, এবং মারাঠা জাতের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর লোকদের কুন্‌বী অর্থাৎ কৃষকের সমান বলিয়া সমাজে গণ্য করা হয়, এবং এই দুই জাতের আচার ব্যবহার প্রায় এক মতই।

ইহা সত্ত্বেও শিবাজীর কীর্তিকলাপ এত মহান্ যে এ প্রদেশের অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ জাতও তাঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া বর্ণনা করেন; তাঁহার তিরোধানের সময় অকালে সূর্যগ্রহণ ভূমিকম্প প্রভৃতি ঠিক যীশুর তিরোধানের মত, নৈসর্গিক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে বলিয়া প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। মহারাণা প্রতাপসিংহের মতই শিবাজী এবং তাঁহার প্রধান অনুচরগণ শত শত নাটক নভেল প্রণোদিত করিয়াছেন, এবং এখনও করিতেছেন। জাতীয় বীর, রাষ্ট্রনেতা, নেশান-গঠনকারী আদিপুরুষ, এই অভিধেয়ের প্রত্যেকটিই তাঁহার সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

তাঁহার কার্যগুলির বিস্তারিত আলোচনা এবং সেই যুগের ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থা চিন্তা করিলে, তবে তাঁহার অসাধারণ মহত্ত্ব ঠিক বুঝিতে পারা যায়। ফলতঃ পুরুষকার কিরূপে ইতিহাসকে বদলাইয়া দিতে পারে, জনসঙ্ঘকে নূতন পথে চালাইয়া দিতে পারে, ভারতে তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত শিবাজী।

শিবাজীর ইতিহাসের কাঠামো অনেকদিন হইল আমাদের জানা আছে। গ্রাণ্ট ডফের গ্রন্থে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাই এতদিন নানা ভাষায় অনুবাদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু গত উনিশ বৎসরের গবেষণার ফলে আমরা শিবাজীকে আরও সত্য, আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারিয়াছি। এখন আর গ্রাণ্ট ডফের কাহিনীতে সন্তুষ্ট থাকা চলে না। গ্রাণ্ট ডফের অজানিত কতকগুলি প্রথমশ্রেণীর মৌলিক উপাদান অতি অল্পদিন হইল আমাদের হস্তগত হওয়ায়, তাঁহার রচিত শিবাজী-চরিতে বিপ্লব-সমান পরিবর্তন ঘটাইয়া দিয়াছে। প্রথম আবিষ্কার, জয়পুরের মীর্জারাজা জয়সিংহের সমস্ত চিঠি-পত্র ; ইহাতে ১৬৬৫-১৬৬৭ পর্যন্ত শিবাজীর কার্যকলাপ অতি বিস্তৃতভাবে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় আমরা জানিয়াছি। দ্বিতীয়, কুমার আওরংজীবের মুন্সী কাবিলখাঁর রচিত আদাব্-ই-আলমগিরিতে ১৬৫৮ সাল পর্যন্ত এই মুঘল রাজকুমার এবং শাহজী ও শিবাজীর পরস্পর সম্বন্ধ বর্ণিত আছে। শিবাজী এবং তাঁহার কয়েকজন কর্ম্মচারীর ফার্সী পত্র বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর এক হস্তলিপিতে পাওয়া গিয়াছে। বিজাপুরের সভাপণ্ডিত জহুর-বিন-জহুরীর মুহম্মদনামা এবং অনেকগুলি বিক্ষিপ্ত ফার্সী ফর্মান ও সনদ আবিষ্কার হওয়ায়, শাহজী এবং তরুণ শিবাজীর ইতিহাস এখন সমসাময়িক দলিলের দৃঢ় ভিত্তিতে খাড়া করা যায়। পণ্ডিচেরীর প্রতিষ্ঠাতা ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁ (Francois Martin)এর দিনলিপি হইতে মারাঠা বীরের কর্ণাটক অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ এবং তাঁহার শিবিরের চাক্ষুষ বর্ণনা আমরা পাইয়াছি (প্যারিস হইতে নকল আনিয়া ১৯২৪ সালে আমি ইহা প্রথম প্রকাশ করি)। পর্তুগীজ ভাষায় গোয়া নগরে যে সব কাগজপত্র আছে তাহা নিঃশেষে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ছাপিয়া, শ্রীযুক্ত পাণ্ডুরঙ্গ পিস্থলেঁকর মহাশয় শিবাজীর জীবনের এই দিকটার উপর অনেক নূতন আলোক পাত করিয়াছেন। আর মারাঠী ভাষায় লিখিত জেধে বংশের শকাবলীতে আমরা সে সময়ের অনেক ঘটনার সঠিক তারিখ এবং সূক্ষ্ম বিবরণ—যদিও অল্প কথায়—পাইয়াছি। ইহা অমূল্য উপাদান। সংস্কৃতভাষায় তৎকালে লিখিত শিবভারতম্ পর্ণালপর্বতগ্রহণাখ্যানম্ এবং শিবরাজরাজ্যাভিষেককল্পতরু এই তিনখানি ইতিহাস অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইয়াছে। আর ফার্সী ভাষায় মাসির্-এ-আলমগীরী নামক সরকারী ইতিহাস ডফ্ সাহেবের অজ্ঞাত ছিল।

এই ত গেল নূতন আবিষ্কার। তাহার পর ডফের জানিত উপকরণ অধিক যত্নের সহিত নিঃশেষে ব্যবহার করিয়া, তিনি যাহা ছাড়িয়াছেন এরূপ অনেক কাজের কথা ও তারিখ পাওয়া গিয়াছে। এই উপকরণের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের বন্দরের ইংরাজ ও ওলন্দেজ কুঠীর পত্র, ভীমসেনের ফার্সী আত্মকাহিনীর মূল গ্রন্থ প্রভৃতি প্রধান। তথাকথিত "রায়গড় লাইফ্ অব্ শিবাজী" অর্থাৎ মালকরে বখর্ ; এটা এখন অন্যান্য উপাদানের সাহায্যে আমরা আগাগোড়া সংশোধন করিতে পারি। ইহার ফলে শিবাজীর ইতিহাস

একেবারে নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার সত্যস্বরূপ এতদিনে চক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

কিন্তু ইতিহাস ও জীবন কাহিনী একজন মানুষের বাহ্য আকার ও কর্মগুলি মাত্র আমাদের দেখায়। তাঁহার চরিত্র ও জীবনীশক্তির ক্রিয়া বুঝিতে হইলে এই সব বাহ্য ঘটনার উপর ঐতিহাসিক দর্শন, যাহাকে Philosophy of History বলে, তাহার প্রয়োগ করা আবশ্যক।

শিবাজীর চরিত্রের যে বর্ণনা আমি পূর্ব এক গ্রন্থে করিয়াছি, তাহাই সম্মুখে রাখিয়া সমালোচনা আরম্ভ করিব—

"আশ্চর্য সফলতা ও অতুলনীয় খ্যাতিতে মণ্ডিত হইয়া শিবাজী সেই যুগের ভারতে সর্বত্রই হিন্দুদের চক্ষে এক নূতন আশার উষাতারারূপে দেখা দিলেন। একমাত্র তিনিই হিন্দুদের জাত ও তিলকের, শিখা ও উপবীতের রক্ষক ছিলেন।...তাঁহার চরিত্র নানা সদ্‌গুণে ভূষিত ছিল। তাঁহার মাতৃভক্তি, সন্তানপ্রীতি, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্মানুরাগ, সাধু-সন্তের প্রতি ভক্তি, বিলাস-বর্জন, শ্রমশীলতা এবং সর্ব সম্প্রদায়ের প্রতি উদারভাব সে যুগে অতুলনীয় ছিল।...তিনি সর্ব ধর্মের মন্দির ও শাস্ত্র গ্রন্থের প্রতি সম্মান এবং সাধু সজ্জনের পোষণ করিতেন।...সর্ব জাতি, সর্ব ধর্মসম্প্রদায়, তাঁহার রাজ্যে নিজ নিজ উপাসনার স্বাধীনতা এবং সংসারে উন্নতি করিবার সমান সুযোগ পাইত। দেশে শান্তি ও সুবিচার, সুনীতির জয় এবং প্রজার ধনমান রক্ষা তাঁহারই দান।

"তাঁহার চরিত্রের আকর্ষণী শক্তি ছিল চুম্বকের মত—দেশের যত সৎ দক্ষ ও মহৎ লোক তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিত।...সৈন্যদের সঙ্গে সদাসর্বদা মিলিয়া মিশিয়া, তাহাদের দুঃখকষ্ট বিপদের ভাগী হইয়া, ফরাসী সৈন্য মধ্যে নেপোলিয়নের ন্যায় তিনি তাহাদের একাধারে বন্ধু ও উপাস্য দেবতা হইয়া পড়েন।

সৈন্যবিভাগের বন্দোবস্তে, শৃঙ্খলা, দূরদর্শিতা, সব বিষয়ের সূক্ষ্মাংশের প্রতি দৃষ্টি, স্বহস্তে কর্মের নানা সূত্র একত্র ধরিবার ক্ষমতা, প্রকৃত চিন্তাশক্তি এবং অনুষ্ঠান-গঠনে নৈপুণ্য—এই সকল গুণের পরাকাষ্ঠা তিনি দেখান।......

তাঁহার বংশধরগণ আজ জমিদার মাত্র। কিন্তু মারাঠা জাতিকে নবজীবন দান তাঁহার অমর কীর্তি।

ফলতঃ শিবাজী হিন্দু জাতির সর্বশেষ মৌলিক গঠন-কর্তা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মবীর।" [আমার রচিত "শিবাজী", ২৫৯—২৬২]। এখানে এই পুনরাবৃত্তি শেষ করিলাম।

শিবাজীর কার্যগুলি এবং সেই যুগে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে আমাদের প্রথম আশ্চর্যের বিষয় হয় শিবাজীর দৃষ্টিশক্তি। তখন রাজনৈতিক গগন অন্ধকার, চারিদিকে ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন, অথচ তিনি যেন দৈবজ্ঞানে বুঝিতে পারিতেন কোন্ ঘটনার কি ফল হইবে, শক্তিগুলির মিলন বা সংঘর্ষ কোন্ দিকে গড়াইবে। তিনি

নাই ; ছোট খণ্ড খণ্ড জাগীরে আমলাগিরি করিয়া শাসন ও যুদ্ধের যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, এমন কি পুস্তক পড়িবার বিদ্যাও শিক্ষা করেন নাই, তাহার জন্য অবসরও পান নাই। তথাপি তিনি চারিদিকে প্রবল পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করিতে, অথবা সময় বুঝিয়া মৈত্রী করিতে, দ্বিধা বোধ করেন নাই। কোন ভুলের চাল চালেন নাই। লোকে ভাবিত ইহা তাঁহার ইষ্টদেবী ভবানীর মন্ত্রণা বা স্বপ্নাদেশের ফল। আমরা বলিব ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা। জগতের সব দেশেই সর্বোচ্চ শ্রেণীর কর্মবীরগণ এই নির্ভুল দূরদর্শিতা দেখাইয়া থাকেন ; সাধারণ প্রতিভার লোক, হাজার সুবুদ্ধি সৎ বা কর্মঠ হউক না কেন, এই মহাশক্তিতে বঞ্চিত। অর্থাৎ ইংরাজীতে genius এবং talentএর মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় তাহা ইহাই।

তাহার পর, প্রকৃত রাজার, সর্বোচ্চ শ্রেণীর লোকনায়কের প্রধান চিহ্ন, লোক চিনিবার শক্তি, অর্থাৎ প্রত্যেক লোকের ঠিক চরিত্র এবং কর্মকুশলতা অথবা বিশেষ গুণগুলি অতি অল্প সময়ে দৈবজ্ঞের মত ঠিক বুঝিয়া লইতে পারা। এই গুণে শিবাজী এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আওরংজীব বাদশাহ অতুলনীয় ছিলেন। এইরূপে লোকচরিত্র নির্ভুল বিচার করিয়া তিনি প্রত্যেক কর্মচারীকে তাহার ব্যক্তিগত উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করিতেন, অর্থাৎ ইংরাজী উপমায় যে বলে গোল খুঁটোকে চৌকোণা গর্তে বসাইও না, শিবাজী কখনও সেরূপ ভুল করিতেন না। ইহাও একটি দৈবশক্তি এবং জগতে সফলতা লাভের একটি প্রধান মন্ত্র।

প্রভুর পক্ষে সফলতার আর একটি মন্ত্র এই যে, সব শ্রেণীর কর্মচারীর শ্রমের সামঞ্জস্য করিয়া, তাহাদের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত চেষ্টাকে সমবায়ের সূত্রে গাঁথিয়া দিয়া, সেই সূত্র সর্বদা নিজ হাতে রাখিয়া অতি অল্প ব্যয়ে ও অতি অল্প বাধাতে কাজ হাসিল করা। শিবাজী সব শ্রেণীর সেবকের নিকট হইতে প্রফুল্লবদনে প্রদত্ত ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ সেবা ও শ্রম আদায় করিবার গোপনীয় মন্ত্রটি জানিতেন। যিনি প্রকৃত লোকনেতা কেবল তিনিই এইরূপ করিতে পারেন। তিনি নিজে খাটেন এবং অন্যকে খাটাইতে জানেন, নিজে খাটেন সর্বদা সজাগ পর্যবেক্ষণে এবং ভৃত্যদের কাজের সমন্বয়ে—ভৃত্যদের কাজ নিজ হাতে করিয়া নহে। শেষোক্ত ভুলটি অর্থাৎ সব কাজ নিজে করিব বা চালাইব, স্থানীয় প্রতিনিধির হাতে কিছুমাত্র দায়িত্ব দিব না, এই মহাভ্রান্তিপূর্ণ নীতি অনুসরণের ফলে দ্বিতীয় ফিলিপ, আওরংজীব এবং আমাদের বড়লাট লর্ড কেনিংএর শাসন বিফলতার মধ্যে ডুবিয়া যায়, অথচ তাঁহারা প্রত্যেকেই সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান্ এবং শ্রমী শাসক ছিলেন। শিবাজী কিন্তু নিজের কোন ভৃত্যকে তাঁহার উপর প্রভু হইয়া বসিয়া তাঁহার কার্য পরিচালনা করিতে দিতেন না, কারণ তিনি নিজেই সর্বত্র কর্তা, সর্বত্রই পরিদর্শক হইয়া থাকিতেন। দৌলত রাও সিন্ধিয়ার ফিরিঙ্গী সেনাপতিগণ প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার প্রভু হইয়া দাঁড়ায়, কারণ দৌলত রাও নিজে অকর্মণ্য নির্বোধ অলস। শিবাজী ইহার বিপরীত ছিলেন। তিনি আশ্চর্য প্রতিভাবলে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন প্রদেশের সেনানী ও

হইতে দিতেন না। দেশস্থ, কর্হাড়ে, শেন্‌বী, চিৎপাবন এই চারি শ্রেণীর পৃথক ব্রাহ্মণ, মসীজীবী প্রভু-কায়স্থগণ, জাত মারাঠাগণ, এমন কি নাপিত, বণিক্‌, গুজর, এবং মুসলমান পর্যন্ত তাঁহার শাসনবিভাগে ও সৈন্যদলে কাজ করিত, কিন্তু প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া এবং প্রভুকে মানিয়া চলিয়া। তাঁহার পরবর্তী যুগে যখন মারাঠা রাজ্যে কর্মচারীদের মধ্যে স্বেচ্ছাচার আরম্ভ হইল, প্রভুর শক্তি অবহেলা ও অগ্রাহের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল, তখন সেই সোনার রাজত্ব ভাঙ্গিয়া গেল। অরাজকতা উপর হইতে নীচে আসিয়া পৌঁছিল—ঠিক যেমন রণজিৎ সিংহের অযোগ্য পুত্রদের সময়ে পঞ্জাবে ঘটিয়াছিল।

সবার উপর শিবাজীর রাজনৈতিক অনুভব-শক্তিকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। নব্য ইটালীর একতা-বন্ধনের এবং স্বাধীনতা-লাভের পুরোহিত কাউণ্ট কাভুর বলিতেন যে শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্‌ কর্মবীরের লক্ষণ হচ্ছে এই যে কোন্‌ কাজটা সম্ভব তাহা দৈবজ্ঞের মত বুঝিতে পারা—বিনা তর্কে, বিনা চিন্তায়, স্বভাবসিদ্ধ শক্তির দ্বারা,—যেমন হাঁসের বাচ্চা জন্মিয়াই সাঁতার দিতে পারে। এই শক্তির অভাবে অনেক নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সাধু শাসক, মহারথী তলাইয়া যান, প্রকৃত কার্যক্ষেত্রের পরীক্ষায় হার মানেন। এই দিক্‌ দিয়া দেখিলে শিবাজীকে প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ অথবা ষ্টেটস্‌ম্যান বলিতে হইবে। আপনারা জানেন জিনিয়াস্‌ এবং ট্যালেণ্ট এই গুণ দুটির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, ঠিক সেই পার্থক্য ষ্টেটস্‌ম্যান এবং পলিটিশিয়ানের মধ্যে আছে। শিবাজী প্রকৃতই ষ্টেটস্‌ম্যান ছিলেন—যেমন ফরাসী রাজা চতুর্থ হেনরী অথবা ইংলণ্ডের প্রথম এডওয়ার্ড ও এলিজাবেথ।

আবার প্রকৃত কর্মবীরের মত তিনি কোন নূতন কাজ বা নূতন অভিযান আরম্ভ করিবার পূর্বে জমি পরিষ্কার করিয়া পথ বাঁধিয়া তবে অগ্রসর হইতেন; এই যেমন স্থরট বন্দর লুটিবার অথবা বেরার প্রদেশ প্রথমবার আক্রমণ করিবার পূর্বে। তিনি অনেক মাস ধরিয়া সেই সেই স্থানে চর পাঠাইয়া সব গোপনীয় তথ্য ও পথঘাট জানিয়া, এবং সেখানে উপস্থিত হইবার পর তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আগে হইতে গুপ্ত প্রতিনিধি বসাইয়া রাখিয়া, তবে নিজ দেশ হইতে যাত্রা করিতেন, এবং এইরূপ স্থানীয় জ্ঞান ও সহায়কের যোগাযোগে তাঁহার কর্মঠ মিতাহারী আস্‌বাববিহীন অশ্বারোহী দল লইয়া এত দ্রুত অগ্রসর হইতেন যে শত্রুগণ তাঁহার পৌঁছার পূর্বে সতর্ক হইতে পারিত না, ভাবিত যে শিবাজীর বর্গীরা আকাশ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে। বেরারের সর্বাপেক্ষা ধনশালী শহর কারঞ্জা যখন শিবাজী প্রথম লুঠ করিলেন, তখন অতি প্রত্যূষে শহরবাসীরা ঘুম হইতে জাগিয়া দেখিল যে যাহা কোনদিন শুনে নাই, ভাবে নাই সেই ঘটনা ঘটিয়াছে, মারাঠা সৈন্যের উপস্থিতি ২০০ মাইলের মধ্যেও শুনা যায় নাই, অথচ তাহারা রাতারাতি পৌঁছিয়া ঐ শহর ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

ফলতঃ শিবাজীকে শুধু বীর যোদ্ধা বা বিচক্ষণ সেনানায়ক ভাবিলে ভুল হইবে। তিনি এই মহাগুণের সঙ্গে সঙ্গে দৌত্যকুশলতা এবং শাসন-দক্ষতা এই দুটি বিপরীত শ্রেণীর গুণেও ভূষিত ছিলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে ক্রমওয়েল ও মার্লবরো, ওয়েলিংটন এবং পঞ্চম

এইত শিবাজী চরিত্রের বিশ্লেষণ। এখন দেখা যাউক তাঁহার কীর্তিগুলি কি কি। আমি এখানে তাঁহার জয়-পরাজয়, ধন-দৌলত বা রাজ্যবিস্তারের বিবরণ দিব না, তাহা আপনারা সকলেই অল্পবিস্তর জানেন, এবং আমি এক বাঙ্গালা গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছি। আজ দেখাইব তিনি মারাঠা জাতির জন্য নূতন কি করিলেন, তাঁহার দান কি কি।

শিবাজীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইতেছে মারাঠাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা, তাহাদিগকে একতার সূত্রে গাঁথিয়া দিয়া নেশান্‌-সৃষ্টির আরম্ভ করা। এরূপ কার্য জগতের ইতিহাসে প্রায়শঃ নূতন ধর্মপ্রবর্তকেরাই করিয়া থাকেন, ক্বচিৎ কোন কোন দেশে এক একজন মহাপুরুষ নেতা বা অসামান্য রাজনৈতিক প্রতিভাশালী পুরুষ করিতে পারেন। শিবাজী এই শ্রেণীর নরশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন, তাই আজও তাঁহার নাম মহারাষ্ট্রে এবং মারাঠাজাতির গুণগ্রাহী অন্য প্রদেশের অধিবাসীর মধ্যে দেবতার সমান পূজা করা হয়। তাই আজও তাঁহার সৃষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিকে লোকে এত যত্নের সহিত আলোচনা করে এবং অনেকে আদর্শ বলিয়া অনুসরণ করিতে চায়। তিনি প্রথমে মারাঠাদিগকে বুঝাইলেন "মানুষ আমরা, নহি ত মেষ", কার্যদ্বারা প্রমাণ করিলেন যে তাহারা এই নব্যযুগেও রাজ্যগঠন করিতে, শাসন চালাইতে, প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হইতে পারে, তাহাদের উন্নতি সম্ভব এবং সে উন্নতিলাভ করা তাহাদের নিজের হাতেই। যুগ যুগ বহিয়া অধীনতা ও জাতীয় অবসাদের ফলে যে নৈরাশ্য জন্মে তাহা দূর করিয়া একটা রাষ্ট্রের মৃতদেহে নবীন প্রাণ সঞ্চার করার মত বড় কাজ জগতে আর নাই। শিবাজী তাহাই করেন, এবং তিনি মারাঠা জাতির মধ্যে যে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও চলিতেছে—সমগ্র ভারতের চক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

চলিত কথায় বলা যাইতে পারে যে শিবাজী প্রথমে মারাঠা জাতির—এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্য প্রদেশের হিন্দু প্রজাদেরও ভয় ভাঙ্গাইলেন। তিনি যখন ক্ষুদ্র জমিদার হইয়াও স্বাধীনতার পথে প্রথম পা ফেলিলেন (১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে) তখন তাঁহার উপরের শক্তি, অর্থাৎ বিজাপুর-রাজ, বাহ্যতঃ অক্ষুণ্ণ প্রতাপে, আর রাজার উপর রাজা অর্থাৎ দিল্লীর বাদশাহ মধ্যাহ্নের সূর্যের মত সমস্ত ভারতকে উত্তপ্ত করিতেছিল। এই মুঘল রাজশক্তির সমক্ষে ভারতের সব হিন্দু-মুসলমান রাজ্যগুলি হার মানিয়াছিল, এমন কি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার এতদিনকার স্বাধীন মুসলমান সুলতান দুটিও দিল্লীশ্বরের নিকট মাথা নত করিয়া নিজদের তাঁহারই সামন্ত মাত্র বলিয়া মানিয়া লইয়া, দিল্লীর বাদশাহের নাম নিজ নিজ রাজধানীতে খুৎবা পাঠের অন্তর্গত করিয়া দিয়াছিলেন, আর অহঙ্কারী দিল্লীশ্বর এই দুই সুলতানকে চিঠি-পত্রে শাহ্‌ অর্থাৎ রাজা না বলিয়া খাঁ অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত প্রজা এই নাম দিয়া লিখিতেন,—আদিল খাঁ, কুতব খাঁ, ঠিক যেন মুঘল সরকারের চাকর খাঁ জহান বা খাঁ দৌরানের মত।

অথচ এই মুঘল চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে প্রথম দাঁড়াইলেন, তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে অপমান করিলেন, কে? একটি ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক, পরাজিত, নির্ব্বাসিত জাগীরদারের ছেলে, যাঁহার আয় তখন তিন লক্ষ টাকার বেশী হইবে না। সমস্ত ভারত

এইরূপ দুরূহ, প্রায় অসাধ্য, কাজে সফল হওয়াই তাঁহার দেবদত্ত প্রতিভার প্রমাণ। জগতে নূতন পথ, নূতন দেশ আবিষ্কারকের যে মান, রাজনৈতিক ভারতে শিবাজীর তাহাই প্রাপ্য।

তাহার পর কখনও দুই শত্রুর, কখনও বা তিন শত্রুর—মুঘল, বিজাপুর, পোর্তুগীজ, ইংরাজ—ইহাদের একসঙ্গে আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া তিনি দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন—এই সব দ্বন্দ্বে তাঁহার কত বুদ্ধির স্থিরতা, হৃদয়ের দৃঢ়তা এবং উপায় উদ্ভাবনে বিচিত্র মৌলিকতা দেখা গিয়াছিল, তাহা তাঁহার ইতিহাস পাঠকেরাই জানেন। ঠিক কখন বা কাহার সহিত মৈত্রী করিতে হইবে, অথবা যুদ্ধ আরম্ভ লাভকর হইবে, তাহা তিনি অব্যর্থভাবে বুঝিতে পারিতেন। ভারতে এরূপ চির-সফল সুবিধাবাদী **unfailing opportunist** আর দেখা যায় না।

তাঁহার এই সুবিধার পন্থা দেখিয়া বাহির করিবার, রন্ধ্রে প্রহার করিবার দৈবশক্তি তাঁহার বিখ্যাত কর্ণাটক অভিযানে অতি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। মারাঠী বখর-কার এই সেনাচালনকে "ছত্রপতির দক্ষিণ দিগ্বিজয়" নাম দিয়াছেন, এবং একজন ইংরাজ প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বণিকের বর্ণনায় আছে যে "জুলিয়াস্ সিজারের মত শিবাজী সেই প্রদেশে আসিলেন, দেখিলেন ও জয় করিলেন"; ইহাই তাহার যথার্থ বর্ণনা। কত রাজনৈতিক ফন্দী, সন্ধি পাতান, মুঘল সুবাদারকে ঘুষ দেওয়া, চর পাঠাইয়া সব খবর লওয়া, ঘাটিতে ঘাটিতে নিজ লোক আগে হইতে গোপনে প্রস্তুত রাখা, এই অভিযানের পূর্বে সম্পন্ন করিয়া তবে শিবাজী একপদও অগ্রসর হন, এবং এইরূপ দূরদর্শিতার সহিত বন্দোবস্তের ফলে তাঁহার গতি যে কেমন অবাধ ছিল, কাজটা কত শীঘ্র সম্পন্ন হইল তাহা শিবাজী-চরিতের এই অধ্যায়ে আপনারা অনেকেই পড়িয়াছেন।

শত্রুরা শিবাজীকে লুঠিয়াই বলুক, আর পার্বত্য মূষিকই বলুক, তাঁহার সফলতা ও শক্তিকে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। স্বয়ং আওরংজীব ১৬৬৭ সালে তাঁহার 'রাজা' উপাধি অনুমোদিত করেন এবং ১৬৭৪ সালে শিবাজী মহাসমারোহে রাজ্যাভিষেক করিয়া সমগ্র ভারতের সম্মুখে নিজকে ছত্রপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন, নিজ নামে টাকা বাহির করিলেন, এবং সেইদিন হইতে এক রাজ্যাভিষেক শক প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ইহাই ত গেল তাঁহার গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উঠিবার পথের সোপানাবলী। তাহার পর তাঁহার প্রতিষ্ঠানগুলি আলোচনা করিয়া বক্তব্য শেষ করিব।

তাঁহার শাসনপ্রণালী সে যুগের এবং সে দেশের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল, এবং ঐ দেশের পূর্ব সংস্কার ও অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপরে গঠিত—বিদেশ হইতে কলে ঢালা দ্রব্যের আমদানী নয়—এজন্য উহা বেশ সুফল প্রদান করে এবং প্রায় শেষ পর্যন্ত টেঁকে। পরবর্তী রাজাদের চরিত্রহীনতার এবং মন্ত্রীদের মধ্যে ঝগড়ার ফলেই এই শাসন-প্রণালী পরে ভাঙ্গিয়া পড়ে—পরিকল্পনার দোষে নহে। শিবাজীর রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতিতে অষ্টপ্রধানদের পদ ও কার্যবিভাগ আপনারা জানেন।

যখন তিনি কল্যাণ (বর্তমান থানা জেলা, বম্বে দ্বীপের ঠিক পূর্বে স্থিত স্থলভূমি) অধিকার করিয়া সমুদ্রগামী জাহাজ গড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাহা দেখিয়া গোয়া ও দামনে পর্তুগীজদের ভয় জন্মিল। আপনারা শুনিয়া বিশ্বাস করিবেন না যে শিবাজী ও বম্বের ইংরাজদের মধ্যে সর্ব প্রথম যে জলযুদ্ধ ঘটে তাহাতে ইংরাজের পরাজয় হয়।

শিবাজীর সৈন্যগঠন ও নেতৃত্বের প্রশংসা করা অনাবশ্যক, কারণ মারাঠা শক্তির অদম্য বিকাশ এবং ভারতব্যাপী প্রভাবই ইহার সাক্ষ্য। এই সৈন্যগণকে শুধু বর্গী ভাবিলে ভুল হইবে। একজন উত্তর-ভারতীয় মুসলমান ঐতিহাসিক মার্‌হাট্টা শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন "মার্‌কে হট্ গিয়া!" অর্থাৎ যাহারা হঠাৎ ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া দু চার ঘা মারিয়া দু চারটা জিনিষ লুঠ করিয়া, বিপক্ষ সৈন্য আসিতেছে শুনা মাত্র পলাইয়া যায়। কিন্তু শিবাজীর সময়ে মারাঠা সৈন্য ইহার অপেক্ষা অনেক উচ্চ শ্রেণীর সামরিক শক্তি দেখায়। তাহারা মুঘল সেনাপতি ইখ্‌লাস খাঁকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করে, অনেক দুর্গ প্রকাশ্যে অবরোধ করিয়া জয় করে, এবং প্রবল দল লইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সহস্রাধিক মাইল পথ কুচ করিয়া যায়। এগুলি লুঠিয়ার কাজ নহে।

শিবাজীর রাজ-সভা দেশের—শুধু মহারাষ্ট্রের নয়, সমস্ত ভারতের—গুণী জ্ঞানী শিল্পী ভক্ত জনগণকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল। তাঁহারই অনুগ্রহে দেশে জ্ঞান ও ধর্ম আবার আলোক দিতে আরম্ভ করিল। ইহাও লুঠিয়ার কাজ নহে।

সর্বশেষে এই নিষ্ঠাবান্ হিন্দু নরপতি সর্ব ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি, সর্বধর্মের মন্দির ও শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি সম্মান, সর্বজাতির সাধু পুরুষদের আদর ও অর্থ এবং লাখরাজ জমি দান প্রভৃতি কাজের দ্বারা সেই যুগে এক অশ্রুতপূর্ব মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত দিয়া গিয়াছিলেন। সে দৃষ্টান্তের অভাব আজ জার্মাণী অনুভব করিতেছে। শিবাজীর দর্শিত আদর্শকে ভুলিয়া যাইবার ফলে আজও ভারতে ধর্মের দোহাই দিয়া নরহত্যা ও গৃহদাহ চলিতেছে। তাই রামদাসের ভাষায় আজও বলা আবশ্যক—"শিবরাজাস্ আঠবাবেঁ"—

'শিবাজীকে স্মরণ রাখিবে'।

শ্রীযদুনাথ সরকার

শিবাজীর পর মারাঠা-ইতিহাসের ধারা *

আমি পূর্বের দিন দেখাইয়াছি যে গ্রাণ্ট ডফ্-রচিত এবং এতকাল সর্বত্র গৃহীত শিবাজীর ইতিহাস-কাহিনীতে গত ১৯ বৎসরে আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। তাঁহার দুই পুত্র—শম্ভূজী ও রাজারামের ইতিহাসেও, আধুনিক গবেষণার ফলে ঠিক সেই পরিমাণে অতি মূল্যবান সংশোধন আমরা এখন করিতে পারিয়াছি। আমাদের প্রাপ্ত, কিন্তু ডফের অজ্ঞাত অথবা যৎসামান্য ব্যবহৃত, উপাদানগুলি এই :—

(১) শম্ভূজী কর্তৃক সাষ্টি (Salsette) আক্রমণের পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত অতি দীর্ঘ বিবরণ ; ইহার একটা ইংরাজী অনুবাদও লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে আছে।

(২) আওরংজীবের পুত্র কুমার আকবর বিদ্রোহী ও পলাতক হইয়া মারাঠা রাজার আশ্রয়ে থাকিবার সময় তাঁহার লিখিত ফার্সী পত্রগুলি (লণ্ডনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ের হস্তলিপি)।

(৩) এই আকবর ও গোয়ার কর্মচারীদের মধ্যে যে পত্রের আদানপ্রদান হয় তাহা এবং পোর্তুগীজ সরকারী দলিলাদি খুঁজিয়া বাহির করিয়া গোয়া-নিবাসী গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণ পাণ্ডুরঙ্গ পিস্থর্লেঁকর অল্পদিন হইল ছাপাইয়াছেন।

(৪) পণ্ডিচেরীর প্রতিষ্ঠাতা ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁর দিনলিপি ; ইহাতে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মান্দ্রাজ কর্ণাটকের বিস্তৃত সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায়। তিনটি বৃহৎ ভলুমে অল্পদিন হইল ইহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৫) ঐতিহাসিক অর্মের নকল করা কতকগুলি খাতা। ইহাতে ইংরাজকুঠীর যে সকল কাগজ নকল করা হয় তাহার আসলগুলি অনেকস্থলে এখন লোপ পাইয়াছে। এই কাগজগুলি হইতে শম্ভূজীর রাজত্বের প্রথম দুই বৎসরের বিশুদ্ধ ও বিস্তৃত বিবরণ এখন রচনা করা যায়। গ্রাণ্ট ডফ্ যে চিটনিস বখরের উপর অন্ধভাবে নির্ভর করিয়া এই দুই রাজার ইতিহাস লেখেন, তাহা অতি আধুনিক এবং প্রবাদমূলক, ১৮০৯ সালে রচিত। উপরের বর্ণিত উপকরণ হইতে ডফ এবং চিটনিসের অসংখ্য ভুল ঘটনা ও তারিখ সংশোধন করিয়া ঐ সময়কার বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস গঠন করা এখন সম্ভব হইয়াছে। এই সংশোধনের ফল আমার ইংরাজী আওরংজীব গ্রন্থের চতুর্থ ভলুমে (দ্বিতীয় সংস্করণে) পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি।

(৬) আওরংজীবের যুগের সমসাময়িক ফার্সী হস্তলিখিত ইতিহাস ও পত্রাবলীর সাহায্যে রাজারামের বিশুদ্ধ ও বিস্তৃত ইতিহাস আমার আওরংজীব-গ্রন্থের পঞ্চম ভলুমে দিয়াছি। এই সব মালমসলা গ্রাণ্ট ডফের অজ্ঞাত ছিল, এবং এগুলির ব্যবহারের ফলে ১৬৮০ হইতে ১৭০০ এই বিশ বৎসরের মারাঠা ইতিহাস এক নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছে।

তাহার পর, অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৌঁছিয়া, মারাঠা ইতিহাসের অতি বহুল সংখ্যক এবং অমূল্য প্রাথমিক উপাদান আমরা গত ৩০।৩৫ বৎসরের মধ্যে পাইয়াছি ; ইহার সবই গ্রাণ্ট ডফের পরে আবিষ্কৃত। এগুলি মারাঠী সরকারী চিঠি, অথবা দূত ও সেনাপতিদের রিপোর্ট এবং নিজস্ব পত্র। দাক্ষিণাত্যের আজন্ম ইতিহাস-সেবক রাজবাড়ে, সানে, পারসনিস, খরে, সরদেশাই প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীর উপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রায় এক শত ভলুম ছাপিয়াছেন। তাহার পর, বম্বে গভর্ণমেণ্ট নিজহস্তে স্থিত পেশোয়া-দপ্তরের সব কাগজপত্র খুঁজিয়া বাছিয়া ৪৫ ভলুম ঐতিহাসিক পত্র ও হিসাব, সরদেশাই মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত করিয়াছেন। এ সব উপকরণ মারাঠী ভাষায় লিখিত। এ ভিন্ন অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের অনেক অপ্রকাশিত ফারসী ইতিহাস এখন আমাদের হাতে আসায়, উত্তর-ভারত ও রাজপুতানায় মারাঠা জাতির ক্রিয়াকলাপ এবং পাণিপথের শেষ যুদ্ধের বিষয়ে অনেক অমূল্য সমসাময়িক বিবরণ নূতন জানা গিয়াছে এবং সেই যুগের ইতিহাস পূর্ণতর হইয়াছে।

অনেকেই জানিতে চান যে, এই পেশোয়া-দপ্তরের মত সমুদ্র মন্থন করিয়া, সাতাইশ হাজার বাণ্ডিলের প্রায় তিন কোটি কাগজখণ্ড ঘাঁটিয়া যে ৪৫ ভলুম-ব্যাপী চিঠিপত্র ছাপান হইল, তাহাতে মারাঠা ইতিহাসের নূতন কি কি তথ্য পাওয়া গেল। এই প্রশ্নের উত্তর অল্প কথায় দেওয়া কঠিন ; ভারত ইতিহাসের এই শাখা যাঁহারা বিশেষ ভাবে চর্চা করিয়াছেন, তাঁহাদের কতকটা বুঝান যায়। আমি সংক্ষেপে ইহার আভাস দিতেছি :—

পেশোয়া-দপ্তরে এবং সেখানে আনীত সাতারা-রাজাদের কাগজপত্র হইতে শিবাজী বা তাঁহার দুই পুত্রের সময়কার কোন ঐতিহাসিক দলিল পাওয়া যায় নাই ; দু চারিটা হুকুম বা স্থানীয় বিচারের রায় (মহজর-নামা) মাত্র মিলিয়াছে। সুতরাং ঐ দপ্তর পরীক্ষা আরম্ভ করিবার সময় যে একটি বড় আশা সকলের মনে জাগিয়াছিল, তাহা বিফল হইয়াছে। কিন্তু এই সব কাগজ হইতে পেশোয়া-যুগের অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, মারাঠা ইতিহাস পূর্ণ ও নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

প্রথম পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ ভট্ট এতদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ছায়ার মত অস্পষ্ট ছিলেন ; তাঁহার কার্যকলাপ, ক্রমোন্নতি এবং রাজার মনের উপর প্রভাব-বিস্তারের কাহিনী আমাদের ভাল জানা ছিল না। এসব কথা আমরা পেশোয়াদপ্তরের কাগজ হইতে সদ্য জানিতে পারিয়াছি। আরও জানিয়াছি যে, বালাজী প্রথমে নগণ্য লোক ছিলেন না, তাঁহার অভ্যুদয় যে সালে আরম্ভ হয় বলিয়া এতদিন লোকের বিশ্বাস ছিল, তাহার অনেক বৎসর আগেই তিনি স্বদেশের রাজকার্যে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন—সেনাকর্তা, জেলাশাসক প্রভৃতির কর্ম করিতেছিলেন। ক্রমে আরও বড় হইয়া, অবশেষে প্রধান মন্ত্রী মুখ্যপ্রধান-এর পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার প্রতি অন্য মন্ত্রীদের বা সর্দারগণের ঈর্ষ্যা ও বাধা দিবার চেষ্টা এই নূতন কাগজ হইতে বেশ পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাহার পর, দ্বিতীয় পেশোয়া বাজী রাও-এর উত্তর-ভারতে অভিযান, মালব-বিজয়, দিল্লীর দ্বার পর্যন্ত লুঠ, ভূপালের নিকট নিজামকে পরাজয় প্রভৃতি ঘটনাগুলি, যাহা

এতদিন সংক্ষেপে জানা ছিল তাহার সম্বন্ধে অতিবিস্তৃত, দিনের পর দিন তারিখযুক্ত কাহিনী এই দপ্তর হইতে উদ্ধার হইয়াছে ও তাহার সাহায্যে এতদিনকার প্রচলিত ভুল কথা ও মিথ্যা তারিখ এখন সংশোধন করা যায়।

এই ৪৫ ভলুম মারাঠী উপকরণ বিশেষভাবে পড়িয়া বুঝিয়াছি যে, এই পেশোয়াদের দপ্তর মারাঠা ইতিহাসের উপর যেমন নূতন আলোক পাত করে, দিল্লী সাম্রাজ্যের এবং নিজামের ইতিহাসের জন্যও তাহা অপেক্ষা কম মূল্যবান্ নূতন সংবাদ দেয় না। ফলতঃ হায়দরাবাদের নিজামদের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক পরিমাণের আদিম ঐতিহাসিক উপকরণ এই মারাঠী ভাষায় লিখিত কাগজগুলিতে আছে—এত ফারসী ভাষায়ও নাই, নিজামের দপ্তরখানাতেও নাই। ১৭২৭ হইতে ১৭৬৯ পর্যন্ত বারম্বার নিজাম-পেশোয়া সংঘর্ষ, যুদ্ধ ও সন্ধির, অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এই মারাঠী কাগজ হইতেই রচনা করা সম্ভব।

সেই মত মান্দ্রাজ কর্ণাটকে মারাঠাদের অভিযান,—যাহাতে ক্লাইভের অভ্যুদয় হইল, এবং যাহার এক তরফা অর্থাৎ ইংরাজপক্ষের উক্তি-মাত্র আমরা এতদিন জানিতাম,—তাহার সম্বন্ধে মারাঠা পক্ষের সাক্ষ্য এবং নূতন তথ্য এই দপ্তরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে পোর্তুগীজ-পেশোয়া সংঘর্ষগুলিরও সেই মত মৌলিক বিস্তৃত মারাঠী চিঠিপত্র পাইয়া আজ আমরা এতদিন পর্যন্ত জ্ঞাত পোর্তুগীজ ভাষায় লেখা ইতিহাসের ফাঁকগুলি পূরাইতে, ভুলগুলি সংশোধন করিতে পারিতেছি।

মারাঠা ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী চিত্তাকর্ষক বিষয় হইতেছে ১৭৬১ সালের জানুয়ারি মাসে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ এবং তাহার পূর্ববর্ত্তী উত্তর ভারতীয় অভিযানগুলি। মারাঠী ভাষার কাগজপত্রে ঐ যুদ্ধ সম্বন্ধে অতি যৎসামান্য নূতন খবর অধুনা পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু ১৭৫৪ হইতে ১৭৬০ সালের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ ঐ মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত, মারাঠা সৈন্যদের গতিবিধি, নেতাদের মন্ত্রণা ও নীতি পরিবর্তন, অপরাপর শক্তিগুলির সহিত সন্ধি বিগ্রহ, দেশের দশা প্রভৃতি বিষয়ে অতি বিস্ময়জনক বিপুল নূতন খবর,—সবই সমসাময়িক ও লিখিত—আজ আমাদের হাতে আসিয়াছে। এই কাজ আরম্ভ করেন বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ে, কয়েকটি মারাঠা ঐতিহাসিক পরিবারের দপ্তর মধ্যে আবিষ্কৃত কাগজপত্র ১৮৯৮ সালে প্রথমখণ্ডে এবং ১৯০৭ সালে ষষ্ঠখণ্ডে ছাপিয়া। গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই নিজের সম্পাদিত "পেশোয়ার দপ্তর হইতে বাছা কাগজপত্র" ৪৫ ভলুমে এই কাজ সম্পূর্ণ বিস্তৃত এবং সরকারী দলিলের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ বাঙ্গলায় বর্গীর হাঙ্গামার পশ্চাতে মারাঠারাজদরবারের নীতি এবং এই সব অভিযানের ইতিহাস শুধু এই কাগজ হইতেই নূতন করিয়া লেখা সম্ভব।

তারাবাই ও আনন্দীবাই, অর্থাৎ ছত্রপতি রাজারাম এবং পেশোয়া রঘুনাথরাও দাদা, এই দুজনের স্ত্রী—অতি তুখোড় ফন্দিবাজ জঙ্গী নারী ছিলেন। তাঁহাদের অনেক বর্ষব্যাপী চিঠিপত্র আবিষ্কার হওয়ায় তাঁহাদের চরিত্র এবং সেই সেই যুগে রাজনৈতিক ঘটনার ভিতরে

কয়েকটি ভলুমে পেশোয়াদের পারিবারিক জীবনের এবং সেকালকার সমাজের অতি উজ্জ্বল চিত্র পাইতেছি; ইহাও নূতন। সর্বশেষে, অনেকগুলি বিখ্যাত মারাঠা সরদার-বংশের প্রতিষ্ঠাতাদের বা প্রথম ২।৩ পুরুষের আদ্যন্ত বিবরণ এই দপ্তর হইতে সংকলন করিয়া প্রচলিত প্রবাদগুলি খণ্ডন করা গিয়াছে।

সুতরাং সকলে দেখিবেন যে, এই নূতন আবিষ্কৃত উপকরণগুলি কত মূল্যবান্, কত বিচিত্র, কত মনোরম। অন্য কোন প্রদেশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বর্ত্তমান কালে এমন সৌভাগ্যজনক আবিষ্কার ঘটে নাই, ঘটিবার আশাও নাই।

এই ত গেল মারাঠা ইতিহাসের নূতন মালমসলা। এখন শিবাজীর পর মারাঠা রাষ্ট্রের ঘটনাস্রোত পর্যবেক্ষণ করা যাউক। আমি ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ দিয়া বা স্কুলপাঠ্য পুস্তকের মত ইতিহাসের কঙ্কাল এখানে খাড়া করিয়া, আপনাদের বিরক্ত করিব না। আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিব, এই শিবাজীর পরবর্তী ১৩৭ বৎসর ধরিয়া স্বাধীন মারাঠা রাজ্যে ও রাজনীতিতে কি কি বড় পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, কোন্ কোন্ প্রভাবে ঘটনাগুলি সেই আকার ধারণ করিল, এবং জননেতাদের কি কি দোষগুণে মারাঠাদের রাষ্ট্রীয় উন্নতি বা পতন হইল।

শিবাজীর মৃত্যুর বিশ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল; দাক্ষিণাত্যে মুঘল বাদশাহ নামে চক্রবর্তী সম্রাট্ হইলেন। মারাঠা রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয় বন্দী, না হয় পলাতক ক্ষুদ্র জমিদারের মত কাল কাটাইতে লাগিলেন। শিবাজীর দুই পুত্র, শম্ভুজী ও রাজারাম, ক্রমান্বয়ে সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য চালাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজারামের মৃত্যুর পর (১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে) মারাঠা ইতিহাসের শিব-পশ্চাৎ যুগের প্রথম অংশ, অর্থাৎ রাজাদের কাল, শেষ হইল, এবং সাত বৎসর ধরিয়া (১৭০০-১৭০৭, আওরংজীবের মৃত্যু পর্যন্ত) অরাজকতায় কাটিল। কারণ, শম্ভুজীর পুত্র শাহু তখন মুঘল শিবিরে বন্দী, কোলাপুরে তারাবাই নিজ পুত্রকে রাজা বলিতেন, কিন্তু বেশী লোক তাহাকে স্বীকার করিত না; কেন্দ্রীয় রাজশক্তি দেশ হইতে নির্বাসিত, এই হইল সেই দেশের দশা। সত্য বটে, আওরংজীবের মৃত্যুর চারি মাস পরে শাহু খালাস পাইয়া নিজ দেশে ফিরিলেন এবং পিতা-পিতামহের রাজ্য দখল করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহার পর পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে ক্রমাগত অবাধ্য সামন্তগণ এবং ভাগী অংশীদার (পিতৃব্যপুত্র, কোলাপুরের রাজা)-র সহিত যুদ্ধ করিতে হইল।

অবশেষে ১৭১৩ সালে শাহু রাজা হইয়া বসিলেন (সাতারার ছত্রপতি বংশ)। কিন্তু এখন হইতে পেশোয়াদের যুগ আরম্ভ হইল; কারণ, তাঁহার সিংহাসনের স্তম্ভ হইলেন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বা পেশোয়া। ছত্রপতি শাহু এই বিশ্বাসী এবং কার্যদক্ষ মন্ত্রীর হাতে সব শাসন কাজ ছাড়িয়া দিয়া, নিজে শুধু উপরে উপরে তত্ত্বাবধান এবং প্রধানদের মধ্যে ঝগড়া মিটান লইয়া ব্যস্ত থাকিলেন।

মারাঠা ইতিহাসে পেশোয়া-যুগ অতি পরিষ্কার দুই ভাগে বিভক্ত; এই বিভাগের

বাজী রাওএর মৃত্যু এবং তাঁহার নাবালক পুত্র মাধব রাওএর সিংহাসন-প্রাপ্তি। এই দুটি কাল-বিভাগের মধ্যে ঘটনাস্রোতে, নেতা-চরিত্রে এবং রাষ্ট্রনীতিতে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

একটা প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, এই সব পেশোয়ারা স্বার্থপর প্রভুদ্রোহী চাকর ছিল। কিন্তু এটা ভয়ানক ভুল। কারণ, বন্ধুবান্ধবহীন নবাগত শাহুকে সিংহাসনে স্থিরভাবে বসাইলেন, এবং এইরূপে নবজীবনপ্রাপ্ত মারাঠা রাজশক্তিকে স্থায়ী এবং ভারতব্যাপী করিলেন পেশোয়ারা; এ কাজ শাহু করিতে পারিতেন না; আর পেশোয়ারা না উঠিলে মারাঠাজাতি কখনই গুজরাত মালব কর্ণাটক জয়, এবং দিল্লী পঞ্জাব বাঙ্গালা পর্যন্ত লুট করিতে পারিত না। কোলাপুরের রাজবংশের মত আর একটি স্থানীয় জমিদার সাতারায় স্থাপিত হইত মাত্র, এবং তাঁহার পক্ষে ছত্রপতি উপাধি হাসির বিষয় হইত।

প্রথম পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ ভট্ট কোন্ কোন্ বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজ প্রভুকে দেশের রাজা বলিয়া সকলের দ্বারা গৃহীত করিতে এবং স্থায়িভাবে সিংহাসনে বসাইতে আর কোলাপুরের রাজশাখাকে নীচে ঠেলিয়া দিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার চরিত্রের গুণগুলি কত বিচিত্র এবং সাতারার রাজবংশের তিনি যে কত বেশী উপকারক ছিলেন, তাহা বুঝা যায়। ১৭০৭-১৭১২ সালে ঐ দেশ অরাজকতায় পূর্ণ, প্রত্যেক লোকই স্ব স্ব প্রধান, কেহ কোন রাজাকে মানিতে বা কর দিতে অথবা স্বদেশের কাজে অন্যের সহিত মিলিতে সম্মত নহে। মুঘল-কারাগার হইতে প্রত্যাগত শাহুর না ছিল অর্থ, না ছিল লোকবল। তাহার উপর, তারাবাইএর নানাপ্রকার চক্রান্ত ও আক্রমণ-চেষ্টা। রাজার জমি সব নানা সামন্ত, পূর্বকর্মচারীদের পুত্রগণ, অথবা জবরদস্ত স্বার্থপর নূতন লোকে দখল করিয়া বসিয়াছে।

ইহা ভিন্ন, শাহুর পক্ষের অন্যান্য কর্মচারিগণ, বিশেষতঃ অষ্ট প্রধানদের অপর সাত জন, পেশোয়ার প্রতিদ্বন্দী, তাঁহার প্রাধান্য মানিতে অসম্মত, সব কাজে তাঁহাকে অপদস্থ ও নিষ্ফল করিতে ব্যগ্র। মারাঠা রাজ্যের সেনাপতি-উপাধিধারী "প্রধান" মারাঠা জাতের, তিনি ব্রাহ্মণ পেশোয়ার উপর হাড়ে হাড়ে চটা, এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে পর্যন্ত অগ্রসর। এইরূপ রাজসভায় বালাজী বিশ্বনাথ যে নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিলেন, ইহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। তাঁহারই চেষ্টায় দিল্লীর বাদশাহ ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে সনদ দিয়া শাহুকে শিবাজীর ন্যায্য উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের চৌথ ও সর্-দেশ-মুখীর অধিকার দান করেন। শাহুর অধীনে প্রথম প্রথম কোন বড় সেনাপতি ছিল না। বালাজীর পুত্র বাজী রাও (১৭২০-১৭৪০ পর্যন্ত পেশোয়া) এই অভাব পূর্ণ করিলেন। বাজী রাওএর অদ্ভুত সামরিক দক্ষতা এবং আজন্ম নেতৃত্বশক্তির ফলে মারাঠাদের রাজা এই ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে প্রকৃতই ছত্রপতি হইলেন, মুঘল সাম্রাজ্য অন্ধকার করিয়া নানা প্রদেশে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন; আটক হইতে কুমারিকা পর্যন্ত লোকে মারাঠা নামে কাঁপিতে লাগিল। এরূপ কার্য শিবাজীও করিতে পারেন নাই। ইহাই পেশোয়াদের স্মৃতিস্তম্ভ।

বাজী রাও ঘরের পাশে নিজামের সঙ্গে প্রথমে যুদ্ধ ও পরে সন্ধি করিয়া, অদম্য তেজে উত্তর-ভারত ও পোর্তুগীজ রাজ্য আক্রমণ করিলেন; রাজপুতানায় কর আদায়, মালব অধিকার, গুজরাত লুণ্ঠন (এবং তাঁহার পুত্রের সময় সম্পূর্ণ দখল) এবং বুন্দেলখণ্ডে ভাগ বসান প্রভৃতি তাঁহার সফলতার চিহ্ন। মারাঠাদের এই রাষ্ট্রীয় বিস্তার তৃতীয় পেশোয়া বালাজী বাজী রাওএর সময়ে (১৭৪০-১৭৬১) চরমে পৌঁছে, এবং সেই সময়ই তাহার অবনতি আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ রাষ্ট্রের প্রধান নেতা শুধু যুদ্ধবিগ্রহে সর্বদা মন দেওয়ায় শাসন কার্যে অবহেলা হইতে লাগিল; প্রজাদের অবস্থা বড় খারাপ হইয়া দাঁড়াইল; অবিচার, ঘুষ লওয়া, জনহিতকর কার্যে অবজ্ঞা, দেশের দৈন্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। পেশোয়াদের দেনা এত বেশী হইয়া উঠিল যে, উত্তর-ভারত লুঠ করা ভিন্ন তাহা শোধ দিবার কোন পথ দেখা গেল না; অথচ উত্তর-ভারতে বৃহৎ অভিযান পাঠাইলে তাহার খরচেই সব আদায় করা কর এবং লুঠ করা ধন খাইয়া ফেলিত। এইরূপে যখন বাহ্যত মারাঠা শক্তি মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত সকলের মাথার উপর তাপ দিতেছিল, তখনই মারাঠা স্বরাজ প্রকৃতপক্ষে অন্তঃসারশূন্য হইয়া জাতীয় ক্ষয়রোগের মৃত্যুবীজ নিজ দেহে পোষণ করিতে লাগিল। পাণিপথে পরাজয় এবং সেখানে যত বড় মারাঠা সরদার এবং অক্ষৌহিণী সৈন্যের মৃত্যু ইহার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

তদপেক্ষা অধিকতর ভীষণ ধ্বংসের কারণ হইল পেশোয়া রাজবংশে এবং কর্মচারি-মণ্ডলে নৈতিক অবনতি এবং অন্তঃকলহ। তরুণ পেশোয়া মাধব রাও বল্লালের পিতৃব্য রঘুনাথ রাও জঘন্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের সর্বপ্রকার অনিষ্টই করিলেন, জাতীয় সকল শত্রু (নিজাম, ইংরাজ প্রভৃতির) সহিত বারম্বার যোগ দিলেন। মাধব রাওএর অকালমৃত্যু (১৭৭২) এবং নারায়ণ রাওএর খুন (১৭৭৩) এত কাছাকাছি ঘটিয়া মারাঠা-রাজকে একেবারে বজ্রাহত করিল। সেই সুযোগে ইংরাজেরা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ব্যক্তি অপেক্ষা জাতি বা জনসমষ্টি অনেক শ্রেষ্ঠ; মারাঠাদের মধ্যে এই সজ্যপ্রাণ, জাতীয় শক্তি এত অধিক ছিল যে, "বারা ভাই" জুটিয়া এই মহাবিপদের মধ্য হইতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে বাঁচাইলেন; কুলাঙ্গার রঘুনাথকে পরাজিত করিয়া মাধব রাও নারায়ণের সিংহাসন বজায় রাখিলেন। এই আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের সময় নানা ফড়্‌নবিস্ দেশের শাসনক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ নিজগুণে অধিকার করিলেন, অর্থাৎ নাবালক পেশোয়ার রক্ষাকর্তা এবং পরে "পেশোয়ার পেশোয়া" হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাঁহার রক্ষণ অপেক্ষা গঠনের শক্তি অনেক কম ছিল, ভবিষ্যদ্দৃষ্টি একেবারেই ছিল না; নানা মতের, নানা শ্রেণীর লোকদের মিলাইয়া মিশাইয়া আপোষে সমবেত চেষ্টায় দেশের জন্য বড় বড় কাজ করিবার যে আশ্চর্য শক্তি ইংরাজ জাতির আছে, নানা ফড়্‌নবিসের চরিত্রে তাহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল, তাঁহার কল্পনারও অতীত ছিল। তিনি সব কাজ নিজে করিতে চাহিতেন, সর্বত্রই স্বয়ং প্রভু, একমেবা-দ্বিতীয়ং হইতে চেষ্টা করিতেন।

এদিকে, এই শেষ যুগে মারাঠা শক্তির প্রকৃত কেন্দ্র পূণা হইতে উত্তর-ভারতে সরিয়া আসিল, সিন্ধিয়া মালব, দিল্লী এবং রাজপুতানায় প্রভু হইয়া দাঁড়াইলেন, অথচ নানা ফড়্‌নবিস্

অতি প্রবল হইয়া উঠায়, পূণার মারাঠারাজ ভীত, অনেকটা হতবীর্য হইয়া ইংরাজদের সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন; অথচ কর্ণওয়ালিসের সময়ে অকপটভাবে ইংরাজের সহায়তা করিয়া টীপুকে নাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন। অতি-চালাক লোক নিজ চালাকির ফাঁদে পড়িয়া অবশেষে নিজেই মারা যায়। নানা ফড়্নবিসের বিফলতা এই সত্যই প্রমাণ করিতেছে।

তাঁহার মন্ত্রিত্বের শেষে পেশোয়ার অপঘাত মৃত্যু (কেহ বলে আত্মহত্যা), নচ্ছার রঘুনাথের ততোধিক অসার পুত্র দ্বিতীয় বাজী রাওএর সিংহাসন প্রাপ্তি, সিন্ধিয়া-হোলকারের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, এবং অবশেষে ইংরাজের দাসত্ব (১৮০২) এবং ইংরাজ কর্তৃক পেশোয়ারাজ্য জয় করা (১৮১৮) এ সব ঘটনা সকলেরই জানা ইতিহাস। এই সর্বশেষের ১৫ বৎসর (১৮০৩-১৮১৭) ধরিয়া মারাঠা ইতিহাস, পেশোয়ার পক্ষে তীব্র বিষসম এবং আমাদের পক্ষে অসীম লজ্জার ও শোকের বিষয়।

শ্রীযদুনাথ সরকার

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস

খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি

সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে অন্য একটি বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমি শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে প্রকাশিত একখানি মাসিক পত্রের সন্ধান পাইয়াছি। ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা সঙ্গত মনে করি, কারণ এ-যাবৎ যাঁহারা বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের কেহই এই মাসিক পত্রের অস্তিত্বের কথা অবগত ছিলেন না; এমন কি অল্পদিন পূর্ব্বে যখন আমি 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড (১৮১৮-১৮৩৯ সন পর্যন্ত), প্রকাশ করি তখনও আলোচ্য পত্রিকাখানির কথা আমার নিকট অজ্ঞাত ছিল।

পত্রিকাখানির নাম "খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি"। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮২২ সনের মে মাসে। এই "মাসিক সমাচার পত্র" শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইত; প্রত্যেক সংখ্যার শেষে লেখা থাকিত :—

> "এই সমাচারপত্র প্রতিমাসে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে প্রকাশিত হইবে ইহার মূল্য প্রতি কাগজ এক আনা লাগিবেক।"

খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারের সহায়তাকল্পে পত্রিকাখানির সৃষ্টি হয়। প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভেই নিম্নাংশ মুদ্রিত হইয়াছে :—

> "সকলকে জানান যাইতেছে এই পত্র প্রতিমাসে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা করিবার বাসনা আছে অতএব যে কোন খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীর কোন সমাচার প্রকাশের আবশ্যকতা বোঝেন তাহা এখানে পাঠাইলে এই পত্রে ছাপান যাইবেক।"

ইহার পর খ্রীষ্টিয়ানদের উদ্দেশ করিয়া লেখা একটি দীর্ঘ প্রস্তাব মুদ্রিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট জানা যাইবে :—

> "অন্য২ দেশে খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা কিরূপ পাপিরদিগের পরিত্রাণার্থে প্রার্থনা করে ও মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে ও লোকেরদিগকে শিক্ষা করিতে কিরূপ পরিশ্রম করে ও অন্য লোকদ্বারা মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে আপনারা কত টাকা ব্যয় করে ও ঈশ্বর তাহারদিগের প্রার্থনা কিরূপ শ্রবণ করেন ও তাহারদের ক্রিয়ার ফল দেন। এই সকল তোমারদিগকে জ্ঞাত করার কারণ মাসে২ এই মত পুস্তক ছাপা হইবে। তাহাতে নানাদেশীয় ভাল সমাচার দেওয়া যাইবেক এই পুস্তক বিষয়েতে যে লাভ হইবে তাহা ভাল২ পুস্তক ছাপাইয়া ধর্ম্মজ্ঞানার্থে হিন্দুরদিগকে দিতে এবং তাহারদিগকে পরিত্রাণের পথ শিক্ষা করাইতে ব্যয় করা যাইবেক। আমরা এই ভরোসা করি যে তোমরা এ বিষয়ে আমারদিগের সহায়তা করিবা ও মাস২ কিছু২ করিয়া দিবা ও প্রভু যিশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করণার্থে বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে এক দল কর। যখন শ্রীযুত মেস্তর ম্যাক সাহেব ইঙ্গণ্ড ছাড়িলেন তখন কতক গরিব চাকরেরা একত্র হইয়া বাঙ্গালি কোন কেতাব ছাপাইয়া বাঙ্গালি লোককে দিতে ৫ টাকা দিল তাহারা বাঙ্গালি লোকেরদিগকে প্রেম বোধ করিয়া টাকা দিল এই পাঁচ টাকার দ্বারা আমরা এক পুস্তক আরম্ভ করিব এবং এই ভরোসা করি যে তোমরা ক্রমে২ ইহা বৃদ্ধি

"খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি" পত্রিকাখানির প্রত্যেক সংখ্যায় ৮ পৃষ্ঠা পরিমাণ খ্রীষ্টধর্ম্মের কথা থাকিত। খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব বিষয়ে ইহা দ্বিতীয় মাসিক পত্র ; এ-বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম মাসিক পত্র 'গস্‌পেল মাগাজীন' ১৮১৯ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

'খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' পত্রিকার ফাইল।—

এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা :—১ খণ্ড। ১ সংখ্যা। মে, ১৮২২।
১ খণ্ড। ১০ সংখ্যা। ফেব্রুয়ারি, ১৮২৩।
১ খণ্ড। ১৪ সংখ্যা। জুন, ১৮২৩।
২ খণ্ড। ১ সংখ্যা। জানুয়ারি, ১৮২৪।

'বঙ্গদূত' প্রকাশের তারিখ

'বঙ্গদূত' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮২৯ সনের ৯ই মে, শনিবার, তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। এত দিন ইহার প্রথম সংখ্যার তারিখ ভ্রমক্রমে "১০ই মে, রবিবার" বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

ইংরেজী, বাংলা, ফার্সী ও নাগরী—এই চারি ভাষায় 'বেঙ্গল হেরল্ড' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় প্রকাশ করিবার জন্য ৭ নং বাঁশতলা গলির সার্জন্ আর. মণ্টগোমারি মার্টিনকে ১৮২৯ সনের ৫ই মে তারিখে সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। 'বেঙ্গল হেরল্ড' কেবল ইংরেজীতেই প্রকাশিত হইত ; ইহার "সহচর" ছিল 'বঙ্গদূত'। 'বঙ্গদূতে'র প্রথম সংখ্যার তারিখ ৯ই মে ১৮২৯ (শনিবার)। 'বেঙ্গল হেরল্ড' পত্রের প্রথম সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় উহার অনুষ্ঠান-পত্র মুদ্রিত হইয়াছে ; তাহাতে 'বঙ্গদূত' সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাওয়া যায় :—

Prospectus of the *Bengal Herald* ... ...

A Native paper to be printed in the Bengalee, Persian and Nagree character, will be subjoined, but distinct, and under the Superintendance of the most talented Hindoos; translations from whose contributions will be occasionally made.

The English portion of the *Herald* will contain *Sixteen Pages*, royal quarto, and the *Native Eight*, which will admit of separate subscription, the former at the rate of *Two* rupees and the latter *One*, monthly.

To be Printed and Published every Saturday night, for the Proprietors,

R. M. Martin, Rammohun Roy,
Dwarkanath Tagore, Neel Rutton Holdar, and
Prussuna Comar Tagore, Rajkissen Sing.

জানা গেল, 'বঙ্গদূত' প্রতি শনিবার রাত্রে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যা যে ১৮২৯ সনের ৯ই মে, শনিবার, তারিখে প্রকাশিত হয় তাহার আর একটি প্রমাণ, তৃতীয় সংখ্যার তারিখ ১৮২৯, ২৩এ মে, শনিবার। এই সংখ্যাখানি কলিকাতার ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়ু চণ্ডীদাসের পদ

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। পদগুলির পাঠান্তর দেওয়ায় ,বিশেষজ্ঞদিগের নিকট পুস্তকখানি সমাদৃত হইবে। গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হইয়াছে,—"আমরা এ পর্য্যন্ত দুই জন চণ্ডীদাসের পরিচয় পাইয়াছি। একজন শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বড়ু চণ্ডীদাস, অন্য জন শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী দীন চণ্ডীদাস। একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলেই এই দুই জন কবির পদ পৃথক্ করা যায়। কিন্তু বড়ু ও দীন চণ্ডীদাস ভিন্ন, 'চণ্ডীদাস' এই নামের অন্তরালে যে অন্য কবিদের পদ চলিতেছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেগুলিকে চিনিয়া লওয়া একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভাব ও রূপের পরিবর্ত্তনে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, এমন পদেরও অভাব নাই। এই সমস্ত আলোচনাপূর্ব্বক আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের পদ যথাসম্ভব পৃথক্‌রূপে চিহ্নিত করিয়াছি। ভণিতা নাই, অথচ বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত হওয়া সম্ভব, এইরূপ কয়েকটী পদ বা পদাংশ ইহারই পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যে সমস্ত পদের রচয়িতার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, যেগুলি বড়ু 'চণ্ডীদাস অথবা দীন চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না, সেগুলি 'চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত' পর্য্যায়ে রক্ষা করিয়াছি, এবং তাহার পরিশিষ্টরূপে বিভিন্ন কবির ভণিতাযুক্ত পদগুলি সাজাইয়া দিয়াছি।" এই খণ্ডেই দীন চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলার কয়েকটী অপ্রকাশিতপূর্ব্ব পদ প্রকাশিত হইয়াছে।

চৈতন্যদেব যাঁহার পদাবলীর আস্বাদনে মাতোয়ারা হইতেন, তিনি বড়ু চণ্ডীদাস। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙ্গালার কাব্যকুঞ্জের আদি-পিক। তাঁহার রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বলিয়া কথিত শ্রীকৃষ্ণলীলার গানের খণ্ডিত পুথিখানি আমরা পাইয়াছি। তাহার অতিরিক্ত পদগুলির সন্ধানে সম্পাদকদ্বয় বিপুল পরিশ্রমে পদাবলী-সাহিত্য মথিত করিয়া মাত্র ২৪টী পদ উদ্ধার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে "দেখিলোঁ প্রথম নিশী" পদটী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও পাওয়া যায়। সম্পাদকদ্বয় বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে তাঁহার রচিত পদাবলীর পরীক্ষায় কষ্টিপাথররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমিও এই কষ্টিপাথরের পরখে তাঁহাদের উদ্ধৃত বড়ু-চণ্ডীদাসের পদগুলি টিকিতে পারে কি না, দেখিব। দুঃখের বিষয়, বিজ্ঞ যুগ্ম-সম্পাদক প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বড়ু চণ্ডীদাসের পদপরিচয়ের সূত্রগুলি আমাদিগকে বলেন নাই। কাজেই আমি নিজের গবেষণায় বড়ু চণ্ডীদাসের পদের বিশেষ লক্ষণ যাহা আবিষ্কার করিয়াছি, প্রথমে তাহাই বলিব।

সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান লক্ষণ ভণিতা। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে খণ্ডিত পদ-সমেত পদসংখ্যা

১। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—পদের সর্ব্বশেষে সাধারণতঃ দশ অক্ষর ছন্দ ও ত্রিপদীতে ... ৭৫
২। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ—পদের সর্ব্বশেষে পয়ারে ... ৫৭
৩। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে—পদের সর্ব্বশেষে পয়ারে ... ৪৯
৪। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে—পদের সর্ব্বশেষে পয়ারে ... ৪৯
৫। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস—পদের সর্ব্বশেষে পয়ারে ... ২৯
৬। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর—পদের সর্ব্বশেষে পয়ারে ... ২৭
৭। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—পদের সর্ব্বশেষে ত্রিপদীতে ... ২৪
৮। বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ—পদের সর্ব্বশেষে পয়ারে ... ১১
৯। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে—পদের সর্ব্বশেষে পয়ারে ... ১০
১০। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী—পদের সর্ব্বশেষে পয়ারে ... ৭
১১। —গাইল চণ্ডীদাসে—পদের সর্ব্বশেষ চরণে পয়ারের শেষাংশে ... ৪
১২। বড়ু চণ্ডীদাস গাএ—পদের সর্ব্বশেষে ... ৩
১৩। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ—লঘু ত্রিপদীর শেষে ... ৩
১৪। গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে—সর্ব্বশেষে ... ৩
১৫। বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস—পদের সর্ব্বশেষে একাবলীতে ... ২
১৬। বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে—পদের সর্ব্বশেষে ... ২
১৭। —গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলীচরণে—পদের সর্ব্বশেষে ত্রিপদীতে ... ২
১৮ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী আই (আয়ী)—পদের সর্ব্বশেষে ... ২
১৯। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস—পদের সর্ব্বশেষে ... ২
২০। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী—পদের সর্ব্বশেষে ... ২
২১। বাসলী বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—পদের সর্ব্বশেষে ... ২
২২। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ দেবী বাসলীচরণে—পদের সর্ব্বশেষে ... ২
২৩। —গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে বন্দিআঁ বাসলী চরণে—পদের সর্ব্বশেষে ... ২
২৪। বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে—পদের সর্ব্বশেষে ... ২
২৫। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—সর্ব্বশেষে ... ২

ইহার পর ৩৬টী ভণিতা কেবলমাত্র এক একবার পদের সর্ব্বশেষে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৬। অনন্ত নাম বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল দেবী বাসলীগণে।
২৭। মাথাএ বন্দিআঁ বাসলী পাএ। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥
২৮। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল দেবী বাসলী চরণে।
২৯। গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে দেবী বাসলীগণে।
৩০। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে।
৩১। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে।
৩২। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে।
৩৩। দেবী বাসলীচরণ করী শিরে বন্দন গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।
৩৪। তুতী কৈল চণ্ডীদাস গাএ।
৩৫। —বড়ু চণ্ডীদাস গাএ বন্দিআঁ বাসলীচরণে।
৩৬। বাসলী শিরে ধরি গাইল চণ্ডীদাসে।
৩৭। —বড়ু চণ্ডীদাসে গো গাইল বাসলী বরে।

৩৯। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস (কাহ্নাঞি ল) দেবী বাসলী বরে।
৪০। বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।
৪১। গাইল চণ্ডীদাস বাসলীগণ।
৪২। বাসলীবরেঁ চণ্ডীদাস গাএ।
৪৩। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।
৪৪। গাইল চণ্ডীদাস বাসলীচরণে।
৪৫। গাইল চণ্ডীদাস বাসলী আই।
৪৬। —গাইল চণ্ডীদাস দেবী বাসলীর বরে।
৪৭। বাসলীচরণ শিরে বন্দী রাধা ল বড়ু চণ্ডীদাস গাএ
৪৮। গাইল বাসলী বন্দিআঁ বড়ু চণ্ডীদাসে।
৪৯। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল বড়ু চণ্ডীদাস গাএ।
৫০। —গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে দেবী বাসলীর বরে।
৫১। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস সুন বড়ায়ি ল বাসলীগণে।
৫২। —বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ল পাআঁ দেবী বাসলীর বরে।
৫৩। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ ল দেবী বাসলীগণ।
৫৪। বন্দিআঁ দেবী বাসলী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।
৫৫। —গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী শিরে বন্দিআঁ।
৫৬। বাসলী বন্দিআঁ এ বড়ায়ি গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।
৫৭। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস এ॥
৫৮। গাইল চণ্ডীদাস বাসলীগতী।
৫৯। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥
৬০। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে ল।
৬১। বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস॥

এই সকল ভণিতা হইতে আমরা কয়েকটী সিদ্ধান্ত করিতে পারি,—(১) বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় কখন দ্বিজ বা কবি বা দীন উপাধি ব্যবহার করেন নাই। (২) বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় "কহে", "ভণে" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তিনি "গাইল", "গাএ" এই দুইটী ক্রিয়াপদ মাত্র ব্যবহার করিয়াছেন। (৩) তাঁহার ভণিতা পদের শেষ চরণে ব্যবহৃত; "চণ্ডীদাস গাএ শুন গোয়ালিনী কাহ্নাঞি করহ সার"—এইরূপ ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। (৪) কতকগুলি ভণিতা তাঁহার বিশেষ প্রিয়। পূর্ব্বোক্ত প্রথম ১০টী ভণিতায় ৪০৯এর মধ্যে ৩৩৮টী পদ সমাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশেষ লক্ষণ ভাব। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কয়েকটী বিশেষ বিষয় আছে, যাহা পরবর্ত্তী পদাবলী-সাহিত্যে অজ্ঞাত। (ক) রাধার পিতামাতার নাম সাগর গোয়ালা এবং পদুমিনী। (খ) রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী। (গ) রাধার পূর্ব্বরাগ নাই, বরং পরম বিরাগ আছে। (ঘ) রাধার কোন সখীর নাম নাই। (ঙ) কৃষ্ণের কোন সখার নাম নাই।

তৃতীয় বিশেষ লক্ষণ ভাষা। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রেম অর্থে সর্ব্বত্র নেহ, নেহা। এক

মোর বোল সুণ অবগাহী।
কাহ্নের পিরিতী কর রাহী॥
দেহ বাঁশী কাহ্নের হাথে।
তুষ্ট হউ দেব জগন্নাথে॥ (১ম সংস্করণ, ৩২৮ পৃঃ)

বিনোদিনী, শ্যাম (কৃষ্ণ), জনু (যেন) প্রভৃতি শব্দগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অজ্ঞাত।

চণ্ডীদাস-পদাবলী

এক্ষণে এই বিশেষ লক্ষণগুলির সাহায্যে বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া "চণ্ডীদাস-পদাবলী"তে উদ্ধৃত পদগুলির বিচার করিব।

১ম পদ।

ইহার ভণিতা—কহে বড়ু চণ্ডীদাসে, কুল শীল সব ভাসে,
লাগিল কালিয়া-প্রেম-মধু।

বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার সহিত মিল নাই। শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ বড়ু চণ্ডীদাসের ভাবের বিপরীত। "জনু" শব্দের প্রয়োগ পরবর্ত্তী বিকৃতি বলিলে চলিবে না। শ্যামবর্ণ দেবা-তনু উপমা নাহিক জনু—এখানে "জনু" স্থানে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের "জেন" বা "যেহ্ন" করিলে মিল থাকে না। অধিকন্তু প্রমাণ "বড়ু"র পাঠান্তর "এই" আছে।

২য় পদ।

ইহার ভণিতাসহ শেষ পদ—

ডাহুকি ডাকএ কোকিল কুহরে
চকর ছাড়এ নিশ্বাষ।
বাসুলি চরণ সিরেত বন্দিয়া
কহে বড়ু চণ্ডিদাস॥

ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ৭নং ভণিতার অনুরূপ। এই পদটী বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষায় এইরূপ হইবে—

ডাহুকী ডাকএ কোকিল কুহলে
চকোর ছাড়এ নিশাসে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দীআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

এই পদটী বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা-বিরহখণ্ডের অপ্রাপ্ত অংশে ছিল বলিয়া মনে হয়।

৩য় পদ।

ইহার আরম্ভ "দেখিলোঁ প্রথম নিশী"। ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের পদ। ইহাতে সম্পাদকদ্বয়, মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে "নেহানিলোঁ" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ভ্রান্ত পাঠ; প্রকৃত পাঠ "নেহালিলোঁ"। পুথিতে "ন" ও "ল" প্রায় একরূপ বলিয়া মুদ্রিত পুস্তকের কয়েক স্থলে এইরূপ গোলযোগ

৪র্থ পদ।

ইহার ভণিতা "বড়ু কহে বাসুলীচরণে"। বড়ু চণ্ডীদাসের কোন ভণিতায় কেবল বড়ু নাই। সুতরাং ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের পদ নহে।

৫ম পদ।

ভণিতা—"দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে শুনহ বচন।
দরশন দিয়া রাধা রাখহ জীবন॥"

এই ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। 'দ্বিজ' স্থানে 'বড়ু' বসাইলেও বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া বুঝা যাইবে। ইহার ভাবও বড়ু চণ্ডীদাসের ভাব-বিরুদ্ধ। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ কেবল কামজ্বালা, দৈহিক। এখানে বিরহ প্রেমের পূর্ণ অভিব্যক্তি, আধ্যাত্মিক। সুতরাং পদটী দ্বিজ চণ্ডীদাসের, বড়ু চণ্ডীদাসের নহে।

৬ষ্ঠ পদ।

সম্পাদকদ্বয় বলেন,—"পদটী নিঃসন্দেহভাবে বড়ু চণ্ডীদাসের"। ভাব নিঃসন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের অনুরূপ। কিন্তু ইহার ভণিতা—"বড়ু কহে বাসুলীর বরে। বাওন কি চাঁদ ধরে করে॥"—নিঃসন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। পদটী জাল। সম্পাদকদ্বয়ের ধৃত পাঠ "বাথানে কি ভেটে চন্দ্রাবলী" ভ্রান্ত। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের স্বীকৃত পাঠ "রাখালে কি ভজে চন্দ্রাবলী" প্রকৃত পাঠ।

৭ম পদ।

ভণিতা—"দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাহি সবে এক জন॥"

ইহা কিছুতেই বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা নহে। পদটী দ্বিজ চণ্ডীদাসের।

৮ম পদ।

ভণিতা পদের শেষ চরণে—"কানু পরশিলে যাএ কহে চণ্ডীদাসে।" "কহে চণ্ডীদাসে" স্থলে "গাইল চণ্ডীদাসে" পাঠ থাকিলে পদটী বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারিত; কিন্তু এরূপ পাঠ পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমান প্রমাণে ইহাকে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া স্বীকার করা যায় না, তবে মূলে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ হইলেও হইতে পারে।

৯ম পদ।

ভণিতা পদের শেষ চরণে—"কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে এথাই।" এইরূপ ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের হয় না। পাঠান্তরেও দেখিতেছি, "দ্বিজ" পাঠ আছে। সুতরাং ইহা দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদ।

১০ম পদ।

ভণিতা সর্ব্বশেষ চরণে—"কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে"। ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের "গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে" ভণিতার অনুরূপ। সম্ভবতঃ মূলে এই পাঠই ছিল।

১১শ পদ।

ইহার ভণিতা—"চণ্ডীদাস কহে দৈবগতি নাহি জান।
পিরীতি-অমিয়া-রসে বধএ পরাণ॥"

ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। ইহাতে 'প্রেম' অর্থে 'পিরীতি' শব্দের প্রয়োগও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে।

১২শ পদ।

ভণিতা ত্রিপদীর উপান্ত্য চরণে—

বড়ু চণ্ডীদাসে কয় প্রেম কি অনল হয়
সুধুই যে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ এমতি দারুণ লেহ
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥"

এইরূপ ভণিতা কস্মিন্ কালে বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। অধিকন্তু প্রমাণ এই যে, "বড়ু চণ্ডীদাসে কয়" ইহার পাঠান্তর "চণ্ডীদাসেতে কয়"।

১৩শ পদ।

ইহার ভণিতা পয়ারে পদের শেষ চরণে—

"সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে"।—ইহা দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদ।

১৪শ পদ।

ইহার আরম্ভ—"হাহা প্রাণ-প্রিয় সখি কি না হৈল মোরে"।

সম্পাদকদ্বয় বলেন,—"এই সুন্দর পদটী অবিসংবাদিতভাবে বড়ু চণ্ডীদাসের। কারণ, ইহার প্রথম চারিটী ছত্র শ্রীচৈতন্যদেবের সমক্ষে গীত হইয়াছিল বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে।" ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বহু পূর্ব্বেই দেখাইয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সাক্ষ্য অকাট্য নহে। (পদকল্পতরুর ভূমিকা, পৃঃ ৯৬-১০১)। তর্কস্থলে যদিও ইহা স্বীকার করা যায় যে, চৈতন্যদেবের সমক্ষে ইহার চারি পংক্তি গীত হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ত কোথায়ও বলেন নাই যে, ইহা চণ্ডীদাসের পদ। তাহার জন্য একমাত্র দলিল প্রমাণ—১১১১ সালের লিখিত একটি পাতড়া, যাহাতে সমস্ত পদটী উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ তাহার ভণিতা পয়ারের শেষ চরণে—

"চণ্ডীদাস কহে ধনি এমতি না বল"—কখনই বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তাহার ভাষা "হেদে রে", "অবলা" "কালা" (= কৃষ্ণ) বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। সুতরাং আমরা অবিসংবাদিতরূপে বলিতে পারি, পদটী বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। প্রথম চারি লাইন যদি বড়ু চণ্ডীদাসের হয়, তাহারও কোন প্রমাণ নাই।

১৫শ পদ।

ইহার ভণিতা পয়ারের শেষ চরণে—"চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া।" ইহা

"পিরীতি" চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। আগি শব্দের পরিবর্ত্তে বড়ু চণ্ডীদাসের "আগুন" কিংবা "আগুনি" বসাইলে মিল ও ছন্দ থাকে না।

১৬শ পদ।

ইহার ভণিতা পদের শেষ চরণে পয়ারে—"বাসুলী আগেতে করি কহে চণ্ডীদাসে।"—ইহা ভ্রান্ত পাঠ। প্রকৃত পাঠ "বাসুলী আদেশে কহে কবি চণ্ডীদাসে" হইবে। নীলরতন বাবুর সংগ্রহে ইহার ভণিতা—"বাসুলী আদেশে কহে কবি দ্বিজ চণ্ডীদাসে।" যাহা হউক, ইহার কোনটীই বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। বড়ু চণ্ডীদাস কোন ভণিতাতেই "বাসুলী আগেতে" কিংবা "বাসুলী আদেশে" ব্যবহার করেন নাই। অন্য পক্ষে দীন চণ্ডীদাস কোন স্থলে বাসুলীর দোহাই দেন নাই। পদটী সম্ভবতঃ জাল কিংবা তৃতীয় চণ্ডীদাসের।

১৭শ পদ।

ইহার ভণিতা পদের শেষ চরণে পয়ারে—"বাসুলী আদেশে কহে কবি চণ্ডীদাসে।" পদকল্পতরুতে ইহার ভণিতায় "দ্বিজ চণ্ডীদাসে" আছে। ইহার ও পূর্ব্ববর্ত্তী পদের রচয়িতা একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।

১৮শ পদ।

ইহার ভণিতা পদের শেষ চরণে পয়ারে—"বড়ু চণ্ডীদাস কহে যার যেবা ভায়।" ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। ইহার ভাষাও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। ইহার প্রথম চরণে আছে—"পিরীতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি।" "পিরীতি লাগিয়া" স্থানে বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষায় "নেহাত লাগিয়া" বসান যায়। কিন্তু "নিছনি" শব্দের পরিবর্ত্তে অন্য শব্দ বসাইলে মিল থাকে না। বড়ু চণ্ডীদাস "নিছন" শব্দ একবার ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা উৎপাত অর্থে। যথা—

> না জাইব আল রাধা মথুরা নগর।
> পথে দুরবার কাহ্নাঞি নান্দের সুন্দর॥
> নিছন লইআঁ কাহ্নাঞি থাকু এক বাটে।
> আন পথে যাইব বিকে মথুরার হাটে॥ [শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—১ম সং, ১২০ পৃঃ]

সুতরাং পদটী জাল বড়ু চণ্ডীদাসের।

১৯শ পদ।

ইহার ভণিতা পদের শেষে—"দ্বিজ চণ্ডীদাস পুন কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয়॥"

ইহা স্পষ্টতঃ দ্বিজ চণ্ডীদাসের। পদরসসারে ভণিতা অন্যরূপ—

> "কাহারে কহিব সই মরমের কথা।
> বলরামদাস বলে কি কৈল বিধাতা॥"

২০শ পদ।

ইহার ভণিতা পদের শেষে—

"বাসুলী আদেশে বলে চণ্ডীদাস গীত।
আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত॥"

ইহা কিছুতেই বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। এই ভণিতায় "বলে" স্থলে পদকল্পতরুতে পাঠান্তর "দ্বিজ" আছে, অন্য পুথিতে "কবি" আছে। পূর্ব্বের ১৬নং ও ১৭নং পদের রচয়িতা এই পদের রচয়িতা হইতে পারেন। ইহার ভাষাও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। মরম, মরমী, উচাটন (চরণের শেষে), সম্বিত (চরণের শেষে), এই শব্দগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের অজ্ঞাত। বড়ু চণ্ডীদাস একবার উছাটিণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কামের উচাটন বাণ সম্বন্ধে।

"স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।
উছাটিণ বাণে লঅ রাধার পরাণে॥" (২৬৮ পৃঃ)

২১শ পদ।

ভণিতা—

"চণ্ডীদাস কহে কেন এমতি করিবে।
কানু সে পরাণনিধি আপনি মিলিবে॥"

ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। সম্পাদকদ্বয়ও দেখাইয়াছেন যে, "এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে", এই "ছত্রে অক্রূর আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার ইঙ্গিত আছে। কৃ-কী-তে (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে) কিন্তু অন্যরূপ" ইত্যাদি। তবুও যে কেন তাঁহারা ইহাকে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ-পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না।

২২শ পদ।

ইহার ভণিতা—

"কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলীর বরে।
ছটফট করে প্রাণ বন্ধু নাহি ঘরে॥"

বড়ু চণ্ডীদাস কোন স্থলে পয়ারে পদের উপান্তে ভণিতা ব্যবহার করেন নাই। সুতরাং এই পদ জাল। এই অনুমান পদকল্পতরুর পাঠদ্বারা দৃঢ় প্রমাণে পরিণত হয়। তাহার পাঠ—

"কত দূরে প্রাণনাথ আছে কোন দেশ।
চম্পতি-গতি বিনু তনু ভেল শেষ।"

সুতরাং ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে চম্পতির পদ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। অথচ সম্পাদকদ্বয় বলেন,—"পদটী নিঃসন্দিগ্ধভাবে বড়ু চণ্ডীদাসেরই বলিয়া মনে হয়।" এমন কি, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর পরিশিষ্টে (৩২৫ পৃঃ) ইহাকে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। আমরা জানি, অন্যান্য অনেক কবির পদ

২৩শ পদ।

ইহার ভণিতা—

"চণ্ডীদাসে বলে কেন কহ হেন কথা।
শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক কোথা॥"

ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। "প্রীতি" শব্দের প্রয়োগও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে।

২৪শ পদ।

ইহার ভণিতা—

"চণ্ডীদাস কহে কাঁদে কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তার হৃদয় জাগিয়া॥"

ইহা কিছুতেই বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। ইহাতে দুই দুইবার "কালা" (=কৃষ্ণ) শব্দের প্রয়োগ বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। তবে "কাহ্নু" শব্দ স্থলে অনায়াসে "কালা" করা যাইতে পারে। কিন্তু "কানু" পাঠ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ভণিতা-প্রমাণে ইহাকে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

পরিশিষ্টের পদ

পরিশিষ্টে সম্পাদকদ্বয় ছয়টী ভণিতাহীন পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের। ইহাদের মধ্যে ১, ২, ৩ সংখ্যক পদাংশ শ্রীচৈতন্যদেবের আস্বাদিত বলিয়া কথিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আস্বাদিত হইলেই যে বড়ু চণ্ডীদাসের হইবে, তাহার প্রমাণ কি? কেহ বলিবেন যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে, শ্রীচৈতন্য চণ্ডীদাসের পদ শুনিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু তিনি যে কখনও অন্যের পদ শুনিতেন না, এমন প্রমাণ কি আছে? চতুর্থ পদে চরণান্তে "বিনোদিনি" পদ আছে। ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। পঞ্চম পদাংশ সহ সম্পূর্ণ পদ পদরসসারে বংশীবদনের ভণিতায় মিলিতেছে। সুতরাং ইহা বংশীবদনের পদ। ষষ্ঠ পদে আছে, "বৃষভানু-সুতা-তনু ছুঁইলে রাখালে।" সুতরাং ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। সম্পাদকদ্বয় বলেন,—"বৃষভানুর উল্লেখ পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্ত"। কিন্তু পদকল্পতরুর কোনও পাঠে কিংবা অন্যত্র ইহার পাঠান্তর পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রক্ষেপের প্রমাণ কি?

চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদ

এই পর্য্যায়ে ৮৪টী পদ আছে। তন্মধ্যে ১৪ সংখ্যক পদটীর ভণিতা—"বড়ু চণ্ডীদাসে গায়"। ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভণিতার অনুরূপ। কিন্তু ইহার ভাব ও ভাষা বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। ইহাতে সাত্ত্বিক প্রেম আছে, মদনজ্বালা নাই। এই পদের প্রথম পয়ার—"সে যে নাগর গুণের ধাম। জপয়ে তোহারি নাম॥" শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কোথায়ও "গুণের ধাম" বা "গুণধাম" ব্যবহৃত হয় নাই। সেখানে আছে "গুণনিধি"। কিন্তু এই পাঠে মিল

চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদপর্য্যায়ের কোনও কোনও পদের ভণিতায় বড়ু চণ্ডীদাসের নাম থাকিলেও যে, সেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে বড়ু চণ্ডীদাসের নহে, এ বিষয়ে আমরা সুযোগ্য সম্পাদকদ্বয়ের সহিত একমত।

বড়ু চণ্ডীদাসের নূতন পদ

এক্ষণে আমরা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর আবিষ্কৃত বড়ু চণ্ডীদাসের নূতন পদগুলি পরীক্ষা করিব [দ্রষ্টব্য—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৯ ভাগ, ১৭৬-১৯৪ পৃঃ ; ৪০ ভাগ, ৪৩-৫৪ পৃঃ]

১ম পদ (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৩৯শ ভাগ, ১৮০ পৃঃ)

ইহার আরম্ভ—"[ন]ন্দের নন্দন কান্থ ষুন।" ইহার ভণিতা "বা[সুলী] বন্দিয়া আশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাশে॥" শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দশ অক্ষরযুক্ত ছন্দের শেষ চরণে "গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।" এই ভণিতা পাওয়া যায়। কিন্তু "বাসলী বন্দিআঁ আশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥" এইরূপ ভণিতা নাই, সুতরাং ইহা জাল।

২য় পদ (১৮২ পৃঃ)

ইহার আরম্ভ—"আমি দেব শ্রীহরি। মথো[রাতে] অবতরি॥" ইহার ভণিতা "বাষুলি বন্দিয়া [আশে]। গাইল বড়ু চণ্ডিদাশে॥" এই ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। সুতরাং ইহা জাল। ভাব এবং ভাষায়ও কৃত্রিমতার প্রমাণ আছে। "শ্যামের বচন ষুনি। মান গেল বিনোদিনির॥" "তরুমূলে রাধাশ্যাম। দেখিতে সে অনুপাম॥" "[অলি সারি শুক তায়]। রাধা [কৃষ্ণ] গুণ গাএ॥" এইগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। "গোয়ালিনি"র স্থানে "বিনোদিনির" বিকৃত পাঠ কল্পনা করিতে পারা যায়। ইহাতে মিলও বজায় থাকে। কিন্তু "রাধাশ্যাম"এর আসল পাঠ এমন কিছু স্থির করা যায় না, যাহাতে ছন্দ ও মিল অক্ষুণ্ণ থাকে। এ স্থানে বলা বাহুল্য যে, "বিনোদিনী", "রাধাশ্যাম", এইরূপ পাঠ বড়ু চণ্ডীদাসের অজ্ঞাত। শুকসারিকা রাধাকৃষ্ণের গুণ গান করে,—ইহা পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের প্রসিদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহার কোনও উল্লেখ নাই।

৩য় পদ (১৮৩ পৃঃ)

ইহার আরম্ভ—"চামরি জিনিঞা তোর চিকন কবরি।" ইহার ভণিতা পদের সর্ব্বশেষে—"গাইল বাঁড়ু চণ্ডীদাস বাষুলির গন।" ইহা নিঃসন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা —"গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ"। আভ্যন্তরিক প্রমাণেও ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের খাঁটি পদ বটে।

৪র্থ পদ (১৮৭ পৃঃ)

ইহার আরম্ভ—"হরিহর একু দেহ বিদিত সংসারে।" ইহার ভণিতা "বাষুলি বন্দিয়া বাঁড়ু চণ্ডীদাসে গান।" এই ভণিতা পদের সর্ব্বশেষে বড়ু চণ্ডীদাসের ধরণে; কিন্তু ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। যদি কেহ বলেন, এই ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের একক ভণিতা ত হইতে পারে। তাহার উত্তরে বলিব,

এবং অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় ইহা "গাস্তি" হইবে। যদি প্রকৃত পাঠ "গাস্তি" বা "গাএ" কল্পনা করা যায়, তবে মিল রক্ষা হয় না। আভ্যন্তরিক প্রমাণও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। প্রথমে "বিনোদিনি" শব্দ; ইহা তত মারাত্মক নয়। কিন্তু "শ্রীশঙ্কুক্ত কৃষ্ণনাম শাস্ত্রে কেন কহে"—ইহা পরবর্ত্তী বৈষ্ণব ভাব। সুতরাং পদটী জাল।

৫ম পদ (১৮৮ পৃঃ)

ইহার আরম্ভ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে—"আগো রাধে। সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর তোঁহে।" ইহার শেষ অংশ নূতন। পদের ভণিতা—"এইখানে রশে রশে কহে বড়ু চণ্ডীদাশে গাইল জে বাষুলির বরে॥" শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এইরূপ ভণিতা নাই। কহে স্থানে "গাএ" কিংবা "গাইল" এরূপ পরিবর্ত্তনও সঙ্গত হইবে না। মূল পুস্তক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহা খাপছাড়া ঠেকিবে। সুতরাং ইহা জাল।

৬ষ্ঠ পদ (১৯০ পৃঃ)

ইহার আরম্ভ—"বল করিতে চাহুঁ তোরে।" ইহার ভণিতা—"গাইল জে বোঁড়ু চণ্ডীদাশে॥" ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের "গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে" ভণিতার বিকৃতি মনে করা যাইতে পারে। "জে" ছন্দের বিরুদ্ধে। ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের খাঁটি পদ।

৭ম পদ।

এই পদটী মণীন্দ্রবাবুর পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয় নাই। কিন্তু চণ্ডীদাস-পদাবলীর সম্পাদকদ্বয় ইহা মণীন্দ্রবাবুর আলোচিত পুথি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন (১৩, ১৪ পৃঃ)। ইহার আরম্ভ—"এক কাল হইল মোর যমুনার জল।" ইহার ভণিতা পদের সর্ব্বশেষে—"আর কাল হইলা বটু চণ্ডীদাসে গায়ে"। পয়ারের শেষ চরণে এইরূপ ভণিতা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার অনুরূপ বটে। সুতরাং এই পদটী বড়ু চণ্ডীদাসের হওয়া খুব সম্ভব।

'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী'র পরিশিষ্ট

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় এই পরিশিষ্টে ১১টী পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে পাঁচটী পদকে তিনি বড়ু চণ্ডীদাসের বলিতে চাহেন। এক্ষণে এই পদগুলি পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

২ সংখ্যক পদ।

ইহার ভণিতা—"রাইয়ের নিকটে পাঠাইল দূতী।
বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সতি॥"

এই ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। ইহাতে "পীরিতি" শব্দ আছে,—"যাহার যেমন পীরিতি গাঢ়া"। "নেহা" শব্দ বসাইলে ছন্দ থাকে না। সুতরাং পদটী বড়ু চণ্ডীদাসের

৩ সংখ্যক পদ।

ইহার ভণিতা—"অধিক উল্লাসে সখিনী যায়।
বড়ু চণ্ডীদাস তাহাই গায়॥"

ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। পদে আছে—সখীর মুখে রাইয়ের দশা শুনিয়া হরি বরজ-গমনে ইচ্ছা করিলেন। এই ভাব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে। সেখানে দূতী সখী নহে—'বড়ায়ি'; ব্রজের নাম নাই, আছে গোকুল। "সখিনী" শব্দের প্রয়োগও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। মণীন্দ্রবাবু যথার্থ ই ইহাকে সন্দেহজনক মনে করিয়াছেন।

৬ সংখ্যক পদ।

ইহার ভণিতা—"সহচরী সনে ভণয়ে ভৎ সয়ে
কহে বড়ু চণ্ডীদাস।"

ভণিতা "গাইল বড়ু চণ্ডীদাস" হইলে বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারিত। কিন্তু আভ্যন্তরিক ভাব বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। "যাও সহচরি মথুরা মণ্ডলে, বলিও আমার কথা।" এই পরিকল্পনা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অজ্ঞাত। মণীন্দ্রবাবুও ইহাকে সন্দেহজনক মনে করেন।

৮ সংখ্যক পদ।

ইহার ভণিতা—"বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখবিলাসে॥"

উপান্তে ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। বিশেষতঃ "বাশুলী আদেশে" বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার ধারা নহে। "অবলা" শব্দের প্রয়োগও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। "চণ্ডীদাস-পদাবলী"তে ইহাকে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদের পর্য্যায়ে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

৯ সংখ্যক পদ।

ইহার আরম্ভ—"ও পারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।" ইহার সমালোচনা "চণ্ডীদাস-পদাবলী"র বড়ু চণ্ডীদাসের ২২ সংখ্যক পদে করা হইয়াছে। সেখানে দেখান হইয়াছে যে, ইহা কবি চম্পতির রচিত।

উপসংহার

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বাহিরে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ নাই। আমরা তাঁহার যে সকল খাঁটি পদ পাইয়াছি, তাহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অপ্রাপ্ত অংশে ছিল বলিয়া মনে করিতে হইবে। বড়ু চণ্ডীদাস বিক্ষিপ্ত কবিতা হিসাবে পদাবলী রচনা করেন নাই। তাঁহার পদগুলি ধারাবাহিক কৃষ্ণলীলার অন্তর্গত।*

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

'বড়ু চণ্ডীদাসের পদ' সম্পর্কে বক্তব্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক "চণ্ডীদাস-পদাবলী"র সম্পাদন-কার্যে নিযুক্ত হইয়া, আমরা যথাশক্তি "চণ্ডীদাস" এই নামে প্রচলিত পদসমূহ সংগ্রহ ও পর্যালোচনাপূর্বক, "চণ্ডীদাস"-সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের উপস্থিত জ্ঞান-মত "চণ্ডীদাস-পদাবলী"-র শ্রেণী-বিভাগে প্রবৃত্ত হই। "চণ্ডীদাস"-রচিত বা ভণিতা-যুক্ত পদ আলোচনা করিয়া, একাধিক "চণ্ডীদাস"-এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের মত সুদৃঢ় হয়। আমাদের বিশ্বাস, অন্ততঃ তিন জন "চণ্ডীদাস" ছিলেন। ইঁহাদের উপনাম বা উপাধি অনুসারে ইঁহাদিগকে [১] "বড়ু", [২] "দ্বিজ" ও [৩] "দীন" নামে পৃথক্ রূপে পরিচিত করিতে হয়। "বড়ু" ছিলেন আদি বা প্রথম চণ্ডীদাস, এবং ইনি চৈতন্যদেবের পূর্বগামী ছিলেন, চৈতন্যদেব ইঁহারই রচিত পদ আস্বাদন করিতেন; সনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বৃহত্তোষণী টীকায় ইঁহারই নাম করিয়া গিয়াছেন। "দ্বিজ" ও "দীন" চণ্ডীদাসদ্বয় চৈতন্যদেবের পরবর্তী যুগের; ইঁহাদের মধ্যে "দীন" চণ্ডীদাসের ব্যক্তিত্ব শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১৩৩৩ সালের পৌষের "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় ও তদনন্তর ১৩৪২ সালের বৈশাখ-সংখ্যার "বঙ্গশ্রী" তে, এবং শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম-এ কর্তৃক ১৩৩৩ সনের চতুর্থ সংখ্যার "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"-তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় "দীন"-চণ্ডীদাসের পদ, প্রচলিত চণ্ডীদাস-পদাবলী হইতে নির্বাচিত করিয়া পৃথক্ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন ("দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী", কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত)। এরূপ চেষ্টা আমাদের আরব্ধ "চণ্ডীদাস-পদাবলী"র সংস্করণেরও অঙ্গীভূত, আমাদের প্রকাশিত প্রথম খণ্ডেই তাহার সূচনা করিয়াছি। "দ্বিজ"-চণ্ডীদাসের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা এখনও নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই; এবং "চণ্ডীদাস-পদাবলী" সম্পাদন আরম্ভ করিবার কালে আমাদের অনুমান সম্বন্ধে আমরা আরও সন্দিগ্ধ ছিলাম বলিয়া, "দ্বিজ"-চণ্ডীদাস-রচিত পদ তথা অন্য কবির রচিত চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত পদ, "চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত" শ্রেণীতে ফেলিয়াছিলাম।

এই তিন চণ্ডীদাসের মধ্যে "বড়ু"-কে পৃথক্ করার চেষ্টা আমাদের সংস্করণের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এ সম্বন্ধে আমরা "বড়ু"-চণ্ডীদাস-রচিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" গ্রন্থকে প্রমাণ বা কষ্টিপাথর স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের বক্তব্য-সমেত আমাদের সম্পাদিত সমগ্র "চণ্ডীদাস-পদাবলী", এক সঙ্গে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আমাদের ছিল; তাহা করিতে পারিলে পাঠক ও সমালোচকগণের পক্ষে সুবিধা হইত। সাধারণ পাঠক এই একাধিক চণ্ডীদাসের প্রস্তাবনায় একটু যে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। সেই জন্য বোধ হয়, আমাদের "চণ্ডীদাস-পদাবলী"র তেমন উপযোগী সমালোচনা আমরা দেখি নাই। বিষয়টী যেরূপ

থাকিবে। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ বিষয়ে সার্থক গবেষণা করিয়া অল্প যে কয়জন ব্যক্তি এই অধিকার লাভ করিয়াছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং আমাদের পক্ষে পরম আনন্দের বিষয় যে চণ্ডীদাস-সমস্যার নিরসনে যে প্রয়াস আমরা করিয়াছি, শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব তৎসম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রচলিত "চণ্ডীদাস"-পদাবলীর পদগুলির মধ্যে যেগুলিতে ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে "বড়ু"-চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদের সঙ্গে মিল আমরা পাইয়াছি, সেই মিল বিচার করিয়া পদাবলীর পদ-বিশেষ "বড়ু"-চণ্ডীদাস-রচিত কি না, তাহা স্থির করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমরা আমাদের বিচার-পদ্ধতি অনুসারে, প্রচলিত সহস্রোর্দ্ধ পদ-মধ্যে মাত্র ২৪টীকে "বড়ু"-চণ্ডীদাসের বলিতে সাহসী হইয়াছি। আমাদের পদ্ধতি আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছি। যাঁহারা "চণ্ডীদাস" নামে রামীর সাধন-সহচর কোনও সাধককে বাঙ্গালা বৈষ্ণব-সাহিত্যের এক দেবতা-রূপে স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই পদ্ধতি অনুমোদন লাভ করিবে না, এবং প্রচলিত শত শত পদের মধ্যে মাত্র ২৪টী পদ আদি বা "বড়ু"-চণ্ডীদাসের বলিয়া তাঁহাদের সমক্ষে ভেট দিলে, এই সংখ্যাল্পতা তাঁহাদিগকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিবে; বিশেষতঃ যখন এই অল্প সংখ্যার মধ্যে তাঁহারা অনেকগুলি লোকপ্রিয় "চণ্ডীদাস"-রচিত পদ পাইবেন না। কিন্তু অপর পক্ষে, ভাষাতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব আমাদের প্রস্তাবিত এই চব্বিশটী পদের দুই একটী ভিন্ন অপরগুলিকেও "বড়ু"-চণ্ডীদাসের খাতে ফেলিতে নারাজ। এক হিসাবে, আমাদের পদ্ধতি তিনি আরও অনেক অধিক সতর্কতার সহিত চালাইতে চাহেন; সুতরাং পদ্ধতি তাঁহার অনুমোদন পাইয়াছে, ইহা ধরিয়া লইতে হয়।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, শহীদুল্লাহ্ সাহেব যে-সব আপত্তি তুলিয়াছেন, সেগুলি এই অতিসতর্কতা-প্রসূত, এবং একদেশদর্শী। তিনি ভণিতার উপরেই বড় বেশী জোর দিয়াছেন— বড় বেশী কেন, প্রায় সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাহিরে অন্য কোনও ভণিতা পাইলে, তাহা মানিতে তিনি রাজী নহেন। অথচ প্রভূত পরিশ্রম করিয়া এই এক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভণিতার যে তালিকা তিনি করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, ৬১ রকম ভণিতা (অবশ্য প্রায় সর্বত্রই "চণ্ডীদাস", "বড়ু", ও "বাসলী"—এই নামগুলি আছে) পাওয়া যাইতেছে। এই ৬১ প্রকার ভণিতার বাহিরে আরও দুই পাঁচটী অন্য ধরণের ভণিতা যে ছিল না এবং পাওয়া যাইবে না, এরূপ বলা অযুক্তিযুক্ত। তাহার পর, ভণিতার বিশুদ্ধি আমরা সর্বত্র আশা করিতে পারি না। কীর্তনিয়াদের সুবিধা অনুসারে গানের সুর, তাল ও কথা সবই বদলাইয়া গিয়াছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ভণিতায় "বড়ু" হইয়া গিয়াছেন "দ্বিজ", "দ্বিজ" হইয়া গিয়াছেন "বড়ু"—বহু স্থলে এরূপ হইয়াছে। যদি পদটীর মধ্যে ভাবে, ভাষায়, বিষয়-বস্তুর অবতারণার প্রকারে, অলঙ্কারে আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে ঐক্য পাই, তাহা হইলে ভণিতাকে গৌণ করিয়াই দেখিতে হয়। আমরা যে ২৪টী পদ "বড়ু"র

প্রত্যেক পদটী লইয়া বিচার করিয়াছেন, আমরাও তাহা করিব। তবে "চণ্ডীদাস"-পদাবলীর হাজার বার শ' পদ আলোচনা করিয়া দেখিয়া ভণিতাকে আমরা একটী স্থান দিলেও, প্রধানতম স্থান দিতে রাজী নহি। এ কথা মনে রাখা দরকার যে, প্রচলিত পদাবলী-সাহিত্যে "বড়ু"র রচিত যে কয়টী পদের স্থান পাওয়া সম্ভব হইয়াছে, সে কয়টী নিশ্চয়ই অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়া পড়ায়ই এইরূপ হইয়াছে ; এবং লোকপ্রিয় পদের ভণিতা লইয়া যে কত গোলযোগ, তাহা আমাদের ধৃত "চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত" পদশ্রেণীর পরিশিষ্ট-রূপে প্রদত্ত পদগুলির ভণিতা আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভণিতা সম্বন্ধে যে একটী কথা বলিয়াছেন, তাহা মানিয়া লইতে পারিতেছি না। বড়ু চণ্ডীদাস যে কেবল "চণ্ডীদাস গাইল" বা "বড়ু চণ্ডীদাস গায়"—এইরূপ সামান্য বা নিরপেক্ষ উক্তিতেই নিজের পদ শেষ করিয়াছেন, বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে নিজের আত্মীয়তা প্রকট করেন নাই, অথবা রাধা বা শ্রীকৃষ্ণ, ইহাদের উভয়ের কাহাকেও আহ্বান করিয়া বা উদ্দেশ করিয়া স্বনামে কিছু বলেন নাই, এ কথা ঠিক নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুই একটী ভণিতায় বেশ বুঝা যায়, পরবর্তী চণ্ডীদাস-পদাবলীর অনুরূপ ভণিতা বড়ু-ও ব্যবহার করিতেন। যথা—

কাহ্নের বিলাপ বড়ু চণ্ডীদাস গাএল,
পাআঁ দেবী বাসলীর বরে ॥ (পৃঃ ২৮৮)

(এখানে "গাএ" ক্রিয়ার কর্ম "কাহ্নের বিলাপ")।

সহজেঁ হৈব তোর চন্দ্রাবলী বসে।
জিআঅ রাধাক গাইল চণ্ডীদাসে ॥ (পৃঃ ২৮৬)

(এখানে "জিআঅ রাধাক" অক্লেশে চণ্ডীদাসের উক্তি বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি)।

এতদ্ভিন্ন, ভণিতার পরেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দুই এক ছত্র—যথা একটী পয়ার—পাইতেছি। ইহারই অবলম্বনে পরবর্তী অনুলেখক বা কীর্তনিয়ার হাতে মূল ভণিতার বিকৃতি ও বাহুল্য হইয়া থাকিতে পারে। যথা—

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর।
তখনে রাধাক দিল মেলানি।
নাচিতেঁ গাইতেঁ বুলে চক্রপাণী ॥ (পৃঃ ২৯২)

এতৎসম্পর্কে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রাপ্ত "দেখিলোঁ প্রথম নিশি" ইত্যাদিক পদটী (আমাদের বইয়ের তৃতীয় পদ) ও পরবর্তী কালের পদাবলীতে রক্ষিত তাহার রূপান্তর, এই উভয়ের ভণিতাগুলি মিলাইয়া দেখিতে পারা যায়। "রস" এই শব্দটী দ্বারা পরবর্তী রূপান্তরগুলিতে ভণিতা পূর্ণ ও ছন্দোবিষয়ে নির্ভুলরূপেই পাইতেছি ; প্রাচীন রূপে "রস গাইল" রূপ ছিল কি না, কে জানে।

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব "বড়ু"-চণ্ডীদাসের পদ-নির্বাচনের দ্বিতীয় পথস্বরূপ এই সকল

বিষয়-বস্তুকেই (অর্থাৎ কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গের ব্যক্তি ও ঘটনাকেই) ভাব বলিয়া ধরিয়াছেন। শ্রীরাধার পিতামাতার নাম কি ছিল, তাঁহার নামান্তর যে চন্দ্রাবলী ছিল, "বড়ু", "দ্বিজ" ইত্যাদির পদের পৃথক্‌ত্ববিধানের জন্য এ সমস্ত অবশ্য প্রথম শ্রেণীর প্রমাণ, কিন্তু এগুলি ভাব-বিশ্লেষগত প্রমাণ নহে। আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের যে চরিত্র আমরা পাই, এবং তাঁহারা যে ভাবে তখনকার বৈষ্ণবদের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্যযুগের পূর্ববর্তী আদি বৈষ্ণবযুগের কথা। চৈতন্যযুগের পূর্বেকার ভাবধারা যে পরবর্তী রসবিচার ও রস-সাহিত্য-পুষ্ট সূক্ষ্মতর বৈষ্ণব ভাবধারা হইতে বিভিন্ন ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। পরবর্তী বৈষ্ণব কবি ও আচার্য এবং কীর্তনিয়াগণ যে আদি-কবি "বড়ু"-চণ্ডীদাসের পদ ভুলেন নাই, চৈতন্যদেব-প্রদর্শিত পথে তাঁহারাও যে "বড়ু"-র পদ আস্বাদন করিতেন, অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহার প্রমাণ প্রচলিত পদাবলী-সাহিত্যে সুস্পষ্ট। চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত বহু পদকে "বড়ু"-র রচিত বলিতে না পারিলেও, সেগুলিতে আমরা বড়ুর ভাবের ছায়া, কচিৎ বা ভাষার ঝঙ্কার পাইতেছি। এরূপ স্থলে, যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-সুলভ ভাবধারা বা ভাবপারম্পর্য দেখি, সেখানে যদি ভাষায়ও তাহার সমর্থন পাই, আমরা সেখানে মূলতঃ "বড়ু"-রই পদ পাইতেছি, তাহা ধরিয়া লইতে পারি। ভাব-বিষয়ে একটী কথা প্রণিধানযোগ্য; "বড়ু"-র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা-বিরহখণ্ডের বিরহের পদগুলিই ভাবে গভীরতম, উচ্চতম; অনুরূপ বিরহ-বিষয়ক পদই ভাষায় ও ছন্দে (পয়ার ছন্দ এইপ্রকার পদে বেশী করিয়া প্রযুক্ত দেখি) শ্রীকৃষ্ণকীতনের সমপর্যায় হওয়ায়, ঐ পদগুলিকেই বিশেষ ভাবে "বড়ু"-র বলিয়া ধরিয়া লইতে আমরা প্রণোদিত হইয়াছি। এই "বিরহ" পর্যায়কেই পরবর্তী কালে "আক্ষেপানুরাগ" এই নূতন আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; এবং "চণ্ডীদাস"-ভণিতাযুক্ত ঐ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পদগুলির মূল উৎস হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণকীতনের বংশী-খণ্ডের ও বৃন্দাবন-খণ্ডের কয়েকটী পদ, এবং রাধাবিরহ-খণ্ডের পদ। ঐরূপ বিরহ-বিষয়ে "বড়ু-"র রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-বহির্ভূত অন্য পদ, প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, এরূপ অনুমানের পক্ষে প্রবল যুক্তি আছে

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে "রাধার পূর্বরাগ নাই, বরং পরম বিরাগ আছে।" কথাটী সম্পূর্ণভাবে গ্রহণীয় নহে। আদিতে রাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরাগ দেখান হইলেও, সে বিরাগ ক্রমে মৌখিক বিরাগে যে দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই আছে; এবং পরে আমরা বংশীখণ্ড ও শেষের অন্য অংশে দেখিতে পাই যে, সেই প্রারম্ভিক বিরাগাভাস শেষে গভীর অনুরাগে পর্যবসিত হইয়াছে। আমরা অন্য পর্যায়-আখ্যার অভাবে, "শ্রীরাধার পূর্বরাগ" শীর্ষক প্রচলিত পর্যায়ে যে পদটীর স্থান দিয়াছি (আমাদের "চণ্ডীদাস-পদাবলী"-র "বড়ু"-চণ্ডীদাসের পদমধ্যে প্রথম পদ), তাহাকে অক্লেশে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশীখণ্ডের প্রথম কয়েকটী পদের মধ্যে স্থান দেওয়া যায়,—ভাবের ব্যত্যয় হয় না।

আমাদের নির্বাচিত "বড়ু-"র পদে রাধার সখী বা শ্রীকৃষ্ণের সখার নাম নাই।

পৃঃ ৩২৮ (শহীদুল্লাহ্ সাহেব-ধৃত) ও পৃঃ ৩৮২। তবে আমাদের বক্তব্য, যখন আমরা নকলনবিস ও গায়কের মারফৎ প্রাচীন পদের অল্প-বিস্তর বিকৃতির সম্ভাবনা মানিয়াই লইতেছি, তখন পরবর্তী কালে বহুল-প্রচলিত "বিনোদিনী", "শ্যাম", "পিরীতি" প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অপ্রাপ্ত বা অন্য অর্থে প্রাপ্ত শব্দ "বড়ু-"র পদে যে স্থান করিয়া লইবে, উহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। আমাদের নির্বাচিত ২৪টী পদকে আমরা যথাযথ "বড়ু"-র স্বহস্ত-লিখিত বা স্বমুখ-গীত রচনার অবিকৃত রূপ বলিতেছি না—আমরা কেবল এইটুকুই বলি যে, আক্ষরিক ভাবে নহে, মোটামুটি ভাবে এই পদগুলিতে বড়ুরই রচনা আমরা পাইতেছি। সমসাময়িক পুথি না পাইলে, প্রাচীন বাঙ্গালা কবির রচনা-সম্বন্ধে ইহার বেশী আর কিছু বলা চলে না।

এক্ষণে "বড়ু"-চণ্ডীদাসের বলিয়া গৃহীত ২৪টী পদ সম্বন্ধে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের অভিমতের আলোচনা একাদিক্রমে করিব।

প্রথম পদ—ইহাকে পূর্বরাগের পর্যায়ে আমরা ফেলিয়াছি বলিয়া শহীদুল্লাহ্ সাহেব যে আপত্তি করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমরা উপরে আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি। "পূর্বরাগ" এই পর্যায়-আখ্যা আমাদের দেওয়া। উহাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশী-খণ্ডের পদের সহিত সামঞ্জস্য বিদ্যমান। অন্য নাম বা বর্ণনার অভাবে "পূর্বরাগ" বলিয়া ধরা হইয়াছিল। নিম্নে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটী পদ তুলিয়া দিলাম, শহীদুল্লাহ্ সাহেব উহাকে কোন্ পর্য্যায়ে ফেলিবেন ?—

বাহু তুলিলেঁ কেশ বন্ধন ছলে।
ঘন ঘন বিকাশিলেঁ বদনকমলে॥
আঙ্গভঙ্গে কৈলেঁ কেহ্নে মোর বিদ্যমানে।
এবেঁ আলিঙ্গন দিআঁ রাখহ পরাণে॥—ইত্যাদি (পৃঃ ২৪৩, যমুনা-খণ্ড)।

রসশাস্ত্রের বিচারে এই পদকে "পূর্বরাগ" পর্যায়েই ফেলিতে হয়। তদনুরূপ আর একটী অংশের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পৃঃ ২৩৮—

নেহে তবেঁ আকুলী রাধিকা ততিখনে। নিমেষরহিত বক্ষ সরস নয়নে॥
দেখিল কাহ্নের মুখ সুচির সময়ে। সকল লোকের মাঝেঁ তেজি লাজভয়ে॥
কাহ্নাঞি দেখিআঁ আর যত গোপীগণে। সঙ্কে আলিঙ্গন কৈল আপণ আঁপণে॥

"শ্যামবর্ণ দেবা-তনু" ইত্যাদি অংশকে আমরা "বড়ু" চণ্ডীদাসের বলিয়া মনে করি না। ইহা পরবর্তী কালের পাঠবিকৃতি-জাত বলিতে হইবে। কিন্তু তৃতীয় ত্রিপদীর শেষ অংশ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগের আদিমতার পরিচায়ক ("বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা")।

চতুর্থ পদ—এখানে শহীদুল্লাহ্ সাহেব ভণিতায় আপত্তি করিয়াছেন। ছন্দের অনুরোধে যে সুপরিচিত নাম বাদ দেওয়া যাইতে পারে, বিশেষতঃ পালা গানে, এ কথা শহীদুল্লাহ্ সাহেব যদি না মানেন, তাহা হইলে আমরা নাচার। এই উৎকৃষ্ট পদটীতে প্রাচীন রচনার ও প্রাচীন ভাষার ছাপ সুস্পষ্ট ; ইহার ভাষাকে বানানে ও দুই-একটী প্রাচীন প্রতিরূপ আনিয়া

দিতে পারা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভণিতার প্রমাণ অন্যতম প্রমাণ হইলেও, প্রধান প্রমাণ নহে। "কানু, মুঞি, বাঢ়য়ে, বাজিছে, দারুণ, রা, বৈরী বাসিয়ে, ছাড়িয়ে" পদগুলি এবং পদের মধ্যে "গো" (=শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের "গ") শব্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

পঞ্চম পদ—ভণিতার কথা ছাড়িয়া দিলে, শহীদুল্লাহ্ সাহেবের এই পদে আপত্তি ইহার ভাব লইয়া। এই পদটীর প্রথম অংশটীতে (প্রথম তিনটী পয়ারে) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাব বিদ্যমান, তুলনীয়—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, নৌকা-খণ্ডের প্রথম পদ (১৩৯ পৃঃ)। ভাব ও শব্দের প্রতিধ্বনিও প্রথম দুই পয়ারে আছে। শেষ তিনটী পয়ার সম্বন্ধে আমরা জোর দিতে চাহি না—এখানে পরবর্ত্তী কালে পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন হওয়া অসম্ভব নহে।

ষষ্ঠ পদ—আমাদের মনে হয়, এই পদ সম্বন্ধে কোনও আপত্তি টিঁকিতে পারে না। উপরে চতুর্থ পদ সম্বন্ধে আমাদের কৈফিয়ৎ দ্রষ্টব্য। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, উহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেরই পদ হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সহিত সাদৃশ্য আমরা পদের আলোচনার শেষে দেখাইয়াছি।

এই পদে "বাথান" পাঠ আমাদের গৃহীত পাঠে রাখিয়াছি। কারণ, "বাথান" হইলে পরবর্ত্তী "পাঁতর" শব্দের সার্থকতা আইসে, এবং "পাথারে" অপেক্ষা "পাঁতরে" পাঠটীই সঙ্গত ও অধিকতর অর্থদ্যোতক। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পথে ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক লাঞ্ছিতা হইবার অনুযোগ রাধা করিতেছেন, যথা—

পথত বারহ মন নান্দের নন্দন।...
ঘাটে বাটে হেন কেহ্নে বোল চক্রপাণী॥ (পৃঃ ২৫১)।

আমরা এই পদটী "নিঃসন্দেহভাবে বড়ু-চণ্ডীদাসের" কি না, তৎসম্বন্ধে অন্য সুধীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সপ্তম পদ—ভণিতার সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব উক্তি দ্রষ্টব্য। পদটীর অনুরূপ ছত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে এবং মণীন্দ্র বাবুর নবাবিষ্কৃত পুথি হইতে আমরা উদ্ধার করিয়া দিয়াছি। ইহা বড়ু-চণ্ডীদাসেরই—তবে ভণিতা পরবর্ত্তী কালের হওয়া সম্ভব।

অষ্টম পদ—ভণিতা ভিন্ন ইহাকে বড়ুর বলিতে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের আপত্তি নাই।

নবম ও দশম পদ—ভণিতা ভিন্ন অন্য দিক্ দিয়া শহীদুল্লাহ্ সাহেব এই পদের বিচার করেন নাই। তদনুরূপ দশম পদটীকে বড়ুর বলিয়া গ্রহণ করিতে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের আপত্তি নাই।

একাদশ, ত্রয়োদশ পদ—ভণিতায় আপত্তি। পূর্বমন্তব্য দ্রষ্টব্য। ত্রয়োদশ পদের ছত্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ছত্রের ভাব-গত ঐক্য লক্ষণীয়।

চতুর্দশ পদ—এখানেও মূলতঃ ভণিতায় আপত্তি। ভাষায় আপত্তি হইতে পারে না; কতকগুলি শব্দ প্রাচীন বাঙ্গালায় লক্ষণীয়। "কানু"="কাহ্ন" আছে; "কালা" শব্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে; যথা—"আকারণে আল রাধা নিন্দসি কৃষ্ণ কালা"; "অভাগি"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে। একমাত্র "হেদে" শব্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই না; কিন্তু তাহাতেই এই পদকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। চৈতন্যদেবের আস্বাদিত পদ; দ্বিশতাধিক বৎসর পূর্বেকার কাগজে চণ্ডীদাসের ভণিতায় পূরণ করিয়া দেওয়া। সহজে ইহাকে বাদ দেওয়া চলিবে না।

পঞ্চদশ পদ—ভণিতার কথা ধরিলাম না—কিন্তু এই পদের ভাষার প্রাচীনত্ব শহীদুল্লাহ্ সাহেব যে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশ্চর্যান্বিত হইতেছি। "ননদী (ননদিনী নহে), দুখ বাসি, কালা কানু", এগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রতিধ্বনি। "আগি" শব্দ প্রাকৃতজ তদ্ভব রূপ—অর্ধতৎসম "আগুনি, আগুন" অপেক্ষাও ভাষায় প্রাচীনতর রূপ (*অগ্নিকা > অগি্গআ > অগি্গঅ > আগী, স্ত্রীলিঙ্গে)—চর্যাপদে "আগী" মিলে; এই প্রাচীন রূপকে শহীদুল্লাহ্ সাহেব এই পদের প্রাচীনত্বের অন্তরায়-স্বরূপ মনে করিতেছেন। "পিরীতি"—"নেহার" বা (স্নেহের) এইরূপ কোনও পুরাতন শব্দের পরিবর্তে আসিয়া থাকিতে পারে।

ষোড়শ ও সপ্তদশ পদ—ষোড়শ পদে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রস্তাবিত ভণিতার পাঠ সমীচীনতর। এই পদদ্বয়ের ভাব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদেও মিলিতেছে; ভণিতায় "বাসলী"র নামও আছে। আমরা বড়ু-চণ্ডীদাসের বলিয়া গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার কিছু দেখিতেছি না।

অষ্টাদশ পদ—"নিছন—নিছনি", একই শব্দের রূপান্তর। পদটীতে "কানু" আছে, "নিছিয়া" শব্দ আছে (তুলনীয় "নিশিবোঁ"—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন), "আরতি" আছে—এগুলি বড়ু-চণ্ডীদাসেরই স্মারক। ভণিতায়ও কেবল "বড়ু"-চণ্ডীদাস পাইতেছি। ভাবে ও ভাষায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতার হইতে বাধা দেখি না। এই পদস্থিত "পিরীতি" শব্দের সম্ভাব্য সমাধান শহীদুল্লাহ্ সাহেবই করিয়া দিয়াছেন।

ঊনবিংশ পদ—পদটীর ভাব, ভাষা, ছন্দ, তিনই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ। আপত্তি "শ্যাম" ও ভণিতার "দ্বিজ", এই শব্দদ্বয়ে। অন্য প্রমাণ বলবত্তর।

বিংশ পদ—"মরম" শব্দটী একাধিক বার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে; যথা—

ব্রতের মরম আইহণের মাএ জাণে।

"উছাটিন", "উচাটন" শব্দের প্রাচীনতর, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনানুমোদিত রূপ হইতে পারে। কিন্তু "ঘুণে"র সহিত "উচাটনে"র মিল হইলে, "উছাটিনে"র সহিতও হইতে বাধা নাই। ভণিতার "বাসলী" শব্দ লক্ষণীয়। ঊনবিংশ পদের সম্বন্ধে মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

একবিংশ পদ—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সম্পূর্ণ রাধাকৃষ্ণলীলা পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবার পরের অংশ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে খণ্ডিত। আমাদের মন্তব্যের দ্বারা মূল পদের ভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুগামিতা খণ্ডিত হয় না।

দ্বাবিংশ পদ—চম্পতিপতির ভণিতা সম্বন্ধে উক্ত পদের নিম্নে আমাদের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। আজ পর্যন্ত চম্পতি-ভণিতার কোনও বাঙ্গালা পদ পাওয়া যায় নাই, উপরন্তু আমাদের

দিলে বোধ হয়, শহীদুল্লাহ্ সাহেবের আপত্তির মুখ্য কারণ দূর হইবে, এবং তাহা হইলে সমস্ত পদটাই শ্রীরাধিকার উক্তি হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু উপান্ত ছত্রে বা উপান্ত পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনেও বড়ু-চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। এই পদের দুই একটী ছত্রও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে, আমরা তাহা আমাদের টিপ্পনীতে দেখাইয়াছি। "পাখী হঞা উড়ি যাওঁ" ইত্যাদি—এই ভাবের পংক্তি বড়ু-চণ্ডীদাসের প্রিয় ছিল, একাধিক বার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহা মিলে।

ত্রয়োবিংশ পদ—পূর্ব পূর্ব পদের সম্বন্ধে আমাদের উক্তি দ্রষ্টব্য।

চতুর্বিংশ পদ—ভণিতায় আপত্তি। ভাবে পদটী যে "অপেক্ষাকৃত আধুনিক-গন্ধী", তাঁহা আমরা আমাদের মন্তব্যে স্বীকার করিয়াছি।

পরিশিষ্টের পদ—এই পদ বা পদাংশগুলিকে বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া জোর করা চলে না, সেই জন্যই আমরা এগুলিকে "পরিশিষ্ট" শ্রেণীতে ফেলিয়াছি। তবে প্রত্যেক পদ বা পদাংশের নীচে আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি, তদ্দ্বারাই শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কোনও কোনও আপত্তি খণ্ডিত হইবে।

বড়ু-চণ্ডীদাসের নূতন পদ

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর আবিষ্কৃত পুঁথি দুইখানিতে যে কয়টী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদের নূতন রূপ ও অন্য পদ পাওয়া গিয়াছে, সে পদগুলি সম্বন্ধে কেবল এই কথাই বলা যথেষ্ট যে, এগুলি পরবর্তী কালের বিকৃত পাঠময় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-ধৃত ও বড়ু-চণ্ডীদাসের রচিত অন্য পদের সংগ্রহ, সুতরাং এগুলিতে যে পরবর্তী ও বড়ু-চণ্ডীদাসের অজ্ঞাত বহু শব্দাদি থাকিবে, তাহা বিচিত্র নহে।

"বড়ু"-চণ্ডীদাস যে কেবল পালা হিসাবেই লিখিয়াছিলেন, বিক্ষিপ্ত বা স্বতন্ত্র পদ লেখেন নাই, সে বিষয়ে জোর করিয়া কি বলা চলে?

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য-বার্ত্তা

[যে জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সাধারণতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে, মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বঙ্গভাষায় নানা স্থানে প্রকাশিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, তথা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যাদিবিষয়ক সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 'সাহিত্য-বার্ত্তা' অংশে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। এই অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার সমসাময়িক মৌলিক আলোচনার নিখুঁত ইতিবৃত্ত করিয়া তুলিবার জন্য সাহিত্যিকবর্গের সহযোগিতা ও সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা যাইতেছে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।]

সাহিত্য

গ্রন্থ

বাংলা বানানের নিয়ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা।

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-লিখিত ভূমিকা সহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত সমিতির অভিমত।

প্রবন্ধ

শ্রীঅনাথগোপাল সেন—পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য বাউল-সঙ্গীত। ভারতবর্ষ, আষাঢ় '৪৩, পৃঃ ১২০।

পূর্ববঙ্গের পল্লীপ্রসিদ্ধ মনোমোহন নামক গ্রাম্য কবির একটী সঙ্গীত।

শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার—ছন্দের মায়া। বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৬৪৫-৬৪৮।

কাব্যের সহিত ছন্দের সম্বন্ধ আলোচনা ও এই প্রসঙ্গে প্রাচীন এবং বর্তমান বাংলা সাহিত্য হইতে উদাহরণ সংকলন।

শ্রীতারাপদ দাশ—নদীয়া জেলার কয়েকজন সমন্বয়পন্থী সাধক। ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৯৭১-৯৭৮।

লালনসাঁইজীর শিষ্য হিরুসা ও পাঞ্জুসা রচিত কতকগুলি সঙ্গীতের সংকলন ও আলোচনা।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—শ্রীগৌরাঙ্গ ও লীলাকীর্ত্তন। ভারতবর্ষ, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৭১৭-৭২৪।

কীর্তনের ক্রমপরিণতি, গৌরচন্দ্রিকার ইতিহাস ও কীর্তনপ্রচারে চৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য—এই সকল বিষয়ের আলোচনা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—"ছাতনার রাজবংশ-পরিচয়" ও চণ্ডীদাস। প্রবাসী, আষাঢ় '৪৩, পৃঃ ৩৪১-৩৪৫।

কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্বে কৃষ্ণসেন-রচিত 'ছাতনার রাজবংশ-পরিচয়' নামক সন্দর্ভের আলোচনা ও তাহা হইতে চণ্ডীদাসের সময় নির্ধারণ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—"চণ্ডীদাস-চরিত"। প্রবাসী, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ১৮-২৯; জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ১৭৭-৮৪; আষাঢ় '৪৩, পৃঃ ৩৭৮-৮৪।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—চণ্ডীদাসের দেশ ও কালের লিখিত প্রমাণ। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ২৫২-৬।

ছাতনায় প্রাপ্ত চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ-সংবলিত কয়েকখানি পুথির পরিচয়।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য—চলিত বাঙ্গালা ও তাহার বানান। ভারতবর্ষ, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৬৫৭-৬৬৬।

চলিত বাংলার বানান সমস্যার সমালোচনা।

শ্রীঅনিলবরণ রায়—বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গ-সংস্কার। ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৮৫৯-৬০।

উচ্চারণানুযায়ী বানান প্রবর্তন ও যুক্তাক্ষর বর্জনের প্রয়াসের অসঙ্গতি প্রতিপাদন।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—বাঙ্গালা ভাষার রূপসমস্যা। ভারতবর্ষ, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৭১০-৭১৬।

বাংলা ভাষার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নাই—বিগত শতাব্দীর গদ্যরচনার কতকগুলি নিদর্শনের সাহায্যে এই মত প্রতিপাদনের চেষ্টা।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য—বাগর্থবিজ্ঞান। ভারতবর্ষ, আষাঢ় '৪৩, পৃঃ ১-১১।

শব্দের অর্থপরিবর্তনের নিয়মাদি আলোচনা।

শ্রীশীলানন্দ সূত্রবিশারদ—সিংহলে সংস্কৃতচর্চ্চা। মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ২৭৬।

প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সিংহলে সংস্কৃত আলোচনা ও সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণয়নের ইতিহাসের আভাস।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্যের জীবনী আলোচনার তিনটি ধারা। উদ্বোধন, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৪৩০-২, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৫০৯-১২, আষাঢ়, পৃঃ ৫৭৯-৮৩।

চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে প্রাচীন কাল হইতে যে সমস্ত আলোচনা বিভিন্ন ভাষায় হইয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন—মহাত্মা গঙ্গাধর কবিরাজ। প্রবর্ত্তক, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ১৮৫-৮৮।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবিরাজ গঙ্গাধরের জীবনবৃত্তান্ত ও রচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত দিগ্দর্শন।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালা সমালোচনা সাহিত্য। মাসিক বসুমতী, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৫৮-৬৪।

বাংলায় প্রকাশিত সমালোচনা সাহিত্যের দিগ্দর্শন।

শ্রীপ্রীতি গুপ্ত—রামায়ণের এক অধ্যায়। বিচিত্রা, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৪১৬-৪৪১।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সীতান্বেষণপ্রসঙ্গে রামায়ণে যে প্রাকৃতিক বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়, তাহার বৈশিষ্ট্য আলোচনা।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শব্দরত্নাবলী ও মুসাখাঁ। ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৯৩০-১।

শ্রীনলিনীনাথ দাশ গুপ্ত-লিখিত চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধের আলোচনা।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন—জিপ্সি-ভাষায় ভারতীয় প্রভাব। বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৬৩৫-৮।

পশ্চিম-জার্মানীর জিপ্সিদের কথ্যভাষার অভিধান হইতে ভারতীয় ভাষার শব্দের সহিত

ইতিহাস

প্রবন্ধ

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী—কৈবর্ত্তরাজ দিব্য। ভারতবর্ষ '৪৩, পৃঃ ৩২-৪১।

দিব্যের রাজপদে নির্বাচন সম্বন্ধে যে সাধারণ ধারণা আছে, 'রামচরিত' গ্রন্থের মূল ও অনুবাদ সাহায্যে তাহার নিরসন।

শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী—পাণ্ডুনগর। ভারতবর্ষ, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৭৯২-৫।

পাণ্ডুনগর বা হিন্দু আমলের পাণ্ডুয়ার স্মৃতিনিদর্শনসমূহের পরিচয়।

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী—বৈদিকযুগের শিক্ষাপদ্ধতি। ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৯৫৫-৮।

বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি আছে, তাহাদের আলোচনা।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতার বাঙালী সমাজ। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ১৫৯-১৬৬, আষাঢ় '৪৩, পৃঃ ৩১৮-৩৩১।

প্রথম বাঙালী সংবাদপত্রসেবী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'কলিকাতা কমলালয়' ও 'সমাচার দর্পণ' নামক প্রাচীন সংবাদপত্র অবলম্বনে কলিকাতার বাঙালীসমাজের চিত্র প্রদর্শন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ—আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে কতিপয় বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ২২৬-৩৩।

সারনাথ, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, সাকেত, পাবা ও কুশীনারার প্রাচীন ইতিহাস ও বৌদ্ধ নিদর্শনের আলোচনা।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—পাশ্চাত্যমতে বেদের আলোচনা। ভারতবর্ষ, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৬৮৫-৯১।

উইন্টারনিট্জ প্রণীত History of Sanskrit Literature গ্রন্থে নিবদ্ধ বেদবিষয়ক কয়েকটী উক্তির প্রতিবাদ।

আবদুল মওদুদ—শাহজাহানের সিংহাসন লইয়া বিবাদ। মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৪৪৫-৯, আষাঢ় '৪৩, পৃঃ ৬০৫-৭।

বিভিন্ন গ্রন্থ অবলম্বনে বিবাদের বিস্তৃত বিবরণ।

শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গে মাৎস্যন্যায়। প্রবাসী, আষাঢ় '৪৩, পৃঃ ৩৬২-৩৬৯।

পাহাড়পুর ও মহাস্থান গড়ে খননের ফলে প্রাচীন স্তরে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের ধ্বংসাবশেষ, অন্যত্র বর্ণিত মাৎস্যন্যায়ের যাথার্থ্য প্রমাণিত করে, ইহাই এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—পিণ্ডারিদিগের বিবরণ। বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৭০৬-৮।

১৮১৮—২০ খৃষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত পিণ্ডারিদিগের বিবরণ সংকলন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ—"দীন-ই-ইলাহী"। মাসিক বসুমতী, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৩৯-৪৩।

আকবর কর্তৃক বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত 'দীন-ই-ইলাহী' নামক নূতন ধর্মের মর্ম, উদ্দেশ্য ও বিধানাদির আলোচনা।

দর্শন

প্রবন্ধ

শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু—প্রজ্ঞানের প্রগতি। ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৮৩৩-৪১।

জাগতিক বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে মানবের চিন্তাধারার ক্রমপরিণতির পরিচয়।

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়—কৃষ্ণলীলায় কামায়ন। বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৬১১-৬১৪।

কৃষ্ণলীলাবর্ণনায় শৃঙ্গাররসের প্রভাবের আধ্যাত্মিক রহস্য নির্দেশ।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ—ঋষি চুয়াংজুর জীবনী ও বাণী। উদ্বোধন, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৪৩৬-৪১।

চীনের তাও ধর্মমতের ব্যাখ্যাতা চুয়াংজুর জীবনবৃত্তান্ত ও উপদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

বিজ্ঞান

গ্রন্থ

গণিতপরিভাষা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

পূর্ব্বপ্রকাশিত ও পরিষৎ-পত্রিকার বর্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যার সাহিত্য-বার্ত্তায় উল্লিখিত পুস্তিকার সংশোধিত সংস্করণ।

প্রবন্ধ

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী—ভাবনির্ণয়ে বিভিন্ন মত। ভারতবর্ষ, আষাঢ় '৪৩, পৃঃ ৯৩-৯৮।

ফলিতজ্যোতিষের ভাবনির্ণয়বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন মতের গুণাগুণ আলোচনা।

শ্রীনীলরতন কর—শক্তির রূপান্তর। মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৮৩১-৮৩৭।

বর্ত্তমান জগতে প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার চেষ্টার ইতিহাস।

শ্রীজ্যোৎস্নাশঙ্কর ভাদুড়ী—গ্রীণ্ মতবাদে ভূপৃষ্ঠপরিকল্পনা। বিচিত্রা, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৪৯৩-৪৯৯।

ভূপৃষ্ঠের জল ও স্থলভাগ সংস্থানের বৈচিত্র্য নির্দেশাত্মক মতবাদের আলোচনা।

শ্রীফণিভূষণ দত্ত—ভারতীয় গণিতে 'পাই'। ভারতবর্ষ, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৬৭৫-৬৭৯।

'পাই' বা বৃত্তের পরিধির সহিত ব্যাসের আনুপাতিক সম্বন্ধ বিষয়ে ভারতীয় গণিতগ্রন্থের গণনার পরিচয়।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ—দিল্লীর প্রাচীন মানমন্দির। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ১৮৫-৯১।

অম্বরাধিপতি জয়সিংহ-প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির ও তাহার যন্ত্রাদির পরিচয়।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। প্রবাসী, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ১২৪-৩০, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ২৬৬-৭২।

কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'গণিত' পরিভাষার বিস্তৃত আলোচনা।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার—ব্যাক্‌টিরিয়া। প্রকৃতি, ১২।৪৪৯-৪৫৮।

বিভিন্ন রোগের মূল কারণ ব্যাক্‌টিরিয়ার আকৃতি, প্রকৃতি ও প্রতীকার সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী—সংখ্যালেখন-প্রণালী। প্রকৃতি, ১২।৪৯২-৯৭।

প্রাচীন কালে বিভিন্ন দেশের সংখ্যালেখন প্রণালীর ইঙ্গিত।

পবনদূত-বর্ণিত বাঙ্গালা দেশ*

পবনদূত[1] কাব্য মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেবের অন্যতম সভাকবি ধোয়ী কবিরাজ-রচিত। ইহা কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে লিখিত। এই কাব্যের নায়ক স্বয়ং লক্ষ্মণসেনদেব এবং নায়িকা মলয়পর্ব্বতবাসিনী কুবলয়বতীনাম্নী এক গন্ধর্ব্বকন্যা। মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেব যখন ভুবনবিজয় ব্যপদেশে দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন, তখন এই গন্ধর্ব্বদুহিতা তাঁহার রূপে মুগ্ধা হন। লক্ষ্মণসেন বিজয় অভিযান শেষ করিয়া গৌড়ে প্রত্যাগমন করিলে এই বিরহ-বিধুরা কুবলয়বতী মলয়পবনকে দূতরূপে তাঁহার রাজধানী বিজয়পুরে প্রেরণ করেন।

মলয় পর্ব্বত হইতে বিজয়পুরের পথে কবি দক্ষিণাপথের নানা স্থানের বর্ণনা করিয়া, অবশেষে পবনকে উড়িষ্যার মহানদী-তীরস্থ যযাতিনগরে উপস্থিত করিয়াছেন। ইহার পরেই 'গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসর' সৌধমালাসমন্বিত সুহ্মদেশের বর্ণনা করা হইয়াছে[2]। এই প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন যে, এই স্থানের ভূমিদেবাঙ্গনাগণ[3] 'নবশশিকলাকোমল' তালী-পত্র কর্ণাভরণরূপে পরিধান করিতেন। এই একটি কথায় সেই সময়কার ব্রাহ্মণ-স্ত্রীগণের সাদাসিধা বেশভূষার সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেনরাজগণের সময় যে ব্রাহ্মণপত্নীগণ আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করিতেন, তাহা কবি উমাপতিধরের বর্ণনায়ও পাওয়া যায়। বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতে[4] লিখিত হইয়াছে যে, মহারাজ বিজয়সেন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ-গণকে বহু ধনরত্ন দান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পত্নীগণ-এতদ্বিষয়ে এতই অনভিজ্ঞ ছিলেন যে, নাগরিকাগণ কিরূপে রত্নাদি চিনিতে হয়, তাহা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেন; যথা—মুক্তা কার্পাস-বীজের ন্যায়, পান্নার রং শাকপত্রের ন্যায়, ডালিম পাকিয়া ফাটিয়া গেলে তাহার ভিতরস্থ দানাগুলি যেরূপ দেখা যায়, চুণি সেইরূপ, রৌপ্যের বর্ণ লাউফুলের ন্যায়

---

* ১৩৪২।২৭এ ফাল্গুন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম-এ, কাব্যতীর্থ সম্পাদিত ও কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অনুবাদের অভাবে অনেকেই গ্রন্থখানির রসাস্বাদনে বঞ্চিত রহিয়াছেন এবং ইহার আশানুরূপ আলোচনাও হইতে পারিতেছে না। সম্পাদক মহাশয় এই অভাব দূর করিয়া সুধীমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

২। গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসরঃ সৌধমালাবতংসো
যাস্যত্যুচ্চৈস্ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ।
শ্রোত্রক্রীড়াভরণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং
তালীপত্রং নবশশিকলাকোমলং যত্র যাতি॥ ২৭

৩। টীকাকার 'ভূমিদেবাঙ্গনানাং' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন 'রাজমহিষীণাম্'। অমরকোষে 'ভূদেব' শব্দের প্রতিশব্দ 'ব্রাহ্মণ' দেওয়া হইয়াছে, আমরা সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি।

৪। মুক্তাঃ কর্পাসবীজৈর্ম্মরকতশকলং শাকপত্রৈরলাবুপুষ্পৈ রূপ্যাণি রত্নং
পরিণতিভিদুরৈঃ কুক্ষিভির্দ্দাড়িমানাম্।
কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকসিতকুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ শিক্ষ্যন্তে যৎপ্রসাদাদ্

এবং স্বর্ণের বর্ণ কুষ্মাণ্ডপুষ্পের ন্যায়। বিজয়সেনের এত রত্নাদি দান করা সত্ত্বেও তাঁহার পৌত্রের সময়ও এই সরলা ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের মধ্যে যে বিলাসিতা প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহা তাঁহাদের তালপত্র আভরণরূপে ব্যবহার দ্বারাই জানা যাইতেছে।

অতঃপর কবি বলিতেছেন যে, এই সুহ্ম দেশে 'কমলাকেলিকার মুরারি' সেনবংশীয়গণ কর্ত্তৃক দেবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার সেবাকারী লীলাকমলহস্ত বাররামাগণকে দেখিয়া লক্ষ্মী বলিয়া ভ্রম হইত।[৫] এই প্রসঙ্গে দুইটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ এ স্থলে আমরা শুধু মুরারির মূর্ত্তিরই বর্ণনা পাইতেছি। তাঁহার শক্তি রাধা কিংবা লক্ষ্মীর কোন বিগ্রহের উল্লেখ এ স্থানে নাই। লক্ষ্মী যে ছিল না, তাহা 'লক্ষ্মীশঙ্কা' কথা দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ বাররামার বর্ণনা। বর্ত্তমান সময়ে বাররামা বা দেবদাসী শুধু দাক্ষিণাত্যের মন্দিরসমূহে ও পুরীর জগন্নাথের মন্দিরেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রথা যে, পূর্ব্বে বঙ্গেও প্রচলিত ছিল, তাহা পবনদূতের এই উক্তি প্রমাণ করিতেছে। বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতেও প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরে বাররামার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬] ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে, আকাশই যে দেবতার লজ্জা নিবারণ করে, মহারাজ বিজয়সেন তাঁহাকে বহু বিচিত্র বসন দান করিয়াছেন, যিনি অর্দ্ধ পত্নীর ঈশ্বর, তাঁহাকে তিনি শত শত রত্নালঙ্কারভূষিতা সুন্দরী রমণী প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার বাসস্থান শ্মশান, তাঁহাকে তিনি রাজপ্রাসাদশোভিত নগরী দান করিয়াছেন। ইহা হইতেও প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় রাজতরঙ্গিণীতে।[৭] কহ্লন লিখিয়াছেন যে, কাশ্মীররাজ জয়াপীড় (৭৭২-৮০৬ খৃষ্টাব্দ) যখন ছদ্মবেশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি তত্রস্থ কার্ত্তিকেয়মন্দিরে কমলানাম্নী এক দেব-নর্ত্তকীর সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন।

কবি আরও লিখিয়াছেন যে, এই দেশে অর্থাৎ সুহ্মে কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় ধবল আগারসমূহে শোভিত চন্দ্রার্দ্ধমৌলির একটি নগর আছে। ঐ স্থানে বহু বাররামার বাস। এই নগরে গঙ্গাতীরে রঘুকুলগুরু সূর্য্যের এবং অর্দ্ধনারীশ্বরের মন্দির বর্ত্তমান। এই পুণ্যক্ষেত্র এবং গঙ্গার মধ্যে মহারাজ বল্লালসেন-নির্ম্মিত একটি সেতুবন্ধ আছে। এই বাঁধের উপর আরোহণকারী গঙ্গাস্নানার্থী জনগণের নিকট অমরনগরী-সন্নিকৃষ্টা গঙ্গা দুইটি বলিয়া প্রতীয়মান হইত। সেতুবন্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ 'প্রেমলোলা' গঙ্গা সফেন তরঙ্গমালা-

---

৫। তস্মিন্ সেনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেবঃ সুহ্মে বসতি কমলাকেলিকারো মুরারিঃ।
পাণৌ লীলাকমলমসকৃদ্ যৎসমীপে বহন্ত্যো
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতিসুভগাঃ কুর্ব্বতে বাররামাঃ ॥ ২৮

৬। উচ্চিত্রাণি দিগম্বরস্য বসনান্যর্দ্ধাঙ্গনাস্বামিনো রত্নালংকৃতিভির্ব্বিশেষিতবপুঃশোভাঃ শতং সুভ্রুবঃ।
পৌরাঢ্যাশ্চ পুরীঃ শ্মশানবসতের্ভিক্ষাভুজোऽশ্যাক্ষয়াং লক্ষ্মীং স ব্যতনোদ্দরিদ্রভরণে
সুজ্ঞো হি সেনান্বয়ঃ ॥ ৩০
(Inscriptions of Bengal, Vol. III p. 48)

রূপ হস্ত উত্তোলন করিয়া নিজ প্রিয় সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন কোন উদ্ধতা নারী চুলের মুঠি ধরিবার জন্য হস্তোত্তোলন করতঃ ছুটিয়াছে।[৮]

ইহার পরে পবনকে বলা হইয়াছে যে, তুমি ভক্তিনম্রভাবে সেই জগতীপাবন দেশে যাইবে, যে স্থানে 'প্রকৃতিকুটিলা' তপনাত্মজা শ্যামল যমুনা জলকেলিরতা সুহ্মসীমন্তিনী-দিগের (?) বীচিধৌত স্তনমৃগমদদ্বারা অধিকতর শ্যামল হইয়া 'আবর্ত্তচক্র' দর্শন করাইতে করাইতে ভাগীরথী হইতে নির্গতা হইয়াছে। তৎপর স্কন্ধাবার (সেনানিবাস) দর্শন করিয়া, ভুবনবিজয়ী লক্ষ্মণসেনের উন্নতা রাজধানী বিজয়পুরে গমন করিবে, যে স্থানে চতুর গঙ্গাবাত পৌরাঙ্গনাদিগের সম্ভোগজনিত ক্লান্তি অঙ্গসংবাহন দ্বারা দূর করিয়া দেয়।[৯]

৮। যাতস্তোর্দ্ধং ধনপতিনগেনৈব গৌরৈরগারৈঃ
পশ্যেস্তস্মিন্ নগরমনঘং চারু চন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ।
যত্রানেকপ্রিয়নখপদব্যাজতো বাররামা
ভর্ত্তুর্ভূর্যাশশধরকলাচিহ্নমঙ্কে বহন্তি ॥ ২৯
তত্রানর্ঘ্যং রঘুকুলগুরুং স্বর্ণদীতীরদেশে
নত্বা দেবং ব্রজ গিরিসুতাসংবিভক্তাঙ্গরম্যম্।
যাতে যস্মিন্ নয়নপদবীং সুন্দরভ্রূলতানাং
প্রৌঢ়স্ত্রীণাং গলতি রমণপ্রেমজন্মাভিমানঃ ॥ ৩০
তৎক্ষেত্রঞ্চ ত্রিদিবসরিতশ্চান্তরা সেবনীয়ঃ
শ্রীবল্লালক্ষিতিপতিযশোবান্ধবঃ সেতুবন্ধঃ।
আরূঢ়ানাং ত্রিদিবতটিনীস্নানহেতোর্জনানাং
যত্র শ্রেণী(?)ামরনগরীসন্নিকৃষ্টা বিভাতি ॥ ৩১
গঙ্গাং ফেনস্তবকমুকুরং বীচিহস্তে বহন্তীং
সেবেথাস্ত্বমথ পরিসরপ্রৌঢ়হংসাবতংসাম্।
প্রত্যাবৃত্তা ব্রজতি জলধৌ প্রেয়সি প্রেমলোলা
কর্ত্তুং কেশগ্রহমিব কিমপ্যুদ্ধতা যা বিভাতি ॥ ৩২

৩১ শ্লোকে পুথির বল্লান ও বল্লাল পাঠের স্থলে চক্রবর্ত্তী মহাশয়-কল্পিত বল্লাল পাঠই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

৯। তোয়ক্রীড়াসরসনিপতৎসুহ্মসীমন্তিনীনাং
বীচীধৌতৈঃ স্তনমৃগমদৈঃ শ্যামলীভূয় ভূয়ঃ।
ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্র নির্যাতি দেবী
দেশং যায়াস্তমথ জগতীপাবনং ভক্তিনম্রঃ ॥ ৩৩
সংসর্পন্তীং প্রকৃতিকুটিলাং দর্শিতাবর্ত্তচক্রাং
তামালোক্য ত্রিদশসরিতো নির্গতামম্বুগর্ভাৎ।
মা নির্মুক্তাসিতফণিবধূশঙ্কয়া কাতরোভূ-
র্ভীতঃ সর্ব্বো ভবতি ভুজগাৎ কিং পুনস্ত্বাদৃশো যঃ ॥ ৩৪
স্কন্ধাবারং বিজয়পুরম্ ইত্যুন্নতাং রাজধানীং
দৃষ্ট্বা তাবদ্ ভুবনজয়িনস্তত্র রাজ্ঞোঽধিগচ্ছেঃ।

এখন আমরা উপরিবর্ণিত স্থানগুলির বৈশিষ্ট্য ও বর্ত্তমান অবস্থান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

সুহ্মদেশ (২৭ শ্লোক)—সুহ্ম বলিতে কখন দক্ষিণ-রাঢ়, কখনও উত্তর-রাঢ়, কখনও বা উভয়-রাঢ় বুঝাইত। পবনদূতের বর্ণনা হইতে মনে হয়, যেন কবি দক্ষিণ-রাঢ়কেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বলেন:—"সুহ্ম বঙ্গদেশের একটি বিভাগের নাম। ইহা উত্তর মেদিনীপুর, সরস্বতী নদীর পশ্চিমস্থ হুগলী জেলার অংশ এবং বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশ লইয়া গঠিত।"[১০]

মুরারির দেবরাজ্য (২৮ শ্লোক)—টীকাকার 'দেবরাজ্য' অর্থ লিখিয়াছেন 'দেবমন্দির'; আমাদের কিন্তু মনে হয়, মুরারির সেবার জন্য সেনগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিস্তীর্ণ ব্রহ্মোত্তরকেই দেবরাজ্য বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে তাঁহার দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান গোবিন্দপুরই এই দেবরাজ্য।[১১] শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত বলেন যে—এই স্থান চব্বিশ পরগণা জেলার সোণারপুর থানার অধীন এবং আদি গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। গোবিন্দপুর ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীর সন্নিকটে একটি প্রাচীন ইষ্টকস্তূপ জঙ্গলাবৃত হইয়া প্রায় দুই তিন বিঘা জমির উপর পড়িয়া আছে। উহার মধ্য হইতে বহুসংখ্যক সুন্দর কারুকার্য্যমণ্ডিত ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে। হয় ত মুরারির মন্দিরই এখন ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছে।[১২]

চন্দ্রার্দ্ধমৌলি বা শিবের নগর (২৯-৩২ শ্লোক)—শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, 'শিবের নগর' বলিতে বর্ত্তমান হাওড়া জেলার শিবপুরের স্থায় কোন প্রকৃত সহরকেই বুঝাইতেছে কি না, তাহা বলা সহজ নহে।[১৩] তিনি সম্ভবতঃ শিবপুরের অবস্থান এবং নামার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐরূপ অনুমান করিয়া থাকিবেন। নিম্নলিখিত কারণে তাঁহার এই অনুমান আমাদিগের নিকট সমীচীন বলিয়াই মনে হয়।

বর্ত্তমান শিবপুরের নিকটে বেতড় নামে একটি প্রাচীন গ্রাম বর্ত্তমান আছে। পর্ত্তুগীজদিগের ষোড়শ শতাব্দীর মানচিত্রে ইহার অবস্থান বর্ত্তমান শিবপুরের পশ্চিম-দক্ষিণে প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎকালীয় বাণিজ্যের জন্য এই স্থান খুব প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার প্রতিপত্তি সপ্তগ্রামের পরই ছিল। এই স্থানের উত্তরে গঙ্গা যথেষ্ট গভীর ছিল না বলিয়া পর্ত্তুগীজদিগের জাহাজগুলি সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত যাইতে না পারিয়া, বেতড়েই নঙ্গর করিত এবং ঐ স্থানে বসিয়া বেচাকেনা করিত। প্রাচীন বঙ্গীয় কবি মুকুন্দরাম, মাধবাচার্য্য ও বিপ্রদাসের পুঁথিতে বেতড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই স্থান সপ্তগ্রাম হইতে এক ভাটি দক্ষিণে এবং কলিকাতার অপর তীরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বেতড়ের বেতাই চণ্ডী প্রসিদ্ধ দেবতা ছিলেন।[১৪]

১০। J. A. S. B. 1905, p. 544.

১১। Inscriptions of Bengal, Vol. III, pp. 92-98

১২। পঞ্চপুষ্প, ১০৩৯, পৃষ্ঠা ২৫৮ ও ২৪১।

১৩। পবনদূতম্, Introduction, p. 25

১৪। J. A. S. B. Vol. LXI, Pt. III 1892, pp. 110-11

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সন্নিকটস্থ বেতাইতলা বেতাই চণ্ডীর স্থান হইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দপুর-তাম্রশাসন দ্বারা প্রদত্ত বিড্ডরশাসন গ্রামের পরিচয়ে বলা হইয়াছে যে, এই গ্রাম শ্রীবর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতী পশ্চিম খাটিকাস্থ বেতড্ড চতুরকে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বে জাহ্নবী প্রবহমানা, দক্ষিণে লেজ্যদেবমণ্ডপী, পশ্চিমে ডালিম্বক্ষেত্র এবং উত্তরে ধর্ম্মনগর। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, এই বেতড্ড ও বর্ত্তমান বেতড় একই স্থান।[১৫] শ্রীযুত কালিদাস দত্তের মতে জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর থানার অধীন 'শাসন' গ্রামই প্রাচীন বিড্ডর শাসন এবং ইহার উত্তর দিকে অবস্থিত ধামনগরই তাম্রশাসনোক্ত ধর্ম্মনগর। এই উভয় গ্রামই আদিগঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত।[১৬] ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান বেতড় ও ইহার সমীপবর্ত্তী স্থানগুলি প্রাচীন। সুতরাং শিবপুরও যে একটি প্রাচীন স্থান, ইহা অনুমান করা বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

ত্রিংশ শ্লোকের প্রথমেই 'তত্র' শব্দ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, গঙ্গাতীরস্থ সূর্য্যের ও অর্দ্ধ-নারীশ্বরের মন্দির পূর্ব্বশ্লোকোক্ত শিবের নগর বা শিবপুরে অবস্থিত ছিল। আবার একত্রিংশ শ্লোকের প্রথমেই 'তৎক্ষেত্রঞ্চ' কথা দ্বারাও পুণ্যক্ষেত্র শিবের নগরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং মহারাজ বল্লালের কীর্ত্তি সেতুবন্ধ, এই শিবের নগর এবং গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী ভূমিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মনে হয়, ইহা একটি বাঁধ (embankment), পুল (bridge) নহে। এই বাঁধগুলি সাধারণতঃ দুইটি উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকে,—কোন স্থানকে জলপ্লাবন অথবা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা করা। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উভয় উদ্দেশ্যই সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু শেষোক্ত কারণ যে ছিলই, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই শ্লোকের শেষার্দ্ধে বলা হইয়াছে যে, গঙ্গাস্নানার্থিগণ যখন এই বাঁধের উপর আরোহণ করিত, তখন তাহাদের নিকট 'অমরনগরীসন্নিকৃষ্টা' বা শিবপুরসন্নিহিতা গঙ্গা দুইটি বলিয়া প্রতিভাত হইত। বোধ হয়, অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, কোন নদীর বাঁকের কোণে দাঁড়াইলে এইরূপ দৃশ্য দেখা যায়। সম্ভবতঃ শিবের নগর এইরূপ একটি বাঁকের উপর অবস্থিত ছিল। গঙ্গাস্রোত বাঁকের নিকট তটে প্রতিহত হইয়া ইহা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। বোধ হয়, এই ভাঙ্গন হইতে শিবের নগরকে রক্ষা করিবার জন্যই বল্লালসেন কর্ত্তৃক এই সেতুবন্ধ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দ্বাত্রিংশ শ্লোকের 'প্রত্যাবৃত্য ব্রজতি' কথাদ্বারাও আমাদের উপরের অনুমান সমর্থিত হইতেছে। গঙ্গাস্রোত বাঁকের নিকট সেতুবন্ধে বাধা প্রাপ্ত হইয়া, কিয়দ্দূর প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সমুদ্রে চলিয়া গিয়াছে। 'প্রত্যাবর্ত্তন' শব্দ দ্বারা গঙ্গা যে দিক্ হইতে আসিয়াছিল, পুনরায় সেই দিকেই চলিয়া গিয়াছিল বুঝা যাইতেছে। গঙ্গা উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে আসিতেছিল, হঠাৎ সেতুবন্ধে প্রতিহত হইয়া, পুনরায় খানিক দূর উত্তর দিকে চলিয়া গিয়া, দক্ষিণবাহিনী হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শিবের নগরের নিকট গঙ্গা উত্তরবাহিনী হইয়াছিল। শিবপুরের বোটানিক্যাল

গার্ডেনের দক্ষিণ হইতে বর্ত্তমান টালিস্ নালা বা আদিগঙ্গার মুখ উত্তর-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এই উভয়ের যোগরেখা সেই সময়ের শিবের নগরের নিকটস্থ উত্তরবাহিনী গঙ্গার কতকটা ধারণা জন্মায়। বোটানিক্যাল গার্ডেনের দক্ষিণস্থ গঙ্গা 'কাটি-গঙ্গা' নামে অভিহিত হয়। প্রবাদ, ইহা পূর্ব্বে ছিল না; মুসলমান আমলে একটি খাল কাটিয়া, গঙ্গা ও দামোদর এবং রূপনারায়ণের সহিত যোগ সাধন করা হয়। সেই খালই বিশাল কাটিগঙ্গায় পরিণত হইয়াছে এবং গঙ্গার প্রাচীন খাত যাহা আদিগঙ্গা নামে পরিচিত, তাহা মজিয়া গিয়াছে। শিবের নগরের নিকটস্থ দক্ষিণবাহিনী এবং উত্তরবাহিনী অংশদ্বয়ই সেতুবন্ধ আরোহণকারীর নিকট দুইটি গঙ্গা বলিয়া প্রতীয়মান হইত। সেতুবন্ধে প্রতিহত হইয়া গঙ্গা উত্তাল তরঙ্গমালা ও ফেনস্তবক সৃষ্টি করিয়া সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইত। গঙ্গার এই অবস্থাকেই কবি, স্বামীর কেশগ্রহণোন্মুখা হস্তোত্তোলনকারিণী ঔদ্ধতা নারীর সহিত তুলনা করিয়াছেন।

বাঙ্গালায় একটা কথা আছে:—"গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল।" আবার শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, গঙ্গা যত্র তত্র কুরুক্ষেত্রের সমান ফলপ্রদা, কিন্তু উত্তর-বাহিনী গঙ্গা ইহার দশ লক্ষ গুণ ফলপ্রদা।[১৭] শিবের নগর বলিতে প্রধানতঃ কাশীকেই বুঝায়। কাশী গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত এবং ইহার নিকটস্থ গঙ্গা উত্তরবাহিনী। আমরা দেখিতে পাইতেছি, আমাদের শিবের নগরে বা শিবপুরে এই উভয়ই বর্ত্তমান ছিল। এই জন্যই সম্ভবতঃ এই স্থানে শিবের অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল এবং ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল শিবপুর।

✓ গঙ্গাযমুনার বিয়োগস্থান।—আবর্ত্তচক্রের বর্ণনা হইতে মনে হয়, এই স্থলে চাকদহের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই স্থানের এক মাইল দূরে প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের ও দেবীর ভগ্ন মন্দির বর্ত্তমান। বর্ত্তমান সময়ে চাকদহের নিকট যমুনার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বে গঙ্গা-যমুনার বিয়োগ স্থলের যে সীমা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উহাকে সরস্বতীর উত্তরে বলা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান যমুনা বা কাঁচড়াপাড়ার খাল সরস্বতীর উত্তরে নহে, দক্ষিণে। ইহা দ্বারা মনে হয়, উত্তরে অবস্থিত চাকদহের নিকটে প্রাচীন যমুনার খাত ছিল। ৺রাখালবাবু[১৮] যমুনার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা দ্বারাও এই ধারণা সমর্থিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন, যমুনা fork এর আকারে দুই শাখায় গঙ্গা হইতে বাহির হইয়াছে। উহার একটি শাখা সরস্বতীর উত্তরে এবং অন্যটি উহার দক্ষিণে। সম্ভবতঃ যমুনার 'আবর্ত্তচক্র' বা চক্রাকার দহের স্থান ভরাট হইয়া চাকদহ নাম হইয়াছে।✓

পরবর্ত্তী যুগে সুপ্রসিদ্ধ সরস্বতী, সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীর কোনও উল্লেখ যমুনার বর্ণনাপ্রসঙ্গে না করা বিশেষ আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ যদি ধোয়ীর সময়ে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীতে

১৭। কুরুক্ষেত্রসমা গঙ্গা যত্র তত্রাবগাহিতা।
কুরুক্ষেত্রাদ্দশগুণা যত্র বিন্ধ্যেন সঙ্গতা॥
ততঃ শতগুণা প্রোক্তা যত্র পশ্চিমবাহিনী।
তস্মাৎ সহস্রগুণিতা যত্র চোত্তরবাহিনী॥
বাচস্পতি মিশ্রের তীর্থচিন্তামণিধৃত মৎস্যপুরাণের বচন (Bib. Ind. Series, p. 526)

ত্রিবেণী কিংবা সরস্বতীর অস্তিত্ব থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগের সম্বন্ধে নির্ব্বাক্ থাকিতেন না। তিনি যেরূপ ভাবে সুহ্মের দেবস্থানের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ত্রিবেণী তীর্থ এবং সরস্বতীর নামোল্লেখ পর্য্যন্ত না করা বড়ই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না কি? শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণবাবু বলিয়াছেন,—হয় ত সে যুগে সপ্তগ্রাম প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই।[১৯] বস্তুতঃ আমরা আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের ত্রিবেণীর এত প্রাচীন উল্লেখ কোথায়ও পাই নাই। বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গলে ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রামের উল্লেখ আছে। এই পুস্তক 'সিন্ধু ইন্দু-বেদ-মহী-সক পরিমাণ'এ (১৪১৭ শকে, ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে) গৌড়েশ্বর হুসেন সার সময় লিখিত।[২০] আমরা ইহা হইতে প্রাচীন তারিখযুক্ত প্রমাণ অবগত নহি। রচনার তারিখহীন এবং সম্ভবতঃ অর্ব্বাচীন বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে[২১] গঙ্গা ও পদ্মাবতীর (পদ্মা) সংযোগস্থল ও গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের মধ্যবর্ত্তী স্থলে যমুনার সহিত বিয়োগ এবং গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর বিয়োগস্থলে ত্রিবেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত মৈথিল পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্রের তীর্থচিন্তামণিতে[২২] এবং ঐ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রচিত স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে[২৩] সপ্তগ্রামস্থ দক্ষিণ-প্রয়াগ বা

১৯। পবনদূতম্, Introduction, p.25.

২০। J. A. S. B., Vol. V. 1909, pp. 253-54.

২১। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ (বঙ্গবাসী সং) পূর্ব্বখণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ও মধ্য খণ্ড, ২২শ অধ্যায়। রায়বাহাদুর যোগেশ-চন্দ্র রায়ের মতে এই পুরাণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে রচিত। (ভারতবর্ষ, ১৩৩৭, পৃঃ ৬৮১)।

২২। প্রদ্যুম্নতীর্থং তপসা যত্র শ্বেন স্মরো হরেঃ।
প্রদ্যুম্ননামা পুত্রোঽভূৎ স্থানে তত্র মহোদয়ঃ ॥
তদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনা গতা।
স্নানাত্তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লভ্যতে ॥
দক্ষিণপ্রয়াগস্তু মুক্তবেণী সপ্তগ্রাম ইতি প্রসিদ্ধঃ।
(তীর্থচিন্তামণি, B. I, Series, p. 219).

এই সন্দর্ভের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমরা শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহোদয়ের নিকট ঋণী।

২৩। (ক) ৺নন্দলাল দে ধৃত পাঠ :—
মহাভারতে—প্রদ্যুম্ননগরাদ্ যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনা গতা ॥
স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লভ্যতে।
দক্ষিণপ্রয়াগস্তু উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামাখ্যাদক্ষিণদেশে ত্রিবেণীতি খ্যাতে ॥
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, গঙ্গামাহাত্ম্য, ১০০ পৃষ্ঠা)

(খ) শব্দকল্পদ্রুমধৃত পাঠ :—
"প্রদ্যুম্নস্য হ্রদাৎ যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনা গতা ॥ ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্।

(গ) আমাদের পুথির পাঠ :—
"মহাভারতে—তদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনা গতা।

ত্রিবেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। উভয়েই প্রমাণস্বরূপ মহাভারত হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু ইহা মহাভারতে খুজিয়া পাওয়া যায় না এবং উভয়ের পাঠেও সম্পূর্ণ মিল নাই।

'সুহ্মসীমন্তিনী' (৩৩ শ্লোক)—চিন্তাহরণ বাবু যে তিনখানি পুঁথির সাহায্যে পবনদূত সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার সকলগুলিতেই 'ব্রহ্মসীমন্তিনী' পাঠ রহিয়াছে, কিন্তু তিনি আশঙ্কা করেন যে, মূল পাঠ বোধ হয় ছিল 'সুহ্মসীমন্তিনী'; কেন না, ব্রহ্মসীমন্তিনী পাঠের অর্থসঙ্গতি করা কঠিন। কিন্তু যমুনাবর্ণনাপ্রসঙ্গে সুহ্মসীমন্তিনীর উল্লেখ সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। সুহ্ম দেশ বর্ণনা করিতে করিতে পবনকে বলা হইয়াছে,—'তুমি সেই জগতীপাবন দেশে ভক্তিনম্রভাবে যাইবে, যে স্থানে যমুনা ভাগীরথী হইতে নির্গতা হইয়াছে।' ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, যমুনা সুহ্ম হইতে পৃথক্ কোন দেশে বর্ত্তমান। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন বলিয়াছেন, 'ব্রহ্ম' উত্তর-রাঢ়ের প্রাচীন নাম, সুতরাং 'ব্রহ্মসীমন্তিনী' পাঠই ঠিক।[২৪] কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যমুনা যখন গঙ্গার পশ্চিমতীরে নহে, তখন ইহা উত্তর কিংবা দক্ষিণ, কোন রাঢ়েই নহে। এখন দেখা যাউক, 'ব্রহ্মসীমন্তিনী'ই যদি প্রকৃত পাঠ হয় এবং 'ব্রহ্ম' দেশবাচক শব্দ না হয়, তবে ইহা কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই শব্দের সহজ অর্থ 'ব্রাহ্মণগণের স্ত্রী'। তবে কি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয়া স্ত্রীগণ যমুনায় স্নান করিত না? এরূপ বলা কখনই কবির অভিপ্রেত হইতে পারে না। আর আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, তখনকার ব্রাহ্মণাঙ্গনাগণ কোন বিলাসিতার ধার ধারিতেন না। আর এখানে পাইতেছি,

---

বাঙ্গালা দেশের প্রয়াগ, 'দক্ষিণ' বিশেষণে বিশেষিত হইল কেন? ইহার নাম 'প্রাচ্য প্রয়াগ' হইলেই বোধ হয় ঠিক হইত। আমাদের সন্দেহ হয়, বাচস্পতি মিশ্রধৃত তথাকথিত মহাভারতের শ্লোক দাক্ষিণাত্যের কোন স্থলে পুরাণে কোন প্রয়াগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের জন্য মহাভারতের নাম দিয়া অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং প্রাচ্য দেশের স্মার্ত্তগণ ভুল করিয়া তাহা সপ্তগ্রামের ত্রিবেণীতে আরোপ করিয়াছেন। আমরা এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করি। আশ্চর্য্যের বিষয়, কতিপয় প্রাচীন খোদিত লিপিতে মহীশূর রাজ্যের মহীশূর জেলায় তিরুমকুড়ল নামক স্থানে দক্ষিণ প্রয়াগ পাওয়া গিয়াছে (Epigraphia Carnatica, Vol. III, Mysore Taluq Inscription, No. 33.)। এই স্থানটি কাবেরী, কপিলা ও স্ফটিক সরোবরের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত (Ep. Car. Tirumakudala—Narasiyur Taluq, No. 62.)। তামিল ভাষায় তিরুমকুড়ল শব্দের অর্থ—ত্রিবেণী। এই স্থানে অগস্ত্যেশ্বর নামক একটি প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ আছে। একখানি তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে যে, অগস্ত্য ঋষি কর্ত্তৃক প্রত্যহ স্তুত হইবার জন্য মুনিগণসেবিত, আগমে প্রশংসিত গয়া, প্রসিদ্ধ প্রয়াগ এবং কাশীর সহিত, দাক্ষিণাত্যের অলঙ্কার এই তিরুমকুড়লে স্ব স্ব স্থান ত্যাগ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই স্থানের কাবেরীই জাহ্নবী এবং কপিলাই তপনাত্মজা (Ep. Car. Nanjangud Taluq No. 198.)। এই তিরুমকুড়ল এবং এই স্থানের অগস্ত্যেশ্বরের সর্ব্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় ১১৮০ খৃষ্টাব্দের একখানি খোদিত লিপিতে (Ep. Car. Tirumakudala, Narasipur Taluq, No. 106.)। বস্তুতঃ দাক্ষিণাত্যের প্রাচীনলিপিসমূহ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, উত্তরাপথের অনেক প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র দক্ষিণাপথে কল্পিত হইয়াছে এবং তাহাদের নামের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যজ্ঞাপক 'দক্ষিণ' বিশেষণ যুক্ত হইয়াছে, যথা, দক্ষিণ-বদরিকাশ্রম, দক্ষিণবারাণসী, দক্ষিণপ্রয়াগ, দক্ষিণভাস্করপুরী বা আদিত্যনগরী, দক্ষিণকৈলাস, দক্ষিণকাশী,

তাঁহারা স্তনে মৃগমদ মাখিয়া জলক্রীড়ারতা হইয়াছেন। আমাদের সন্দেহ হয়, এই স্থলে প্রকৃত পাঠ হইবে 'বঙ্গ-সীমন্তিনী'। বঙ্গ যে ভাগীরথী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা বায়ু ও মৎস্যপুরাণ পাঠে জানা যায়। উক্ত পুরাণদ্বয়ে লিখিত হইয়াছে যে ভাগীরথী গঙ্গা ব্রহ্মোত্তর, বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্ত প্রদেশ পবিত্র করিতেছে।[২৫]

✓ স্কন্ধাবার ও বিজয়পুর রাজধানী (৩৬ শ্লোক)—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে স্কন্ধাবার ও বিজয়পুর রাজধানী একই স্থানে স্থিত।[২৬] আমাদের মনে হয়, 'দৃষ্টা' এবং 'অধিগচ্ছেঃ' এই দুইটি ক্রিয়াপদ ব্যবহার দ্বারা ইহারা যে দুইটি পৃথক্ স্থান, তাহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই ভুবনবিজয়ী রাজার স্কন্ধাবার অর্থাৎ সেনানিবাস নিশ্চয়ই একটি দর্শনীয় স্থান ছিল। তাই সম্ভবতঃ কবি পবনকে স্কন্ধাবার দর্শন করিয়া রাজধানীতে যাইতে বলিয়াছেন। এই বিজয়পুরের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন,—ইহা নদীয়া, আবার কেহ বলেন,—ইহা রাজসাহী জেলার দেওপাড়ার সন্নিকটস্থ বিজয়নগর। এখন এই উভয় মতের সপক্ষে ও বিপক্ষে কি কি প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা বিচার করা যাউক। পবনদূত হইতে আমরা বিজয়পুর সম্বন্ধে দুইটি বিষয় অবগত হই। প্রথমতঃ ইহা পবনদূতের বর্ণনাকালে লক্ষ্মণসেনদেবের রাজধানী ছিল, দ্বিতীয়তঃ 'গঙ্গাবাত' শব্দ দ্বারা ইহার গঙ্গার সান্নিধ্য সূচিত হইয়াছে।

যমুনা বর্ণনার পরই বিজয়পুরের উল্লেখ করা হইয়াছে, সুতরাং এই স্থান যমুনার পরে, এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। ইহা যমুনার অনতিদূরেও হইতে পারে, দূরেও হইতে পারে। নদীয়ার ভাগীরথীতীরস্থ বামনপুকুর গ্রামে একটি ঢিবি ও দীঘিকে প্রবাদ বল্লালসেনের নামের সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা ঐ স্থানে রাজধানী থাকা প্রকাশ পায় না। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ নদীয়াকে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বলিয়াছেন। কিন্তু মনে হয়, ইহা তাঁহার শেষ বয়সের রাজধানী বা গঙ্গাবাসের স্থান। উহা যে পবনদূত-বর্ণিত ঘটনার সময়েও অর্থাৎ লক্ষ্মণসেনের দিগ্‌বিজয়ের পর প্রথম বয়সেও তাঁহার রাজধানী ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। বিজয়পুর যে নদীয়ার আর একটি নাম, আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই।

নামসাদৃশ্যহেতু বিজয়নগর ও বিজয়পুর এক স্থান হওয়া সম্ভবপর। এই স্থানও যমুনার পরে, কিন্তু নদীয়ার ন্যায় অত নিকটে নহে। বিজয়পুর গঙ্গাতীরে অবস্থিত। কিন্তু বিজয়নগর পদ্মাতীরে। পদ্মাকে হয় ত অনেকে গঙ্গা বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী হইবেন না। তবে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পদ্মাবতী বা পদ্মাকে জহ্নুকন্যা এবং গঙ্গার ভগিনী বলা হইয়াছে। খোদিত লিপি এবং কুলজীতে পদ্মাকে গঙ্গা বলিয়াই বর্ণিত হইতে দেখিতেছি। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির তিনিভেলী জেলায় প্রাপ্ত একখানি খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, মহারাজ জটিলবর্ম্মা ত্রিভুবনচক্রবর্ত্তী কুলোত্তুঙ্গ পাণ্ড্য ১৩৮৮ শকে (১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার পরমাচার্য্য মহাগণপতিনয়িনার বামদেবকে কতক জমি দান করিয়াছিলেন। এই

২৫। বায়ুপুরাণ (বঙ্গবাসী সং), ৪৭ অধ্যায়, ৩৭-৪১ শ্লোক; মৎস্যপুরাণ (ঐ), ১২১ অধ্যায়, ৫০ শ্লোক।

২৬। পবনদূত, Introduction p. 25.

আচার্য্যের পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে যে, ইনি উত্তরাপথের গঙ্গার উত্তরতীরস্থ গৌড়রাষ্ট্রের বরেন্দ্র গ্রামস্থ আমর্দ্দাশ্রমাচার্য্যের শিষ্য।[২৭] এই স্থানে যে পদ্মাকেই গঙ্গা বলা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। আবার বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় দেখা যায়, ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওঝা রাজা ধর্ম্মপালের নিকট হইতে 'অমরধুনীতীরদেশে' ধামসার নামক গ্রাম যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[২৮] রায় বাহাদুর যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তিপ্রণীত কুলশাস্ত্রদীপিকায় (২০২ পৃষ্ঠায়) ধামসার বাগছি বংশের একটি কুলস্থান বলিয়া লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এই স্থান বরেন্দ্র দেশে। বরেন্দ্রের এই 'অমরধুনী' পদ্মা ভিন্ন আর কোন্ নদী হইতে পারে ?

পদ্মা যে এক সময়ে গঙ্গা নামে অভিহিত হইত, তাহার আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকরনন্দিবিরচিত রামচরিতে (৩।১০) রামপালের রাজধানী রামাবতী সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—'অপ্যভিতো গঙ্গাকরতোয়া-প্রবাহপুণ্যতমাম্'। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, রামাবতী গঙ্গা ও করতোয়া নদীর সঙ্গমে অবস্থিত ছিল। করতোয়া কোন সময়ে ভাগীরথী গঙ্গায় পতিত হইত, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ে করতোয়া যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে, যমুনা আবার পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। ভ্যান্‌ডেন ব্রুকের মানচিত্রে করতোয়াকে পদ্মার সহিত মিলিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং রামচরিতে বর্ণিত এই গঙ্গা যে পদ্মা, তাহা অনুমান করা বোধ হয়, অন্যায় হইবে না।

শ্রীযুত চিন্তাহরণ বাবু সম্পাদিত ও সম্প্রতি প্রকাশিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথি-শালায় রক্ষিত সংস্কৃত পুথির বিবরণীতে[২৯] দেখা যায়, 'শাখাবর্ণন' নামক পুথির শেষে বিভিন্ন দেশে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যশাখা বিস্তার প্রসঙ্গে বরেন্দ্রকে 'পারেগাঙ্গং' বলা হইয়াছে। যথা,—

"রাঢ়ং বঙ্গং সুগৌড়ং ব্রজমথ মগধং চোৎকলং রাজকঞ্চ।
পারেগাঙ্গং বরেন্দ্রং গিরিজমপি তথা বৃদ্ধকঙ্কালকঞ্চ॥"

এই 'পারে গাঙ্গং' (পারেগঙ্গং ?) বিশেষণ দ্বারা বরেন্দ্র দেশ যে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই গঙ্গা, পদ্মা ভিন্ন আর কোন নদী হইতে পারে না।

২৭। "উত্তরাপথস্তু গঙ্গোত্তরতিরস্তু গৌড়রাষ্ট্রগৌতমগোত্রস্তু ব্রাহ্মণস্থস্ত্রস্তু।
বরেন্দ্রীগ্রামস্তু সাবিত্রগোত্রং আমর্দ্দাশ্রমাচার্যাযুদ্ধমদোনস্তিল" ইত্যাদি (Report of the Asst. Archaeological Supdt. for Epigraphy, Southern Circle, for 1917-18, App. B. No 569. p. 56).

২৮। "রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখমমরধুনীতীরদেশে বিধাতুং
নাম্নাদিগাঞিবিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকনকরজতৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ।"
গৌড়ে ব্রাহ্মণ (১১৭ পৃষ্ঠা) ধৃত বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা ; রাজন্যকাণ্ড, ১৫৬ পৃঃ পাঃ টীঃ।

কবি কৃত্তিবাস তাঁহার আত্মবিবরণে লিখিয়াছেন :—

"এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেন কালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গাপার॥"

রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন বলেন,—'বড় গঙ্গা যশোহরে।'[৩০] যশোহর কবির নিবাস ফুলিয়া গ্রামের পূর্ব্ব-দক্ষিণে, উত্তরে নহে। সুতরাং এই 'বড় গঙ্গাপার' যশোহর নহে। আমাদের মনে হয়, এই বড় গঙ্গা শব্দ দ্বারা পদ্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে সাভারের বিখ্যাত রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র মহেন্দ্রের যে সংস্কৃত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ভাওয়ালের বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে[৩১] :—

"বংশাবতী ব্রহ্মসুতপ্রবিষ্টং।
দক্ষেণ গাঙ্গং স চ ভাবলীনং॥"

এই ভাবলীন বা ভাওয়ালের দক্ষিণে গাঙ্গ বা গঙ্গা ছিল। বর্ত্তমান সময়ে এই স্থানে ধলেশ্বরী বর্ত্তমান। ইহা দ্বারা মনে হয়, ধলেশ্বরী এক সময়ে গঙ্গার প্রাচীন খাত ছিল। ঢাকার নিকটস্থ বুড়ী গঙ্গা নদীর নাম দ্বারাও ইহাকে গঙ্গার প্রাচীন খাত বলিয়া মনে হইতেছে।

উপরোক্ত প্রমাণসমূহ দ্বারা মনে হয় যে, গঙ্গার পূর্ব্বশাখা বহু বার ইহার গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নদীর খাত দিয়া প্রবাহিত হইয়া, সেই সেই নদীর নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অবশেষে পদ্মার খাত দিয়া প্রবাহিত হইয়া পদ্মা নাম ধারণ করিয়াছে। সুতরাং এই প্রমাণে পদ্মাতীরস্থ বিজয়নগর গঙ্গাতীরস্থও বলা যাইতে পারে।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে রামপালের অন্যতম সামন্ত নিদ্রাবলীয় বিজয়রাজ ও বিজয়সেন একই ব্যক্তি[৩২]। নিদ্রাবলী বা নিদ্রালী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের গাঞি, অতএব এই নিদ্রাবলী বরেন্দ্রের অন্তঃপাতী কোন গ্রাম। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, বিজয়নগরের দেড় মাইল দক্ষিণে 'নিদ্রালী' গ্রাম ছিল, এখন তাহা পদ্মাগর্ভে।[৩৩] রামপালের সময় বিজয়সেনের রাজধানী নিদ্রাবলীতে ছিল। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালে পূর্ব্ব-রাজধানীর নিকটে নিজ নামে বিজয়নগর রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিজয়-নগরের নিকটেই দেওপাড়া গ্রামে বিজয়সেনের কীর্ত্তি প্রদ্যুম্নেশ্বর শিব ও প্রদ্যুম্ন সরোবর। পবনদূতে (৫৫শ শ্লোকে) 'প্রাপ্তরাজ্যাভিষেক' বলিয়া উল্লিখিত যুবক লক্ষ্মণসেন পবনদূত রচনার সময় এই পৈতৃক রাজধানীতেই ছিলেন মনে করা অসঙ্গত নহে।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

৩০। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১২৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

৩১। Dacca Review, 1920, বঙ্গবাণী, ১৩৩০, ১১৫ পৃঃ।

৩২। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা ; Studies in Indian Antiquities---Ray

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস

১৩৩৮ সাল হইতে আমি ধারাবাহিকভাবে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি; ১৩৪২ সালের ৪র্থ সংখ্যা পত্রিকায় এই প্রবন্ধ শেষ হয়। কিন্তু পুরাতন সাময়িক পত্র দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রাপ্য, অনেক পত্র-পত্রিকা আমি চোখে দেখি নাই। এই কারণে আমার প্রবন্ধগুলির স্থানে স্থানে ক্রটিবিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। নূতন অনুসন্ধানের ফলে এই সকল ক্রটি ক্রমশঃ নজরে পড়িতেছে।* সম্প্রতি ১৮৫৮ সনের কতকগুলি 'সংবাদ প্রভাকর' ও ১৮৬০ সনের কতকগুলি 'সোমপ্রকাশ' শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহায়তায় ঢাকার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। এই পত্রিকাগুলিতে কয়েকখানি বাংলা সাময়িক পত্র সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ আছে। এই সংবাদগুলির পরিচয় দেওয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই নূতন তথ্যের বলে আমার পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধের কোন-কোন অংশের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইবে।

কলিকাতা বার্ত্তাবহ

'কলিকাতা বার্ত্তাবহ' নামে একখানি সংবাদপত্র ১৮৫৮ সনের ১৮ই জানুয়ারি (৬ মাঘ, ১২৬৪) প্রকাশিত হয়। ১লা বৈশাখ, ১২৬৫ (১৩ এপ্রিল, ১৮৫৮) সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ:—

> "সন ১২৬৪ সালের সমস্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ।...৬ মাঘ দিবসে 'কলিকাতা-বার্ত্তাবহ' নামে একখানি নূতন সমাচার পত্র প্রকাশ হয়।"

'কলিকাতা বার্ত্তাবহ' প্রতি সোম ও শুক্রবারে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পরদিন 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন:—

> " 'কলিকাতা বার্ত্তাবহ' নামক অভিনব বাঙ্গালা সমাচার পত্রের প্রথম সংখ্যা আমরা গত দিবস প্রাপ্ত হইলাম, ইহার কলেবর ভাস্করের ন্যায়, প্রতি সোমবার এবং শুক্রবাসরে প্রকটিত হইবেক, মাসিক মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র। প্রথম সংখ্যায় কয়েকটি বিষয় কেবল গদ্যে লিখিত হইয়াছে, রচনা অতি উত্তম, প্রার্থনা করি পরমেশ্বরের কৃপায় সম্পাদক কৃতকার্য্য হইয়া সাধারণের প্রিয় হউন।"
> ('সংবাদ প্রভাকর,' ১৯ জানুয়ারি, ১৮৫৮)

---

* ১৩৩৮ সালের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (পৃ, ১৭৭) আমি লিখি, "অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র প্রথম স্থাপিত হয়।" 'ভারতবর্ষে' কথাটির স্থলে 'বাংলা দেশে' লেখা উচিত ছিল। কারণ, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জেহইট পাদ্রীরা ইউরোপ হইতে মুদ্রাযন্ত্র আনাইয়া গোয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং এই মুদ্রাযন্ত্রে ১৫৫৭ সনে সেন্ট ফ্রানসিস্ জেভিয়ার-রচিত পর্ত্তুগীজ ভাষায় একখানি 'ক্যাটিকিজম' মুদ্রিত হয়— [illegible] ইহাই প্রথম বই। "The First Printing Presses in India."—Leo

বিচারক

'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৫৮ সনের জানুয়ারি (?) মাস হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম তিন সংখ্যা হস্তগত হইবার পর ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' যে মন্তব্য করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

> " 'বিচারক' নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক পত্রের ১ হইতে ৩ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, বিচারক তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই অনুষ্ঠানটি অতি সদনুষ্ঠান বটে। প্রতিজ্ঞা এবং উৎসাহকে স্থিররূপে রক্ষা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখের বিষয় হইবে। সম্পাদক মহাশয় কি জন্য আপনার নামটি গোপন করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলাম না।"

হিতৈষিণী পত্রিকা

'হিতৈষিণী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা কলিকাতা হাড়কাটা লেনস্থ হিতৈষিণী সভার মুখপত্র ছিল। এই সভার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন কানাইলাল পাইন। ১৭৭৯ শকের ফাল্গুন মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয় :—

> "হিতৈষিণী সভা হইতে আগামী বৈশাখ মাসাবধি প্রতিমাসে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক পত্র প্রয়োজন মতে ইংরাজী কিম্বা বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। তাহার প্রতি খণ্ডের মূল্য এক পয়সা মাত্র। .."

কিন্তু 'হিতৈষিণী পত্রিকা' ১২৬৫ সালের আষাঢ় (জুন ১৮৫৮) মাস হইতে প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ১৮৫৮ সনের ২১ জুন (৮ আষাঢ়, ১২৬৫) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে প্রকাশ :—

> " 'হিতৈষিণী পত্রিকা' নাম্নী এক মাসিক পত্রিকার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইলাম, ইহা কলিকাতাস্থ হিতৈষিণী সভা কর্তৃক প্রকাশিত, ইহার পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র আটপেজি ফরমার অর্দ্ধ ফরমা অর্থাৎ ৪ পৃষ্ঠা মাত্র। সাধারণ মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার কথা, এই পত্রিকার উদ্দেশ্য এবং যাহাতে অধন সধন সকলে ইহা পাঠ করিতে পারে, তজ্জন্য ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য ১ পয়সা মাত্র নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। এক্ষণে পঞ্চোপাসনা প্রচার বিষয়ে একটী প্রস্তাব প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত হইয়াছে, ইহার রচনা প্রণালী অতীব সুন্দর।"

মনোরঞ্জিকা

১৮৬০ সনের জুন মাসে (আষাঢ় ১২৬৭) ঢাকার বাঙ্গলা যন্ত্রালয় হইতে 'মনোরঞ্জিকা' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ইহার সম্পাদক ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

কেদারনাথ মজুমদার ও আরও কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার সর্ব্বপ্রথম সাময়িক পত্র 'মনোরঞ্জিকা' প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই উক্তির মূলে কোন সত্য নাই। 'মনোরঞ্জিকা' প্রকাশের এক মাস পূর্ব্বে (জ্যৈষ্ঠ, ১৭৮২ শক) হরিশ্চন্দ্র মিত্র ঢাকা

বাঙ্গলা যন্ত্র হইতে 'কবিতাকুসুমাবলী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ; এই কাগজখানিকেই ঢাকার সর্ব্বপ্রথম বাংলা সাময়িক পত্র বলা উচিত। 'মনোরঞ্জিকা' যে ১২৬৭ সালের আষাঢ় (জুন ১৮৬০) মাসে প্রকাশিত হয়, তাহা 'সোমপ্রকাশ' পত্রের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে স্পষ্ট জানা যাইবে :—

"মনোরঞ্জিকা।—বর্ত্তমান আষাঢ় মাস অবধি ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রালয় হইতে মনোরঞ্জিকা নামে এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে মুদ্রাযন্ত্র, আধুনিক যুবকসম্প্রদায় ও তাড়িত বার্ত্তাবহ এই তিনটি বিষয় লিখিত দৃষ্ট হইল। সম্পাদকেরা উত্তম বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহারা ভূমিকা মধ্যে লিখিয়াছেন "পরাপবাদ ও পরদোষ কীর্ত্তন করিয়া পত্রিকা খানি কলঙ্কিত ও অপবিত্র করিবেন না"। তাঁহারা যদি এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত না হইয়া ঈদৃশ সদর্থ ও মহোপকারক বিষয় দ্বারা পত্র পরিপূরিত করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পত্রিকার মনোরঞ্জিকা এই নাম অন্বর্থ হইবে সন্দেহ নাই।" ('সোম-প্রকাশ,' ২০ আষাঢ় ১২৬৭, ২ জুলাই ১৮৬০)

রাজপুর পত্রিকা

'রাজপুর পত্রিকা' নামে একখানি সাময়িক পত্র ১৮৬০ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহা খুব সম্ভব মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকা সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' ২৪ সেপ্টেম্বর (১৮৬০) তারিখে লেখেন :—

"এ সপ্তাহেও এক খানি নূতন গ্রন্থ ও এক খানি নূতন পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।...

পত্রিকাখানির নাম রাজপুর পত্রিকা। ইহা...আমাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই বটে কিন্তু ইহা পাঠ করিয়া আমরা বিরক্তচিত্ত হই নাই। ইহা যথার্থ বাঙ্গলা ভাষার রীতিতে প্রণীত হইয়াছে। বাঙ্গলাভাষার বিশুদ্ধ রীতিতে লিখিত বলিয়া কোন স্থানে অর্থ প্রতীতির ব্যাঘাত জন্মে নাই। অনেক বাঙ্গলা পত্রিকা ও গ্রন্থে এ গুণ দুর্লভ। ইহাতে কয়েকটি বিশেষ দোষ লক্ষিত হইল। কিন্তু পত্রিকা প্রচারয়িতাদিগের প্রথম আরম্ভ বলিয়া তাহা ধর্ত্তব্য নহে। আমাদিগের দেশের যেরূপ রীতি আছে, প্রাথমিক অনুরাগ দীর্ঘতরকালস্থায়ী হয় না। উক্ত পত্রিকা সম্পাদয়িতারা যদি সেইরূপ বীতরাগ ও শিথিলযত্ন না হন, আমাদিগের বোধ হইতেছে, ইহার উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হইবেন।"

নবব্যবহার সংহিতা

ঢাকার সদর আমীন আদালতের উকীল রামচন্দ্র ভৌমিক আইন-কানুন সংক্রান্ত একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশে ইচ্ছুক হইয়া ১৮৬০ সনের আগষ্ট মাসে ইহার অনুষ্ঠান-পত্র প্রচার করেন। এই অনুষ্ঠান-পত্র পাইয়া 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

"ঢাকার সদর আমীনের অন্তর্গত উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক প্রতিমাস-

প্রকাশিত গবর্ণমেণ্ট গেজেট হইতে নানাবিধ আইন ও সরকুলর অর্ডর প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ব্যবহার সংহিতা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহার অনুষ্ঠান পত্র প্রচারিত হইয়াছে। আমরা উহার এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য অগ্রিম দিলে ৪, অন্যথা ৫ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।" ('সোমপ্রকাশ,' ১২ ভাদ্র, ১২৬৭। ২৭ আগষ্ট, ১৮৬০)

১২৬৭ সালের ভাদ্র মাসে (আগষ্ট ১৮৬০) নবব্যবহার সংহিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশ :—

> "ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্র হইতে নবব্যবহারসংহিতা প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা উহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি।" ('সোমপ্রকাশ,' ২৬ ভাদ্র, ১২৬৭। ১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৬০)

বিজ্ঞান কৌমুদী

'বিজ্ঞান কৌমুদী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১৮৬০ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাস হইতে প্রকাশিত হয়। জগমোহন তর্কালঙ্কার ইহার সম্পাদক ছিলেন বলিয়া জানা যায়।* ১৮৬০ সনের ১৪ই অক্টোবর (৩০ আশ্বিন, ১২৬৭) 'সোমপ্রকাশ' এই পত্রিকা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "বিজ্ঞান কৌমুদী নামে একখানি নূতন পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনাই এতৎপত্র প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্য অন্য বিষয়ও ইহাতে লিখিত দৃষ্ট হইল। প্রথম বারের পত্রে যে কয়েকটি বিষয় লিখিত হইয়াছে, আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম, সকলগুলিই শ্রেয়স্কর। এতৎ পাঠে পাঠকগণের সবিশেষ উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে।..."

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল*

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের দুইখানি খণ্ডিত পুথি অনেক দিন হইতেই সংগৃহীত আছে।[১] যে কালে পুথি দুইখানি সংগৃহীত হয়, সেই সময় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিপ্রদাসের কাব্যের উপর একটি মন্তব্য এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন।[২] তাহার পর ১৩১৫ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (পৃঃ ৩৬।৩৭) স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সপ্তগ্রাম" শীর্ষক প্রবন্ধে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের উল্লেখ করেন এবং উহার কিঞ্চিৎ অংশও প্রবন্ধমধ্যে উদ্ধৃত করিয়া দেন। পরে মুন্শী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক ১৩২০ সালে প্রকাশিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যায় (পৃঃ ২২) বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল হইতে কবির পরিচয় ও রচনাকাল-জ্ঞাপক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেন এবং অন্য একাধিক পুথির অস্তিত্বের সংবাদও দেন। এতৎ সত্ত্বেও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য লইয়া যাঁহারা অদ্যাবধি গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই নিকট কবি বিপ্রদাস ও তাঁহার এই সুপ্রাচীন কাব্যখানি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত, অনাদৃত অথবা অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান আলোচনায় এই অজ্ঞাতপ্রায় সুপ্রাচীন কবির কাব্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

১৪১৭ শকে অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্রদাস মনসামঙ্গল রচনা করেন। তখন হুসেন শাহ্ গৌড়ের সুলতান।

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ে সুলতান ॥[৩]

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে প্রাপ্ত কালজ্ঞাপক পয়ারের সঙ্গত পাঠটি যথার্থ হইলে উহা বিপ্রদাসের কাব্যের ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।

বিপ্রদাসের পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। কবিরা চারি সহোদর ছিলেন। জাতিতে ব্রাহ্মণ, সামবেদীয়, কৌথুমী শাখা, বাৎস্য গোত্র, পঞ্চ প্রবর, পিপ্‌লাই গাঁই। বহুদিন ধরিয়া

---

* ১৩৪৩।১৭ই ভাদ্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। পুথি দুইখানির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫২৯ এবং ৩৫৩০।

২। J. A. S. B, Pr....১৮৯২ পৃঃ ১৯৩-৭।

৩। পুথিতে আছে,—

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহি সকল পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের সুলক্ষণ ॥—প্রথম পুথি।
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহি সক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সা গৌড়ে সুলক্ষণ ॥—দ্বিতীয় পুথি।

'সুলক্ষণ' শব্দের কোন অর্থ হয় না ; ইহা 'সুলতান' শব্দেরই বিকৃতি মনে করিয়া সংশোধিত করিয়া দেওয়া

ইহাঁদের বাদুড়্যা (বাসুড়্যা ? নাদুড়্যা ? নমুড়্যা) বটগ্রামে বসতি। এ বিষয়ে কবির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

মুকুন্দ পণ্ডিতসুত বিপ্রদাস নাম।
চিরকাল বসতি বাদুড়া[৪] বটগ্রাম॥
বাৎস্য গোত্র পিপিলাই পঞ্চ প্রবর।
সাম বেদ কৌথুম শাখা চারি সহোদর॥[৫]

বাসুড়্যা বা নাদুড়্যা ইত্যাদি নামে কোন গ্রামের সন্ধান পাই নাই। তবে বসিরহাট অঞ্চলে, কলিকাতা হইতে আনুমানিক সতের আঠার ক্রোশ দূরে বাদুড়ে গ্রাম আছে এবং তাহার সন্নিকটে বড়গাঁ বা বটগ্রামও আছে, সন্ধান পাইয়াছি। কবি বারাসত-বসিরহাট অঞ্চলের লোক ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির দুইখানি পুথিই বারাসতের নিকটবর্ত্তী দত্তপুখরিয়া (আধুনিক দত্তপুকুর) গ্রামে অনুলিখিত হইয়াছিল। মুন্‌শী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহেব-প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, দত্তপুকুর গ্রামের অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তী ছোট জাগুলিয়া গ্রামের তিন পাড়ায় বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল শ্রাবণ মাসের নাগ পঞ্চমীর দিন হইতে প্রায় নয় দিন ধরিয়া পাঠ করা হইত। জাগুলিয়া গ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে মনসাপূজা এককালে খুব প্রচলিত ছিল, এইরূপ অনুমান হয়। বিপ্রদাসের মতে মনসার এক নাম "জাগুলি"।[৬] ইহা হইতে "জাগুলিয়া" নামের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব।

কাব্যরচনার হেতু ও কাল কবি এইরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে॥
পাঁচালী রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ[৭]।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ[৭]॥
কবি গুরু ধীর জনে করি পরিহার।
রচিল পদ্মার গীত শাস্ত্র অনুসার॥
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ে সুলতান॥
হেন কালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত।
শুনিয়া ত্রিবিধ[৮] লোক পরম পিরীত॥
পদ্মাবতীচরণসরোজমধুলোভে।
দ্বিজ বিপ্রদাস তথি ভৃঙ্গরূপে শোভে।

দুইখানি পুথিরই প্রথম পাতাখানি পাওয়া যায় নাই। পুথি দুইখানিতে বন্দনারূপ অনুক্রমণিকা অংশের যেটুকু বর্ত্তমান আছে, তাহাতে সামান্য কিছু অসামঞ্জস্য দেখা যায়। প্রথম পুথির প্রাপ্ত অংশের আরম্ভ এইরূপ,—

স্বর্গরাজ ধ্বজা তেজা (?) অষ্টাদশভুজা॥
রিদ্ধি সিদ্ধি নিধি বরপ্রদা সেই সার।
পারিষদগণ বন্দোঁ কার্ত্তিক কুমার॥
ডাকিনী যোগিনী বন্দোঁ মোর ধর্ম্মমা।
মোর অঙ্গে কোন কালে না করিহ ঘা।॥

৪। ৩৫২৯ সংখ্যক পুথিতে 'বাদুড়া' অথবা 'বাসুড়া' পড়া যায়। ৩৫৩০ সংখ্যক পুথিতে 'নদুড়্যা' অথবা 'নমুড়া' পড়া যায়; স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'নক্ষভ্যা' পড়িয়াছিলেন [ব-সা-প-প, ১৫, পৃ ৩৬]। মুন্‌শী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহাশয় 'নাঁদুড়ে' পাঠ ধরিয়াছেন [পৃ ২২]।

৫। ৩৫২৯ সংখ্যক পুথিতে এই ছত্রটি বাদ পড়িয়াছে। অপর পুথির পাঠ এইরূপ,—
শ্যাম বেদ কুতুর সাখা চারি সহোদর॥

৬। জাগিয়া জাগুলি নাম সীজবৃক্ষে স্থিতি।

৭। দ্বিতীয় পুথিতে যথাক্রমে 'আদেশে' 'বিশেষে'।

৮। প্রথম পুথিতে 'ত্রীবিদ,' দ্বিতীয় পুথিতে 'ত্রিবিধি'।

ইন্দ্র অগ্নি যম নৈরি[৯] বরুণ আনল।
কুবের ঈশান আর বন্দোঁ দিকপাল॥
রবি শশী ভৌম বুধ গুরু শুক্র শনি।
রাহু কেতু নবগ্রহ বন্দোঁ পুটপাণি॥
নারদাদি ঋষি বন্দোঁ সিদ্ধ বিদ্যাধর।
নানা স্থানে নানা মূর্ত্তি বন্দোঁ জোড়কর॥
জরৎকারু[১০] মুনি বন্দোঁ তপোতেজোময়।
আস্তীক কু[মা]র বন্দোঁ পদ্মার তনয়॥
নেতোর চরণ বন্দোঁ পদ্মার নন্দিনী।
সর্ব্বনাগগণ বন্দোঁ সকল নাগিনী॥
দ্বিজ গুরু প্রণমহোঁ[১১] জনকজননী।
যাহার প্রসাদে ভোগ সম্ভবে অবনী॥
ভাবক সেবকে বর দেহ বিষহরি।
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে করজোড় করি॥

দ্বিতীয় পুথির প্রাপ্ত অংশের আরম্ভ এইরূপ,—

ভকতি মুকতি হয় যাহার সঙ্গে॥
সাগরের পুত্রগণ অন্বেষণ অশ্ব[১২]।
কপিলের[১৩] শাপে তারা হইয়াছিল ভস্ম॥
ভগীরথ ভাগীরথী আনিয়া অবনি।
পরশে পরমপদ পাইল তখনি॥
ত্রিভুবনে কেবা জানে গঙ্গার মহিমা।
বিধি বিষ্ণু হর আদি না জানে মহিমা॥
কিঞ্চিৎ মহিমা বুঝি জানে গঙ্গাধর।
অদ্যাবধি আছে গঙ্গা মস্তক উপর॥
দ্বিজ গুরু প্রণমহোঁ[১৪] জনকজননী।
যাহার প্রসাদে ভোগ সম্ভবে অবনি॥
ভাবুক সেবকে বর দেহ বিষহরি।
দ্বিজ বিপ্রদাসে বলে করজোড় করি॥

প্রথম পুথি হইতে উদ্ধৃত অংশটি কোন গায়কের প্রক্ষেপ বলিয়াই মনে হয়। ইহার পর উভয় পুথির মধ্যে আর বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য নাই। ইহার পরের অংশটিতে মনসার সর্পসজ্জার বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে যে সাপের নামের তালিকা পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীন বলিয়া মূল্যবান্। এই অংশটি নিম্নে তুলিয়া দেওয়া গেল।

জয় জয় বিষহরি বিষধারিভূষণ।
সর্ব্বাঙ্গে শোভে দেবীর নাগ-অভরণ॥
সেবক রক্ষিতে দেবী হইলা সুবেশ।
চিরনিয়া নাগ লৈয়া কুরুনিলা[১৫] কেশ॥
নাইনাড়া নাগে কৈল কবরী প্রতুল।
উদয়কাল নাগেতে খোপার পদ্মফুল॥
অলকাবলি চিত্রনাগ হইলা শোভন।
নীলমেঘতটে যেন[১৬] উদয় তারাগণ॥
সিন্দুরিয়া নাগ হৈল সীমন্তে সিন্দূর।
উদয়গিরি সূর্য্য যেন করিছে মেদুর॥
ধুসরিয়া বোড়া দেবীর হৈল স্তকুন্তলা।
কুইয়া বোড়া হইল দেবীর অভিন্ন চপলা॥
সর্প নাম[১৭] নাগেতে মাথার সিতিপাটী।
নীলমেঘতটে যেন বিজলী দিপতি॥
কালচিতি নাগে দেবীর ভুজযুগ সাজে।
কালিন্দীর হস্তী যেন স্বর্ণগিরি মাঝে[১৮]॥
কালী নাগিনী হৈল নয়নে কজ্জল।
কুবলয়-দলে[১৯] যেন খঞ্জন যুগল॥
কনকচিতি নাগে দেবীর নাসিকা উজ্জ্বল।
কুণ্ডলিয়া নাগে হইল শ্রবণে কুণ্ডল॥
সুরঙ্গ সিন্দুর নাগে অধরের কান্তি।
ধবলিয়া চিতি হইল দশনের পাঁতি॥
এতেক উরগে যদি মস্তক শোভন।
কলেবরে শোভেরে[২০] প্রবল নাগগণ॥

৯। নৈর্ঋত। ১০। পু (পুথির পাঠ) 'জরৎকার'। ১১। পু 'প্রণমহ'।
১২। পু 'অন্যাসন অশ্ব' (বা 'অশ্ম')। ১৩। পু 'কপিলার'। ১৪। পু 'প্রণমহ'।
১৫। 'কুরণিয়া' প্রথম পুথি। ১৬। 'জেন নিলমেঘেতে' ঐ।
১৭। 'সর্পা নামে' প্রথম পুথি; 'সর্ব্বনাম' দ্বিতীয় পুথি।
১৮। পু 'মাঝে'। ১৯। 'দকে' দ্বিতীয় পুথি। ২০। 'দেবির' ঐ।

শ্বেতকর্ণ নাগেতে গলার কেয়াপাতি।
পীতগিরি বেড়ি যেন বহে ভাগীরথী ॥
কণ্ঠে ভূষিত মণি-নাগের দিপতি।
উদয় শিখরে যেন স্বর্ণময় জুতি ॥
হালিয়া নাগ দেবীর হৃদয়ে শোভে হার।
সুমেরু শিখরে জেন বিজুলি ঝঙ্কার ॥
কনকমৃণাল ভুজে বলয়া[২১] প্রকার।
রাজসর্প হৈল দেবীর তাড় অলঙ্কার ॥
শঙ্খলিয়া[২২] চিতি হৈল দুই ভুজে শঙ্খ।
বাহুটী কঙ্কণ হৈল আড়িয়াল বঙ্ক ॥
বিষতিয়া বোড়া হইল অঙ্গুলে অঙ্গুরি।
গন্ধচিতি নাগ দেবীর কুম্‌কুম্ কস্তুরি ॥
মলয়জ নাগ চন্দন শোভে গায়।
তাহার সৌরভ গন্ধ দশদিকে ধায় ॥
[মুকুলিয়া[২৩] বেড়া দেবীর হৃদয় কাঁচলি।
নেতের আঁচলে হৈল নাগ ধনিয়াছলি ॥
উলু বোড়া নাগ দেবীর কাছিয়া চরণ।
বেত আছাড় কটীতটী করিল বন্ধন ॥
নাউডুগি নাগে দেবীর গাথিয়া বসন।
চরণে নূপুর শোভে নাগ অভরণ ॥
কালচিতি নাগে কৈল অঙ্গু[লে] অঙ্গুরি।
আর যত নাগগণ পাএর পাহুলি ॥
নাগ অভরণে দেবী হইলা প্রচণ্ড।
কালনাগিনী তার শিরে ধরে দণ্ড ॥
দুই ভিতে নাগদল ধরিল জোগান।
বাসুকি পঠেন [যত] শাস্ত্র পুরাণ ॥
অনন্ত তক্ষক নৃত্য করেন আপনি।
শঙ্খ মহাশঙ্খ করেন জয়ধ্বনি ॥
সেবকেরে বর দিতে উর মণ্ডপুরী।
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে কর জোড় করি ॥][২৪]

ষোড়শ শতাব্দী বা তাহার পূর্ব্বে রচিত কোন মনসামঙ্গলে মনসার সর্পসজ্জার বিবরণ নাই। কেবল কাণা হরিদত্তের লেখা বলিয়া প্রচলিত একটু অংশে আছে। সেটুকু এই,—

দুই হাতের শঙ্খ হইল গরল শঙ্খিনী।
কেশের জাদ[২৫] হইল এ কাল নাগিনী ॥
সুতলিয়া নাগে কৈল গলার সুতলি।
দেবী বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলি ॥
সিতলিয়া নাগে কৈল সীঁথার[২৬] সিন্দূর।
কাজলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর ॥
পদ্মনাগে কৈল দেবীর সুন্দর কিঙ্কিণী।
বেতনাগ দিয়া কৈল কাকালি কাঁচুলী ॥
কনক নাগে কৈল কর্ণের চাকি বলি।
বিষাতিয়া নাগে দেবীর পায়ের পাশুলি ॥
হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের খোপনা।
সর্ব্বাঙ্গে নিকলে যার অগ্নি কণা কণা ॥
অমৃতনয়ান এড়ি বিষনয়ানে চায়।
চন্দ্র সূর্য্য দুই তারা আড়ে লুকায় ॥[২৭]

তাহার পর বিপ্রদাসের কাব্যে মনসার বিবিধ নামের উল্লেখ ও কারণ দেওয়া হইয়াছে।

[জনম পাতাল পুরী অযোনিসম্ভবা।
নির্ম্মানি জননী মহাদেব তেজসম্ভবা ॥
আপনা আপনি কৈলা জীবের সঞ্চার।
বাসুকি দিলেক বিষ নানা অধিকার ॥][২৮]
উদ্ভবা পাতাল নাম পাতালকুমারী।
নাগদান পাইয়া নাম হইল নাগেশ্বরী ॥
কালিদহে পদ্মবনে হইল উৎপত্তি।
তথির কারণে নাম হৈল পদ্মাবতী ॥
মনেতে জনম জানি দেব ত্রিপুরারি।
তথির কারণে নাম মনসা কুমারী ॥

২১। 'বলয়' প্রথম পুথি। ২২। 'সঙ্কলিয়া' বা 'সঙ্কনিয়া'। ২৩। 'মঙ্গলিয়া' ?
২৪। দ্বিতীয় পুথিতে বন্ধনীস্থিত অংশ নাই। ২৫। পু 'জাত'। ২৬। পু 'সীতার'।
২৭। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় (শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত), প্রথম খণ্ড, ১৭৪-১৭৫ পৃঃ।
২৮। দ্বিতীয় পুথিতে বন্ধনীস্থিত অংশটি নাই।

নিরঞ্জনকায় ভেদ সর্ব্বশাস্ত্র জানী। ব্রহ্মজ্ঞান পায়্যা নাম হইল ব্রহ্মাণী॥
মহাজ্ঞান দিল যদি দেব শূলপাণি। যোগেশ্বরী নাম আর পরম যোগিনী॥
চণ্ডীর বিবাদে নাম হইল মন্দাক্ষী। চণ্ডী জীত্যা নাম হইল বিষপূর্ণ-আখি॥
শুক্লবস্ত্র পরি যবে গেলা বনবাসে। শ্বেতাম্বরী নাম আর সর্ব্বলোকে ঘোষে॥
চণ্ডীর বিবাদে নাম হইল নির্ব্বাসিনী। পর্ব্বতে পার্ব্বতী নাম পর্ব্বতবাসিনী॥
জরৎকারুপত্নী নাম হইল জগদ্গৌরী। পতির বিচ্ছেদে নাম পতিমন্দোদরী॥
জাগিয়া জাগুলি নাম সীজবৃক্ষে স্থিতি। আমি কি বলিতে পারি আমার[২৯] শকতি॥

তাহার পর আত্মপরিচয় দিয়া, কথাবস্তু বিস্তার করিবার প্রারম্ভে কবি 'গ্রন্থানুবাদ' অর্থাৎ সূচিপত্র বা বিষয়বস্তুর সারাংশ বর্ণনা করিয়াছেন,—

প্রথমে কহিব তত্ত্ব শুন নর একচিত্ত
মহাযজ্ঞ করে দেবগণে।
গঙ্গা হরের ঘরে নিরঞ্জন আসি তাঁরে
যেন মতে দিলা দরশনে॥
নাগ ইন্দ্র রক্ষা কাজে কালিদহে দেবরাজে
মনসা জন্মিল যেন মতে।
চণ্ডীর সহিত বাদ হৈল বড়[৩০] পরমাদ
নির্ব্বাসিলা সিজুয়া পর্ব্বতে[৩১]॥
কহিব যজ্ঞের কথা কপিলার নন্দন যথা
বাত্র মনুরথে[৩২] মহারণ (?)।
ব্রহ্মশাপ ইন্দ্রে হইল লক্ষ্মী জলধি গেল
ক্ষীরনদী করিল মথন॥
বিশ্বেশ্বর পশুপতি আসিয়া ত্বরিতমতি[৩৩]
যেন মতে করাইল চেতন।
বিষ বাঁটি দিলা নাগে মনসার বিভা যোগে
জরৎকারু[৩৪] মুনি মহাজন॥
আস্তীক কুমার হৈল নাগ ইন্দ্র রক্ষা পাইল
জন্মেজয় যজ্ঞ নাশ করি।
মায়া পাতিয়া গিয়া[৩৫] রাখালের পূজা লৈয়া
বধিলেন হাসনের পুরী॥
জানু লইল নিজস্থানে হরিল চাঁদোর জ্ঞানে
যেন মতে বধি ধনন্তরি[৩৬]।
ধনা মনা বধ করি চাঁদোর ছ[য়] পুত্র মারি
অনিরুদ্ধ[৩৭] উষা আনি হরি॥
নৃপতি পাটনে যায় লখাই বেহুলা হয়
চাঁদ রাজা আইল নিজ দেশে।
উজানি নগরে গিয়া লখাই বেহুলা বিয়া[৩৮]
এড়িল লোহার গুপ্তবাসে॥
সুতার সঞ্চারে আসি লোহার মন্দিরে[৩৯] বসি
দংশিলেক কালনাগিনী।
মাযাসে[৪০] ভাসিয়া গেল মৃত পতি জিয়াইল
সুরপুরে করিল মেলানি॥
তাহা দেখি চাঁদো রাজা করিল পদ্মার পূজা
লখাই বেহুলা স্বর্গবাসী।
সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গল গীত
বিস্তরে কহিব সপ্ত নিশি॥
এ সব অপূর্ব্ব গীত[৪১] যেই শুনে একচিত
ধন পুত্র সিদ্ধি পুরে[৪২] আশ।
পদ্মাপদ পঙ্কজে পুট চাটু করি ভুজে
বিরচিল দ্বিজ বিপ্রদাস॥

২৯। তোমার ?
৩০। 'দেখ হইল' দ্বিতীয় পুথি।
৩১। 'নির্ব্বাসন দিলেন পর্ব্বতে' ঐ।
৩২। 'ব্রহ্ম মনরথে' (বা 'বথে') প্রথম পুথি।
৩৩। 'আসিয়াত পদ্মাবতি' দ্বিতীয় পুথি।
৩৪। পু 'জরৎকার'।
৩৫। 'মায়া পাতিয়া পদ্মা গিয়া' প্রথম পুথি।
৩৬। 'জেমতে বধিলা ধনন্তরি' ঐ।
৩৭। পু 'অনিরূদ্র'।
৩৮। 'বিভা দিয়া' ২য় পুথি।
৩৯। 'বাসরে' দ্বিতীয় পুথি।
৪০। 'মাদাসে' প্রথম পুথি ; মাযাষ—মঞ্জুষা।
৪১। 'সম্পূর্ণ সিদ্ধি ব্রত' প্রথম পুথি।
৪২। 'হয়' ঐ।

চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে দ্বিতীয় পুথিতে যে যে স্থানের বর্ণনা আছে, তাহাতে যথেষ্ট নূতনত্ব আছে। অনেক পরিচিত স্থানের নাম আছে—তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে কলিকাতার নাম। কলিকাতার নাম এই সর্ব্বপ্রথম পাওয়া গেল। চানকের উল্লেখ আছে। জব চার্ণকের নাম হইতে চানক নাম উদ্ভূত হইয়াছে, এই কথা আধুনিক কালে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। Charnock (চার্ণক) হইতে 'চানক' হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু 'চানক' নামে একাধিক গ্রাম আছে। বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার সীমান্তে 'চানক' নামে গ্রাম আছে। এই গ্রামের শচীনন্দন বিদ্যানিধি ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উজ্জ্বলনীলমণির অনুবাদ করেন। সুতরাং 'চার্ণক' হইতে 'চানক' হইয়াছে, এই অনুমান অযৌক্তিক। সপ্তগ্রামের যে বর্ণনা আছে, তাহা যে পঞ্চদশ শতকের পরবর্ত্তী কালের হইতে পারে না, ইহা স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক অপরিচিত স্থান ও নদী প্রভৃতির উল্লেখও আছে। বর্ণনাটি মূল্যবান্, সুতরাং নিম্নে সমগ্রভাবে উদ্ধৃত হইল।

রাজঘাট রামেশ্বর[৪৩] বাহিয়া এড়ায়।
ধর্ম্মথান বাহিয়া অজয় নদী পায়॥

উজানি[৪৪] বাহিয়া আসি হৈল উপনীত।
শিবানদী[৪৫] সাড়াই[৪৬] বাহিল ত্বরান্বিত[৪৭]॥

উজানি কাটোয়া বাহি রহে ইন্দ্রঘাটে।
(আসি ছাড়িয়া) ইন্দ্রচরণ পূজে সেই নদীতটে॥

ইন্দ্রাণী বাহিয়া নদী যায় উপনীত।
আঁবুয়া[৪৮] ফুলিয়া গিয়া চাপায় বুহিত॥

রন্ধ[ন] ভোজন করি গোঁয়ায় রজনি।
বাহো বাহো বলিয়া ডাকে নৃপমণি॥

বুহিত্র বাহিয়া সুখে চলিল প্রভাতে।
ফুলিয়া বাহিয়া গিয়া হৈল উপনীতে[৪৯]॥

গুপ্তীপাড়া বাহিয়া মির্জ্জাপুর আইসে।
ত্রিবেণী[৫০] লাগায় ডিঙ্গা বলে বিপ্রদাসে॥

নাটক রাগ॥

বুহিত্র চাপায়া কূলে চাঁদ অধিকারী [ব]লে
দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম।
তথা সপ্ত ঋষি স্থান সর্ব্বদেব অধিষ্ঠান
শোক দুঃখ (?) সর্ব্বগুণধাম॥
যতি হয়া একমতি ঋষি মুনি সবে তথি
তপ জপ করে নিরন্তর।
গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশাল অতি[৫১]
অধিষ্ঠান উমা মাহেশ্বরী॥
দেখিয়া ত্রিবেণী গঙ্গ[৫২] চাঁদরাজ মনে রঙ্গ[৫৩]
কূলেতে চাপায়্যা মধুকর।
আনন্দিত মহারাজ করে নৃপ (তি)তীর্থকাজ
ভক্তিভাবে পূজে মহেশ্বর॥
তীর্থকার্য্য সমাপিয়া অন্তরে হরি[ষ] হয়া
উঠে রাজা ভ্রমিয়া নগর।
ছত্রিশ[৫৪] আশ্রমে লোক নাহি কোন দুঃখ শোক
আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর॥

৪৩। বা 'বামেশ্বর'।
৪৪। পু 'উজনি'। পরবর্ত্তী বর্ণনায় 'উজবনি'।
৪৫। পু 'সিবানদি'।
৪৬। 'সাখাই' পরে দ্রষ্টব্য।
৪৭। পু 'ত্বরাত্বতি'।
৪৮। পু 'আবুয়া'।
৪৯। পু 'উপতি'।
৫০। পু 'ত্রিবিনি'।
৫১। পু 'থতি'।
৫২। পু 'ত্রিবিণি গঙ্গো'।
৫৩। পু 'রঙ্গো'।
৫৪। পু 'ছত্তিষ'।

বৈসে যত দ্বিজগণ সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ
তেজোময় যেন দিবাকর।
সর্ব্বতত্ত্ব জানে মর্ম্মে বিশারদ[৫৫] গুরুধর্ম্মে
জ্ঞানগুরু দেবের সোসর॥
পুরুষ মদন যেন রমণী সাবিত্রী হেন
অভরণ সব স্বর্ণময়।
তার রূপ গুণ যত তাহা বা কহিব কত
হেরিতে নিমিক বিলয়[৫৬]॥
অভিনব সুরপুরী দেখি ঘর সারি সারি
প্রতি ঘরে কনকের বারা।
নানা রত্ন অবিশাল জোতিময় কাচচাল
রাজমুক্তা প্রলম্বিত ঝারা॥
সভে দেবে ভক্তিমতি প্রতি ঘরে নানা মূর্ত্তি
রত্নময় সকল প্র[া]সাদে।
আনন্দে বাজায় বাদ্দি[৫৭] শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ আদি
দেখি রাজা বড়ই প্রামাদে[৫৮]॥
নিবসে যবন যত তাহা বা বলি[ব] কত
মোঙ্গল পাঠান মোকাদীম।
সৈয়দ মোল্লা কাজি কেতাব কোরাণ রাজি
দুই ওক্ত[৫৯] করে তছলিম॥
মসিদ মোকাম ঘরে সেলাম বাজায় করে
ক্ষয়তা করয়ে নিত্য[৬০] লোকে।
বন্দিয়া মনসা দেবী দ্বিজ বিপ্রদাস কবি
উচ্চারিয়[া] ভকত সেবকে॥
দিন দুই তথা রহি মেলিল বুহিত।
কুমারহাট গিয়া ডিঙ্গা হইল উপনীত॥
ডাহিনে হুগলী রহে বামে ভাটপাড়া।
পশ্চিমে বাহিল বোরো পূর্ব্বে কাকীনাড়া॥
মুলাজোড়া গাড়ুলিয়া বাহিল সত্বর।
পশ্চিমে পাইকপাড়া রহে ভদ্রেশ্বর॥
চাঁপদানি ডাহিনে বামে ইছাপুর।
বাহ বাহ বলিয়া রাজা ডাকিছে প্রচুর॥
বামে বাকিবাজার বাহিয়া যায় রঙ্গে।
চাপাচানি বাহি রাজা প্রবেশে দিগঙ্গে॥
পুজিল নিমাইতীর্থ করিয়া উত্তম।
নিমগাছে দেখে জবা অতি অনুপাম॥
চানক বাহিয়া যায় বুড়লিয়ার দেশে।
তাহা রামলাল (?) বাহি আকনা মাহেশে॥
খড়দহে শ্রীপাট[৬১] করিয়া দণ্ডবত।
বাহ বাহ বলিয়া রাজা ডাকে আবিরত[৬২]॥
রিসিড়া ডাহিনে রহে বামে সুকচর।
পশ্চিমে হরিষে রাজা বাহে কোননগর॥
ডাহিনে কোতরং বাহে কামারহাটী বামে।
পূর্ব্বেতে আড়িয়াদহ ঘুষড়ি[৬৩] পশ্চিমে॥
চিতপুরে পূজে রাজা সর্ব্বমঙ্গলা।
নিশিদিশি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা॥
তাহার পূর্ব্বকূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা।
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারথা॥
পূজিল বেতাই চণ্ডী চাঁদ দণ্ডধর।
হাসিতে [হাসিতে] সারি[৬৪] গায় নায় নফর॥
নানা উপচারে[৬৫] কৈল রন্ধ[ন] ভোজন।
ধনও (?) বাহিয়া গেল ত্বরিত গমন॥
কালীঘাটে চাঁদ রাজা কালিকা পুজিয়া।
চুড়াঘাট বাইয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া॥
ধনস্থান এড়াইল বড় কুতূহলে।
বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে॥
হেন কালে মনসা ভাবেন মনে মন।
দ্বিজ বিপ্রদাস [কবি] করিল রচন॥

... ...

হুলিয়ার গাঙ্গে বাহি চলিল ত্বরিত।
ছত্রভোগ গিয়া রাজা চাপায় বুহিত॥
তীর্থকার্য্য চাঁদরাজ করিল তথায়।
বদরিকা কুণ্ডে জল লইল নৌকায়॥
তাহার মেলান রাজা বাহে হাথিয়গড়।
শতমুখী বাহি রাজা যায় দড়বড়॥
চৌমুখি[৬৬] বাহিয়া রাজা হরষিতে যায়।
তথায় চাপায়্যা ডিঙ্গা যায় চাঁদরায়॥

৫৫। পু 'বিসাদ'। ৫৬। নিমিষ নাহি লয়? ৫৭। পু 'বাদ্ধি'।
৫৮। পু 'প্রমাদে'। ৫৯। পু 'তাৰ্ত্ত'। ৬০। 'নিতা'?
৬১। পু 'স্রিপাট'। ৬২। পু 'আভিরত'। ৬৩। বা 'ঘুছড়ি'।
৬৪। পু 'সাড়ি'। ৬৫। পু 'উপহারে'। ৬৬। বা 'চৌমুখে'।

শঙ্কর মাধব পুজে হইয়া একমন।
তীর্থকার্য্য শ্রাদ্ধ কৈল পিত্রির তর্পণ ॥
তাহার মেলান ডিঙ্গা সঙ্গমে প্রবেশে।
তীর্থকার্য্য কৈল রাজা পর[ম] হরিষে ॥
দরিয়া প্রবেশ হইল চাঁদোর মধুকর।
নিশিদিশি বাহে অষ্ট প্রহর সত্বর ॥

সাখাই বা সাড়াই নদীর কোন সন্ধান পাই নাই। "বরগ্রামের কিছু দক্ষিণে এখনও শিবা নদী আছে, কিন্তু গঙ্গা দূরে পড়ায় তাহার প্রভাব খর্ব্ব হইয়াছে ও তিনি এক্ষণে শিয়াল-নালায় পরিণত হইয়াছেন[৬৭]।" কোগ্রাম হইতে দুই চারি মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ধরমখান নামে একটি নাতিবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। হয়ত ইহাই ধর্ম্মখান নদীর স্মৃতি বহন করিতেছে। 'আড়িয়ল খান' ইত্যাদি নদীর নামে যে 'খান' শব্দ পাওয়া যায়, তাহা 'খন্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই তালিকায় নদীয়ার নাম না থাকা বিস্ময়কর বটে। সম্ভবতঃ লিপিকার-প্রমাদে ছাড় পড়িয়াছে। চাঁদ যখন পাটনের রাজার নিকট নিজের যাত্রার বিবরণ বলিতেছেন, তখন অবশ্য নদীয়ার উল্লেখ আছে। শ্রীপাট খড়দহের উল্লেখ একটু আশ্চর্য্যের ঠেকিতে পারে। সম্ভবতঃ এই স্থানে কবির গুরুগৃহ ছিল; অন্যথায় এই অংশটি লিপিকারের প্রক্ষেপ বুঝিতে হইবে। কিন্তু পুথিদ্বয়ের কুত্রাপি শ্রীচৈতন্যের অথবা নিত্যানন্দ প্রভুর উল্লেখ দেখা যায় না। তাহা ছাড়া বর্ণনাটি পরবর্ত্তী কালের হইলে শান্তিপুরের উল্লেখ অবশ্যই থাকিত। 'হুগুলি' রূপটি প্রাচীন, পোর্ত্তুগীজের লিখিত Ugulim। চন্দননগর (ফরাসডাঙ্গা) ও চুঁচুড়ার অনুল্লেখ প্রাচীনত্বদ্যোতক। 'নিমাইতীর্থ' বর্ত্তমান বৈদ্যবাটী; ইহার সহিত শ্রীচৈতন্যের কোন সংস্রব নাই। নিমগাছে জবা ফুল ফুটিত, সেই জন্য এই তীর্থের প্রসিদ্ধি ছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে[৬৮] আছে,—"উপনীত হৈল গিয়া নিমাইতীর্থ ঘাটে। নিমের বৃক্ষেতে যথা ওড়ফুল ফুটে॥" এইরূপ আর একটী খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। তাহাও নিম্নে তুলিয়া দিতেছি।

পটমুঞ্জরি ॥
অবধান কর নৃপমণি।
মধুকরে অহর্নিশি সলিলে ভাসিয়া আসি
দিগবিদিগ নাহি জানি ॥
নানা দুঃখ ক্লেশ পাইয়া পুর্ণিত বুহিত নাইয়া
অবিলম্বে আসি তব পুরী।
প্রথমে বাহিনু জান রামেশ্বর ধর্ম্মথান
অজয়া বিজয়া সুরেশ্বরী ॥
উজবনি ক্রমে বাই শিবানদী শাখাই[৬৯]
ওধানপুর বাই ইন্দ্রেশ্বর।
বাহিনু নদীয়া দিয়া আঁবুয়া[৭০] ফুলিয়া বায়া
ত্রিবেণী[৭১] প্রবেশ মধুকর ॥

নানা গন্ধি(?) বায়া আসি কালিদহে পরবেশি
তথা কানি[৭২] পাতে অবতার।
আলিকে (?) নাগগণ ত্রাস পায় সর্ব্বজন
শুন মিতা বিক্রম আমার ॥
হেতালের বাড়ি ধরি ডাকিনু বিক্রম করি
নাগগণ পালায় সকল।
ভাঙ্গিয়া মণ্ডপঘর ভরা দিনু মধুকর
সাগরে দিলাম দরশন ॥
দরিয়ায় পরবেশি নাহি জানি দিবানিশি
বাহি আমি অষ্ট প্রহর।
উড়িয়া বিহগ বুলে ছই ঘর মানুষ গিলে
তাহা দেখি কাঁপে প্রাণেশ্বর ॥

৬৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৯৬।

৬৮। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণ, পৃঃ ৬৪০।

৬৯। 'সাড়াই' পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য। ৭০। পু 'আবুয়া'। ৭১। পু 'ত্রিবিনি'। ৭২। বা 'কালি'।

কাঁকড়া জোকাই দিয়া শঙ্খ কড়িয়া বায়া
নানা দুঃখ বাহিনু সম্বল।
সিংহল প্রবেশ তথা পদ্মিনী জনমে যথা[৭৩]
সর্ব্বাংশে পুরুষ বিচক্ষণ ॥

এড়াইয়া বহু দেশ তবু রাজ্য পরবেশ
কহিলাম দুঃখের কাহিনী।
দ্বিজ বিপ্রদাস ভণে করি এই নিবেদনে
অন্তকালে তরাইব ভবানী ॥

ওধানপুর বোধ হয়, বর্ত্তমান উদ্ধারণপুর। 'উদ্ধারণপুর' হইতে 'ওধানপুর' হইতে পারে না। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালে 'ওধানপুর' 'উদ্ধারণপুর' এইরূপে শুদ্ধীকৃত হইয়াছে। 'ইন্দ্রেশ্বর' ইন্দ্রাণীস্থিত দেবতা, তাহা হইতে ইহা স্থানের নামও বুঝাইত। প্রথম বিবরণে 'ইন্দ্রাণী' নাম আছে। ইন্দ্রাণীতে ইন্দ্রেশ্বর দেবতার উল্লেখ কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে[৭৪] আছে,—"ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রেশ্বরের পূজা কৈল দিয়া পুষ্পপাণি॥" ১৯২৩ জৈনাব্দের (= ১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দের) একটি লিপিতে 'ইন্দ্রেশ্বর' এই স্থাননামের উল্লেখ আছে[৭৫]।

বিপ্রদাস যখন তাঁহার কাব্য রচনা করেন, তখন ধর্ম্ম ঠাকুরের প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। অনাদ্য তখন দেবের দেব। স্বয়ং শিবও তাঁহার দর্শন লাভের প্রত্যাশায় বলুকার তীরে (?) অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া তপস্যায় নিরত থাকেন, তবুও দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে না। অপর কোন মনসামঙ্গলে ধর্ম্মঠাকুরের এইরূপ প্রভাব বা প্রতিপত্তির উল্লেখ নাই। এই প্রসঙ্গে মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে ধর্ম্মঠাকুর কর্ত্তৃক জগৎসৃষ্টির উপাখ্যান স্মরণীয়। শূন্যপুরাণের তারিখ কি, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। সুতরাং বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে ধর্ম্মপূজার উল্লেখ যদিও প্রাচীনতম না হউক, তথাপি বিশেষ প্রাচীন, ইহা ঠিক। এই হিসাবে নিম্নে উদ্ধৃত মহাদেবের ধর্ম্মধ্যান ও ধর্ম্মের আগমন অংশটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

ধানসি রাগ।

হাথে লইয়া জাপ্যমাল জপ[৭৬] করে চিরকাল
পঞ্চমুখে করেন স্তবন।
ব্রহ্মমন্ত্রে বেদ বলে মুখেতে আনল জ্বলে
প্রকাশিত তিন লোচন ॥
নানা পুষ্প লইয়া করে অনাদ্যের পূজা করে
একচিত্ত ধ্যান অনুক্ষণ।
গলায় রুদ্রাক্ষমাল বিভূতিভূষণ ভাল
বলুকা দেখিতে নিরঞ্জন ॥
মূলমন্ত্র জপ করি ত্রিশূল ডম্বর ধরি
করিলা বিস্তর তপ ধ্যান।
কভু বা যুধুর্থ[৭৭] (?) খায় ভর করি এক পায়
নিরবধি যোগেতে গেয়ান ॥

উর্দ্ধবাহু করি ক্ষণে ক্ষণে নাগ শয়নে
নিদাঘেতে আনল বেষ্টিত।
জলে রহি শীতকালে শিরে ধারা বর্ষাকালে
দ্বিজ বিপ্রদাস বিরচিত ॥

ধবল ছত্র ধরি শিরে দণ্ড কমণ্ডলু করে
উলুকে করিয়া আরোহণ।
ধবল শ্যামলতর শোভে দিব্য কলেবর
হরের আশ্রমে দরশন ॥
ডাকিয়া শিবের তরে কহিয়া[৭৮] মধুর স্বরে
গঙ্গা আছিলা সেই ঘরে।
অতি সুললিত বাণী অভ্যন্তরে গঙ্গা শুনি
উপসন্ন গোসাঞি গোচরে ॥

৭৩। পুথি 'তথা'। ৭৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণ—পৃঃ ৬৩৭।

৭৫। কাঁটোয়ার নিকটে প্রাপ্ত জৈন পিত্তলফলক, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ, পৃঃ [illegible]।

দেখি নিরঞ্জনকায় গঙ্গা চমকিত হয়
করে যোড়ে কৈল পরিহার।
ধর্ম্মের বদন দেখি গঙ্গা ধবলমুখী
রথে ভর কৈল অবতার॥
অন্তরীক্ষে ধর্ম্মরায় গঙ্গে দিল পরিচয়
জানাইহ হরের অগ্রেতে।
দ্বাদশ বৎসর হর আমা পুজে নিরন্তর
আইলাম তাহারে দেখিতে॥
না দেখিল[৭৯] ত্রিলোচন আছিল অনন্যমন
আমারে দেখিল দৃষ্টিবলে।
হের[৮০] বলি সম্বিধান দ্বিজ বিপ্রদাস গান
গঙ্গা বলেন হেন কালে॥

পাঁচালী[৮১]।

শুন প্রভু কৃপানাথ কর অবধান।
তুমি সে কৈবল্য[৮২] গুরু কারুণ্য[৮৩] নিদান॥
সংসার স্থজিয়া গোসাঞি ভার দিলা হরে।
তোমার স্থজন সৃষ্টি দিলা মহেশ্বরে॥
তোমারে দেখিতে হর অনেক সাধনা।
বলুকায় দুঃখ পায় ক্লেশ যাতনা॥
দ্বাদশ বৎসর হর বড় পায় দুঃখ।
তোমা না দেখিয়া[৮৪] হর না ধরিবে বুক॥
অস্থিচর্ম্মসার মাত্র হৈলা দেবরায়।
বারএক দেখা[৮৫] দেহ হইয়া সদয়॥
গঙ্গার উত্তর শুনি বলে নিরঞ্জন।
এই কথা কহিয় আইলে ত্রিলোচন॥
তোমারে দেখিলে হরে[৮৬] সেই দেখা মোরে।
শিরে জটা মেলি যেন লয় তোমা শিরে॥
তবে যদি অতি খেদ করে দেবরায়।
কালিদহে কমল তুলিতে যেন যায়॥
কালিদহে কমল তুলিব মায়াধর।
তবে কন্যারূপ মায়া দেখিবেক হর॥
কহিয়া গেলেন প্রভু গঙ্গা হেট মাথা।
আমি কি বলিব হর এই মন চিন্তা[৮৭]॥
বসিলা ধবল খাটে হইয়া শ্বেতকায়।
ওথা তপ[৮৮] তেজিয়া আইলা দেবরায়॥
সাজি কমণ্ডলু থুইয়া দেব মহেশ্বরে।
ধবল-আকার গঙ্গা দেখিল মন্দিরে॥
দ্বিজ বিপ্রদাসে বলে সকরুণ বাণী।
দেখিয়া গঙ্গার রূপ বলে শূলপাণি॥

এইবার পুথি দুইখানির বিষয় কিছু বলা কর্ত্তব্য। দুইখানি পুথিরই আদ্যন্ত খণ্ডিত। প্রথমটিতে দুইটি মাত্র পালা এবং দ্বিতীয়টিতে নয়টি মাত্র পালা আছে। সর্ব্বসমেত হয় ত বাইশ পালা ছিল। দ্বিতীয় পুথির সমাপ্তি এইরূপ,—

"পদ্মা[র] মায়ায় চাঁদ রহে সেই দেশে।
এখন রহিল গীত বলে বিপ্রদাসে॥

এ পুস্তক শ্রীগোপীনাথ সিংহ সাকিম দত্তপুখরিয়া। সংস্মিদং। শ্রীশ্রীগোপাল সিংহ।" প্রথম পুথির প্রাপ্ত অংশের প্রথম পৃষ্ঠার শেষে আছে,—"স্বঅক্ষর......রাম সিংহ সাকিম দত্তপুখরিয়া।"

পঞ্চদশ শতকের পুস্তক বলিয়া এবং ইহার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট বলিয়া সম্পূর্ণ পুথি না পাওয়া গেলেও বিপ্রদাসের কাব্যের প্রাপ্ত অংশটুকুও প্রকাশের যোগ্য।

শ্রীসুকুমার সেন

৭৯। 'দেখিনু' প্রথম পুথি। ৮০। 'হর' দ্বিতীয় পুথি। ৮১। পুথি 'পাচালি'।
৮২। 'কারন্ত' প্রথম পুথি, 'কার্ব্যা' দ্বিতীয় পুথি। ৮৩। 'কারস্ত' প্রথম পুথি; 'করস্ত' দ্বিতীয় পুথি।
৮৪। 'দেখিলে' দ্বিতীয় পুথি। ৮৫। 'বারেক দর্শন' দ্বিতীয় পুথি। ৮৬। 'হর' প্রথম পুথি।
৮৭। 'কথা' দ্বিতীয় পুথি। ৮৮। 'তপবন' প্রথম পুথি।

উড়িষ্যার বৈষ্ণব-সাহিত্যে চৈতন্যদেবের কথা*

চৈতন্যদেবের কথা লইয়া বিস্তর আলোচনা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। কিন্তু আলোচনার উপাদান শুদ্ধ বাঙ্গালা ধর্ম্ম-সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করিলে চলিবে না। এ বিষয়ে উড়িষ্যার বৈষ্ণব-সাহিত্যকে উপেক্ষা করা উচিত নহে; কারণ, মহাপ্রভু তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের তিন-চতুর্থাংশ কাল উড়িষ্যাতে কাটাইয়াছিলেন ও তাঁহার উড়িয়া শিষ্য ছিলেন অসংখ্য। উড়িয়া ধর্ম্ম-সাহিত্যের বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ যত্ন ও আগ্রহের অভাবে লোপ পাইয়াছে। "আখরিয়া"দের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যে কত পুথির পাঠ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং চৈতন্যদেব সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য উড়িয়া উপাদানের পরিমাণ এখন অল্পই। তবে অল্প হইলেও তুলনামূলক আলোচনার জন্য সেটুকুর মূল্য আছে।

প্রথমেই বলিয়া রাখি, উড়িয়া সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য উড়িয়া পার্ষদগণপরিবৃত অবস্থায় অঙ্কিত হইয়াছেন। এই সাহিত্যে উল্লিখিত গৌড়ীয় ভক্তদের সংখ্যা কম ও তাঁহাদের মহিমা বর্ণনা আরও কম। পক্ষান্তরে, উড়িয়া সাহিত্যে যাঁহারা চৈতন্য-ভক্তদের মধ্যে প্রধান-তম, গৌড়ীয় সাহিত্যে সেই সকল উড়িয়া ভক্তেরা যবনিকার অন্তরালে রহিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যার বৈষ্ণব-সাহিত্য অনুসারে জগন্নাথ, বলরাম, অচ্যুতানন্দ, যশোবন্ত ও অনন্ত দাসই প্রভুর উড়িয়া ভক্তদের মধ্যে প্রধান[১]। উড়িষ্যার চৈতন্য-পূর্ব্ব বৈষ্ণবধর্ম্মকে সংমিশ্রিত (heterogenous) বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বলা উচিত। বৌদ্ধ, শৈব, রামাইত প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সহিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সমন্বয়ে উৎকলীয় জ্ঞানমিশ্র-ভক্তি-মূলক বৈষ্ণবধর্ম্মের সৃষ্টি। চৈতন্যদেব জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিপন্থী বৈষ্ণবদের সহিত বহু সময়ে ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতেন। অচ্যুতানন্দ-রচিত "শূন্যসংহিতা"য় এই কথাই বলা হইয়াছে (১১ম অধ্যায়),—

> "মহাপণ্ডিত শ্রীচৈতন্য গোসাইঁ বেদ বেদান্তরে সার।
> যে যেমন্তে বিদ্যা শখোলা করন্তি পড়ন্তি সেহি প্রকার"॥

দিবাকর দাসের "জগন্নাথচরিতামৃত" গ্রন্থে দেখা যায়, উৎকলীয় জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিপন্থী ও নবাগত শুদ্ধ-ভক্তিপন্থী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। দিবাকরদাস শিষ্য-পরম্পরায় জগন্নাথদাসের ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ বলিয়া পরিচিত। জগন্নাথদাসের বৈষ্ণবোচিত পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া চৈতন্য একদিন—

> ... ... "হরষ হোইলে গোসাইঁ॥
> আপনা শ্রীঅঙ্গ পাছোড়ি শ্রীকর ঘেনি অঙ্গু কাড়ি॥
> দাসঙ্ক শিরে বান্ধি দেলে "অতিবড়" বোলি বোইলে॥
> অতিবড় কথা কহিল তেন্তু "অতিবড়" হোইল॥—(৩য় অধ্যায়)।

---

* ১৩৪০, ১৬ই আশ্বিন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। এই পাঁচ জন "পঞ্চ-সখা" নামে পরিচিত—"অনন্ত অচ্যুত ঘেনি যশোবন্ত বলরাম জগন্নাথ।
এ পঞ্চ সখাহিঁ নৃত্য করি গলে গৌরাঙ্গ চন্দ্র সঙ্গত॥" (অচ্যুতানন্দ দাস-রচিত শূন্যসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।)

"অতিবড়" বোলি বোলন্তে বৈষ্ণবে দুঃখ কলে চিত্তে ॥
ওড়িয়া ব্রাহ্মণঙ্কু রাই বোইলে অতিবড় তুহি ॥
আজি পর্যান্ত সেবা কলুঁ সমস্তে থান পদে গলুঁ ॥"

প্রভু কিন্তু সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও "অতিবড়" উপাধি প্রত্যাহার করিলেন না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা স্থির করিলেন,—

পুরুষোত্তম যেবে থিবা এহি ভাষা সিনা শুনিবা ॥
ওড়িয়া সঙ্গ ছড়াইবা গউড় দেশে চালি যিবা ॥
বোইলে চৈতন্যকু চাহিঁ 'যতি, এক রাজ্যে ন রহি ॥
গয়া গঙ্গাসাগর স্নান কর হে তীর্থ পর্যাটন' ॥
এ বাক্য শুনি শ্রীচৈতন্য সেরূপে কহিলে বচন ॥
'মোহর মনবুদ্ধি ভাবে শরণ জগন্নাথ ঠাবে ॥
জীয়ইঁ অবা মরইঁ জগন্নাথুঁ মো অন্য নাহিঁ' ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা শেষে বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন। প্রতি বৎসর তাঁহারা রথযাত্রার সময় আসিতেন। কিন্তু "অতিবড়" জগন্নাথদাসের প্রাধান্যে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরিয়া যাইতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে দিবাকরদাসের বর্ণনা অতিরঞ্জিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গৌড়ীয় সাহিত্যে জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিপন্থী বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে নীরবতা ও অপর সাহিত্যে মতবিরোধের দরুণ বিকৃত বর্ণনা—এই দুই উল্টা দিকের সামঞ্জস্য করিলে সত্য-নির্ণয়ে সুবিধা হইবে।

উড়িয়া ভাষায় অন্ততঃ তিনখানি চৈতন্য-জীবনচরিতের নাম জানা যায়। "শ্রীমচ্চৈতন্যগীতা" বা চৈতন্য-রামানন্দ-সংবাদ পরমানন্দ ভ্রমরবর-রচিত। এই উড়িয়া পুথিখানির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পুথিখানি শ্রীহরিভক্ত কবিরাজ বাঙ্গালা পয়ারে অনুবাদ করেন ও পরে গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের পিতা সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ মহাশয় বাঙ্গালা অনুবাদটীর মার্জ্জিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। গৌড়ীয় মতাবলম্বী সদানন্দ কবিসূর্য্যব্রহ্ম অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের লোক। তিনি তাঁহার অপ্রকাশিত "মোহনকল্পলতা" পুথির শেষে নিজের রচনাগুলির একটী তালিকা দিয়াছেন। সেই তালিকায় পাই, তিনি চৈতন্য-দেবের বাল্যলীলা অবলম্বনে "ব্রহ্মাণ্ডমঙ্গল" নামে প্রাকৃত ভাষায় একখানি বই লিখিয়াছিলেন,—

"চৈতন্য-জীবন বাল্য-লীলা বিধিমতে ব্রহ্মাণ্ড-মঙ্গল কেবল পরাকৃতে"

এই পুথিখানির একখণ্ড শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট শুনিয়াছি। তৃতীয় জীবনচরিতখানির নাম চৈতন্য-ভাগবত। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতের সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাই। গ্রন্থকারের নাম ঈশ্বর দাস। এই গ্রন্থ ৬৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনার কাল নির্দ্দেশ করেন নাই। এই গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ে চৈতন্যদেব বুদ্ধ অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অথচ সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব-সাহিত্যে বুদ্ধের ঠাঁই নাই[২]।

২। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত "জগন্নাথচরিতামৃত" অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের হাস্য হইতে উদ্ভূত চৈতন্যদেব শেষে রাধাকৃষ্ণের সহিত অভেদাঙ্গ জগন্নাথের মধ্যে লীন হইয়া গেলেন।

কাজেই বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে ঈশ্বরদাসকে আমরা ষোড়শ শতকের শেষ দিকের লোক বলিয়া ধরিব। পুথিখানির ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণও সমস্যার বিষয়। বইখানি অলৌকিক বর্ণনায় পরিপূর্ণ। চৈতন্যের বাল্যলীলা সম্বন্ধে ঈশ্বরদাসের জ্ঞান খুবই কম ছিল। জগন্নাথ বা পুরন্দর মিশ্রের দুই ভাই—নীলকণ্ঠ ও আদিকন্দ। প্রেমবিলাসের চব্বিশ বিলাসে বর্ণিত জগন্নাথ মিশ্রের ভাইদের নামের সহিত এ দুই নাম মেলে না। জগন্নাথের ভগিনীর নাম চন্দ্রকান্তি। স্বয়ং বসুদেব ও দেবকী কলিযুগে জগন্নাথ ও শচীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন (৩য় অধ্যায়)। কারণ, দ্বাপর যুগে দেবকী তাঁহার পুত্রকে পরের হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। শচীরূপে জন্মিয়া তিনি মাতৃহৃদয়ের সেই ক্ষুধা মিটাইলেন। ঈশ্বরদাসের ভাগবতে বিস্তর অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও বইখানির একটী বিশিষ্ট মূল্য আছে। এই ভাগবতে অবসানোন্মুখ বৌদ্ধ চিন্তাধারার সহিত উৎকলীয় সংমিশ্রিত বৈষ্ণব মতবাদের সমন্বয় সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের গুরুপরম্পরা সম্বন্ধে কিছু তথ্য উড়িয়া সাহিত্য হইতে পাওয়া যায়। ইহাতে চৈতন্যসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরায় মধ্বাচার্য্যের নাম পাই। গৌড়ীয় গুরুপরম্পরার সহিত উড়ুপীর মূল উত্তরাঢ়ী মঠে রক্ষিত তালিকার মধ্বাচার্য্য হইতে পাঁচ পুরুষ অধস্তন শিষ্যপরম্পরায় জয়তীর্থ পর্য্যন্ত মিল আছে[৩]। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য গোপালগুরু গোস্বামী প্রথম গুরুপরম্পরা বর্ণনা করিয়াছেন। চৈতন্যদেব কিন্তু প্রকৃতই মাধ্ব-সম্প্রদায়ী কি না, সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠিয়াছে[৪]। এই সন্দেহ দূর হয়, অচ্যুতানন্দ-রচিত "ব্রহ্মবিদ্যাতত্ত্বজ্ঞান" পুথিখানি পাঠ করিলে। এই অপ্রকাশিত পুথি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। শেষের দিকে এক স্থানে অতি সংক্ষেপে ও অন্যত্র কিছু বিস্তৃতভাবে তিনি গুরুপরম্পরা বর্ণনা করিয়াছেন। অচ্যুতানন্দের তালিকা অনুসারে প্রথমে নিরাকার; তার পর যথাক্রমে মহানারায়ণ, নারায়ণ, ভগবান্, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, নারদ, মধ্বাচার্য্য, পদ্মনাভ, নরহরি, মাধবেন্দ্র পুরী, কৃষ্ণ (কেশব) ভারতী, চৈতন্যদেব, সারঙ্গ ঘোষ, শ্যাম ঘোষ। এই সারঙ্গ ঘোষের নাম শূন্যসংহিতা ও গুরুভক্তিগীতাতে উল্লিখিত দেখা যায়। গুরুভক্তিগীতার প্রথম খণ্ডে চৈতন্যদেবকে "নিম্বাদিত্য"সম্প্রদায়ভুক্ত বলা হইয়াছে। নিম্বাদিত্য (নিমানন্দ নামে উল্লিখিত) হইতে হরিব্যাসদেবাচার্য্য পর্য্যন্ত গুরুপরম্পরার অনেকগুলি নাম এই তালিকায় পাই। হরিব্যাসদেবাচার্য্যের পর এই কয়েকটী নাম জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে,—নরহরি, বাসুদেব, চৈতন্য, মাধবেন্দ্র, ঈশ্বরপুরী, চৈতন্যদেব, সারঙ্গ গোসাঁই, শ্যাম ঘোষ। ঈশ্বর দাসও তাঁহার ভাগবতে (৬৫ অধ্যায়ে) গুরুপরম্পরার কয়েকটী নাম দিয়াছেন। যথা,—নারদের শিষ্য মাধবেন্দ্র, তাঁহার শিষ্য বাসবভারতী, তাঁহার শিষ্য পুরুষোত্তম। তার পর একেবারে শ্রীমন্ত আচার্য্য (সন্ন্যাসদীক্ষার পর কেশব ভারতী নামে পরিচিত)।

চৈতন্যদেবের বুদ্ধাবতারত্ব সম্বন্ধে উড়িয়া সাহিত্যে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, এইবার তাহাদের আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীচৈতন্য উৎকলে আসিয়া জগন্নাথের ও পরে বুদ্ধের অবতাররূপে বর্ণিত হইলেন। উড়িষ্যার বৈষ্ণব-সাহিত্য অনুসারে পঞ্চ-সখা দ্বাপর

যুগে শ্রীকৃষ্ণের সহচর ছিলেন। শূন্যসংহিতার দশম অধ্যায়ে পাই, শ্রীকৃষ্ণ—

"বোইলে সুদাম শুণ আম্ভর যে বাণী।
চিন্তারে নিমগ্ন হেলু তুম্ভ পাই' পুণি॥
তুম্ভ আম্ভ সঙ্গ বাবু অন্তর নোহিব।
কলিযুগে বউদ্ধ রূপে রূপকু হেজিব॥
তুম্ভে পঞ্চ সখা থিব আম্ভর সঙ্গরে।
তহি' তুম্ভ আম্ভ ভেট কলপবটরে॥
প্রতাপরুদ্র নৃপতি রাজন হোইবে।
পঞ্চসখা প্রচ্ছিন্ন পরচে স্থান দেবে॥
...   .
প্রভুঙ্কর আজ্ঞা হেলা যাঅ হে সুদাম।
তুম্ভ আম্ভ ভেট পাই কলিযুগে পুণ॥
বউদ্ধরূপরে আম্ভে হোইবু প্রকাশ।
সিন্দুরানন্দ তুম্ভর হোইবটি শিষ্য॥
আম্ভকলা যেনি জন্মি নদীয়া দ্বীপরে।
চৈতন্যরূপে প্রকাশ হইবু যে থরে॥
জগত প্রকটি আম্ভে পতিত উদ্ধারি।
হরিনাম দীক্ষা দেবু ঘরে-ঘরে ফেরি॥
সে বেলরে তুম্ভে আম্ভ সঙ্গতরে থিব।
অচ্যুত নামকু কহি গোকুল তারিব॥
পুণ আম্ভ নিজকলা বউদ্ধ রূপরে।
নির্ণয় চৈতন্যরূপ চতুর্দ্ধা মূর্ত্তিরে" ॥

একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সুদামকে বলিতেছেন,—

"বোইলে অচ্যুত তুম্ভে শুণ আম্ভ বাণী
কলিযুগে বৌদ্ধরূপে নিজরূপ গোপ্য
আম্ভে এহা জাণু হো অচ্যুতানন্দ বাই
তুম্ভে মোর পঞ্চ আত্মা অট পঞ্চজণ
নিরাকার মন্ত্রে থবু দুর্গতি হরিব
...   ...
কলিযুগে বৌদ্ধরূপে প্রকাশিবু পুণি।
এণু যে সকল মুনিজনে দেলে শাপ।
এণু করি প্রকাশিবু এক কলা নেই।
অবতার শ্রেণী যেতে তুম্ভ পাই শুণ।
আপণে তরিণ পুণি পরে তরাইব॥"
...   ...

এই অধ্যায়ের অন্যত্র স্পষ্ট বলা হইয়াছে,—

এণু আজ্ঞা দেলে আদি, অনাদি হে শুণ
আজ্ঞা পাই অনাদি হোইলে অবতীর্ণ
শ্রীচৈতন্য প্রভু নাম অধম উদ্ধার
হরে রাম মহামন্ত্র প্রকট করিলে
পৃথিবী পাতকরাশি কর যা খণ্ডন।
এক অংশ কলা মেনি হোইলে জনম।
প্রকট করিলে নাম কলিযুগে সার।
মূঢ় জ্ঞানী অজ্ঞানী সমস্তে নিস্তরিলে।"

ঈশ্বরদাসের ভাগবতের তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ দেবকীকে বলিতেছেন,—

"অচেত হেউ থিবে প্রাণী।
পণ্ডিত পণে বোধ কহি।
তেণু চৈতন্য নাম ভণি॥
বউধাবতার নাম বহি" ॥

৪৬শ অধ্যায়ে "ভগবান্" অচ্যুতকে বলিতেছেন,—

"বোলন্তি প্রভু ভগবান।
তাঙ্ক চরণে সেবা কর।
*   *
সে নাম প্রকাশ তু কর।
বউধা রূপ মো চৈতন্য॥
ভক্তির পথকু আবোর॥
*   *
সুদাম সখা অঙ্গ মোর" ॥

৫৩ অধ্যায়ে "নিরাকার"রূপী বিষ্ণু বিনোদমিশ্র বিপ্রকে বলিতেছেন,—

"পুণি কহন্তি কম্বুপাণি,
কলিরে মোর অবতার,
আগত ভবিষ্য কাহাণী॥
চইতন্য অঙ্গ নিরাকার॥

এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে শ্রীচৈতন্যকে "বোধাবতার" বলা হইয়াছে। গুরুভক্তি-গীতার তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পটলে পাই, অচ্যুতানন্দ চৈতন্যরূপ ধ্যান করিয়া বউদ্ধপন্থা গ্রহণ করিলেন। উড়িষ্যার বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীআর্ত্তবল্লভ মহান্তী মহাশয়ের মতে, এই গীতা অষ্টাদশ শতকের রচনা ["প্রাচী" সংস্করণের ভূমিকা]। বৈষ্ণব হইয়াও অচ্যুতানন্দ ও ঈশ্বরদাস প্রভৃতি চৈতন্যদেবকে বুদ্ধ বলিয়াছেন। কেন তাঁহাদের ধর্ম্ম-সংস্কারে এ কথা বলিতে বাধে নাই, তাহা বিচার করিতে হইবে।

কালক্রমে উড়িষ্যা হইতে ক্রমে বুদ্ধকল্পনা লোপ পাইল। ফলে বুদ্ধের নামও অবহেলার ফলে বিকৃত আকারে দেখা দিল। একটা উদাহরণ দিই। শূন্যসংহিতার একটী সুপরিচিত মুদ্রিত সংস্করণে "বুদ্ধমাতা" আগাগোড়া "বৃদ্ধমাতা"রূপে ছাপা হইয়াছে! শূন্যসংহিতার কয়েকখানি পুথিতেও বুদ্ধের পরিবর্ত্তে "বৃদ্ধ" (উড়িয়া উচ্চারণ "ব্রুদ্ধ") বসান হইয়াছে দেখিলাম। তবে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে বুদ্ধাবতার কল্পনা, উপস্থিত মাত্র কয়েকখানি গ্রন্থে দেখিতে পাই বলিয়া, এ কল্পনার গুরুত্ব নাই, এ কথা বলা চলে না।

এইবার শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব সম্বন্ধে উড়িয়া গ্রন্থে প্রাপ্ত বৃত্তান্তের আলোচনা করিব। বুদ্ধাবতার কল্পনার সহিত তিরোভাব-কাহিনীর সংশ্রব আছে। শূন্যসংহিতা, জগন্নাথ-চরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত (শুনিলাম, সদানন্দ কবিসূর্য্যব্রহ্ম-রচিত ব্রহ্মাণ্ডমঙ্গলেও) গ্রন্থে তিরোভাব বর্ণিত হইয়াছে। উড়িয়া গ্রন্থকারগণের মতে, মহাপ্রভু জগন্নাথের মধ্যে লীন হইলেন। শূন্যসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে দেখিতে পাই,—

"এমন্তে কেতেহে দিন বহি গলা শুণিমা অপুর্ব রস। মহাপ্রতাপ দেব রাজা যেণিন পাত্র মন্ত্রীমান সঙ্গে।
প্রতাপরুদ্র রাজন বিজে কলে কলারাএটর পাশ॥ হরি-ধ্বনিরে দেউল উছুলই শ্রীমুখ দর্শন রঙ্গে॥
এমন্ত সময়ে গৌরাঙ্গচন্দ্রমা বেড়া প্রদক্ষিণ করি। চৈতন্য ঠাকুর মহানৃত্যকার রাধা রাধা ধ্বনি কলে।
দেউলে পশিলে সখাগণ সঙ্গে দণ্ড কমণ্ডলু ধরি॥ জগন্নাথ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গরে বিদ্যুপ্রায় মিশি গলে॥

দিবাকর দাসের জগন্নাথচরিতামৃতের সপ্তম অধ্যায়ে দেখিতে পাই,—

এমন্ত কহি শ্রীচৈতন্য শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন॥
গোপন হইলে স্বদেহে দেখি কাহার দৃষ্টি নোহে॥
ন দেখি শ্রীচৈতন্যরূপ সর্ব্ব মনরে দুখ তাপ॥
রাজা হোইলে মনে ছন্ন হে প্রভু হেল অন্তর্দ্ধান॥
পুর্ব্বে যহিঁরু আসিথিলে লেউটি তহিঁ প্রবেশিলে॥
অভক্তে ভক্তি সাধিবাকু ভক্তি দেখাইলে ভক্তকু॥
সংসারে ভক্তিগুণ থোই নিজ ধামকু বিজে হোই॥

ঈশ্বরদাসের ভাগবতে 'বোধাবতারে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রস্বর্গারোহণে সর্ব্ব-শুচিনাম পঞ্চষষ্টি অধ্যায়ে' তিরোভাব বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ভাগবত রচনার পর যখন নীলাচলে আসিলেন, তখনও জগন্নাথমন্দিরে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল। ঈশ্বরদাস তাঁহার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি লইয়া মুক্তিমণ্ডপে গিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ

সন্ন্যাসী বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে, চৈতন্যদেব জগন্নাথের অঙ্গে লীন হইয়া গিয়াছেন।

"শ্রীকৃষ্ণ অবতার হোই অচিন্ত্যো শয়ন গোসাঈঁ॥
তদন্তে ত্রৈলোক্য ঠাকুর ধইলে চৈতন্যশরীর॥
কালেক সন্ন্যাসে বিহরি প্রবেশ যাইঁ নীলগিরি॥
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন দেখন্তি সর্ব্ববিশ্বজন॥
যে শাস্ত্র মুক্তি মণ্ডপেণ শুণন্তি সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ॥
য়েমন্ত সময়রে মুঁহি শ্রীপুরুষোত্তম গলই॥
বাসুদেব তীর্থ সন্ন্যাসী আপে সরস্বতী প্রকাশি॥
তাঙ্ক ছামুরে পুন গ্রন্থ প্রকাশ কলে বৈষ্ণবন্ত॥
অনেক বিপ্র তপী জন শুনন্তি মুক্তি মণ্ডপেণ॥
সমস্তে আনন্দে শুনন্তি গ্রন্থকর্ত্তাঙ্কু প্রশংসন্তি॥

* * * *

শুনন্তি আনন্দিত হোই কাহারি অহংগুণ নাহিঁ॥
প্রভু অঙ্গে চইতন্য মিশি তীর্থঙ্ক মনকু ন আসি॥
বৈষ্ণবে প্রমাণ করন্তি সন্ন্যাসী কেহ্নে ন মানন্তি॥
সন্ন্যাসী মতে দেলে চাহিঁ মনরে হসহস হোই॥
তীর্থে যে কহন্তি মধুর বোলন্তি "শুনহে ঈশ্বর॥
পূর্ব্বে যে শাস্ত্র শুনন নাহিঁ য়েবে য়ে শাস্ত্র শুনিলই।
ভক্তিযোগর য়েহুঁ কথা চৈতন্য মঙ্গল বারতা॥
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন কাহুঁ লেখিল য়ে বচন?
য়েহা সঙ্কপি মতে কহ অন্তকু য়ে কথা সন্দেহ"॥

বিদেহ দেশের রাজাও অগস্ত্য মুনির নিকট জগন্নাথে লীন হওয়ার সংবাদ শুনিয়া প্রশ্ন করিলেন,—

চৈতন্য অঙ্গ কেহ্নে যাই মতে যে সন্দেহ লাগই॥
য়েহা সঙ্কপি মতে কহ মন্নু ছড়াও মায়া মোহ॥

এই অধ্যায়েই তিরোভাবের পূর্ণ সংবাদও পাই,—

"এমন্তে গলা কিছি দিন পুনি যাত্রা হোএ চন্দন॥
বৈশাখ তৃতীয়া দিবস চৈতন্য হোইলে সুবেশ॥
কীর্ত্তন মধ্যে বনমালী বড় দাণ্ডরে যাইঁ মিলি॥
অঙ্গতে ছন্তি নৃপরাণ অনেক অছন্তি ব্রাহ্মণ॥
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী সঙ্গতে সহিতে অছন্তি সমস্তে॥

* * * *

তহুঁ বিজয়ে বনমালি সিংহাসনর তলে মিলি॥
দর্শন নীলাদ্রি লোচন সিংহাসনরে শ্রীচৈতন্য॥

নৃপতি অছন্তি ছামুর — দর্শন কৃষ্ণ কম্বুধর ॥
চৈতন্ত আপে জগজ্জ্যোতি — পতিতপাবন শ্রীপতি ॥
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন — প্রত্যক্ষে দর্শন রাজন ॥
ক্রোধ কে তার কহি পারি — অজ্ঞানে সর্ব্ব দেহ ঝারি ॥
সচেত হোই সর্ব্ব জনে — নিত্যানন্দঙ্ক প্রবোধনে ॥
সমস্তে ঘেনি নৃপ সাইঁ — চন্দনযাত্রা যে করই ॥
কহিলে নিত্যানন্দ দাস — বৈকুণ্ঠে বীজে পীতবাস ॥

উদ্ধৃত বর্ণনাটুকুতে লক্ষ্য করা উচিত,—

১। মহাপ্রভু বৈশাখী তৃতীয়া দিবসে অর্থাৎ অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে জগন্নাথের অঙ্গে লীন হইয়া যান।

২। রাজা প্রতাপরুদ্র তিরোভাবঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করিলেন।

৩। রাজা শোকাকুল ভক্তদের লইয়া চন্দনযাত্রা উৎসব শেষ করিলেন।

অগস্ত্য মুনি বিদেহ-রাজকে কিরূপ বুঝাইয়া রাজার মন হইতে মায়ামোহ ছাড়াইলেন, চৈতন্ত-ভাগবতে সে সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে,—শ্রীকৃষ্ণ অরূপ ও অরেখ হইলেও মায়ার ফলে শরীর ধারণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্ত নাম ধারণ করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইলেন ও লীলাবসানে গঙ্গাগর্ভে তাঁহার শ্রীদেহ লীন হইয়া গেল[৫]। জগন্নাথের আজ্ঞায় ক্ষেত্রপাল চৈতন্তের শ্রীদেহ অন্তরীক্ষ দিয়া লইয়া গিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। এখানে গঙ্গা অর্থে সুপরিচিত নদীটী বুঝাইতেছে না। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে দেখি (১২শ অধ্যায়),—রাজা রত্নগ্রীব পুরুষোত্তম দর্শনে আসিয়া গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্থান প্রাপ্ত হইয়া (ক্রমেণ সম্প্রাপ্তো গঙ্গাসাগরসঙ্গমম্) এক তাপস ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, সেই পুণ্যস্থান নীলপর্ব্বতের অন্তর্গত। মাদলা পাঞ্জীতে

৫। "শূন্ত অশূন্ত মহাশূন্ত। — নাম অনাম যহিঁ লীন ॥
মহাশূন্তরে ব্রহ্ম রূপ। — মায়াকু দিশন্তি স্বরূপ ॥
মায়ারে রাম অবতার। — মায়ারে শ্রীকৃষ্ণশরীর ॥
মায়ারে চৈতন্ত গোসাইঁ। — গৌরাঙ্গ রূপ শূন্তে বহি ॥
* * — * *
বৃক্ষ ছায়ি ঠারে যেমন্ত। — নির্ণয় যেহ্নে সূর্য্য অস্ত ॥
সেহি স্বরূপে শ্রীচৈতন্ত। — লীন যে নীলাদ্রিমোহন ॥
শ্রীজগন্নাথকলেবর। — একাত্মা একাঙ্গ শরীর ॥
সমস্তে এমন্ত দেখন্তি। — মায়াশরীর ন জাণন্তি ॥
চৈতন্তপিণ্ড, সিংহাসন (রু)। — দেখন্তি ত্রৈলোক্যমোহন ॥
ক্ষেত্রপালঙ্কু আজ্ঞা দেই। — এ পিণ্ড নিঅ বেগ করি ॥
অন্তরীক্ষে নেই গঙ্গাজল (-রে)। — মেলিন দিঅ ক্ষেত্রপাল ॥
অন্তরীক্ষে নেলে শব বহি। — শ্রীজগন্নাথ আজ্ঞা পাই ॥

কালাপাহাড় দ্বারা জগন্নাথমূর্ত্তির নিগ্রহ প্রসঙ্গে গঙ্গার অনবরত উল্লেখ দেখা যায়। তাই গঙ্গা অর্থে সমুদ্র সূচিত হইয়াছে মনে হয়।

দেখা যাইতেছে, উড়িয়া লেখকেরা তিরোভাবের স্থান সম্বন্ধে একমত। সময় লইয়াই যত গোলযোগ। দিবাকরদাস সময় নির্দ্দেশ করেন নাই। অচ্যুতানন্দও স্পষ্ট ভাবে কিছু বলেন নাই। তবে ঈশ্বরদাসের বর্ণনার সহিত তাঁহার বর্ণনার কিছু মিল খুঁজিয়া পাই। অচ্যুতানন্দের বর্ণনা অনুসারেও রাজা উৎসব করিতেছেন। তিরোভাব-প্রসঙ্গের পর অধ্যায়ের শেষে এই দুই পঙ্‌ক্তি পাই,—

"মাধব শুক্ল পূর্ণমী দিনঠারু মহোৎসব রাজা কলে।
মাসক সম্পূর্ণ মহোৎসব সারি পুণি যেঝাশ্রমে গলে" ॥

মাধবপূর্ণিমা অর্থে বৈশাখী পূর্ণিমা বুঝায়।

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

কয়েকটি জাগগান*

বাঙ্গালা দেশের জাগগান প্রসিদ্ধ। জাগগান সম্ভবতঃ উত্তর-বঙ্গের সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ রাজসাহী, পাবনা, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলায় এককালে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। ফরিদপুর জেলায়ও ইহা প্রচলিত আছে, বিশেষ করিয়া পদ্মার তীরবর্ত্তী জনপদসমূহে। ঢাকা জেলায় কামদেবের গান প্রচলিত আছে। ঢাকার কামদেবের গান ঢাকার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন[১]। এই গানগুলির সঙ্গে রঙ্গপুরের জাগগানের ভাবের কিছু কিছু মিল আছে। বস্তুতঃ জাগগানের অনুরূপ গান বাঙ্গালাদেশের কোন কোন জেলায় প্রচলিত আছে। রঙ্গপুরের কিছু কিছু জাগগান সংগৃহীত, আলোচিত এবং রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে[২]। পাবনা জেলার কয়েকটি জাগগান আমি 'ভারতী' ও 'বঙ্গবাণী'তে[৩] প্রকাশ করিয়াছিলাম। পরে ঐ জাগগানগুলি মৎসঙ্কলিত ও প্রকাশিত "হারামণি" নামক গ্রাম্য গানের বহিতে একত্রিত করিয়া ছাপাইয়াছি।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে রাজসাহী ও পাবনা জেলা হইতে সংগৃহীত এইরূপ কয়েকটি গান প্রকাশিত হইল। কতকগুলি জাগগান ডকটর রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় পালাগান বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন[৪]। প্রত্যুত এগুলি পালাগান নয়। তিনিও সে কথা কতকটা তাঁহার মন্তব্যের শেষ ভাগে স্বীকার করিয়াছেন[৫]। তাঁহার গানের সঙ্গে বর্ত্তমান সংগ্রহের কয়েকটি ছত্রের মিল দেখিতে পাওয়া যাইবে। অধিকন্তু তাঁহার সংগ্রহের কয়েকটি ছত্রের সহিত 'হারামণি'তে প্রকাশিত ফরিদপুর জেলার মেয়েলি গানের কয়েকটি ছত্রের মিল দেখা যাইবে। ১৩৩১ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গবাণীতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন "মারাঠী ও বাঙ্গালী" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে যে পল্লীগান উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার সহিত জাগগানের তুলনা চলে। ১৩৪০ সালের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় মেয়েদের গান ও নাচ সম্পর্কে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উদ্ধৃত গানের কতকগুলি পঙ্‌ক্তির সহিত এই জাগগানের কতকগুলি ছত্রের মিল দেখা যায়। এই জাগগান সাধারণতঃ পৌষ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। একজন প্রথমে জাগ বলে, পরে সকলে সমস্বরে গান করে। সাধারণতঃ রাত্রিতে গান গাওয়া হয়।

জাগগান আদিতে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ছিল, বিশেষ করিয়া কৃষ্ণের বাল্যলীলা ইহার বর্ণনীয় ছিল। পরে বিভিন্ন চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসিয়া ইহাতে নূতন বস্তু গৃহীত হয়—যেমন চৈতন্যলীলা এবং সর্ব্বশেষে সত্যপীরলীলা। গ্রাম্য গানে এ রকম অহরহঃ ঘটিতেছে।

---

* ১৩৪৩৷২৫এ পৌষ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। ঢাকার ইতিহাস, পৃঃ ৩৯২-৯৪।

২। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৩১৫, ২য় ও ৪র্থ সংখ্যা।

৩। ভারতী, ১৩৩১, পৃঃ ২৭২-৭৬। বঙ্গবাণী, ১৩৩১, মাঘ, পৃঃ ৭৩৬-৭৩৭।

রেল, ষ্টীমার, এমন কি, গান্ধীকে লইয়া বহু গ্রাম্য গান পাওয়া যায়। মালদহের গম্ভীরায় ও মুর্শিদাবাদের আল্কাফ্ গানেও এরূপ ব্যাপারের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রকাশিত জাগগানে সোনাপীরের উল্লেখ আছে। পাবনা জেলার চাট্‌মহর সহরে তাঁহার বাড়ী ছিল, বলা হইয়াছে। পাবনা জেলার চাট্‌মহর এককালে মুসলমান-প্রাধান্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। বহু মসজিদ, পুষ্করিণী ইত্যাদি চাট্‌মহরে রহিয়াছে। পাবনা জেলার ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত রাধাচরণ সাহা ইহার বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোথাও সোনাপীরের কথা উল্লেখ করেন নাই। এই গানগুলিতে উল্লিখিত সোনাপীর, ফকরুল্লাপীর, মাণিকপীর ও জিন্দাপীর কে, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। জিন্দাপীর কি মকানপুরের জিন্দাপীর শা মাদার? অন্য একটি গ্রাম্য গানে পাওয়া যায়,—
"যাও জিন্দাপীরের সন্ধানে, আব্ হায়াতের মর্ম্ম যে জানে"।

নিম্নলিখিত গান কয়টি রাজসাহী জেলার অধীন সিংড়া থানার অন্তর্গত সিংড়া গ্রাম হইতে মুন্সী ইছহাব মিয়ার সাহায্যে ১৯২৬ সনে সংগৃহীত।

পীর সাহ মীরের ঘরে পীরের জনম॥
একত মাসের কালে জানে বা জানে।
দুইত মাসের কালে লোকের কানে কানে॥
তিনত মাসের কালে যক্তের দোলা।
চারত মাসের কালে হাড়ে হাড়ে জোড়া॥
পাঁচত মাসের কালে পঞ্চ ফুল ফোটে।
ছয়ত মাসের কালে এটু পলটে॥
সাতত মাসের কালে সাতে শরীর নয়।
অষ্টম মাসের কালে মনপ্রাণ চিয়ায়॥
নবম মাসের কালে নব ঘনাকৃতি।
দশম মাসের কালে পিণ্ডের অনুভূতি॥
দশ মাস দশ দিন পূর্ণ হয়ে আইল।
উদরে থাকিয়া পীর ভাবিতে লাগিল॥
উদরে থাকিয়া পীর করে কোন কাম।
বিষের নাড়ী ধরিয়া মায়ের মারে বিষম টান॥
বিষের নাড়ী ধরে মার বজ্রটান দিল।
মলাম মলাম বলে মা জমিনে পড়িল।
দাই দুলানী এসে তখন ঘেরাও করিল॥
হাবা থুবা দিয়া মাকে জামেতে বগলে।
চালের বন্ধা কেটে দাই ঘরে প্রবেশ হইল॥
উদরে থাকিয়া পীর করে কোন কাম।
ভূমিষ্ঠ হইয়া নিল আল্লাহজীর নাম॥
যখন মাণিক পীর ভূমিতে পড়িল।
অঞ্চলের পঞ্চ মাণিক দাইকে দিল॥

চাটমহর সহর নিয়া সোনা পীরের বাড়ী।
নব্বই হাজার ঘর যাহার দক্ষিণদুয়ারী॥
আল রে আল রে পীর আল আরবার।
চাঁদুয়া টাঙ্গাইয়া পীর হইল দরিয়া পার॥
দরিয়া পার হয়ে পীর চায় চতুর্দ্দিক্।
স্বর্গ হতে সোনার পালঙ্গ পল আচম্বিত॥
তারি উপর দোন ভাই করিল আলিন।
খাট পালঙ্গ পেয়ে পীর মোরে দিল না।
আতোর খুতোর লাললাম তাহার আছা।
তার গর্ভে জন্ম নিল মাণিকপীর রাজা॥
সোনা পীর উঠে বলে মাণিক পীর রে ভাই।
ক্ষুধায় আকুল তনু জুয়াল মরে যাই॥
জোয়ালগরে যেয়ে পীর ছাড়িল জিকির।
ডিঙ্গা লয়ে কালুর মা হইল বাহির॥
ভিক্ষুক ফকির নহি মা গো ভিক্ষা লয়ে যাব।

কোথা পাব গাই গাড়ী বাতাসে নিয়াছে।
কোথা পাব দুগ্ধ কলা তোমায় দিব খেতে॥
সুমতি ছিল গোয়ালিনীর কুমতি লাগিল।
ঝিকার উপর দুগ্ধ থুয়ে পীরেরে ভাঁড়াল॥
সোনা পীর উঠে বলে মাণিক পীর রে ভাই।
এসেছি জোয়াল ঘরে জাহির রেখে খাই॥
আগাড়ি পাছ করে বাতাসে দিল বাড়ী।
নব লক্ষ ধেনু মল বিশ লক্ষ বাছুরী॥
বাতাসে পড়িয়া মল বাতাসে ভাসুর।
দরবারে পড়ে মল দরবারে শ্বশুর॥
কান্দে রে গোয়ালিনী নারী হস্তে করে দাও।
গোধেনুর বদলে কিনা মরিল মাও॥
কান্দে রে গোয়ালের নারী হস্তে করে কাচি।
গোধেনুর বদলে না মরিল চাচী॥
কান্দে রে গোয়ালের নারী হাতে করে ঝারি।
গোধেনুর বদলে ফেলাইলাম সাড়ি॥
সোনা পীর উঠে বলে মাণিক পীর রে ভাই।
মেরেছি গরীবের ধন জিলাইয়া যাই॥
আগাড়ি পাছ করি বাতাসে দিল বাড়ী।
নব লক্ষ ধেনু তারা পাড়ে দোড়াদোড়ী॥
বাতাসেতে চেতন পেল পাতালে ভাসুর।
দরবারেতে চেতন পেল দরবারে শ্বশুর॥
আগে যদি জানতেম তুমি সোনা পীর।
আগে দিতাম দুগ্ধ কলা পাছে দিতাম ক্ষীর॥
জিন্দা চার যুগের সার।
মারিয়া জিলাতে পার,অপার মহিমা তোমার।

ওখান হতে পীর বিদায় হ'ল
পঞ্চ মাণিক সঙ্গে নিল
আয় পীর চাল্যাজীর বাজারে।
শোন রে চাল্যাজী ভাই
সোওয়া সের চাউল দেও খাই
দোওয়া করিব আল্লাহজীর ফকির॥
শোন রে ফকির মোরে
তৈয়ার চাল নাইক ঘরে
ভাড়ালি আল্লাজীর ফকিরে।
পীরের মনে ছিল হক্কা
চালেতে মারিল তুক্কা
সব চাল শূন্যেতে উড়াল॥
সুমতি ছিল চাল্যাজীর কুমতি লাগিল।
তৈয়ার চাল থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল॥
কান্দে রে চাল্যাজীর নারী
কার ধন করিলাম চুরি
কেন্দে পড়ে ঐ পীরেরই পায়।
কান্দন শুনিয়া জোরে
ডাক দিয়ে বলে পীরে

ওখান হতে পীর বিদায় নিল
পঞ্চ মাণিক সঙ্গে নিল
যায় গুড়িয়ার বাজারে।
শুন রে গুড়িয়া ভাই
সোওয়া সের দুধ দেও খাই
দোয়া করিব আল্লাজীর ফকির॥
সুমতি ছিল গুড়িয়ার কুমতি লাগিল
তৈয়ার গুড় থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল।
ফকির হইল হুক্কা
গুড়েতে মারিল তুক্কা
সব গুড় শূন্যেতে উড়িল॥
কান্দে রে গুড়িয়া নারী
কার ধন করিলাম চুরি
কেন্দে পড়ে ঐ পীরের পায়।
কান্দন শুনিয়া দূরে
ডাক দিয়া বলে পীরে
মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করে খাই॥
ওখান হতে বিদায় নিল
পঞ্চ মাণিক সঙ্গে নিল

শুন রে কুমার ভাই
একটী পাতিল দাও খাই
দোওয়া করিব আল্লাজীর ফকির ॥
সুমতি ছিল কুমারের কুমতি ধরিল
তৈয়ার পাতিল থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল।
ফকির হইল হুক্কা
পাতিলে মারিল তুক্কা
সব পাতিল শূন্যেতে উড়িল ॥
কান্দে রে কুমারের নারী
কার ধন করিলাম চুরি
কেন্দে পড়ে ঐ পীরের পায়।
কান্দন শুনিয়া জোরে
ডাক দিয়ে বলে পীরে
মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করে খাই ॥
সা জিন্দা ফকরুল্লা ও জিন্দা পীর,
মারিয়া জিলাতে পারে অপার মহিমা তোমার।
শুনতে খেরুয়া ভাই অন্য বাড়ী যায়
এ বাড়ীর মানুষ গরুর বাড়ুক পরমাই ॥

দক্ষিণদুয়ারী ঘর ঘন বাঁশের রুয়া।
বাহির করে দেও পিড়ি,পান বাটা ভরি গুয়া ॥
বাটা ভরি কাটা গুয়া পাচ পীরের খায়।
পাঁচ পীরে যুক্তি করে অরণ্যেতে যায়।
অরণ্যের বাঘ ভাল্লুক দেখিয়া পলায় ॥
পলাস না পলাস না রে তোরা।
দরজা ঘুরিয়া দাও নিদান খেলি মোরা ॥
নিদান খেলিতে খেলিতে পীরের ;
জেগে জেগে দেও তোমরা সোনা পীরের বিয়া।
প্রথমে চলিল মাল্যানে ফুলের লাগিয়া।
আনিল করবী ফুল সাজি ভরিয়া ॥
সেও ফুলে হল না রে সোনা পীরের বিয়া।
তার পরে চলিল মাল্যানে ফুলের লাগিয়া ॥
আনিল কেয়া ফুল সাজি ভরিয়া।
সেও ফুলে হল না রে সোনা পীরের বিয়া ॥
চার তরফ চার কলার গাছ লইল গাড়িয়া।
পাঁচ বাড়ীর পাঁচ আইয়ো আনিল ডাকিয়া।
জেগে জুগে দাও তোমরা সোনা পীরের বিয়া ॥

ধুয়া।

জিন্দা সৈয়দ বাঁকা মিঞা মাণিক পীর।
মারিয়া জিলাতে পার আজব মহিমা তোমার ॥

নিম্নলিখিত কয়েকটি গান পাবনা জেলার অন্তর্গত সুজানগর থানার অধীন মুরারিপুর গ্রামের সেখ আবদুল জব্বারের নিকট হইতে ১৯২৪ সালে সংগৃহীত হইয়াছে।

পোয়ালে জাগ সোনার হারের জাগ ॥
গিরি ভাই গিরি ভাই ছওর ছওর।
সোনার পীরের চেলা আ'ল বছর অন্তর ॥
সোনার হারের চেলা দেখে যে করিবে হেলা।
দুই পায় দুই গোঁদ বাড়াবি চক্ষে বাড়াবি ঢেলা ॥
ঢেলা নয় রে ঢুল্যা নয় রে গায় আইছে জ্বর।
সোনার হার ভক্ত ঠাকুর মুখে চাপদাড়ী।
হেলিয়া দুলিয়া গেলেন গোয়ালনীর বাড়ী ॥
গোয়ালনী গোয়ালনী বইসে কর কি।
তোমার পুত্র মার খাত্যাছে এই সভার মধ্যি ॥
সুবুদ্ধি গোয়ালের নারী কুবুদ্ধি লাগিল।
সিকার উপর দুগ্ধ থুয়ে পীরকে ভাঁড়াল ॥
ঘরে গুয়ালনীরে বাথানে মরে গাই।

আগে যদি জানতেম রে তুমি সত্যপীর।
আগে দিতাম দই দুগ্ধ পাছে দিতাম ক্ষীর॥
হুই চই করে পীর বাথানে দিল বাড়ি।
বাথানেতে পড়্যা রইছে চোদ্দ বোঝা দড়ি॥
হুই চই করিয়া পীর বাথানে দিল ভুষ্যা।
সাত দিনকার মরা ধেনু দন্তে কাটে কুটা॥
হুই চই করিয়া পীর বাথানে দিল বাড়ি।
সাত দিনকার মরা ধেনু পারে নড়ানড়ি॥
চলো চলো রাখাল ভাই রে আর এক বাড়ী গাই।
এ বাড়ীর মানুষ গরুর বাড়ুক পরমাই॥

নিম্নলিখিত গানটি পাবনা জেলার অধীন সুজানগর থানার অন্তর্গত মুরারিপুর গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

নিমাই জাগ

নিমাই দুখিনীর ধন,

দুঃখ পাসরার বেটা রে নিমাই ওরে নীলরতন॥ধু
এক মাসের কালে নিমাই ভাসে গঙ্গাজল।
দুইও মাসের কালে নিমাই করে টলমল॥
তিন মাসের কালে নিমাই লোহু রক্তের গোলা।
চার মাসের কালে নিমাই হাড়ে মাংসে জোড়া॥
পঞ্চ মাসের কালে নিমাই পঞ্চ ফুল ফোটে।
ছয় মাসের কালে নিমাই মাথার চুল উঠে॥
সাত মাসের কালে নিমাই সাত সুরে গায়।
অষ্ট মাসের কালে নিমাই শুয়্যা নিদ্রা যায়॥
নয় মাসের কালে নিমাই নব ডঙ্কা মারিল।
দশ মাসের কালে নিমাই ভূমিস্থ পড়িল॥
দশ মাস দশ দিন নিমাইর পূর্ণতা হইল।
নিমাইচাঁদ ভূমিস্থ পড়ে মা বোল বলিল॥
এক মাস যায় মায়ের খুতি আর মুতি।
আর এক মাস যায় মায়ের মাঘ মাস্তা॥
কোথা হতে এল যোগী কেশব ভারতী।
কিবা মন্ত্র কর্ণে দিয়া নিমাইরে বাস্তাল সন্ন্যাসী॥
দেখ দেখ 'লঘুব্যা'র লোক দেখ রে চাহিয়া।
নিমাইচাঁদ সন্ন্যাসী চল্‌লো জননী ছাড়িয়া॥
সন্ন্যাসী না হয় রে নিমাই বৈরাগী না হয়।
ঘরে বসে কৃষ্ণনামটী মাকে শোনায়॥

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

সাহিত্য-বার্ত্তা

[যে জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সাধারণতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে, মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বঙ্গভাষায় নানা স্থানে প্রকাশিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, তথা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যাদিবিষয়ক সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 'সাহিত্য-বার্ত্তা' অংশে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। এই অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার সমসাময়িক মৌলিক আলোচনার নিখুঁত ইতিবৃত্ত করিয়া তুলিবার জন্য সাহিত্যিকবর্গের সহযোগিতা ও সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা যাইতেছে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।]

সাহিত্য

গ্রন্থ

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ—গোবিন্দদাসের কড়চা রহস্য। ২নং আনন্দ চাটুর্য্যের লেন হইতে শ্রীসুচারুকান্তি ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গোবিন্দকর্ম্মকারের নামে প্রচলিত 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামক গ্রন্থের অসারতা, অর্বাচীনতা ও কৃত্রিমতা প্রদর্শন।

বাংলা বানানের নিয়ম। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অনুমোদনপত্র ও সংশোধন-পরিবর্ত্তনাদি সংবলিত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছন্দ। বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়।

বিভিন্ন সময়ে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ রচিত ছন্দোবিষয়ক লেখসমূহের সঙ্কলন।

কলিকাতা-কমলালয়—৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত ভূমিকা ও ভবানীচরণের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সমন্বিত। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—১। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা।

শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতার রীতিনীতি বর্ণন এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং—রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়-রচিত। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—২। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ২৫।২, মোহন বাগান রো, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় লিখিত রাজীবলোচনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ ১৮০৫ সালে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত গ্রন্থের পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ।

শ্রীহরেন্দ্রমোহন দাশ গুপ্ত—Studies in Western Influence on Nineteenth Century Bengali Poetry (1857-1887). চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জি এণ্ড কোঃ লিমিটেড্।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও বিহারীলাল—গত শতাব্দীর এই চারি জন প্রধান বাঙ্গালী কবির কাব্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের আলোচনা।

শ্রীসুকুমার সেন—A History of Brajabuli Literature. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধ

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত—'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পুথির লিপিকাল। বিচিত্রা, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ৬৪-৭৫।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' গ্রন্থের পুথির প্রাচীনতা সম্বন্ধে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত খণ্ডনপূর্ব্বক ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধই ইহার লেখনকাল বলিয়া প্রতিপাদন।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অভিনব আবিষ্কার। প্রবর্ত্তক, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৬০৩-৪।

শ্রীযুক্ত-যোগেশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও সম্প্রতি প্রকাশিত চণ্ডীদাসের জীবনকাহিনীসমন্বিত তিনখানি গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে সংশয় জ্ঞাপন।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য—ব্রতের ফল। বিচিত্রা, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ১৯৯-২০৯।

বাংলার মেয়েলি ব্রতকথার মধ্যে বাঙালী স্ত্রীলোকের আশা আকাঙ্ক্ষার যে আভাস পাওয়া যায়, তাহার পরিচয়।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ রায়—'মঙ্গল কাব্যে' খেলা-ধূলা। প্রবর্ত্তক, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৬৩১-৩।

বাংলা মঙ্গলকাব্যে খেলার যে স্বল্প বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার পরিচয়।

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—'খেলা-ধূলার' বাঙালা পরিভাষা। প্রবর্ত্তক, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৬৪১-২।

ফুটবল খেলা সম্পর্কে ব্যবহৃত ইংরাজী শব্দের বাংলা অনুবাদ।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাঙ্‌লা ভাষা আর সাহিত্য। প্রবর্ত্তক, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ৩৫৩-৮।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার, প্রসার ও কতকগুলি সমস্যা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল—তামিল জাতির উৎপত্তি ও প্রাচীন ইতিহাস। বিচিত্রা, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ৪৭-৫৩, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ১৭৭-৮৫, ৩১৯-২৬।

তামিল জাতির উৎপত্তি, আচারব্যবহার, ভাষা ও প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য—বাগর্থবিজ্ঞান। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ১৬৯-১৮০।

বাংলা শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তনের বিভিন্ন প্রকার নির্দ্দেশ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শব্দতত্ত্বের একটী তর্ক। প্রবাসী, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ৫২৭।

বাংলার হকারান্ত ধাতুর ভবিষ্যৎকালের পদের বানান সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী—আবদুর রহিম্ খাঁনখানান্ ও হিন্দী-সাহিত্য। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ২৬৪-৭।

রহিমের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণন ও তাঁহার রচিত সাহিত্যের পরিচয় প্রদান।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত—ভুবনরঞ্জনের 'আনন্দ-বিলাস'। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ২৭৬-৭।

আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্রীকান্ত ভুবনরঞ্জন রচিত স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডের প্রথম চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের 'আনন্দবিলাস' নামক বাংলা পদ্যানুবাদ গ্রন্থের ও উহার নবাবিষ্কৃত পুথির পরিচয়।

চৈত্র মাসে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত লিখিত এতদ্‌বিষয়ক প্রবন্ধের কয়েকটী ত্রুটি প্রদর্শন।

খোন্দকার আবদুল হামিদ ও মহম্মদ খুরশীদ—পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লীগাথা। মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ' ৪৩, পৃঃ ৬৮০-২।

নৌলাগান, পর্ব্বগান ও সারিগানের পরিচয়।

মোহাম্মদ আশ্‌রাফ হোসেন—আমাদের পল্লী-সাহিত্য। মাসিক মোহাম্মদী, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ৭৫২, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৮২৪-২৯।

পালাগান, গান বা রাগ, কবি, হাইর, দিঠান, ছইয়া, পই, শিল্লক, বয়ান, কথার কথা প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত পল্লীসাহিত্যের পরিচয়।

মহম্মদ এনামুল হক—মুসলমানী বাঙ্গালা। মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৮০৯-১৫।

'মুসলমানী বাঙ্গালা' এই শব্দপ্রয়োগের শৈথিল্য ও অযৌক্তিকতা প্রদর্শন।

শ্রীচিন্তাহরণ চবক্রর্ত্তী—ভারতীয় সহিত্যপরিষৎ। প্রবাসী, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ৬৬০-৩।

ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য বিক্ষিপ্তভাবে যে সমস্ত প্রযত্ন করা হইয়াছে, তাহার আভাস ও এতদুদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সাহিত্য পরিষদের কর্ম্মপদ্ধতি নিরূপণ।

ইতিহাস

গ্রন্থ

শ্রীযদুনাথ সরকার—মারাঠা জাতীয় বিকাশ (সরল কাহিনী)। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস্‌, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকতা।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৪২শ খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যা ও ৪৩শ খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত চারিটী প্রবন্ধ লইয়া এই পুস্তিকা গঠিত।

খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ—কোচবিহারের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। রাজ-সরকারের আদেশানুসারে প্রকাশিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত কোচবিহারের বিস্তৃত ইতিহাস।

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া—পিটক গ্রন্থাবলী—১ম সংখ্যা। ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউট কর্ত্তৃক ১৭০নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

বৌদ্ধ পিটক গ্রন্থাবলীর ইতিবৃত্ত আলোচনা। ইহা প্রস্তাবিত বিস্তৃত ও বহু খণ্ডে প্রকাশ্য বৌদ্ধকোষের বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ নামক প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগ।

প্রবন্ধ

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু—ঋগ্বেদে ইন্দ্র। প্রবাসী, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ৪৮৪-৪৯৮।

হিন্দুর দেবতাদিগের—বিশেষ করিয়া ইন্দ্রের—মূল স্বরূপ ও তাহাদের সম্বন্ধে ধারণার ক্রমপরিণতির ধারা আলোচনা।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ—রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিতের উপাদান। প্রবাসী, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৮৪৫-৮৫২।

১৭৭২ হইতে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত রামমোহনের জীবনচরিত সম্পর্কে প্রাপ্ত উপাদানের পরিচয় ও

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার—রামমোহন রায়ের প্রথম স্মৃতিসভা। প্রবাসী, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৯০২-৪।

১৮৩৪ সালের ৫ই এপ্রেল তারিখে কলিকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভার বিবরণ।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক—পাল-সাম্রাজ্যের শাসন-প্রণালী। প্রবাসী, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৮৮১-৯।

পালসাম্রাজ্যের শাসনপ্রণালীর সাধারণ পরিচয় ও বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের নাম এবং কর্তব্য কার্যের বিবরণ।

যোগেন্দ্রকিশোর লৌহ—বাঙালার চটকলের ইতিহাস। প্রবর্ত্তক, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ৩৮৯-৯২।

চটকলের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমোন্নতির বৃত্তান্ত।

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়—ব্রহ্মদেশে বঙ্গসংস্কৃতি। প্রবাসী, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ১৩৯-৪৭; ব্রহ্মদেশে ও আরাকানে বঙ্গসংস্কৃতি, প্রবাসী, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৮১০-১৭।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত আনন্দ-মন্দির ও তৎপরবর্ত্তী যুগের মন্দির ও মূর্তি শিল্পে এবং আরাকান-রাজসভার সাহিত্যে বাংলাদেশের সহিত ব্রহ্মদেশের যে যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয়, তাহার আলোচনা। [এই দুই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার—"বঙ্গসংস্কৃতির সহিত ব্রহ্মদেশের যোগাযোগ," বিচিত্রা, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৬১০-৬ দ্রষ্টব্য]।

শ্রীমাখনলাল চৌধুরী—মুঘলরাজ্যে গুপ্তচর বিভাগ। বিচিত্রা, আশ্বিন' ৪৩, পৃঃ ৩৫৮-৬০।

মুঘলরাজ্যের গুপ্তচরবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের নাম ও কর্ম্মপদ্ধতির আলোচনা।

শ্রীজনরঞ্জন রায়—রামগড়। ভারতবর্ষ, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ৩৮৪-৯৪।

রামগড় রাজ্যের ইতিবৃত্ত।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা—সুপ্রসিদ্ধ জৈন নরনারী। ভারতবর্ষ, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৫৮৪-৯৫।

পার্শ্বনাথ, নেমিনাথ, কুমারপাল, বস্তুপাল, তেজপাল, ক্ষেমা, পেথড়কুমার, অমরকুমার, বিমলশাহ, শ্রীপাল, রাণী চেলনা ও চন্দনবালার জীবনবৃত্ত বর্ণনা।

শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ—দিব্য-প্রসঙ্গ। ভারতবর্ষ, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৫৯৭-৬০৩।

আষাঢ় মাসে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও ভট্টশালী মহাশয়ের প্রত্যুত্তর।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী—ভারত ও মধ্য এশিয়া। বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ১১-১৭; ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ২৫৪-৬০; আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৪১৮-২৩।

প্রাচীন ভারতের সহিত মধ্যএশিয়া ও প্রান্তবর্তী জনপদসমূহের যোগাযোগের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত।

আবুল কাসেম—মোগল সিংহাসন। মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৮৩৪-৪০।

দেশের বিভিন্ন স্থানে মোগল সম্রাট্গণের যে বিভিন্ন সিংহাসন রক্ষিত ছিল, তাহাদের শিল্পোৎকর্ষের পরিচয়।

ফজলুল করিম—সিন্ধুপ্রদেশের ইতিহাস। মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৮৪১-৪৪।

প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্যন্ত সিন্ধুপ্রদেশের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত।

শ্রীরমণীকান্ত বসু—আসামে দেওয়ানবংশীয়গণ। মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ৬৭৩-৭৯।

দর্শন

গ্রন্থ

শ্রীবংশদীপ মহাস্থবির—প্রজ্ঞাভাবনা। প্রকাশক—প্রিয়দর্শী ভিক্ষু, নালন্দা বিদ্যাভবন, ১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট্, বউবাজার, কলিকাতা।

বুদ্ধঘোষ-কৃত সুপ্রসিদ্ধ 'বিসুদ্ধিমগ্‌গো' নামক মহাগ্রন্থের 'পঞ্‌ঞানিদ্দেস' নামক তৃতীয় অংশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ও বঙ্গানুবাদ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—বুদ্ধদেবের 'নাস্তিকতা'। প্রকাশক—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯বি, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বুদ্ধদেবকে নাস্তিক প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সমস্ত যুক্তি সাধারণতঃ উপস্থাপিত হয় বা হইতে পারে, পালি বৌদ্ধগ্রন্থ অবলম্বনে সেই সমস্ত যুক্তির অসারতা প্রতিপাদন।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ। প্রকাশক—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯বি, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিবৃত যাজ্ঞবল্ক্যের দার্শনিক মতবাদের বিচার ও বিশ্লেষণ।

প্রবন্ধ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—ভারতের ধর্ম্মসমস্যা। ভারতবর্ষ, ভাদ্র' ৪৩, পৃঃ ৩৩৭-৩৪৩।

হিন্দু শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র—স্বর্ণমান ও বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কট। ভারতবর্ষ, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ৩৫৫-৩৬৪।

শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু—প্রজ্ঞানের প্রগতি (২)। ভারতবর্ষ, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৪৯৭-৫০৫।

প্রাচীন গ্রীসের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের আলোচনা।

বিজ্ঞান

প্রবন্ধ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—পাঁজির ভুল। বিচিত্রা, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ২২০-৫।

পুরাণাদি গ্রন্থে চতুর্যুগের কালনির্ণয়াত্মক যে সমস্ত শ্লোক রহিয়াছে, মানববর্ষানুসারেই তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়া পরিমাণ নির্ণয় কর্তব্য, এই মত প্রতিপাদন।

শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়—গ্রহ নক্ষত্রের পরিচয় ও জন্মকথা। ভারতবর্ষ, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ৩৭২-৩৭৯; আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৫৩৮-৫৪৪।

গ্রহাদির উৎপত্তি ও আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের মত নিরূপণ।

শ্রীহাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী—ভারতে ফলিত জ্যোতিষ। বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ৫০-৫৬।

ভারতে ফলিত জ্যোতিষের প্রচলিত অংশে পাশ্চাত্যদেশের প্রভাব প্রদর্শন।

শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ মিত্র—উদ্ভিদের উপর উদ্ভিদের প্রভাব। প্রবাসী, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ৭২২-৪।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—ধূলি ও ব্যাধি। প্রবাসী, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ৭২৪-২৯।

ধূলির স্বরূপ ও ব্যাধিসৃষ্টি বিষয়ে ইহার প্রভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণ কর্তৃক চারি শত বৎসর যাবৎ কৃত আলোচনার আভাস।

শ্রীসুধীরকুমার বসু—আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। প্রকৃতি, ১৩।১২৬-৩২।

আধুনিক যুগে পরমাণুর গঠন, যৌগিক পদার্থের গঠনাকৃতি, জড় পদার্থের তরঙ্গবাদ প্রভৃতি বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের আলোচনার আভাস।

কবি শেখ চান্দ

ভূমিকা

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান কবির সংখ্যা একেবারে নগণ্য না হইলেও, অতি প্রাচীন মুসলমান কবির সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বঙ্গীয় মুসলমান কবির সহিত এ যাবৎ আমরা পরিচিত হইতে পারি নাই। বলা বাহুল্য, এই যুগের হিন্দু কবির নামসংখ্যাও বেশী নহে। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে, কোন বঙ্গীয় মুসলমান প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সাধনা করেন নাই। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বঙ্গীয়, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গীয় মুসলমানগণ যে প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু বাঙ্গালার মুসলমান সমাজ আধুনিক শিক্ষায় নিতান্তই পশ্চাৎপদ বলিয়া, তাঁহাদের মধ্যে অনুসন্ধান ও অনুসন্ধিৎসার একান্তই অভাব। তাই, এ যাবৎ মুসলমান কবি কর্ত্তৃক বিরচিত প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় মুসলমানগণ আশানুরূপভাবে সংগ্রহ করেন নাই। ইহার ফলে, আজ আমরা প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার মুসলমান লেখকদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। অথচ, পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী কালে, অসংখ্য বঙ্গীয় মুসলমান কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা একজন প্রাচীন মুসলমান কবির সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

"চারি মঞ্জিলের কথা"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত কিঞ্চিদধিক ছয় হাজার বাঙ্গালা পুথির মধ্যে, মুসলমান লেখকদের দ্বারা রচিত বাঙ্গালা পুথির যে দুই তিনখানি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে, তন্মধ্যে "চারি মঞ্জিলের কথা" (?) (৬১১৮নং পুথি দ্রষ্টব্য) এই আখ্যায় একখানি বিরাট্ বাঙ্গালা পুথির অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আছে। ইহা ২ হইতে ৯৮ পত্র অর্থাৎ ১৯৪ পৃষ্ঠা লইয়াই আত্মরক্ষা করিয়াছে। এই পুথিখানি কবি শেখ চান্দ কর্ত্তৃক বিরচিত।

"রসুল-বিজয়"

এই "চারি মঞ্জিলের কথা" আলোচনা করিয়া দেখা গেল, পুথিখানির নাম "চারি মঞ্জিলের কথা" নয়; তথাপি মলাটে ইহার এই নাম দেওয়া হইয়াছে। পুথিখানিতে কোথাও এই নাম ব্যবহৃত হয় নাই। পুথির মধ্যে ইহাকে নানা স্থানে "রচুল বিজএ" অর্থাৎ "রসূল-বিজয়" নামে অভিহিত করা হইয়াছে, যথা—

"রচুল বিজএ কথা, অপূর্ব্ব পাচালি গাতা
শ্রবনেত পাপ বিমোচন।"—(৪৯-২)

সুতরাং পুথিখানির প্রকৃত নাম যে "রসূল-বিজয়", সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন

হইল ? পুথিখানির প্রথমে "সৃষ্টি অধ্যায়" নামে একটি দীর্ঘ অধ্যায় সংযোজিত আছে। এই "সৃষ্টি অধ্যায়ে" ইস্‌লামী অধ্যাত্ম (মারফৎ) বিষয়ক কতকগুলি বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। "চারি মঞ্জিল" অর্থাৎ সূফী-সাধনার চারিটি ধাপ ইহার অন্তর্গত। এই অধ্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের সহিত এই "চারি মঞ্জিল" সম্বন্ধেই বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং যিনি পুথিখানিতে নাম সংযোজিত করিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই "সৃষ্টি অধ্যায়ে"র "চারি মঞ্জিলে"র বিবরণটি পাঠ করিয়াই অনুমান করিয়াছিলেন যে, পুথিখানির নাম "চারি মঞ্জিলের কথা"। ফলে তাহা নহে ;—ইহার নাম **"রসূল-বিজয়"**।

"রসূল-বিজয়"এর পাণ্ডুলিপি

এই "রসূল-বিজয়" কাব্যখানির পাণ্ডুলিপি এক শত হইতে দেড় শত বৎসরের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের ধারণা। ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মেহারকুলের অধিবাসী নছরত গাজী নামক এক ব্যক্তির দ্বারা ইহা অনুলিখিত হয়[১]। দেখিতেছি,—পুথিখানির নকলকারক নছরত গাজীও একজন কবি ছিলেন। এই পাণ্ডুলিপির দুই স্থলে (এক স্থল এই পৃষ্ঠার পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে ; অন্য স্থল ৩১।১) তাঁহার রচিত বিনয়জ্ঞাপক পদ রহিয়াছে। যদিও তিনি দুই দুই বার প্রকাশ করিয়াছেন যে,—

"জেমত অছলে আছে লেখিল তেমত।
মুই অধমের প্রতি না কর জরাফত॥" (৩১।২ ; ৭৪।২)

অর্থাৎ তিনি যে পুথি হইতে নকল করিতেছেন, সেই আসল বা মূল পুথিতে যেইরূপ আছে, অবিকল সেইরূপ লিখিয়াছেন, সুতরাং কেহ যেন তাঁহাকে দোষারোপ না করে ; তথাপি এই দোষারোপ করার কথা পাড়াতে আমাদের মনে হয়, তিনি পুথিখানিতে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। তিনি নিজেও পদ রচনা করিতে পারিতেন ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে নকল করার সময়ে সংযোজন ও বিয়োজন করা কিছুই বিচিত্র নহে। ফলে তিনি তাহাই করিয়াছেন। তিনি কি যে সংযোজিত করিয়াছেন, অন্য পুথি না পাইলে, তাহা বলা সহজ নয়। তবে বিয়োজন যে করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি হইতেই ধরা পড়িতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত বর্ত্তমান পুথিতে "সৃষ্টি অধ্যায়ে"র পরে হঠাৎ নবম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে ; ইহাতে "চল্লিশ অধ্যায়"টি নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রথমের "আট" এবং মধ্যের "চল্লিশ"—মোট নয়টি অধ্যায়কে বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বর্ত্তমান পুথির কোন কোন অধ্যায় খুব ছোট এবং কোন কোন অধ্যায় বেশ একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়,—

১। "রচুলের বরে কহে মতিহিন চান্দে।
কহিবা চৌতিসা কিছু পএয়ার প্রবন্দে॥
জেমত অছলে আছে লিখিলাম তেমত।
মুই অধমের প্রতি না কর জরাফত॥
জে রাগে জে ছন্দে হএ বুজিয়া পড়িবা।
মতিহিন হৈয়া যদি অক্ষর পড়এ।
বুজিয়া পড়িবা ভাই কহিএ নির্চাএ॥
মেহারকুলিয়া হই আমি ধরি অল্পজ্ঞান।
অক্ষর পড়িলে গোনা করিবা মোছন॥
সহস্র প্রণাম করি গুণিগণ পাএ।

দীর্ঘ অধ্যায়গুলিতে অনেক বিষয় সংযোজিত, এবং খর্ব্ব অধ্যায়গুলি হইতে অনেক বিষয় বিয়োজিত হইয়াছে। জানিতে পারিয়াছি,—চট্টগ্রামের স্বনামখ্যাত প্রাচীন সাহিত্যিক মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহোদয়ের পারিবারিক পুস্তকাগারে কবি শেখচান্দের "রসুল-বিজয়" কাব্যের তিনখানি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে। এই পাণ্ডু-লিপিত্রয়ের সহিত মিলাইয়া লইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির জাল-জুয়াচুরি সহজেই ধরা পড়িবে। বর্ত্তমানে সুযোগের অভাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিখানিই আমাদের সম্বল।

বর্ত্তমান পুথিখানির আদ্যন্ত খণ্ডিত। এই খণ্ডিত পুথির কোথাও নকলের তারিখ বা কবির আত্ম-বিবরণী নাই। সুতরাং, আপাততঃ কবির সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ আমরা এই পুথি হইতে পাইতেছি না। কিন্তু পুথিখানিতে যে সকল ভণিতা আছে, তাহা হইতে কবির সম্বন্ধে মোটামোটি কতকগুলি কথা আমরা জানিতে পারি। নিম্নে কয়েকটি আবশ্যক ভণিতা উদ্ধৃত হইল,—

(১)

"ফথে মাহাম্মদর সুত সএক চান্দ নাম।
মুর্স্বিদ আজ্ঞাএ পাচালি রচিল অনুপাম॥"—(বহু স্থানে)

(২)

"রচুল বিজএ কথা অপূর্ব্ব পাচালি গাতা
শ্রবনেত পাপ বিমোচন॥
মুমিন সকলে সুন পাইবা বহুত পুণ্য
অন্তকালে বিহিস্তেত গতি।
ফথে মাহাম্মদ সুতে সুজন লোকের ছুতে
পাচালি রচিল দিন ত্রিতি॥"—(৪৯-২)

(৩)

"সাহা দৌলতের সিস্ব্য সএক চান্দ নাম।
গুরুর আজ্ঞাএ পাচালি রচিল অনুপাম॥"—(বহু স্থানে)

(৪)

"পাগল চান্দাএ কহে রচুল বিজএ।
বিনি খড়্গ বিনি ঝাটে বরি পরাজএ॥"—(বহু স্থানে)

(৫)

"রচুল বিজএ কথা অপূর্ব্ব পাচালি গাতা
ভক্তিভাবে সুন সর্ব্বজন।
রচুলের পদ্দ ছায়া তাতে অঙ্গ ছাপাইয়া
অধম চান্দার বিরচন॥"—(৯৪-২)

কবির পরিচয়

উপর্য্যুদ্ধৃত ভণিতাগুলি হইতে আমরা "রসুল-বিজয়" কাব্যের প্রণেতা সম্বন্ধে জানিতে

তাঁহার পিতার নাম ফথে মোহাম্মদ ; এবং তিনি তদীয় "মুর্সিদ" বা গুরুর আদেশে তাঁহার "রস্থল-বিজয়" কাব্য প্রণয়ন করেন। আমরা আরও জানিতে পারিতেছি,—তিনি নিজেকে "পাগল" বলিয়া পরিচয় দিতেন ; বোধ হয়, তিনি গুরুর মতে দীক্ষিত হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে "পাগল" বলিত। কিন্তু সাধারণতঃ লোকজন তাঁহাকে "পাগল" বলিয়া অভিহিত করিলেও তিনি জানিতেন যে, তিনি এমন এক ব্যক্তির শিষ্য এবং এমন এক ব্যক্তির বাণী প্রচার করিয়া বেড়ান, যিনি "সুজন" অর্থাৎ সিদ্ধ পুরুষ। তাই, কবি নিজেকে "সুজন লোকের দূত" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই "সুজন" অর্থাৎ সিদ্ধ পুরুষটি কে,—কবি সে কথাও বলিয়া দিয়াছেন। ইঁহার নাম শাহ দৌলৎ বা শাহ দৌলা।

"রস্থল-বিজয়" কাব্যে রচনার কোন তারিখ নাই। সুতরাং কবির আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। এমন অবস্থায়, কাব্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ও আনুষঙ্গিক বা প্রাসঙ্গিক বিষয় হইতে কবির সময় অনুমান করিবার চেষ্টা করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

আভ্যন্তরীণ প্রমাণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, "রস্থল-বিজয়" কাব্যখানি মালাধর বসুর (গুণরাজ খাঁর) "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" কাব্যের ছাঁচে হুবহু ঢালা। নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি পর্য্যন্ত "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" কাব্যের আদর্শেই লিখিত। গুণরাজ খাঁর "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে (১৪০২ শাকে) লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং, এই কাব্যের আদর্শে বিরচিত "রস্থল-বিজয়" নিশ্চয় ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়া থাকিবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে,—"রস্থল-বিজয়" ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের কত পরে রচিত হইয়াছিল ? "রস্থল-বিজয়-"বর্ণিত প্রাসঙ্গিক এবং কাব্যখানির আনুষঙ্গিক বিষয় হইতে আমরা একরূপ সঠিক ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব।

আমরা দেখিয়াছি, কবি শেখ চান্দ, শাহ দৌলা নামক একজন পীরের আদেশে "রস্থল-বিজয়" কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবি তাঁহার কাব্যের এক স্থলে শাহ দৌলা পীরের একটু পরিচয়ও দিয়াছেন। তিনি তাঁহার পীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"সাহ দৌলা পীর জান মোহা গুনবান। তাঁহার চরনে নিত্য চান্দের ধ্যায়ান ॥
সাস্তবন্ত জ্ঞানবন্ত জ্ঞানে মোহাজ্ঞানি। পুরুস ফকির পির ধন্য মোহা ধ্যায়ানি ॥
সদাএ ধ্যায়ান তান নাচুত মোকামে। জিকির ফিকির তান মলকুত মোকামে ॥
দ্রসন করএ তাঞ লাহুত মোকামে। সদাএ ধ্যায়ান তান আল্লার হুকুমে ॥
পাঞ্চ ওক্ত নমাজ পড়এ মছজিদে। সদাএ ধ্যায়াএ তাই মন হরসিতে ॥
সর্ব্ব অঙ্গে গুননিধি পরম সোন্দর। সামবর্ন অঙ্গত সে জেন জলধর ॥
ক্রেপার সাগর পির চান্দার ইস্বর। তাহান চরন বিনে গতি নাই আর ॥
তাহান চরনের রেনু নয়ানে ভুসিয়া। অধম চান্দাএ কহে পাঞ্চালি রচিয়া ॥"

এই বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি,—পীর শাহ দৌলা একজন উচ্চদরের

এই সাধক বিচরণ করিয়া সাধনামগ্ন হইতেন। তিনি প্রধানতঃ "তরীকত্" বা অধ্যাত্মবাদী সাধক হইলেও, "শরী'অত্" বা আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মও পালন করিতেন। তিনি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণবিশিষ্ট সুপুরুষ ছিলেন।

মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়ের পারিবারিক গ্রন্থাগারে "শাহ্ দৌলা পীর পুস্তক" নামে একখানি প্রাচীন পুথির আরবী ও বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত কয়েকখানি পাণ্ডু-লিপি রক্ষিত আছে। সাহিত্য-বিশারদ মহোদয়ের অনুগ্রহে আমরা পুথিখানির পাণ্ডুলিপি কয়খানি দেখিয়াছি। "চান্দ" নামক শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে "শাহ্ দৌলা" নামক পীর যে তত্ত্বকথা উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকখানিতে লিপিবদ্ধ আছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে মনে হয়, যেন ইহা একজন তৃতীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপর্য্যুক্ত গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তর শুনিয়া লিখিত। কিন্তু ফলে তাহা নহে। কেন না, আরবী অক্ষরে লিখিত একখানি পাণ্ডুলিপিতে দেখিতে পাই :—

এই মতে মনরাজা ভ্রমে বন্দে বন্দে।
সাহা দৌলার আগে জান বিরচিল চান্দে॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শাহ্ দৌলা পীরের শিষ্য স্বয়ং চান্দই ইহার রচয়িতা। কবি চান্দ তাঁহার গুরু শাহ্ দৌলা এবং নিজের পরিচয় এই আরবী অক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপির প্রারম্ভে এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"সকল বন্দিলুম আমি জান একমন। কায়মনে বন্দিমু মুর্সিদচরণ॥
সাহা দৌলা পির জান আল্লার নিজ জাত। ফকিরিতে দম ধরে নুরের ছিফাত॥
চারি পির চৌদ্দ খান্দান জেই জানে। সরিয়ত পন্থ জান সে সকল মানে॥
সরিয়ত, তরিকত, হকিকত, মারফত। এই চারি মঞ্জিলে জান করে এবাদত॥
পরগনে "কুদুফা" নাম "হুর" গ্রামে ঘর। তালুক ভূমি অল্প তান সিস্ত বহুতর॥
সকল সিস্তের মধ্যে ক্ষুদ্র একজন। নাম হীন চান্দ কথে মোহাম্মদের নন্দন॥
আউয়ালে আখেরে আশা সাহা দৌলা পদ্দে। দীনের ইমান দিয়া বিকাইল চান্দে॥

বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপিতে এই পদগুলির অনেক অংশ নাই এবং যেগুলি আছে, তাহা বিকৃত হইয়াছে। পীর শাহ্ দৌলার সম্বন্ধে ইহাতে দুইটি পঙ্ক্তি অতিরিক্ত আছে; তাহা এই,—

"পরগনে পাইটকরা স্থানে গোঞাঁঅএ সাল।
তালিপ তলপ সিস্ত পণ্ডিত বিসাল॥"

কবির সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ পঙ্ক্তিগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত পঙ্ক্তি দুইটি আবশ্যক,—

"দ্বাদস বৎসর পাছে বাড়িলেক জ্ঞান।
মুরসিদ চরণে মোর একিদা ইমান॥"

উপর্য্যুক্ত বিবরণ পাঠ করিলে আর সন্দেহ থাকে না যে, "রসুল-বিজয়"-প্রণেতা ও "শাহ্ দৌলা পীর পুস্তক"-প্রণেতা অভিন্ন ব্যক্তি, এবং "রসুল-বিজয়ে" বর্ণিত পীর শাহ্ দৌলা

পীর পুস্তকে" এই দরবেশ ও কবির সম্বন্ধে যে বিবরণ পাইতেছি, তাহা "রসূল-বিজয়" পুস্তকে প্রাপ্ত বিবরণটিতে আরও নূতন আলোকপাত করিতেছে। "শাহ দৌলা পীর পুস্তক" পাঠে জানিতে পারিতেছি, "কুতুফা" নামক কোন পরগণার অন্তর্গত "হুর" নামক এক গ্রামে পীর শাহ্ দৌলার স্থায়ী বাসস্থান ছিল। ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত পাটিকারা পরগণায় তিনি কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তালিপ ও তলপ নামে তাঁহার দুই জন সুপণ্ডিত শিষ্য ছিলেন। ফথে মোহাম্মদের পুত্র চান্দ তাঁহার বহু শিষ্যের মধ্যে অন্যতম। চান্দ বার বৎসর পর্য্যন্ত পীর শাহ্ দৌলার পাছে পাছে ঘুরিয়া যথেষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কবি শেখ চান্দ তাঁহার গুরু সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ দিতেছেন, তাহাতে তাঁহার জীবনকাল সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারিতেছি না। তবে, পীর শাহ্ দৌলা যে একজন বিখ্যাত দরবেশ ছিলেন, তাঁহার কর্ম্মস্থল যে বাঙ্গালার বহু স্থানে বিস্তৃত ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

বাঙ্গালার দরবেশদের জীবন-কথা আলোচনা করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, রাজশাহী জেলার সদর সবডিভিশনের অন্তর্গত "বাঘা" গ্রামে হজরত মৌলানা শাহ দৌলা নামে একজন বিখ্যাত দরবেশের সমাধি আছে। এই সাধকের পৌত্র হজরত মৌলানা আবদুল ওহাব মোঘল-বাদশাহের নিকট হইতে ১০২৪ হিজরী অর্থাৎ ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য "মদত্ অ মায়াস"রূপে বার্ষিক মোট আট হাজার টাকা আয়ের বেয়াল্লিশটি গ্রাম নিষ্কর ভোগের সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই সনন্দ হইতে দেখা যায়, তাঁহার ঠাকুরদাদা হজরত মৌলানা শাহ্ দৌলা সাহেব ৯২৫ হিজরীতে অর্থাৎ ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসেন। বাঘাগ্রামেই তাঁহার প্রধান প্রচারকেন্দ্র ছিল। এখানেই তাঁহার দেহাবসান হয়।

বাঙ্গালা দেশে, পঞ্চদশ, কি ষোড়শ শতাব্দীতে, এই শাহ্ দৌলা ব্যতীত এই নামের অন্য কোন খ্যাতনামা প্রচারক পীর আগমন করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয় এ যাবৎ আমরা কিছু জানি না। আমাদের বিশ্বাস, রাজশাহীর বাঘা গ্রামে সমাহিত পীর শাহ্ দৌলাই কবি শেখ চান্দের গুরু। রাজশাহীর পীর শাহ্ দৌলা ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্যই এ দেশে আসিয়াছিলেন। "রসূল-বিজয়ে"র ন্যায় হজরত মোহাম্মদের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করিবার জন্য আদেশ দেওয়া তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। বিশেষতঃ "রসূল-বিজয়ে"র প্রথমেই "মা'রফত্" অর্থাৎ ইস্‌লামী অধ্যাত্মবিষয়ক অনাবশ্যক কাব্য হিসাবে অনেক কথা সংযোজিত আছে; শাহ দৌলার ন্যায় সিদ্ধ পুরুষের সাহচর্য্যে রচিত বলিয়াই, পুস্তকখানিতে এই কথাগুলি সংযোজিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

আরও একটি কারণে, রাজশাহী জেলার পীর শাহ দৌলা সাহেবকে আমাদের আলোচ্য কবি শেখ চান্দের গুরু বলিয়া মনে করি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই বাঙ্গালা সাহিত্যের "বিজয়" কাব্যগুলি লিখিত হইয়াছিল; যেমন, "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" লিখিত হয় ১৪০২ শাকে অর্থাৎ ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে, "গোরক্ষ-বিজয়"ও আনুমানিক এই সময়ে, "জগন্নাথ-

হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে একই জাতীয় কাব্যরীতিতে লিখিত ভাল কাব্যগুলি ক্রমে ক্রমে এক হইতে দুই শতাব্দীর মধ্যেই লিখিত হইয়াছিল দেখা যায়। সুতরাং অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত "বিজয়" কাব্যের কাব্যরীতিতে লিখিত "রসূল-বিজয়" খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পরে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। যদি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই "রসূল-বিজয়" লিখিত হইয়া থাকে, তবে এই কাব্যে বর্ণিত পীর শাহ দৌলা রাজশাহী জেলার পীর শাহ দৌলা ব্যতীত অন্য লোক বলিয়া মনে হয় না। রাজশাহীর পীর শাহ দৌলা ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আগমন করেন। অতএব ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যেই কবি শেখ চান্দের আবির্ভাবকাল মনে করা যাইতে পারে।

কবি শেখ চান্দের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে একরূপ মোটামোটি ধারণা করা গেল। তাঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কবির কাব্যগুলির পাণ্ডুলিপি পূর্ব্ববঙ্গেই (ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম) অনুলিখিত, পঠিত ও রক্ষিত হইয়াছে সত্য, তাই বলিয়া কবিকে পূর্ব্ববঙ্গের (ত্রিপুরা বা চট্টগ্রাম জেলার) অধিবাসী বলিয়া অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কাব্যগুলির বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপিতে পূর্ব্ববঙ্গের (ত্রিপুরা বা চট্টগ্রাম জেলার) শব্দ ও ভাষাও যে পাওয়া যায় না, তাহা নহে। তাই বলিয়াও কবিকে পূর্ব্ববঙ্গের লোক বলিয়া অনুমান করা সমীচীন নহে। কেন না, পূর্ব্ববঙ্গের (ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের) নকলকারকদের হাতে এহেন ব্যাপার সাধিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। তাহা হইলে, কবির জন্মস্থান কোথায়? আমাদের ধারণা, কবি উত্তর-বঙ্গেরই অধিবাসী ছিলেন। এই ধারণাটি যে নিতান্ত অমূলক, তেমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। কেন না, আমরা কবির বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত "শাহ দৌলা পীর পুস্তক"এর শেষে দেখিতে পাই,—

"পুস্তক লেখীল আহ্মি না জানি কিছু সন্দি।
রিজিগের লাগি আহ্মি বিদেসেত বন্দি॥
বিদেসে রহিএ আহ্মি তারে নাহি ডর।
প্রভুর চরণ বিনে ভ্রসা নাহি মোর॥" (২৩-২)

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, কবি যেখানে বসিয়া পুস্তক লিখিয়াছিলেন, সেখানে তিনি বাস করিতেন না,—ইহা তাঁহার পক্ষে বিদেশ ছিল, এবং জীবিকার্জ্জনের জন্যই তিনি তথায় বাস করিতেছিলেন। কবির পীর শাহ দৌলা যখন ত্রিপুরা জেলার পাটিকারা পরগণায় বাস করিতেছিলেন, তখন তথায় থাকিয়া তিনি "শাহ দৌলা পীর পুস্তক" লিখিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

"রসূল-বিজয়" এবং "শাহ দৌলা পীর পুস্তক" পাঠে এই ধারণা মনে বদ্ধমূল হয় যে, চান্দ তাঁহার গুরুকে ছায়ার ন্যায় সর্ব্বত্র অনুসরণ করিয়াছিলেন। রাজশাহী জেলার বাঘা গ্রামেই পীর শাহ দৌলার স্থায়ী আস্তানা ছিল। সাধারণতঃ দেখা যায়,

ভক্ত হইয়া পড়ে এবং তাঁহাদিগকে যত্র তত্র ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে। তাই মনে হয়, বাঘা গ্রাম বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কবির বাস ছিল। এই স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কবির বাড়ী উত্তরবঙ্গে হইলে, তথায় তাঁহার কোন পুস্তকাদি বা স্মৃতি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইল না,—অথচ পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার কাব্য অনুলিখিত, পঠিত ও রক্ষিত হইল কেন? উত্তরে বলিতে পারা যায়,—মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদ যদি বাঙ্গালায় অনুকারিত ও রক্ষিত হয়, পশ্চিমবঙ্গের চণ্ডীদাসের পদ যদি পূর্ব্ববঙ্গেও পাওয়া যায়, মুর্শিদাবাদের সাধক কবি সৈয়দ মর্ত্তুজার পদাবলী যদি বৈষ্ণবসমাজ ও চট্টগ্রামের মুসলমান কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়, তবে উত্তরবঙ্গের শেখ চান্দের পুঁথি পূর্ব্ববঙ্গে অনুলিখিত, পঠিত ও রক্ষিত হইলে, তদ্দ্বারা কবিকে টানিয়া পূর্ব্ববঙ্গভুক্ত করা চলে না। অধিকন্তু উত্তরবঙ্গে এ যাবৎ মুসলমানদের পুঁথি সংগ্রহের কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চলে নাই বলিয়া, ঐ অঞ্চলে কবির পুঁথি ও স্মৃতি বিলুপ্ত হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে।

রসুল-বিজয়ের পরিচয়

এইবার আমরা কবি শেখ চান্দের "রসুল-বিজয়" কাব্য সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করিব। কেন না, কাব্য হিসাবে ইহার বিশেষ মূল্য থাকুক বা না থাকুক (এবং এই শ্রেণীর কোন কাব্যেরই কাব্য হিসাবে বিশেষ মূল্য নাই), বাঙ্গালার সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ঐস্লামিক সংস্কৃতি-বিস্তৃতির ধারা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কোন্ পথে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার সত্যকার প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, এই "রসুল-বিজয়" কাব্যখানির মূল্য যে অফুরন্ত, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যে 'বিজয়' কাব্য ও তাহার মূল বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে "বিজয়" কাব্যের অভাব নাই। এই সমুদয় কাব্যে যে সাহিত্য-রীতি গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা মূলতঃ এক। ইহাদের অন্য যে বৈশিষ্ট্যই থাকুক না কেন, তন্মধ্যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল,—এই কাব্যগুলিতে যাঁহাদের "বিজয়" অর্থাৎ প্রশস্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে, নানা প্রকৃত ও অপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশে তাঁহাদের মানবীয় জীবনটিকে অলৌকিক করিয়া তোলা। কাব্য-বর্ণিত চরিত্রগুলির মূল কাঠামো ঐতিহাসিক হইলেও, কবিগণ সৃষ্টির মোহে মুগ্ধ হইয়া, যত্র তত্র যেমন ভাবে কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়াছেন, তাহাতে সৃষ্টি যে শুধু অনাসৃষ্টিতে পর্য্যবসিত হইয়া নিতান্তই পৌরাণিক হইয়া পড়িয়াছে, তেমন নহে, বরং সৃষ্ট চরিত্রগুলি মানবীয় সীমারেখা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেবরাজ্যে প্রবেশ করায়, এই মহাপুরুষগণ পৌরুষ-বিহীন হইয়া মানব-জগৎ হইতে সমস্ত সম্বন্ধই ছিন্ন করিয়াছেন। মানবজাতির এই শিক্ষকগণকে কারণে অকারণে এহেনভাবে দেবতা করিয়া তোলার মধ্যে যে মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে আর্য্যজাতিসুলভ হিন্দু-মনোবৃত্তির চরম বিকাশ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। কেন না, সেমীয় (Semitic) জাতির মধ্যে (যেমন আরবের মুসলমানদের মধ্যে) মানব-শিক্ষকগণকে জগতের নিকট এমন দেবতারূপে দাঁড় করাইবার

বর্ত্তমান থাকে, একমাত্র হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী আর্য্যজাতির মহাপুরুষদের চরিত্রের সেই বৈশিষ্ট্যের অনেকাংশ দেবভাবের আরোপে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। মূলতঃ এই কারণেই "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" বা "জগন্নাথ-বিজয়" কাব্যের দেবরূপী মহাপুরুষগণকে মানবের শিক্ষকরূপে জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরা কতকটা অস্বাভাবিক। কেন না, পূর্ণ মানুষই অপূর্ণ মানুষের আদর্শ হইতে পারেন ; দেবতা দেবতার আদর্শ হইতে পারেন, মানুষের নহে।

'বিজয়'কাব্যে 'রসূল-বিজয়ে'র স্থান

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালার মুসলমানগণ যে "বিজয়"-কাব্যের সৃষ্টি করিলেন, তাহাকে বঙ্গীয় হিন্দুর "বিজয়"-কাব্য হইতে পৃথক্ করা চলে না। "রসূল-বিজয়ে" অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদের মাহাত্ম্যবর্ণনায় ফথে মোহাম্মদের পুত্র শেখ চান্দ যে কাব্য-রীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা মুসলমানদের হজরত মোহাম্মদ আর হজরত মোহাম্মদ রহেন নাই,—সোজা শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত হইয়াছেন। এদিক্ হইতে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, "রসূল-বিজয়" কাব্যখানি "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" কাব্যের একটি প্রতিরূপ মাত্র। আমাদের বিশ্বাস,—কবি তাঁহার কাব্যে এই কথা স্বীকার করুন বা না-ই করুন, "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" কাব্যই কবির আদর্শ ছিল। কেন না, আমরা দেখিতে পাই, "রসূল" অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদের জীবনের কতকগুলি সর্ব্বজনবিদিত ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যতীত অপরাপর সমুদয় অনৈতিহাসিক ও অপ্রাকৃতিক ঘটনায় "রসূল-বিজয়"-এর সহিত "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়"-এর সাদৃশ্য এতই ঘনিষ্ঠ যে, অনেক সময় আমরা পুস্তকদ্বয় পাঠকালে ঠিক করিতে পারি না যে, আমরা শ্রীকৃষ্ণের জীবনী পাঠ করিতেছি, না হজরত মোহাম্মদের। বলিতে কি, আরব দেশের স্থানগুলির নাম বাদ দিলে, মনে হইবে,—হজরত মোহাম্মদ বাঙ্গালায় জন্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু জাতির মধ্যেই ধর্ম্ম ও আপন মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন। কবি শেখ চান্দের হাতে পড়িয়া আরব যে শুধু বাঙ্গালা দেশে পর্য্যবসিত হইয়াছে তাহা নহে, আরবের নরনারী এবং তাহাদের আচার ব্যবহার পর্য্যন্ত বাঙ্গালার নরনারী ও তাহাদের আচার-ব্যবহারে পরিণত হইয়াছে।

'রসূল-বিজয়' 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র আদর্শে লিখিত হইল কেন ?

মুসলমান কবির দ্বারা হজরত মোহাম্মদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হওয়া সত্ত্বেও, এমন হইল কেন?—এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। কবির বংশ সম্বন্ধে যদি তাঁহার উক্তি সত্য হয়, অর্থাৎ তিনি যদি সত্যই "শেখ-" (আরবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপাধি) বংশজাত মুসলমান হন, তবে তাঁহাতে বাঙ্গালী বা হিন্দু মনোভাবের আরোপ করা অন্যায় হইবে। মনে হয়,—এদেশের নবদীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে ঐসলামিক সংস্কৃতি বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে এমনটি করা হইয়া থাকিবে। এ কথা নিতান্তই সত্য যে, এদেশের সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে পুরুষকারপূর্ণ হজরত মোহাম্মদের চরিত্র যতটা ক্রিয়া করিতে পারে না, তাঁহার প্রতি অযথা আরোপিত অলৌকিকত্ব ততোধিক ক্রিয়া করে। সুতরাং, বাঙ্গালার মুসলমান এবং হিন্দুর সম্মুখে হজরত মোহাম্মদকে দেবতারূপে দাঁড় করান, কবির পক্ষে

আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ এদেশের লোক দেবরূপী শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক জীবনের সহিত যতটা পরিচিত, ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সহিত তত পরিচিত নহে। অতএব, বাধ্য হইয়াই কবি শেখ চান্দ তাঁহার "রসূল-বিজয়ে" হজরত মোহাম্মদের জীবনে দেবত্ব ও অলৌকিকত্ব আরোপ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিলেন যে, মুসলমানদের মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ, হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে কোন অংশে কম নহেন, বরং বেশী; সুতরাং এমন অলৌকিক জীবন পাঠ করিয়া যেন লোক মুগ্ধ হয়, এবং দলে দলে ইস্‌লাম্ ধর্ম্ম গ্রহণ করে। আমরা পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাই,—এই কাব্যখানির পশ্চাতে ধর্ম্ম-প্রচারমূলক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। তাই কবি একাধিক স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"পাগল চান্দাএ কহে মুর্শ্বিদের বরে। রচুলবিজএ কথা রচিলুম পএয়ারে॥
সুনিলে পাতক নাসে অন্তে সর্গে ঠাম। জ্ঞান ধ্যেন বাড়এ পাএ নিজ নাম॥
ইহলোকে পরলোকে নিস্তার জাহান। রচুলবিজএ সুর সুনহ সাবধান॥

এইরূপে জনসাধারণকে নরকের ভয়, স্বর্গের প্রলোভন, ঐহিক সুখ্যাতির লোভ এবং তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির আশায় প্রলুব্ধ করিয়া, কবি যেখানে "রসূল-বিজয়"-এর কথা শুনাইয়াছেন, সেখানে কাব্য-প্রণয়নে কবির উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। এইরূপ নানা প্রলোভনে ধর্ম্ম-প্রচার করাই উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া, "রসূল-বিজয়" স্থানে স্থানে "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়"-এর খোলস বা মুখোস পরিধান করিয়াছে। নতুবা মুসলমান কবির হাতে হজরত মোহাম্মদের এহেন অলৌকিক চিত্র অঙ্কিত হইত না,—এ কথা একরূপ সুনিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে।

'রসূল-বিজয়' কাব্যে রসূল-চরিত

"রসূল-বিজয়"-এর সহিত "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়"-এর তুলনামূলক সমালোচনা করিতে হইলে, এই পুস্তকে কি ভাবে হজরত মোহাম্মদের জীবন চিত্রিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বপ্রথমে জানিয়া লওয়া উচিত। পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সহিত প্রায় সকলেই একরূপ সুপরিচিত। "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়"-এর শ্রীকৃষ্ণ ও পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং দুই পুস্তকের ঘটনা-সমাবেশ তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য "রসূল-বিজয়"-এর রসূল হজরত মোহাম্মদ সম্বন্ধে আমরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করিলাম।

"রসূল-বিজয়" পুস্তকে দেখিতে পাই,—জন্মের পূর্ব্বে হজরত মোহাম্মদ ব্রহ্ম-জ্যোতি-বৃক্ষে (বস্ত সুর ব্রিক্ষে) একটি পুষ্পরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহার মানবদেহ-ধারণের সময় উপস্থিত হইলে, 'নিরঞ্জন' স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলকে (Gabriel) সেই পুষ্পটি আহরণ করিয়া আনিয়া হজরত মোহাম্মদের ভাবী পিতা আবদুল্লার হস্তে দিতে আদেশ করিলেন। জিব্রাইল্ পুষ্প আহরণ করিতে গিয়া দেখিলেন, ফুলটিকে সত্তর হাজার ফেরেস্তা (স্বর্গীয় জীববিশেষ) পাহারা দিয়া রক্ষা করিতেছে; ফেরেস্তাগণ জিব্রাইল্‌কে পুষ্প আহরণে বাধা প্রদান করিল। অতঃপর প্রভু নিরঞ্জনের প্রভাবে জিব্রাইল্ পুষ্প আহরণ করিয়া আনিয়া, তাহা আবদুল্লার হাতে প্রদান করিলেন। আবদুল্লা তাহার ঘ্রাণ

আবদুল্লা এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় গন্ধে পরিপূর্ণ হইলেন। তাঁহার শরীর হইতে যে সুগন্ধ চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল, তাহাতে—

"মনুষ্য আদি যত জীব আছে পৃথিবীত। মুরের সুগন্ধে তারা হৈল আমোদিত ॥
নবীন বসন্ত যেন হৈল উপস্থিত। মত্ত হৈয়া কোকিলায় ডাকে সুললিত ॥
যুবক যুবতী যেন হৈল পুলকিত। কেদার সময়ে হৈল বসন্তের রীত ॥
আপনা অঙ্গের গন্ধ আবদুল্লায় পাইয়া। ভ্রমিতে লাগিল বীরে মোহিত হইয়া ॥"

(নবম অধ্যায়)

এইরূপে কস্তুরী-মৃগের ন্যায় আপন গন্ধে মোহিত হইয়া আবদুল্লা যখন নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন যে ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিত, সে-ই মুগ্ধ হইয়া যাইত। হজরত মোহাম্মদের ভাবী স্ত্রী বীবী খদীজা এই সময়ে তাঁহাকে দেখিলেন; দেখিয়া তিনিও মুগ্ধা হইয়া গেলেন। যে দিন আবদুল্লার সহিত তাঁহার দেখা হয়,—

"সে দিন খদিজা বিবি যুবতী আছিল। উদরে লইতে চন্দ্র মনেতে ভাবিল ॥
. . .　　. . .　　. . .　　. . .
আবদুল্লার মুণ্ডে দেখি চন্দ্রের প্রকাশ। এ তিন ভুবন ভরি অমৃত পিতে আশ ॥"

কিন্তু, বীবী খদীজার সে আশা পূর্ণ হয় নাই; তিনি হজরত মোহাম্মদের মাতা হইতে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেও, ভগবানের ইচ্ছায় তাহা হয় নাই (দশম অধ্যায়)।

হজরত মোহাম্মদের ভাবী মাতা আমিনা 'নফলঙ্গ' নামক এক আরব্য রাজার নন্দিনী ছিলেন। তিনি তখনও অনূঢ়া যুবতী; তাঁহার নিটোল যৌবন, অপরূপ রূপ ও অপূর্ব্ব লাবণ্য তখনও উছলিয়া পড়িতেছে। তিনি আরব-রাজ-নন্দিনী হইলেও, সম্পূর্ণই বঙ্গীয় রমণীরূপে তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় হইতেছে। কেন না, আমরা দেখিতেছি,—

"অঞ্জন রঞ্জিত হৈল নয়ানের কোলে। পদপরে ভোমরাএ মধুলোভে ভোলে ॥
নাসিকা শোভএ যেন এক তিলফুল। বেশর শোভএ তাতে মুকুতা হিন্দোল ॥
গৃধিনী পক্ষিনী জিনি শ্রবণ শোভিত। মণিমএ কুণ্ডল আছে তাতে বিরাজিত ॥
সুন্দর তিলকের চন্দনের বিন্দু। সূর্য্য আশ্রাদিয়া যেন রহিয়াছে ইন্দু ॥
চাচর চিকুর দেখি চামরী লজ্জিত। তাতে বেণী শোভা করে ভুজঙ্গী সহিত ॥
রক্তবর্ণ অধর জিনিয়া বিম্বফল। মুকুতার হার জিনি দশন বিমল ॥
মৃণাল জিনিয়া শোভিয়াছে দুই কর। কেয়ূর কঙ্কণ তাতে দেখিতে সুন্দর ॥
বাহুমূলে নবরঙ্গ দেখিতে শোভিত। যার তেজে দশ দিক করে আমোদিত ॥
গ্রীবা পরে শোভিয়াছে মণিরত্ন হার। দিনমণি পাএ দীপ্তি হরে অন্ধকার ॥
মৃগরাজমধ্য জিনি কটি অতি খিনি। উরুযুগ সুললিত রামরম্ভা জিনি ॥
চরণ শোভএ মণিমএ বৃক্ষরাজ। কনক নেপুর তাতে অধিক বিরাজ ॥

এহেন বঙ্গীয় অলঙ্কারে সুশোভিতা, বঙ্গীয় সৌন্দর্য্য-বিমণ্ডিতা, তিলক-বিন্দুশোভিতা রমণী আরবের কুত্রাপি দেখা যায় বলিয়া মনে হয় না।* ইনি যে আমাদেরই গৃহলক্ষ্মী, যেন আরবে

সেবন করিতেছিলেন, এমন সময় আপন অঙ্গ-সুরভি-প্রমত্ত আবদুল্লা সেই "টঙ্গী"র পাশ দিয়া যাইতে, বীবী আমিনা তাঁহাকে দেখিলেন। আবদুল্লার বদন-মণ্ডলে "নুর-ই-মোহাম্মদী" (মোহাম্মদের জ্যোতিঃ) চম্‌কাইতেছিল ; তাই—

"পরম সুন্দরী কন্যা নব যুবকলা। দেখিয়া নুরের রঙ্গ বিমোহিত ভেলা ॥"

বিমুগ্ধা আমিনার মনে প্রেম জাগিল, তাঁহার কামনার বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আবদুল্লাকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং তাঁহার সহিত অবৈধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। আবদুল্লা এহেন বিগর্হিত কার্য্যে অস্বীকৃতি প্রকাশ করিলে, বীবী আমিনা তাঁহাকে ঐ মুহূর্ত্তেই বিবাহ করিতে প্রস্তাব করেন। তৎক্ষণাৎ বিবাহ সম্পন্ন হওয়া স্থির হইল। কবি বলিতেছেন,—

"আল্লার হুকুম পাইয়া চারি ফিরিস্তাএ। ধরিয়া মৌলানা ভেস মক্কা দেশে যাএ॥
দস্তার জুব্বা পিন্ধি আসা করি হাতে। ধীরে ধীরে চলি যাএ তছবি অঙ্গুলিতে ॥
... ...
বিবার সঞ্জগ তবে সত্বরে করিল। পানফুল সিরিণী ফাতেহা করাইল ॥
আমিনা সহিত পুনি বসিল আবদুল্লা। মহত্বর জিব্রিল মৌলানা হইলা ॥
মহত্বর মিকাইল হইল উকিল। আমিন হইল আজ্রাইল ইস্রাফিল ॥
আমিনা আবদুল্লা দোঁহ নিকা পড়াইয়া। জিলুয়া দিলেক মধ্যে অন্তসপট দিয়া ॥"

এইরূপে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, পিতামাতার অজ্ঞাতসারে, নির্জ্জন টঙ্গীতে, উপর্য্যুক্ত স্বর্গীয় দুতচতুষ্টয়ের সহায়তায় আমিনার সহিত আবদুল্লার বিবাহ হইয়া গেল (একাদশ অধ্যায়)। বিবাহের পর, তাঁহারা রতি-ক্রীড়ায় প্রমত্ত হইলেন। ভাবী 'পয়গম্বর' (ঐশ সংবাদবাহক) হজরত মোহাম্মদ এই সময়ে আবদুল্লার নিকট হইতে আমিনার গর্ভে প্রবেশ করিলেন। (দ্বাদশ অধ্যায়)। ইতিমধ্যে হজরত মোহাম্মদের ভাবী স্ত্রী বীবী খদীজার সহিত এক বণিকের বিবাহ হইয়া গেল (ত্রয়োদশ অধ্যায়)।

এ দিকে, বীবী আমিনার বিবাহের সূত্র ধরিয়া, তাঁহার শ্বশুর 'নফলঙ্গ' রাজার সহিত আবদুল্লার বিবাদ উপস্থিত হইল। পরিশেষে এই বিবাদ যুদ্ধে পর্য্যবসিত হয়। এই যুদ্ধে আবদুল্লা অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে সংহার করিবার জন্য,—

"নৃপতির সৈন্য তবে মারে নানা অস্ত্র। অন্ধকার কৈল বাণে পৃথিবী সমস্ত ॥
শেল শূল শক্তি গদা মুসল মুদ্গর। নারাচ নালিকা খস্তা পাশ বহুতর ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ আর খুরচন্দ্র মারে। নেঞ্জা বাজি নেঞ্জী সম পড়এ চারি ধারে॥
ঝাকে ঝাকে বরিসএ আবদুল্লা উপর। সংখ্যা নাই বাণ যত ছুটিল লস্কর ॥"

কিন্তু, এত আয়াস স্বীকার ও আয়োজন করিয়াও বীর আবদুল্লাকে 'নফলঙ্গ'রাজ-সৈন্যগণ মারিতে পারিল না। কেন না, অপূর্ব্ব সংগ্রাম-কৌশল ও শৌর্য্যবলে—

"গদা ভ্রমাইয়া বীর যেই দিকে যাএ।

পরিশেষে 'নফলঙ্গ'রাজ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন; আবদুল্লা তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিলেন। কিন্তু ভ্রাতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার বশে আবদুল্লা স্বয়ং সিংহাসনে উপবিষ্ট না হইয়া, তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবু জেহেলকে সিংহাসনে বসাইলেন (চতুর্দ্দশ অধ্যায়)। আবু জেহেল রাজা হওয়ার পর, ইউসুফ কাহন নামক এক সুদক্ষ জ্যোতিষী পণ্ডিত তাঁহার মন্ত্রী হইল। সে জ্যোতিষ-শাস্ত্র সাহায্যে রাজার শুভাশুভ গণনা করিয়া দেখিল যে, আবদুল্লার ঔরসে ও বীবী আমিনার গর্ভে মোহাম্মদ নামে এক সন্তান জন্মিবে, এবং সেই শিশু—

"এ সব আচার যত কিছু না রাখিব।
মুছলমান করি সব লোক নিস্তারিব॥"

অতএব এই কুলনাশক, ধর্ম্মনাশক, আচার-বিচার-নাশক মোহাম্মদের হাত হইতে নিস্তার লাভ করিতে না পারিলে, রাজা আবু জেহেলের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। ইহা শুনিয়া রাজা আবু জেহেল বিচলিত হইলেন, এবং অন্তঃসত্ত্বা বীবী আমিনাকে ধরিয়া আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন (পঞ্চদশ অধ্যায়)। যথাসময়ে দূত আমিনার নিকট পৌঁছিল ; আমিনা সমস্ত কথা দূত-মুখে অবগত হইলেন, এবং গর্ভস্থ সন্তানের জীবন-নাশের আশঙ্কায় ভীতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন (ষোড়শ অধ্যায়)।

অতঃপর আমিনাকে রাজা আবু জেহেলের নিকট নেওয়া হইল। তখন আমিনা পাঁচ মাস গর্ভবতী। আবু জেহেল তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানকে ভ্রূণাবস্থাতেই হত্যা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন এবং বীবী আমিনাকে হস্তীর পদতলে ফেলিয়া, সর্পের দ্বারা দংশন করাইয়া, অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, পাথরের উপরে আছাড় মারিয়া তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানটিকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আবু জেহেল যখন দেখিলেন যে, উদরস্থ শিশুর অলৌকিক ক্ষমতায় তাঁহার সৌভাগ্যবতী মাতার কোনই অনিষ্ট হইল না, তখন তিনি চিন্তাকুল হইয়া ইউসুফ কাহনকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"হস্তিদন্তে সর্পাঘাতে অগ্নিতে দাহন। পাষাণ উপরে মারি উদরে ঘাতন॥
কোন মতে না মরিল কুলনষ্টকারী। যুক্তি কর এবে তারে কিরূপেতে মারি॥

রাজা আবু জেহেল হজরত মোহাম্মদকে মারিবার জন্য তদীয় মন্ত্রী ইউসুফ কাহনের সহিত নূতন পন্থা উদ্ভাবনে তৎপর হইলেন, বীবী আমিনাও এবারের মত রক্ষা পাইলেন (সপ্তদশ অধ্যায়)। কিন্তু তিনি অকারণে উপর্য্যুক্ত প্রকারে অপদস্থা ও লাঞ্ছিতা হইয়া, তাঁহার স্বামী আবদুল্লার নিকট আবু জেহেলের বিরুদ্ধে অনুযোগ করিলেন। ভ্রাতৃভক্ত আবদুল্লা এই বিষয়ে কোন প্রতিবিধান না করিয়া, বীবী আমিনাকে সান্ত্বনা দিলেন যে,—

"তোমার নিকমে বিবি নবি উপজিছে। তানে পরীক্ষিতে প্রভু এতেক করিছে॥

... ...

সাধু সাধু নাম তোর জগতে ঘোষিব। অপার মহিমা তোর ভুবনে বাড়িব॥
নারীর মেলেতে তুমি জানি মহাসতী। আল্লার পরম সখা যে ভাগে উৎপতি॥"

সৌভাগ্যের কথা নয়। বিশেষতঃ ইতিমধ্যেই এই অলৌকিক পুরুষের মাহাত্ম্যও দেখা গিয়াছে। সুতরাং বীবী আমিনা ভাবী পয়গম্বরের মাতা হইবার আশা ও আশ্বাসে বুক বাঁধিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন (অষ্টাদশ অধ্যায়)।

এদিকে রাজা আবু জেহেল ও মন্ত্রী ইউসুফ কাহন হজরত মোহাম্মদকে মারিবার জন্য পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে, আমিনার প্রসবকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে পাহারা দিবার জন্য একজন ধাত্রীকে নিযুক্ত করা হউক, এবং তাহাকে আদেশ দেওয়া হউক যে,—

"যেই ক্ষণে হএ শিশু আমিনার ঘরে। সেই ক্ষণে শিশু আনি ভেটাইবা মোরে॥
দাগা দিয়া গুপ্ত যদি কর কদাচিত। অগ্নিএ দহিমু তোরে বংশের সহিত॥

এহেন কঠোর আদেশ সহ একজন ধাত্রীকে বীবী আমীনার নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হইল। ধাত্রী চৌদ্দ মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখিল যে, আমিনা সন্তান প্রসব করিতেছে না, তখন সমস্ত ব্যাপার সে আবু জেহেলকে নিবেদন করিল। আবু জেহেল জোর করিয়া সন্তান প্রসব করাইতে আদেশ দিলেন। ধাত্রী রাজাজ্ঞা পালন করিতে গিয়া, গর্ভস্থ মোহাম্মদের অলৌকিকতার আভাসে মুগ্ধ হইয়া মুসলমান হইল (ঊনবিংশ অধ্যায়)।

হজরত মোহাম্মদ অষ্টাদশ মাস মাতৃজঠরে ছিলেন। তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় উপস্থিত হইল। এই সময়ে, যাহাতে শয়তান তাহার স্বভাবসিদ্ধ দুষ্কৃতের দ্বারা হজরতের জন্মের পবিত্রতা নষ্ট করিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি মাতৃজঠর হইতে আল্লার নিকট অনুরোধ করিয়া শয়তানকে বন্দী করাইলেন (বিংশ অধ্যায়)। শয়তান অনন্যোপায় হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল (একবিংশতি অধ্যায়), আর সহস্র সহস্র ফেরেস্তার রক্ষকতায় হজরত ভূমিষ্ঠ হইলেন। এইবার ধাত্রী মহা সমস্যায় পড়িয়া গেল। সৌভাগ্য-ক্রমে ইতিপূর্ব্বে তাহারও একটি সন্তান প্রসূত হয়। ধাত্রী তাড়াতাড়ি হজরত মোহাম্মদের জন্মের পর, তাঁহার—

"নাড়ি ছেদ করি ধাত্রি শিশু লৈয়া কোলে। ভকতি মিনতি করি রছুলেত বোলে॥
তোমার বদলে আমি নিজ পুত্র দিমু। পরম জত্তনে তোমা লুকাইয়া রাখিমু॥"

অমনি জিব্রাইল্ অন্তরীক্ষ হইতে ভবিষ্যদ্বাণী করিল যে, আবু জেহেলের হাতে ধাত্রী-পুত্র নিহত হইবে। ধাত্রী তাহাতে বিচলিত হইল না, বরং সন্তুষ্টচিত্তে,—

"আপনার ঘরে ধাত্রি রছুলক থুইল।
আপনার শিশু লইয়া সত্বরে চলিল॥"

ঠিক এই সময়ে, ধাত্রীর অবিদ্যমানে হালিমা নাম্নী এক রমণী ধাত্রীর ঘরে আসিল। এই রমণীটীর পিত্রালয় মক্কাদেশে এবং শ্বশুরালয় বসরায় ছিল। সে ধাত্রীর ঘরে পৌছিয়া দেখিল যে, শিশু মোহাম্মদ ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে মনে মনে কহিল,—"যদি এই শিশু আমার হইত"। অমনি—

"হালিমাএ এহি মতে মনেত ভাবিতে। জিবরিল ডাকি বোলে থাকিয়া শূন্যেতে॥
... ...
এহি শিশু দিল তোমা প্রভু নিরঞ্জন। পরম যতনে শিশু করহ পালন॥

এইরূপে শিশু মোহাম্মদ বসরায় নীত হইলেন। তথায় হালিমা ও তাহার স্বামীর আদরে তিনি পরম যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন (দ্বাবিংশ অধ্যায়)। ধাত্রী তাহার সদ্যোজাত শিশুটিকে আবু জেহেলের নিকট পৌছাইয়া দিল। এই শিশুর নাম আহ্মদ্। আবু জেহেল আহ্মদ্‌কে মোহাম্মদ্ মনে করিয়া শিলার উপরে আছাড়িয়া মারিবার ব্যবস্থা করিলেন ; কিন্তু তাহাতে শিশুর মৃত্যু হইল না। পরিশেষে আহমদ্ ইচ্ছামৃত্যু গ্রহণ করিল। আবু জেহেল মনে করিলেন, হজরত মোহাম্মদ মরিয়াছে। (ত্রয়োবিংশ অধ্যায়)।

ইতিমধ্যে হজরত মোহাম্মদের মাতা বীবী আমিনা পরলোক গমন করিলেন। (চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়)। আবু জেহেল প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, তিনি হজরত মোহাম্মদকে হত্যা করিয়াছেন। আবু তালেবপ্রমুখ কোরেশবংশীয় প্রধানগণ এই কথা জানিতে পারিয়া হজরত মোহাম্মদের জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা বসরা হইতে হালিমা, অপোগণ্ড শিশু হজরত মোহাম্মদকে লইয়া, কোরেশবংশীয় প্রধানদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া,—

"তা সবার আগে ধাত্রি শিশু লইয়া যাইতে। নিজরূপ রছুলে ধরিল অলক্ষিতে ॥
পূর্ণমাসী চন্দ্র যেন উজ্জ্বল বদন। উচ্চ নাসাদণ্ড কোটি পঙ্কজ লোচন ॥
... ...
লনীর পুতলী তনু প্রাতঃসূর্য্য প্রাএ। হেরিতে তাহার অঙ্গ চক্ষে ঝিম খাএ ॥
... ...
মৃণাল জিনিয়া বাহু অধিক সুঠাম। রিপুকুলহতকারী বজ্রের সমান ॥
... ...
সিংহ জিনি মধ্যভাগ খিন অতিশএ। গজশুণ্ড জিনি উরু অতি সুলম্বএ ॥
... ...
শির পরে মেঘ যত চক্রপ্রায় হইয়া। সূর্য্য জ্যোত না লাগে অঙ্গে ছায়াহীন কায়া ॥
এহি মতে রূপ দেখি শিশুর লক্ষণ। আবু তালিব আদি সচকিত মন ॥"

শিশু হজরত মোহাম্মদ স্ববংশীয় কোরেশ-প্রধানদের সম্মুখে এহেন ভাবে নিজরূপ ব্যক্ত করায়, কোরেশেরা বুঝিল যে, তখনও হজরত বাঁচিয়া রহিয়াছেন। ইহাতে তাহাদের সমস্ত উৎকণ্ঠা দূরীভূত হইল, এবং তাহারা নিতান্তই সন্তুষ্ট হইল (পঞ্চবিংশ অধ্যায়)।

অতঃপর হালিমা, শিশু মোহাম্মদকে লইয়া বসরা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল মোহাম্মদকে হালিমার নিকট হইতে চুরি করিয়া লইয়া গেল (ষড়্বিংশ অধ্যায়)। জিব্রাইল যথাকালে হজরতকে মক্কায় তাঁহার পিতামহের নিকট পৌছাইয়া দিল। কোরেশগণ আবু জেহেলের ভয়ে হজরতকে লুকাইয়া রাখিল (সপ্তবিংশ অধ্যায়)। হজরত গুপ্তভাবে কোরেশদলে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে, তিনি মাঠে অপরাপর কোরেশবালকদের সহিত ছাগ চড়াইতে যাইতেন। একদা ছাগ-চারণ-মাঠে তাঁহার নিকট জিব্রাইলের আবির্ভাব ঘটিলে,—

"জিবরিলে বোলে শুন হুকুম আল্লার। আজ্ঞা হৈছে তোমা হতে পিত্ত কাটিবার ॥
ফর্ম্মান শুনিয়া নবি ধ্যানেতে রহিল। অলক্ষিতে জিবরিল পিত্ত নিকালিল ॥

এইরূপে হজরত মোহাম্মদ শৈশবেই জিব্রাইল্ কর্ত্তৃক বিশুদ্ধীকৃত হইলেন। তাঁহার পঞ্চভূত-নির্ম্মিত মানব-শরীর হইতে ভূত-সঞ্জাত দোষাদি পরিষ্কৃত হইল। সুতরাং, তিনি মর্ত্ত্যের মানব হইলেও, দেহধারী অবস্থাতেই তাঁহার দেবত্ব প্রাপ্তির পথ আরও পরিষ্কৃত হইল (অষ্ট-বিংশ অধ্যায়)।

এই ঘটনার পর, রাজা আবু জেহেলের সহিত হজরত মোহাম্মদের শত্রুতা আরম্ভ হয়। ফলে, কোরেশ-প্রধান আবু তালেব নিহত হইলেন বটে, কিন্তু আবু জেহেল হজরতের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিলেন না। কোনরূপে হজরত মোহাম্মদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া, পরিশেষে আবু জেহেল শত্রুতা ত্যাগ করিয়া, উদারপন্থী হইয়া প্রচার করিলেন যে,—

"কেহ বোলে রাম ভাব কেহ বোলে হরি। কেহ বোলে কৃষ্ণ ভাব তবে ভব তরি॥
কেহ বোলে ব্রহ্মনাম করহ স্মরণ। কেহ বোলে ধ্যানে রহ অতীত লোচন॥
কেহ বোলে কৃষ্ণ ভাব একচিত্ত হইয়া। পরম আনন্দে যাইবা শমন তরিয়া॥
অন্তকালে ঔষধ ইহা বিনে নাই। আবু জাহিলে বোলে বড় জনে ভাই॥"

(ঊনত্রিংশ অধ্যায়)।

হজরত মোহাম্মদে বঙ্গীয়ত্ব আরোপ

তার পর, ত্রিংশ অধ্যায় হইতে ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় পর্য্যন্ত, নানা ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক গল্প গুজবের ভিতর দিয়া, অনেক কথাই বলা হইয়াছে। নানা ভাবে, নানা ভঙ্গীতে হজরত মোহাম্মদের মাহাত্ম্য প্রচার করাই এই বর্ণনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সুদীর্ঘ বর্ণনার অধিকাংশ স্থানে হজরত মোহাম্মদের ধর্ম্ম-প্রচার-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারের বর্ণিত ধারার প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, যেন তিনি বাঙ্গালা দেশের হিন্দুদের মধ্যেই প্রচার-কার্য্য চালাইয়াছিলেন। তাঁহাকে আরবী বা তাঁহার প্রচারক্ষেত্রকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আরব বলিয়া মনে হয় না। তিনি যেন বাঙ্গালীর পোষাকেই গৃহে থাকেন এবং যখন ধর্ম্ম-প্রচার করিতে বহির্গত হন, কেবল তখনই তিনি মাথায় 'দস্তার' অর্থাৎ পাগড়ী বাঁধেন, গায়ে 'জুব্‌বা' নামক আল্‌খেল্লাজাতীয় দীর্ঘ জামা পড়েন, দক্ষিণ হস্তে 'তস্‌বি' বা জপমালা ও বাম হস্তে 'আসা' বা যষ্টি ধারণ করেন, তাঁহার পরিধানে 'ইজার' বা পাজামা ও পায়ে এক জোড়া খড়ম থাকে। এইরূপে সজ্জিত হইয়া তিনি যখন বৃদ্ধের ন্যায় 'তস্‌বি' জপিতে জপিতে অগ্রসর হন, তখন 'কাফের' বা বিধর্ম্মীরা তাঁহার দিকে তাকাইয়া বিদ্রূপের হাসি হাসে[১]। কিন্তু তিনি তাঁহার কার্য্য করিয়া যান। একদা হজরত আবু বকর সিদ্দিক মুসলমান হইলেন। ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে সকলে মিলিয়া—

১। "তাহা শুনি পএগম্বর চলিল তখন। মুছলমানী ভেস করি পরিল বসন॥
শিরেত দস্তার বান্ধে জুব্‌বা দিল গাএ। ডাইন হাতে তছবি জপে আসা হাতে বাঁএ॥
ইজার পিন্ধিল নবি পিলুহুদ (?) করি। পাতার উপরে গিরি বন্দ লইল ঘিরি (?)॥
পাএত পরিল নবি খড়ম এক জোড়া। দেখিতে তাহান ভেস যেন মত বুড়া॥

"ধুতি উতারিয়া তারে ইজার পরাইল। টিকী মুড়াইয়া তারে শিরে টুপি দিল॥
গিলাপ কাড়িয়া তারে পরাইল নিমা। মুছলমান কৈল তারে পড়াই কলিমা॥

(৪২শ অধ্যায়)

এইরূপে আরবের অধিবাসীরা হজরতের প্রচারে ধুতি, টিকী, চাদর (গিলাপ) ছাড়িয়া কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইয়াছিল। আবার দেখিতে পাই, তিন জন ব্রাহ্মণ ইস্‌লাম গ্রহণ করিল। দীক্ষা গ্রহণের পর তাহাদের অনুষ্ঠানের নমুনা এইরূপ,—

"এহি মতে তিন দ্বিজ মুছলমান হৈল। পুরাণ করিয়া রদ কোরাণ লইল॥
মূর্ত্তিপূজা রদ করি নমাজ পড়ে নিতি। হরির নাম রদ করি কলেমা করে স্থিতি॥
কৃষ্ণনাম রদ করি বোলে মোহাম্মদ। টিকী মুড়াইয়া শিরে টুপি দিল ছদ॥
কৃষ্ণনাম রদ করি আল্লার যে নাম। সকল ত্যজিয়া তারা লৈল এহি কাম॥

(৫৯-১)

আরব (?) দেশের ব্রাহ্মণত্রয় ত এই ভাবে মুসলমান হইয়া গেল, কিন্তু তাহাদের আত্মীয়-স্বজন হিন্দু থাকিয়া যাইবে, এ কথা তাহাদের সহ্য হয় নাই। তাহারা তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকেও স্বদলে টানিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের আত্মীয়েরা নব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না লইয়া, তাহা গ্রহণ করিতে চাহে নাই। তাই, নব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থে—

"এহি তিন দ্বিজ বোলে শুন জ্ঞাতিগণ। কোরান পুরাণে করি আতশে স্থাপন॥
হুতাসনমুখ হতে যেবা বাহুড়িব। সর্ব্বজন মিলি তারে পঠন পড়িব॥
এহি বাক্যে অঙ্গীকার করে সর্ব্বজন। কোরান পুরাণে কৈল আতশে স্থাপন॥
পুরাণ পুড়িয়া গেল কোরান বাহুড়িল। কোরান বড় হৈল মানিয়া লইল॥" (৫৯-২)

ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দু, মুসলমান হইয়া, কি ভাবে তাহার আত্মীয় স্বজনকেও মুসলমান করিতে চেষ্টা করিত, ইহা হইতে আমরা তাহার আভাস পাইতেছি। ধর্ম্ম-প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে এহেন যুক্তির বহর দেখিয়া কাহার না হাসি পায়? অথচ এইরূপেই এ দেশে মুসলমানধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। *

মুহম্মদ এনামুল হক

* বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৬ই পৌষ, অষ্টম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত সঙ্কেতটির উদ্ভাবনকাল

স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত সঙ্কেতটি আমরা সকলেই শৈশবে আয়ত্ত করিয়াছি। ইহা এত সহজ যে, ইহার উদ্ভাবন আয়াসসাধ্য হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। বরং মনে হয়, যখন চিহ্নের সাহায্যে সংখ্যালিখনের আরম্ভ হইয়াছিল, তখনই এই সঙ্কেতটি উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ মনে করিবার উপযুক্ত কারণ নাই। প্রাচীন মিশর, বেবিলন, গ্রীস ও চীনদেশে এবং রোমকরাজ্যে পণ্ডিতের অভাব ছিল না, গণকেরও অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহারাও এই সহজ সঙ্কেতটি বাহির করিতে পারেন নাই। কোন্ প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী এই সঙ্কেতটি কখন্ উদ্ভাবন করিয়া মানবজাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। ইহা নির্ণয় করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যার ২২ পৃষ্ঠায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—"খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে কৌটিল্য স্থানীয়-মানতত্ত্ব অবগত ছিলেন এবং সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ তৎসহ শব্দ প্রয়োগ করিতেন।" তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন যে, জৈনগ্রন্থ অনুযোগদ্বারসূত্র ও ব্যবহারসূত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যা লিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জ্ঞাত ছিল[১]। কৌটিল্য স্থানীয়মানতত্ত্ব জানিতেন কি না, পরে আলোচিত হইবে। কৌটিল্যের অন্যূন ৭৫০ বৎসর পরে ৪৭৬ খ্রীষ্টীয় অব্দে বৃদ্ধ আর্য্যভট জন্মগ্রহণ করেন। এই ৭৫০ বৎসরের মধ্যে "মূলপুলিশসিদ্ধান্ত" ও "পিঙ্গলছন্দঃসূত্র" কেবল এই দুইখানি গ্রন্থে দত্ত মহাশয় স্থানীয়মান-তত্ত্বের অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন[২]। তাঁহার মতে সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার ভট্টোৎপল বরাহমিহির-রচিত বৃহৎসংহিতার স্বপ্রণীত টীকায় "মূলপুলিশসিদ্ধান্ত" হইতে নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"খখাষ্টমুনিরামাশ্বিনেত্রাষ্টশররাত্রয়ঃ।
ভানাং চতুর্যুগেনৈতে পরিবর্ত্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

ভট্টোৎপলের টীকার সহিত মিলাইয়া দেখিতে পাই যে, দত্ত মহাশয় দুইটি ভুল করিয়াছেন। বচনটির প্রথম পঙ্‌ক্তিতে 'রাত্রয়ঃ' স্থলে "রাত্রিপাঃ" হইবে। বচনটির প্রথম

১। The Jaina School of Mathematics, Bulletin of the Calcutta Mathematical Society, Vol XXI (1929), No. 2, p 139.

২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (বঙ্গাব্দ ১৩৩৫) ১ম সংখ্যা, ১৭ পৃষ্ঠা।

পঙ্‌ক্তিতে খ (০), খ (০), অষ্ট (৮), মুনি (৭), রাম (৩), অশ্বি (২), নেত্র (২), অষ্ট (৮), শর (৫) এবং রাত্রিপ বা চন্দ্র (১) দ্বারা ১৫৮২২৩৭৮০০ সংখ্যাটি ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব বচনটির রচনাকালে স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি প্রচলিত ছিল—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বচনটি "মূলপুলিশসিদ্ধান্ত" হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া ভট্টোৎপল লিখেন নাই। এই বচনটির অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছেন,—

"তথা চ পুলিশসিদ্ধান্তে পঠ্যন্তে নক্ষত্রপরিবর্ত্তাঃ।"

[বৃহৎসংহিতা, ৺সুধাকর দ্বিবেদিকৃত সংস্করণ, ২৭ পৃষ্ঠা]

দত্ত মহাশয় স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, পুলিশসিদ্ধান্তের লাটকৃত সংস্করণের পরে আরও সংস্করণ হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় এবং ভট্টোৎপল ঐ প্রকারের দুইখানি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া একটাকে বলিয়াছেন "পুলিশসিদ্ধান্ত," অপরটির নাম দিয়াছেন "মূলপুলিশসিদ্ধান্ত"।[৩]

অতএব মনে হয় যে, ভট্টোৎপল উক্ত বচনটি "মূলপুলিশসিদ্ধান্ত" হইতে উদ্ধৃত করেন নাই, স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেত প্রচলিত হওয়ার পরে পুলিশ-সিদ্ধান্তের যে সকল সংস্করণ রচিত হইয়াছিল, তাহাদের কোনও একটি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মূলপুলিশসিদ্ধান্তের রচনাকালে অর্থাৎ "খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকেও সংখ্যানির্দ্দেশক নাম স্থানীয়মান সহকারে ব্যবহৃত হইত"—দত্ত মহাশয়ের এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে।

পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে দুই বা ততোধিক সংখ্যাবাচক শব্দকে সমাসবদ্ধ করিয়া সংখ্যাজ্ঞাপক অনেক শব্দ রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের একটিতেও স্থানীয়মানতত্ত্ব ব্যবহৃত হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ভূতেন্দ্রিয়বস্বৃষি' শব্দটি লওয়া যাউক। ইহা দ্বারা ভূত (৫) + ইন্দ্রিয় (৫) + বসু (৮) + ঋষি (৭) বা ২৫ এই সংখ্যাটি বুঝান হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ের ৩০ সূত্রে 'ক্রৌঞ্চপদা' নামক ছন্দের লক্ষণ প্রসঙ্গে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে ২৫টি অক্ষর থাকিবে এবং ৫টি, ৫টি, ৮টি ও ৭টি অক্ষরের পর যতি হইবে, ইহাই ঐ শব্দটি দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ের ২৯ ও ৩০ এই দুইটি সূত্র হইতে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, তৎকালে শূন্যচিহ্নের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—"স্থানীয়-মানতত্ত্ব ব্যতীত শূন্যচিহ্ন পরিকল্পনা করা নিরর্থক। বস্তুতঃ তাহারা উভয়ে সহজাত।"[৪] খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বেবিলনে শূন্য বুঝাইতে চিহ্নবিশেষ ব্যবহৃত হইত[৫]। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে মধ্য আমেরিকারময়জাতির মধ্যে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রচিহ্ন দ্বারা শূন্য বুঝান

৩। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (বঙ্গাব্দ ১৩৩৫), ১ম সংখ্যা।

৪। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ১ম সংখ্যা, ২৩পৃঃ।

৫। Cajori, A History of Mathematics (1922), p 5.

Peet, The Rhind Mathematical Papyrus (1923) p. 28

হইত। কেহ কেহ বলেন, বেবিলনবাসিগণের ও ময়জাতির সংখ্যালিখনে গুরুতর দোষ থাকা সত্ত্বেও স্থানীয়মানতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। বর্ত্তমান লেখক অন্যত্র[৬] এই মত খণ্ডন করিয়াছে। স্থানীয়মানতত্ত্ব এবং ঐ গুরুতর দোষ একত্র থাকিতে পারে না। আজকালকার ন্যায় পূর্ব্বেও কোনও স্থানে অঙ্কের অভাব হইলে একটি চিহ্ন ঐ স্থানে ব্যবহৃত হইত। ঐ চিহ্নটিই শূন্যচিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রীক গণক টলেমী শূন্যচিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন[৭]। কিন্তু তিনি স্থানীয়মানতত্ত্ব জানিতেন না, এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। স্থানীয়মানতত্ত্ব ব্যতীতও ভারতে এক হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি বুঝাইতে কতকগুলি চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। সেইগুলিই কালক্রমে পরিবর্ত্তিত আকারে স্থানীয়মান সহকারে ব্যবহৃত হইতেছে। অতএব কেবল এক হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যাজ্ঞাপক চিহ্নের অস্তিত্ব হইতে স্থানীয়মানতত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে। সেইরূপ কেবল শূন্য চিহ্নের অস্তিত্ব হইতেই স্থানীয়মানতত্ত্বের জ্ঞান অনুমান করা উচিত নহে। আয় ও ব্যয় সমান হইলে তহবিলে কিছুই থাকে না অথবা কোনও স্থানে অঙ্কের অভাব আছে—ইহা বুঝাইতে কোনও চিহ্নের ব্যবহার স্থানীয়মানতত্ত্বের উদ্ভাবনের পূর্ব্বেও প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। অতএব স্থানীয়মানতত্ত্ব ও শূন্য চিহ্ন সহজাত মনে করিবার কোনও কারণ নাই। দত্ত মহাশয়ের ন্যায় পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ শূন্য চিহ্ন ও স্থানীয়মানতত্ত্ব সহজাত বলিয়া একটি ভ্রমাত্মক ধারণা পোষণ করেন। তাই পিঙ্গলছন্দঃসূত্রের যে অংশে শূন্যচিহ্নের উল্লেখ আছে, সেই অংশকে তাঁহারা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন[৮]। বস্তুতঃ এই ছন্দঃসূত্রে শূন্য চিহ্নের ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় বলিয়া ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত মনে করা যেমন ভ্রমাত্মক, তৎকালে স্থানীয়মানতত্ত্বের অস্তিত্ব অনুমান করাও তেমনই অসঙ্গত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কৌটিল্যের পরে ৭৫০ বৎসরের মধ্যে কোনও গ্রন্থে স্থানীয়মানতত্ত্বের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিলালিপিতে (বা তাম্রলিপিতে) স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে গুর্জ্জর দেশে ৫৯৫ খ্রীষ্টীয় অব্দে অর্থাৎ কৌটিল্যের সময়ের অন্ততঃ ৯০০ বৎসর পরে। এমন কি, কৌটিল্যের কর্ম্মভূমি মগধের অন্তর্গত রোটাসের শিলালিপিতে শকাব্দসংখ্যা ১৩২ নিম্নলিখিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে,—

"নবতিনবমুনীন্দ্রৈর্ব্বাসরাণামধীশৈঃ।
পরিকলয়তি সংখ্যাং বৎসরে সাহশাকে ॥"[৯]

৬। Did the Babylonians and the Mayas of Central America possess place-value arithmetical notations ?—Bulletin of the Calcutta Mathematical Society. Vol. XXII (1930), pp. 99-102.

৭। Sir Thomas Heath, A History of Greek Mathematics, Vol. I. P. 45.

৮। The History of Indian Literature by Weber (English Translation by Mann and Zachariae), p. 256, foot-note 281.

৯। Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, June, 1876, p. 111.

নবতি (৯০), নব (৯), মুনি (৭), ইন্দ্র (১৪) ও 'বাসরদিগের অধীশ' বা সূর্য্য (১২), এই কয়েকটি সংখ্যার সমষ্টিরূপে ১৩২ ব্যক্ত করা হইয়াছে।

এই সকল কারণে মনে হয়, কৌটিল্যও স্থানীয়মানতত্ত্ব জানিতেন না। ইহার বিরুদ্ধে দত্ত মহাশয় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভিত্তি আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

দত্ত মহাশয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে স্থানীয়মান অনুসারে ব্যক্ত একটি সংখ্যারও উল্লেখ করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক ঐ অর্থশাস্ত্রে সংখ্যা এই ভাবে ব্যক্ত হয় নাই।

"অক্ষপটলে গাণনিক্যাধিকার" নামক প্রকরণে লিখিত আছে,—"ত্রিশতং চতুঃপঞ্চাশচ্চাহোরাত্রাণাং কর্ম্ম সংবৎসরঃ।" এ স্থলে তিন শত চুয়ান্ন স্থানীয়মানতত্ত্ব অনুসারে ব্যক্ত হয় নাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে "সমবৃত্তা" নামক তুলাদণ্ডের নিম্নলিখিত বর্ণনা আছে,—

"পঞ্চত্রিংশৎপললোহাং দ্বিসপ্তত্যঙ্গুলযামাং সমবৃত্তাং কারয়েৎ। তস্যাঃ পঞ্চপলিকং মণ্ডলং বদ্ধ্বা সমকরণং কারয়েৎ। ততঃ কর্ষোত্তরং পলং পলোত্তরং দশপলং দ্বাদশপঞ্চদশবিংশতিরিতি কারয়েৎ। তত আশতাদ্দশোত্তরং কারয়েৎ। অক্ষেষু নান্দীপিনদ্ধং কারয়েৎ।"

একমাত্র "অক্ষেষু" শব্দটির প্রয়োগের উপরই দত্ত মহাশয়ের মত প্রতিষ্ঠিত। এই শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন টীকাকার ভট্টস্বামী ও মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রীর মতে এই শব্দটী দ্বারা ৫, ১০, ১৫ ইত্যাদি ৫এর গুণিতক সংখ্যাগুলি বুঝাইতেছে। দত্ত মহাশয়ের মতে এই শব্দটি দ্বারা এ স্থলে ২৫, ৩৫, ৪৫ ইত্যাদি সংখ্যা বুঝাইতেছে। আমার মনে হয়, দত্ত মহাশয়ের ব্যাখ্যাই এ স্থলে প্রযোজ্য, অপর ব্যাখ্যা এ স্থলে যুক্তিযুক্ত নহে। স্থানীয়মানতত্ত্বের ব্যবহার করিয়া ২৫, ৩৫, ৪৫, ৫৫ ইত্যাদি সংখ্যা বুঝাইতে 'অক্ষকর', 'অক্ষাগ্নি,' 'অক্ষবেদ', 'অক্ষবাণ' ইত্যাদি সংখ্যা-জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। যখন অর্থশাস্ত্রের অপর কোন স্থলে স্থানীয়মানতত্ত্ব আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই, তখন "অক্ষেষু" এই শব্দটি দ্বারা অক্ষকর ইত্যাদি সংখ্যা-বোধক শব্দ বিবক্ষিত হইতেছে মনে করিবার কোনও কারণ দেখিতে পাই না। পক্ষান্তরে উল্লিখিত বর্ণনার প্রথমেই "পঞ্চত্রিংশৎ" শব্দটি আছে। উহার পরিবর্ত্তে কৌটিল্য "অক্ষাগ্নি' কিংবা 'অক্ষরাম' কিংবা এইরূপ অন্য কোনও শব্দ ব্যবহার করেন নাই। যদি কৌটিল্য 'অক্ষেষু' শব্দের পরিবর্ত্তে ইহার সমানার্থক 'পঞ্চসু' শব্দ ব্যবহার করিতেন, তবে উহা দ্বারা পঞ্চবিংশতি, পঞ্চত্রিংশৎ, পঞ্চচত্বারিংশৎ ইত্যাদি সংখ্যাই বুঝাইত বলিয়া তৎকালে স্থানীয়মানতত্ত্বের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইত না। যখন কৌটিল্যের সময় স্থানীয়মান সহকারে শব্দ দ্বারা সংখ্যা প্রকাশ করিবার প্রমাণ অন্যত্র কোথায়ও পাওয়া যায় না, তখন একমাত্র "পঞ্চসু"র সমানার্থক "অক্ষেষু" শব্দের প্রয়োগ হইতে তৎকালে স্থানীয়মানতত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারা যায় না।

অনুযোগদ্বারসূত্র ও ব্যবহারসূত্র নামক জৈন গ্রন্থ দুইখানি দেখিবার সুযোগ বর্ত্তমান লেখকের হয় নাই। তথাপি দত্ত মহাশয়ের লেখা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ দুইখানি গ্রন্থে তৎকালে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটির অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ নাই। দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন যে, অনুযোগদ্বারসূত্রে পৃথিবীর মনুষ্য-সংখ্যা এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে,— [১০]

(১) "কোটি কোটি ইত্যাদি এককে ব্যক্ত হইলে মনুষ্যসংখ্যা উনত্রিশটি স্থান অধিকার করে ; অথবা

(২) ইহার স্থান-সংখ্যা চব্বিশের অধিক ও বত্রিশের কম ; অথবা

(৩) দুইয়ের ষষ্ঠ বর্গকে দুইয়ের পঞ্চম বর্গদ্বারা গুণ করিলে মনুষ্যসংখ্যা পাওয়া যায় ; অথবা,

(৪) মনুষ্যসংখ্যাকে দুই দ্বারা ছিয়ানব্বই বার ভাগ করা যায়।"

সংখ্যাটি ২৯টি স্থান অধিকার করে—ইহাই যদি স্থির হইল, তবে স্থানসংখ্যা ২৪এর উপর এবং ৩২এর নীচে, এইরূপ পরে লিখিবার উদ্দেশ্য বা আবশ্যকতা কি? সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি উদ্ভাবিত হওয়ার পূর্ব্বেও অঙ্ক বা চিহ্নের সাহায্যে সংখ্যা লিখিতে স্থান লাগিত, এ স্থলে যে সেইরূপ স্থান বুঝাইতেছে না, তাহার প্রমাণ কি? যদি সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি তখন জানা থাকিত, তবে মনুষ্যসংখ্যা উক্ত সঙ্কেত অনুসারে ব্যক্ত হইল না কেন? যদি ঐরূপে ব্যক্ত হইত, তবে মনুষ্যসংখ্যা কত ছিল, সঠিক জানা যাইত। কিন্তু যে ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে ঐ সংখ্যার সঠিক ধারণা জন্মে না।

যদি দত্ত মহাশয় মূল সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়া উহার ব্যাখ্যা দিতেন, তবে অন্যরূপ ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইতে পারে কি না, বুঝিতে পারা যাইত। মূল সূত্রটির অভাবে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যদি খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে লিখিত ভারতীয় জৈনগ্রন্থে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটির তৎকালীন অস্তিত্বের প্রমাণ থাকে, তবে ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইবে যে, ৪৯৯ খ্রীষ্টীয় অব্দের পূর্ব্বে ভারতে ঐ সঙ্কেত অন্য কোথাও ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না।

লেখকের মত ও উহার প্রতিষ্ঠা

পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মূল-পুলিশসিদ্ধান্তের কাল অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্তও স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি উদ্ভাবিত হয় নাই। পক্ষান্তরে বৃদ্ধ আর্য্যভটের পরে রচিত জ্যোতিষের গ্রন্থগুলিতে এই সঙ্কেতটির অস্তিত্বের অখণ্ডনীয় প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। আর্য্যভটীয় নামে যে গ্রন্থ আজকাল চলিতেছে, তাহা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে বৃদ্ধ আর্য্যভট কর্ত্তৃক রচিত। উহার গণিতপাদের দ্বিতীয় আর্য্যাটি এই,—

১০। Bulletin of the Calcutta Mathematical Society, Vol. XXI (1929), p. 136.

একং দশ চ শতঞ্চ সহস্রময়ুতনিয়ুতে তথা প্রয়ুতম্।
কোটার্ব্বুদঞ্চ বৃন্দং স্থানাৎ স্থানং দশগুণং স্যাৎ॥

এই আর্য্যাটিতে বৃদ্ধ আর্য্যভট প্রথমে এক, দশ, শত, সহস্র, অয়ুত, নিয়ুত, প্রয়ুত, কোটি ও বৃন্দ, এই দশটি স্থানের নাম উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, স্থানের মান ও নাম বুঝাইতে একই শব্দ ব্যবহৃত হইবে। পরে "স্থানাৎ স্থানং দশগুণং স্যাৎ" অর্থাৎ প্রত্যেক স্থানের মান উহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানের মানের দশগুণ, এই তত্ত্বটি দ্বারা পরবর্ত্তী স্থানগুলির মান ও নাম কিরূপ হইবে, তাহারই আভাস দিয়াছেন। অতএব স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি উক্ত আর্য্যাটিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

উক্ত সঙ্কেতটি আর্য্যভটীয়তেই প্রথম দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া উহার উদ্ভাবয়িতা বৃদ্ধ আর্য্যভট,—এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। হয় ত উহা কিছু পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল এবং আর্য্যভট পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার গুরুদেবের নিকট হইতে সঙ্কেতটি শিখিয়াছিলেন। এই সন্দেহের মীমাংসার নিমিত্ত আর্য্যভটীয় গ্রন্থখানির কিছু পরীক্ষা করা যাউক।

সপ্তম শতাব্দীর ব্রহ্মগুপ্ত ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের তন্ত্রপরীক্ষাধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে লিখিয়াছেন,—

আর্য্যাষ্টশতে পাতা ভ্রমন্তি দশগীতিকে স্থিরাঃ পাতাঃ।

ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটীয়ের উল্লেখ করেন নাই, দশগীতিক ও আর্য্যাষ্টশতের উল্লেখ করিয়াছেন। আর্য্যভটীয়ে চারিটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়টিকে গীতিকাপাদ, দ্বিতীয়টিকে গণিতপাদ, তৃতীয়টিকে কালক্রিয়াপাদ ও চতুর্থটিকে গোলপাদ বলা হয়। ব্রহ্মগুপ্তের লেখায় দশগীতিক দ্বারা আর্য্যভটীয়ের প্রথম অধ্যায় এবং আর্য্যাষ্টশত দ্বারা অপর তিনটি অধ্যায় বুঝাইতেছে। এই তিনটি অধ্যায়ে মোট ১০৮টি আর্য্যা আছে বলিয়া উহাদের নাম আর্য্যাষ্টশত হইয়াছে। আর্য্যভট শেষ অধ্যায়ে অর্থাৎ গোলপাদে 'পাত সকল ভ্রমণ করে' এই কথা লিখিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্ত গোলের বা গোলপাদের উল্লেখ না করিয়া আর্য্যাষ্টশতের উল্লেখ করিলেন কেন? একই পঙ্‌ক্তিতে একই কারণে এক স্থানে 'দশগীতিক' বা প্রথম অধ্যায়ের উল্লেখ এবং অপর স্থলে নির্দ্দিষ্ট গোলপাদের পরিবর্ত্তে উহার সঙ্গে আরও দুইটি অধ্যায় মিশাইয়া আর্য্যাষ্টশতের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, দশগীতিক ও আর্য্যাষ্টশত একই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নহে, উহারা পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ। ল্যাসেনও এইরূপ মনে করেন।[১১] প্রচলিত আর্য্যভটীয় সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলেও আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহাতে চারিটি অধ্যায় আছে। অতএব গ্রন্থারম্ভে কেবল একবার মাত্র ইষ্টদেবতার বন্দনা থাকিবে অথবা প্রত্যেক অধ্যায়ের আরম্ভে একবার করিয়া চারিটি অধ্যায়ের আরম্ভে মোট চারি বার ইষ্টদেবতার বন্দনা

১১। The Literary Remains of Dr. Bhau Daji edited by Rama Chandra Ghosha (Calcutta 1888), pp. 224—225.

থাকিবে। কিন্তু বস্তুতঃ কেবল দুই বার বন্দনা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে আর দুইটী বন্দনার আর্য্যা কি এ পর্য্যন্ত উদ্ধার করা হয় নাই ? আর্য্যভটীয়ের কোনও আর্য্যা লুপ্ত থাকিলেও বন্দনার আর্য্যা লুপ্ত নাই, ইহা সুনিশ্চিত। কারণ, যে দুইটি বন্দনার আর্য্যা আছে, তাহাদের একটিতে দশগীতিকের বা প্রথম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং অপরটিতে অবশিষ্ট তিন অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় গণিত, কালক্রিয়া ও গোল উল্লিখিত হইয়াছে। বন্দনার আর্য্যা দুইটি এই,—

"প্রণিপত্যৈকমনেকং কং সত্যাং দেবতাং পরং ব্রহ্ম।
আর্য্যভটস্ত্রীণি গদতি গণিতং কালক্রিয়াং গোলম্ ॥"
"ব্রহ্মকুশশিবুধভৃগুরবিকুজগুরুকোণভগণান্ নমস্কৃত্য।
আর্য্যভটস্ত্বিহ নিগদতি কুসুমপুরেঽভ্যর্চ্চিতং জ্ঞানম্ ॥"

প্রথম আর্য্যাটির দ্বিতীয় পঙ্ক্তির অর্থ এই,—"আর্য্যভট গণিত, কালক্রিয়া ও গোল, এই তিনটি বিষয়ের বর্ণনা করিতেছেন।"

অতএব যে অংশে এই তিনটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রথমে অর্থাৎ গণিতাধ্যায়ের প্রথমে এই আর্য্যাটি থাকা উচিত। কিন্তু আর্য্যভটীয়ের কার্ণ সাহেবের সংস্করণে ও উদয়নারায়ণ সিংহের সংস্করণে দশগীতিক বা গীতিকাপাদের প্রথমে এই আর্য্যাটি দেওয়া হইয়াছে।

বন্দনার দ্বিতীয় আর্য্যাটির প্রথম পঙ্ক্তিতে আর্য্যভট ব্রহ্মাকে এবং পৃথিবী, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শনির ভগণদিগকে নমস্কার করিয়াছেন। গীতিকাপাদের প্রথম আর্য্যাটিতে বন্দনা, দ্বিতীয়টিতে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের সাহায্যে সংখ্যালিখনের সঙ্কেত এবং তৃতীয়টিতে পৃথিবী, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনির যুগভগণের সংখ্যা দৃষ্ট হয়। অতএব গীতিকাপাদের প্রথমে বন্দনার দ্বিতীয় আর্য্যাটি থাকা উচিত ছিল। কিন্তু আর্য্যভটীয়ের উল্লিখিত দুইটি সংস্করণেই গণিতপাদের প্রথমে এই আর্য্যাটি প্রদত্ত হইয়াছে।

অতএব মনে হয়, বর্ত্তমানে প্রচলিত গীতিকাপাদ একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ; ইহার নাম ছিল দশগীতিক। গণিত, কালক্রিয়া ও গোল, এই তিনটি বিষয় যে তিন অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, সেই তিনটি অধ্যায় লইয়া আর একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল—ইহারই নাম ছিল আর্য্যাষ্টশত। সুতরাং ইহাই মনে হয় যে, প্রচলিত আর্য্যভটীয় একখানি গ্রন্থ নহে, ইহা দশগীতিক ও আর্য্যাষ্টশত, এই দুইখানি বিভিন্ন গ্রন্থের সমাবেশে উৎপন্ন।

আর্য্যাষ্টশতের কালক্রিয়াধ্যায়ের দশম আর্য্যাটি এই,—

"ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ ॥"

ইহার অর্থ এই,—যখন বর্ত্তমান যুগের তিন চতুর্থাংশ (অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর) অতীত হওয়ার পর আরও ষাটগুণ ষাট অব্দ (অর্থাৎ কলিযুগের ৩৬০০ বৎসর) অতীত, হইয়াছে, তখন আমার জন্মের পর ২৩ বৎসর অতীত হইয়াছে।

পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩১০১ অব্দে কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছে। অতএব (৩৬০০-৩১০১) বা ৪৯৯ খ্রীষ্টীয় অব্দে আর্য্যভটের বয়স ২৩ বৎসর ছিল। এই আর্য্যাটি হইতে পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন যে, আর্য্যভট ৪৯৯ খ্রীষ্টীয় অব্দে ২৩ বৎসর বয়সে আর্য্যাষ্টশত রচনা করেন।

দশগীতিক রচনাকালে আর্য্যভট সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান কালে প্রচলিত সঙ্কেতটি জানিতেন না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, দশগীতিকের দ্বিতীয় আর্য্যাটিতে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশ করিবার একটি সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে। এই আর্য্যাটির ব্যাখ্যা ও আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি।[১২] এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আর্য্যাটি হইতে অনুমান হয়, দশগীতিক রচনাকালে আর্য্যভট বুঝিয়াছিলেন যে, (১) এক, দশ, শত ইত্যাদি বুঝাইবার নিমিত্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে এবং (২) স্থানগুলি বর্গস্থান (যথা—এক, শত, অযুত ইত্যাদি বর্গসংখ্যার স্থান) ও অবর্গস্থান (যথা—দশ, সহস্র, ইত্যাদি অবর্গসংখ্যার স্থান) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। অতি সঙ্ক্ষেপে সংখ্যা ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রথম বর্গ ও প্রথম অবর্গস্থান অ দ্বারা, দ্বিতীয় বর্গ ও দ্বিতীয় অবর্গস্থান ই দ্বারা, তৃতীয় বর্গ ও তৃতীয় অবর্গস্থান উ দ্বারা, এবং পরবর্ত্তী স্থানগুলি এইরূপে ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ দ্বারা বুঝাইবে, এই নিয়ম করিলেন। একই স্বর দ্বারা একটি বর্গ ও একটি অবর্গস্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে ক্ হইতে ম্ পর্য্যন্ত ২৫টি বর্গাক্ষর কেবল বর্গস্থান-গুলির জন্য এবং য্, র্, ল্, ব্, শ্, স্, হ্, এই সাতটি অবর্গাক্ষর কেবল অবর্গ স্থানগুলির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। ক্ হইতে ম্ পর্য্যন্ত হলন্ত ২৫টি অক্ষর দ্বারা যথাক্রমে ১ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত সংখ্যা এবং য্ হইতে হ্ পর্য্যন্ত ৭টি হলন্ত অক্ষর দ্বারা যথাক্রমে ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ বুঝিতে হইবে। যথা, ম=২৫, মি=২৫০০, মু=২৫০০০০ ইত্যাদি; য=৩০, যি=৩০০০, যু=৩০০০০০ ইত্যাদি। এই সঙ্কেতে শূন্য বুঝাইবার জন্য কোনও অক্ষরের আবশ্যকতা হয় না, স্থানগুলিরও কোনও নির্দ্দিষ্ট ক্রমের প্রয়োজন নাই। "খ্যু" দ্বারা আমাদের বত্রিশ অযুত এবং "ঘৃ" দ্বারা আমাদের চারি নিযুত বুঝায়। অতএব আমাদের চারি নিযুত, বত্রিশ অযুত (অর্থাৎ তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার) বুঝাইতে বৃদ্ধ আর্য্যভট "খ্যুঘৃ" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এ স্থলে নিযুতের অঙ্ক অযুতের অঙ্কের দক্ষিণে বসিয়াছে। "খ্রি" দ্বারা বিয়াল্লিশ শত বুঝায়, "চ্যু" দ্বারা ছয়ত্রিশ অযুত এবং "ভ" দ্বারা চব্বিশ বুঝায়। অতএব ছয়ত্রিশ অযুত বিয়াল্লিশ শত চব্বিশ বুঝাইতে আর্য্যভট "খ্রিচ্যুভ" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এ স্থলে শত আর এককের মধ্যে অযুত বসিয়াছে। কিন্তু স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনে শূন্য চিহ্ন ও স্থানগুলির নির্দ্দিষ্ট ক্রম না থাকিলে চলিবে না। দশগীতিক রচনাকালে যদি আর্য্যভট স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত সঙ্কেতটি জানিতেন, তবে তিনি কখনই বর্গস্থান-

---

১২। Was Aryabhata indebted to the Greeks for his alphabetic system of expressing numbers?—Bulletin of the Calcutta Mathematical Society, Vol. XVII, pp. 195—202.

গুলিতে ১ হইতে ২৫ পর্যন্ত সংখ্যাজ্ঞাপক অক্ষরগুলি ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিতেন না। এই ব্যবস্থার ফলে এই সঙ্কেত অনুসারে ব্যক্ত সংখ্যাগুলি দিয়া পাটীগণিতের পরিকর্ম্মগুলি সম্পাদন করা যায় না। কারণ, একই সংখ্যা নানারূপে ব্যক্ত হইতে পারে। যেমন ৩৪কে মঝ, ঝম, ভঞ, ঞভ, বট, টব, ফঠ, ঠফ, পড, ডপ, নঢ, ঢন, ধন, নধ, দত, তদ, থথ, যঘ, এই আঠার প্রকারে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। এই সঙ্কেতটির একমাত্র গুণ এই যে, অতি সঙ্ক্ষেপে সংখ্যা প্রকাশ করিতে পারা যায়। বর্ত্তমান সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া যদি বর্গস্থানে নয়টি অক্ষর ও অবর্গস্থানে অপর নয়টি অক্ষর ব্যবহার করিবার নিয়ম করা হইত, তাহা হইলেও সংখ্যাগুলি অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত হইতে পারিত। কিন্তু তিনি এই নিয়ম করেন নাই কেন ? তিনি বর্ত্তমান সঙ্কেতটি জানিতেন না বলিয়াই করেন নাই।

দশগীতিকে প্রদত্ত বর্ণমালা সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের সঙ্কেতে স্বর দ্বারা স্থানীয়মানের নির্দ্দেশ ও স্থান বিভাগ দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, বৃদ্ধ আর্য্যভট হয় ত দশগীতিক রচনাকালে আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি জানিতেন। কিন্তু সমস্ত সঙ্কেতটি বিচার না করিয়া কেবল কোনও কোনও অংশের বিচার দ্বারা ভ্রমশূন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, এ কথা স্মরণ করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইবে। নতুবা ভ্রমে পতিত হওয়া অসম্ভব নহে। তিব্বতে তথাকার ভাষায় একুশকে 'দুই—এক', বাইশকে 'দুই—দুই', তেইশকে 'দুই—তিন', চব্বিশকে 'দুই—চার', পঁচিশকে 'দুই—পাঁচ', ছাব্বিশকে 'দুই—ছয়', সাতাইশকে 'দুই—সাত,' আটাইশকে 'দুই—আট' ও উনত্রিশকে 'দুই—নয়' বলে।[১৩] কেবল এই কয়েকটি সংখ্যাবাচক শব্দ শুনিলে নিশ্চয়ই মনে হইবে যে, এই সকল শব্দের রচনাকালে তিব্বতে স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই অনুমান ভ্রমাত্মক। কারণ, অন্য কোনও সংখ্যাবাচক তিব্বতদেশীয় শব্দে স্থানীয়-মানতত্ত্বের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না।

এতএব দেখা যাইতেছে যে, বৃদ্ধ আর্য্যভট দশগীতিক রচনাকালে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি জানিতেন না, কিন্তু আর্য্যাষ্টশত রচনাকালে উহা জানিতেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বৃদ্ধ আর্য্যভট অন্য কাহারও নিকট হইতে এই সঙ্কেতটি শিক্ষা করেন নাই, তিনি নিজেই উহা দশগীতিক রচনার পরে এবং আর্য্যাষ্টশত রচনার পূর্ব্বে উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। দশগীতিক রচনার অব্যবহিত পরেই এই সঙ্কেতটি উদ্ভাবিত হয় নাই। দশগীতিক প্রচলিত হওয়ার পরে এই সঙ্কেতটি উদ্ভাবিত হইয়াছে। নতুবা তিনি দশগীতিকে যথাযোগ্য পরিবর্ত্তন সাধিত করিতে পারিতেন। তাঁহার ২৩ বৎসর বয়সে আর্য্যাষ্টশত রচিত হইয়াছে। অতএব তাঁহার অন্যূন ২০ বৎসর বয়সে দশগীতিক রচনা হইয়াছে। আর্য্যাষ্টশতের রচনাকাল ৪৯৯ খ্রীষ্টীয় অব্দ। অতএব ৪৯৬ হইতে ৪৯৯ খ্রীষ্টীয় অব্দের মধ্যে বৃদ্ধ আর্য্যভট কর্ত্তৃক স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত সঙ্কেতটি উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

১৩। The Encyclopædia of Pure Mathematics (1847), pp. 373 & 374.

বরাহমিহির-রচিত বৃহজ্জাতকের সপ্তম অধ্যায়ের নবম শ্লোকে জীবশর্ম্মার নাম দৃষ্ট হয়। টীকাকার ভট্টোৎপল এই শ্লোকের টীকায় জীবশর্ম্মার গ্রন্থ হইতে কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাদের একটি বচনে ৫০৪ বুঝাইতে "বেদাভ্রসায়ক" (বেদ=৪, অভ্র=০, সায়ক=বাণ=৫) শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

অতএব জীবশর্ম্মা স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি জানিতেন। তাঁহার গ্রন্থ আর্য্যাষ্টশতের পরে রচিত হইয়া এবং বৃহজ্জাতক রচনার পূর্ব্বে খ্যাতি লাভ করিয়া থাকিবে। বরাহমিহির খ্রীষ্টীয় ৫৮৭ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন[১৪]। কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহার জন্ম ৫০৫ খ্রীষ্টীয় অব্দে হইয়াছিল।[১৫] ভাউদাজির মতে ইহার ২০ কিংবা ৩০ বৎসর পরে বরাহমিহির জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (Literary Remains, p.241.)। তাহা হইলেও আর্য্যাষ্টশতের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ৪৯৯ অব্দ নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

১৪। G. R. Kaye, Indian Mathematics (Calcutta, 1915), p. 67. The Literary Remains of Dr. Bhau Daji, p. 240.

১৫। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ ১ম সংখ্যা, ১৬ পৃষ্ঠা।

দ্বিজ রামকুমারের ভাগবত *

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দ্বিজ রামকুমারের ১২খানি পুথি আছে। এই বারোখানি পুথিতে ভাগবতের দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্য্যন্ত পদ্যে লেখা আছে। দশম স্কন্ধ দুইখানি পুথিতে পাওয়া যায়। পুথিগুলির সংখ্যা ১৬৯৩—১৭০৩ ও ৯৪৬। সম্প্রতি আমি নিজে ইহার দশম স্কন্ধের একখানি পুথি পাইয়াছি। উপরোক্ত পুথিগুলির মধ্যে যেখানিতে দ্বিতীয় স্কন্ধ লেখা আছে (১৬৯৩), তাহা হইতে জানা যায় যে, সেইখানি রামধন মিত্র নামে একজন ভদ্রলোক লিখাইয়াছিলেন। ২য় স্কন্ধের লিপিকার তাঁহার বাসস্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

'জবগ্রামে পিত্রিকুলে জন্ম হয় তার।
প্রকাশ করিয়া নাম কহি শুন তার॥'

চতুর্থ স্কন্ধের (১৬৯৫) শেষে তারিখ দেওয়া আছে,—'সন ১২৪০ সাল তারিখ ২৮ পৌষ।' সম্ভবতঃ ইহা ঐ স্কন্ধটির লিপিকাল। পঞ্চম স্কন্ধের (১৬৯৬) ভণিতায় আছে,—

'রাধাকান্তপুর হয় গ্রামের ক্ষেয়াতি।
সামিল গাঙ্গুড়ে চৌকী হয়েছে সংপৃতি॥
মযুকুরের মধ্যে বাস মাতামহাশ্রয়।
সিবপুর হয় মোর পিতার আলয়॥
... ...
জবগ্রামে যুদ্ধ পিত্রীকুলে জন্ম জার॥
দ্বিজ তারিণীচরণ আপনার হয় নাম।
পঞ্চম স্কন্ধের হইল সমাধান॥
সন ১২৪০।১৫ পৌষ

দ্বিজ তারিণীচরণ বোধ হয়, লিপিকারের নাম। নবম স্কন্ধের (১৭০০) শেষে এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

'পরগণে ছোটীপুর জেলা বর্দ্ধমান।
উলার মুস্তফীদের তালুক গ্রামখান॥

দ্বাদশ স্কন্ধের (১৭০৩) শেষে কবি তাঁহার এই ভাগবত রচনার ইতিহাস এইরূপ লিখিয়াছেন,—

জেষ্টা ভাযা আমার পৃয়সী অতি ছিল।
সময় পাইয়ে সেই পুত্র প্রসবিল॥
কিছু দিন পরে দোঁহে হইল সংহার।
তাহাতে বড়ই শোক হইল আমার॥
কোন মতে শোকের না হয় নিবারণ।
একেলা থাকিলে সদা করি যে রোদন॥
ক্রমে এক পক্ষ মোর নিদ্রা নাহি হৈল।
তার পর একদিন নিদ্রা হয়েছিল॥
ঐ কালে একজন ব্রহ্মার রূপে।
আসিয়ে দাঁড়াল জেন আমার সমীপে॥
আমিহ রোদন করিতেছি দুকাতরে।
তিহো জেন জিজ্ঞাসিতে লাগীল আমারে॥
কি জন্যে এতেক তুমি করহ রোদন।
শুনিয়ে তাহারে সব কৈল নিবেদন॥
কাতর হইয়াছি আমি তাহার জন্যেতে।
মুনি সেই দ্বিজ মোরে লাগীল কহিতে॥

* ২১এ চৈত্র, ১৩৪৩, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

অনর্থক ভাবনা কি জন্তে কর তুমি।
কর গিয়ে জে কথা বলিয়ে জাই আমি ॥
ভাগবত গ্রন্থ তুমি রচহ পয়ারে।
মিছে কেন ভাবনা করহ তার তরে ॥
এই কথা কহিলেন সম্মুখে দাঁড়ায়ে।
দুঃখে মোর উপহাস হইল ঘুনিয়ে ॥
উপহাস করিয়ে জিজ্ঞাসা কৈনু আমি।
কহিব সভার নাম করহ শ্রবণ ॥
হরিদেব মহাদে[ব] তৃতীয় মুকুন্দ।—ইত্যাদি১

স্বপ্ন দেখার পর স্বরূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাতের বিবরণ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন,—

... ... শোকে প্রাণ দহে।
কোন মতে নিবারণ কদাচিত নহে ॥
কাহার নিকটে স্থির নাহি হৈত মন।
সদা রহিতাম যথা লিখে শিশুগণ ॥
তারা সবে সর্ব্বদা করিত কলরব।
সেখানে থাকিলে শোক দূরে জেত সব ॥
জেই দিন এ সপন দেখিনু নিসিতে।
প্রাতে উঠি কিছু আর না ছিল মনেতে ॥
গিয়ে পাঠশাল মাঝে বসিছিনু আমি।
হেন কালে তথা আইল স্বরূপ গোস্বামী ॥
কৃশ হইয়াছে অঙ্গ করি নিরিক্ষণ।
বুঝাতে লাগিলা মোরে প্রবোধবচন ॥
কেন ভাই তুমি তো সুবুদ্ধি জানি হও।
এতো শোক কি জন্যে করহ মোরে কও ॥
আমিহ তাহার প্রতি কৈনু নিবেদন।
জানি তবু তথাপি না হয় নিবারণ ॥
পূর্ব্বাপর জানি জে মরিলে নাহি বাচে।
তাহার লাগিয়ে খেদ করা সব মিছে ॥
জানিয়ে না হয় স্থির তাহার মায়াতে।
এই মত কৈনু আমি তাহার সাক্ষাতে ॥
তার পর গোস্বামী কহিলা মোর প্রতি।
শুন ভাই আমি এক কহিব জুকতি ॥
মিছামিছি অনর্থক কেন ভাব তুমি।
মোর কাছে জেও ভাগবত কব আমি ॥
এই কথা গোস্বামী আমারে জবে কৈল।
সে কালে আমার সব কথা [মনে] আইল ॥
ভকতি জন্মিল মোর সেই সময়েতে।
শ্রীধর করিল কৃপা ভাবিনু মোনেতে ॥
নতুবা এ কথা কেন কবেন গোস্বামী।
এই মনে বিবেচনা করিলাম আমি ॥
তাহারে কহিনু আমি বৈকালে জাব।
তোমার নিকট গিয়া পুরাণ শুনিব ॥
এতেক বলিয়ে উঠে আইনু মন্দিরে।
স্নান করি ভক্তি করি পুজিনু শ্রীধরে ॥
বৈকালে গেল(াম) আমি গোস্বামী সদনে
ধ্রুবের চরিত্রকথা করিনু শ্রবণে ॥

মদীয় দশম স্কন্ধের শেষে কবি নিজ পরিচয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

সামিল গাঙ্গুড়ে চৌকী আছে বেবধান।
রাধাকান্তপুর হয় গ্রাম অবিধান ॥
উলার মুস্তফীদের হয় গ্রামখান।
ময়ুকুরের মধ্যে বাস মাতামহাশ্রয়।
শিবপুর হয় মোর পিতার আলয় ॥
দুই নাম লিখি ক্রমে শুনহ বচন।
মাতামোহ কৃষ্ণহরি পিতা রামমোহন ॥
মাতামহি রাসেশ্বরি মাতা সত্যভামা।
বিরদা সারদা দুই ভগ্নি গুণধামা ॥
দুই ভার্য্যে আমার আছিল গুণবতি।
জেষ্টা নাই নাম তার ছিল ভগবতী ॥
কনিষ্টা ভার্য্যার নাম হয় রামপৃয়ে।
কহে দ্বিজ রামকুমার শ্রীধর ভাবিয়ে ॥

এক স্থানে কবি লিখিয়াছেন,—পরগনে ছোটী, জেলা বর্দ্ধমান। বর্দ্ধমান জেলায় রাধাকান্তপুর নামে কোন গ্রাম এখন আছে বলিয়া আমার জানা নাই। গ্রন্থখানি বর্দ্ধমান

১। বোধ হয়, লিপিকার ভ্রমক্রমে কয়েক পঙ্‌ক্তি ছাড়িয়া দিয়া, শেষের দুই পঙ্‌ক্তি লিখিয়াছিলেন। কারণ, শেষের দুই পঙ্‌ক্তির সহিত পূর্ব্বপঙ্‌ক্তিগুলির কোন সম্বন্ধ নাই।

জেলার অধীন গলসী থানার অন্তর্গত কুরকুরা গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত দশম স্কন্ধের পুথিতেও (১৭০১) এইরূপ পরিচয় লিখিত আছে।

মদীয় পুথিখানির আর এক স্থানে (পৃঃ ৪৩) কবি নিজ পরিচয় সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

শ্রীযুত কৃষ্ণহরি মাতামোহ নাম। যেমতে হইনু জ্ঞাতো লিখি পরিচয়।
অবসতি গঙ্গানন্দ চাটুতি সন্তান॥ শ্রীযুত স্বরূপচন্দ্র মোহন্তসন্তান।
পীতা রামমোহন মুকুটী গাই খাত। এ সব সন্ধান পাইনু তার স্থান॥
ফুলিয়ে কানাই ছোট ঠাকুরের স্থতো॥ আমারে বুঝালে তিঁহো শ্লোক অনুসারে।
এই ভাগবত মোর পড়া গ্রন্থ নয়। আমি তাহা ভাসা করি রচিনু পয়ারে॥

সাহিত্য-পরিষদের পুথিতে (সং ১৭০১। ৩৬শ পত্র) উপরে উদ্ধৃত ১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে প্রথম ৬ পঙ্‌ক্তি পাওয়া যায় না, শেষের ৪ পঙ্‌ক্তি সামান্য পাঠান্তরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। পুনরায় ৩৮৫ পৃষ্ঠায় কবি লিখিয়াছেন,—

রামমোহন মুখোপাধ্যায় সন্তান আপনি।
ফুলে কানাই ছোট ঠাকুরের সন্তানে বাখানি॥

মদীয় পুথিখানির রচনার সন তারিখ সম্বন্ধে লেখা আছে,—

সকে সসি সিন্ধু সর নেত্র নিরূপণ। সমাপ্ত হইল রাম কর্কট মাহাতে॥
বিধু পক্ষ রাম বসু বাঙ্গালার সন॥ সিত পক্ষ আসাড়ে যে নবমি সে দিনে।
শুন্ন বসু রাম চন্দ্র লিখি ইঙ্গরাজিতে। বারে বিধু স্বাতি ইক নক্ষত্র সে দিনে॥

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ১৭৫৩ শকে, ১২৩৮ সনে বা ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থখানি ভাগবতকে অনুসরণ করিয়া রচিত হইলেও উহার স্থানে স্থানে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রভাব লক্ষিত হয়। রাধার জন্ম অধ্যায়ে কবি লিখিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পুর্ব্বে জনম রাধার। লিখি রাধাজন্ম ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে।—ইত্যাদি
ভাগবতে নাহি কিছু প্রসঙ্গ তাহার॥

দানখণ্ড অধ্যায়টি হরিবংশের মতে লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,—

দানখণ্ড বিস্তার নাহিক ভাগবতে।
লিখিলাম আমি ইহা হরিবংশমতে॥

কৃষ্ণদাস তাঁহার শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলেও লিখিয়াছেন,—

দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে।
অজ্ঞ মুঞি কহি কিছু হরিবংশমতে॥

এই হরিবংশ কি বাঙ্গালা দেশের বিশেষ কোন লৌকিক পুরাণ বা কাব্য ছিল? ভবানন্দের হরিবংশ কাব্যের সহিত মহাভারতের খিলহরিবংশের কোনই মিল নাই, ইহাও দ্রষ্টব্য।

রচনার নমুনাস্বরূপ নিম্নে দশম স্কন্ধ হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করা হইল,—

দানখণ্ড

সকলেতে বড়াই বুড়িরে নিল ডাকি।
বিকিতে চলিল রাধে সঙ্গে নিয়ে সখি॥
মথুরা যাইব বলি হইল আগুসার।
জানিলেন কৃষ্ণ সেই সব সমাচার॥
সিশু সনে পুর্ব্বেতে গেছেন হরি মাটে।
সুবল সখার যুতে ডাকীলা নিকটে॥
তাহাদিকে বলিয়ে এ সব বিবরণ।
ধীরে ধীরে দয়াময় করিলা গমন॥
জমুনার তীরে কদম্বের তরুমুলে।
বামেতে কলসি রাখি বৈসে দানি ছলে॥
সখি সনে জান রাধে হয়্যা আগুয়ান।
এই তিন ভুবনে জার রূপের বাখান॥
ললিতা বিসাখা সব রাছে কাছে ২।
সঙ্গে যেতে না পারে বড়াই সব পিছে॥
পথমাঝে তরুতলে কানু আছে বসি।
পাস ঘেসি জান ছলে রাধিকা রুপসি॥
কৃষ্ণ কন সব সখি জাও কোথাকারে।
কিসের পসরা দেখি মাথার উপরে॥
রাধে কন শুণ শ্যাম জাই মধুপুরে।
ঘৃতো ঘোল দধি দুগ্ধ বেচিবার তরে॥
পসারে লয়েচি সেই দধি দুগ্ধ ঘৃত।
মাথাতে করিয়ে মোরা যাইতেছি দ্রুত॥
শুনি কানু কন সভে জাহ কোন বুকে।
ওলাহ পসরা আগে আমার সমুখে॥
রাধে কন পসরা ওলাব কী জন্মেতে।
হয়েচে গগনে বেলা যাব মথুরাতে॥
শুন বন্ধু এখন কৌসলকাল নয়।
হইলে অধিক বেলা বিক্রী নাহি হয়॥
আর এক শুন বন্ধু আমার বচন।
ওলাব পসরা কেন তোমার সদন॥
কানু কন না জান হয়েছি আমি দানি।
কংস কর খাব মোর এই ঘাটখানি।
কহিনু তোমারে সব তত্ত্ব বিবরণ।
ইবে মোরে কর দিয়ে করহ গমন॥

রাই বলে আই আই এ বড় অদ্ভুত।
কেনে হেন মিথ্যা কথা কহ নন্দসুত॥
চারি দিকে সখিগণ বলে ধীরে ধীরে।
কভু নাহি শুনি দানি যমুনার তীরে॥
আজি নহে কালি নহে বার মাস জাই।
কখন এখানে দানি দেখিতে না পাই॥
দধি লয়ে যাই মোরা কুলে কুলবতি।
ছাড়িতে না পারি জাতিবিত্তি জাই নিতি।
পুর্ব্বাপর শুনেচি এ পারাপার ঘাট।
আজি বন্ধু কেন তুমি কর এই ঠাট॥
পথ ছাড়ি দেহ আর না কর বিরোধ।
বুঝিলাম হও তুমি বড়ই নিবোধ॥
মথুরা নগরে আছে কংস নৃপবর।
সদা জাতায়াত করে তার অনুচর॥
দেখি গিয়ে এই কথা বলি গিয়ে তাকে।
তখনই প্রমাদ শুন হবে মুহূর্ত্তেকে॥
তোমারে দানির তারা এই দান দিবে।
লুটিয়ে নন্দের পুরি লইয়ে জাইবে॥

* * *

ছাড় কলা কালাহে বিলম্ব কর কেনে।
কখন হইবে বিক্রী ভেবে দেখ মনে॥
আর তাহে কখন এখানে নাহি দানি।
নিতি নিতি জাই মোরা জতেক গোপিনি॥
এই মত সখিগণ বলিল সভাই।
শুনিয়ে কহেন তবে নাগর কানাই॥
নিতি নিতি জাও বিকে মথুরা নগরি।
ভালই বচন তুমি বলিলা সুন্দরি॥
সর্ব্বদা আমি তো এই ঘাটে নাহি থাকি।
নাহি জানি কখন গিয়েছ সব সখি॥
এ ঘাট হয়েচে মোর দ্বাদস বৎসর।
এতো দিন বাকী আছে সবাকার কর॥
নিতি নিতি গিয়েচ আমারে দিয়ে ফাকী।
আজ আমি বুঝে লব শুন সব সখি॥
দধি দুগ্ধ চারি পোন ঘোলে কিছু উনো।
খির ঘৃত নবনি ছেনাতে চাহি দুনো॥

এই হিসাবেতে বারো বৎসরের লব।
তবে মথুরার বিকে জাইবারে দিব ॥
আজ আমি লাগ পাইয়াছি সভাকার।
বুঝিয়ে লইব দান গেছো যত বার ॥
সকলে আমার গোগুা আগে ফেলি দাও।
তবে সে মথুরা বিকে জাইবারে পাও ॥
এই মত করি যদি বলিল কানাই।
কহিতে লাগিলা তবে রসবতি রাই ॥
দান দিব বন্ধুহে তাহাতে নাই খেতি।
মিথ্যা কথা বল এত অনুচিত অতি ॥
এ ঘাটে তুমি হে দানি দ্বাদস বৎসর।
কেমনেতে এ কথা বলিলে নটবর ॥
দশম বৎসর হইল বয়েস তোমার।
কে [না] জানে বৃন্দাবনে বাস আছে যার ॥
দশম বৎসরের জসদার নিলমণি।
বারো বর্ষ এই ঘাটে আছ তুমি দানি ॥
বল দেখি বন্ধু তুমি আমার নিকটে।
পূর্ব্বে দুই বর্ষ দান কে সাধিল ঘাটে ॥

এই কথা কৈল যদি রসবতি রাই।
শুনি মনেতে লজ্জা পাইলা কানাই ॥
মুখেতে বলেন কৃষ্ণ শুন বিনদিনি
দ্বাদশ বৎসর আমি এই ঘাটে দানি ॥
দশ বর্ষ সাধি দান আসিয়া ব্রজেতে।
দুই বর্ষ লইনু দান গোলোক হইতে ॥
এই বারো বৎসর আমার ঘাটখানি।
বারো বৎসরের কর দেহতো গোপিনি ॥
শুনিয়ে কৃষ্ণের কথা রাধে বিনদিনি।
ইসদ হাসিয়ে মুখ ফিরান তখনি ॥
কৃষ্ণ কন কেনে ইবে ফিরালে বদন।
কর দিতে হবে বলি করিলে এমন ॥

* * *

দানখণ্ড বিস্তার নাহিক ভাগবতে।
লিখিলাম আমি ইহা হরিবংশমতে ॥

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের দানলীলার বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ধারার অনুসরণ বিস্ময়কর।

নৌকাখণ্ড

কৃষ্ণের এ কথা শুনি কন রাধে বিনদিনি
নিবেদন করি বংশিধারী।
তোমার তরি উপরে উঠিতে হে ভয় করে
সির্ন্ন জির্ন্ন তব তরি হেরি ॥
জমুনা তরঙ্গ উছলে টলমল করি দোলে
ঝলকে ঝলকে উঠে নির।
কেরুয়াল হাথে করি চাপিয়ে বসেচি হরি
তথাপি না পারি হতে স্থির ॥
আমরা নারি অবলা তাহাতে গোপের বালা
শঠতা না কোন কালে জানি।
তরঙ্গে হেলিছে তরি দেখি মোরা ভয়ে মরি
ভাবি মোনে যাইব কেমনে ॥
রাধার বচন শুনি কন তবে চক্রপাণি
শুন রাধে বলিব তোমায়।
হৃদয় কাষ্ঠের এই(=মুই ?) তরণি করেছি এই
মোন বাতাসেতে উড়ি জায় ॥

মোনে ভয় নাহি করি সভে আসি চাপ তরি
এখনি ও পার লয়ে জাব।
ভাণ্ড পিছে লব বুড়ি রাধার লইব সাড়ি
সখি পৃতি আনা আনা লব ॥

... ...

তরি করে টলমল চঞ্চলা গোপী সকল
সকাতরে বলয়ে কৃষ্ণেরে।
কী কর কী কর হরি দেখ হে ডুবয়ে তরি
কেরুয়াল না বাহ কী করে ॥
জমুনা তুফান অতি ঘোরতরা বেগবতি
দুকুলে বহিছে কানে কানে।
ঘন ঘন ঘুরে তরি বুঝি বা হে বংশিধারি
জীবনেতে হারাই জীবনে ॥

বিদেশিনীমান

গীত গান বীণাস্বরে মিলাইয়া তান।
শ্রবণে শুনিতে রাধা পাইলেন গান॥
বেগ্রা হ'য়ে কন রাই বিসাখা চাহিয়ে।
দেখ সখি কেবা যায় বীণা বাজাইয়ে॥
নিকটেতে তাহারে ডাকিয়ে আন দেখি।
শুনি শীঘ্র উঠিল বিসাখা ছয় সখি॥
ডাকিল তখন শ্যামে নয়নভঙ্গিতে।
আইলা নাগররাজ রাধার সাক্ষাতে॥
বসাইল কমলিনী আপনার পাশে।
কহ নিজ বিবরণ বলিয়া জিজ্ঞাসে॥

কি নাম তোমার কোন দেশে নিবসতি।
বীণা যন্ত্র করে কেন ধরেচ যুবতি॥
তব প্রাণনাথ বল কি দোষে তেজেছো।
একাকিনি হয়ে কেন ভ্রমণ করিছ॥
শুনিয়ে কহেন শ্যাম শুন কমলিনি।
উদাসিনি হই মোর নাম বিদেসিনি॥
কি কব তোমারে প্রেমদায়ে ঠেকেচি।
সেই হেতু বীণা লয়্যা সদা ভ্রমিতেছি॥
আপনি আমারে ছাড়ি গেল মোর পূয়ে।
একাকী রহিতে নারি তারে না দেখিয়ে॥

শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'

১৮৫৭ সনে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্বন্ধে 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' লিখিয়াছিলেন :—

> প্রশংসিত বাবুর বয়ক্রম ১৭ বৎসরের অধিক হইবেক না। ঐ কালে বালকেরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে ; গ্রন্থ রচনায় কেহই পারগ বা উদ্যত হয় না ; কিন্তু উল্লিখিত বাবু ঐ কালমধ্যে নানা গ্রন্থ সাময়িক পত্র ও বক্তৃতা রচনা করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকট প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রাজেন্দ্রলালের উক্তিতে কোন ভুল নাই। ১৮৫৭ সনের পূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন সিংহ সত্য সত্যই একখানি সাময়িক পত্র বাহির করিয়াছিলেন ; তাহার নাম 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'। ইহা কালীপ্রসন্ন সিংহ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র ছিল। কিন্তু এই পত্রিকাখানির কথা এত দিন কাহারও জানা ছিল না ; এমন কি, কালীপ্রসন্নের ইংরেজী ও বাংলা জীবনচরিত-রচয়িতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষও ইহার সন্ধান দিতে পারেন নাই। এই পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যা সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার মলাটের অনুলিপি দিতেছি :—

> **বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা।**
>
> মাসিক প্রকাশ্য।
>
> শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ দ্বারা বিরচিত।
>
> বাঙ্গাল সুপিরিয়ার যন্ত্রে মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যায় ১০ পৃষ্ঠা লেখা থাকিত। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ :—সভ্যতার বিষয়, পৃ. ১-৯ ; চাঞ্চল্য (ক্রমশঃ প্রকাশ্য), পৃ. ৯। ১০ম পৃষ্ঠায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে, ইহা হইতে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের তারিখ—২০ এপ্রিল ১৮৫৫—জানা যাইতেছে।

> **বিজ্ঞাপন।**
>
> যদিও আমার তাদৃশ বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি হয় নাই, তথাপি বিদ্যাবন্তব্যক্তি ব্যূহের উৎসাহে এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। এই পত্রিকা যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি যোড়াসাঁকোস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভার কার্যালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ইহার মূল্য /০ একআনা মাত্র।
>
> যোড়াসাঁকোস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভা,
১৭৭৭ শক, ৮ বৈশাখ, ১২৬২ সাল
>
> শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ,
সম্পাদক
>
> সভ্য মাত্রেই বিনা মূল্যে এক খণ্ড করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কালীপ্রসন্ন সিংহের স্বরচিত। তাঁহার প্রাথমিক রচনাগুলি এ-যাবৎ কেহই উদ্ধার করিতে পারেন নাই। এই কারণে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিবার প্রয়োজন আছে। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'সভ্যতার বিষয়' প্রবন্ধটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সভ্যতার বিষয়।—অসভ্যাবস্থা দূরীকৃত করিয়া সভ্যতার সোপানারূঢ় হইতে সকলেরই প্রধানোদ্দেশ্য, কিন্তু কি কি উপায়াবলম্বন করিলে এতৎ মাঙ্গলিক বিষয়ানুষ্ঠান হইতে পারে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধানের অনুবর্ত্তী প্রায় কাহাকেই দৃষ্টিগোচর হয় না অতএব এই সর্ব্বমঙ্গল প্রদায়ক বিষয়ের কোন কোন উপায়াবশ্যক করে, তাহা পশ্চাৎ ভাগে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

বিদ্যাই ইহার প্রধান সোপান স্বরূপ। ভূমিতে হলযোজনাক্রিয়াদি দ্বারা শস্যাদি রোপিত হইলে যেমত ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ মনোমধ্যে বিদ্যাবীজাঙ্কুরিত না হইলে সরলান্তঃকরণ সদ্ভাব উপচিকীর্ষা ন্যায়পরতা ইত্যাদি বৃত্তি দ্বারা মন কখনই বিভূষিত হইতে পারে না। যদি এই রসার্দ্রিত না হইয়া অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন থাকে, তবে কেবল অনিষ্টকর এবং অমাঙ্গলিক বিষয়ানুষ্ঠানানুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বলোকাপ্রিয় এবং অশেষবিধ যন্ত্রণার ভাজন হইতে হয়। মানসিক বৃত্তির চালনা থাকিলে মনের স্ফুর্ত্তি লাভ এবং পরমাশ্চর্য্য বিষয়ানুশীলনে, সর্ব্বদেশোপকারে, মন আবদ্ধ থাকে। ভূতত্ত্ববেত্তা, ভূগোলবেত্তা, জ্যোতির্ব্বেত্তা, বিজ্ঞানবেত্তা, বিশ্বজ্ঞানবেত্তা, এবং অন্যান্য বিষয়ে সুপণ্ডিত হওয়া বিদোজ্জ্বল ব্যতিরেকে হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মানসিক শক্তির যত প্রবলতা হইবে, ততই সুখের যথেষ্ট পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবেক, বুদ্ধির প্রাখর্য্যতা হেতু নানা বিষয়ে সুবিধা এবং শারীরিক ক্লেশের অনেক হ্রাসতা লাভ করিয়াছে। অধিকন্তু সৎস্বভাবান্বিত, সরলান্তঃকরণান্বিত, পরম কৃপান্বিত মহাপূজনীয় মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তিদিগের বিদ্যালোচনা, জ্ঞানালোচনা, ধর্ম্মালোচনা, এবং সর্ব্বমঙ্গলালোচনা স্বভাবাবস্থিত হইলেই অতি মূঢ় অজ্ঞ ব্যক্তিরাও নানা বিষয়ে মহোপকৃত হইতে পারে। অতএব এতাদৃশ সৎসংসর্গে অবস্থিতি করা সকলেরই কর্ত্তব্য। হায়! অস্মদ্দেশে তাদৃশ জ্ঞানানুশীলন না থাকাতে যে কতই অন্যায় এবং অযুক্তি যুক্ত ব্যবহার সংঘটিত হইয়া আসিতেছে, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে।

জাত্যভিমান, যাহা এতদ্দেশীয় লোকের পক্ষে বিষম শূল স্বরূপ হইয়া অশেষ যন্ত্রণায় জর্জ্জরীভূত করিতেছে। কারণ অধুনা ইউরোপ এবং আমেরিকা খণ্ডে যেরূপ সুপ্রণালী ক্রমে বিদ্যানুশীলনের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে, আসিয়া খণ্ডে তাহার কিছুমাত্রও নাই। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! এতদ্দেশীয় লোকেরা অর্ণবযানারোহণ পূর্ব্বক তথায় গমন করিয়া জ্ঞানার্জ্জন পূর্ব্বক, স্বীয় মানব জন্মের সার্থকতা লাভে বঞ্চিত হয়েন। যেহেতু তাহার স্বীয় স্বজন বন্ধুবর্গ এবং পরিবারেরা সেই মহাত্মাকে সমুচিত সম্মান করা দূরে থাকুক, তাহাকে জাতিভ্রষ্ট করিয়া পরিত্যাগ করে, ও এতদ্রূপ পরিত্যক্ত হইতে অনেক মহাত্মাকে দৃষ্টি গোচর হইতেছে। এবং এই অনিষ্টকর দেশাচার অস্মদ্দেশে বদ্ধমূল হওয়াতে যে আরও কত শত প্রকার দুর্ঘটনা দিন দিন সংঘটিত হইতেছে তাহা অবচনীয়। দেখ যে ব্যক্তি সৎকর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন নিষ্ঠুর দেশাচারের অসহ্য বিষমবিষদন্ত দংশনাশঙ্কায় তাহাতে অপ্রবৃত্ত হইয়া অশেষ ক্লেশভোগ করেন। যেহেতু সকলেই এক কর্ম্ম প্রাপ্তির আশার উপরে নির্ভর করিলে কখনই তদ্দ্বারা সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে পারে না। যেমন বিন্দুমাত্র অনল সংযোগে মহার্ণবের বারি উত্তপ্ত হয়

না ; তদ্রূপ সর্ব্বসাধারণে এক কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইলে তদ্দ্বারা কখনই সুশৃঙ্খলরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ ও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। আহা! অস্মদ্দেশীয় লোকেরা দিন দিন নিস্তেজ ভীরুস্বভাব দুর্ব্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত কেন হইতেছে ও কি নিমিত্তই বা পরস্পর দ্বন্দ্ব কলহ দ্বারা বিষম দ্বেষানলে অহরহ দগ্ধ হওত দুষ্‌ক্রিয়াশক্ত প্রযুক্ত দুঃসহ রোগাক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। ইহার কারণানুসন্ধান করিতে হইলে ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হইবেক যে কৌলীন্য ব্যবস্থানুসারে উদ্বাহ নির্ব্বাহই ইহার মূলীভূত কারণ।

হায় এমৎ মহানন্দের কালোপস্থিত আমাদিগের কবে হইবে, যেদিনে এই সর্ব্ব বিষয় হন্তা মহদ্বিষয়ানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধকারী ধর্ম্মানুশীলনের বৈরী স্বরূপ মন বিচ্ছেদের মূলাধার নিরপরাধির প্রাণহর্ত্তা এবং দেশোচ্ছিন্ন করিবার মুখ্য কারণ দেশাচার দূরীভূত হইবে, তখন এতদ্দেশের সৌভাগ্যের আর পরিসীমা থাকিবেক না।

ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল, তিনি এই সুখকর মনোহর জগৎসংসার সৃজন করিয়া ইহাতে যে সমস্ত অদ্ভুত নৈপুণ্যতা করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলে অন্তঃকরণ প্রফুল্লতার হিল্লোলে আর্দ্র হইতে থাকে। তিনি সর্ব্বদেশের স্বভাবাদি বিভিন্ন করিয়া নানা আশ্চর্য্যাশ্চর্য্য, অশেষ হিত সমৃদ্ধিত এবং গুণবিশিষ্ট দ্রব্যাদি দ্বারা পৃথিবীকে মনুষ্যের সুখাকর স্বরূপ করিয়াছেন। মানবগণ দ্রব্যাদির গুণজ্ঞ এবং সংযোগ বিয়োগাদির মর্ম্মজ্ঞ বিষয়ে যত নৈপুণ্যতা প্রকাশ করিবেন, ততোধিক পরিমাণে সুখের আতিশয্য বৃদ্ধি হইতে পারিবে। কাষ্ঠাদি জলসংযুক্ত হইলেই কাষ্ঠ জলোপরি ভাসমান হইয়া থাকে। এবং ধাতু সংযোগীত বিষয়াদির নিগূঢ় তত্ত্বাবধারণেতেই নাবিকতা ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ানুশীলনের বিশেষ প্রাচুর্য্য লাভে, কত শত দেশ ইহার উপকার পাশে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অধিকন্তু চুম্বুক পাথরের প্রকাশ, পদার্থ বিদ্যানুকূল্যের মহাশ্চর্য্য,"Steam engine" অর্থাৎ দ্রুত শিখা নিঃসারিত, জল স্থল উভয়স্থ এবং মনভ্রমণানুযায়ী শকট, ও Telescope অর্থাৎ দূরদৃষ্টি সমীপকারী বোধক যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ ও প্রকাশতাতে অবনীমণ্ডলস্থ তাবৎ জাতি মাত্রেই এই হিতাভিলাষিণী পরমোপকারিণী এবং দেশবিদেশের সভ্যতা উন্নতির আদিকারণ স্বরূপ পরমামৃতপানে মন আনন্দ রসার্দ্রিত হইয়া থাকে। যথেষ্ট দ্রব্যোৎপাদক এবং নদ্যাদি পরিবেষ্টিত দেশাদিতে বাণিজ্যাদির বিশেষ আধিক্য থাকিবার, তত্তদ্দেশে সভ্যতা ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। কিন্তু পদার্থবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিব্যূহের নির্ম্মল ও সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রাখর্য্যতাতে যে বিদ্যুৎ যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ হইয়াছে, তাহার আনুকূল্যে বাণিজ্য দেশ পরিভ্রমণ প্রাণীর প্রাণরক্ষা অজ্ঞানির জ্ঞানচর্চ্চা বৈরী হইতে রাজ্য মোচন সংবাদাদি প্রেরণাপ্রেরণের সদুপায় দুর্ভিক্ষ হইতে দেশ মুক্ত হওয়া ইত্যাদি সুচারুরূপে নিষ্পাদন হইতেছে। বাণিজ্য দ্বারা দেশীয় লোকের সাহস সভ্যতা এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতে পারে। কোন্ কোন্ কর্ম্মাসক্ত হইলে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সহকারে সভ্যতার উন্নতি হইতে থাকে, তাহা পশ্চাদ্ভাগে বর্ণনা করা যাইতেছে। যে যে ব্যক্তিরা পরিশ্রমাবলম্বন করিয়া নানা বিষয়োপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণে যত্নবন্ত থাকে তত্র দেশে এই এই কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিবার সভ্যতার দেশ বলিয়া পরিগণিত হয়। পূর্ব্বকালের সহিত বর্ত্তমান কালের অবস্থার উন্নতির বিষয় তুলনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে এক্ষণকার লোকেরা অনেকাংশেই সভ্যতাতে পদার্পণ করিয়াছেন। দেশ দেশান্তরে গমনাগমন এবং সংবাদাদি প্রেরণাপ্রেরণের দিন দিন যেরূপ সদুপায় হইতেছে পূর্ব্বে ইহার কিছুমাত্র ছিল না, কত শত ব্যক্তি ভূমি হইতে ধাতু খনন করিতেছে, কেহ বা অতি দুস্তর গম্ভীর ভয়ানক মহার্ণব হইতে মুক্তাদি বহুমূল্য প্রস্তর সকল উত্তোলন

করিতেছে, কেহ বা মেষ প্রভৃতি পশুদিগের লোম সকল সংযোজনা করিয়া অত্যুত্তম বস্ত্রসকল প্রস্তুত করিতেছে কেহ বা কৃষিকর্ম্মে আসক্ত হইয়া প্রগাঢ় পরিশ্রমপূর্ব্বক সুস্বাদু শস্যাদি প্রস্তুত করণান্তর লোকদিগের জীবনদান করিতেছে। কত কত ব্যক্তিরা অতি সুমনোহর অট্টালিকা সকল নির্ম্মাণ করিয়া মনুষ্যের সুখাবাস করিয়া দিতেছে। এবং কত শত গ্রন্থকর্ত্তারা স্ব স্ব দেশের অবস্থা এবং রীতিনীতি আচার ব্যবহার সকল অতি সুললিত ভাষায় গ্রন্থসকল মুদ্রাঙ্কিত করিয়া পৃথিবীর অশেষ প্রকার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। এবং সংবাদদাতারা দিন দিন দেশের অবস্থানুসারে নানা প্রকার সংবাদ পত্রাদি প্রকাশ পূর্ব্বক পৃথিবীর চতুর্দ্দিগে বিস্তারিত করিয়া লোকদিগকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে মুক্ত করিতেছে। এই সমস্ত ব্যাপার দিন দিন সুসম্পন্ন হওয়াতে পৃথিবীর অশেষ প্রকারে মঙ্গলোন্নতি হইতেছে নাবিকেরা জাহাজারোহণ পূর্ব্বক দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া তত্তদ্দেশস্থ দ্রব্য সামগ্রী আনয়ন করত বিনিময় করাতে যে সকল দ্রব্য তাহাদিগের প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা মাত্র ছিল না তাহা অনায়াসে আবাসে অবস্থিতি করিয়া সম্ভোগ করিতেছেন এতদ্রূপ বাণিজ্য ব্যবসার দ্বারা লোকেরা শিল্পদক্ষ ও পরিশ্রমী হয়, যদিও এতদ্দ্বারা অশেষ প্রকারে ক্লেশ নিবারণ এবং মঙ্গল সাধন হইতেছে বটে, কিন্তু সর্ব্বলোক হইতে আসক্ত হইলে বিপর্য্যয় হইয়া উঠে মনুষ্যের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহার্থে নানাবিষয়াবশ্যক, সুতরাং সকলেই এককর্ম্মাসক্ত হইলে তদ্দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া, বরং নানা প্রকারেই অমঙ্গল ঘটে। দেশ পর্য্যটন দ্বারা মনুষ্যের অত্র সর্ব্বতোভাবে সভ্যতা বৃদ্ধি এবং উপকার বর্দ্ধন হয় জগদীশ্বর এই পৃথিবীর স্থানে ২ যে সমস্ত অদ্ভুত কীর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছেন দেশভ্রমণ দ্বারা সেই সমস্ত পদার্থ অবলোকন করিয়া তাহার যথার্থ তাৎপর্য্যাবগত হইলে অন্তঃকরণ আনন্দ সলিলে প্লাবিত হইতে থাকে, এবং নানা দেশীয় লোকের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবত ব্যবহারাদি জ্ঞাত হইয়া ন্যায় অন্যায় বিবেচনা পূর্ব্বক তদ্বিষয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারা যায়। অনেক অনেক মহাত্মারা কহিয়াছেন যে ইহা দ্বারা স্মরণের প্রগাঢ়তা, চরিত্রের সংশোধন, বুদ্ধির প্রাখর্য্যতা হয়, এবং যিনি যথার্থরূপে জ্ঞানানুশীলনে উৎসুক হয়েন, তিনি জগদীশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে যে সকল মহা মহা আশ্চর্য্য বিষয় আছে তাহা সন্দর্শন করিলে অভিজ্ঞতালাভ করত মনোমধ্যে এই বোধ করেন যে পরমেশ্বর তাহার জ্ঞানের শিক্ষার জন্য উপদেশক স্বরূপ হইয়াছেন। মনুষ্যের মন কোন বিষয়েতেই এতাধিক আনন্দিত হয় না যদ্রূপ তত্ত্বানুবেত্তা হইয়া ভ্রমণ বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ করে। পূর্ব্বকালে যাঁহারা বিশ্বজ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কীয় গ্রন্থাদি প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং স্থির মনোযোগের সহিত মনুষ্যের স্বভাবাদি বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান লইতেন, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশের দর্শনকারি বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। গ্রীস দেশীয় প্রায় সকল সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা মিসর দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই ভারতবর্ষে জ্ঞানান্বেষণ জন্য আসিয়াছিলেন (Anacharsis) নামে একজন (Sythian) আপনদেশ উজ্জ্বল করিয়া গ্রীস দেশ পর্য্যটনকারি বলিয়া গণনীয় হয়েন ঐ সময়ে তিনি গ্রীস হইতে অনেক বিদ্যা ও জ্ঞানের উন্নতি করিয়াছিলেন।

হায়! দুর্ভাগা বঙ্গদেশীয় লোকেরা এই সমস্ত হিতজনক বিষয়ানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ প্রযুক্ত সামান্য লোকদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে কুসংস্কাররূপ বিষম বৃক্ষ বপন করাতে মহানর্থের কারণ হইয়াছে। তাহারা পৃথিবীকে ত্রিকোণ এবং ইহাতে সপ্ত সমুদ্র প্রভৃতি অতি অপকৃষ্ট মত সকল গ্রাহ্য করিয়াছেন। যাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়া দিলেও স্থাবলম্বিত মত ঈশ্বর প্রণীত জ্ঞানে তাহাতে হেয় এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, সুতরাং নির্ম্মল মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিব্ ্হের সহিত তাহাদিগের আন্তরিক প্রণয় না হওয়াতে মনোবিচ্ছেদ হেতু অশেষ বিপদ উৎপত্তি হয়। ঐক্যতা যে কি

পরমোৎকৃষ্ট পদার্থ তাহাতে তাহারা এককালে বঞ্চিত থাকায় পরস্পর দ্বন্দ্ব কলহোপলক্ষে সাধ্যমত অনর্থ অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়াও পরানিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। কেহ কোন ব্যয়সাধ্য সৎকর্ম্মানুষ্ঠানার্থে তাহারদিগের নিকট যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করিলে কখনই তাহাতে সম্মত হয়েন না। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় তাহারা স্বীয় বারাঙ্গনা ও সুরা সেবন প্রভৃতি উপলক্ষে দিন দিন অকাতরে যে ব্যয় স্বীকার করেন, তদ্দ্বারা অশেষ প্রকার দেশের হিত সাধন ও মঙ্গল বর্দ্ধন হইতে পারে। কোন কোন স্থানে বারয়ারি পুজোপলক্ষে বৎসর বৎসর যাহা ব্যয় করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা অনায়াসেই পাঠশালা সংস্থাপিত করিয়া বালকবৃন্দের জ্ঞানানুশীলন, লোকদিগের গমনাগমনোপযোগী বর্ত্ম, দুর্দ্দান্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পীড়া শান্তির নিমিত্ত ঔষধালয়, পিপাসাতুর ব্যক্তিদিগের তৃষ্ণা শান্তির নিমিত্ত পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি পরমোপকার-জনক সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া দেশোজ্জ্বল করিতে পারে এই সমস্ত সামান্য বিষয়ে অস্মদ্দেশীয় লোকেরা বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন। ঐকৈক্য মতাবলম্বন পূর্ব্বক কতদিনে এতদ্দেশীয় লোকেরা অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনত্ব প্রাপ্ত হইবেন তাহা স্মরণ করিলে হতজ্ঞান হইতে হয়। এই সমস্ত অন্যায় বিষয়ের কারণানুসন্ধান করিলে ইহা অবশ্যই বোধ হইবে যে জ্ঞানের অনুশীলন ও ধর্ম্মের ঐক্যতা না থাকাতে এতাদৃশ বিপদোৎপত্তি হইতেছে। হায় এতদ্দেশীয় লোকেরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বিবেচনা করিল না যে ইংরাজেরা কেবল ঐক্যতাবলম্বন পূর্ব্বক এদেশে আগমন করিয়া সুকৌশলে দলবলে রাজা গ্রহণান্তর স্বাধীনরূপে শাসন করিতেছেন। প্রায় তিন শত বৎসরাতীত হইল আমেরিকা দেশ প্রকাশ হইয়াছে, পূর্ব্বে তত্রস্থ লোকেরা অসভ্যাবস্থায় থাকাতে ইংরাজদিগের অধীন ছিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য পরমোৎকৃষ্ট একতারূপমূল তাহাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকাতে অল্পদিনের মধ্যেই সেই সমস্ত সাম্রাজ্য হস্তগত করিয়া সভ্যতাপথাবলম্বী হওত স্বাধীনরূপে রাজ্য শাসন এবং প্রজা পালন করিতেছেন। হায় মনোদুঃখের বিষয় স্মরণ করিলে নয়ন হইতে অনবরত বারি নিঃসৃত হইতে থাকে, যে অস্মদ্দেশীয় অনেকানেক ব্যক্তিরা আমেরিকা যে একটি দেশ আছে তাহা বিশেষরূপে অবগত নহেন।

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার ২য় সংখ্যার মলাটও প্রথম সংখ্যার অনুরূপ। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১-২০। ইহাতে মুদ্রিত রচনাগুলির নাম :— বাল্য বিবাহ (পৃ• ১১-১৩), কৌলীন্য (পৃ• ১৪-১৭), চাঞ্চল্য (পৃ• ১৭-১৮), বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা (পৃ• ১৮-২০)। আমরা কয়েকটি রচনা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

বাল্য বিবাহ।—বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে যে সকল কুৎসিত প্রথা প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া একটি সামান্য কুপ্রথা নহে। পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইলে ইহা নানা অনিষ্টের মূল। দেখ মাতা পিতা পুত্রটির পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে না হইতেই কিরূপে কন্যাসাত করিবেন সর্ব্বদা এই চিন্তাতেই ব্যাকুল থাকেন। কেবল চিন্তিত থাকেন এমত নহেন অতীব যত্ন সহকারে কুলাচার্য্যকে সমাহ্বান করিয়া কন্যা অন্বেষণে নানা দিগ্বিদেশে প্রেরণ করেন। জননী, সুন্দরী পুত্রবধূর মুখ নিরীক্ষণাভিলাষে নানা দেবালয়ে নানাবিধ মানসিক করিয়া থাকেন ফলতঃ মাতা পিতা শীঘ্র শীঘ্র বধূসহিত পুত্রের কমল বদন নিরীক্ষণ করিতে পারিলেই আপনাকে অত্যন্ত ভাগ্যশালী ও কৃতার্থম্মন্য বোধ করেন। ইহা অপেক্ষা বৈদিক মহাশয়দিগের পাণিগ্রহণের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে

উদ্বাহর চেষ্টা করিয়া থাকেন কিন্তু বৈদিক মহাশয়েরা গর্ব্ভে গর্ব্ভেই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন ফলতঃ ইহাতে যে নানাবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে তাঁহারা ভ্রম ক্রমেও তাহার অনুধাবন করেন না।

অনিষ্টের বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ ইহা দেখিতে হইবে যে প্রাণিগণের জীবিত কাল অবস্থাত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছে যথা বাল্য, যৌবন, এবং বার্দ্ধক্য। কোন্ অবস্থায় কি কি কর্ম্ম করিতে হইবে নীতিশাস্ত্রে ইহার নিরূপণ আছে যথা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসাদি যৌবনে ধনোপার্জ্জনাদি বার্দ্ধক্যে পুণ্যসঞ্চয়াদি। যদ্যপিও বাল্যকাল ব্যতীত অন্য সময়ে বিদ্যাভ্যাসাদি হইতে পারে কিন্তু বাল্যকালে মেধা সমধিক থাকে সে সময়ে অনায়াসেই যত শিক্ষা করিতে পারা যায়, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে তত শিখিতে হইলে প্রগাঢ় পরিশ্রম অপেক্ষা করে এবং তাদৃশ সুচারু হইবারও সম্ভাবনা নহে। যোগ্য সময়ে ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে যত শস্য জন্মে অসময়ে কি সেরূপ হয়? অতএব বাল্যকালকেই বিদ্যাভ্যাসের উৎকৃষ্ট সময় বলিতে হইবে কিন্তু আমাদিগের দেশে সকলি ইহার বিপরীত। দেখ বাল্যাবস্থাতে পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়া যখন উত্তরোত্তর স্ত্রীপুরুষের প্রণয় বদ্ধমূল হইয়া উঠে তখন বিদ্যাভ্যাসাদিতে অপেক্ষাকৃত অনেক অযত্ন ও ব্যাঘাৎ জন্মে তাহার আর সন্দেহ নাই। এই রূপেই অস্মদ্দেশীয় লোকেরা অপেক্ষাকৃত অন্য দেশস্থ লোক হইতে সমধিক রূপে মূর্খতাজালে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অপর, বাল্যকালে বিবাহ হইলে হতবীর্য্যও হইতে হয় তাহার প্রমাণ অস্মদ্দেশীয় লোকেরা প্রায়ই অন্যদেশীয় লোক হইতে দুর্ব্বল হইয়া থাকে সুতরাং দুর্ব্বল হইলে ইহারা যে কোন কালে স্বাধীন হইবে তাহার প্রত্যাশা করাও বৃথা। এই বাল্য বিবাহ এদেশের দরিদ্রতার এক প্রধান কারণ। দেখ যখন পুত্রের বয়ঃক্রম অল্প তখন সে ভবিষ্যতে বিদ্বান হইবে কি মূর্খ হইবে; সুশীল হইবে কি দুঃশীল হইবে; সম্পন্ন হইবে কি দীন হইবে; তাহা জানিতে পারা যায় না। সেই সময়ে তাহার বিবাহ দিলে যদ্যপি সে উপার্জ্জন করিতে অশক্ত হয়; তবে তাহাকে পুত্রকলত্রাদির ভরণপোষণ করিতে যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট হয় তাহা বর্ণনাতীত। আহা তাহার স্ত্রীপুত্রাদি পর্য্যাপ্ত অন্নাচ্ছাদনাদির অভাবে নিরন্তর দুঃখে সময়াতিপাত করে! অতএব যখন কৃতবিদ্য হইয়া উপার্জ্জনাদি করিতে পারিবে তখনি মাতা পিতার বিবাহ দেওয়া যথার্থ স্নেহের কর্ম্ম।

আরো স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে পরস্পর অপ্রণয় দৃষ্ট হয় বাল্য বিবাহকে তাহার এক প্রধান কারণ বলিয়া গণনা করিতে হইবে; কারণ বিবাহ কালে শিশু বরকন্যা পরাধীন ও সদসদ্বিবেক-হীন; সুতরাং মাতা পিতা যদ্যপি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া অন্যায় বিবাহ দেন তবে ভবিষ্যতে কিরূপে দম্পতি সুখে কালযাপন করিবে। কিরূপেই বা তাহাদিগের পরস্পর ঐক্য থাকিতে পারে আরো বাল্যকালে উদ্বাহ দেওয়ায় এক ভয়ানক ঘটনা হইয়া থাকে। বিজ্ঞ বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা কহেন এবং প্রত্যক্ষও করা যাইতেছে যে বাল্যকালে অধিক পীড়াদি ঘটে এবং তাহাতে অনেকেই কালকবলে নিপতিত হয় সুতরাং পতির কাল হইলে বর্ত্তমান নিয়মানুসারে পুনরুদ্বাহ না থাকায় বালিকা বিধবা যাবজ্জীবন দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে অতএব এই সকল দোষ পর্য্যালোচনা করিয়া অতি অনিষ্টকর বাল্য বিবাহ যাহাতে রহিত হয় তাহাই শীঘ্র করা কর্ত্তব্য।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা
১০ মাঘ ১৭৭৬ শক
শনিবার যোড়াসাঁকো }

কৌলীন্য—আমাদিগের দেশে এক্ষণে যেরূপ কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রচলিত আছে; ইহাকে শত শত অনর্থের বীজস্বরূপ বলিয়া গণনা করিতে হইবে।

ইহা প্রথমত কোন্ অভিপ্রায় প্রচলিত হইয়াছিল এবং আপাততঃ কৌলীন্য স্থাপনের মর্ম্মোচ্ছেদ করিতে না পারিয়া কেবল ইহাকে বংশ পরম্পরাগত করায় প্রত্যহ যে রাশি রাশি অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে তদ্বিষয় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে; শ্রোতা মহাশয়েরা পক্ষপাত রহিত হইয়া মনোভিনিবেশ পুর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখুন ইহা রহিত করা উচিত কি না? অধিক পুর্ব্বে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রচলিত ছিল্ না। বৈদ্যবংশোদ্ভব নৃপতি বল্লাল সেনই আপন অধিকার কালে সকলের গুণদোষাদি পর্য্যালোচনা করিয়া যাঁহারা সদ্‌গুণান্বিত ধার্ম্মিক ও সুশীল তাঁহাদিগকেই মর্য্যাদাসূচক কুলীন উপাধি প্রদান করেন। এবং যাহারা অপেক্ষাকৃত উক্ত গুণাদি বিহীন তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিদুন মৌলিকাদি উপাধি দান করেন ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে তিনি, সকলেই অসামান্য মান্যসূচক কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া সুখে অবস্থান করিবে। এই প্রত্যাশায় "আচারো বিনয়ো বিদ্যা" ইত্যাদি যে সমস্ত কুলীনের লক্ষণ আছে তদনুগামী হইবে, তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে অধার্ম্মিক ও দুষ্‌ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা হ্রাস হইয়া যত ধার্ম্মিক ও সুশীলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে ততই সংসার হইতে দুষ্কর্ম্মপ্রবাহ মন্দীভূত হইয়া সকলে সুখে অবস্থান করিতে পারিবে এই নিমিত্তই সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করেন। এই অভিপ্রায়কে অতি উত্তম বলিতে হইবে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দোষ গুণাদি পর্য্যালোচনা না করিয়া কেবল কুলীনের পুত্র হইলেই আপন পিতার পদের উত্তরাধিকারী হইবে যদ্যপি সহস্র সহস্র দোষের আধার হয় তথাপি জনসমাজে তাহার পিতার ন্যায় মান ও আদরাতিশয়ের কোন হানি হইবে না। এইরূপে কৌলীন্য মর্য্যাদা কুলক্রমাগত হওয়ায় পুর্ব্বলিখিত কুলীন শ্রেণী স্থাপনকর্ত্তার সদভিপ্রায় বিপরীত হইয়াছে। সকলের ভদ্র হইবার উৎসাহ বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক বরং যাহারা বাল্যকালাবধি অতিশয় পরিশ্রম ও অর্থব্যয়াদি স্বীকার করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন পুর্ব্বক ভদ্রতার পদবীতে সমারূঢ় হইয়াছেন তাঁহারা আপন অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট মূর্খতম অধার্ম্মিক কুলিনসন্তানদিগের মান ও গৌরবাদি এবং আপনাদিগের অনাদরাদি দেখিয়া অত্যন্ত হতোৎসাহ হয়েন। আর তাহাদিগের পূর্ব্বের ন্যায় বিদ্যাধ্যয়নাদি বিষয়ে যত্ন থাকে না।

আহা আমাদিগের দেশের লোকের কি ভ্রমান্ধতা ও বদ্ধমূল কুসংস্কার। অস্মদ্দেশীয় অসংশোধিতচিত্ত পরম্পরাগত কুসংস্কারবশত লোকেরা অশেষ দোষের আকর স্বরূপ কুলীনের পুত্রকে পাদানত হইয়াও নানাবিধ অর্থব্যয় পুর্ব্বক কন্যাদান করিয়া "আমি অদ্য কৃতার্থ হইলাম আমা অপেক্ষা আর ভাগ্যশালী লোক ভুবনে পাওয়া ভার অদ্য আমার চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত স্বর্গে গমন করিল" ইত্যাদি বিবেচনা করিতে থাকেন আর একব্যক্তি বিদ্বান্ সুশীল সুরূপ ধার্ম্মিক মৌলিকাদিকে বিবাহ করিতে হইলে প্রভূত অর্থ প্রয়োজন করে এবং অর্থাভাবে শত শত ব্যক্তিও বিবাহ করিতে পারে না এই সকল অবিচার অন্যায় আচরণ দর্শন করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি না দুঃখিত হইবেন? বর্ত্তমান কৌলীন্য মর্য্যাদা বর্ত্তমান থাকিলে কেবল পুর্ব্বপ্রদর্শিত অবিচার ঘটে এরূপ নহে ইহাতে আর [এক] ভয়ানক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কুলীন মহাশয়েরা অর্থলাভ প্রত্যাশায় অথবা কন্যাকর্ত্তার আগ্রহাতিশয়ে বশীভূত হইয়া এক এক জন, শত শত স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহারা এমত কোন ক্ষমতা বিশেষ প্রাপ্ত হন নাই স্ত্রীর ধর্ম্মরক্ষা ও মনোরক্ষাদি করিবেন্। হয়ত কেহ বিবাহ করিয়া

অবধি আর স্ত্রীর নিকট যান না কেহবা বার্ষিক কিম্বা মাসিক নিয়মে শ্বশুরালয়ে গমন করেন, কেহ কেহ দশ কিম্বা দ্বাদশ বৎসরের পর শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া যদ্যপি মর্য্যাদার টাকা না পান তবে স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণাদি না করিয়া অবিলম্বে ক্রোধভরে স্থানান্তরে গমন করেন। ইহাতে সেই স্ত্রীসকল যে কি পর্য্যন্ত দুঃখে কালযাপন করে তাহা বর্ণনাতীত। কোন কোন স্ত্রী দুঃসহ যৌবন যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া ব্যভিচার দোষে দূষিতা হয় এবং এইরূপে ক্রমশ বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে যে কুলীন মহাশয় শত শত স্ত্রীকে বিবাহ করেন্ তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলে একেবারে তাঁহার সকল পত্নী বৈধব্যদশাগ্রস্তা হয় তখন তাহারা আর যথেচ্ছ উপভোগাদি করিতে পারে না, কেবল প্রাণধারণোপযোগি একসন্ধ্যা যৎকিঞ্চিৎ ফলমূলাদি আহার করিয়া দিন যাপন করে তিথিবিশেষে জলগণ্ডুষ মাত্রও খাইতে পায় না। আহা! তাঁহাদিগের এই সমস্ত যন্ত্রণা অবলোকন করিয়াও কেহ পরমকারুণিক জগদীশ্বরের অনভিপ্রেত অতিশয় নিষ্ঠুর কার্য্যের নিরাকরণ বিষয়ে সাহস পুর্ব্বক হস্তক্ষেপণ করেন্ না যদ্যপি এক্ষণে অনেক ব্যক্তির মনোমধ্যে কৌলীন্য প্রথা রহিত ; বিধবাদিগের পুনরুদ্বাহদান ; এবং এক স্ত্রী বিদ্যমানে পত্ন্যন্তর পরিগ্রহ নিষেধাদি পরম মঙ্গলাকর কার্য্য সকল কর্ত্তব্য কলিয়া বোধ হইতেছে কিন্তু তাহারা কেবল লোকনিন্দাভয়ে এতদনুষ্ঠানে সাহসী হইতেছেন না সকলে যাবৎ না সাহস পুর্ব্বক ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া এই সকল বিষয় প্রচলিত করিবেন তাবত অস্মদ্দেশের দুরবস্থা সকল নির্ব্বাসিত হইতে পারিবে না ; অতএব সকলেরই হিতকর নিয়ম স্থাপনে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য ইতি।

বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা।—অন্য অন্য দেশ হইতে হিন্দুস্থান অধিকার করিতে সকল রাজার ইচ্ছা আছে। কারণ ভারতবর্ষীয়েরা ধনশালী বলিয়া লোকে বিখ্যাত আছে। ইহার উর্ব্বরা ভূমি, সুস্থকর বায়ু দেখিয়া মহামহা যোদ্ধারা লোলুপ হইয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই, বস্তুত ধনলোভ ও আধিপত্যের ইচ্ছা থাকিতে স্থির থাকা যায় না।

হিন্দুরা যে অতি প্রাচীন বংশ তাহা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে, যে দেশ অতি বৃহৎ, যেখানে জীবন ধারণ উপযোগী ভক্ষণীয় সকল দ্রব্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে, সে দেশে কেন না অগ্রেই বসতী হইবে, যাঁহারা অগ্রে এস্থানে বসতি করিয়াছিল তাঁহারা এই দেশজাত শস্যাদি ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিত সুতরাং তাহারদিগের অন্য স্থানে যাইবার কোন ইচ্ছাও হইত না।

ইহা অতি দুঃখের বিষয় যে ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিরা ইহার কোন বৃত্তান্ত লিখিয়া যান নাই দেশস্থ করিয়া যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল অলৌকিক রচনায় পরিপুর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় গ্রন্থকারেরা ইহার ইতিহাস যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়া গিয়াছেন তৎপাঠে জানা যায় যে বহুকালাবধি ভারতবর্ষ বিজাতীয় রাজগণের অধীনে আছে। প্রথমতঃ মুসলমানদিগের অধীনে ছিল, পরে ইংরাজদিগের অধীন হইয়াছে, এক্ষণে ইংরাজ এবং মুসলমানদিগের অধীনে ভারতবর্ষীয় লোকদিগের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাইতেছে। রাজনীতি অনভিজ্ঞ দুর্দান্ত মুসলমানদিগের অধীনে ধর্ম্ম কর্ম্ম স্ব ইচ্ছামতে করিবার বিষয় কি ছিল। যখন ইচ্ছা হইত তখনই আসিয়া বলপুর্ব্বক প্রজাদিগের অর্থ অপহরণ করিত। এরূপ অবস্থায় সকলেই পরিশ্রম করণে পরাঙ্মুখ ছিল শ্রমফল লাভ করিতে না পারিলে কি নিমিত্ত শ্রম করিবে সুতরাং কৃষি কার্য্যের উন্নতি ছিল না। কৃষকরা স্বামী বিরহে বহু শস্য উৎপাদক ভূমিসকল সতী

যুবতী বিধবার স্থায় রোদন করিত বিদ্যার অনালোচনা হেতু ব্যক্তিদিগের মন অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকিত। এবং তাহারা প্রজাদিগের ধর্ম্ম জানিত না সুতরাং রাজবিদ্রোহিতা করিত, এবং রাজারা সুখে রাজ্য ভোগ করিতে পারিতেন না। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে মুসলমান রাজারা রাজনীতি অনভিজ্ঞ ছিলেন, প্রজাদিগকে কিরূপ পালন করিতে হয় তাহা না জানাতে পালন স্থলে পীড়ন করিতেন, এবং এই দোষেই তাঁহাদিগের রাজ্য নষ্ট হয়। হিন্দু প্রজারা আর সহ্য করিতে না পারিয়া আপনাদিগের পরিত্রাণ নিমিত্ত ইংরাজদিগকে আহ্বান করিয়া বাঙ্গালারাজ্য অধিকার করিবার সদুপায় করিয়া দিলেন। কিন্তু ব্রিটীশ্‌ গবরণ্‌মেন্ট্‌ও বিজাতীয় পক্ষপাতশূন্য নহেন। মুসলমানদিগের অধীনে পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে পাওয়া যাইত না বলিয়া কেহ পরিশ্রম করিত না। কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা হয় তাহাও ভাল ছিল। এক্ষণে অবাধে বিদ্যার বিমলজ্যোতিতে সকলের মন উজ্জ্বল হইতেছে কিন্তু কি মনস্তাপ! যে ইংরাজদিগের সমকৃতবিদ্য হইলেও তাহারদিগের স্থায় উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক জন ইংরাজ যে কর্ম্ম করে যদি সেই কর্ম্ম একজন বাঙ্গালি নির্ব্বাহ করেন তাহা হইলেও তাহার বেতন সেই ইংরাজের স্থায় হইবে না, সমান বেতন পাওয়া দূরে থাকুক অপেক্ষাকৃত পারগ হইলেও সে পদ তাঁহার পাইবার বিষয় কি, ইহাকে কি বিজাতীয় পক্ষপাত বল না। এক্ষণে একবার আকবর বাদসাকে স্মরণ করি, তাঁহার সময়ে যোগ্যব্যক্তি হইলেই রাজ্যের গুরুতর কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে পারিত হিন্দু কি মুসলমান তাহার বিচার ছিল না। তাঁহার নিকট বিদ্যাই পূজ্য হইত, যেমন একচন্দ্র গগনমণ্ডলে উদয় হইয়া পৃথিবীর সকল অন্ধকার হরে, সেইরূপ তিনি উদয় হইয়া পূর্ব্বমত মুসলমানদিগের, রাজধর্ম্ম অনভিজ্ঞতা রূপ যে অন্ধকার ছিল, তাহা হরিয়াছিলেন দেখ ব্যবস্থাপক কৌনসলে এক্ষণে প্রজাদিগের কোন হাত না থাকাতে কত অমঙ্গলের সম্ভাবনা কোন আইন প্রচার কালে প্রজাদিগের মত গ্রহণ হয় না ইহাতে তাহারা কোন নিয়ম অকল্যাণকর জ্ঞান করিলেও স্তব্ধ থাকে পরন্তু মুসলমানদিগের প্রতি কোন দোষারোপ করা যাইতে পারে না তাহারা যে কালে রাজা ছিল সে কালে অসভ্যতাই সবল ছিল কিন্তু এইক্ষণে অসভ্যতা দূর হইয়া সভ্যতার সোপান বর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদিগের বৃটীশ গবরণমেণ্ট সভ্য বলিয়া লোকবিখ্যাত আছেন অতএব বিজাতীয় পক্ষপাত থাকিতে ঐ বিষয়ে গবরমেণ্ট সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে অবশ্যই লজ্জা পাইবেন।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র ফাইল।—
রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি:—প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা। } শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য-বার্তা

[যে জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সাধারণতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে, মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বঙ্গভাষায় নানা স্থানে প্রকাশিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, তথা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যাদিবিষয়ক সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 'সাহিত্য-বার্তা' অংশে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। এই অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার সমসাময়িক মৌলিক আলোচনার নিখুঁত ইতিবৃত্ত করিয়া তুলিবার জন্য সাহিত্যিকবর্গের সহযোগিতা ও সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা যাইতেছে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।]

সাহিত্য

প্রবন্ধ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ—বলদেব পালিত। ভারতবর্ষ, পৌষ '৪৩, পৃঃ ১১৬-২০।

উনবিংশ শতাব্দীর এই বাঙ্গালী কবির ও তাঁহার কাব্যের পরিচয়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনী গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাঙ্গালা হস্তলিখিত পুথির পরিচয়। প্রবর্ত্তক, পৌষ '৪৩, পৃঃ ৩২১-৩।

পাঁচখানি বৈষ্ণব পুথির বাহ্যিক পরিচয় আদ্যন্ত নির্দেশ।

শ্রীকামিনীকুমার রায়—পালাগানে মানুষ ও প্রকৃতি। বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ '৪৩, পৃঃ ৬৩৪-৪০।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'মৈমনসিংহগীতিকা' ও 'পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা' নামক প্রকাশিত গ্রন্থের গীতিকাগুলির মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক এবং একের উপর অন্যের প্রভাবের যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহার আভাস প্রদান।

শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়—বাংলা পদ্যসাহিত্যে হাস্যরস। ভারতবর্ষ, পৌষ '৪৩, পৃঃ ১৪০-৭।

বিজয় গুপ্ত, মাধবাচার্য্য, কবিকঙ্কণ, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ভারতচন্দ্র, এণ্টুনি ফিরিঙ্গি, গোপাল উড়ে, কৈলাস বারুই, দাশরথি রায়, ভোলা ময়রা, ঈশ্বর গুপ্ত ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক অন্য কয়েক জন কবির রচনা হইতে হাস্যরসের আংশিক নিদর্শন উদ্ধার।

ইতিহাস

গ্রন্থ

শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী—প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়-প্রকাশিত।

প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্ত্তৃক হরপ্পা, মোহেন্-জো-দড়ো প্রভৃতি স্থান খননের ফলে প্রকাশিত সভ্যতার নিদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

রামরাম বসু—রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত রামরাম বসুর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী সহ। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—৩। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলকিতা।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ।

প্রবন্ধ

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—ভারতীয় সঙ্গীত। ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক '৪৩, পৃঃ ৭১৩-৭১৬ ; ভারতীয় সঙ্গীত, অগ্রহায়ণ '৪৩, পৃঃ ৯৩৫-৭ ; ভারতীয় সঙ্গীতের যুগবিভাগ, পৌষ '৪৩, পৃঃ ৮২-৩।

ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আধুনিক কালে কৃত আলোচনার আভাস প্রদানপূর্ব্বক এইরূপ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীনতা প্রতিপাদন ও ইহার যুগচতুষ্টয় (প্রাগৈতিহাসিক যুগ, মধ্য যুগ, মুসলমান যুগ ও বর্ত্তমান যুগ) নির্দেশ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—বিক্রমপুরে প্রাপ্ত সদাশিবমূর্ত্তি। ভারতবর্ষ, পৌষ '৪৩, পৃঃ ২৫-৭।

বিক্রমপুরের আপরকাঠি গ্রামে প্রাপ্ত ও আরিয়াল গ্রামের চিত্রশালায় রক্ষিত সদাশিবমূর্ত্তির বিবরণ।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার—উত্তর-বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস। ভারতবর্ষ, পৌষ '৪৩, পৃঃ ১৩৮-৯।

উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত প্রাচীন কালের নিদর্শন—মুদ্রা ও তাম্রলিপির সংক্ষিপ্ত দিগ্‌দর্শন।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা—প্রাচীন ভারতের ব্যাধি। ভারতবর্ষ, পৌষ '৪৩, পৃঃ ১৪৯-৫০।

বৌদ্ধসাহিত্যে প্রসঙ্গতঃ যে সমস্ত পীড়া ও তাহাদের উপশমের যে ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের বিবরণ।

মোহাম্মদ কে, চাঁদ—মোসলেম জগতে দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা। মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ '৪৩, পৃঃ ৮১-৮।

পারস্য, বোগদাদ প্রভৃতি স্থানে মুসলমান নরপতিগণ-প্রতিষ্ঠিত কয়েকটী দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিবরণ।

এনামুল হক—বঙ্গে ইস্‌লাম বিস্তার। মাসিক মোহাম্মদী, কার্ত্তিক '৪৩, পৃঃ ৪৮-৫২ ; অগ্রহায়ণ '৪৩, পৃঃ ৯৯-১০৪ ; পৌষ '৪৩, পৃঃ ১৫৩-১৬০।

৮০০ হইতে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ ও ১২০০ হইতে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাণিজ্য, রাজ্যবিস্তার ও ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালায় আগত মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মপ্রচারার্থে কৃত কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ—যুধিষ্ঠিরের সময়। ভারতবর্ষ, পৌষ '৪৩, পৃঃ ১-৯।

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধবৎসর এবং পঞ্চ পাণ্ডব ও দুর্য্যোধনের জন্ম ও মৃত্যুসময় নিরূপণ।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ—(১) রাজা রামমোহন রায়ের বৈষয়িক জীবন (১৭৯৭-১৮১৪)। প্রবাসী, কার্ত্তিক '৪৩, পৃঃ ৩২-৪৩। (২) মাতা-পুত্র। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ '৪৩, পৃঃ ২৬৪-৭০। (৩) গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের দাবী। প্রবাসী, পৌষ '৪৩, পৃঃ ৩৪৭-৩৫৪।

প্রধানতঃ মোকদ্দমার কাগজপত্র অবলম্বনে রাজা রামমোহন রায়ের বৈষয়িক জীবন সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সংকলন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী—তন্ত্র ও বাঙালী। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ '৪৩, পৃঃ ২৬১-৪।
তান্ত্রিক আচার ও তান্ত্রিক সাহিত্যের সারা ভারতময় ব্যাপকতার নিদর্শন।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন—বাংলার চিত্রকলা। বিচিত্রা, কার্ত্তিক '৪৩, পৃঃ ৪৪২-৭।
বাংলার চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন—ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের মরীচিকা। মাসিক মোহাম্মদী, কার্ত্তিক '৪৩, পৃঃ ২৫-৩২।
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলিম স্থাপত্য-নিদর্শনসমূহের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা।

মণিবর্দ্ধন—প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের রূপ, রস, আদর্শ ও ভাবসম্পদ্। প্রবর্ত্তক, কার্ত্তিক '৪৩, পৃঃ ৭৪-৮।
প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন।

শ্রীঅজিত ঘোষ মজুমদার—অগস্ত্যযাত্রা। প্রবর্ত্তক, কার্ত্তিক '৪৩, পৃঃ ৮৬-৯০।
ভারতের সর্বত্র ও বৃহত্তর ভারতের নানা স্থানে অগস্ত্যের অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠার পরিচয়।

শ্রীহরিদাস মিত্র—দেবী দশভুজা। বঙ্গশ্রী, কার্ত্তিক '৪৩, পৃঃ ৫২৫-২৯।
নানা স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন মূর্ত্তি অবলম্বনে দেবী দশভুজা দুর্গার পূর্ব্বরূপ নিরূপণ।

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ—সিংহলের উৎসব কাণ্ডিনৃত্য বা 'উদারানাটুম্।' প্রবাসী, কার্ত্তিক '৪৩, পৃঃ ১০৭-১১৪।
কাণ্ডিনৃত্যের বিবরণ ও ইতিহাস আলোচনা।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী—ভারত ও মধ্য এশিয়া। বঙ্গশ্রী, কার্ত্তিক '৪৩, পৃঃ ৫৭৩-৭ ; অগ্রহায়ণ '৪৩, পৃঃ ৭২৩-৬ ; পৌষ, পৃঃ ৭৮৫-৯২।
মধ্য-এশিয়ার অন্তর্গত খোটান, নিয়া, মিরান, তুমচুক, কুচী, তরুক, অগ্নিদেশ, তুন্‌হোয়াং প্রভৃতি স্থানের পুরাবৃত্ত ও তথায় প্রাপ্ত প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন আলোচনা।

শ্রীকালীপদ ঘটক—সাঁওতাল জাতি ও তাহাদের নাচগান। মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ '৪৩, পৃঃ ২৪৩-৫০।
সাঁওতালদিগের জীবনযাত্রা ও আমোদ উৎসবের বর্ণনা প্রসঙ্গে কতকগুলি সঙ্গীতের সংগ্রহ।

শ্রীব্রজদয়াল বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীরামমোহন নাথ—নিধনপুর-তাম্রশাসন এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ ও বৈদ্যগণের পদবী। ভারতবর্ষ, পৌষ '৪৩, পৃঃ ৬৩-৯।
নিধনপুরে প্রাপ্ত ভাস্করবর্মার তাম্রশাসনে দানীয় ব্রাহ্মণগণের নামের অন্তে দত্ত, সোম, নাগ, সেন, পালিত, মিত্র প্রভৃতি পদ দৃষ্টে বাঙ্গালার কায়স্থ ও বৈদ্যগণকে নাগর ব্রাহ্মণদিগের বংশধর বলিয়া প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রচারিত মতবাদের প্রতিবাদ ও এই পদগুলি পদবীসূচক নহে—নামবাচক পদের অংশমাত্র, এইরূপ মতস্থাপন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বালির ইতিহাস। ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ '৪৩, পৃঃ

৮৯২-৬। [প্রবন্ধের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীট, বালী পোঃ, জেলা হাওড়া হইতে প্রকাশিত হইয়াছে-]।

কলিকাতার সন্নিহিত বালি নামক স্থানের প্রাচীন ইতিবৃত্তের সংক্ষিপ্ত দিগ্দর্শন।

শ্রীহরিদাস পালিত—পুদনগর, পুণ্ড্রনগর, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও পাণ্ডুনগর এবং পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো। ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ '৪৩, পৃঃ ৯৫৭-৯।

মহাস্থানের মৌর্যব্রাহ্মী লিপিতে প্রাপ্ত পুদনগর পুণ্ড্রনগরাদি নামে প্রসিদ্ধ স্থান হইতে পৃথক্, এই মত প্রতিপাদন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—হুগলী জেলার ইতিহাস। মাসিক বসুমতী, পৌষ '৪৩, পৃঃ ৪৪১-৩।

হুগলী জেলান্তর্গত বৈষ্ণবাটী নামক স্থানের পুরাবৃত্ত আলোচনা।

দর্শন

প্রবন্ধ

শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—প্রাচীন পুথি। বঙ্গশ্রী, অগ্রহায়ণ '৪৩, পৃঃ ৬৪৮-৫৩।

ষড়্দর্শনসমুচ্চয় নামক গ্রন্থের পুথির তালিকা ও বার্লিন ইউনিভারসিটির পুথির আদ্যন্ত উদ্ধার।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—শ্রীশ্রীচণ্ডীপ্রসঙ্গ। প্রবর্ত্তক, কার্ত্তিক '৪৩, পৃঃ ১১৭-৯।

দেবীশুম্ভনিশুম্ভ-সংবাদের দার্শনিক রহস্য বিশ্লেষণ।

শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ—প্রহেলিকা জগৎ। প্রবর্ত্তক, কার্ত্তিক '৪৩, পৃঃ ৯৩-৭।

মনোমিতিজ্ঞ (Psychometer) ব্যক্তিগণের অলৌকিক শক্তির নিদর্শন প্রদান প্রসঙ্গে প্রাণিমাত্রের মধ্যে জ্ঞানের ব্যাপকতা প্রতিপাদন।

শ্রীরণজিৎচন্দ্র সান্যাল—গ্রাফোলজী ও মানুষের চরিত্র। ভারতবর্ষ, পৌষ '৪৩, পৃঃ ৪০-২।

হস্তলিপিবিদ্যার বিবরণ ও ইহার ইতিহাস আলোচনা।

বিজ্ঞান

গ্রন্থ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী—প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষা। প্রকৃতি কার্য্যালয়, ৫০নং কৈলাস বোস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিভিন্ন সময়ে নিরূপিত পরিভাষা সমালোচনান্তে নির্দ্ধারিত ও প্রকৃতি পত্রিকায় কয়েক বৎসর যাবৎ সংকলক কর্ত্তৃক প্রকাশিত পরিভাষাগুলি বর্ত্তমানে উল্লিখিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—লাল পিপীলিকার জীবনেতিহাস। প্রকৃতি, ১৩। ১৬৯-১৮৪।

লাল পিপড়ার জীবনযাত্রার বিবরণ।

শ্রীসুধীরকুমার বসু—বর্ণবিভ্রম। প্রকৃতি, ১৩। ২১৭-২২১।

বর্ণের সূক্ষ্ম জ্ঞান সম্বন্ধে মানুষের অক্ষমতার কারণবিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচনাকাল

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত ব্রজবুলীসাহিত্যের ইতিহাস (A History of Brajabuli Literature, Calcutta University, 1935) গ্রন্থের ৩৮৯ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, বিশেষজ্ঞদের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির লিপিকাল ১৫২৫ খ্রীঃ অঃ। তাহার পরেই লিখিয়াছেন, ভাষা সমধিক প্রাচীন হইলেও তন্মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহাতে উহার রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষ পাদ অথবা পরবর্ত্তী শতাব্দীর প্রথম পাদ নির্দ্দেশ করিতে বাধে। এবং শেষে মন্তব্য করিয়াছেন, খুব নেকনজরে দেখিলেও বইখানাকে ১৫শ শতকের শেষার্দ্ধের পূর্ব্বে লওয়া যায় না। তাঁহার যুক্তি,—(১) সনাতন গোস্বামীর বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীতে চণ্ডীদাসের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ থাকিলেও উহা দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দান ও নৌকাখণ্ড লক্ষিত হইয়াছে, ইহা বলা সঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে গীতগোবিন্দের সহিত উল্লেখে চণ্ডীদাসও সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছিলেন, এমনটাই বুঝায়। চণ্ডীদাস নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' সংযুক্ত থাকাতেও একটু আপত্তির কারণ হইয়াছে। কেন না, জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বেই সাধারণতঃ 'শ্রী' ব্যবহৃত হয়। তাহার অন্যথা হইলেও সনাতন গোস্বামী যাঁর-তাঁর নামের আগে 'শ্রী' লিখিতে পারেন না। (২) মহাপ্রভুর প্রাচীন চরিত-গ্রন্থগুলিতে চণ্ডীদাস বা তাঁহার রচিত গ্রন্থের অনুল্লেখ। (৩) মুরারি গুপ্তের দান-লীলা ও নৌকা-লীলা, রূপ গোস্বামীর দানকেলিকৌমুদী এবং কবি কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়োক্ত দান-বিনোদের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দান ও নৌকাখণ্ডের বর্ণনাগত বৈষম্য।

(১) সনাতনের দৃষ্টিতে চণ্ডীদাস বড় ছিলেন না, কে বলিল? ঐ দান ও নৌকা-লীলাই যে কবিকে বড় করিয়াছিল। সংস্কৃত কবির সহিত ভাষা-কবির উল্লেখ দৃষ্টিকটু হইলে কৃষ্ণদাস কবিরাজই বা তাহা কেমন করিয়া করেন? এবং তাদৃশ দৃষ্টান্তও একান্ত দুর্লভ নহে।

বিদ্যাপতিশ্চণ্ডীদাসো জয়দেব-কবীশ্বরঃ।
লীলা-শুকঃ প্রেমযুক্তো রামানন্দশ্চ নন্দনঃ॥
শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রোঽহঙ্কঃ সিদ্ধঃ কৃষ্ণঃ কবীন্দ্রকঃ।
পৃথিব্যাং ধন্যধন্যাস্তে বর্ত্তন্তে সিদ্ধ-রূপিণঃ॥

(২) এখন দেখা যাউক, প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে কে কে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্যের উল্লেখ বা ইঙ্গিত করিয়াছেন।

(ক) জয়ানন্দ মহাপ্রভুর প্রাচীন চরিতকারদের অন্যতম এবং তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল (১৫৫৮-১৫৭০ খ্রীঃ অঃ) প্রামাণিকও বটে। তিনি লিখিয়াছেন,—

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥

(খ) স্পষ্টতঃ না বলিলেও বৃন্দাবনদাস তাঁহার চৈতন্যভাগবতে (১৫৫৭ অথবা ১৫৭৩ খ্রীঃ অঃ) চণ্ডীদাসের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের যেন ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ ॥
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমুকুন্দ মহাশয়।
কীর্ত্তন করেন প্রভু নৌকায় বিজয় ॥

(গ) তার পর কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের (১৫৮১ খ্রীঃ অঃ) একাধিক স্থলে গীতগোবিন্দের সহিত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের উল্লেখ করিয়াছেন।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ ॥

(ঘ) নিত্যানন্দদাস তৎপ্রণীত প্রেমবিলাসে (১৬০০ খ্রীঃ অঃ) লিখিয়াছেন,—

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলাগানে।
যে শুনে হরয়ে তার মন আর প্রাণে ॥
সন্তোষ গোবিন্দ গোকুল সবে গায় গীত।
চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলায় হরে সবার চিত ॥

সুকুমার বাবু এই চণ্ডীদাসকে নরোত্তম-শিষ্য মনে করেন। কিন্তু বিদ্যাপতির সহিত একত্র উল্লেখ থাকায় সম্ভবতঃ ইনি বড়ু চণ্ডীদাস। উদ্ধৃত বাক্যসমূহের লক্ষ্য যে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বাসনা-বর্জ্জিত হইয়া বিচার করিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। মহাপ্রভুর প্রাচীন চরিতাখ্যায়কগণের মধ্যে আর কেহ চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ করেন নাই, এই হেতুবাদে কৃষ্ণদাসের উক্তি অগ্রাহ্য হইবে, এ কেমন যুক্তি? একই বিষয় বা ঘটনার বর্ণনা যে সকলকেই করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

(ঙ) মুরারি গুপ্তের চৈতন্যচরিতামৃতে দান-লীলা ও নৌকা-লীলা যথাক্রমে গোবর্দ্ধন-সান্নিধ্যে এবং মানস গঙ্গায় সংঘটিত হয়। দানকেলিকৌমুদীর দান-লীলাও গোবর্দ্ধনপার্শ্বে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দান-লীলা মথুরার পথে বা অন্যত্র এবং নৌকা-লীলা যমুনায় সম্পন্ন হয়। এই অনৈক্য দেখিয়া সুকুমার বাবু বলিতে চান, সনাতন গোস্বামীর উদ্দিষ্ট চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকার হইলে রূপ গোস্বামী দান-লীলা কখনই অপরত্র ঘটাইতেন না। উত্তরে বলা যাইতে পারে, লীলাদ্বয় বর্ণনা ইতিহাস পর্য্যায়ের নহে। প্রাচীন পুরাণ, এমন কি, ইতিহাসের মধ্যেও ত যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। আর রূপ গোস্বামী তাঁহার পদ্যাবলীতে যমুনায় নৌকা-বিলাসের

কাজেই নৌকা-লীলা যমুনায় হয় না। অধুনা বৃন্দাবন ও মথুরা যমুনার এক তীরেই বটে ; কিন্তু সে কালে বৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যে যমুনা প্রবাহিত হইত। [এ বিষয়ে ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ৺নন্দলাল দে বিরচিত ভারতের প্রাচীন ভৌগোলিক অভিধানাদি দ্রষ্টব্য।]

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচনা-কাল সম্বন্ধে সুকুমার বাবুর যুক্তি-পরম্পরা অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিতে হয়।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

শাহ মোহাম্মদ সগীর*

(পঞ্চদশ শতাব্দী)

প্রাচীনতম মুসলমান কবিদিগের মধ্যে শাহ মোহাম্মদ সগীর অন্যতম। তদ্রচিত "য়ুসুফ জোলেখা" নামক একখানি চমৎকার কাব্যগ্রন্থই তাঁহাকে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। এই গ্রন্থের ১০৯৪ মঘী অর্থাৎ (১০৯৪ + ৬৩৮) ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের একখানি প্রতিলিপি এবং পরবর্ত্তী আরও কয়েকখানি প্রতিলিপি আমাদের নিকট সংগৃহীত আছে।

ইহা একখানি বিরাট্ গ্রন্থ। প্রাচীন কালে খুব বেশীসংখ্যক কবি এত বড় বিরাট্ কাব্য রচনা করেন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত বড় বিরাট্ গ্রন্থে কবি তাঁহার কোন পরিচয় দেওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই; এমন কি, সমগ্র কাব্যে মাত্র কয়েকটি ভণিতার ব্যবহার করিয়াছেন। আবশ্যক ভণিতাগুলি এইরূপ,—

১

"কহে সাহা মোহাম্মদ ইছুফ জলিখা পদ
দেসি ভাসা পয়ার রচিত।"

২

"ইছুফ জলিখা কিচ্ছা কিতাব প্রমাণ।
দেসি ভাসে মোহাম্মদ ছগিরিএ ভাণ।"

৩

"মোহাম্মদ ছগিরি দাসের দাস তান।
তাহা হোন্তে বড় ভাগ্য মোর নাহি আন।"

এই ভণিতাগুলি পাঠ করিলে দেখা যায়, কবির প্রকৃত নাম "শাহ মোহাম্মদ সগীর।" কবি সম্বন্ধে ইত্যধিক আর কোন সংবাদ জানিবার উপায় নাই। তবে তাঁহার "শাহ" উপাধি দেখিলে মনে হয়, তিনি কোন সাধকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"য়ুসুফ জোলেখা" কাব্যের ভাষা খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে (১৪৮০ খ্রীঃ) রচিত "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের" মধ্যবর্ত্তী ভাষা। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" ও তৎপরবর্ত্তী "পরাগলী মহাভারতের" ভাষায় কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। অথচ "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" এবং "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে"র ভাষায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" ও "য়ুসুফ জোলেখা"র ভাষায়ও প্রভেদ বিস্তর; কিন্তু "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" ও "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের" ভাষায় যত প্রভেদ, তত নহে। অপিচ "য়ুসুফ জোলেখা"র ভাষা অনেক বিষয়ে "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" ও "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের" ভাষার মধ্যবর্ত্তী হারানো সূত্রকে ধরাইয়া দেয়।

এ সকল বাদানুবাদ না করিয়া, আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, কবি শাহ মোহাম্মদ সগীরের ভাষা, কবি জৈনুদ্দিন বা তৎসমসাময়িক মালাধর বসুর ভাষা হইতে প্রাচীন। এই প্রাচীনত্বের দাবীর প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য,—

১। কবি সগীরের ভাষার যে সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা প্রাকৃত-ভাবাপন্ন শব্দের বহুল প্রয়োগ। যথা,—

"তোহ্মা জথ সখি আছে নৌআলি জৌবন।
তাসব পাঠাই দেঅ জাউ বৃন্দাবন॥
ইছুফকে বোলহ জাউক নিধুবনে।
তুলিয়া আনৌক পুষ্প তোহ্মার কারণে॥

আমাত্যা কুমারি জথ রূপে কামাতুর।
দাস বেস করি জাউ বৃন্দাবনপুর॥
অথেক নাগরিপনা কামাকুল রূপে।
ইছুফ ভোলাউ গিয়া যুরূতি আলাপে॥"

"হেন মত ইছুফ জলিখা নিবাসন্ত।
জলিখার কি ভাব ইছুফে ন জানন্ত॥
ইছুফে জানন্ত মোখে গৌরব করন্ত।
বহুল আদর করে এহি অনুবন্ধ॥"

আলোচ্য কাব্যে ব্যবহৃত প্রাচীন ভাবাপন্ন কতকগুলি শব্দের নমুনা দিলাম।— নৌআলি জৌবন (নব যৌবন); গারুরি (বিষবৈদ্য); হাকলি-বিকলি (অস্থিরতা, চাঞ্চল্য); উন্নারি (দালান, পুরী); ওসমিস (মেলামেশা, সদ্ভাব); আওরে (আড়ালে); আওর (এবং); খেরি (ক্রীড়া); কটোরা (বাটি বা পাত্র); ডাকোয়াল (আহ্বানকারী, ঘোষণাকারী); অন্ধক (আঁধা লোক); লড়ি (লাঠি); অথান্তর (অবস্থান্তর); উশ্চা, উশ্ছা (উৎসাহ); গরুয়া, গুরুয়া (গুরু বা ভারী); উপস্কার কৈলা (মুছাইয়া দিলেন); উজাগর (ভোর, কাটাইয়া দেওয়া); ঝামর বদন (রুক্ষ-শুষ্ক); দির্ঘল (দীর্ঘ); মউলিত (মুকুলিত); বিখোলিত (স্খলিত); উফর-ফাফর (হতভম্ব, হতবুদ্ধি); উঝর (উজ্জ্বল); অকুমারি (কুমারী); বালি (বালিকা); বৃন্দাবন (বাগান, উদ্যান); ঘাটিল (ক্ষয় হইল); আবহো (এবেও); পিউ (প্রিয়া); জিউ (জীবন); সাচা (সত্য); কভো (কবু); খাঁখাঁর (কলঙ্ক); পুত্রবাচ (পুত্রসম জ্ঞান করা); কমন (কেমন); আউল-বাউল (পাগলের ন্যায় উষ্কু-শুষ্কু অবস্থা); উভা (দাঁড়াইয়া থাকা); ভাগ (ভাগ্য); সাখি (সাক্ষী বা সাক্ষ্য) ইত্যাদি ইত্যাদি।

সম্ভবতঃ বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষা বা প্রাকৃত ভাষার প্রভাবে কাব্যের প্রায় সর্ব্বত্র "ষ" বর্ণ নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে "খ" বর্ণে পরিণত হইয়াছে,—বিখ, নিমেখ, ঔখদ, পেখিলুঁ, বিখধারা, বরিখ, বরিখেক, পুরুখ। (দিঠ, তছুপরে, জনি, দেহ্লা, নেহা, ছোহন প্রভৃতি শব্দও দ্রষ্টব্য)।

২। "য়ূসুফ জোলেখা" কাব্যের ব্যাকরণ এই কাব্যের প্রাচীনত্ব দাবীর পক্ষে একটি

"শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" হইতে একটু পৃথক্, তৎস্থলে ইহা "কৃষ্ণকীর্ত্তন" ও তৎপরবর্ত্তী যুগের মাঝামাঝি কালের রূপ বলিয়া অনুমান করা যায়। এই স্থলে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল,—

সন্ধি :—মনরঙ্গ, মনুদাস, কামতুর, করঘাত, বুন্দেক (বিন্দু+এক) প্রভৃতি।

কর্ম্মকারকে :—রাজাক, নৃপতিক, দূতক, ভাইক প্রভৃতি সর্ব্বত্র সমানভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।

সর্ব্বনাম,—উত্তম পুরুষ :—আহ্মি, মুঞি, মোহোর, আহ্মাসব, আহ্মাক, আহ্মারে প্রভৃতি।

মধ্যম পুরুষ :—তুহ্মি, তোহ্মার, তুহ্মিসব, তোহ্মাক ইত্যাদি।

নামপুরুষে :—সে, সেহি, তাক, এহি, তান, কেহো, কোহ্ন, কোন।

ক্রিয়াপদ, বর্ত্তমান কাল,—

প্রথম পুরুষ :—(ক) প্রায় এক তৃতীয়াংশ শব্দের—

থাকোঁ, দেখোঁ, করোঁ, মাগোঁ, লাগোঁ প্রভৃতি রূপ।

(খ) প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শব্দের—

থাকো, ফিরো, করো প্রভৃতি রূপ।

নাম পুরুষে :—(ক) প্রায় এক তৃতীয়াংশ শব্দের—

কহন্তি, বোলন্তি, ধাবন্তি, জোগায়ন্তি প্রভৃতি রূপ।

(খ) প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শব্দের—

নেহালন্ত, বাখানন্ত, জানন্ত, চাহন্ত প্রভৃতি রূপ।

(গ) আবার কোথাও কোথাও—

ধাবএ, রবএ, আছএ, পারিএ প্রভৃতি রূপ।

অনুজ্ঞা :—কৈয়ার (তুলঃ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন "কহিআর" অর্থ—কহ)

"পুন তুহ্মি কৈয়ার বচন। মূর্চ্ছিত হইলা কি কারণ॥"

দিয়ার (তুলঃ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন "দিআর" অর্থ—দাও)

"দিয়ার আপনা নাম, বাস তুহ্মি কোন গ্রাম।"

নাম পুরুষের অনুজ্ঞা :—

আছউক, জাউ, জাউক, আনৌক, ভোলাউ, দেখৌ, জানউ, আছউ, বোলাউ প্রভৃতি রূপ।

অতীত কালের উত্তম পুরুষের তিন প্রকার রূপ, যথা—

(১) দিলুঁ, সমর্পিলুঁ, কহিলুঁ প্রভৃতি। (অল্পসংখ্যায়)

(২) দিলুম, কহিলুম, জানিলুম প্রভৃতি। (অত্যল্পসংখ্যায়)

(৩) দিলু, কহিলু, জানিলু প্রভৃতি। (অধিকসংখ্যায়)

অতীত কালের নাম পুরুষের এক ও বহুবচনে—ভেটিলেন্ত, করিলেন্ত, দিলেন্ত প্রভৃতি রূপ।

কবি সগীর শুধু কাব্যের খাতিরে এই কাব্য রচনা করেন নাই। ইহার রচনার পশ্চাতে

ধর্ম্ম-কাহিনীর প্রচার-প্রেরণা কিছুই অস্বাভাবিক নহে। বাঙ্গালা ভাষাভাষী মুসলমানদিগকে "দেসিভাষা"র সাহায্যে মুসলিম্ উপাখ্যান শুনান তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও কবি যে কাহিনী আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, তাহাকে অনায়াসেই রসাশ্রয়ী ধর্ম্ম-কাহিনী বলা যায়। এই বিষয় কবি অজ্ঞাত নহেন; তাঁহার কাহিনীর এই দুইটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি বেশ সচেতন। তাই দেখিতে পাই, কাব্যের প্রারম্ভে ভূমিকায় কবি আমাদিগকে জানাইতেছেন,—

"কহিব কিতাব চাহি সুধারসপুরি।
শুনহ ভকত জন শ্রুতিঘট ভরি॥"

এই স্থলে ভক্তজনকে কবির সুধারসপূর্ণ কাহিনী শুনাইবার প্রস্তাব লক্ষণীয়। বলিতে কি, তিনি সত্যই আমাদিগকে এক অপূর্ব্ব সুধারসপূর্ণ কাহিনী শুনাইয়াছেন। আর একটিবার কাব্যের শেষে এই কথাও জানাইয়া দিয়াছেন,—

"পোথার বৃত্তান্ত জেবা চিত্ত দিয়া শুনে।
তাক কৃপা করে বহু প্রভু নিরঞ্জনে॥
ইছুফ জলিখা জেবা মন দিয়া বুঝে।
আদি আন্ত শুনিলে সে ভাব হএ মনে॥
... ...
একচিত্তে বুঝে জে এই সব পরস্তাব।
পুণ্য বাড়ে দুক্ষ হরে যসকৃতি লাব॥"

কবি যাহাই বলুন, অধুনা কেহ এই বিরাট্ কাব্য পড়িয়া পুণ্য বাড়াইবার, দুঃখ হরণ করিবার বা যশকীর্ত্তি লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন কি না, জানি না; তবে এই কথা সত্য যে, পাঠক এখনও এই কাব্য পাঠ করিয়া ইহার "সুধারসে শ্রুতিঘট" ভরিতে পারিবেন। প্রধানতঃ এই ভরসায় আমরা কবি-বর্ণিত কাহিনীটুকুর যথাসম্ভব সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া নিম্নে বর্ণনা করিলাম।

তৈমুস নামক কোন নরপতির কন্যা জোলেখা এক অপূর্ব্ব সুন্দরী রাজকুমারী ছিলেন। তাঁহার অপরূপ লাবণ্যে সুর-নর মুগ্ধ ও বিস্মিত হইত। নিঃসন্তান রাজদম্পতি বহু দান-ধর্ম্ম ও আরাধনা করিয়া জোলেখা সুন্দরীকে লাভ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে রাজকুমারী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে, তাঁহার হৃদয়ে প্রেমভাবের সঞ্চার হয়। এই সময়ে তিনি বৎসরে এক এক বার করিয়া তিন বার তাৎকালিক মিসরাধিপতি যুবকরাজ আজিজ-মিসিরকে স্বপ্নে দেখেন। এই স্বপ্নের পর জোলেখার অবস্থা যাহা হইল, তাহা তিনি স্বয়ং সংক্ষেপে সখীর নিকট বর্ণনা করিতেছেন,—

"প্রথম বরিখ সপ্ন দেখাইলা ছল।
বুদ্ধি শুদ্ধি প্রাণ মোর হরি নিল বল॥
দ্বিতিয় সপন দেখি জুক্তি হরি নিল।
ইঙ্গিত আকার মুক্তি এক ন জানিল॥

তৃতীয় স্বপ্নের পর প্রেমোন্মাদিনী জোলেখা শান্তভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার ইঙ্গিত মত চতুর্দ্দিকে সংবাদ প্রেরিত হইল যে, তিনি স্বয়ম্বরা হইবেন। এই সংবাদে নানা দিগ্দেশ হইতে দূতগণ বিবাহের "পয়গাম" (প্রস্তাব) লইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। জোলেখা একে একে সকলকে বিদায় দিলেন এবং স্বপ্নদৃষ্ট আজিজ-মিসিরের দূত আসিয়া না পৌঁছায় নিতান্তই চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। নরপতি তৈমূস যথাসময়ে আজিজ মিসিরের নিকট দূত পাঠাইয়া স্বীয় কন্যার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাত করাইলেন, এবং নিজেই সাধিয়া জোলেখার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। আজিজ-মিসির সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে গোলযোগ বাধিবার ভয়ে বিবাহের জন্য তৈমূস রাজার রাজ্যে গমন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া সংবাদ দিলেন। অধিকন্তু তিনি স্বীয় দূতের দ্বারা তৈমূস-রাজের নিকট অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন দয়া করিয়া জোলেখাকে মিসরে বিবাহের জন্য প্রেরণ করেন। তৈমূস অগত্যা এই অনুরোধ রক্ষা করিলেন।

যথাসময়ে রাজা তৈমূস স্বীয় কন্যা জোলেখাকে মিসরে মহাসমারোহে বিবাহের জন্য প্রেরণ করিলেন। জোলেখা মিসরে উপস্থিত হইলে, আজিজ-মিসির ভাবী পত্নীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মহাধুমধামে অগ্রসর হইলেন। যথোচিত অভ্যর্থনা করা হইলে উভয় দল রাজধানী অভিমুখে চলিল। এই সময়ে প্রেমাতুরা জোলেখা স্বীয় হস্তিপৃষ্ঠ হইতে জনতা-বেষ্টিত আজিজ-মিসিরকে দেখিবার জন্য স্বীয় বৃদ্ধা ধাত্রীর নিকট নিবেদন করেন। ধাত্রী হস্তিপৃষ্ঠের 'কনক-রচিত আম্বারী' কাটিয়া একটি সুন্দর গবাক্ষ প্রস্তুত করিলেন এবং বলিলেন,—

"এহি গবাক্ষের পন্থে দেখ পরতেক।
জেন মত আজিজের কান্তি রূপ রেখ॥
সেই রন্ধ্রপন্থ দিআ কৈল নিরক্ষণ।
মুর্চ্ছিত পরিল দেখি হই অচেতন॥"

জোলেখা চেতনা হারাইয়া বহু ক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। ধাত্রী তাঁহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, কিছুতেই তাঁহার চৈতন্য হইল না দেখিয়া,—

"সখিগণে পুষ্পজল সিঞ্চে ধাত্রি সঙ্গে।
বিচিত্র চামরে বাও করে কন্যা অঙ্গে॥"

কিয়ৎক্ষণ পর জোলেখা সংজ্ঞা লাভ করিলে,—

"ধাত্রি আদি সখিগণে পুছিলেন্ত বাত।
কেহ্নে হেন গতি কন্যা কহত আক্ষাত॥"

এইরূপে সখীগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রেমাকুলা জোলেখা যে উত্তর দিলেন, তাহা বড়ই করুণ, বড়ই মর্ম্মদাহী। সখীদের প্রশ্নে তাঁহার হৃদয়ের যাবতীয় অবরুদ্ধ ব্যথা গুমরিয়া উঠিল, প্রেমবঞ্চিত ভরা-যৌবনের যাবতীয় স্মৃতি একে একে তাঁহার দগ্ধ মর্ম্মপটে উজ্জ্বল হইয়া ভাসিয়া উঠিল; তিনি ভূগর্ভস্থ অগ্ন্যুদ্গারী আগ্নেয় গিরির ন্যায় হৃদয়ের যাবতীয় সঞ্চিত বেদনা একটির পর

রাগ কোরা—লঘিকা ছন্দ।

(লাচারি)

শুন শুন সখি,
আর তরে হইলুঁ দুখি,
প্রাণের সখি ল!
প্রথম সপ্নেত দেখি হৃদয় অন্তরে কামহতা।
এ তিন বরিখ ধরি,
রজনি বসিআ ঝুরি
প্রাণের সখি ল!
বিরহ আনলে পুরি কাহাত কহিমু এহি কথা? ধ্রু॥

মোর হেন বিপরিত কাজ,
কলঙ্কিনি জোবন সমাজ,
সে জন ন হএ এহি,
সপ্নেত দেখিলুঁ জেহি,
প্রাণের সখি ল!
মোর তরে গেল কহি, সেই মোর পরমার্থ বাণি।
দোসর সপ্নের কথা,
কহিতে মরম বেথা,
প্রাণের সখি ল!
কহিল সে মোকে কথা,
ব্যাকুল হইলুঁ তথা, শুনিতে হইলুঁ বুদ্ধি হানি॥

চঞ্চল হইল মতি,
চপল হৃদএ গতি,
প্রাণের সখি ল!
প্রমাদ হইল অতি কথা পাইমু তাহান উদ্দেস।
ত্রিতিয় সপ্নেত দেখি,
আকলে ধরিলুঁ পেখি,
প্রাণের সখি ল!
প্রতক্ষে দেখিলুঁ আখি চিন্তিতে হইল তনু সেস॥
মুঞি নারি কামরতা,
বিধি মোর বিড়ম্বিতা,
প্রাণের সখি ল!
আপনা রাখিমু কথা, পাসানে চাপিল কর মোর।
বিষম হইল কাজ,
যাইমু কমন রাজ,
প্রাণের সখি ল!
কহিতে আপনা কাজ, ভাবিতে হইল মন ভোর॥
কহিমু কেমন বুদ্ধি,
কেবা জানে তার শুদ্ধি,
প্রাণের সখি ল!
কথা পাইমু গুণনিধি, কে মোর করিব প্রতিকার।
কহে মোহাম্মদ সার,
বিরহ সমুদ্র পার,
প্রাণের সখি ল!
করহ উদ্দেস তার, পির বিনে মনে নাহি আর॥

জোলেখা নীরব হইলেন। তাঁহার আবেগময় বিলাপে সকলের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব কারুণ্যের ভাব উদিত হইল। "আম্বারী"মধ্যস্থ আনন্দকোলাহল মুহূর্ত্তের মধ্যে থামিয়া গেল। জোলেখা সুন্দরী সহসা অন্তরীক্ষ হইতে এক "আকাশবাণী" শুনিতে পাইলেন,—

উঠ উঠ আএ কন্যা তাপিত হৃদএ।
তোহ্মার মনের বাঞ্ছা পুরিব নিশ্চএ॥
আজিজ মিশ্বির তার নহে মনস্কাম।
শুকভোগ তার সঙ্গে হইবেক বাম॥
আজিজ মিশ্বির তোর পতি মাত্র লেখা।
তার জোগে হৈব তোর প্রভু সনে দেখা॥

জেবা তুহ্মি ভিত কর সঙ্গম তাহার।
সুখ ভোগ তার সঙ্গে ন হৈব শৃঙ্গার॥

রত্তন মন্দির তোর বজ্রের কপাট।
তার জুক্ত নহে মুক্ত করিতে সে বাট॥

এইরূপ আকাশবাণী শুনিয়া, তাঁহার ভগ্ন হৃদয়ের কোণে অলক্ষিতে একটি ক্ষীণ আশার বিদ্যুৎ-রেখা খেলিয়া গেল। যত যুগ যুগান্তের পরেই হউক, একদিন বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলিত হইবেন, এই আশ্বাসে তাঁহার প্রাণ চকিতে এক অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার এই মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইল, "মৃত্যু-কায়া হোস্তে জেন আইল নিশ্বাস"। মিছিল পূর্ব্ববৎ মহাসমারোহে চলিতেছিল। যথাসময়ে জোলেখা রাজপুরীতে উপস্থিত হইলেন।

রাজপুরীতে বিবাহের যথাবিধি আয়োজন হইয়াছিল। উভয়ে রাজপুরীতে পৌছিলে বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। বিবাহান্তে যথারীতি "পুষ্পশয্যার" ব্যবস্থা হইল। কিন্তু হায়, বিধাতার বিধান এমনই যে,—"কন্যা সঙ্গে রাজার নাহি ওসুমিসু"। কেন না, সুপুরুষ আজিজ-মিসির জোলেখার নিকটবর্ত্তী হইলেই রতিরসহীন হইয়া কাল যাপন করেন। ইহাতে জোলেখা আনন্দিতা হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রেমাতুর হৃদয় উদ্দিষ্ট বাঞ্ছিতের বিরহে নিয়ত দগ্ধ হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি কি ভাবে স্বামিরূপী শত্রুর পুরীতে বাস করিতেছিলেন, তাহার প্রতি শুধু মানস নয়নে, কল্পনার নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে পারা যায়। এই সময়ে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ-সামগ্রী এবং বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থাকা সত্ত্বেও তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি লাভ করেন নাই। দাবানলসদৃশ বিরহ নিয়তই তাঁহার হৃদয়ে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। বাঞ্ছিতের সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহার প্রাণ পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় সতত চঞ্চল অবস্থায় কাল যাপন করিতেছিল। এই বিশাল রাজপুরীতে সর্ব্বদা সহস্র সহস্র দাসদাসী-পরিবৃত হইয়া থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার অন্তরের বেদনা, মর্ম্মের দাহ, হৃদয়ের পীড়া নিবেদন করিবার স্থান ছিল না। তাই বাধ্য হইয়াই তিনি—

"গগনে তারক দেখি চাহে একমন।
তার সঙ্গে কাহিনি কহএ সর্ব্বক্ষণ॥

তুহ্মিসব ভ্রমিতে আছহ রাত্র দিন।
তোহ্মা অবিদিত নাহি ভোবন এ তিন॥

দুক্ষের কাহিনি কহি গোঞাএ রজনি।
বিসেস তাপিত মন বিরহ আগুনি॥

চান্দ জেল মলিন বিরল তারাগণ।
অরুণ ওদএ হৈলে হএ আনমন॥

প্রভাতে পাখালে মুখ নয়নের জলে।
ক্লান্দিত বদন তান প্রতি উসাকালে॥

এইরূপে নীরবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জোলেখা সুন্দরী দিন কাটাইতে লাগিলেন। দিনের

মানিল না। তাঁহার বাঞ্ছিত প্রিয়ের কোন উদ্দেশ তিনি লাভ করিলেন না। তাঁহার এই বিরহ-বিধুর চিত্র কবি মোহাম্মদ সগীর "বারমাসীতে" অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন।

এ দিকে জোলেখা সুন্দরী এইরূপ মর্ম্মদাহী বিরহানলে জ্বলিতে জ্বলিতে অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় শুদ্ধ এবং ধীরে ধীরে বাঞ্ছিত প্রিয়তমের প্রেমে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। আর ঐ দিকে তাঁহার প্রিয়তম য়ুসুফও জোলেখার সহিত বিধি-নির্ব্বন্ধ মিলনের জন্য নানা ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়া নানা জীবন-বিপর্য্যয় অবলম্বনে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছিলেন। য়ুসুফের কবি-বর্ণিত জীবন-সূত্র ধরিয়া এইবার আমরা এ দিকে দৃষ্টিপাত করিব।

কেনান দেশে এয়াকুব নবীর আবির্ভাব হয়। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে একে একে দশ জন বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করে। য়ুসুফ তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত একাদশ পুত্র। কালক্রমে ইবন্ন আমীন নামে য়ুসুফের আরও এক ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। য়ুসুফ অনন্ত রূপ লইয়া জন্মিয়াছিলেন এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়া পিতা তাঁহাকে নিতান্তই আদর করিতেন; এই জন্য য়ুসুফের দশ ভ্রাতা তাঁহাকে অত্যন্ত হিংসা করিতেন। এই সময়ে—

"এক রাত্রি ইছুপ আপনা বাসঘর।
অচেতন হই নিদ্রা জাএ ঘোরতর ॥
সয্যাশুখে অলক্ষিতে দেখিলা সপন।
হেন অপরূপ নাহি দেখে কোন জন ॥
একাদশ নৈক্ষত্র আওরে রবি সসি।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভুমিতলে পসি ॥
চৈতন্য পাইআ সপ্ন বাপেত কহিলা।
সপ্নের বৃত্তান্ত জথ সকল জানাইলা ॥

এয়াকুব নবী কাহাকেও স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানাইতে য়ুসুফকে নিষেধ করিলেন। বিশেষতঃ তিনি য়ুসুফকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, যেন তাঁহার দশ ভ্রাতা এই সমস্ত বিষয়ের কিছুই জানিতে না পারে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, য়ুসুফ তাঁহার পর "নবী" হইবেন এবং তাঁহার বর্ত্তমান দশ ও ভাবী এক, এই একাদশ ভ্রাতা কালক্রমে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিবে।

কিন্তু ভাগ্যচক্র এমনই যে, এই স্বপ্নের কথা য়ুসুফের ভ্রাতৃগণের অগোচর রহিল না। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের ভ্রাতার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। সুতরাং তাঁহারা য়ুসুফকে পিতৃসন্নিধান হইতে সরাইয়া বধ করিয়া ফেলিতে ষড়্‌যন্ত্র করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, এইরূপেই নিষ্কণ্টক হইলে তাঁহারা পিতৃস্নেহের পূর্ণ অধিকারী হইবেন। পরামর্শের পর স্থির হইল, য়ুসুফকে মৃগয়ার ছলে বনে নিয়া হত্যা করা হইবে এবং পিতার নিকট তাঁহাকে বাঘে খাইবার কথা প্রচার করিয়া ভ্রাতৃহত্যার দায় হইতে নিস্তার লাভ করা হইবে।

যথাযুক্তি কাজ করা হইল। কপট মমতায় এয়াকুব নবীকে ভুলাইয়া, বালক য়ুসুফকে

আরম্ভ করিল। সরলপ্রাণ বালক য়ুসুফের এই নিঃসহায় অবস্থা বড়ই করুণ, বড়ই হৃদয়-বিদারক। এই করুণ দৃশ্য দেখিলে মানুষের কথা দূরে থাকুক, পাষাণের হৃদয়ও গলিয়া যায়। এই দৃশ্য অঙ্কন করিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন,—

"কোহ ভাই করঘাত অঙ্গেত মারিল।
কেহো দুষ্ট বাণি বুলি কর্ণ মোচরিল॥
কেহো মারিলেন্ত ঠেলা মারিআ চাপর।
একে একে কাড়ি লৈল গাএর কাপর॥
কেহো ভাই ক্রোদ্ধ হই মারে অনুরাগে।
আর ভাই নিকটে জায়ন্ত দয়াভাগে॥
সেহো ভাই ঠেলা দিয়া পেলে এক পাস।
আর ভাইকাছে গেল হইয়া হতাস॥
সেহো ভাই নিদয়া হৃদএ হৈআ মারে।
আর ভাই নিকটে জায়ন্ত বস্ত্র আড়ে॥
কোহ ভাই মায়া নাই সবে মারে বেড়ি।
কান্দিতে লাগিলা তবে বাপ অনুস্বরি॥"

এইরূপ নির্ম্মমভাবে মারিতে মারিতে হঠাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি সকলকে বলিলেন যে, আর এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে না মারিয়া, য়ুসুফকে এক অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হউক। রক্তাক্তকলেবর য়ুসুফকে সত্য সত্যই এক অন্ধকূপে নিক্ষেপ করা হইল এবং তাঁহার শোণিত-সিক্ত বস্ত্র লইয়া আসিয়া এয়াকুব নবীকে বুঝান হইল যে, য়ুসুফকে বাঘে খাইয়াছে। কিন্তু এয়াকুব নবীর হৃদয় প্রবোধ মানিল না। তিনি প্রিয়তম পুত্রের নিধন-সংবাদে শোকে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং শোকাকুল হইয়া তিনি খেদ করিতে লাগিলেন,—

"মোর কর্ম্ম দোস, বিধি কৈল রোস,
কোন পাপ মোর বাধা।
জাই ভিন্ন দেস, ব্রহ্মচারি ভেস,
পুরিতে মনের সাধা॥
ঘরে ঘরে জাই, পুত্র যথা পাই,
পুত্র হেন ভিক্ষা মাগোঁ।
কোন ধর্ম্ম সিক্ষা, পুত্র দিব ভিক্ষা,
তান পদগত লাগোঁ॥"

কিছুতেই কিছু হইল না; এয়াকুব নবী পুত্রের কোন সংবাদ না পাইয়া বিষাদে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু বারংবার তাঁহার মনে হইত যে, তাঁহার প্রাণপ্রিয় য়ুসুফ যেন বাঁচিয়া আছেন। য়ুসুফ সত্য সত্যই কূপে পড়িয়াও জীবিত ছিলেন।

য়ুসুফকে কূপে নিক্ষেপ করার পরেই "মনিরু" নামক এক মিসরদেশীয় বণিকের নেতৃত্বে একদল বণিক্ ঐ বনপথে চলিতে চলিতে কূপ-সন্নিহিত কোন এক স্থানে বিশ্রাম করিতেছিল। এই সময়ে তাহাদের জলাভাব ঘটে। তাহারা জলের অন্বেষণে বাহির হইয়া, নিকটেই কূপ দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং জলের জন্য দড়ি বাঁধিয়া কূপে "কুম্ভ" ফেলিয়া দিল। য়ুসুফ নীরবে কুম্ভে উঠিয়া বসিলেন। "সাধুগণ" তাঁহাকে পাইয়া মনিরুর নিকট লইয়া গেল। সাধু মনিরু এই অপরূপ বালকটিকে লাভ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন এবং বাণিজ্যযাত্রা বন্ধ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ঠিক এই সময়ে য়ুসুফের দশ ভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বণিক্‌দলে য়ুসুফকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং মনিরুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—"আমরা আমাদের দুষ্ট দাসকে কূপে ফেলিয়া দিয়া মারিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম, তোমরা যখন তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যাইতেছ, তখন হয় তাহার মূল্য দাও, নয় তাহাকে ফেরৎ দাও।" ইহাতে—

"সাধু বোলে মোর ঠাক্রি ধন নাহি আর।
তামার ঢেপুয়া লও এই মূল্য তার।"

মনিরু সাধু "তামার ঢেপুয়া" দিয়া য়ুসুফকে কিনিয়া লইলেন এবং যথাসময়ে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মিসর দেশে পৌছিলেন। যেখানেই য়ুসুফকে লইয়া যাওয়া হইত, সেইখানেই তাঁহার অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দেখিবার জন্য নানা স্থান হইত লোকজন ছুটিয়া আসিত। অচিরকাল মধ্যে য়ুসুফের সৌন্দর্য্যের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। মিসররাজ আজিজ-মিসির য়ুসুফের কথা জানিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে রাজপুরীতে লইয়া আসিতে সাধুর নিকট খবর দিলেন।

রাজাজ্ঞায় সাধু য়ুসুফকে লইয়া রাজপুরীতে উপস্থিত হইলেন। সকলে য়ুসুফকে দেখিবার জন্য সমাগত হইল এবং সকলেই তাঁহাকে ক্রয় করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিল। সাধু সুযোগ বুঝিয়া প্রচার করিলেন যে, য়ুসুফের শরীরের সমভার মহামূল্য সামগ্রীই এই ক্রীতদাসের মূল্য। এতৎসত্ত্বেও তাঁহাকে ক্রয় করিবার চেষ্টা চলিল। কিন্তু কেহই সফলকাম হইতেছিল না।

এই সময়ে জোলেখা তাঁহার প্রাত্যহিক নগর-ভ্রমণ হইতে উষ্ট্রারোহণে প্রত্যাবৃত্তা হইতেছিলেন। তিনি "গড়ের" অর্থাৎ রাজ-প্রাসাদের বহিঃপ্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জনকোলাহল শুনিয়া সমস্ত বিষয় জানিতে পারিলেন এবং ক্রীতদাসকে স্বয়ং একবার দেখিবার জন্য সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। য়ুসুফ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র তাঁহাকে অবিকল স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিবৎ প্রতীয়মান হওয়ায়, জোলেখা ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি সর্ব্বস্বের বিনিময়েও য়ুসুফকে ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইলেন।

অতঃপর জোলেখা ও আজিজ-মিসির য়ুসুফকে ক্রয় করেন। এই সময়ে রাজানুগ্রহে রাজপুত্রবৎ সুখ শান্তিতে য়ুসুফ রাজপুরীতে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। এই সময়ে জোলেখা উদ্ভিন্ন-যৌবনা যুবতীসুলভ নানা রঙ্গ-রস ও হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়া দেব-চরিত্র য়ুসুফকে কামভাবে তৎপ্রতি প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু য়ুসুফ—

"জলিখার মনবাঞ্ছা দেখৌ সমদৃষ্টে।
ইছুকে হেরএ হেট মাথা পদপিষ্টে॥"

যুসুফের এহেন ঔদাসীন্য নিরীক্ষণ করিয়া সুন্দরী জোলেখা স্বীয় বৃদ্ধা ধাত্রীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন; তিনি সবিস্তারে জোলেখার যাবতীয় বৃত্তান্ত তাঁহার পদে নিবেদন করেন। যুসুফ কিছুতেই স্বীয় পুণ্যপথ হইতে টলিলেন না, কিছুতেই দেব-চরিত্র হইতে ভ্রষ্ট হইলেন না। তিনি নিস্পৃহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন,—

"বাপের গৌরবভরে হৈলু ভিন্নদেশ।
জলিখার ভাবে মোর কি আছে বিশেস॥
পুত্রবাচ দিয়া মোরে পুরীর ভিতর।
সমর্পিল জলিখার হাতের উপর॥

* * * *

কেহ জদি শুনে এহি দুরাচার বাণি।
জোবন ভরিআ হৈব অযস কাহিনি॥

ধাত্রী বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। জোলেখা সমস্ত অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এই ভাবে যুসুফকে সৎপথভ্রষ্ট করা দুরূহ কাজ; সুতরাং অন্য পথ অবলম্বন করা ব্যতীত উপায় নাই।

এইবার জোলেখা পুরীর বাহিরে এক সপ্তকক্ষ সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। ইহার নানা কক্ষে কামভাবোদ্দীপক নানা চিত্র ও বস্তুর সমাবেশ করা হইল। তাহা দেখিলে মানবের কথা দূরে থাক, দেবতার মনও টলিয়া যাইত। এই বিচিত্র মন্দিরে বাস করিবার জন্য যুসুফকে প্রেরণ করা হইল। কিছু দিন পর একদা জোলেখা এই মন্দির পরিদর্শনে যাইবেন স্থির করিলেন। যথারীতি সাজসজ্জা আরম্ভ হইল। বর্ত্তমান যুগে জোলেখার এই সাজসজ্জার বর্ণনা বেশ উপভোগ্য বস্তু, সন্দেহ নাই,—

"জলিখা করএ বেস, চিকুর চামরি কেস,
বান্ধএ কানরি খোপা লাস।
নানা কুসুম্বিত জুতি, দেখি চমকিত মতি,
ঘন মৈদ্ধে নৈক্ষত্র প্রকাস॥
নয়ন খঞ্জন তুল, আঞ্জনে রঞ্জিত মুল,
চঞ্চল চকোর সমুদ্রিত।
নিমেখে নির্ম্মল বাণ কটাক্ষেত সুসন্ধান,
বিরহিনি পন সচকিত॥
সিসেত সিন্দুর ভাসে, জেন রবি পরকাসে,
মুখচন্দ্রজুতি সমুদিত।
শ্রবণে শুম্ভিত মুতি, রতন কুণ্ডল জুতি,
তারাপ্রভা জিনিয়া বিদিত॥

গিমগত হিরা হার, রচিত সোবর্ণ সার,
গজমুতি বিরাজিত পাতি।
তাহাত কুসুমমালা, বিসেস ষুভিত ভালা,
বিনি সুতে গাথে কত ভাতি ॥
কস্তুরি কুঙ্কুম বুন্দ, কপালে তিলক চন্দ,
জেন চন্দ্র নৈক্ষত্র পুরিত।
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ, কেসর সুগন্ধি সঙ্গ,
জিনি তনু কান্তি ষুসোভিত ॥
কাঞ্চলি মণ্ডিত হার, সুরচিত পয়োভার,
বসন ভুসন আভরণ।
সুলৈক্ষ লাবণ্য বেস, মুহিত সকল দেস,
উনমত্ত নবিন জৌবন ॥
করেত কঙ্কণ বর, জেন চন্দ্র দিবাকর,
কনক মাণিক্য জুতি সার।
নানা অলঙ্কার রঙ্গ, সোবর্ণ রতন সঙ্গ,
রূপে সচি জেন অবতার ॥
বাহুদণ্ডে তাড় ভারি সোবর্ণ উঝল ধারি,
চুনি মণি বিচিত্র নির্ম্মাণ।
অঙ্গুরি মাণিক্য জরি, দশাঙ্গুলে ভরি পুরি,
বহুমুল্য ভোবন বিধান ॥
কটিত কিঙ্কিনি বাজে, জেন চন্দ্র সুর সাজে,
কি কহিমু তাহার বাখান।
চরণে নপুর বাজে, কনক বরণ সাজে,
তার জুতি চমকে চরণ ॥

এইরূপ সাজসজ্জায় বিভূষিতা হইয়া সুন্দরী জোলেখা সপ্তকক্ষ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তিনি য়ুসুফকে সঙ্গে লইয়া, একে একে কক্ষের পর কক্ষ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য শত প্রকারে সহস্র ভাবে প্রলুব্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। একটির পর একটি করিয়া যখন সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তখন জোলেখা য়ুসুফের পদে আত্ম বিকাইয়া দিয়া বলিলেন,—

"মুঞি যুক্ত সন্ত তুহ্মি জলদ নিপুণ।
বুন্দেক পড়িলে জল ন হৈবেক উণ ॥
জাচক তুলনা আহ্মি তুহ্মি দাতা জন।
ভক্ষদান দিলে কত্তো ন টুটিব ধন ॥
তুহ্মি সুধাকর আহ্মি ত্রিষ্ণাএ বিকল।
আহ্মা অল্প দিলে তোহ্মা ন টুটিব জল ॥

তুহ্মি মোহা কল্পতরু ফলিত নির্ম্মল।
আহ্মা এক ফল দিলে ন হৈব নিফল ॥
... ...
কৃপিনের ধন জেন করএ সঞ্চিত।
জাচক জনেরে কভো না কর বঞ্চিত ॥"

ইহাতে যুসুফ টলিলেন না। তিনি বার বার ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন; বার বার ধর্ম্মনাশের কথা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, তিনি চঞ্চল মূর্ত্তি পরিহার করিলেন এবং প্রশান্ত মনে গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,—

"খেমা কর মোর তরে কিছু কর দয়া।
অপকির্ত্তি হৈব তোহ্মা জগত ভরিয়া ॥
... ...
খুধা হৈলে বিভেক্ষ ভৈক্ষে নি দুই করে।
তিস্কায় বহুল জল ন পিএ সত্বরে ॥
পাথরে চাপিলে কর করিবেক বল।
জৌবন গরবে কন্যা না হৈঅ বিকল ॥"

যুসুফের এহেন অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনিয়া, জোলেখা আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। তিনি কামাতুর মনে যুসুফকে জড়াইয়া ধরিতে সচেষ্ট হইলেন। পাপভয়ে যুসুফ ছুটিয়া পলাইলেন। জোলেখা পলায়নপর যুসুফকে তাড়া করিলেন; কিন্তু ধরিতে পারিলেন না। অবশেষে যুসুফ যখন বাহির হইতেছিলেন, তখন জোলেখা যুসুফের জামার পশ্চাদ্‌ভাগ ধরিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তিনি জামার কিয়দংশ জোলেখার হাতে রাখিয়া পলায়ন করিলেন। জোলেখার মাথায় বাজ পড়িল, তিনি শয্যায় লুটাইয়া পড়িলেন।

ইহার পর জোলেখা যুসুফের নামে সতীত্ব নাশের অপবাদ রটাইয়া দিলেন। আজিজ-মিসিরের হাতে যুসুফের বিচার হইল। আল্লার হুকুমে এক দুগ্ধপোষা শিশু সাক্ষ্য দিল। প্রমাণিত হইল যে, যুসুফের জামার পশ্চাদ্ভাগ যখন ছিন্ন, তখন নিশ্চয় তিনি এই ব্যাপারে নির্দ্দোষ। যুসুফ সাময়িকভাবে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

এই ঘটনার পর একদা জোলেখা সখীদের সহিত যুসুফের অপরূপ রূপ-লাবণ্যের আলোচনা করিতেছিলেন। তাহারা যুসুফকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে ডাকাইয়া আনা হইল। যুসুফ যখন সখীদের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তাহারা নানা দ্রব্য ও ফলমূল আহার করিতেছিল; তাহারা যুসুফকে দেখামাত্রই এমনই মুগ্ধা হইল যে,—

"হাতেত তরুণ্যা ফল কাতি খরসান।
হস্ত সমে ফল কাটে আন নাহি জ্ঞান ॥
রুনিত পড়এ জেন ফলরসধার।
কামভাবে নেহালন্ত মুখচন্দ্র তার ॥
কর হোস্তে অবিরত পড়এ রুনিত।

য়ূসুফকে দর্শন করিয়া জোলেখার সখীদের যে শোচনীয় অবস্থা হইল, তাহা দেখিলে মনে হয়,—

"জেন এক প্রদিপেত পতঙ্গ বহল।
পড়িতে চাহএ মিত্যু হইয়া আকুল॥
জেন এক সুধাতরু ফলন্ত উঞ্চল।
তলে থাকি সর্ব্বজনে খাইতে চাহে ফল॥
ধরিতে ন পারে ফল ন পড়এ হাতে।
খুদাএ বিকল সরিরেত মর্ম্মঘাতে॥

ধীরে ধীরে জোলেখার সমস্ত কথা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। জোলেখা অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করিলেন এবং আজিজ-মিসিরকে অনুরোধ করিয়া য়ূসুফকে বন্দী করাইলেন। এইরূপে রমণীর চক্রান্তে য়ূসুফ বন্দিজীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

ইহার কিয়ৎকাল পরে আজিজ-মিসিরের মৃত্যু হইল। মিসরে এক নূতন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি রাজা হইয়াই কোন অপরাধে দুইটি লোককে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। এই দুই কয়েদীর সহিত কারাগারে য়ূসুফের পরিচয় হইল। একদা এই দুই কয়েদী দুইটি স্বপ্ন দেখিল। একজন দেখিল,—তাহার মস্তকস্থিত আহার্য্যপূর্ণ স্বর্ণথাল হইতে কাক ও চিল আহার্য্য সামগ্রী কাড়িয়া খাইতেছে। অপর ব্যক্তি দেখিল,—সে স্বর্ণের "কটোরা" লইয়া ভীতমনে রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান। কয়েদীদ্বয় এই স্বপ্ন দুইটির ব্যাখ্যার জন্য য়ূসুফের শরণাগত হইল। তিনি ব্যাখ্যা করিলেন যে, শীঘ্রই প্রথমোক্ত কয়েদীর শিরশ্ছেদ ও দ্বিতীয়োক্ত কয়েদীর রাজানুগ্রহ লাভ ঘটিবে। ফলে তাহাই হইল এবং য়ূসুফের ব্যাখ্যার সত্যতা প্রতিপন্ন হইল।

অনন্তর মিসরের নবীন বাদশাহ এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলেন। ইহা কবির ভাষায় এইরূপ,—

সপ্ত বৃষ হৃষ্ট পুষ্ট অতি সুবলিত।
আর সপ্ত বৃস কৃস তনু দুর্ব্বলিত॥
খিনবল সপ্ত গরু বলবন্ত হৈয়া।
এহি সপ্ত বৃসক খাইতে গেল ধাইয়া॥
জেন ব্যাঘ্রে ঝম্প দিয়া তাহাক ধরিল।
অহি সপ্ত পুষ্টতনু গরুক ভক্ষিল॥
আর এক অপূর্ব্ব দেখিল নৃপবর।
সপ্ত ছড়া গোহম (গোন্দম ?) গাছাইল তছু পর॥
শুক্লবর্ণ সপ্ত ছড়া তেহেন.মুরিত।
জেহেন চামর দোলে অতি সুললিত॥
তাহার নিকট হোন্তে আর৷সপ্ত ছড়া।
গাছাইল তেহেন বর্জ্জিত-জেন মরা॥
সপ্ত ছড়া মরএ জলিল পূর্ণ ছড়া।

এইরূপ বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়া রাজা পাত্রমিত্রকে ডাকাইয়া ইহার ব্যাখ্যা চাহিলেন। কেহই ঠিক ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হইল না। এই সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত পূর্ব্বোল্লিখিত কয়েদীটি বাদশাহকে জানাইল যে, য়ুসুফ নামক যে কয়েদী আছে, সেই ব্যক্তি ব্যতীত কেহই ইহার সদুত্তর দিতে পারিবে না। বাদশাহ য়ুসুফকে কারামুক্ত করিয়া মহাসমারোহে রাজদরবারে উপস্থিত করিলেন। য়ুসুফ সকলকে স্তম্ভিত করিয়া ব্যাখ্যা দিলেন যে, মিসরে উপর্য্যুপরি সাত বৎসর অত্যধিক শস্য জন্মিবে এবং তৎপর ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর ধরিয়া অজন্মা হইবে। ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। রাজা য়ুসুফকে বলিলেন,—"য়ুসুফ, তুমি রাজকার্য্যের উপযুক্ত ব্যক্তি; তোমাকে 'আজিজ-মিসির' (মিসরপ্রিয়, প্রধান মন্ত্রী ?) করিলাম; তুমি রাজ্যকে আসন্ন বিপদ্ হইতে মুক্ত করিবার ব্যবস্থা কর।" য়ুসুফ "আজিজ-মিসির"-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই সাত বৎসর যাবৎ রাজ্যের স্থানে স্থানে রাজশস্যাগার স্থাপন করিয়া, তথায় সাত বৎসর যাবৎ শস্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মিসর-রাজের মৃত্যু হয়। সকলে মিলিয়া য়ুসুফকে মিসরের সিংহাসন দান করেন। য়ুসুফ রাজা হইয়াই দেশে সুশাসনের প্রতিষ্ঠা করেন।

এ দিকে জোলেখা অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তখনও তিনি য়ুসুফকে ভুলিতে পারেন নাই। বহু বৎসর ধরিয়া মিসরের রাষ্ট্রবিপ্লবে তাঁহার বিশেষ ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, কিন্তু য়ুসুফকে তিনি কিছুতেই হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে পারেন নাই। তিনি এখন ভিখারিণী; কিন্তু তথাপি পথের ধারে বসিয়া য়ুসুফের যাতায়াত নিরীক্ষণ করেন, চির উপেক্ষিত হৃদয়কে প্রিয়তমের দর্শনে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু য়ুসুফের আদেশে রাজপ্রহরীরা কোন রমণীকে তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে দেয় না,—ইহাই জোলেখার অনুতাপ।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। একদা জোলেখা রাজপথের ধারে বসিয়া প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া য়ুসুফের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। য়ুসুফ আদেশ দিলেন, এই বৃদ্ধা যাহা চায়, তাহা তাহাকে দান কর। আশ্চর্য্যের বিষয়, বৃদ্ধা য়ুসুফের দর্শন ব্যতীত আর কিছুই ভিক্ষা মাগিল না। তাঁহাকে রাজ-অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে আদেশ দেওয়া হইল এবং যথাসময়ে য়ুসুফ বৃদ্ধাকে দর্শন দিলেন। এইখানেই য়ুসুফের সহিত জোলেখার নূতন করিয়া পরিচয় হয় এবং এখনও জোলেখা যৌবনের প্রেম পোষণ করিতেছেন দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া যান। বলা বাহুল্য, য়ুসুফ এখন "নবী"। জোলেখা তাঁহার পূর্ব্বযৌবন ভিক্ষা দিতে য়ুসুফকে অনুরোধ করেন। য়ুসুফের আশীর্ব্বাদে জোলেখা মুহূর্ত্তের মধ্যেই পূর্ব্বযৌবন লাভ করিলে, তিনি য়ুসুফকে জানাইলেন যে, এখন তাঁহাদের বিবাহে আর কোন বাধা নাই। খোদার হুকুমে য়ুসুফ ও জোলেখার বিবাহ হইল।

বিবাহের পর জোলেখার গর্ভে একে একে য়ুসুফের দুই পুত্র জন্মে। এই সময়ে মিসরে সপ্তবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। য়ুসুফের পিতৃরাজ্য কেনান প্রদেশেও এই সময়ে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। মিসর ব্যতীত তখন আর কোথাও শস্য ছিল না। শস্য ক্রয়ের জন্য য়ুসুফের বিমাতার গর্ভজাত দশ ভ্রাতা এই সময়ে মিসরে আগমন করে। য়ুসুফ তাহাদিগকে চিনিয়া

ভ্রাতা ও পিতাকে দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইলেন। য়ুসুফ তাঁহার ভ্রাতৃগণকে বলিলেন যে, ইবনু আমীনকে সঙ্গে লইয়া আসিলে তিনি তাহাদিগকে আরও অনুগ্রহ করিবেন। তাঁহার ইঙ্গিত মত অপর ভ্রাতাদের সঙ্গে ইবনু আমীন শস্য ক্রয় করিবার জন্য মিসরে আসিয়া পৌঁছিলে, য়ুসুফের চক্রান্তে সে চোর বলিয়া ধৃত হইল এবং মিসরীয় আইন অনুসারে য়ুসুফ তাহাকে নিজের দাস করিয়া সঙ্গে রাখিয়া দিলেন।

ইহার পর ইবনু আমীনকে দেখিবার জন্য বৃদ্ধ এয়াকুব নবীও মিসরে আসিয়া পৌঁছিলেন। পিতাপুত্রে মিসরের রাজপ্রাসাদে মিলন হইল। জোলেখা আসিয়া—

"পাখালি নবির পদ নির্ম্মল করিলা।
জলিখা মস্তককেসে উপস্কার কৈলা॥

এই প্রসঙ্গে ভ্রাতাদের সহিত য়ুসুফের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল। তিনি মধুপুর রাজ্যের সুন্দরী রাজকন্যা বিধুপ্রভার সহিত ইবনু আমীনের বিবাহ দিলেন। এইরূপে সকলে মিসরে সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

এইখানেই "য়ুসুফ জোলেখা" কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। এই কাব্যের চরিত্র-সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই। য়ুসুফ ও জোলেখাই এই কাব্যের মূল নায়ক ও নায়িকা। ইহাদের চরিত্রের যাহা মুল বৈশিষ্ট্য, তাহা কবির সৃষ্ট নহে। "বাইবেল" ও "কোরআনে" এই দুইটি চরিত্রের সবল ও দুর্ব্বল দিকের চিত্র বেশ সুন্দরভাবে অঙ্কিত আছে। কবি এই চিত্রগুলিকে বাঙ্গালা ভাষার তুলিতে রং দিয়াছেন,—ইহাই কবির একমাত্র কৃতিত্ব।

চরিত্র সৃষ্টির দিক্ হইতে কবির কোন কৃতিত্ব না পাওয়া গেলেও, তিনি যে একজন প্রতিভাবান্ কবি ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রের আদর্শ তিনি যেখান হইতেই গ্রহণ করুন, বাঙ্গালা ভাষায় এই চিত্র অঙ্কনে তিনি নানাভাবে মৌলিকত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার কবিত্বের প্রতিভা সর্ব্বত্র না হউক, এই কাব্যের অধিকাংশ স্থলে দেদীপ্যমান। এই কাব্যে মহাকাব্যসুলভ যে সৌন্দর্য্য (epic grandeur) রহিয়াছে, তাহা—কবি যে যুগে এই কাব্য লিখিয়াছিলেন, সে যুগে নিতান্ত দুর্লভ না হইলেও অত্যন্ত সুলভও নহে। আদর্শ মানবীয় প্রেমের চিত্রকররূপে কবির বিশেষ কোন কৃতিত্ব না থাকিলেও মানুষের সুখ-দুঃখের চিত্রকর হিসাবে তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সাহিত্যের আসরে উচ্চাসন না দিলে, তাঁহার প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হইবে।

বাস্তবিকই কবি মোহাম্মদ সগীরকে বেদনার কবি বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। ব্যথার চিত্র অঙ্কনে এই কবি যেন সিদ্ধহস্ত। বঞ্চিত হৃদয়ের বেদনা কবির লেখনীতে এমন সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, এক একবার কাব্য পাঠ করিতে করিতে আত্মহারা হইতে হয়। কবির সহানুভূতির বৃত্তি এতই প্রবল যে, তিনি অতি সহজেই নায়কনায়িকার ভাবে তন্ময় হইয়া তাঁহার নিজের মধ্যে তাহাদের বেদনা পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারেন। এই জন্যই তাঁহার বর্ণিত দুঃখের চিত্রগুলি এতই করুণ; এই জন্যই এইগুলি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, আলোড়িত করে। এইরূপ একটি

"নিসি উজাগর আখি ঝামর বদন।
পবনের সঙ্গে বাত কহে অনুক্ষণ॥
শুন রে পবন মোর দুক্ষের কাহিনী।
দণ্ডেক বরিখ মোর দীর্ঘল জামিনি॥
মোর পিয়া স্থানে গিয়া কহ রে সম্বাদ।
কেমোন সহাস্ত তান দাসি সঙ্গে বাদ॥
মলয়া সমির মোর সমন সমান।
এ চান্দ চন্দন দেহ দহএ নিদান॥
সঘন গহন ঘন বিদ্যু চমকিত।
নয়নে বহএ নির চিত্য বিচলিত॥
কুসুম সুগন্ধি জথ আগর চন্দন।
আতপে তাপিত তনু দহএ মদন॥"

কবি প্রধানতঃ মহাকাব্যসুলভ সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা হইলেও, তাঁহার রচনা গীতিপ্রবণ। কাব্যের স্থলে স্থলে তিনি যেরূপ নৈপুণ্য সহকারে সুন্দর সুন্দর গীতাবলীর সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা শুধু তাঁহার শিল্প-জ্ঞানের পরিচায়ক নহে, তাহা তাঁহার গীতি-প্রবণ হৃদয়ের সাক্ষ্যও বহন করিতেছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রধানতঃ গীতিকবিতার যুগ। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই যুগ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ন্যায় গীতি-কবিতারচকদিগের আবির্ভাবে ধন্য হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্য মালাধর বসু, জৈনুদ্দিন ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রভৃতি কবির ন্যায় মহাকাব্যরচয়িতাদিগকে লাভ করিয়াছিল। মনে হয়—এই দুই যুগের সন্ধিক্ষণে কবি মোহাম্মদ সগীরের জন্ম; তাঁহাকে এই গীতিকাব্য ও মহাকাব্যের যোগসূত্র বলিয়া ধরা যায়।

তাঁহার গীতগুলি কাব্যের নায়ক-নায়িকার বেদনাকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিলেও, বঙ্গের তৎপূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কবিদের মধ্যে এইগুলির কোন কোনটির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। গল্পের প্রথমাংশে উদ্ধৃত "শুন শুন সখি" নামক গানটি পাঠ করিতে করিতে চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের" কোন কোন গানের শুধু ভাব নহে, ভাষার কথাও মনে পড়ে। আবার যখন আমরা পাঠ করি,—

"মুঞি জেন এক, পন্থিক দুখিক,
ত্রিষ্ণাএ বিকল হৈয়া।
জলের উদ্দেস, ন পাই প্রাণ সেস,
চলিলু বিকল হৈয়া॥
দিঠ তরমএ, অন্তরে দহএ,
জলরূপ অনুমান।
গেলু সন্নিকট, পাইলু সঙ্কট,
নবিন রৌদ্রের বাণ॥"

তখন বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের সুপ্রসিদ্ধ "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু" নামক কবিতাটির কথা

"তিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গল।"

আমাদের বার বার এই কথা স্মরণ করাইয়া দেয় যে, কবি মোহাম্মদ সগীরের মধ্যে তৎপুর্ব্ব ও পরবর্ত্তী যুগের গীতি-লালিত্য "য়ুসুফ-জলিখার" ন্যায় মহাকাব্যকে আশ্রয় করিয়াও ফুটিয়া উঠিতে পারিয়াছে।

কাব্যে "বারমাসীর" আমদানী প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বারমাসীতে প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণ নায়িকার বিরহ-বেদনাকে বিনাইয়া বিনাইয়া অনেক সময় পাঠকের বিরক্তিকর মায়াকান্না জুড়িয়া দেন। কবি মোহাম্মদ সগীরও তাঁহার কাব্যে জোলেখার বিরহ-বেদনাকে আশ্রয় করিয়া "বারমাসী" গাহিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহার এই বারমাসীটি প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্যে প্রাচীনতম বারমাসী। প্রাচীনতম "বারমাসী" হিসাবে বঙ্গসাহিত্যে ইহার একটা বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক মূল্য ব্যতীত, তাঁহার "বারমাসীর" অন্য বৈশিষ্ট্যও বর্ত্তমান। তাঁহার বারমাসীতে কবির বাক্‌সংযমই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই জন্যই এই "বারমাসীটি" তাঁহার পরবর্ত্তী কালে রচিত "বারমাসী" হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইহাতে যথাসম্ভব অল্প বাক্যব্যয়ে কবি জোলেখার যে বিরহ-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বেশ উপভোগ্য। এতদ্ব্যতীত এই বারমাসীতে নায়িকার বিরহভোগ অপেক্ষা ষড়্‌ঋতুবিলাসিনী বাঙ্গালার ঋতুবিলাসের একটি প্রকৃত চিত্র অঙ্কনে কবি অধিক প্রয়াস পাইয়াছেন দেখিতে পাই। এই চিত্রের কিয়দংশ পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

"আশ্বিন জে পরবেস, বারিসা হইল সেস,
থেনে ঘোর থেনেকে বিদ্যুত।
কেতকি বকুল ফুল, তাহাতে ভ্রমরা রোল,
তা দেখি ধরাইতে নারি চিত॥
খণ্ড খণ্ড মেঘগণ, সসোদর সঙ্গে রণ,
ডুবকি উঠএ ঘনজিত।
তাহার নির্ম্মল নিসি, মুধা বিস্তারিত হাসি,
তা দেখিয়া মন বিচলিত॥
আইল কার্ত্তিক মাস, চতুর্দ্দিগ পরকাস,
মন্দ মন্দ দেহ প্রতুসাএ।
তা হেরি উদাস পিআ, বিরহে বিদরে হিয়া,
মন পক্ষি উরিছে উশ্চাএ॥
নিসি দিসি উঝলিত, তারাগণ বিস্তারিত,
বহএ সমির ধির ধারি।
ধবল কাচিআ ফুল, জেহেন পতকা তুল,

আঘ্রণ আইল রিত, নব সালি সমুদিত,
সুগন্ধি সৌরব জাএ দুর।
সারি শুক করে রোল, নানা বর্ণ ধান্য ফুল,
বিকসিত সব খিতিপুর॥
ঘরে ঘরে ধান্যরাসি, নর পষুগণ হাসি,
গগন রচিত পরকাস।
রাজা প্রজা উল্লসিত, প্রবাস বঞ্চিত রিত,
মোর লৈক্ষে জেন বনবাস॥
পৌস আইল তুসারিত, ভোবন পুরিত সিত,
খোহামএ জেন বৃষ্টিকার।
জুবক জুবতি মিলি, কর্পূর তাম্বুল তুলি,
বিলাসিত নানা সুখ সার॥
মুঞি বর হতভাগি, অহনিসি রহোঁ জাগি
প্রভু মোর নিদয়া হৃদএ।
মোহাম্মদে কহে দুখি অবস্য হইবা সুখি
নিসি সেসে রবির উদএ॥"

মুহম্মদ এনামুল্ হক্

মহাভারতে স্থানীয়মানতত্ত্ব*

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ১৩৪১ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যায় (১-১৩ পৃষ্ঠায়) আমরা লিখিয়াছিলাম, বর্ত্তমান 'মহাভারতে' স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার সমর্থনে যে প্রমাণটি তথায় উপস্থিত করা গিয়াছিল, উহা সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দিগ্ধ নহে। কেন না, তাহার ভিন্নার্থও করা যাইতে পারে। তখনই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। সম্প্রতি আমরা ঐ বিষয়ে একটা নূতন প্রমাণ পাইয়াছি। উহা একেবারে অকাট্য।

'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে, অগ্নি পনর দিন ধরিয়া খাণ্ডববন দাহ করিয়াছিল। তৎসম্পর্কে মহর্ষি বৈশম্পায়ন মহারাজ জনমেজয়কে বলিয়াছিলেন,—

"তদ্বনং পাবকো ধীমন্ দিনানি দশ পঞ্চ চ।
দদাহ কৃষ্ণপার্থাভ্যাং রক্ষিতঃ পাকশাসনাৎ॥"[১]

'হে ধীমন্! কৃষ্ণ এবং পার্থ কর্ত্তৃক ইন্দ্র হইতে পরিরক্ষিত হইয়া অগ্নি পঞ্চদশ ("দশ পঞ্চ চ") দিনে সেই বন দগ্ধ করিয়াছিল।' তাহার কিঞ্চিৎ পরে তিনি কহিয়াছেন,—

"পাবকশ্চ তদা দাবং দগ্ধ্বা সমৃগপক্ষিণম্।
অহানি পঞ্চ চৈকঞ্চ বিররাম সুতর্পিতঃ॥"[২]

'১৫ ("পঞ্চ চৈকঞ্চ") দিবস ধরিয়া মৃগপক্ষিসমাকুল (সেই) বন দগ্ধ করত পরম পরিতুষ্ট হইয়া অগ্নি বিরত হইল।'

এই দ্বিতীয় উক্তিস্থ "পঞ্চ চৈকঞ্চ" অবশ্যই ১৫ এই সংখ্যা খ্যাপন করে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা প্রথম বচনের "দশ পঞ্চ চ" অর্থাৎ ১৫ সংখ্যার সহিত উহার বিরোধ হইবে। ইহাতে নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হয় যে, বর্ত্তমান 'মহাভারত' সঙ্কলনের সময়ে (৫০০ শক-পূর্ব্বাব্দে) হিন্দুস্থানে স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যা ব্যবহৃত হইত, এবং অঙ্কপাতে তাহাতে বামাগতি অনুসৃত হইত। সুতরাং দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীও তখন জানা ছিল।[৩] এ বিষয়ে অপর স্বতন্ত্র প্রমাণ পূর্ব্বপ্রবন্ধেই প্রদত্ত হইয়াছে।

আরও একটা দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু উহা বড় সন্দেহাস্পদ। বনবাসকালে তীর্থ-মাহাত্ম্যবর্ণনাচ্ছলে পুরোহিত ধৌম্য যুধিষ্ঠিরকে বলেন, যমুনা নদীর তীরে ("যমুনামনু") অগ্নিশির নামক তীর্থে সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তী ভরত "বিংশতিঃ সপ্ত চাষ্টৌ চ" অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

"বিংশতিঃ সপ্ত চাষ্টৌ চ হয়মেধানুপাহরৎ।"[৪]

---

* ১৩৪২।১৯এ ফাল্গুন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। 'মহাভারত', নীলকণ্ঠকৃত টীকা সমেত, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নকর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং 'বঙ্গবাসী' কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮২৬ শক, আদিপর্ব্ব, ২২৮।৪৬

২। ঐ, আদিপর্ব্ব, ২৩৪।১৫

৩। প্রক্ষিপ্ততাবাদের ও পাঠভ্রান্তির শঙ্কা তুলিয়া দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালী ও স্থানীয়মানতত্ত্ব আবিষ্কারের প্রাচীনত্ব বিষয়ে এই নবোপস্থাপিত প্রমাণের মূল্য হ্রাস করা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বচন দুইটি প্রক্ষিপ্ত কি না এবং তাহাদের বর্ত্তমান পাঠ অভ্রান্ত কি না, তাহা নির্দ্ধারণের উপায় কি? এই পর্য্যন্ত 'মহাভারতে'র যতগুলি প্রধান প্রধান সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলিতে উহারা আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ এই সুদূর পল্লীগ্রামে লেখকের নাই।

ঐ বাক্যে বিবক্ষিত সংখ্যা কোন্‌টি? নীলকণ্ঠ মনে করেন, ১৪৮ (=২০×৭+৮)। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, "বিংশতিঃ" স্থলে "বিংশতিং" পাঠ ধরিলে, উহাদ্বারা ৩৫ (=২০+৭+৮) সংখ্যা বুঝাইত।[৫] কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত বঙ্গভাষান্তরে[৬] এই শেষোক্ত সংখ্যাই (৩৫) উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ সংখ্যাদ্বয়ের কোনটিই বক্তার অভিপ্রেত নহে, বোধ হয়।

'মহাভারতে'র আরও দুই স্থলে রাজচক্রবর্ত্তী ভরতের যজ্ঞের উল্লেখ আছে। পরমর্ষি বেদব্যাস মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—ভরত যমুনাসমীপে ("যমুনামনু") ১০০, সরস্বতী নদীর তীরে ৩০০ এবং গঙ্গাতীরে ("গঙ্গামনু") ৪০০ অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

"সোঽশ্বমেধশতেনেষ্ট্বা যমুনামনু বীর্য্যবান্।
ত্রিশতাশ্বান্ সরস্বত্যাং গঙ্গামনু চতুঃশতান্॥"[৭]

কৃষ্ণ তাঁহাকে কহিয়াছিলেন যে, ভরত যমুনাতীরে ১০৩, সরস্বতীতীরে ২০ এবং গঙ্গাতীরে ১৪ অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন।

"যো বদ্ধা ত্রিশতং চাশ্বান্ দেবেভ্যো যমুনামনু।
সরস্বতীং বিংশতিঞ্চ গঙ্গামনু চতুর্দ্দশ॥"[৮]

এইরূপে দেখা যায়, মহারাজ ভরত যমুনাতীরে কতটি অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান 'মহাভারতে' তিন প্রকার উক্তি রহিয়াছে। ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে, শেষের উক্তিদ্বয় নারদ-সৃঞ্জয়-সংবাদের অন্তর্গত। আদিতে দেবর্ষি নারদ মহারাজ সৃঞ্জয়ের পুত্রশোক অপনোদনের জন্য তাঁহাকে সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপরায়ণ প্রাচীন ষোল জন রাজার কাহিনী শুনাইয়াছিলেন। অভিমন্যুশোকবিহ্বল মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিবার জন্য মহর্ষি ব্যাস তাঁহার নিকটে ঐ ষোড়শ-রাজিক উপাখ্যান বিবৃত করেন। কুরুক্ষেত্রমহাসমরের পরে, যুধিষ্ঠিরের শোকাপনোদনার্থ কৃষ্ণ উহার পুনরাবৃত্তি করেন। তাঁহাদের দুই জনের উক্তিতে ঐ প্রকার ভেদ অবশ্যই পাঠভ্রমজনিত বলিতে হইবে। প্রকৃত পাঠ যে কি, বিশেষতঃ রাজচক্রবর্ত্তী ভরত যমুনাসমীপে কত অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয়ের উপায়ও দেখা যায় না। 'ভাগবতে'র উক্তি বিষয়টাকে আরও জটিল করিয়া দিয়াছে। তথায় আছে, ভরত যমুনাসমীপে ৭৮ ও গঙ্গাসমীপে ৫৫, মোট ১৩৩ ("ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতং") অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন।

"বিংশতিঃ সপ্ত চাষ্টৌ চ" বাক্যের 'বিংশতিঃ+সপ্ত চাষ্টৌ চ' এই প্রকারে পদযোজনা করিলে এবং 'সপ্ত চাষ্টৌ চ' পদে নামসংখ্যা প্রযুক্ত হইয়াছে ধরিলে, বিবক্ষিত সংখ্যা হইবে, বামাগতিতে ২০+৮৭=১০৭, অথবা দক্ষিণাগতিতে ২০+৭৮=৯৮। এই শেষের সংখ্যাটীই (৯৮) এক শতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আসন্ন। উহাকেই মহর্ষি ব্যাস স্থূলভাবে শত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অনুমান করা যাইতে পারে। 'সপ্ত চাষ্টৌ চ' সংখ্যাকে ৭৮ বলিয়া গ্রহণ করিলে, 'ভাগবতে'র উক্তির সঙ্গেও কতকটা সঙ্গতি থাকে।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

৫। নীলকণ্ঠের উক্তি এই,—"বিংশতিঃ বিংশতিবারমাবর্ত্তিতঃ সপ্ত অষ্টৌ চেতি অষ্টচত্বারিংশদধিকং শতম্। ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতং রাজেতি তু শ্রুতিঃ। বিংশতিমিতি পাঠেঽত্যন্তহীনসংখ্যত্বাৎ পঞ্চত্রিংশৎ।"

৬। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনূদিত মহাভারত, কলিকাতা, হিতবাদী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত, ১৩১০ সাল,

ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি

AN EXTENSIVE

VOCABULARY,

Bengalese and English. & Udiya

VERY USEFUL

TO TEACH THE NATIVES ENGLISH,

AND

TO ASSIST BEGINNERS IN LEARNING THE BENGAL LANGUAGE.

CALCUTTA,

PRINTED AT THE CHRONICLE PRESS.

MDCCXCIII.

আপজন-এর অভিধানের আখ্যা-পত্র

ক

কাঁটালিকলা	a plantain of an angular kind	କାଁଠାଳି କଦଳି
কাটাইতে	to cauſe to cut	କଟାଇବାକୁ
কাটার	a poignard, dagger	କଟାରୀ
কাটারি	a crooked broad knife	କଟାରି
কাটিতে	to cut, to hew	କାଟିବାକୁ
কাটিতে আখর	to blot a letter	କାଟିବାକୁ ଅକ୍ଷର
কাটনাকাটিতে	to ſpin	କାଟନା କାଟିବାକୁ
কাটরা	a ſence of boards	କାଠରା
কাঠুর্যা	a wood-cleaver	କାଠୁରିଆ
কাঁটা	a thorn, a fork, a fiſh-bone	କଣ୍ଟା
কাঠ	wood	କାଠ
কাঠ বেরাল	a ſquirrel	କାଠ ବିଲେଇ
কাঠের	wooden, of wood	କାଠର
কাঠখড়	fire-wood	କାଠଖଡ଼
কাঠের মাড়	a float of timber	କାଠର ଗାଡ଼
কাঠা	a meaſure, a cotta or piece of ground [4 ells ſquare	କାଠା
কাড়াকাড়ি	force, violence	କାଡ଼ାକଡ଼ି
কাড়িয়া আনিতে	to get by force	କାଡ଼ି ଆଣିବାକୁ

বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান*

এখন পর্য্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে পাদ্রি মানোএল-দা-আসসুম্পসাউঁ রচিত *Vocabulario Em Idioma Bengalla, E Portuguez* নামক পুস্তককেই সর্ব্বপ্রথম বাংলা শব্দসংগ্রহ বা অভিধান বলা যাইতে পারে। এই পুস্তক ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে[১] পোর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরে Francisco Da Sylvaর ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল। বইটি সম্পূর্ণ রোমান হরফে ছাপা। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিখ্যাত চার্লস উইলকিন্স সর্ব্বপ্রথম[২] নিজে ছেনি কাটিয়া বাংলা হরফ ঢালাই করেন। নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড কর্ত্তৃক ইংরেজীতে লিখিত বাংলা ব্যাকরণ *A Grammar of the Bengal Language* নামক পুস্তকে সেই হরফ প্রথম ব্যবহৃত হয়। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই সম্পূর্ণ বাংলা অক্ষরে কয়েকটি আইনের পুস্তক মুদ্রিত হয়। ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক বাংলা এবং দেশীয়গণ কর্ত্তৃক ইংরেজী শিক্ষার সেই প্রথম যুগে ইংরেজী বাংলা এবং বাংলা ইংরেজী শব্দসংগ্রহ (vocabulary) বা অভিধানও প্রস্তুত হইবার কথা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা এতদিন পর্য্যন্ত ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে মুদ্রিত কোনও অভিধানের সন্ধান পাই নাই।

---

* ১৩৪৪।১৩ই আষাঢ়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১. "The First Bengali Grammar and Dictionary were in Portugueze. The title of the work is *Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez dividido em duas partes.........Lisboa, 1743.* Bengali Grammar, pp. 1—40; Vocabulary Bengali-Portuguese, pp 41—306; Portuguese-Bengali, pp. 307—577. The whole is in the Roman character, the words being spelt according to the rules of Portuguese pronunciation".—Sir George Grierson, Linguistic Survey of India, vol. v, pt. 1, p. 23.

"এই বইয়ের দুইখানি প্রতিলিপি লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকাগারে আছে। একখানি খণ্ডিত, আর খানি সম্পূর্ণ।.........পৃষ্ঠা সংখ্যা X, 592; প্রথম দশ পৃষ্ঠা ভূমিকা প্রভৃতি লইয়া; তৎপরে ১—৪০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ব্যাকরণ; ....তৎপরে ৪১—৫৯২ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শব্দসংগ্রহ, ৪১—৩০৬ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা পোর্ত্তুগীস, ও ৩০৭—৫৭০ পর্য্যন্ত পোর্ত্তুগীস-বাঙ্গালা; এবং ৫৭১—৫৯২ পর্যন্ত বাকী পৃষ্ঠায় নানারূপ শব্দ শ্রেণী হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছে—" ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'পাদ্রি মানোএল-দা-আসসুম্পসাম-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ'—(কলি. বি. বি.) এর প্রবেশক পৃঃ ১১। এই পুস্তকে মূল বহির টাইটেল পেজ ও চারিটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি আছে।

উপরোক্ত দুই জনই বইটি চোখে দেখিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আলোচনা করিয়াছেন, Father H. Hosten, *Bengal : Past & Present*, vol. IX, pt. 1, p. 42; vol. XIII, pt. 1, pp. 67—68 (ইহাতে মূল বহির টাইটেল পেজ ও অপর দুইটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি আছে); ডক্টর সুশীলকুমার দে—*Bengali Literature in the Nineteenth Century* (C. U. 1919) p. 75 ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৩ এবং কেদারনাথ মজুমদার, 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য', ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৭ (ইহাতে টাইটেল পেজের প্রতিলিপি আছে)।

২ হালহেডের ব্যাকরণের ভূমিকা, পৃঃ XXIII-XXIV

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হেনরী পিট্‌স্ ফরষ্টার ('Senior Merchant on the Bengal Establishment') প্রণীত *A Vocabulary, in two parts, English and Bongalee, and Vice Versa* নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ড (ইংরেজী হইতে বাংলা) কলিকাতার 'Ferris and Co.'র প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ii+XX+421। ইহারই দ্বিতীয় খণ্ড (বাংলা ইংরেজী) উপরোক্ত প্রেস হইতে ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা-সংখ্যা 443+IX। লঙ্‌ সাহেবের মতে এই পুস্তকে প্রায় ১৮০০০ বাংলা শব্দ আছে। (*A Descriptive Catalogue of Bengali Books*, p. 2)। এতদিন পর্য্যন্ত বাংলা হরফে মুদ্রিত অভিধানগুলির মধ্যে এই পুস্তকটিই আদিমতম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। ফরষ্টার সাহেবের নিজেরও ধারণা ছিল যে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন এবং পরবর্ত্তী অভিধান-কারেরাও (যথা উইলিয়ম কেরী—১৮১৫-২৫, রামকমল সেন—১৮১৭-৩৪, তারাচাঁদ্‌ চক্রবর্ত্তী—১৮২৭, জন মেণ্ডিস—১৮২৮, জি. সি. হটন—১৮৩৩ প্রভৃতি) তাঁহাকেই এই সম্মান দিয়াছেন; ফলে, এখন পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যতগুলি ইতিহাস রচিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই ফরষ্টারকৃত অভিধানটিই বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত সর্ব্বপ্রথম অভিধান বলিয়া উল্লিখিত হয়।

এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলা ও ইউরোপীয় ভাষায় অভিধান সঙ্কলনের চেষ্টার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পুরাতন পুস্তক ও পত্রিকাদি পড়িতে পড়িতে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্কল্পের পরিচয় মাত্র পাওয়া গিয়াছে, সেই সকল সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল কি না, তাহার প্রমাণ নাই। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার *The Origin and Development of the Bengali Language* পুস্তকের ১ম খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায় Augustin Aussant প্রণীত ফরাসী-বাংলা শব্দাভিধানের (১৭৮১-৮৩ খ্রীঃ) উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা পাণ্ডুলিপি আকারেই আছে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে *Calcutta Gazette*-এ একটি বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, তাহাতে কয়েক জন বঙ্গদেশবাসী উপযুক্ত লোককে একটি বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়নের অনুরোধ জানাইতেছেন[৩]। অনুরোধের ধরণ দেখিয়া মনে হয়, তখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের ব্যবহারার্থ কোনও ইংরেজী-বাংলা অভিধানের প্রচলন ছিল না। সুবিখ্যাত রামকমল সেন তাঁহার *A Dictionary in English and Bengalee* (Serampore Press, 1834) পুস্তকের ভূমিকায় (p. 17) কিন্তু লিখিয়াছেন—

---

৩. "*Card.* The humble request of several Natives of Bengal. We humbly beseech any gentleman will be so good to us as to take the trouble of making a Bengal Grammar and Dictionary, in which we hope to find all the Common Bengal Country words made into English. By this means we shall be enabled to recommend ourselves to the English Government and understand their orders; this favor will be gratefully remembered by us and our posterity for ever"—Seton Karr, *Selections form Calculta Gazettes*, vol. II, p. 497.

"In 1774 the Supreme Court was established here, and from this period a knowledge of the English language appeared to be desirable and necessary. In tracing the progress made, it appears that a Brahmin named *Rámrám Misra* was the first who made any considerable progress in the English language, but it is not known how he learnt it, or by whom he was taught. He himself taught several Baboos and amongst them *Ramnarain Misra*, a clerk to an attorney of the Supreme Court, who was considered to be a scholar and a great lawyer into the bargain, for he could draw up petitions, and knew the forms and practice of the pernicious system of law which has ruined almost every family of note in Calcutta, who were subject to its jurisdiction. By it he made his fortune, there not being his equal at the time. He afterwards kept a school, in which he taught a number of Hindoo youth, and received from them a monthly fee of from 4 to 16 Rs. each. Before his time however there was another individual named *Anondiram Doss*, who knew a still greater number of English words than *Ramnarain*. This man had a vocabulary or collection of words which was considered a treasure of English knowledge, and a number of young Hindoos used to attend daily upon him for hours and to wait his pleasure and convenience to get some scraps from his book. This pious philanthropist used to give out five or six words everyday for their study. A specimen of the words in Bengalee characters with their meaning is as follows.

লার্ড.........(Lord,)....................ইশ্বর।
গাড.........(God,) ইশ্বর।
কম ....(To come,) আইশ।
গো ....(To go,) জাও।
গোইন ......(Going,) জাইতেছি।

Ramlochun Napit, *Krishnamohun Bose* and some others also used to teach English in the same manner as many writers in public offices do to this day. Sometime after this, *Bhobani Dutt*, *Sibu Dutt*, and a few others were celebrated as complete English Scholars, among the Hindoos ; *Mr. Franco*, called *Panchico*. also opened a school about this time which was followed by another, kept by one *Aratoon Pitrus*, several of whose scholars are still living. At that time there were no other elementary books than *Thomas Dyche's* Spelling Book and Schoolmaster. The Arabian Nights and the tootee nameh came many years after ; those who could read any of these were reckoned learned men, and those who could run over the rules of Grammar at the end of the spelling books, were considered masters of the language."

উপরোক্ত অংশ বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিলাম এই জন্য যে, এই সময়ের ইংরেজী শিক্ষার প্রচেষ্টার ইতিহাস অন্য কোথায়ও পাওয়া যাইতেছে না এবং দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধেও আর কিছু জানা যায় না। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' ও 'সেকাল আর একালে' বাঙ্গালীর প্রথম ইংরেজী শিক্ষার যৎসামান্য ইতিহাস দিয়াছেন। তিনি টমাস ডিস্, আরাটুন পিট্রুস, রামরাম মিশ্র ও কৃষ্ণমোহন বসুর উল্লেখ করিয়াছেন। *Bengal : Past & Present* এর দ্বাদশ ভল্যুমে রামকিষণ মিশ্রের অন্য প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে। ইহাঁদের কাহারও শব্দসংগ্রহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল কি না,

Sir G. C. Haughton তাঁহার *A Dictionary, Bengali and Sanskrit*, (London, 1833) পুস্তকের ভূমিকায় (পৃঃ VII) লিখিয়াছেন, স্যার চার্লস উইলকিন্স বঙ্গদেশে অবস্থানকালে (১৭৭০-১৭৮৬ খ্রীঃ) তিনটি সংস্কৃতমূলক শব্দের তালিকা সঙ্কলন করেন ; তাহা পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই আছে[৪]।

উইলিয়াম কেরী মালদহের মদনাবতীতে অবস্থানকালে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বারমিংহামের মিঃ পি-কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বাংলা ভাষার একটি অভিধান লিখিতে আরম্ভ করার কথা আছে[৫]। কিন্তু তাঁহার বিখ্যাত কোয়ার্টো বাংলা-ইংরেজী অভিধানের মুদ্রণকার্য্য ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সুরু হইয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

সুখের বিষয়, সম্প্রতি এইগুলি ছাড়াও আর দুইটি বাংলা-ইংরেজী শব্দসংগ্রহের সন্ধান আমরা পাইয়াছি। দুইটি পুস্তকই যে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই বাংলাদেশেই মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কি অজ্ঞাত কারণে ফরষ্টার এবং পরবর্ত্তী অভিধান-কারেরা এই পুস্তক দুইটির সন্ধান পান নাই, অথবা সন্ধান পাইয়া থাকিলেও তাহার উল্লেখ মাত্র করেন নাই, তাহা ভাবিবার বিষয়। ইহার প্রথমখানি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়খানি ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।* সুতরাং ফরষ্টারের অভিধান প্রথম বাংলা অভিধান হিসাবে এতকাল যে সম্মান পাইয়া আসিতেছিল, এখন হইতে ১৭৯৩ সালে ছাপা অভিধানটিকেই সেই সম্মান দিতে হইবে।

এই প্রবন্ধে আমরা এই পুস্তকটি লইয়াই আলোচনা করিব। ইহার আবিষ্কারের একটু ইতিহাস আছে। প্রাচীন বাংলা মুদ্রিত পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীর প্রথম ভালুম ক্যাটালগের (১৮৮৮ খ্রীঃ) ৩৯৫ পৃষ্ঠায় "Extensive Vocabulary of Bengali, English and Udiya. 2 vols. Calcutta, 1793" এই নামটি দেখিতে পাই। ফরষ্টারের প্রথমতম বাংলা অভিধানের কথা স্মরণ করিয়া '১৭৯৩'কে ছাপার ভুল বলিয়াই ধরিয়া লই। তথাপি ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীকে পত্র লিখি। উত্তরে জানিতে পারি, ভুল নয়, বইখানি

---

৪. "To his friend Sir Charles Wilkins thanks are due for the loan of three Ms. list of words collected during the course of that distinguished scholar's studies while resident in Bengal."

৫. "I have also begun to write a dictionary of the language, but this will be a work of time ;"—*Periodical Accounts Relative to the Baptist Missionary Society* Vol. 1, Pt III, p. 223.

* দ্বিতীয় শব্দসংগ্রহটি ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশেই মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৬৪। আমরা ভবিষ্যতে এই পুস্তকটিরও বিস্তৃত আলোচনা দিতে চেষ্টা করিব। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল যে, এখন পর্য্যন্ত বাংলা-ইংরেজী অভিধানগুলি বিদেশীয়দের দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছে। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বাঙালী-রচিত সর্ব্বপ্রথম বর্ণানুক্রমিক বাংলা অভিধানকার হিসাবে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নাম করিতে হয়। তাঁহার

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দেই ছাপা, কিন্তু ক্যাটালগের নামে ভুল আছে। বইখানির নাম—"An Extensive Vocabulary, *Bengalese and English*." '*and Udiya*' শব্দ দুইটি পুস্তকের মূল মালিকের হাতে লেখা ; তিনি নিজের ব্যবহারের জন্য পুস্তকটিকে 'ইণ্টারলিফ' করিয়া দুই ভালুমে বাঁধাইয়া প্রত্যেকটি শব্দের ওড়িয়া প্রতিশব্দ হাতে লিখিয়া রাখিয়াছেন। যথাসময়ে ইণ্ডিয়া আফিসে রক্ষিত পুস্তকের টাইটেল পেজ, ভূমিকা ও অভিধান-অংশের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হয়। টাইটেল পেজ ও অভিধান পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এই প্রবন্ধে মুদ্রি- হইল।[৬]

পুস্তকটির নাম—

ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি
An Extensive
Vocabulary,
Bengalese and English,
Very useful
To Teach the Natives English,
And
To Assist Beginners in Learning
The Bengal Language.
Calcutta,
Printed at the Chronicle Press.
M D C E X C III

ক্রনিকল প্রেসের নাম মাত্র আছে, গ্রন্থকারের অথবা মুদ্রাকরের কোনও নাম নাই। ক্রনিকল প্রেসের সূত্র ধরিয়া আমরা গ্রন্থকারকে বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছি, এখন পর্য্যন্ত সফলকাম হই নাই। গ্রন্থকার ভূমিকাতেও আত্মপরিচয়ের কোনও সূত্র ধরিয়া দেন নাই। ভূমিকাটি যথাযথ উদ্ধৃত করিতেছি।

PREFACE.

The Author spent ten years in compiling and revising this work. He is very sensible of its defects ; but as it is the first of the kind, and promises much utility in diffusing the English language among the Natives, he hopes it will be candidly received by the Publick. The Printer engages to furnish to every Purchaser a complete Index, as soon as it can be prepared, gratis.

---

৬. ইণ্ডিয়া আফিসে রক্ষিত পুস্তকটির আরও একটু ইতিহাস আছে। ইহার মালিক ছিলেন Rev. Brooks, তিনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কটক হইতে '*An Oriya and English Dictionary*' প্রকাশ করেন। ইণ্ডিয়া আফিসে রক্ষিত ইংরেজী-বাংলা অভিধান হইতে বুঝা যায়, তিনি এইটিকে আদর্শ করিয়াই তাঁহার

সৌভাগ্যক্রমে, এই পুস্তকের একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি শোভাবাজার রাজবাটীতে রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে খুঁজিয়া পাই[৭], পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারেও ইহার একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি প্রাপ্ত হই। টাইটেল পেজ, ভূমিকা ইত্যাদি না থাকাতে ইহা 'মিলার সাহেবের অভিধান (১৮০১)', এই ভুল নামে তালিকাভুক্ত হইয়া আছে[৮]। আশ্চর্য্যের বিষয়, হাতের কাছে এই পুস্তকের এতগুলি কপি থাকা সত্ত্বেও ইহা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকদের নজর এড়াইয়া গিয়াছে। এই অভিধান সম্পর্কে আমরা সর্ব্বপ্রথম ১৩৪৩ সনের আশ্বিন সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে (পৃঃ ১৫৮১) উল্লেখ করি ও পরে কার্ত্তিক সংখ্যা শনিবারের চিঠির ৩২ ও ১৪৫-৬ পৃষ্ঠায় ইহার সামান্ত পরিচয় প্রদান করি।

প্রথমটা আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল, রামকমল সেনের ভূমিকায় উল্লিখিত 'আনন্দিরাম দাসে'র শব্দসংগ্রহই পরবর্ত্তী কালে 'ইংরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি' নাম লইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সন্দেহের সপক্ষে আমারা কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় *Calcutta Chronicle* নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইত। কলিকাতার ম্যাপ প্রস্তুতকারক সুবিখ্যাত A. Upjohn ইহার মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন। ইঁহাদের অফিস ও ছাপাখানা ছিল ৮ নং লালবাজার। কলিকাতা ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে ১৭৯২ ও ১৭৯৩ এই দুই সালের *Calcutta Chronicle* আছে। তাহা হইতে জানা যায়, প্রেসের নাম ছিল 'Calcutta Chronicle Press'; এই প্রেসটিই অভিধানের টাইটেল পেজে 'Chronicle Press' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এ. আপজন সাহেব Calcutta Chronicle (প্রেস ও পত্রিকা)-এর এক-ষষ্ঠাংশের মালিক ছিলেন। তিনি ১৭৯২ সালের গোড়ার দিক্ হইতেই দুরবস্থায় পতিত হন ও তাঁহার অংশ হস্তান্তরিত করিবার চেষ্টা করেন। কলিকাতা গেজেটের সেটন-কার-কৃত সঙ্কলনে ও ক্যালকাটা ক্রনিকল সাপ্তাহিকের বিভিন্ন সংখ্যায় আপজন সাহেবের সম্পত্তি বিক্রয় বিষয়ে নানা অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়[৯]। কিন্তু এই দুর্দ্দশার মধ্যেও আপজন সাহেবের অদম্য উৎসাহের অন্ত ছিল না; তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয়ের চেষ্টা চলিতেছে, এই অবস্থাতেই তিনি তাঁহার পত্রিকায় (Tuesday, March 20, 1792, Vol. VII, No. 322) বিজ্ঞাপন দিয়া বসিলেন,—

New Publications, In the Press, And speedily will be published, An Extensive Vocabulary, Bengalese and English, Very useful to teach the Natives English and to Assist Beginners in Learning the Bengal Language. Those who wish for the works are requested to send their orders to Mr. Upjohn.

ইংরাজ এবং বাঙ্গালি লোকের/ সিখিবার কারন এক বহি অতি/ সিগ্র ছাপাখানায় তৈয়ার হইবে/ক সাহেব লোকে বাঙ্গলা কথা/ সিখিবেক এবং বাঙ্গালি লোকে/ ইংরাজি কথা সিখিবেক অতএ/ব সকল লোকের কেন্দাএত/ কারণ এই বহি তৈয়ার করা জা/ইতেছে জে২ লোকে চাহে তা/হারা মেং আবজান সাহেবের/ ছাপাখানায় আসিয়া লইবেক/ ইতি সন ১৭৯২ ইংরাজী/ তারিখ ১৯ মার্চ্চ সন ১১৯৮/ বাঙ্গালা তারিখ ৯ চৈত্র।

---

৭. বাংলা আলমারীর ১৪২ (জে) সংখ্যক বই।

৮. দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের তালিকায় ২৩ নং বই।

এই বিজ্ঞাপনটিই ঘুরিয়া ফিরিয়া এবং সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া ১৭৯৩ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বার বার বাহির হয়। "Price Twelve Rupees" এই অংশটিও কয়েক বার জুড়িয়া দেওয়া হয়। আপজন সাহেব নিজেই হউক অথবা অপর কাহাকেও দিয়া হউক, অভিধানটি সঙ্কলন ও মুদ্রণ করিতে থাকেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ তারিখের ক্যালকাটা ক্রনিকলের একটি বিজ্ঞাপনে অফিস ও প্রেস লালবাজার হইতে চিৎপুর রোডে Le Blancএর গৃহে উঠিয়া যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। আপজনের সহিত ক্যালকাটা ক্রনিকলের সম্পর্কও ওই সঙ্গে শেষ হয় এবং তৎপরেই ১৬ই এপ্রিলের কাগজে এই বিজ্ঞাপন দেখিতেছি,—

Just Published,/ At the Chronicle Office, Chitpore Road,/ (Price fou Rupees,)/ ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি/ বোকেবিলরি/ An Extensive/ Vocabulary,/ Bengalese and English ;/ very useful to Teach the natives English/ And/ To Assist beginners in learning the/ Bengal Language.

বারো টাকা হইতে চার টাকায় দাম নামিয়া আসাতে বোধ হইতেছে, পুস্তকটি প্রথমে যত বৃহৎ হইবে বলিয়া প্রকাশক আশা করিয়াছিলেন, ঠিক তত বড় হয় নাই। মনে হয়, সম্পত্তি বিক্রয় ও হস্তান্তরণ ব্যাপারেই নানাবিধ গোলযোগ ঘটে এবং এই পুস্তক তেমন ভাবে প্রকাশ ও প্রচার না হওয়ার ইহাই সম্ভবতঃ কারণ।

এই অভিধান যাহার দ্বারাই সঙ্কলিত হইয়া থাকুক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক এ. আপজন ছাড়া আর কাহারও নামের সহিত এখনও ইহা যুক্ত করা যায় না। সুতরাং আপাততঃ ইহাকে ক্রনিকল প্রেসে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৬ এপ্রিল তারিখের পূর্ব্বে) ছাপা আপজনের ইংরেজী-বাংলা অভিধান বলিয়াই উল্লেখ করিতে হইবে।

পুস্তকটি প্রায় ডবল ক্রাউন ষোলপেজী সাইজের; টাইটেল পেজ ও ভূমিকা স্বতন্ত্র, মূল অভিধানের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪৪৫। প্রত্যেক পৃষ্ঠার বাঁদিকে বাংলা ও ডান দিকে তাহার ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। শব্দগুলি বর্ণানুক্রমে সাজানো হইলেও ব্যঞ্জন বর্ণ পূর্ব্বে স্থান পাইয়াছে। ১-৩৯৩ পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ব্যঞ্জন বর্ণ, ৩৯৩-৪৪৫ পৃষ্ঠা স্বরবর্ণ। সকল শব্দ ঠিক বর্ণানুক্রমে সাজান নাই। শব্দ ছাড়া অনেক বাক্য ও বাক্যাংশও অনুবাদ-সমেত দেওয়া হইয়াছে।

এই অভিধানের শব্দগুলি ভাষাবিদের বিশেষ আলোচনার যোগ্য; অনেক শব্দ বর্ত্তমানে অপ্রচলিত, অনেক শব্দের অর্থের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, সংস্কৃত তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম; দেশজ শব্দ অত্যন্ত বেশী; মুসলমানী শব্দও কম নয়। ফরষ্টারের অভিধান হইতে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত করিবার যে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল, এই অভিধানে তাহার কোনই চিহ্ন নাই[১০]। এই শব্দ বিচারের জন্যই এই প্রাচীনতম অভিধানটির সম্পূর্ণ পুনর্ম্মুদ্রণ আবশ্যক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতেই এই চেষ্টা হইলে শোভন হইবে।

---

১০. এই বিশুদ্ধীকরণ প্রচেষ্টা সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কোনও শব্দতাত্ত্বিক আলোচনা করেন নাই। ১৭৯৯ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই আন্দোলন প্রবলবেগে চলিয়াছিল এবং তাহার ফলেই বাংলা অভিধানে সংস্কৃত-প্রভাব অত্যন্ত বেশী হয়। কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি এ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

আমরা বারান্তরে ভাষা ও শব্দতত্ত্বের দিক্ দিয়া এই পুস্তকের সাধ্যমত আলোচনা করিব। যে সকল শব্দ বর্ত্তমানে অপ্রচলিত অথবা অর্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা আমরা সেই সঙ্গে প্রকাশ করিব। অক্ষরের নমুনা ও শব্দসঙ্কলনের ধরণ নমুনাপৃষ্ঠা হইতেই সম্যক্ বুঝা যাইবে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস।

দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার

দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।* এই সকল প্রবন্ধে কবির কোন কোন কাব্যের—প্রধানতঃ হস্তলিখিত পুথি হইতে—পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিজ রামচন্দ্র সেকালের এক জন খ্যাতনামা কবি ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হওয়া উচিত। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরা তাঁহার সকল রচনার সন্ধান পান নাই। অন্য একটি ব্যাপারে অনুসন্ধান কালে আমি দ্বিজ রামচন্দ্রের অনেকগুলি মুদ্রিত গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি; বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলাম। এই গ্রন্থপঞ্জী তাঁহার চরিতকারের কাজে লাগিতে পারে।

(১) দুর্গামঙ্গলান্তর্গত 'গৌরীবিলাস'। পৃ. সংখ্যা ১৪০ + ১২৯ + ৩ (শুদ্ধিপত্র) + ৪ (স্বাক্ষরকারিদিগের নাম)।

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থের এক খণ্ড আছে কিন্তু তাহার আখ্যাপত্র নাই। ইহাতে ৬ খানি চিত্র আছে; তন্মধ্যে ২ খানি কাঠখোদাই, ৪ খানি লাইন-এনগ্রেভিং। গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে—গৌরীবিলাস, তাহার পৃ. সংখ্যা ১-১৪০। দ্বিতীয় ভাগে—কঙ্কালীর অভিশাপ, তাহার পৃ. সংখ্যা ১-১২৯। প্রথম ভাগের শেষ কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—

> এত বলি পার্ব্বতী হানিল অসি দুর্গাসুরে।
> পড়িল দনুজপতি পুষ্পবৃষ্টি সুরপুরে॥
> দুর্গাসুর সংহারিয়া হৈল মার দুর্গা নাম।
> কি কব নামের গুণ নাহি তার অনুপাম॥
> ব্রহ্মহত্যা আদি করি পঞ্চম মহাপাতকী।
> দুর্গা নামে মুক্ত হয় অশেষ আর নারকী॥
> দুর্গানাম মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ এইত শুনিলা।
> অতঃপর ইতিহাস কহি একাম্বর লীলা॥
> কঙ্কালী জন্মিল শাঁপে গৌড়ে ভূপতি কন্যা।
> দ্বিজ রামচন্দ্র কবি কহে শুনহ সুধন্যা— (পৃ. ১৪০)

ইহার পর দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ। ইহার পৃষ্ঠাঙ্কও পুনরায় ১ হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। আমরা সমগ্র গ্রন্থের নির্ঘণ্টটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—

---

* (১) "দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল কাব্য"—শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, ১ম সংখ্যা, ১৩০৫।
(২) "দ্বিজ রামচন্দ্রের প্রকৃত কালনির্ণয়"—রমেশচন্দ্র বসু, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩০৫।
(৩) "দ্বিজ রামচন্দ্র-রচিত হরপার্ব্বতী-মঙ্গল"—দুর্গাদাস রায়, ২য় সংখ্যা, ১৩২৭।
(৪) "রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র"—শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য, ৩য় সংখ্যা, ১৩৪০।

নির্ঘণ্ট পত্র

আলোচ্য গ্রন্থখানির আখ্যাপত্র পাওয়া না গেলেও, গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

(ক) অভয়ার পাদপদ্মে মধু করি আশ।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীর বিলাস ॥ (১ম ভাগ, পৃ. ৩২)

(খ) খরিটী সমাজধাম গোপাল মুখটি নাম।
তার সুত দ্বিজ রামধন।
তাহার তনয় তিন জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র দীন
গৌরীগুণ করিল রচন ॥ (১ম ভাগ, পৃ. ১১৩)

(গ) শ্রীকবি কেশরী নাম নিজ হরিনাভিধাম
শ্রীদুর্গামঙ্গল রসপানে ॥ (২য় ভাগ, পৃ. ২)

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের শেষে রচনাকাল ১৭৪১ শক (= ১৮১৯ সন) এই ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে :—

শশী ঋষি বেদশশী শকনর রায়।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ তারার ইচ্ছায়—

এই গ্রন্থ "শ্রীরামমোহন ধনীর" অর্থে মুদ্রিত। সমগ্র গ্রন্থ গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত, ইহাতে রাগ-রাগিণী দেওয়া আছে। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন :—

পুস্তক প্রস্তুত করি ছিল অভিলাষ।
গায়ক দ্বারায় গীত করিব প্রকাশ ॥
অর্থ বিনা সে সকল না হয় পুর্ণিত।
শ্রীরামমোহন ধনী করিলেন হিত ॥
ছাপিলা পুস্তক করি নিজ অর্থব্যয়।
শ্রমসার্থকতা হয় গুণীগণে লয় ॥
নতুবা পঠিবে পুতি দশরা মসরা।

ধনী গুণী নিকটেতে প্রার্থনা আমার।
গাথকের দ্বারে কেহ করিলে প্রচার॥
অনুমতি রূপে নাম দিও স্থানে স্থানে।
রাজা রঘুনাথ যথা আছে চণ্ডীগানে॥
অন্নদামঙ্গল গানে কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ।
ভনিতার পূর্ব্বে নাম দিবা সেইরূপ—

গ্রন্থখানি ১৮১৯ সনে রচিত হইবার অল্পদিন পরেই মুদ্রিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। গ্রন্থের শেষে "স্বাক্ষরকারিদিগের নাম"-এর মধ্যে নীলমণি মল্লিক ও রামমোহন রায়ের নাম পাইতেছি; ১৮২১ সনে নীলমণি মল্লিক পরলোকগমন করেন, এবং ১৮৩০ সনে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন।

'গৌরীবিলাস' ও তদন্তর্ভুক্ত 'কঙ্কালীর অভিশাপ' যে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল এ সংবাদ ইতিপূর্ব্বে কাহারও জানা ছিল না। এই দুইখানি গ্রন্থের হাতে-লেখা পুথির কিছু খণ্ডিত অংশ শ্রীযুত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য পাইয়াছেন। ১৩৪০ সালের ৩য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় তিনি 'গৌরীবিলাস' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত পুথিতে ১৫-১৫, ১৭-১৮, ২৬-৩১ পত্রগুলি নাই বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ঐ সব স্থলের গল্পাংশের বর্ণনা তিনি দিতে পারেন নাই। আমরা মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে সেই সেই অংশে বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।—

১৪-১৫ পত্র (মুদ্রিত গ্রন্থের ২৬-২৯ পৃঃ)।

লক্ষ্মী কর্ত্তৃক নারায়ণের গলে বরমাল্য দান; দেবাসুরের পুনর্ব্বার সমুদ্র মন্থন; অমৃতকুম্ভ লইয়া সমুদ্র হইতে ধন্বন্তরির উত্থান; অসুরদের অমৃত গ্রহণে উদ্যোগ; বিষ্ণু কর্ত্তৃক মোহিনী স্ত্রীরূপ ধারণ এবং অসুরগণকে বঞ্চিত করিয়া দেবগণকে অমৃত দান।

১৭-১৮ পত্র (মুদ্রিত গ্রন্থের ৩১-৩৫ পৃঃ)।

শিব কর্ত্তৃক কালকূট বিষ পান; শিবের মূর্চ্ছা; দেবতাদের ক্রন্দন; শিবানীর স্তব করিবার জন্য দেবগণকে বিষ্ণুর উপদেশ, দেবগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মময়ী শিবানীর স্তব; স্তবে প্রসন্ন হইয়া ক্ষীরোদ-তীরে তাঁহার আগমন; শিবের চেতনা লাভ; দেব ও অসুরগণের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান; সংক্ষেপে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা।

২৬-৩১ পত্র (মুদ্রিত গ্রন্থের ৪৯-৬০ পৃঃ)।

পিতামহের উপদেশে দেবগণ কর্ত্তৃক মদনের আহ্বান; শিবের ধ্যান ভঙ্গের জন্য মদনকে শিবসমীপে প্রেরণ; শিব কর্ত্তৃক মদন ভস্ম; রতি বিলাপ; শিবের অন্তর্ধান; হিমালয় কর্ত্তৃক উমাকে গৃহে আনয়ন; পিতা মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া উমার তপস্যায় গমন।

(২) দুর্গামঙ্গলান্তর্গত নলদময়ন্তী। পৃ. সংখ্যা ৭৯।

শ্রীশ্রীদুর্গাঃ ॥/ শরণং ॥/ শ্রীশ্রীদুর্গামঙ্গলান্তর্গত নল দময়ন্তী নামক গ্রন্থ/ শ্রীযুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দ্বারা পয়ারাদি / ছন্দে বিরচিত হইয়া/ শ্রীমাধবচন্দ্র ধর ও শ্রীরূপচাঁদ দে / ইহারদিগের অনুমতানুসারে/ কলিকাতা / জ্ঞানাঞ্জন যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল / এই পুস্তক যাহাদিগের প্রয়োজন হইবেক তিনি / বটতলার দক্ষিণাংশে তত্ত্ব করিলে / পাইবেন

এই পুস্তকের এক খণ্ড কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে।

দ্বিজ রামচন্দ্রের 'নলদময়ন্তী' শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় ১৩০৫ সালে 'দুর্গামঙ্গল' নামে প্রকাশ করেন। তিনি একখানি পুথি হইতে ইহা মুদ্রণ করেন; খুব সম্ভব এই পুথি মুদ্রিত পুস্তকের নকল। 'নলদময়ন্তী' যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, এ সংবাদ শাস্ত্রী মহাশয় জানিতেন না। তিনি তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, দ্বিজ রামচন্দ্র "সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন; সুতরাং এই কাব্যের অনেক স্থলে শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতের অনুকরণ করিয়াছেন। যে যে স্থানে অবিকল নৈষধচরিতের ভাব অপহরণ করিয়াছেন...।"

প্রকৃতপক্ষে 'নলদময়ন্তী'র পূর্ব্বেকার একটি মুদ্রিত সংস্করণের আখ্যাপত্রে নৈষধচরিতের উল্লেখ কবি নিজেই করিয়াছিলেন। বেহারিমোহন দাস নামে এক ব্যক্তি এই সংস্করণের 'নলদময়ন্তী' পুথির আকারে নকল করিয়া লইয়াছিলেন। মুন্‌শী আবদুল করিম এই পুথির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

২৪৯। **নলদময়ন্তী**। এই পাণ্ডুলিপিখানিও মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া প্রস্তুত। আবরণ পত্রে লেখা আছে:—শ্রীহরিচরণ সার। নলদময়ন্তী। শ্রীশ্রী৺ দুর্গামঙ্গলান্তর্গত নলদময়ন্তি উপাক্ষণ অর্থাৎ নৈশেধ কাব্য। তদ্ভাষা শ্রীযুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দ্বারায় পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া শীবাদহ নিবাসী শ্রীগৌরচাঁদ শেন দীং শীলুযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।...

স্বক্ষরমিদং শ্রীবেহারি মোহন দাসস্ত হক মালিক এই পুস্তক শ্রীযুত পীতাম্বর বাবুর বাটীর মণ্ডপ ঘরে সন ১১৯৯ মঘিতে মাতাবেক সন ১২৪৪ বাঙ্গালা তারিখ ৫ চৈত্র রোজ শনিবার ৬এ দণ্ড বেলা গতে লিখা সমাপ্ত হইল।..."

ইহা হইতে আরও জানা গেল, ১৮৩৮ সনের কাছাকাছি 'নলদময়ন্তী'র একটি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

'নলদময়ন্তী'র শেষে কবি 'কঙ্কালীর অভিশাপে'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

নল দময়ন্তী কথা করিলে শ্রবণ।
কলির নাহিক ভয় পাপবিমোচন॥
অতঃপর বলি কঙ্কালীর অভিশাপ।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র সংগীত আলাপ॥

এখানে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 'নলদময়ন্তী' পুস্তকের আখ্যাপত্রে প্রকাশ যে ইহা "দুর্গামঙ্গলান্তর্গত"। প্রকৃতপক্ষে 'গৌরীবিলাস,' 'কঙ্কালীর অভিশাপ' ও 'নলদময়ন্তী' এই তিনটি লইয়াই 'দুর্গামঙ্গল' পালা,—ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র ন্যায় 'দুর্গামঙ্গল'ও কোন একখানি পুস্তক-বিশেষের নাম নহে। পরে দেখা যাইবে, কবি তাঁহার 'হরপার্ব্বতীমঙ্গলে' 'গৌরীবিলাসকে'ও 'দুর্গামঙ্গল' বলিয়াছেন।

(৩) অক্রুর সংবাদ। পৃ. ১১৬।

শ্রীশ্রীহরিঃ। / শরণং / শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত অক্রুর সংবাদ॥/ নামক গ্রন্থ॥ / শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার

অনুমত্যানুসারে / কুমারটুলির শাস্ত্র প্রকাশ যন্ত্রে যন্ত্রিত / হইল। / এই পুস্তক যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবেক তাঁহারা / কলিকাতার/ শোভাবাজারের বটতলার দক্ষিণাংশে/তত্ব করিলে পাইবেন। / ইতি সন ১২৫৩ সাল তারিখ ৭ চৈত্র মাস।/

কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে এক খণ্ড 'অক্রুর সংবাদ' আছে। পুস্তকের শেষে রচনাকাল—১৭৪৫ শক (=১৮২৩ সন) দেওয়া যাছে :—

সাগরের পূর্ণশশী বাণ বেদ দশকে বসি
এই স্থানে গ্রন্থের বিশ্রাম॥

(৪) আনন্দলহরী। ১৮২৪। পৃ. সংখ্যা ৬২।

শ্রীশ্রীদুর্গা।— / জয়তি— / শিবাবতার শ্রীশঙ্করাচার্যানিজকৃতা / আনন্দলহরী / শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারকৃত সুদীয়ার্থ সাধু / ভাষা সংগ্রহঃ / কলিকাতার কলুটোলার সমাচার / চন্দ্রিকাযন্ত্রে মুদ্রিত হইল / সন ১২৩১ সাল /

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। ইহাতে রূপচাঁদ আচার্য্য-ক্ষোদিত একখানি লাইন-এনগ্রেভিং আছে। পুস্তকের আরম্ভে গ্রন্থকার নিজ পরিচয়স্বরূপ লিখিয়াছেন :—

হরিনাভি নিবাসী শ্রীরামচন্দ্র দ্বিজাগ্রজঃ॥
আনন্দলহরী ভাষাং করোতি সুবোধায় চ॥ (পৃ. /০)

পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় :—

আনন্দলহরী স্তবমধু সরসিজ॥
ভাষায় করিল ব্যাখ্যা রামচন্দ্রদ্বিজ॥
ইন্দু ইন্দুপিতা বেদ বাণ পরিমাণ।
এই শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত বিধান॥ ১০২॥
ইতি আনন্দলহরী সমাপ্তঃ সন ১২৩০ শাল॥
তারিখ ২০ চৈত্র॥

এখানে বলা প্রয়োজন, গ্রন্থকার হরিনাভি-নিবাসী রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহে,—ইনিই কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার। ইহার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে। জানা যাইতেছে, কবির উপাধি প্রথমে "বিদ্যালঙ্কার" ছিল।

(৫) মাধব মালতী। পৃ. সংখ্যা ১২২।

মাধব মালতী নামক গ্রন্থ। / শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারেণ বিরচিতং / ইদানীং / শ্রীগুরুচরণ ধরের কমলাশন যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল॥ / এই গ্রন্থ যাঁহারদিগের প্রয়োজন হইবেক তাহারা / মোকাম কলিকাতার আহিরীটোলার শ্রীযুত বাবু জুংখি/রামদের ১।১২ নম্বরের বাটিতে তত্ব/ করিলেই পাইবেন॥ / ইতি সন ১২৭৫ সাল তারিখ ১৯ চৈত্র রোজ সোমবার।

কবির শেষ-জীবন শোভাবাজার-রাজপরিবারের আশ্রয়ে কাটিয়াছিল। কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আদেশে তিনি এই কাব্যখানি রচনা করেন। কবি লিখিতেছেন :—

অথ গ্রন্থসূচনা।
পয়ার॥
মহারাজা নবকৃষ্ণ বিখ্যাত নগরী।
তাহার বর্ণনা আমি কিরূপে বা করি॥
আরোপিত কথনের নাম হয় স্তব।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য লইলেন জন্ম।
সেইমত তাহার তাবত দেখি কর্ম্ম॥
তাঁর ছিল নবরত্ন ইহার সে রূপ।
সভাস্থের বিবা কব নিজে বিদ্যাকূপ॥
সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ।

মহাকবি বাণেশ্বর নন্দের শঙ্কর।
বলরাম কামদেব আর গদাধর ॥
শিশুরাম পদপুরে স্মার্ত্ত কৃপারাম।
শান্তিপুরে বাস গোঁসাই ভট্টাচার্য্য নাম ॥
এই নবরত্ন লয়ে সর্ব্বদা আমোদ।
আপনি আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ ॥
মাস্তের কি কব যার উজিরত্ব পদ।
হুকুম আছিল যার করিবারে বধ ॥
বিলাতের বাদসাহ করিলে সম্মান।
গবর্ণরের ঘরে যিনি সদা চৌকী পান ॥
অধিকার হাতে গড় গঙ্গামগুলাদি।
হেন জন নাহি ছিল হয় প্রতিবাদী ॥
রূপের তুলনা নাই মামে গোষ্ঠীপতি।
মুখ্য বিনা কর্ম্ম নাই তাহার সন্ততি ॥
তাঁর পুত্র বাহাদুর রাজা রাজকৃষ্ণ।
কি কব তাঁহার গুণ ন শ্রুত ন দৃষ্ট ॥
পিতাতুল্য মান্ত নাম তাবত কর্ম্মেতে।
বিশেষ তাঁহার গুণ দয়ার ধর্ম্মেতে ॥
দেবীবর বল্লালের যে বা ছিল ঘাটি।
কায়স্থের কুলের করিল পরিপাটি ॥
তার পুত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুর নাম।
নবীন প্রবীণ যিনি সর্ব্বগুণধাম ॥
আদ্যাশক্তি কমলার কবিত্ব বিশেষ।
কবি রামচন্দ্র প্রতি করিলা আদেশ ॥

গ্রন্থশেষে কবি 'মাধব মালতী'র রচনাকাল ১৭৫২ শক (=১৮৩০ সন) এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

চন্দ্র চন্দ্রযোনি চন্দ্রললাটবদন।
চন্দ্রহাসবৃদ্ধি যাতে শক নিরূপণ ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এক খণ্ড 'মাধব মালতী' আছে।

(৬) হরপার্ব্বতীমঙ্গল। পৃ. ৩৩৯।

শ্রীশ্রীদুর্গা ॥ / জয়তি। / শ্রীহরপার্ব্বতী মঙ্গল / মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের অনুমত্যানুসারে ॥ / তৎসভাসদ / শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী / ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক রচিত ॥ / বিচার করিবে গুণ গুণি বিজ্ঞবর। / খলের স্বভাব দোষ দেখিতে তৎপর ॥ / পদ্মবনে ত্যজি মধু মৃণাল ভুজঙ্গ। / ভেক ভক্ষণের আশে তাহার আসঙ্গ ॥ / আহিরীটোলা নিবাসী। / শ্রীমাধবচন্দ্র ধর ও শ্রীরূপচাঁদ দের জ্ঞানাঞ্জন যন্ত্রে / মুদ্রাঙ্কিত হইল ॥ /............[১২৫৮ সাল]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এক খণ্ড জীর্ণ 'হরপার্ব্বতীমঙ্গল' আছে। আখ্যাপত্রে প্রকাশকালটি পড়া যাইতেছে না, কিন্তু ইহা যে ১২৫৮ সাল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে এই সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে। ইহাতে একখানি কাঠখোদাই চিত্র আছে।

এই মহাকাব্যখানিও কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের আদেশে রচিত। 'হরপার্ব্বতীমঙ্গলে'র আখ্যাপত্রে কবি নিজেকে কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের "সভাসদ" রূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

'হরপার্ব্বতীমঙ্গলে' কবির "আত্মপরিচয়" অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

ত্রিপদী ॥

জাহ্নবীর পূর্ব্বভাগ, মেদনমল্ল অনুরাগ,
অধিপতি ছিল মদন রায়।
নিজে মামারক গাজী, আপনি হইয়া রাজী,
বনমাঝে দেখা দিলা তায় ॥

দত্ত কুল সমুদ্ভব, গোষ্ঠীপতি খ্যাতি রব,
কায়স্থ কুলের অধিকারী।
বৃত্তিভোগী কত দ্বিজ, পঞ্চম তনয় নিজ,
কনিষ্ঠ শ্রীরাম বিচক্ষণ।
বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব, জমীদারী তাহে বর্ত্ত,
তদঙ্গজ শ্রীদুর্গাচরণ॥
সহায় আনন্দময়ী, সর্ব্বাংশে হইলা জয়ী,
শ্রীমতী শ্রীমতী যার বাণী।
করিয়া সমাজস্থান কত ভূমি কৈলে দান,
বারুইপুরেতে রাজধানী॥
তস্য পুত্র গুণধাম, শ্রীকালীশঙ্কর নাম,
অল্পকালে হৈলা লোকান্তর।
তস্য পুত্র মহাশয়, শ্রীরাজবল্লভ হয়,
চৌধুরী বিখ্যাত সর্ব্বত্তর॥
শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্যবরা, অবিবাদে পালে ধরা,
গাম্ভীর্য্যতে রঘুপতি রাম।
অধিকার ইংরাজী, কেহ করি কারসাজী
কিছু গ্রাম করায় নিলাম॥
তার মধ্যে বাসস্থান, হরিনাভি সমাখ্যান,
কিনিলেন দুর্গারাম কর।
নহেন সামান্য ব্যক্তি, গুরু দেব দ্বিজে ভক্তি,
কীর্ত্তি কত দেশ দেশান্তর॥
উভয়ত গুণযোগী, কিন্তু যার বৃত্তিভোগী,
আশীর্ব্বাদ করি পুনঃ পুন।
কবীন্দ্র মাতাম কুল, ইষ্ট যার অনুকূল,
পিতৃপরিচয় কিছু শুন॥
মুখটী বিখ্যাত কুলে, মেলবন্ধ যার ফুলে,
শঙ্করের তনয় গোপাল।
ভরদ্বাজ মুনি অংশ, কানাই ঠাকুর বংশ,
আদান প্রদানে সম ভাল॥
তিনি কুল ভঙ্গ নিজ, মাহিনগরেতে দ্বিজ
কামদেব সার্ব্বভৌমাখ্যান।
বিবাহ তনয়া তারি, তাহাতে সন্তান চারি,
রামধন তৃতীয় সন্তান॥
তদঙ্গজ রামচন্দ্র, ইষ্ট চরণারবিন্দ,
একান্ত হৃদয়মাঝে ভাবি।

উপরি উদ্ধৃত অংশের এক স্থলে কবি নিজেকে বিনোদরাম তর্কপঞ্চাননের "সুতাসুত" অর্থাৎ দৌহিত্র বলিতেছেন। শ্রীযুত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য কবির মাতামহকুলের যে পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নির্ভুল নহে বলিয়াই মনে হইতেছে।

কবি বারুইপুরের রাজবল্লভের আদেশে 'হরপার্ব্বতীমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন; তিনি লিখিয়াছেন :—

বারুইপুরেতে বাস,　　শ্রীরাজবল্লভ দাস,
আদেশিলা রচিতে মঙ্গল।
রামচন্দ্র বিরচিত,　　শ্রীহরপার্ব্বতী গীত,
নায়কেরে করিবে কুশল॥

'হরপার্ব্বতীমঙ্গলে'র এক স্থানে কবি 'দুর্গামঙ্গলে'র বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন। এই অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

অতঃপর যে যে কথা,　　শ্রীদুর্গামঙ্গল যথা,
করিয়াছি তাহাতে রচনা।
হিমালয়ে সতীর জন্ম,　　কামদেব ভস্ম কর্ম্ম,
পার্ব্বতীর শিব আরাধনা॥
মিলন হইল উভে,　　হরগৌরী বিভা শুভে,
উভয়ের কাশীতে প্রস্থান।
গিরি ঘরে গৌরী আনি,　　আসিয়া পিনাকপাণি,
কৈলাসশিখরে শেষে যান॥
স্তব কৈল দিবিসদ,　　তারকাসুরের বধ,
গণেশ কার্ত্তিক জন্মাইয়া।
বিরচিল রামচন্দ্র,　　অশেষ প্রকার ছন্দ,
দেখিবেন উভে মিলাইয়া॥ (পৃ. ৬১-৬২)

(৭) শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাক।

পাদরি লঙের মতে ১৮২০ সনে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে পরবর্ত্তী সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে, তাহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। / শরণং / শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাক। / অর্থাৎ / শাতাতপ মুনিকর্তৃক সংগ্রহ / মহাপাপ ও অতিপাপ / ও সামান্য পাপকারি মনুষ্যদিগের/জন্ম জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন যে সকল রোগ / উদ্ভব হয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত/ বিবরণ। / তত্ত্বার্থ / শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দ্বারা / সংগৃহীত হইয়া। / ইদানী / শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকারের অনুমত্যনুসারে / শ্রীরামপুর / জ্ঞানারুণোদয় যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / শকাব্দা ১৭৭৬ / [পৃ. সংখ্যা ৬১]

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতেও এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

(৮) কৌতুকসর্ব্বস্ব নাটক। ১৮২৮। পৃ. ৭৮।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। মিউজিয়মের পুস্তক-তালিকায় ইহার

GOPINATHA CHAKRAVARTI. কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক। শ্রীযুক্ত কলিবৎসল রাজার উপাখ্যান। [*Kautukasarvasva nataka.* A Sanskrit play, with intervening portions appearing in a Bengali version in prose and verse by Ramachandra Tarkalankara.] pp. 78. ১২৩৫ [Calcutta ? 1828.] 8°.

পাদরি লঙের বাংলা পুস্তকের তালিকাতেও (পৃ. ৭৫) পাইতেছি :—

Kautuk Sarbasa Natak, Ch. P., 1830, a drama, by R. Chundra **Tarkalankar** of Harinabhi.

(৯) চন্দ্রবংশ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রবিহীন এক খণ্ড 'চন্দ্রবংশ' আছে; তাহার পৃ. সংখ্যা ৪+১৪৪। এই পুস্তকের রচনাকাল ১৭৫০ শক (=১৮২৮ সন) শেষ পৃষ্ঠায় এই ভাবে দেওয়া আছে :—

শুন ভাই পুণ্যবান ভারতের উপাখ্যান
রসিকজনের রসলভ্য।
মৈত্র বাণ শূন্ম ডাকে সমাপন ঐ শাকে
কহে রামচন্দ্র কবিসভ্য॥

গ্রন্থসূচনায় কবি তাঁহার বংশ-পরিচয় দিয়াছেন; এই অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

মুখটী বিখ্যাত কুলে মেলি বদ্ধ যার ফুলে
ছোট ঠাকুর কানাই আছিলা।
গঙ্গানন্দে কৈলা ত্রাণ ছলে কন্যা নিয়া দান
সারূপ্য তাহাকে পদ দিলা॥
কি আর বিস্তর কব তস্য বংশে সমুদ্ভব
মুখটী গোপাল ভঙ্গ নিজ।
তস্য পুত্র রামধন দৌহিত্র যা ার হন
কামদেব সার্ব্বভৌম দ্বিজ॥
রামধন সুত তিন জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র দীন
বিনত্রাম তনয়া নন্দন।
নিবসতি হরিনাভি উমা পাদপদ্ম ভাবি
কাব্য কিছু কহিব বচন॥

ইহার পর কবি এই গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

শুন ভাই সর্ব্বজন চন্দ্র বংশ বিবরণ
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলি সার
নহুষের অবতংশে জন্ম যার চন্দ্রবংশে
যযাতি ভূপতি নাম যার।
কব কাব্য আদ্যরস যাহাতে রসিক বশ
কাল গুণে আদর অধিক।
ভক্তি মুক্তি রসপ্রাপ্তি অনেকে না লয় মতি

কিন্তু পূর্ব্ব কবি যারা প্রকাশ করেছে তারা
আদ্য রস সংস্কৃতে গুপ্ত।
সাহিত্য নাটক যত প্রায় হইয়াছে হত
ইতে সংস্কৃত রস লুপ্ত॥
ভাষায় কিঞ্চিৎ করা অনেকের মন হরা
গুণি জনে না ধরিবে দোষ।
দ্বিজ রামচন্দ্র কয় যদ্যপি অগ্রাহ্য হয়
বিচক্ষণে পাইবে সন্তোষ॥

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। তাহার প্রকাশকাল ১৮৪১ সন; পৃ. সংখ্যা ৪ + ১২০।

(১০) আচার-রত্নাকর। ১৮৪১।

এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে মুন্‌শী আবদুল করিম লিখিয়াছেন :—

৪৩১। আচার-রত্নাকর। ছাপা গ্রন্থ। ইহাতে অরুণোদয় হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সময়ের কর্ত্তব্য সদাচার কথিত হইয়াছে। আবরণে লেখা আছে :—"শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া ইদানীং শিবাদহের শ্রীপীতাম্বর সেন দীং সিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২৪৮ সাল। ('বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ', ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২৬৮)

(১১) কালীপুরাণ। ১৮৪৮। পৃ. সংখ্যা ৪ + ২৭৫।

শ্রীশ্রীদুর্গা / শরণং / মূল কালীপুরাণ। / অর্থাৎ / কামাখ্যা বর্ণন এবং ভগবতী পুজা ইত্যাদি / বহুবিধ প্রকরণ আছে। / বক্তা মহামুনি ঔর্ব্ব গোস্বামী। / শ্রোতা সূর্য্যবংশোদ্ভব সগর রাজা। / তদ্ভাষা / শ্রীযুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক / বিরচিত হইয়া / শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীকালীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের / কলিকাতা / সারসংগ্রহ যন্ত্রাক্ষরৈর্ম্মুদ্রিতা। / এই পুস্তক যাঁহারদিগের প্রয়োজন হইবেক মোং / শোভাবাজারের বটতলার উত্তরাংশে উক্ত যন্ত্রালয়ে / পাইবেন ইতি / সন ১২৫৫ সাল। /

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এক খণ্ড 'কালীপুরাণ' আছে। গ্রন্থশেষে ইহার রচনাকাল ১৭৫৬ শক (= ১৮৩৪ সন) এই ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে :—

সমাপ্ত হইল গ্রন্থ ব্যাসের বচন।
ভাষা করি রামচন্দ্র করিল রচন॥
মুখটি বিখ্যাত কুলে হরিনাভী বাস।
পয়ার প্রবন্ধে রচি ব্যাসের আভাষ।
রসবাণ সমুদ্র পশ্চাত সুধাকর।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ শক নৃপবর॥

গ্রন্থারম্ভে কবি আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রচনাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপরে শোভাবাজার-রাজবংশের পরিচয় দিয়া জানাইয়াছেন যে, এই গ্রন্থও কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আদেশে

নিবাস জাহ্নবী তীর হরিনাভী গ্রাম।
সমাজ কায়স্থ দ্বিজ কত কব নাম॥
মেলি বন্ধ ফুলেতে মুখুটি অবদাত।
অধুনা উপাধি তর্কালঙ্কার বিখ্যাত॥
পূর্ব্বে কয়খানি গ্রন্থ করেছি রচনা।
বহু রস বহু ছন্দে তাহার সূচনা॥
গৌরীর বিলাস নল দময়ন্তী কথা।
মাধব মালতী চন্দ্র বংশোদয় গাঁথা॥
কৌতুক সর্ব্বস্ব হরপার্ব্বতী মঙ্গল।
আনন্দলহরী ভাষা আচার সকল॥
কর্ম্ম বিবেকার্থ আর আছয়ে অনেক।
অক্রূর সম্বাদ ষষ্ঠী সিতলা কতেক॥
করেছি অমর ভাষা শব্দ অনুমান।
সংপ্রতি রচিব ভাষা কালীকা পুরাণ॥
বিক্রমআদিত্য তুল্য নবকৃষ্ণরাজ।
নবরত্ন সম যার৷পণ্ডিত সমাজ॥
তাহার তনয় রাজকৃষ্ণ বাহাদুর।
রূপে গুণে দয়া ধর্ম্মে তাবতে প্রচুর॥
তাহার তনয় অষ্ট সবে বিলক্ষণ।
শিবকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠপুত্র সর্ব্ব সুলক্ষণ।
কালীকৃষ্ণ মধ্যম বর্ণনে বর্ণ হারে।
শাপে সুরপতি অবতীর্ণ এ সংসারে॥
শান্ত ধীর দেবীকৃষ্ণ নামেতে তৃতীয়।
চতুর্থ অপূর্ব্বকৃষ্ণ সর্ব্বজনপ্রিয়॥
পঞ্চম মাধবকৃষ্ণ বিজ্ঞ গুণবান।
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ষষ্ঠ উপেন্দ্র সমান॥
সপ্তম নরেন্দ্রকৃষ্ণ মদন মূরতি।
যাদবেন্দ্রকৃষ্ণ নাম অষ্টম সন্ততি॥
কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণসখ দেওয়ান বাটীর।
স সম্পর্ক ভাগিনেয় বিচক্ষণ ধীর॥
বৃহস্পতিতুল্য সভাপণ্ডিত শ্রীকান্ত।
মধ্যমের গুণ বলি ধীর দয়া শান্ত॥
সুশীল পণ্ডিত সুকুমার অনুপম।
ক্ষমা ধৈর্য্য দয়াশীল ধার্ম্মিক উত্তম॥
সভাসত রামচন্দ্রে আজ্ঞা দিল তারে।
কালিকা পুরাণ ভাষা গীত রচিবারে॥
সেই বাক্য অনুসারে হইল রচিত।
সম্প্রতি ছাপায় গ্রন্থ হইবে মুদ্রিত॥
রচিব মানস আরো যদি আয়ু পাই।
নিবেদন মাগি কিছু সাধুজন ঠাঁই।
কিবল পয়ারছন্দে রচিত প্রচুর।
অন্য ছন্দে রচিলে ভাবার্থ হয় দূর।
এই হেতু যথার্থ মূলের সহ ঐক্য।
রচিয়াছি বিজ্ঞগণে করিবে কটাক্ষ॥
যদি তায় থাকে দোষ কর মোরে ক্ষম।
আছয়ে শাস্ত্রের কথা মুনি মতিভ্রম॥
অতএব কর কৃপা কটাক্ষাবলোকন।
কবি রামচন্দ্রে এই করে নিবেদন॥

উপরের উদ্ধৃত অংশে কবি তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'গৌরীবিলাস' হইতে 'অক্রূরসংবাদ' পর্য্যন্ত গ্রন্থের নাম ছাড়া ষষ্ঠী ও শীতলা সম্বন্ধেও গ্রন্থরচনার আভাস পাওয়া যাইতেছে; বোধ হয় ইহা ষষ্ঠীমঙ্গল ও শীতলামঙ্গল হইতে পারে। তদ্ভিন্ন 'অমরভাষা' বা অমরকোষের অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আয়ুতে কুলাইলে অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিতেও তাঁহার বাসনা ছিল দেখা যাইতেছে। কিন্তু 'কালীপুরাণে'র পরে তিনি অন্য কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, সে-সম্বন্ধে কোন সংবাদ এ যাবৎ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতেও এক খণ্ড 'কালীপুরাণ' আছে, তাহার প্রকাশকাল ১২৬২ সাল।

'কৌতুকসর্ব্বস্ব' ও 'আচার-রত্নাকরে'র কথা বাদ দিলে, কবির প্রায় সকল গ্রন্থই আমার

পুস্তক নহে,—কবির মৃত্যুর * পর প্রকাশিত প্রধানতঃ বটতলার সংস্করণ। এই কারণে সেগুলির সাহায্যে প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল পাইবার উপায় নাই। † তবে 'নলদময়ন্তী,' 'কর্ম্মবিপাক' ও 'চন্দ্রবংশ' যে ১৮৩০ সনের পূর্ব্বেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ১৮২৯ সনে মুদ্রিত পুস্তকাবলীর তালিকায় এই তিনখানি পুস্তক পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত বলিয়া সংবাদপত্রে উল্লেখ আছে। ‡

দ্রষ্টব্য

এই প্রবন্ধের অধিকাংশ মুদ্রিত হইয়া যাইবার পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের এক খণ্ড 'নলদময়ন্তী' পাওয়া গিয়াছে। ইহা ১২৩৪ সালে (১৮২৭ সনে) প্রকাশিত সংস্করণের পুস্তক। ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

শ্রীশ্রীপরমেশ্বর / শরণং। / **নলদময়ন্তী** উপাক্ষ্যণ। / অর্থাৎ / শ্রীযুক্ত নলরাজার কলি কত্রিক অক্ষক্রীড়া দ্বারা রাজ্যচ্যুত / এবং / কলিপরিত্যাগানন্তর পুনঃরাজ্যাভিশিক্ত। / কলিকাতা। / মহেন্দ্রলাল প্রেষে ছাপা হইল, নম্বর ২৭, শাঁখারিটোলা / ১২৩৪ / [পৃ. সংখ্যা ২+৯২]

এই 'নলদময়ন্তী'খানি প্রথম সংস্করণের পুস্তক বলিয়াই মনে হইতেছে।§

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* "ইং ১৮৪৫ সালের ১৬ই জুন তারিখ দেওয়া একখানি দরখাস্ত দেখিলাম। রামচন্দ্র তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার প্রথমা পত্নী গৌরীমণি দেবী ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (মাধবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র) দ্বারিকানাথ মিলিয়া তাঁহার সম্পত্তির অধিকার পাইবার জন্য এই দরখাস্ত করেন ; সুতরাং বুঝা যায়, ইং ১৮৪৫ (বাং ১২৫২) সালের কাছাকাছি সময়ে রামচন্দ্র মারা যান।"—"রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র"—শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা", ৩য় সংখ্যা, ১৩৪০, পৃ. ১১৪।

† মুনশী শ্রীআবদুল করিম 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে' (১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫-৯৬) 'মাধব মালতী'র একখানি পুথির সন্ধান দিয়াছেন।

‡ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫।

§ ১৩৪৪।২৭এ আষাঢ়, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

"বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম ইংরাজী ব্যাকরণ"

(আলোচনা)

এই নামে একটি প্রবন্ধ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৪র্থ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এই প্রবন্ধে ১৮১৬ সনে রামচন্দ্র-বিরচিত বঙ্গভাষায় প্রকাশিত 'ইঙ্গ্লিষ দর্পণ' নামক ইংরেজী ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

(১) গ্রন্থকারের নাম শ্রীরামচন্দ্র। তাঁহার উপাধি কি ছিল, জানা যায় নাই ;

(২) রামচন্দ্র···"ইঙ্গলিষশাস্ত্রাভিলাসি বঙ্গদেশনিবাসি মহাশয়েরদিগের অনায়াসে ঐ শাস্ত্রের রীত্যবধারণ কারণ" ইংরাজী ব্যাকরণ বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম প্রকাশ করেন।

লেখকের এই দুইটি উক্তি সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে; সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

(১) 'ইঙ্গ্লিষ দর্পণ'-রচয়িতা "রামচন্দ্র" কে ছিলেন, তাঁহার উপাধিই বা কি ছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন নহে। পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখিতেছেন :—

শ্রীযুত কাম্পেনী বাহাদুরের সম্পর্কীয় কার্য্য সচিব বিবিধবিদ্যানিধান শ্রীমান জান মস্টর John Master. সাহেবের উপদেশক্রমে সেই ভূপাল চূড়ামণির সামদান দণ্ড ভেদ ইত্যাদি যন্ত্র নির্ম্মাণের আবেশনাধ্যক্ষ নানাশাস্ত্র বিশারদ বিশ্বকর্ম্মা শ্রীযুত ডাক্টর বিলেম কেরী Dr. W. Carey. সাহেবের প্রধান সর্বাধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অনুসেবক শ্রীরামসেবক কর্ত্তৃক দূরস্থ ইঙ্গ্লিষবিদ্যা সামীপ্যকারক ইঙ্গ্লিষ দর্পণ নামে দূরদর্শক অর্থাৎ দূরবীন নির্ম্মিত হইল—

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "অনুসেবক" রামচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সহকারী পণ্ডিত রামচন্দ্র রায়। এই কলেজের বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন ডক্টর উইলিয়ম কেরী এবং প্রধান পণ্ডিত ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।* রামচন্দ্র রায় ১৮০৩ হইতে ১৮১৬ সন পর্য্যন্ত মৃত্যুঞ্জয়ের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। ১৮১৯ সনে প্রকাশিত রোবাকের (**Roebuck**-এর) *The Annals of the College of Fort William* পুস্তকের পরিশিষ্টে (পৃ. ৫০) বাংলা বিভাগের পণ্ডিতগণের মধ্যে রামচন্দ্র রায়ের নাম আছে, এবং তিনি যে ১৮০৩ সনে কলেজে পণ্ডিতী কর্ম্মে প্রথম বাহাল হন, তাহারও উল্লেখ আছে।

জন্ মাষ্টারের উপদেশক্রমে রামচন্দ্র 'ইঙ্গ্লিষ দর্পণ' রচনা করেন। এই জন্ মাষ্টার এক জন সিভিলিয়ান ; দেশীয় ভাষা—বিশেষতঃ বাংলা শিখিবার জন্য ১৮১৩ সনের ২০ নবেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করেন এবং পর-বৎসর জুন মাসে কলেজ ত্যাগ করেন। † খুব সম্ভব, রামচন্দ্র তাঁহাকে বাংলা পড়াইয়াছিলেন।

---

* বাগবাজারে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের চতুষ্পাঠী ছিল ; সেখানে ১৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। – William Ward : *A View of the History, Literature, and Mythology of the Hindoos,* lv.

এই সকল কারণে রামচন্দ্র রায়কেই 'ইঙ্গ্লিষ দর্পণ'কার বলিয়া আমি মনে করি।

(২) ১৮১৬ সনে প্রকাশিত রামচন্দ্রের 'ইঙ্গ্লিষ দর্পণ'ই যে বাংলা ভাষায় "প্রথম" ইংরেজী ব্যাকরণ, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না; কারণ, ঠিক এই বৎসরেই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য-রচিত আর একখানি ইংরেজী ব্যাকরণ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। গঙ্গাকিশোরের ব্যাকরণের এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে। আমি তাহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি:—

A / Grammar, / in / English and Bengalee : / containing / what is necessary to the knowledge / of the / English Tongue. / To which is added / a / Translation of Words / from / one to three Syllables, / laid down in a plain and familiar way. / By Gungakissore, Bhutachargee. / Calcutta : / From the Press of Ferris and Co. / 1816. / [পৃ. সংখ্যা ২১৬]

এই ইংরেজী ব্যাকরণ বাংলায় প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গঙ্গাকিশোর লিখিতেছেন:—

শ্রীশ্রীদুর্গা

প্রতুলকর্ত্রী

এতদ্দেশীয় প্রায় অনেক বালকগণ ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ করিতে আরব্ধ করিয়া অত্যল্প কাল পরে তাঁহারদিগের উহাতে অলস তাচ্ছল্য এবং অশ্রেদ্ধা জন্মে তাহার কারণ এই অভিপ্রায় হয় যে বালকত্ব ধর্ম্ম হেতু তাঁহারদিগের বুদ্ধির তরলতা প্রযুক্ত ও মোনের চঞ্চলতা প্রযুক্ত ঐ ব্যাকরণের যে পাঠ তাঁহারদিগের গুরু ও বন্ধু জনেরা দেন তাহা মোনে রাখিতে পারেণ না অতএব শুৎরাং তাঁহারদিগের অলসাদি জন্মাইতে পারে যেহেতুক মনুষ্যেরদিগের মন যে বিষয় কঠীন্ এবং শ্রম সাধ্য হয় তাহাতে অক্লেশে প্রবিষ্ট হয় না বিশেষত বালকগণদিগের অতএব আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে ইংরাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের আপনার ভাষাতে সংগ্রহ থাকিলে যে সকল বালকেরা ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ করিতে বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারদিগের অতি শুসাধ্য হইতে পারে একারণ যথাসাধ্য এক সংক্ষেপ ইংরাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের সাধু ভাষাতে সংগ্রহ করা গেল...।

শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যেন
পরোপকৃতয়ে কৃতঃ—

দেখা গেল, ১৮১৬ সনে বাংলা ভাষায় দুইখানি ইংরেজী ব্যাকরণ প্রকাশিত হইয়াছিল; তবে কোন্‌খানি আগে এবং কোন্‌খানি পরে, তাহা আপাততঃ জোর করিয়া বলা যাইতেছে না।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য-বার্ত্তা

[যে জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সাধারণতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে, মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বঙ্গভাষায় নানা স্থানে প্রকাশিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, তথা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যাদিবিষয়ক সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 'সাহিত্য-বার্ত্তা' অংশে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। এই অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার সমসাময়িক মৌলিক আলোচনার নিখুঁত ইতিবৃত্ত করিয়া তুলিবার জন্য সাহিত্যিকবর্গের সহযোগিতা ও সাহায্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করা যাইতেছে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।]

সাহিত্য

গ্রন্থ

তারিণীচরণ মিত্র—ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত তারিণীচরণ মিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—৫। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা।

১৮০৩ সালে জন গিলক্রিস্টের তত্ত্বাবধানে 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট' নামে হিন্দুস্থানী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত ও রোমান অক্ষরে প্রকাশিত কতগুলি গল্পের বঙ্গানুবাদ অংশের বঙ্গাক্ষরে পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ।

বি. ভি. দাসগুপ্ত—Govinda's Kadcha : A Black Forgery. ১০, ঢোলাইগঞ্জ ষ্টেশন রোড হইতে এম. এন্. দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গোবিন্দ কর্ম্মকারের নামে প্রচলিত গোবিন্দদাসের কড়চা নামক গ্রন্থের অর্বাচীনতা ও কৃত্রিমতা প্রদর্শন।

প্রবন্ধ

শ্রীহেমন্তকুমার ভট্টাচার্য্য—সংস্কৃত সাহিত্য ও কাব্যপ্রকাশ। বঙ্গশ্রী, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৩৬৯-৩৭৪।

কাব্যপ্রকাশ নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অলঙ্কার-গ্রন্থের প্রতি উল্লাসের সংক্ষিপ্তসার।

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য—চণ্ডীদাসের কথা। বঙ্গশ্রী, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ১৮৮-৯২।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামক গ্রন্থের অসারতা ও অর্বাচীনতা প্রতিপাদন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—মঙ্গলোদয়। প্রবর্ত্তক, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৬০৪-৫।

[বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস প্রবন্ধে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৪২।৭) উল্লিখিত]

১২৬৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত মঙ্গলোদয় নামক সাপ্তাহিক পত্রের ১৪শ সংখ্যার বিবরণ।

শ্রীপ্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—অন্ধ কবি ৺কেনারাম নন্দী। প্রবর্ত্তক, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৬৪৮-৯।

শতবর্ষ পূর্ব্বে শ্রীরামপুরের অন্তর্গত চাতরা নামক স্থানে প্রাদুর্ভূত কেনারামের কবিত্বের পরিচয়।

শ্রীপুলিনবিহারী ভট্টাচার্য্য—শিলচর নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত হস্ত-লিখিত পুথির তালিকা।

বিষয়বিভাগানুসারে সজ্জিত বাংলা ও সংস্কৃত পুথিগুলির তালিকা ও স্থলবিশেষে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত—তামাকুমাহাত্ম্য। ভারতবর্ষ, মাঘ '৪৩, পৃঃ ২৭৮-২৮১।

রামপ্রসাদ নামক এক কবির রচিত তাম্রকূটের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যের বিবরণাত্মক ক্ষুদ্র বাংলা কাব্যের ১২০৮ সনে লিখিত পুথির সংস্করণ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী। শনিবারের চিঠি, মাঘ '৪৩, পৃঃ ৫৩৭-৬৬।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—তারিণীচরণ মিত্রের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী। শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ,৪৩, পৃঃ ৬৯১-৯৯।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ—টেক্‌নিকের অনুরূপ বাঙ্গালা। ভারতবর্ষ, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ৪২২-৩।

টেক্‌নিক শব্দের তাৎপর্য নির্দেশপূর্বক সম্পাদনা-শিল্প এই বাংলারূপ নির্ধারণ।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ—রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৬৩১-৫।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কলিকাতা শোভাবাজারের কালীকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত।

এম্, আশরফ হোসেন—শ্রীহট্টের নাগরী সাহিত্য। শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১।৯৭-৯, ১১৮-২৫।

সিলেটী নাগরীতে প্রচারিত সাহিত্যের লেখকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক। শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১।১০০-১১১।

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রকাশিত ও তৎকালে সমাদৃত এই পুস্তকের বিস্তৃত পরিচয়।

ইতিহাস

প্রবন্ধ

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাগৈতিহাসিক যুগ। ভারতবর্ষ, মাঘ '৪৩, পৃঃ ২৮৬-৮।

সঙ্গীতের উৎপত্তিসম্বন্ধে ভারতীয় মত নির্দেশ ও সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ভরতের মতানুসারে শার্ঙ্গদেব কর্ত্তৃক রচিত অর্বাচীন গ্রন্থ 'সঙ্গীতরত্নাকরে'র পরিচয়।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন—ভারতীয় চিত্রকলার দ্বৈতরূপ। ভারতবর্ষ, মাঘ '৪৩, পৃঃ ২৩২-৪০।

ভারতীয় চিত্রকলায় স্বাভাবিকতার নিদর্শন নিরূপণ।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বর্ম্মন্—মালদহে দ্বিতীয় গোপালদেবের তাম্রশাসন আবিষ্কার। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৬৩৮-৪০।

মালদহের জাজিলপাড়া গ্রামে নবাবিষ্কৃত এই তাম্রশাসনের পরিচয়।

মুহম্মদ এনামুল হক—বঙ্গে ইস্‌লাম বিস্তার। মাসিক মোহাম্মদী, মাঘ '৪৩, পৃঃ ২৬৩-৭০, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ৩২১-৮।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যে সমস্ত ধর্মপ্রচারক বাংলায় ইস্‌লাম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ—পিতাপুত্র। প্রবাসী, মাঘ '৪৩, পৃঃ ৫০৯-১৮।

বাঁটোয়ারার পর হইতে বিষয় সম্পত্তি ও দেনাপাওনা সম্বন্ধে রামকান্ত রায় ও জগমোহন রায় যে রামমোহন রায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিলেন, সরকারী চিঠিপত্র, জগমোহন রায়ের দস্তখতী চিঠিপত্র এবং অন্যান্য দলিলপত্র সাহায্যে তাহা প্রতিপাদন।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ—নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার। প্রবাসী, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ৬৮৪-৯২।

নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার ওরফে হরিহরানন্দনাথের সহিত রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিবরণ।

শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ—মহারাজ দিব্য। প্রবাসী, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৮৩৭-৪৩।

বঙ্গের পালবংশীয় রাজা মহীপালের সময় আবির্ভূত দিব্য বা দিব্বোকের পরিচয় ও কৃত কার্যের বিবরণ।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ—দাবা খেলার ইতিহাস। বঙ্গশ্রী, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ২২৭-৩২।

'চতুরঙ্গদীপিকা' নামক সদ্যঃপ্রকাশিত গ্রন্থ অবলম্বনে চতুরঙ্গক্রীড়ার বিবরণ ও ইহা হইতে বিভিন্ন দাবা-খেলার উৎপত্তি আলোচনা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন—প্রাচীন ভারতে ব্যবহারশাস্ত্র। ভারতবর্ষ, মাঘ '৪৩, পৃঃ ১৭৭-৮১; ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ৩৭৩-৭।

সংহিতা গ্রন্থে নির্দিষ্ট ব্যবহার বা মোকদ্দমার পদ্ধতি ও বর্তমান পদ্ধতির তুলনা মূলক আলোচনা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—বিক্রমপুরের প্রত্নসম্পদ্। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৫৭২-৬।

বিক্রমপুরের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত কয়েকটী প্রাচীন মূর্ত্তির বিবরণ।

দর্শন

গ্রন্থ

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—বেদান্তচন্দ্রিকা। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—৪। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা।

১৮১৭ সনে প্রথম প্রকাশিত বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তপ্রতিপাদক গ্রন্থের পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ।

প্রবন্ধ

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মিত্র—বাঙলার বাউল ও সহজিয়া সাধন। প্রবর্ত্তক, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ৫০৯-১২। বাউল। বিচিত্রা, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ২৯১-৩০১।

সহজিয়া সাধনের প্রকারভেদ ও মূল তত্ত্বনির্দেশ।

শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী—কঠোপনিষদের প্রতিপাদ্য। প্রবর্ত্তক, মাঘ '৪৩, পৃঃ ৩৯৫-৮।

কঠোপনিষদে অদ্বৈতবাদের ও জগন্মিথ্যাত্ববাদের কোনও সূচনা পাওয়া যায় না—পক্ষান্তরে ভক্তিবাদের আভাস পাওয়া যায়, এই মত প্রতিপাদন।

শ্রীশশিভূষণ দাস গুপ্ত—ভক্তিধর্মের বিবর্ত্তন। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৪৯৭-৫০৪।

ভাগবত তথা চৈতন্য প্রচারিত ভক্তিবাদের উপর দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বর্তমান, এই মত প্রতিপাদন।

শ্রীঅমূল্যকুমার নাগ—বার্কলীর দর্শন। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৬১৭-৮।

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক বার্কলীর মতবাদের বিবৃতি।

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—'স্বপ্ন' কি? বিচিত্রা, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ২৮৩-৮।

স্বপ্নের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীঅনিলবরণ রায়—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। বিচিত্রা, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ১৫৭-৬০।

গীতোক্ত আলোচ্য উক্তিটির তাৎপর্য্যনির্দ্দেশ।

বিজ্ঞান

প্রবন্ধ

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত—বঙ্গদেশের ভেষজ উদ্ভিদ্। প্রকৃতি ১৩।২৪৯-৬৪, ৩৩২-৪৫।

প্রবন্ধে উদ্ভিদ্গুলির বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম, প্রকৃতি, ঔষধে ব্যবহৃত অংশ, বাসস্থান ও ব্যাবহারিক গুণ উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীসুনীলবিহারী সেনগুপ্ত—ভিটামিনের রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণা। প্রকৃতি, ১৩।২৮৯-৪।

বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণ কর্তৃক কৃত গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র লাহা—স্থলজ উদ্ভিদের বিকাশ। প্রকৃতি, ১৩।২৯৪-৯৯।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিবরণ।

শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী—কৃষিকার্য্য-পরিচালনার আধুনিক প্রণালী। প্রবাসী, মাঘ '৪৩, পৃঃ ৪৯৯-৫০০।

শস্যক্ষেত্রে জলসংগ্রহ ও জলনিকাশন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোচনা।

শ্রীনীলরতন ধর—ভারতে কৃষির উন্নতি। প্রবাসী, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৮০০-৬।

ভারতে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক উপায় নিরূপণ।

শ্রীসহায়রাম বসু—কাষ্ঠধ্বংসী ছত্রাক 'পলিপোর'। প্রবাসী, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৮০৬-৮১০।

এই ছত্রাকের পরিচয় ও উহার আক্রমণ প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ।

শ্রীকমলেশ রায়—জড় ও শক্তির রূপ। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৬২১-৬২৬।

জড় ও শক্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতবাদের দিগ্দর্শন।

ভ্রম-সংশোধন

বর্ত্তমান সংখ্যার 'বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান' প্রবন্ধে (পৃ. ১৬৩-৭০) কয়েকটি ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে সংশোধন দেওয়া গেল।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৩	২২	'বাঙ্গালা পোর্ত্তুগীস'	'বাঙ্গালা-পোর্ত্তুগীস'
১৬৪	১	'Bengal'	'Bongal'
১৬৪	২৮	'gentleman'	'gentlemen'
১৬৪	৩২	'Seton'	'Seton-'
১৬৪	৩৩	'form Calculta'	'from Calcutta'
১৬৫	২০	'লার্ড'	'লাড'
১৬৫	২৭	'Sibu'	'Siboo'
১৬৫	৩২	'tootee nameh'	'Tooteenameh'
১৬৬	২৪	'list'	'lists'
১৬৭	২০	'E'	'C'
১৬৭	৩৪	'ইংরেজী-বাংলা'	'বাংলা-ইংরেজী'
১৬৮	১১	'আমারা'	'আমরা'
১৬৮	২৮	'works'	'work,'
১৬৮	৩২	'মার্চ্চ'	'মার্চ'
১৬৮	৩২	'বাঙ্গালা	'বাঙ্গলা'
১৬৯	৮	'fou'	'four'
১৬৯	২২-২৩	'ব্যঞ্জন বর্ণ'	'ব্যঞ্জনবর্ণ'

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[চতুশ্চত্বারিংশ ভাগ]

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড,

কলিকাতা।

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত।

চতুশ্চত্বারিংশ ভাগের

সূচীপত্র

—:০:—

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য

প্রথম বাঙালী সাংবাদিক

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যাঁহাদের আলোচনার বিষয় তাঁহাদের নিকট গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের নাম অপরিচিত নহে। বাঙালীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'বাঙ্গাল গেজেটি'ই বাঙালী-পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। দুঃখের বিষয়, গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে এ-পর্য্যন্ত বিস্তৃত আলোচনা হয় নাই,—উপকরণের অভাবই বোধ হয় তাহার কারণ। কিন্তু সেকালের সংবাদপত্রাদি সযত্নে অনুসন্ধান করিলে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য এখনও সংগ্রহ করা অসম্ভব নহে। নিম্নের সংগ্রহও প্রাচীন সংবাদপত্রাদি হইতে করা হইয়াছে।

শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানার কম্পোজিটর

গঙ্গাকিশোরের বাড়ী ছিল শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী বহরা গ্রামে। তিনি প্রথমে কম্পোজিটর-রূপে শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় প্রবেশ করেন। এইখানে তিনি ছাপাখানার কাজ বিশেষভাবে শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। শ্রীরামপুরে কিছুদিন চাকুরী করিবার পর তিনি স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিবার মানসে কলিকাতায় আসেন।

কলিকাতায় পুস্তক-বিক্রয়ের ব্যবসা

কলিকাতায় আসিয়া গঙ্গাকিশোর পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসায়ে হাত দিলেন। এদিকে তখনও কোন বাঙালীর নজর পড়ে নাই। শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

> এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথমোদ্যোগ কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে ইহা দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এত অল্প কালের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ছাপার কর্ম্মের এমত উন্নতি হইয়াছে। প্রথম যে পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার নাম অন্নদামঙ্গল শ্রীরামপুরের ছাপাখানার এক জন কর্ম্মকারক শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য তাহা বিক্রয়ার্থে প্রকাশ করেন। (৩০ জানুয়ারি ১৮৩০)

গঙ্গাকিশোর প্রথমে ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানায় বাংলা বই ছাপিতে সুরু করিলেন ; তন্মধ্যে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' উল্লেখযোগ্য ; ইহাই বোধ হয় ছাপার হরফে প্রথম সচিত্র বাংলা পুস্তক। ইহা ছাড়া স্বরচিত দুই-তিনখানি পুস্তকও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তকের বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। গঙ্গাকিশোরের প্রকাশিত পুস্তকগুলির কাটতি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল ; তিনি কলিকাতায় একটি আপিস ও বইয়ের

দোকান খুলিলেন। একটি বিশেষ উপায়ে পুস্তকের ব্যবসায়ে তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইয়াছিল। তিনি বাংলা দেশের প্রধান প্রধান শহর ও পল্লীগ্রামে প্রতিনিধি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; তাহারাই তাঁহার পুস্তকগুলির বিক্রয় বাড়াইয়া দিয়াছিল।

কলিকাতায় দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

দেশীয় লোকদের মধ্যে বাবুরাম নামে এক জন হিন্দুই সর্ব্বপ্রথম খিদিরপুরে দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ ছাপিবার জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র আনুমানিক ১৮০৬-৭ সনে * স্থাপন করেন। তাঁহার ছাপাখানা সংস্কৃত যন্ত্র নামে পরিচিত ছিল। বাবুরাম এক জন সারস্বত ব্রাহ্মণ, নিবাস মীর্জ্জাপুরের ত্রিলোচন ঘাটে।† এই ছাপাখানার মুদ্রাকর ছিল মদন পাল নামে এক জন সদ্গোপ।

বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্রটি ১৮১৪-১৫ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্রজভাষার মুন্শী লল্লুলাল কবি নামে এক জন গুজরাটী ব্রাহ্মণ কিনিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে।‡ লল্লুলালের ছাপাখানাও সংস্কৃত যন্ত্র নামে পরিচিত ছিল, এবং পূর্ব্বোক্ত মদন পালই তাহার

---

* ১৮০৭ সনেও খিদিরপুরে বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে; ইহা কোলব্রুকের আজ্ঞায় মুদ্রিত, বিদ্যাকর মিশ্রের সূচিসমন্বিত 'অমরকোষ'। 'হেমচন্দ্রকোষ'ও এই সনে বাবুরাম কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮০৮ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ৭ম বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষে ভিজিটর-রূপে লর্ড মিণ্টো যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্র সম্বন্ধে এই অংশটি আছে:—

A printing press has been established by learned Hindoos, furnished with complete founts of improved Nagree types of different sizes, for the printing of books in the Sunskrit language. This press has been encouraged by the College to undertake an edition of the best Sunskrit Dictionaries, and a compilation of the Sunskrit rules of Grammar. The first of these works is completed, and with the second, which is in considerable forwardness, will form a valuable collection of Sunskrit Philology. It may be hoped, that the introduction of the art of printing among the Hindoos, which has been thus begun by the institution of a Sunskrit press, will promote the diffusion of knowledge among this numerous and very ancient people ;...... (Roebuck : *Annals* etc., p. 155.)

† ১৮১৪ সনে প্রকাশিত লল্লুলাল কবি-সঙ্কলিত 'সভাবিলাস' নামক হিন্দী পুস্তকের শেষে বাবুরামের এই পরিচয় পাওয়া যায়।

‡ এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে। প্রথমতঃ উভয় মুদ্রাযন্ত্রের নামের সাদৃশ্য; বাবুরামের যিনি মুদ্রাকর ছিলেন, সেই মদন পালই লল্লুলালেরও মুদ্রাকর ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ১৮১৪ সনের জানুয়ারি মাসে মুদ্রিত লল্লুলাল কবি-সঙ্কলিত 'সভাবিলাস' ছাড়া বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্রে তৎপরবর্ত্তী কালে মুদ্রিত অপর কোন পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তৃতীয়তঃ লল্লুলাল কবির সংস্কৃত যন্ত্রে ১৮১৫ সনে (সংবৎ ১৮৭২) তুলসীদাসের 'বিনয়পত্রিকা' নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হয়; এই ছাপাখানায় তৎপূর্ব্বে মুদ্রিত আর কোন পুস্তকের সন্ধান এখনও পাই নাই।

মুদ্রাকর ছিলেন।* সংস্কৃত বা হিন্দী পুস্তক ছাড়া বাংলা পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থাও লল্লুলাল করিয়াছিলেন। তাঁহারই মুদ্রাযন্ত্রে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রথম গ্রন্থ 'জ্যোতিষ-সংগ্রহসার' ১৮১৭ সনের জানুয়ারি মাসে মুদ্রিত হয়। এই পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় আছে :—"শ্রীযুল্লল্ল্ কবীশ্বরস্য সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রীমদন পালেনাঙ্কিতম্"। লল্লুলালের সংস্কৃত যন্ত্র পটলডাঙ্গায় অবস্থিত ছিল।

তখন পর্য্যন্ত কোন বাঙালীই মুদ্রাযন্ত্র-প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন নাই। বাংলা বই ছাপিতে হইলে তখন লালবাজারে হিন্দুস্থানী প্রেস, ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস, ডি রুজার, অথবা শ্রীরামপুর মিশনরীদের ছাপাখানার শরণাপন্ন হইতে হইত। গঙ্গাকিশোর একটি বাংলা মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপনে অগ্রণী হইলেন। পুস্তকের ব্যবসায়ে তিনি পূর্ব্বেই কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন; তাহার উপর এই কার্য্যে স্বগ্রামবাসী হরচন্দ্র রায়কে অংশীদার-রূপে পাওয়ায় তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন; এই হরচন্দ্র রায় রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গঙ্গাকিশোরের মুদ্রাযন্ত্রটি—সম্ভবতঃ বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত বলিয়া—'বাঙ্গালি প্রেষ', বা 'বাঙ্গালা যন্ত্র' নামে পরিচিত ছিল, এবং ইহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮১৭ সন বলিয়া মনে হইতেছে।†

বাঙালী-পরিচালিত প্রথম সংবাদপত্র

মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের পর গঙ্গাকিশোরের দৃষ্টি পড়িল সংবাদপত্র-প্রকাশের উপর। তিনি দেখিলেন, এ যাবৎ কেহই বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন নাই। বাঙালীর একখানি বাংলা সংবাদপত্র হইলে অনেক পাঠক জুটিতে পারে। গঙ্গাকিশোর ও তাঁহার অংশীদার হরচন্দ্র রায় 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়া ইংরেজী সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করিলেন :—

---

* ১৮০২ সনে লল্লুলাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে ব্রজভাষার মুন্শী নিযুক্ত হন। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, ১৮২৪ সনে চাকুরি হইতে বিদায় লইয়া আগ্রা ফিরিবার সময় তিনি মুদ্রাযন্ত্রটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। গুজরাটী হইলেও তিনি ও তাঁহার স্বজনবর্গ আগ্রা-গোকুলপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেন। ১৮২৫ সনে লল্লুলালের মৃত্যু হয়।

† রামমোহন রায়-কৃত কঠোপনিষদের অনুবাদ ১৮১৭ সনের আগষ্ট মাসে "বাঙ্গালি প্রেষে" মুদ্রিত হয়। এতদ্ভিন্ন ১৮১৮ সনের জুলাই মাসে রাধামোহন সেনের 'সঙ্গীততরঙ্গ' "বাঙ্গালি প্রেসে" মুদ্রিত হইয়াছিল; ইহার মুদ্রাকর যে গঙ্গাকিশোর ছিলেন তাহার প্রমাণ অন্যত্র পাওয়া যাইবে। অধিকন্তু গঙ্গাকিশোরের স্বরচিত 'ভগবদ্গীতা'র ভাষাঅর্থ "বাঙ্গালা যন্ত্রে" ১৮২৪ সনে মুদ্রিত হইয়াছিল। "বাঙ্গালি প্রেষ" গঙ্গাকিশোরেরই মুদ্রাযন্ত্র ছিল—এই অনুমান সত্য হইলে, উহা যে ১৮১৭ সনে স্থাপিত, তাহা মনে করা সঙ্গত হইবে; কারণ ১৮১৬ সনে নিজের মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় গঙ্গাকিশোর তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানায় মুদ্রণ করাইয়াছিলেন। পরে গঙ্গাকিশোর ও হরচন্দ্র রায় 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করিলে তাঁহাদের মুদ্রাযন্ত্রটি সাধারণতঃ "বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়" নামে পরিচিত হইয়াছিল।

HURROCHUNDER ROY begs leave to inform his Friends and the Public in general, that he has established a BENGALEE PRINTING PRESS, at No. 45, Chorebagaun Street, where he intends to publish a WEEKLY BENGAL GAZETTE, to comprise the Translation of Civil Appointments, Government Notifications, and such other Local Matter, as may be deemed interesting to the Reader, into a plain, concise, and correct Bengalee Language; to which will be added the Almanack, for the subsequent Months, with the Hindoo Births, Marriages, and Deaths.

Advertisement for insertion in this Gazette, will be received at 2 Annas per line. English and Persian, the same Price.

Gentlemen wishing to become Subscribers to this Weekly Publication will be pleased to send their Names to HURROCHUNDER ROY, at his PRESS, No. 45, Chorebagaun Street, where every information will be thankfully received.

The Price of Subscription is 2 Rupees per Month, Extras included.
Calcutta, 12*th May,* 1818.

এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হয় ১৪ই মে ১৮১৮ তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেটে'। খুব সম্ভব পরবর্ত্তী জুন মাসের প্রথমার্দ্ধে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয়। ইহা প্রতি-শুক্রবারে বাহির হইত। কাগজখানি প্রকাশিত হইয়া যাইবার পর ৯ জুলাই ১৮১৮ তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' হরচন্দ্র রায় আর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহাতে কার্য্যালয়ের ঠিকানা "১৪৫ নং চোরবাগান ষ্ট্রীট" দেওয়া আছে। ইতিমধ্যে ২৩ মে তারিখে শ্রীরামপুর হইতে মিশনরীরা 'সমাচার দর্পণ' নামে বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। মিশনরীরা দাবি করেন 'বাঙ্গাল গেজেটি'-প্রকাশের এক পক্ষ আগে তাঁহারা 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই দাবি সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও, স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙালী-কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত এবং কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্রের সম্মান 'বাঙ্গাল গেজেটি'রই প্রাপ্য। 'বাঙ্গাল গেজেটি' বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই, প্রায় এক বৎসর চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়। ইহার কারণ গঙ্গাকিশোরের সহিত তাঁহার অংশীদারের অবনিবনা। কাগজখানির প্রচার রহিত হইলে গঙ্গাকিশোর ছাপাখানাটি স্বগ্রাম বহরায় লইয়া যান। এই প্রসঙ্গে ১৮২০ সনে শ্রীরামপুরের ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রথম সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

The first Hindoo who established a press in Calcutta was Babooram, a native of Hindoosthan. . . He was followed by Gunga Kishore, formerly employed at the Serampore press, who appears to have been the first who conceived the idea of printing works in the current language as a means of acquiring wealth. To ascertain the pulse of the Hindoo public, he printed several works at the press of a European, for which having obtained a ready sale, he established an office of his own, and opened a book-shop. For more than six years, he continued to print in Calcutta various works in the Bengalee language, but having disagreed with his coadjutor, he has now removed his press to his native village. He appointed agents in the chief

towns and villages in Bengal, from whom his books were purchased with great avidity; and within a fortnight after the publication from the Serampore press of the Sumachar Durpun, the first Native Weekly Journal printed in India, he published another, which we hear has since failed.—"On the effect of the Native Press in India," pp. 134-35.

উপরিউদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইতেছে, গঙ্গাকিশোর একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং অংশীদারের সহিত অবনিবনার ফলে তিনি ছাপাখানাটি স্বগ্রামে লইয়া গিয়াছিলেন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে গঙ্গাকিশোরের মৃত্যু হয়। ১৮৩১ সনের ৬ জুন তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশ :—

৺গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য যিনি প্রথম অন্নদামঙ্গল পুস্তক ছবি সহিত ছাপা করেন…।

গঙ্গাকিশোরের মৃত্যুর পরেও অনেক দিন যাবৎ তাঁহার "বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ে"র অস্তিত্ব ছিল। ১৭৬৬ শকে (=১৮৪৪ সনে) মুদ্রিত 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ॥ প্রকৃতিখণ্ড॥ তদ্ভাষা রামলোচন দাস কর্ত্তৃক পদ্যছন্দে বিরচিত' পুস্তকের আখ্যাপত্রে আছে :—"গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যমহাশয়স্য বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ে শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়স্যানুমত্যানুসারে ছাপা হইল বহরা গ্রামে"।

হরচন্দ্র রায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গঙ্গাকিশোরের সহিত পৃথক্ হইবার কিছু দিন পরেই তিনি নিজে কলিকাতায় একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। সরকারী দপ্তরে প্রকাশ, ২১ এপ্রিল ১৮২৩ তারিখে বাংলায় একখানি 'অ্যান্নুয়েল অ্যালম্যানাক্' বা বার্ষিক পঞ্জিকা বাহির করিবার জন্য তিনি "মুদ্রাকর ও প্রকাশকরূপে ৯ নং আড়পুলি, কলিকাতা হইতে" লাইসেন্সের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন; আরও জানা যায়, এই বার্ষিক পঞ্জিকার স্বত্বাধিকারী ছিলেন হরচন্দ্র রায়, সিমুলিয়া-নিবাসী মদনমোহন মিস্ত্রী ও মদনগোপাল মজুমদার। নব-প্রবর্ত্তিত প্রেস আইনের জন্যই সরকারের অনুমতি লওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল।

হরচন্দ্র রায়ের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত একখানি পুস্তক সম্প্রতি আমি দেখিয়াছি। ইহা ১৮২৪ সনে প্রকাশিত রামরত্ন ন্যায়পঞ্চানন-রচিত 'ভগবতী গীতা'। পুস্তকখানির শেষ কয় ছত্র এইরূপ :—

মুদ্রিত হইল শেষে কলিকাতার একদেশে
শ্রীযুৎ হরচন্দ্র রায়ের আপিষে।
ছাপা হইল আড়কুলি তার নাম পশ্চিমে কালির ধাম
খ্যাত দত্তপুরী পূর্ব্ব পাশে॥

১৮২৫ সনে "মোং আড়পুলি শ্রীহরচন্দ্র রায়ের প্রেসে" যে-সকল পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল তাহারও তালিকা পাওয়া যায়।*

---

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ৮২ দ্রষ্টব্য।

গঙ্গাকিশোরের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

গঙ্গাকিশোর অনেক প্রাচীন গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ, এবং নিজেও কোন কোন গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের যেগুলির সন্ধান বা উল্লেখ এ-যাবৎ পাওয়া গিয়াছে তাহার একটি তালিকা দিলাম :—

(১) ১৮১৬ সনে গঙ্গাকিশোর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' (পৃ. সংখ্যা ৩১৮) প্রকাশ করেন। ইহার এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে। ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮১৬ তারিখের 'গবর্ম্মেণ্ট গেজেট' পত্রে এই পুস্তকের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> মে° ফেরিস এন কোম্পানি সাহেবের
> ছাপা খানায় সিঘ্র প্রকাষ হইবেক
> অন্নদা মঙ্গল ও বিদ্যা সুন্দর পুস্তক
> অনেক পণ্ডিতের দ্বারা শোধিয়া শ্রীযুত
> পদ্মলোচন চুড়ামণি ভট্টাচার্য্য* মহাস
> য়ের দ্বারা বর্ন্ন সুদ্ধকরিয়া উত্তম বাঙ্গলা
> অক্ষরে ছাপা হইতেছে পস্তকের প্রতি
> উপক্ষণে একং প্রতিমুত্তি থাকিবেক মুল্য
> ৪ টাকা নিরূপণ হইল জাহার লইবার
> ইচ্ছা হয় আপন নাম ঐ ছাপাখানায়
> কিম্বা এই আপিষে শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর
> ভট্টাচার্যের নিকট পাঠাইবেন ইতি—

---

* পদ্মলোচন চূড়ামণি নদীয়ার এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিত। তিনি কিছু দিনের জন্য ভারতে আগত প্রথম ব্যাপটিষ্ট মিশনরী জন্ টমাসের পণ্ডিত ছিলেন। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৭৯৫ তারিখে মদনাবতী হইতে লিখিত একখানি পত্রে জন্ টমাস লিখিয়াছিলেন :—

I have a pundit to assist me in the translation, whose name is Podo Loson, a native of that famous metropolis of Bengal Learning, Nuddea.—*Periodical Accounts*...i. 205.

টমাসের জীবনীপাঠে জানা যায়, পদ্মলোচন চূড়ামণি একটি ইংরেজী খ্রীষ্টসঙ্গীতের অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন (C. B. Lewis : *The Life of John Thomas,* 1873, p. 276.) অনূদিত সঙ্গীতটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> হে স্বর্গের স্তবা প্রভু খ্রীষ্ট।
> অবিরাম তোমার গুণের তেজ।
> স্বর্গ ও মর্ত্যলোকের রাজ
> নাম তোমার লইতে কেন লাজ।

> খ্রীষ্টনামে লজ্জা জন্মিলে।
> হউক সন্ধ্যার তারা দর্শনে।
> অমৃত কিরণ তেজে তার।
> মোর মনস্তম তাড়িবার।

এই পুস্তকে ৬ খানি চিত্র আছে ; প্রায় সবগুলিই লাইন-এনগ্রেভিং। চিত্রের ব্লকগুলি রামচাঁদ রায়ের (হরচন্দ্র রায়ের আত্মীয় ?) তৈয়ারি। ইহার পূর্ব্বে আর কোন সচিত্র বাংলা বই এখনও আমার নজরে পড়ে নাই। পুস্তকের আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

> Oonoodah Mongul, / exhibiting / the / Tales / of / Biddah and Soonder. / To which is added, / The / Memoirs / of / Rajah Prutapadityu. / Embellished / with Six Cuts. / Calcutta : / From the Press of Ferris and Co. / 1816. /

(২) ১৮১৬ সনে গঙ্গাকিশোর আরও একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহা বাংলা ভাষায় একখানি ইংরেজী ব্যাকরণ ; কেহ কেহ ইহাকে বাঙালীর লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন। পুস্তকের আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

> A / Grammar, / in / English and Bengalee : / containing / what is necessary to the knowledge / of the / English Tongue. / To which is added / a / Translation of Words / from / one to three Syllables, / laid down in a plain and familiar way. / By Gungakissore, Bhutachargee. / Calcutta : / From the Press of Ferris and Co. / 1816. / [পৃ. সংখ্যা ২১৬]

এই ইংরেজী ব্যাকরণ বাংলায় প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গঙ্গাকিশোর লিখিয়াছেন :—

> এতদ্দেশীয় প্রায় অনেক বালকগণ ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ করিতে আরব্ধ করিয়া অত্যল্প কাল পরে তাঁহারদিগের উহাতে অলস তাচ্ছল্য এবং অশ্রেদ্ধা জন্মে তাহার কারণ এই অভিপ্রায় হয় যে বালকত্ব ধর্ম্ম হেতু তাঁহারদিগের বুদ্ধির তরলতা প্রযুক্ত ও মোনের চঞ্চলতা প্রযুক্ত ঐ ব্যাকরণের যে পাঠ তাঁহারদিগের গুরু ও বন্ধু জনেরা দেন তাহা মোনে রাখিতে পারেণ না অতএব শুৎরাং তাঁহারদিগের অলসাদি জন্মাইতে পারে যেহেতুক

খ্রীষ্টার্থে লজ্জা জন্মিলে।
হউক রাত্রির লাজ মধ্যাহ্নেতে।
য়িশু পোহাতি তেজোময়।
দর্শনে মনস্তম যায়।
কি লাজ সে প্রিয় বন্ধুতে।
মোর কষ্টে পূর্ণ মুক্তি হয়।
নয় লজ্জিত হইলে লজ্জা এই।
মোর অধিক প্রেম না হওনেতে।

খ্রীষ্টার্থে লজ্জা উচিত হয়
মোর দোষে আপন যদি নয়।
অভাব ভয় ক্রন্দন অপমান।
ও কাম্য মঙ্গল প্রাণের ত্রাণ।
তা নহিলে হত্যা তারক নাম।
মোর দর্প হবে অনুপাম।
মোর বড় আহ্লাদ তুষ্টি এই।
মোরার্থে য়িশু লজ্জিত নহে।

তাঁর বিধিতে প্রবৃত্ত হই।
তাঁর দুখ্ খ লজ্জা সর্ব্ব লই।
তাঁর বাক্য বলি সর্ব্ব ঠাঁই।
তাঁর আজ্ঞা মাননে নির্ভয়।

—'য়িশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত'।—প্রথম ইংগ্রণ্ডীয় স্বর। ১৫শ গীত। (পৃ০ ১৮-১৯)

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে, ১৮০১ সনের মে মাসে পদ্মলোচন চূড়ামণি মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে ডক্টর উইলিয়ম কেরীর অধীনে এক জন সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই কর্ম্মে তিনি অনেক দিন নিযুক্ত ছিলেন।

মনুষোরদিগের মন যে বিষয় কঠীন্ এবং শ্রম সাধ্য হয় তাহাতে অক্লেশে প্রবিষ্ট হয় না বিশেষত বালকগণদিগের অতএব আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে ইংরাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের আপনার ভাষাতে সংগ্রহ থাকিলে যে সকল বালকেরা ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ করিতে বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারদিগের অতি সুসাধ্য হইতে পারে একারণ যথাসাধ্য এক সংক্ষেপ ইংরাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের সাধু ভাষাতে সংগ্রহ করা গেল…।

শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যোন
পরোপকৃতয়ে কৃতঃ—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ঠিক এই বৎসরেই (১৮১৬) রামচন্দ্র-রচিত 'ইঙ্গ্লিষ দর্পণ' নামে বাংলা ভাষায় আর একখানি ইংরেজী ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়।* এই রামচন্দ্র ছিলেন—রামচন্দ্র রায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন সহকারী পণ্ডিত।

(৩) গঙ্গাকিশোর "ভাষাঅর্থসহ" একখানি 'ভগবদ্গীতা' প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮২৪ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে। তাহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

শ্রীশ্রীহরিঃ ॥ / শ্রীভগবদ্গীতা ॥ / ॥ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ / অষ্টাদশ অধ্যায় সংস্কৃত মূলগ্রন্থ ॥ / [এবং] গদ্যরচিত ভাষা অর্থ সংগ্রহ ॥ / শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যোন প্রকাশিত ॥ / বাঙ্গালা যন্ত্রে / দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল ॥ / মোকাম বহরা ॥ / সন ১২৩১ সাল / [পৃ. সংখ্যা ২১৬]

(৪) "কলিকাতার বাহিরে মোং বহেড়াতে শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যকৃত দ্রব্যগুণ ভাষা" ১৮২৪ সনে প্রকাশিত হয়।†

(৫) রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে 'চিকিৎসার্ণব' নামে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের একখানি পুস্তক পাইয়াছি। ইহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি। আখ্যাপত্রে পুস্তকের প্রকাশকালটি কীটদষ্ট, তবে ছাপা দেখিয়া মনে হয় ১৮২০ সনের কাছাকাছি ইহা মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীদুর্গা / শহায় / ॥ চিকিৎসার্ণব ॥ /। নাড়ীজ্ঞান নিরুপণ। / ॥ জ্বরলক্ষণ ॥ / পাঁচন ও ঔষধাদি / এবং / দ্রব্যাদি শোধন প্রকরণ / মুদ্রাঙ্কিত হইল / কলিকাতা / ……
[পৃ. সংখ্যা ৬ নির্ঘণ্ট+২+৭২]

পুস্তকের গোড়ার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ; ইহা হইতে গ্রন্থকারের নামধাম জানা যাইবে :—

গুরুপদে রাখি মতি বন্দোদেব গণপতি তুষ্টা হন ভগবতি তবে অতি শীঘ্রগতি পুরে অভিলাস ॥ জগৎ জননি যারে তুষ্টা হন এ সংসারে সেজন সকল পারে অনাআসে করিতে প্রকাশ ॥ চিকীৎসার্ণব নাম গ্রন্থ অতি গুণধাম চিন্তা করি অবিরাম দেখি চিত্ত হবে চমকিৎ। ভাষায় কোমলমিষ্টি গ্রন্থ যে নুতনসৃষ্টি কিছুদিন করি দৃষ্টি মুর্খ বৈদ্য হইবে পণ্ডিৎ ॥

---

* 'ইঙ্গ্লিষ দর্পণ' ও তাহার রচয়িতা সম্বন্ধে ১৩৩৯ সালের ৪র্থ সংখ্যা এবং ১৩৪৩ সালের ৪র্থ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' দ্রষ্টব্য।

নাড়িপ্রকাশানুসারে যদি নাড়ী বোধ করে চিকীৎসা করিতে পারে এ কারণে নাড়ীজ্ঞানে করি নিরূপিত॥ না থাকিলে নাড়ীবোধ হবে কেন রোগবোধ মূর্খ বৈদ্য করে ক্রোধ বিষবড়ি দিয়া করে হিতে বীপরীৎ॥ ব্যাধিতে পীড়িত লোক নানামতে পায় শোক তার কিছু করি রোগ উপায় কারণ॥ বৈদ্যকের শাস্ত্রমত পাচনাদি আছে কত তার মধ্যে সার যত এই গ্রন্থে করি নিরূপণ॥ যে জ্বরে যে অধিকার বিস্তারিয়া কব তার সত্তাকার উপগার হবে অতিশয়॥ ঔষধী নানামত বিস্তারিয়া কব কত অল্পে করি গুণশত শাস্ত্রমত করিব নির্ণয়॥ সুরধনি তিরে ধাম ধন্য সে বহরাগ্রাম গঙ্গাকিশোর নাম দ্বিজদিন অতি॥ চন্দ্রতেজ করি চুর তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর ভুবনে দ্বিতীয়শূর মহারাজা তাঁর অধিকারেতে বসতি॥ গ্রন্থে কোন থাকে ভুল গুনিগণ দিবে কুল দোষছাড়া নাহি মূল সাধুজনে আছয়ে প্রকাশ॥ অল্প দোষে সুধাকরে কি করিতে পারে তারে গঙ্গাধর ধরে শিরে অন্ধকার ঘোরতরে অনায়াসে কর‍য়ে বিনাশ॥

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক (১৮১৯-২০) রিপোর্টের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে (পৃ. ৪০-৪৬) এদেশের মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর একটি দীর্ঘ তালিকা আছে। ইহা হইতে গঙ্গাকিশোরের ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তকগুলির নাম উদ্ধৃত করিতেছি :—

Gonga- bhoctee- toronginee
Lukhmee choritro
Betal-poncho-bingsoti

Title unknown {
Translation of the Vedant—Rammohun Roy
Do of Ishopunishud Do
Do of Kenopunishud Do
On the common actions and ceremonies of life.
}

Chanokya (slok)
Songit-toronginee

ইহা ছাড়া বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত ভগবদ্গীতার পদ্যে অনুবাদ ১২২৬ সালে (=১৮১৯) "বাঙ্গালগেজেটি আফিশে ছাপা" হইয়াছিল।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি পীতাম্বর মিত্র ও জনমেজয় মিত্র

প্রায় দুই বৎসর হইল, ডক্টর সুকুমার সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৈষ্ণব-গীতিকবিতা সম্বন্ধে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানির নাম *A History of Brajabuli Literature.* ইহার ৩৩১-৩২ পৃষ্ঠায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের কবিগণের মধ্যে স্বনামধন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রপিতামহ পীতাম্বর মিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। এই বিবরণপাঠে জানা যায়, পরমবৈষ্ণব পীতাম্বর ব্রজবুলী ও বাংলায় কতকগুলি বৈষ্ণব-গীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রচিত চারিটি কবিতা তৎপৌত্র জনমেজয় মিত্রের 'সংগীত রসার্ণবে' স্থান পাইয়াছে।* কিন্তু 'সংগীত রসার্ণব' সংগ্রহ করিতে না পারায় সুকুমার বাবু স্বীয় গ্রন্থে পীতাম্বরের অথবা জনমেজয়ের রচনার নিদর্শন প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার, রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি ও উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে 'সংগীত রসার্ণব' আছে। পুস্তকখানির পৃ. সংখ্যা ৭৬; ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

> সংগীত রসার্ণব। / অর্থাৎ / সদা শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ মননার্থে। / অভিসারাদি রসোদধির / সংক্ষেপ পদ রত্ন / — / কীর্ত্তন প্রণালী মতে চলিত ভাষায় / সঙ্কর্ষণ ভোগ অর্থাৎ পুষ্পিকায় / স্বীয় মনঃ সন্তোষার্থে / শ্রীজনমেজয় মিত্র কর্ত্তৃক রচিত / এবং প্রকাশিত হইল। / কলিকাতা শুঁড়া। / — / কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে / শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং, দ্বারা বাহির মৃজাপুর, ১৩ সংখ্যক ভবনে মুদ্রিত। / — / শকাব্দাঃ ১৭৮২। /

'সংগীত রসার্ণব' পুস্তকের ৭-৮ পৃষ্ঠায় পীতাম্বরের চারিটি কবিতা আছে; দুইটি ব্রজবুলীতে এবং দুইটি ভাষায় রচিত। কবিতা চারিটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"নিবেদন।

মত্ পিতামহ ৺বৃন্দাবনবাসি তদ্রজোভিলাষি ভক্তি-সিদ্ধান্তাভ্যাসি ৺মহারাজ পীতাম্বর মিত্র বাহাদুর মহাশয় কৃত ব্রজ ভাষায় এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় কবিতা এবং পদ সকলের মধ্যে কএকটী এতদ্গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণার্থে এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। ব্রজ ভাষায় পীতম এবং ভাষায় পীতাম্বর ভোগ অর্থাৎ পুষ্পিকায় দৃষ্টি করিবেন।

---

* 'বিশ্বকোষে'র "রাজেন্দ্রলাল মিত্র" প্রবন্ধে পীতাম্বর মিত্র ও জনমেজয় মিত্র সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ('গৌরপদতরঙ্গিণী', ভূমিকা পৃ. ২৫৫-৫৬) এবং ডক্টর সুকুমার সেনের গ্রন্থে এই বিবরণটিই উদ্ধৃত হইয়াছে।

ব্রজ ভাষার বৃন্দাবন স্মরণ।

বৃন্দাবন পুঞ্জোঁ কুঞ্জোঁ দিন্ রাত্ বৃন্দাবন তন মন জাপ ত্রিতাপহারণ বৃন্দাবন হিঁ।
তাকো রজ্ নাহেঁা মেরো ভইয়া মইয়া কাম গইয়া সুবুদ্ধি বৃন্দাবন হিঁ॥
আচারিজ্ বৃন্দাবন মান প্রাণ বৈষ্ণ বৃন্দাবন ভাগ ভরণ রতন বৃন্দাবন হিঁ।
পীতম সপুত বৃন্দাবন কাজ সাজ লাজরাখো বৃন্দাবন অবতো বিচার সার এহি বৃন্দাবন হিঁ॥১॥

ব্রজ ভাষায় বলদেবজীর রূপ এবং গুণ বর্ণন।

গোয়াল্ বাল্ মিল্ তাল তোরে ধেনুকাসুর গাধ মারে এয়সে রোহিণী কুমার হেঁ।
দৈঁএত্ বীর প্রলম্ব গারে হস্তিনা ওঠায় ডারে দুর্য্যোধন কে মান্ তোডন্ বারে হেঁ॥
মোর পঙ্ক মুকুট বারে নীলপট বনমাল ধারে দুষ্টন্ কো নাশ করণ হারে হেঁ।
বারুণী মধ পান বারে শেষ নাগ ছত্র ধরে পীতম সো হমারে রাখবারে হেঁ॥ ১॥

ভাষায় শ্রীরাধিকার দধি বিক্রয়ার্থে মথুরায় গমন।

পরে প্যারী নীলাম্বর : প্রকাশিত জলধর : অলকা উজ্জ্বল মুখ শশী।
ভ্রু মানি ইন্দ্রের ধনু : সিন্দুরে উদয় ভানু : সখিগণ নক্ষত্র প্রকাশী॥
নয়ন চকোর সার : সৌদামিনী হেম হার : শিখে মতি বক পাঁতি যায়।
গজ কুম্ভ পয়োধর : বেণী শুণ্ড পীঠ পর : বাক্য রূপ সুধা বৃষ্টি তায়॥
কুণ্ডল পরায় কানে : দেব দ্বয় এক স্থানে : চন্দ্রার্কেতে সাজিল মণ্ডল।
নাসায় নোলক ঝোলে : জেন সুধা বিন্দু দোলে : চন্দ্র হৈতে পড়ে অনর্গল॥
সাজাইল নানা মতে : কানু মন হরে যাতে : দধির পসরা করে মাথে।
পীতাম্বর অল্প মতি : গোপীগণ যার গতি : পশ্চাতে ধাইয়া যায় সাথে॥

প্রশ্নোত্তর পদ।

ক্ষীর নীর বিভিন্নতা করে কোন জন। পর্ব্বত পৃথিবী পশু কে করে সৃজন॥
কোন বস্তু হয় ভাই স্বর্গ ভোগ কাম। বিষ্ণু মন্ত্রে উপাসক তার কিবা নাম॥
বৃষভানু নন্দ গৃহে কার জন্ম হয়। পঞ্চ প্রশ্নোত্তর কর যদি মনে লয়॥
আদি ক্রমে চারি কহি শুনহ বান্ধব। মরাল বিধাতা আর সুকৃতি বৈষ্ণব॥
পাঁচ প্রশ্নোত্তর হবে চারি মধ্যাক্ষর। ইহ লোকে পর লোকে সবার ঈশ্বর॥
ভনে কবি কৃষ্ণ পরিধান আখ্য দাস। পঞ্চ প্রশ্ন দয়া করি পূর্ণ কর আশ॥"

পীতাম্বরের পৌত্র এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা জনমেজয় মিত্র 'সঙ্কর্ষণ' ভণিতায় ব্রজবুলী ও ভাষায় যে-সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, 'সংগীত রসার্ণবে' তাহাই স্থান পাইয়াছে ; ইহা হইতে ভাষায় রচিত চৈতন্যদেব-বিষয়ক ৯টি পদ জগদ্বন্ধু ভদ্র তৎসঙ্কলিত 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সুকুমার বাবু তাঁহার গ্রন্থের ৩৬৮-৬৯ পৃষ্ঠায় উনবিংশ শতাব্দীর কবিগণের মধ্যে জনমেজয় মিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু 'সংগীত রসার্ণব' সংগ্রহ করিতে না পারায় ব্রজবুলীতে রচিত তাঁহার কবিতাগুলির নিদর্শন প্রকাশ করিতে পারেন নাই। জনমেজয়-কর্ত্তৃক ব্রজবুলীতে রচিত যে কয়টি কবিতা 'সংগীত রসার্ণবে' আছে, আমরা এখানে সেগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

[পৃ. ৯] ব্রজ ভাষায় প্রাতঃ স্মরণ পদ।

বিভাব।

রাধা কৃষ্ণ রূপ মনরে প্রেমসে নেহারো। তন মন ধন আপনা সব বাহিপনেছারো॥
আপনা২ কহতে জাকো বাকো দূর ডারো। রাধা২ কৃষ্ণ২ রাত দেন পুকারো॥
মোহনী স্বরূপ অরু কৌন মন বিচারো। সঙ্কর্ষণ রাধা শ্যাম পরতু মন কো বারো॥ ১॥

বিভায।

ভোর ভয়ো মনুয়া মেরা জয় গোপাল বোলো। পঙ্খিগণ রাম বোলে তুতি মুহকো খোলো॥
কেঁও অচেত সোতে ভাই রাম কহকে ডোলো। ঘটতে জাতে গিন্তিকে দেন কৃষ্ণ বোলে মোলো॥
সৎ অসৎ জান বুঝ দ্রর্ব্ব মোলো তোলো। সঙ্কর্ষণ ব্রজমে যায় খুব রজমে রোলো॥ ২॥

শ্যাম রটো মন শ্যাম ভজো শ্যাম সে প্রিত লগাও জী।
শ্যাম বিনা কো জগমে আপনা ভাই হমরা বতাও জী॥
শ্যাম পিতা ভাই ও মাতা বেটা উসিকো বনাও জী।
সঙ্কর্ষণ সদা চিতকো লগায়ে শ্যাম নাম তুম গাও জী॥ ৩॥

পিতম পিয়া মেরো পিয়ারা প্রাণ নেছারুঁ তায়।
জোঁ পাবক পেখে পতঙ্গ তাকো প্রেম কহায়।
পাপ পুণ্য পরকা প্রসঙ্গ ছোড়ো পিতম পায়।
সঙ্কর্ষণ আশা পুরে পিতম কো জো পায়॥ ৪॥

রাম কেও মেঞ জগমে আয়া মনকা জনম কো অকারত পায়া
মায়া মোহমে চিতকো লগয়া বেটা ভাই অরু লোগাই তায়া॥
[পৃ. ১০] দেখা ভালা উসে খুব উঁচায়া আপন কিসিকো নেহি দেখায়া।
সঙ্কর্ষণ কেও লোগ হঁসায়া রাম ভজো ভাই ছোড়ো মায়া॥ ৫॥

দাউসে মন চিত্ত কো লাগায়ো মিত্র ওহি আপনা দাউ হেয় ।
লোভ কর কেঙ দৌড়ে হেয় ভাই দাতা ওহি আপনা দাউ হেয় ॥
ধন ইহ্ ন আপনা বেটা ন আপনা কোই না আপনা দাউ হেয় ।
সঙ্কর্ষণ ইহ ধৰ্ত্তি ন আপনি খালি ওহ্ আপনা দাউ হেয় ॥ ৬ ॥

দর্শন দাউজী করকে আস মিটে ন ভরকে ।
করে উহ্ ডর কিসি নরকে যম ভাগে জিসে ডরকে ॥
শরণ উঙ্কে যো ন সরকে মরে কভু ন উহ মরকে ।
সঙ্কর্ষণ ছোড় চিন্তা পরকে দাউ রটাকর মুহ্ ভরকে ॥ ৭ ॥

[পৃ. ১৩] ব্রজভাষায় শ্রীবলদেবজীর জন্ম যাত্রা ।   বাধাই ।

আজু ব্রজ মে ভই হেয় বাধাই । দাউ জনম শুনি গোপী চলি ধাই ॥
মাতু রোহিনী গোদ লিয়ে শিশু প্যার করত মুখ চাই ॥
আনদ উৎসব নন্দ করত হেঁয় অরু যশোমতি মাই ॥
ধার বার সব নাচত গাওত কুদত মঙ্গল গাই ॥
মাখন হৰ্দ্দি দধি উর ডারত মটকে ভর ভর লাই ।
করবে নেছাওর মনধন লেকর সঙ্কর্ষণ ঠাডহি যাই ॥

[পৃ. ১৪] ব্রজভাষায় শ্রীবলদেবজীর রূপ ।

শঙ্খতেঁ সোপেদ রূপ, বলাদাউকি সরূপ, তাহে নীলপট পহরে হেঁ ।
মোতেন্ কে পহরে হার, শের মুকুটকে বাহার, হাথ হল মুষল ধরে হেঁ ।
গলে বৈজয়ন্তি মাল, মধ পিয়ে আঁখে লাল, শরণ্ শেষ নাগকো লিয়ে হেঁ ।
চলে ধৰ্ত্তি লগে কাপ, দেখে বীর লগে হাঁপ, কান এক কুণ্ডল দিয়ে হেঁ ॥
রৈবত্ কুমারী সাথ, রেবতী কি প্রাণনাথ, রূপ অরু ছবিকে নেহাল হেঁ ।
শোভা ন কহত জাত্, জেতেহি কহিয়ে বাত্, সঙ্কর্ষণ কি আশ্রে দয়াল হেঁ ॥

দাউ কি ঝাঁকি বড়িবাঁকি, দেখে কছু নরহে বাকি, মুরত এয়সি মোহনী হেঁ ।
মুহি পাগ শর ধরে, নীলপট কটিপরে, কুন্দসি রূপ শোহাবনি হেঁ ॥
হল মুষল শোভে করে, কান এক কুণ্ডল ধরে, বাঁকি ছবি অঙ্গ চাহনি হেঁ ।
বারুণীপি আঁখে লাল, অলবেলি লটকেঁ বাল, আধিং সঙ্কর্ষণ কি বোলনি হেঁ ॥

[পৃ. ১৫] ব্রজভাষায় নন্দোৎসব। বাধাই মল্লার জয় জয়ন্তি।

ব্রজমে বাজে বাধাই। নন্দজী ঘরভয়ে কুবর কানাই॥ ধ্রু॥
গোপী অভূষণ পহনি চলতি হেঁ ঘুন ঘুনঘুঙ্গরু বজাই॥
গোপী যশোমতী গোদ বালক্ দেখ লেত বলাই।
গোয়াল মটকে দহি মক্ষণ লেকর নন্দজী ভেটন যাই॥
নাচত গাওত কোই দহি ডারত আনদ ধুম মচাই।
সঙ্কর্ষণ ঠাঢ়হি সবতেঁ মাঙ্গত লাল দেখা মুঝে মাই॥ ১॥

[পৃ. ১৬] ব্রজভাষায় শ্রীগোপালজীর বাল্যলীলা।

খেলেঁ গোপাল লাল, আনন্দ সরুপ বাল, বাল ভাব নন্দকে অঙ্গণ মেঁ।
ঘোটনোকে বলচলেঁ, আধি আধি বোলি বোলেঁ, ভাগে কভিগেরে দেখিয়ে ছনমেঁ॥
দেখে জোসোলেহি ভাগে, চন্দ্র কোহিলেনে মাগেঁ, তোড়ে ফোড়ে উসে যোপায়ে খেলন মেঁ।
মাখন অরু দহি মাই, দেতিহেঁয় সুখ পাই, খায়ে কছু ফেঁক দে ভবন মেঁ।
গোপীযোঁ কহে বজাই, নাচো কুবর কানাই, থাই থাই নাচেঁ তলন মেঁ।
সঙ্কর্ষণ অরু কানাই, খেলতে হেঁ দোনোভাই, ছাইরূপ সঙ্কর্ষণ দৃগণ মেঁ॥

[পৃ. ৫৫-৫৬] ব্রজভাষায় উত্তর গোষ্ঠ। গৌরী।

গোধন্ চরায়ে আয়ে কুবর কানাই। সখাঘেরি চৌদিগে আগে চলে ভাই॥
গোরজ শোভে অঙ্গ বালোপ ছাই। মাথে পগড়ি বিচ ফুলেঁ লগাই॥
কানন কুণ্ডল কদম ঝুলাই। হাত লকড়ি বন্সী ফুকত যাই॥
বন্সী শুনত গোপী দেখন আই। মোহন দেখ সুধ বুধ খোয়াই॥
যশোমতী আগেবঢি লেত বলাই। দীপকি থালি লিয়ে আরতী গাই॥
ঘর ঘর আরতী গোপী বজাই। ভায়োকি জোড়ি সঙ্কর্ষণ মন ভাই॥ ১॥

[পৃ. ৬৮] ব্রজভাষা ঝুলন। মল্লার কয়ালী তাল।

শাবণ তিজ সোহায়নি আই। প্যারিজী সাথ ঝুলে হেঁ কানাই॥
সখিগণ ঘেরত দেত ঝকোরা কোই উপজে সুর কোই বজাই॥
অতর গোলাব কোই ডারত কোই লিয়ে ফুলোঁকি হার পহরাই।
বাদর গরজত দামিনী চমকত বরষত বুঁন্দ ঘটা দিশা ছাই॥
শুনত কড়ক হিয়া কাঁপই ডরকে চৌক ছপে প্যারী পিয়া গলে যাই।
কহত সঙ্কর্ষণ প্যারী দুলারী ডরকি ডরাবন রহে কোঁ ডরাই॥ ১॥

জনমেজয় মিত্র আরও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়; তন্মধ্যে দুইখানি আমার দেখিবার সুবিধা হইয়াছে। এখানে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

নারদ পুরাণোক্ত / অষ্টাদশ মহা পুরাণীয় / অনুক্রমণিকা। / শ্রীযুক্ত জনমেজয় মিত্র কর্ত্তৃক / অনুবাদিত। / কলিকাতা। / পুর্ণচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত। / শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ, প্রকাশক। / শকাব্দাঃ ১৭৭৭। /

মিত্র মহাশয় পুস্তকের ভূমিকা-স্বরূপ লিখিয়াছেন :—

পুরাণানুক্রমণিকা।—অর্থাৎ অষ্টাদশ মহাপুরাণীয় শ্লোক, পর্ব্ব, খণ্ড, ভাগ এবং উপাখ্যান নিরূপণ।

এতদ্দেশের প্রাচীন ধার্ম্মিক হিন্দু মহাশয়গণ স্বস্ব গৃহে অষ্টাদশ মহাপুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ করণে যত্নবান হইয়া থাকেন, কিন্তু কাল এবং দুর্দ্দৈব বশতঃ শাস্ত্র সকল লোপ হওয়াতে বহু ক্লেশেও সে আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া সুকঠিন, আর যে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া থাকেন তাহাও খণ্ডিত হইয়া উঠে, কারণ এমত কোন পুরাণানুক্রমণিকা প্রচলিত নাই যাহাতে কোন্ পুরাণে কত খণ্ড, কি২ পর্ব্ব, কিম্বা ভাগ এবং কি২ উপাখ্যান আছে তাহা জানিতে পারা যায়, এবং তদ্দৃষ্টে সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ হইতে পারে। যদিচ ভাগবতাদি শাস্ত্রে পুরাণের নাম এবং শ্লোক সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু তাহাতে কোন্ পুরাণে কি কি উপাখ্যানাদি আছে তাহা নিরূপিত হইতে পারে না, সুতরাং শ্লোক সংখ্যায় ঐক্য হয় না। একারণ দুষ্প্রাপ্য নারদ পুরাণ হইতে এতৎ অনুক্রমণিকা উদ্ধৃত এবং নানা পুরাণের সহিত ঐক্য করিয়া বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিলাম। ইহা দৃষ্টে বিষয়ি মহোদয় গণের পুরাণ সংগ্রহ করণের উপকার দর্শিতে পারিবেক, এবং কোন্ পুরাণে কত শ্লোক, পর্ব্ব, ভাগ, খণ্ড এবং কি২ উপাখ্যান আছে তাহা অনায়াসে বোধ হইবেক।

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এই পুস্তক আছে।

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতানুক্রমণিকা। / তদারম্ভে। / **নয়নাঞ্জন**। / অর্থাৎ / ভগবতভানু দর্শনাশক্ত দিবান্ধ জন গণের / জ্ঞানাঞ্জন স্বরূপ মহৌষধ। / তথাতদ্দ্বেষ রূপ মহান্ধ কূপ পতিত জনের / উদ্ধারোপযোগি জ্ঞানচক্ষুঃ প্রকাশক পুস্তক / নানা শাস্ত্র পুরাণ প্রমাণ এবং যুক্তি / যুক্ত প্রবন্ধ গৌড়ীয় ভাষায় / ভাগবত ভক্তগণের / প্রীতার্থে। / শ্রীজনমেজয় মিত্রের দ্বারা কলিকাতা / শুঁড়ায় সংগৃহীত হইল। / কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে / শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা বাহির মৃজাপুর, / চাশাধোবা পাড়ার ১৩ সঙ্খ্যক ভবনে / দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। / শকাব্দা ১৭৮১। /

এই পুস্তকখানির ৩০-৩২ পৃষ্ঠা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

দেবী ভাগবতোৎপত্তি কারণং যথা।

যৎকালে ৺মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর পুরাণ সংগ্রহ কারন তৎকালীন এতদ্দেশীয় মহাভারতীয় শ্লোক সংখ্যা গণনায় লক্ষ পরিপূর্ণ না হইবায় মহারাজ ৺শিবনাথ তর্কালঙ্কার ৺রামপ্রসাদ বাচস্পতি এবং ৺রামদুলাল চূড়ামণি এই ভট্টাচার্য্যত্রয়কে ৺কাশীধামে প্রেরণ করেন তাঁহারা তথায় যাইয়া দেবনাগরাক্ষর শিক্ষা করত লক্ষ শ্লোক সংগ্রহ পূর্ব্বক নাগরাক্ষরে মহাভারত লেখাইয়া সোধন করত আনয়ন করেন, এবং তৎ কর্ম্ম সাধনার্থে বারাণশীর কমিটির দেয়ান ৺দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়কে পত্র লিখেন, পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত গণ বারাণশীতে থাকিয়া বেদান্তাদি

শাস্ত্র পাঠ করত গ্রন্থ সংগ্রহ করেন এবং মহারাজকে লিপি প্রেরণ করেন যে সম্প্রতি কাশীধামে এক নূতন পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে তদ্বিবরণ এই প্রাগুক্ত মিত্র মহাশয় এক দিবস তত্রস্থিত সমস্ত পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন যে ভগবত্যাইদং ভাগবতং ইতিত্তনাশঙ্কনীয়ং ইহাতে বোধ হয় ভগবতীর চরিত্র বর্ণন যুক্ত ভাগবত পুরাণান্তর অবশ্য আছে আপনারা অনুগ্রহ পুরঃসর অনুসন্ধান করিয়া আনয়ন করুন। ইহাতে কেহই স্বীকার করিলেন না কেবল ৺রামচন্দ্র ঘুলিয়া নামক এক ব্যক্তি মহা কবিকল্প ছিলেন, তিনিই অঙ্গীকার করিলেন কিয়ত কালানন্তর তিনি শ্রীমদ্ভাগবতীয় সকল স্কন্ধাধ্যায় শ্লোকের অনুকরণ করিয়া ভগবন্মাহাত্ম্য স্থানে ভগবতীর চরিত্র বর্ণন পূর্ব্বক দেবী ভাগবত নামক পুরাণ রচনা করিয়া আনিয়া দেন তাহাতে মিত্র মহাশয় মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে যথেষ্ট পারিতোষিক দিয়া ঐ দেবী ভাগবত কাশীতে পারায়ণ করাইয়াছেন তদবধি উক্ত কল্পিত পুরাণ ক্রমশ সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়াছে ইত্যাদি। এক্ষণে এই বিবরণে যদি কোন মহাশয়ের সন্দেহ হয় তিনি পূর্ব্বোক্ত মহারাজের বংশধর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহাশয়ের সমীপে তত্ত্ব করিলে উল্লিখিত লিপি দেখিতে পাইবেন ইতি।

এই রূপ এক অকিঞ্চনের পিতামহ বৈকুণ্ঠ বাসী ৺রাজা পীতাম্বর মিত্র বাহাদুর মহাশয় যে সকল গ্রন্থ সঞ্চয় করেন তন্মধ্যে মহাভাগবত নামক গ্রন্থের পৃষ্ঠে লিখিত আছে যথা।

মহাভাগবত নামকো গ্রন্থঃ।

ইদং পুস্তকং ১৬৮৭ শকাব্দে গোকুল ঘোষাল নাম্না বিপ্রেণ বেরেলস্ নামক ম্লেচ্ছস্য অথবা ইংরাজস্য দেয়ানো ভূত্বা চট্টগ্রামে স্থিত্বা কেনচিদ্‌ব্রাহ্মণেন দ্বারা নবা সংগ্রহং কৃত্বা কলিকাতামধ্যে আনীতং এবং দুর্গাচরণ মিত্র মদন মোহন দত্তাভ্যাং সহ মন্ত্রণাং কৃত্বা গ্রন্থং প্রচলিতং কৃতবান। ইদং পুস্তকং নব্য কাব্য মিতি।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মল্লসারুলে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসন—সম্মুখ ভাগ

মল্লসারুলে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসন—পশ্চাদ্ভাগ

মল্লসারুলে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসন

এই তাম্রশাসন ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত গল্‌সি থানার অধীন দামোদর-তীরবর্ত্তী মল্লসারুল গ্রামে একটী প্রাচীন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আবিষ্কর্ত্তা ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশ্বর রায় উক্ত তাম্রশাসনখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌কে দান করিয়াছিলেন এবং তদবধি উহা পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত হইতেছে। স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ লিপির আংশিক পাঠ উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তীও ইহার কিছু পাঠ উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু এ যাবৎ তাম্রশাসনখানির সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত বা প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি আমাকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ উক্ত লিপির পাঠোদ্ধার করিবার এবং এতৎসম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার অনুমতি দান করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার ইংরাজী প্রবন্ধ প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্ত্তৃক 'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। তাম্রশাসনখানি মূল্যবান্ বিবেচনায় উহার সারমর্ম্ম সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি।

এক খণ্ড চতুষ্কোণ তাম্রফলকের দুই দিকে লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। ফলকখানি প্রায় ১০১/২" দীর্ঘ এবং ৬১/২" প্রস্থ। লেখার বাম দিকে, ফলকের এক প্রান্তে, একটী গোলাকার মুদ্রা বা শীলমোহর সংযুক্ত আছে। শীলমোহরের উপর একটী দণ্ডায়মান দ্বিভুজ পুরুষমূর্ত্তি এবং তাহার পশ্চাতে একটী চক্র উৎকীর্ণ রহিয়াছে। মূর্ত্তির নীচে 'মহারাজবিজয়সেনস্য' এই লিপি উন্নমিত অক্ষরে খোদিত হইয়াছে। ফলকের প্রথম পৃষ্ঠায় ১৫ ছত্র ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১০ ছত্র লিপি আছে। বঙ্গদেশে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে অক্ষর প্রচলিত ছিল, এই লিপির অক্ষর তাহার অনুরূপ। এইরূপ অক্ষর ফরিদপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগবান্ লোকনাথ, ধর্ম্ম এবং সাধুজনের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া এই লিপির আরম্ভ হইয়াছে। ২য় ও ৩য় ছত্রে এই শাসনখানি মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের রাজ্যকালে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। এই গোপচন্দ্র ও ফরিদপুর-তাম্রশাসনের মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। ৩য় হইতে ৫ম ছত্রে বর্দ্ধমানভুক্তির রাজকর্ম্মচারি-বর্গকে সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে। কর্ম্মচারিবর্গের আখ্যাগুলি যথাক্রমে এই :—কার্ত্তাকৃতিক, কুমারামাত্য, চৌরোদ্ধরণিক, উপরিক, ঔদ্রঙ্গিক, আগ্রহারিক, ঔর্ণস্থানিক, ভোগপতিক, বিষয়পতি, তদায়ুক্তক, হিরণ্যসামুদায়িক, পত্তলক, আবসথিক। ৫ম হইতে ৮ম পঙ্‌ক্তিতে এতদঞ্চলের মহত্তরগণ এবং অন্যান্য সম্মানার্হ ব্যক্তি-গণের নামোল্লেখ আছে ; যথা,—বক্কত্তকবীথীসম্বদ্ধ-অর্দ্ধকরক-অগ্রহারের মহত্তর হিমদত্ত,

অগ্রহারের মহত্তর যষ্ঠিদত্ত ও শ্রীদত্ত, কোড্ডবীর-অগ্রহারের ভট্টবামনস্বামী, গোধগ্রাম-অগ্রহারের মহিদত্ত ও রাজ্যদত্ত, শাল্মলিবাটকের জীবস্বামী, বক্কত্তকের খাড়্গি-হরি, মধুবাটকের খাড়্গি-গোইক, খণ্ডজোটিকার খাড়্গি-ভদ্রনন্দী, বিন্ধ্যপুরীর বাহনায়ক, হরি প্রভৃতি। ইঁহারা এবং 'বীথ্যধিকরণ' একযোগে এইরূপ ঘোষণা করিতেছেন :—"মহারাজ বিজয়সেন এই (বক্কত্তক) বীথীসম্বদ্ধ বেত্রগর্ত্তা গ্রামের অষ্টকুল্যবাপ-পরিমিত ভূমি আমাদিগের নিকট হইতে যথাযুক্তভাবে ক্রয় করিয়া পঞ্চমহাযজ্ঞ-প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত ঋগ্বেদান্তর্গত-বাহ্ব্‌চশাখাধ্যায়ী কৌণ্ডিন্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বৎসস্বামীকে প্রদান করিতে চাহেন। এই ধর্ম্মকার্য্যে পরমভট্টারকপাদের (অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের) পুণ্য অর্জ্জন হইবে এবং এই দানের প্রতিপালকরূপে আমাদিগেরও কীর্ত্তি ও শ্রেয়ঃ লাভ হইবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ করা হউক, ইহা অবধারিত হইল। তদনুসারে আমাদিগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক মহারাজ বিজয়সেনের নিকট হইতে মূল্যস্বরূপ প্রাপ্ত দীনার বীথীমধ্যে সম্যক্‌রূপে ভাগ করিয়া এবং আমাদিগের বেত্র-গর্ত্তা গ্রামে উক্ত অষ্টকুল্যবাপ হইতে যথোচিত দেয় উক্ত বীথীর তহশিলে অর্পণ করিয়া ভূমি গ্রহণ করিতে হইবে—ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়া উক্ত ভূমি মহারাজ বিজয়সেনকে প্রদত্ত হইল। তৎপরে তিনি ব্রাহ্মণ বৎসস্বামীকে তাম্রপট্টের দ্বারা উক্ত ভূমি দান করিলেন।" এই ভূমি ক্রয় ও দানের ব্যাপার ৮ম পঙ্‌ক্তি হইতে ১৪শ পঙ্‌ক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে। ১৪শ ও ১৫শ পঙ্‌ক্তিতে প্রদত্ত ভূমির সীমা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে,—পূর্ব্বে গোধগ্রাম, দক্ষিণে গোধগ্রাম, উত্তরে বটবল্লক অগ্রহার এবং পশ্চিমার্দ্ধে আম্রগর্ত্তিকা গ্রাম। এই ভূমি চতুর্দ্দিকে পদ্মবীজমালাঙ্কিত কীলকসমূহের দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছিল, এই কথা ১৫শ ও ১৬শ ছত্রে লিখিত আছে। তৎপরবর্ত্তী অংশে (১৭শ হইতে ২৪শ পঙ্‌ক্তিতে) এই দানের পক্ষে বাধা বা অপহরণ-জনিত পাপ ও প্রতিপালনজনিত পুণ্যের কথা সাতটী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ২৪শ পঙ্‌ক্তিতে এই তাম্রশাসনের দূতক শুভদত্ত ও লেখক সান্ধিবিগ্রহিক ভোগচন্দ্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পুস্তপাল-জয়দাস কর্ত্তৃক এই তাম্রশাসন 'তাপিত' হইয়াছিল, ২৫শ পঙ্‌ক্তিতে তাহার উল্লেখ আছে। এই ছত্রের শেষে তাম্রশাসনের তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে,—সংবৎ ৩, শ্রাবণ ২৭। এই তৃতীয় সংবৎসর সম্ভবতঃ মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের রাজ্যাব্দ।

ভূমিদাতা মহারাজ বিজয়সেন মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের অধীনস্থ কর্ম্মচারী বা সামন্ত ছিলেন দেখা যাইতেছে। এই বিজয়সেন ও কুমিল্লায় প্রাপ্ত মহারাজ বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসনের দূতক মহারাজ-মহাসামন্ত বিজয়সেন অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসনের তারিখ ১৮৮ গুপ্তাব্দ, অর্থাৎ ৫০৭ খৃষ্টাব্দ। বিজয়সেন বিভিন্ন সময়ে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে, বৈন্যগুপ্তের ও গোপচন্দ্রের অধীনে সামন্তপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সম্ভবতঃ বৈন্যগুপ্তের পরে গোপচন্দ্র রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ফরিদপুর হইতে বর্দ্ধমান জেলা পর্য্যন্ত তাঁহার

তাম্রশাসনে উল্লিখিত গ্রামগুলির অবস্থিতি বর্ত্তমানে নিরূপণ করা কঠিন; এ সম্বন্ধে কয়েকটী অনুমানমাত্র করা যাইতে পারে। মল্লসারুল গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত গোহগ্রাম তাম্রশাসনোল্লিখিত গোধগ্রাম হইতে পারে এবং মল্লসারুলের দক্ষিণস্থিত আমবহুলা গ্রাম (অর্থাৎ সীমাসীমি) সম্ভবতঃ প্রাচীন আম্রগর্ত্তিকার স্থানে বিরাজ করিতেছে। মল্লসারুল ও গোহগ্রামের মধ্যবর্ত্তী থাঁড়াজুলি খণ্ডজোটিকা নামে পরিচিত ছিল, এইরূপ প্রতীতি হয়। শাল্মলিগ্রাম বর্ত্তমানে হয় ত মল্লসারুলে পরিণত হইয়াছে। গোহগ্রামের পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চল সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে বক্কত্তকবীথী নামে পরিচিত ছিল। তাম্রশাসনের পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সম্মুখভাগ

১...(লো)কনাথঃ যঃ পুংসাং সুকৃতকর্ম্মফলহেতুঃ (।) সত্যতপোময়মূর্ত্তি-
র্ল্লোকদ্বয়সাধনো ধর্ম্মঃ (॥ ১) তদনু জিতদনৃভ(স্ত)লোভা জয়-

২ (স্তি) পরহিতার্থাঃ[১] নির্ম্মৎসরাঃ সুচরিতৈঃ পরলোকজিগীষবঃ সন্তঃ (॥ ২)
পৃথিবীং পৃথুরিব প্রথিতপ্রতাপনয়শৌর্য্যে মহারাজাধিরাজশ্রীগোপ-

৩ [চন্দ্রে] প্রশাসতি তদনুজ্ঞপ্তায়াং পুণ্যোত্তরজনপদাধ্যাসিতয়াং সততধর্ম্ম-
ক্রিয়াবর্দ্ধমানায়াং বর্দ্ধমানভুক্তৌ পূজ্যাম্বর্ত্তমানোপস্থিততং কার্ত্তাকৃতিক কু-

৪ মারামাত্যচৌরোদ্ধরণিকোপরিকৌদ্রঙ্গিকাগ্রহারিকৌর্ণস্থানিকভোগপতিকবিষয়-
পতিতদাযুক্তকহিরণ্যসামুদায়িকপত্তলকাবসথিকদেবদ্রোণীসম্ব-

৫ দ্ধাদীন্বিধিবৎসম্পূজ্য বক্কত্তকবীথীসম্বদ্ধার্দ্ধকরকাগ্রহারীণমহত্তরহিমদত্তঃ নির্ব্বৃত-
বাটকীয়মহত্তরসু(ব)র্ণ্ণযশা(ঃ) কপিস্থবাটকাগ্রহারীণ-

৬ মহত্তরধনস্বামি(মী) বটবল্লকাগ্রহারীণমহত্তরষষ্ঠিদত্তশ্রীদত্তৌ কোড্ডবীরাগ্রহারীণ-
ভট্টবামনস্বামি(মী) গোধগ্রামাগ্রহারীণমহিদত্তরাজ্য-

৭ দত্তৌ শাল্মলিবাটকীয়জীবস্বামি(মী) বক্কত্তকীয়খাড়্গিহরিঃ মধুবাটকীয়খাড়্গি-
গোইক(ঃ) খণ্ডজোটিকেয়খাড়্গিভদ্রনন্দি(ন্দী) বিন্ধ্যপুরেয়বাহনায়ক-

৮ হরিপ্রভু(ভূ)তয়ো বীথ্যধিকরণঞ্চ বিজ্ঞাপয়ন্তি (।) পূজ্যং[২] মহারাজ-
বিজয়সেনেন বয়মভ্যর্থিতা ইচ্ছেহ(য়)মেতদ্বীথীসম্বদ্ধবেত্রগর্ত্তাগ্রামে যুষ্মভ্যো য-

৯ থান্যায়েনোপক্রীয়াষ্টৌ কুল্যবাপান্ মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে
কল্পান্তরস্থায়িন্যা প্রবৃত্ত্যা পুত্রপৌত্রাম্বয়ভোগ্যত্বেন কৌণ্ডিন্যসগোত্রায়

---

১ এখানে বিলুপ্ত দুইটী অক্ষরের মধ্যে একটী অনুমান করা যাইতে পারে।

২ লেখকের ভ্রান্তিবশতঃ দুইটী 'ত' উৎকীর্ণ হইয়াছে। 'স্থিতত' না পড়িয়া

১০ বাহ্ন্ চবৎসস্বামিনো(নে) পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রবর্ত্তনায় প্রতিপাব(দ)য়িতুমিতি (।) যতোরস্মাভিরস্যাভ্যর্থ(ন)য়াবধৃতমস্তোযো(স্তৈযো)নুক্রমঃ[1] উভয়লোক-বিজিগীষুভি(ঃ)

১১ সাধুভিঃ ক্রিয়মাণপুণ্যস্কন্ধেষু শ্রীপরমভট্টারকপাদানাং ধর্ম্মষড়্‌ভাগেচযো-[2] স্মাকমপি প্রতিপালয়তাং কীর্ত্তিশ্রেয়োভ্যাং যোগঃ (।) উক্তঞ্চ (।) যঃ ক্রিয়াং ধর্ম্মসং-

১২ যুক্তাং মনসাপ্যভিনন্দতি (ব)র্দ্ধতে স যথেষ্টেব শুক্লপক্ষ ইবোডুরাট্ (॥ ৩) তৎ সম্পত্ত্যতামস্যাভিপ্রায় ইত্যস্মথা(দ্বা)রক্লতৈরনেন দত্তক-দীনারা(ন্) বীথ্যাং সম্বিভজ্যাস্মদ্বে(দ্বে)ত্র-

১৩ গর্ত্তাগ্রামেষ্টাভ্যঃ কুল্যবাপেভ্যো যথোচিতং দানং তদ্বীথীসমুদয় এব প্রনার্য্য[3] বোঢ়ব্যমিত্যবচূর্ণ্যাষ্টৌ কুল্যবাপা মহারাজবিজয়সেনস্য দত্তোঃ (দত্তাঃ)

১৪ ...পি[4] রাজ্ঞাস্মৈ কৌণ্ডিন্যসগোত্রায় বাহ্ন্ চবৎসস্বামিনে পঞ্চমহাযজ্ঞ-প্রবর্ত্তনায় তাম্রপ্র(প)ট্টেন প্রতিপাদিতা (ঃ ।) অথ চ[5] চৈষাং চতুর্ষু দিক্ষু সীমা ভবন্তি পূ-

১৫ (র্ব্বস্যাং দি)শি গোধগ্রামসীমা দক্ষিণ্যাং(দক্ষিণায়াং) গোধগ্রামা(ম) এব উত্তরস্যাং বটবল্লকাগ্রহারসীমা পশ্চিমস্যাং(পশ্চিমায়াং) দিশি অর্দ্ধেন আম্রগর্ত্তিকাসীমা কীলকাশ্চাত্র কমলা-

পশ্চাদ্ভাগ

১৬ ক্ষমালাঙ্কিতা চতুর্ষু দিক্ষু ন্যস্তা ভবন্ত্যেবমেষাং কৃতসীমাঙ্কানামস্য ব্রাহ্মণস্য পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রবর্ত্তনেনোপভুঞ্জানস্য ন

১৭ কেনচিদেতদ্বন্‌শ(দ্বংশ)জেনান্যতমেন বা স্বল্পপ্য(স্বল্পাপ্যা)বাধা হস্ত-প্রক্ষেপো বা কার্য্যঃ (।) এবমবধৃতে যোথ করোতি স বধ্যঃ পঞ্চভির্ম্ম-

১৮ হাপাতকৈঃ সোপপাতকৈঃ সংযুক্তঃ স্যাদপি চ নাস্য দেবা ন পিতরো হবিঃ-পিণ্ডং সমাপ্নু য়ুঃ [ছি]ন্নমস্তকবত্তালঃ অপ্র-

---

১ অস্ত্যেযোনুক্রমঃ ? ২ 'ধর্ম্মষড়্‌ভাগোপচয়ো' পড়িলে অর্থসঙ্গতি হয়।

৩ শুদ্ধ পাঠ সম্ভবতঃ 'প্রণায্য'।

৪ এখানে অনুমান তিনটীমাত্র অক্ষর বিলুপ্ত। সম্ভবতঃ 'অনেনাপি' পড়িতে হইবে।

১৯ তিষ্ঠঃ পতিষ্যতি (॥ ৪) ভূমিদানাপহরণপ্রতিপালনগুণদোস(ষ)ব্যঞ্জকাঃ আর্যাঃ শ্লোকা ভবন্তি (।) ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি

২০ স্বর্গে নন্দতি ভূমিদঃ (।) আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ (॥ ৫) আস্ফোটয়ন্তি পিতরঃ প্রবল্গন্তি পিতামহাঃ (।) ভূমিদো-

২১ স্মনৃকু(ৎকু)লে জাতঃ স নঃ সন্তারয়িষ্যতি (॥ ৬) যৎ কিঞ্চি(ৎ) কুরুতে পাপং নরো লোভসমা(ম)ন্বিতঃ (।) অপি গোচর্ম্মমাত্রেণ ভূমিদানেন শুধ্যতি (॥ ৭) পূ-

২২ র্ব্বদত্তাং দ্বিজাতিভ্যো যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির ভূমিং ভূমি(ম)তো শ্রেষ্ঠদানাচ্ছ্রেয়োনুপালনং (॥ ৮) ইয়ং রাজশতৈর্দ্দত্তা দীয়তে চ পুনঃ

২৩ পুনঃ (।) যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং (॥ ৯) তড়িত্তরঙ্গবহুলাং শ্রিয়ং মত্বা চ মর্ত্ত্যানাং (।) ন ধর্ম্মস্থিতয়-

২৪ সৃসন্তিঃ যুক্তা(ন্তির্যুক্তা) লোকে বিলোপিতুম্ (॥ ১০) কুল্য ৮ দূতকঃ শুভদত্তো লিখিতং সান্ধিবিগ্রহিকভোগচন্দ্রেণ

২৫ তাপিতং পুস্তপালজয়দাসেন (॥) সংব্বদ (সংবৎ) ৩ শ্রাব দি ২০ ৭

শ্রীননীগোপাল মজুমদার

গৌড়েশ্বরের আদেশে রচিত "বিদ্যাসুন্দর"*

বাঙ্গালী পাঠকগণ অবগত আছেন যে, শৈশবে বাঙ্গালা ভাষাকে নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছিল। এক দিকে ব্রাহ্মণগণ, অন্য দিকে গোঁড়া মুসলমান মৌলবীগণ বঙ্গভাষায় গ্রন্থ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ব্রাহ্মণেরা "সর্ব্বনেশে" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদকগণের জন্য ইহাঁরা রৌরব নামক নরকে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যে আঙ্গুলে বাঙ্গালা লেখা হইত, মুসলমান মৌলবী সাহেব পাপভয়ে সেই আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিবার ফতোয়া দিয়াছিলেন। এহেন দুঃসময়ে বঙ্গভাষা ঘটনাচক্রে গৌড়েশ্বরগণের সুনজরে পড়িয়া যায়। বস্তুতঃ গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহদানের ফলেই বঙ্গভাষা শৈশবে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছিল। গৌড়েশ্বরগণের সভাগৃহে স্থান লাভ করিতে না পারিলে বাঙ্গালা ভাষা শৈশবেই কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া মারা যাইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গৌড়ের সুলতানগণের মধ্যে অনেক বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্যানুরাগী নরপতি ছিলেন। তাঁহাদের সাগ্রহ প্রবর্ত্তনায় হিন্দু ও মুসলমান পণ্ডিতবর্গ হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুলতান শমসুদ্দীন ইউসুফ শাহের (রাজ্যকাল ১৪৭৪—১৪৮২ খৃঃ অব্দ) আদেশে জৈনুদ্দিন নামক মুসলমান কবি "রসুল-বিজয়" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুলতান হোসেন শাহ কুলীনগ্রামবাসী মালাধর বসুকে ভাগবতের অনুবাদ রচনায় নিযুক্ত করেন। তিনি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ করিলে সুলতান তাঁহাকে "গুণরাজ খাঁ" উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। হোসেন শাহের প্রশংসাদ্যোতক অনেক কবিতা বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হোসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ মহাভারতের একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন বলিয়া পরাগল খাঁর আদেশে রচিত মহাভারতে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কবি বিদ্যাপতিও নসিরা শাহ (সম্ভবতঃ উক্ত নসরত শাহ) এবং গৌড়েশ্বর "প্রভু গয়াস উদ্দীন সুলতানের" প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। নসরত শাহ যে প্রেমবিষয়ক সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন, বিদ্যাপতির পদে তাহার আভাস আছে। আমার আবিষ্কৃত একটি পদে এই সুলতান নসিরা শাহের সঙ্গীত-প্রিয়তার যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য পদটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

ধানশী বেলাবলী।

অ কি অপরূপ রূপের রমণী ধনি ধনি।
চলিতে পেখল গজরাজগমনী ধনি ধনি ॥ ধ্রু।
কাজলে রঞ্জিত ধনি ধবল নয়ান ভালে।
ভ্রমোরা ভোলল বিমল কমল দলে ॥

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের [illegible]

গুমান না কর ধনি ক্ষীণ অতি মাজাখানি
কুচগিরি ফলের ভরে ভাঙ্গি পড়িব যৌবনি ॥
সুন্দরী চান্দমুখি বচন বোলসি হাসি
অমিআ বরিখে জৈছে শারদ পূরণ শশী ॥
সেখ কবিরে ভণে অহি গুণ পামরে জানে
ছুলতান নাছির সাহা ভুলিছে কমল বনে ॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণও এক গৌড়েশ্বরের আদেশে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই "গৌড়েশ্বর" কে ছিলেন, কবি তাহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি উক্ত গৌড়েশ্বরের যে সভা-বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে মুসলমান-প্রভাব-বিশিষ্ট ছিল। তদীয় অমাত্যের "খাঁ" উপাধি হইতেও তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়।

অতঃপর আমরা বাঙ্গালী পাঠকগণকে একটি অশ্রুতপূর্ব্ব কথা বলিব। সুলতান নসরত শাহের পুত্র সুলতান ফিরোজ শাহও তদীয় পিতামহ ও পিতার মত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ও উৎসাহদাতা ছিলেন।

ফিরোজ শাহের আদেশে দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ-রচিত একখানি "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উহার দুইখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, দুইখানিই আদ্যন্ত খণ্ডিত। একখানির ২—৮ ও ২৭ সংখ্যক পত্রগুলি মাত্র বিদ্যমান। উহা ২১×৮ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজের দুই পিঠে পুথির আকারে লেখা। এই পুথিখানি অত্যন্ত প্রাচীন ও কীটদষ্ট। অপরখানির একটি মাত্র পত্র বিদ্যমান।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বন করিয়া অনেক কবিই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশের রচিত পুথির নাম "কালিকামঙ্গল" দৃষ্ট হয়। আমাদের দ্বিজ শ্রীধরের পুথিরও ঐ নাম ছিল কি না, খণ্ডিত পুথির সাহায্যে তাহা বলিবার উপায় নাই।

পুথির স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোক আছে। "মাধব ভাট রূপগুণং বিস্তার্য্য কথঅতি", "কন্যা কথঅতি" ইত্যাদিরূপ সংস্কৃত বাক্য-প্রয়োগও পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং পুথিখানি যে কোন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পুথিতে সুন্দরের পিতার নাম গুণসার ও মাতার নাম কলাবতী, রাজ্যের নাম বিজয়ানগরী রত্নাবতী। বিদ্যার পিতার নাম বীরসিংহ, মাতার নাম শীলা (দেবী), রাজ্যের নাম কাঞ্চী বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

কবির সময় বাঙ্গালা ভাষা "দেশী ভাষা" বা "প্রাকৃত ভাষা" নামে পরিচিত ছিল।

"সাবধান নরলোক পাএ জেন মতে।
দেসি ভাসে পদবন্ধে গাহি পরাকৃতে ॥"

নিম্নে কয়েকটি ভণিতা উদ্ধৃত করিতেছি,—

(১) নৃপতি নসির সাহা তনএ সোন্দর।
নাম ছিরি পেরোজ সাহা রসিক সেখর ॥

... ...

(২) নৃপতি নসির সাহা তনএ সোন্দর।
সর্ব্বকলা নলিনী ভুগিত মধুকর॥
রাজা শ্রী পেরোজ সাহা বিনোদ সুজান।
দ্বিজ ছিরিধর কবি রাজা পরমাণ॥

(৩) শীরি পেরোজ সাহা বিদিত জুবরাজ।
কহিল পঞ্চালি ছন্দে ছিরি কবিরাজ॥

(৪) রাজারাজস্বর তনএ সোন্দর
কর্ণ সম দাতা বিচক্ষণ।
শ্রীপেরোজ সাহা পঞ্চ গুণে অবগাহা
ছিরিধর কবিরাজে ভাণ॥

(৫) নৃপতি নসির সাহার নন্দনে
ভোগপুরে মেদনি মদনে।
রাজা শ্রীপেরোজ সাহা জান
ছিরিধর কবিরাজে ভাণ॥

প্রাগুদ্ধৃত তৃতীয় ভণিতায় পাঠকগণ দেখিতেছেন, ফিরোজ শাহ্ তখনও যুবরাজ মাত্র—রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। নসরত শাহের রাজত্বকাল ১৫১৯—১৫৩২ খৃষ্টাব্দ, আর ফিরোজ শাহের রাজত্বকাল ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ (কয়েক মাস মাত্র)। সুতরাং পুথিখানি ১৫৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নসরত শাহের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল, অনুমান করিতে হইবে।

দীনেশ বাবুর মতে কঙ্কের রচিত বিদ্যাসুন্দরই বঙ্গভাষায় রচিত বিদ্যাসুন্দর-কাব্যগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। রচনাকাল হিসাবে শ্রীধরের রচিত গ্রন্থটি সম্ভবতঃ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে।

লিপিকরের কল্যাণে এই নষ্টাবশিষ্ট পত্রগুলির উদ্ধারও একরূপ অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। যেখানেই হাত দেই, সেখানেই নানা প্রমাদ ও অপূর্ণতা দেখিতে পাই। পাঠকগণ তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত অংশগুলি হইতেই বুঝিতে পারিবেন। এ অবস্থায় অন্যান্য পুথিগুলির সহিত তুলনায় ইহার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিতে আমরা আপাততঃ অক্ষম।

কবি দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ গৌড়ের রাজসভায় থাকিতেন, আমরা এইমাত্র অনুমান করিতে পারি। তাঁহার বাড়ীঘর কোথায় ছিল, আমরা তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার রচিত গ্রন্থখানি চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও অক্ষত-দেহে থাকিতে পারে নাই;—ক্ষতবিক্ষত জীর্ণশীর্ণ কয়েকটি পত্রমাত্র সম্বল করিয়া, গৃহস্থের গৃহকোণে অযত্নে পড়িয়া থাকিয়া, চিরনির্ব্বাণ লাভের দিন গণনা করিতেছিল। লূতাতন্তু ও ধূলিরাশি ঝাড়িয়া পত্র কয়টি সংগ্রহপূর্ব্বক তৎসাহায্যে আজ বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকট এক মহানুভব নৃপতি ও এক বিস্মৃতনামা কবির কীর্ত্তিকাহিনী বলিতে পারিলাম বলিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি।

সেকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিত

১। প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, হরিনাভি

হরিনাভি-নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের নাম এখন হয়ত অনেকের নিকট তেমন পরিচিত নহে ; কিন্তু এমন এক সময় গিয়াছে, যখন তাঁহার যশের সৌরভ চারি দিকে ব্যাপ্ত ছিল। তিনি 'নাটুকে নারাণ' বা সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। প্রাণকৃষ্ণ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিকথা-পাঠে জানা যায়, তিনি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে মুগ্ধবোধ পড়াইতেন এবং কৃষ্ণকমল স্বয়ং তাঁহার শ্রেণীতে দুই বৎসর থাকিয়া মুগ্ধবোধের সন্ধি ও শব্দ শেষ করিয়াছিলেন। পত্রিকা-সম্পাদন ব্যাপারেও প্রাণকৃষ্ণ পটু ছিলেন ; ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' যোগ্যতার সহিত তিনি অনেক দিন সম্পাদন করেন।

প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের রচিত তিনখানি পুস্তক রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে পাইয়াছি ; তিনখানিই সংস্কৃতে রচিত এবং বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। এগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি :—

(১) শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাশতকং। ১৮৪৫। পৃ. সংখ্যা ১৫।

পুস্তকখানির আখ্যাপত্র এইরূপ :—

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাশতকং / সমাচার চন্দ্রিকা গ্রাহকাণাং / পারিতোষিকং / সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রেণ / মুদ্রিতং / শকাব্দাঃ ১৭৬৭ সনাব্দাঃ ১২৫২ / ১ বৈশাখঃ। /

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'অন্নপূর্ণাশতকং' হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

বদন্তি ত্বামেকে প্রকৃতিমপরে চাদিপুরুষং
পরে ব্যত্যাসক্তং তদুভয়মথান্যে মন্ত্রময়ীং।
চিদাধারং কেচিৎ পরমচিতিরূপাং তদিতরে
বিতর্কাম্বয্যেবং জননি গহনত্বাদ্বহুবিধাঃ ॥ ৩ ॥

সমাধায় শ্রদ্ধাং শ্রুতিষু বিমলান্তঃকৃতিতয়া
ভজন্তে যে কেচিদ্ ভগবতি যথা ত্বাং যদভিধাং।
তথা তেষাং ভক্তিপ্রকৃতিমুপলভ্যৈবহি তয়া

স্মরারেরানন্দার্ণবভবনলীলামণিময়ী
মুনীন্দ্রাণাং সম্বিৎসকলফলসম্পৎসুরতরুঃ।
প্রফুল্লীকর্ত্তুং নঃ কলুষিতমনঃকৈরবকুলং
ত্বমাসন্না রাশীকৃতসুকৃতকাশী শশিকলা ॥ ৫ ॥

পুরী নাম্না কাশী পুরমথিতুরানন্দবসতিঃ
কৃতান্তাৎ সংত্রাসং জননি শময়ন্তী সুবিপুলং।
অবিঘ্নং নির্ব্বাণং দিশতি মৃতিমাত্রং তনুভৃতাং
ত্বদীয়াধিষ্ঠানাদিদমতিরহস্যং ভজতি সা ॥ ৬ ॥

চিদাকারং যস্তে চরণযুগলং চিন্তিতবতী
মনীষা কৈবল্যং ঘটয়িতুমলং সংযমবতাং।
অতো বারাণস্যাঃ স্ফুটমিব দধত্যান্তদনঘে
বিমুক্তক্ষেত্রত্বং কিমিতি বত বিস্মাপকমিদং ॥ ৭ ॥ (পৃ. ১-২)

পুস্তকের শেষে গ্রন্থকার তাঁহার পরিচয় এই ভাবে দিয়াছেন :—

নিবসতি হরিনাভির্ভূসুরঃ শ্রীভবানীচরণশরণ এষ প্রাণকৃষ্ণোঽতিদীনঃ।
স্তুতিমতিরভিতঃ শ্রীঅন্নপূর্ণাপদাব্জং শতমরচয়দেতদ্‌যত্নতঃ শ্লোকরত্নং ॥
ইত্যন্নপূর্ণাশতকং শুভপ্রদং কৃতান্তসন্তাপনিতান্তবারকং।
পঠন্নরো নিত্যমনন্যচেতসা বিপদ্যতে নাত্র পরত্র চ ক্বচিৎ ॥ * ॥
ইতি শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদ্বিজবিরচিতং শ্রীঅন্নপূর্ণাশতকং সম্পূর্ণং ॥ * ॥
ওঁ তৎ সৎ ॥ ৩ ॥

(২) ধর্ম্মসভা বিলাস। ১৮৫০। পৃ. সংখ্যা ৪১।

ইহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীশ্রীদুর্গা। / জয়তি। / ধর্ম্মসভা বিলাস। / নামক চম্পূকাব্যস্য প্রথম খণ্ডং / চন্দ্রিকা গ্রাহকগণ পারিতোষিকার্থং / ধর্ম্ম সভানুজ্ঞানুসারতঃ / কলিকাতা নগরে / চন্দ্রিকাযন্ত্রেণ / মুদ্রিতং। / ১২৫৭ বঙ্গাব্দীয় ৩ বৈশাখঃ। /

'ধর্ম্মসভা বিলাস' সম্বন্ধে ১৮৫৯ সনে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' লিখিয়াছিলেন :—

"সংস্কৃত কলেজের পূর্ব্বতন অধ্যাপক ও সমাচারচন্দ্রিকা নাম সংবাদপত্রের বিখ্যাত সম্পাদক পণ্ডিতপ্রধান মৃত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্ম্ম সভাবিলাস নামে একখানি সংস্কৃত চম্পূ প্রকাশ করেন। তাহাতে তাৎকালিক ধর্ম্মোদ্দেশী ব্রহ্ম ও ধর্ম্ম সভা সংক্রান্ত মহাশয়দিগের চরিত্র

লইয়া অনেকগুলি ব্যঙ্গোক্তি বিন্যস্ত আছে। ঐ ব্যঙ্গ্য সকল সরস হইয়াছিল, কিন্তু সংস্কৃতে রচিত হওয়াতে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইতে পারে নাই।"—'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ', শকাব্দা ১৭৮০, চৈত্র, পৃ. ২০৮।

'ধর্ম্মসভা বিলাস' চারিটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ; প্রথম পরিচ্ছেদের নাম "সভানিদানং" (পৃ. ১-৭), দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম "সভাপ্রবন্ধ" (পৃ. ৭-২২), তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম "সভাবিবৃতি" (পৃ. ২২-৩০), এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম "বিবৃতিকদম্বকং" (৩০-৪১)।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ পুস্তকখানি হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা হইল :—

> অথৈকদা সদসি সম্পাদকঃ সভ্যান্ সবিশেষমবাগময়ৎ ভোঃ সভাধ্যক্ষাঃ সম্প্রতি কশ্চিৎ সিংহশাবকঃ ক্ষিপ্তো যত্নরক্ষিতমস্মাকং ধর্ম্মারণ্যমিদ-মুন্মূলয়িতুমুদ্যুক্তো দৃঢ়নিয়মকবাটমুদ্ঘাটয়তি প্রতিষেধং ন শৃণোতি যতঃ॥ সতাং সদুপদেশেষু মত্তো নৈব প্রবর্ত্ততে। বরং বিরুদ্ধমাদত্তে যথোন্মত্তো প্রদৃশ্যতে॥ সভ্যাঃ, সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ কিমিতি চাপল্যং। সম্পা,— দুষ্পরিহার্য্যত্বাৎ স্বভাবস্য, অতএব পঠন্তি তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্য ইতি। কিঞ্চ সম্ভবতি সর্ব্বং সঙ্গবশাৎ সংসর্গোহি প্রতিযোগিনমনুকুর্ব্বন্ শনৈস্তদ্ধর্ম্মাননুযোগিনমনুগময়তি ততশ্চ॥ বিস্মৃত্য স্বপরাক্রমং শিশুরসৌ সিংহস্য সাধারণৈরন্যারণ্যনিবাসিভিঃ পশুগণৈঃ সার্দ্ধং সদা ক্রীড়তি। তদ্দুঃ-যঙ্গকৃতাত্ত্বসাস্ত বিততির্নাদৃত্য জন্মান্তরং পেশস্কৃৎকৃমিবদ্বিধাস্যতি শনৈরস্যাপ্র তত্তুল্যতাং॥ তদস্ত তাবত্তদ্দমনমুচিতমিতি সভ্যৈর্ব্বহুধা বিবিচ্য তস্মিন্ সিংহার্ভকে সভায়াঃ পঞ্চমনিয়মোহবতারিতস্তৎপ্রকারোতিপ্রাড়ম্বরঃ॥ নিজ-জননিকুরম্বে নন্দলালো বিষাদং বিদধদবললম্বে মাথুরীং যর্হি লীলাং। হরিপুরমতিরম্যং তন্নবীনপ্রতিষ্ঠং প্রবিরচিতবিলাপং শোচ্যমুচ্চৈস্তদ-দাসীদিতি॥*॥ অথাসৌ সিদ্ধাশ্রমাদ্ধর্ম্মারণ্যাদপসারিতঃ সিংহো নির্ম্মুক্ত-বন্ধন ইব যত্র কুত্রচিৎ পরিভ্রমন্ যঞ্চ কঞ্চন সমীপবর্ত্তিনমাক্রম্য গ্রসিতুমারেভে ইত্যতো লোকে অয়ং সিংহো জনমেতমাক্রামত্যেনং গ্রসতীতি সর্ব্বত্র মহান্ কোলাহলো জাতঃ। হা ধিক্২॥ যোঽতিমান্যো মানভৃতাং সিংহো দেব ইবাদৃতঃ। ভবানীচরণত্যক্তঃ স এব স্মৃতিভীষণঃ॥ তদাস্তাং তস্য তাবস্তয়ঙ্করত্বাদস্পৃশ্যনামধেয়ত্বং যস্তেন গ্রস্তোঽন্যোপি যমাচক্রাম সোপি দারুণো বভূব প্রসিদ্ধং হি লোকে॥ দুষ্টকৃতপ্রসরণাৎ পশবঃ প্রমত্তা যান্ কানপীক্ষণ-গতান্ প্রসভং দশন্তি। দষ্টাশ্চ তে বিষপরিক্রমদোষদুষ্টা যঞ্চ স্পৃশেয়ুরুত সোপি ভয়ানকঃ স্যাৎ॥ (পৃ. ৩৮-৩৯)

(৩) শ্রীশিবশতক স্তোত্ররত্ন। ১৮৫৪। পৃ. সংখ্যা ৫৯।

ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

স্তোত্ররত্ন / নামক গ্রন্থ। / কলিকাতা নগরীয় গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পাঠশালার ব্যাকরণাধ্যাপক / শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক / রচিত হইয়া বিনামুল্যে ধার্ম্মিকগণে বিতরণার্থ / কাচরাপাড়া নিবাসি বৈকুণ্ঠবাসি বৈদ্যকুলোদ্ভব / গুরুপ্রসাদ রায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র / শ্রীযুত উমানাথ রায় মহাশয়ের / সম্পূর্ণ ব্যয় সাহায্যে / শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসুর বহুবাজারস্থ ১৮৫ নং ইষ্টানহোপ্ যন্ত্রালয়ে / মুদ্রাঙ্কিত হইল। / শকাব্দাঃ ১৭৭৬। /

এই পুস্তকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত এক শত শ্লোক ও প্রতি শ্লোকের নীচে বাংলায় অর্থ দেওয়া আছে। ইহার প্রথম দুই পৃষ্ঠা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।—

গ্রন্থাভাস।

অনির্ব্বচনীয় প্রযুক্ত নির্গুণ ব্রহ্মের বর্ণনাদি করা যাইতে পারে না কিন্তু সেই ব্রহ্ম যৎকালে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তখন সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী মায়ার প্রতি অবলোকনদ্বারা তদ্গুণাভাসে ভাসমান হইয়া ঈশ্বরসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন তৎপ্রতি তাহা অসম্ভব নহে এবং জীব তৎপ্রসাদাৎ নিখিল সন্তাপ মুক্ত হইয়া মুক্তিভাজন হইতে পারে এই বেদান্তসিদ্ধ সিদ্ধান্তানুসারে পরমশিবের সগুণ ব্রহ্মত্ব বর্ণনপূর্ব্বক স্তব করা যাইতেছে।

ওঁ নমঃ শিবায়॥ গুণাতীতেঽপীক্ষা গুণিনি
গুণময্যা গুণবশাদ্গুণীতিপ্রত্যুক্ত্যা গুণবি-
দনুশাস্তি শ্রুতিগণঃ। যতো নির্গুণ্যে
ক্বচিদপি ন বৃত্তির্গুণবিদামতস্ত্বাং সংস্তো-
তুং সগুণ বিগুণোঽপি প্রভবতি॥ ১॥

ব্রহ্মবস্তু স্বয়ং গুণাতীত হইয়াও গুণময়ী মায়ার প্রতি অবলোকন গুণে গুণী হন এই উত্তরদ্বারা গুণজ্ঞ বেদগণ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে অনুশাসন অর্থাৎ শিক্ষাপ্রদান করেন যেহেতু যাঁহারা গুণই জানেন তাঁহারা কখন নির্গুণ বস্তুকে সাক্ষাৎ প্রতিপন্ন করিতে পারেন না অতএব হে সগুণ হে গুণবন্, বিগুণ অর্থাৎ তমোগুণাক্রান্ত ব্যক্তিও বেদপ্রসিদ্ধ তোমাকে সগুণরূপে স্তবাদি করিতে সমর্থ হইতেছে॥ ১॥

মহৈশ্বর্য্যং যত্তেঽনপরজনসাধারণপরং
কুতর্কৈর্দুস্তর্ক্যং জগদনঘলীলাকুতুকিনঃ।
অনেনৈব ব্রহ্মন্নিশমনুমেয়োঽসি নিপু-

হে ব্রহ্মন্, তুমি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকরণাদি স্বরূপ সুচারু লীলা করিতে কৌতুকী হইয়া যে প্রচুর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছ যাহা অন্য কোন জনে সম্ভবে না এবং কুতর্কবাদি নাস্তিকেরা তর্ক করিয়া যাহা নির্ণয় করিতে পারে না নিপুণ জনেরা এই আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য দ্বারা তোমাকে নিরন্তর অনুমান করেন এবং প্রবোধের উদয়ে কেহ২ হঠাৎ জানিতেও পারেন ॥ ২ ॥

পুস্তকের শেষ শ্লোকটি অর্থসমেত উদ্ধৃত হইল :—

ইতি শিবশতকং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদ্বিজেন
ব্যরচি নিয়তনুত্নং স্তোত্ররত্নং সযত্নং।
সুবিহিতশিবপূজাপূর্ব্বমেতস্য পাঠা-
দখিলফলবিধাতা শ্রীশিবঃ প্রীতিমেতি ॥ ২ ॥
ইতি শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদ্বিজবিরচিতং শিবশতক-
স্তোত্ররত্নং সম্পূর্ণং।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণনামা বিপ্র শিবনাম মাহাত্ম্য প্রযুক্ত সর্ব্বদা নূতন এই শিবশতক স্তোত্ররত্ন যত্নপূর্ব্বক রচনা করিলেন, যথাবিধি শিবপূজা করিয়া এই স্তবের পাঠ করিলে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ স্বরূপ সকল ফলের বিধানকর্ত্তা শ্রীশিব প্রীতি প্রাপ্ত হন, সুতরাং তিনি প্রীত হইলে কোন ফলেরি অপ্রাপ্তি থাকে না ॥ ২ ॥

নির্গুণ সগুণ শিব শিব সর্ব্বময়।
করিলে শিবের সেবা সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
তাঁহার শতক স্তব সমাপ্ত হইল।
প্রাণকৃষ্ণ কহে সবে শিবশিব বল ॥

এই পুস্তকখানির সমালোচনাকালে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তৎসম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে ১২ অক্টোবর ১৮৫৪ তারিখে লিখিয়াছিলেন ঃ—

শ্রীশিবশতকস্তোত্র রত্ন।—সংস্কৃত কালেজীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত নামে এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন······ ভক্তিরসে পরিপূর্ণ কবিতা সকল অতি সুরচিত হইয়াছে আমরা সমস্ত পাঠ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কবিত্ব পাণ্ডিত্যের ধন্য ধ্বনি করিলাম, ··· ··· ইহার পূর্ব্বে বৈদিক কুলসর্ব্বস্ব, অন্নপূর্ণাশতক, ধর্ম্মসভা বিলাস চম্পু ইত্যাদি অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন তাহাতেও বিদ্যাসাগর কীর্ত্তিসাগর হইয়াছেন, পুনর্ব্বার এই রত্নদানে সাধারণের মর্ম্মস্থানে কীর্ত্তিরত্ন হইয়া রহিলেন...।

এই সমালোচনা-পাঠে আমরা 'বৈদিক কুলসর্ব্বস্ব' নামে প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের

প্রাণকৃষ্ণের আরও একখানি পুস্তকের নাম পাওয়া যাইতেছে; এখানি 'শরীরোৎ-পত্তিক্রম' নামে ৯ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা। ইহার প্রকাশকাল—"কলিকাতা ১৯১৭" (১৮৬০ সন)। পুস্তিকাখানি বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।

২। প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, পুঁড়া

প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের নিবাস ছিল বশিরহাট সবডিবিজনের পুঁড়া গ্রামে। তিনি পরে বরাহনগরে আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহার পিতা "পুঁড়া গ্রামনিবাসী ৺কন্দর্প সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় যিনি দেশবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় অতি বড় মানুষ ছিলেন"। * বিদ্যাবত্তায় পিতার সমতুল্য না হইলেও প্রাণকৃষ্ণের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল; সেকালের অনেক গণ্যমান্য লোকের—টাকীর কালীনাথ রায়-চৌধুরী, পাতুরিয়াঘাটা-নিবাসী দেওয়ান রামলোচন ঘোষ প্রভৃতির বাটীতে কর্ম্মকাণ্ডকালে প্রাণকৃষ্ণ অধ্যক্ষতা করিতেন। দেওয়ান রামলোচন ঘোষের অন্যতম পুত্র দেবনারায়ণ ঘোষের অনুরোধে প্রাণকৃষ্ণ একটি গঙ্গাস্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন; ইহা ১৮৪১ সনে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল।

পুস্তিকাখানির আখ্যাপত্র এইরূপ :—

> গঙ্গায়ৈ নমঃ / গঙ্গাস্তোত্রং। / বৈকুণ্ঠবাসি গুণরাশি দেবনারায়ণ ঘোষজ / বাবুর আদেশ ক্রমে / শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক রচিত ও / শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দনারায়ণ ঘোষজ / মহাশয়ের আদেশে / সম্বাদ ভাস্কর যন্ত্রালয়ে প্রকাশিত হইল / ১২৪৭ সাল শকাব্দাঃ ১৭৬২ / তারিখ ২৫ ফাল্‌গুণ /

গঙ্গাস্তোত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

মাতর্ম্মহেশ্বরশিরোবিলসত্তরঙ্গে-
হপাঙ্গেক্ষণামৃতরসপ্রণতার্ত্তিভঙ্গে।
তাপত্রয়াত্যয়বিধায়কসৎপ্রসঙ্গে
ত্বামাশ্রয়ে ভগবতীমভবায় গঙ্গে ॥ ১ ॥

যে ত্বাং স্মরন্তি বিলপন্তি নমন্তি যান্তি
তীরং ত্বদীয়মথবানিশমাশ্রয়ন্তি।
নীরং পিবন্তি তুহিনাদ্রিসুতেঽর্চয়ন্তি
সদ্যস্ততে পুররিপোঃ পুরমাবিশন্তি ॥ ২ ॥

কঙ্কালমালকৃতবালমৃগাঙ্কভাল-
কালান্তকালশিবজালসমা হি জীবাঃ।
তীরে তব ত্রিনয়নে ত্রিগুণে ত্রিবর্গে
লোকো মৃষা নিগদতীতি নরাদয়ন্তে ॥ ৩ ॥

মুক্তো ভবেত্ত্বদমলাম্বুকণাভিষিক্তো
যুক্তোঽপি পাপনিকরৈঃ সুকৃতৈর্বিরিক্তঃ।
মাতঃ সুনিশ্চিতমতস্তব বারি যত্র
নাস্তীতি কিল্বিষচয়ঃ সবলো হি তত্র ॥ ৪ ॥

পূর্ণং সুচূর্ণয় চিরাচরিতোগ্রপাপং
তূর্ণং ত্রিলোকজননি ত্রিবিধঞ্চ তাপং।
সংসারসাগরসন্তরণোপযোগি-
শ্রীপাদপদ্মযুগলে বিমলে প্রসীদ ॥ ৫ ॥

ধ্যানং ন বন্দনমথাপ্যুত্থুপাসনং বা
ত্বৎকীর্ত্তনং তব পদাম্বুজপূজনং বা।
জানে কদাচিদপি নৈব কৃপার্দ্রচিত্তে
চিত্তেঽনিশং নিবস মেঽস্তু বিশুদ্ধচিত্তে ॥ ৬ ॥

মিথ্যাপি তথ্যসদৃশী জগতী বিভাতি
ত্বয্যেব রজ্জুষু যথাঽনিলভুক্‌প্রতীতিঃ।
আত্মা ত্বমেব পরমে সকলার্থদর্শী
চিদ্রূপমাত্রমনিশং পরিচিন্তয়ে ত্বাং ॥ ৭ ॥

নাস্ত্যাকৃতির্ন চ কৃতির্ন ধৃতির্ন ধাম
গোত্রং ন তে গিরিসুতে ন জনুর্ন নাম।
স্বেষ্টার্থসাধনকৃতে কিল সাধকানাং
রূপং প্রকল্পিতবতী ভবতী বিচিত্রং ॥ ৮ ॥

গঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং সর্ব্বপাপহরং পরং।
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং তস্য গঙ্গা প্রসীদতি ॥ ৯ ॥

যোঽসৌ ঘোষকুলাগ্রণী ক্ষণজনির্ধীরঃ সতাং সম্মতঃ
শাস্ত্রাশাস্ত্রবিচারণৈকনিপুণঃ শ্রীদেবনারায়ণঃ।
তদ্বাক্যামৃতকৌতুকী বিতনুতে গঙ্গাষ্টকং যত্নতো
ধ্যাত্বা শৈলসুতাঙ্ঘ্রিসারসযুগং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদ্বিজঃ ॥ ১০ ॥

দৈবনারায়ণীমাজ্ঞাং ধৃত্বা শীর্ষে প্রকাশ্যতে।
স্তুতিরেষানন্দনারায়ণঘোষেণ সশ্রিয়া ॥ ১১ ॥

পুস্তকের শেষে প্রকাশক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

বিবিধ বুধ সম্মত সর্ব্বজন হিতৈষী ধন্য বদান্য ভাগীরথী ভক্তাগ্রগণ্য মদগ্রজ

পুরোহিত বরাহনগরগ্রাম নিবাসি শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রতি আদেশ করেন ঐ আদেশানুসারে তর্কালঙ্কার মহাশয় কর্ত্তৃক বিরচিত গঙ্গাষ্টক শ্রবণ করত পরমাহ্লাদিতচিত্তে মৎপ্রতি এই আজ্ঞা দেন যে এই গঙ্গাষ্টক কোন যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিবা অতএব ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

সংযোজন

এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধের ৫ম পৃষ্ঠায় হরচন্দ্র রায়ের যন্ত্রালয়ে ১৮২৩ সনে মুদ্রিত একখানি পুস্তকের কথা বলিয়াছি। ইহারও দুই বৎসর পূর্ব্বে—১৮২১ সনে এই যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত একখানি পুস্তক রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে পাইয়াছি। পুস্তকখানির নাম 'শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ঃ' (পৃ. সংখ্যা ৬৫)। ইহাতে মূল শ্লোক ও দ্বিজ পীতাম্বর (সম্ভবতঃ পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়)-কৃত পয়ার অনুবাদ আছে। অনুবাদক লিখিয়াছেন :—

রাসপঞ্চঅধ্যায় প্রত্যেক শ্লোকভাষা। পদ্যরূপে রচনা করিব এই আশা ॥
দ্বিজ পীতাম্বর গঙ্গাবংশ সমুদ্ভব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যাখ্যা ভাব করি অনুভব ॥ ···
অগ্রেতে মূলের শ্লোক করি উপন্যাস। পশ্চাৎ তাহার অর্থ করিলাম প্রকাশ ॥ (পৃ. ১-২)

ইহার সহিত 'শ্রীউদ্ধবদূত' নামে ৫২ পৃষ্ঠার আর একখানি পুস্তক একত্র মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার গোড়ার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীউদ্ধবদূতকাব্য শ্রাব্য সভাকার। ইহাতে উপজে কৃষ্ণ ভক্তি সুধাসার ॥
গোস্বামি রচিত গ্রন্থ অতি সুললিত। শত সংখ্যা শ্লোকেতে হইল বিনির্ম্মিত ॥ ···
অগ্রেতে মূলের শ্লোক করি উপন্যাস। পশ্চাৎ তাহার অর্থ করিলাম প্রকাশ ॥—

এই অনুবাদও দ্বিজ পীতাম্বর-কৃত বলিয়া মনে হইতেছে।

পুস্তকদ্বয়ের শেষে মুদ্রণকাল ও মুদ্রাকরের নাম এই ভাবে দেওয়া আছে।

সমাপ্তশ্চায়মুদ্ধবদূতগ্রন্থঃ শ্রীরস্তু গ্রন্থপাঠকে

যদি কিছু ত্রুটি থাকে রচিতে ইহার। বুধগণ ক্ষমিবেন সে দোষ আমার ॥
সপ্তদশ শত পুন বেয়াল্লিশ শকে। পুস্তক মুদ্রিত হৈল মাসে ফাল্গুণিকে ॥ * ॥ * ॥ * ॥

রায় শ্রীহরচন্দ্র শর্ম্মণো মুদ্রাক্ষর যন্ত্রালয়ে
মুদ্রিতমিদং গ্রন্থদ্বয়ং ॥ * ॥ * ॥

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীদাস

(আলোচনা)

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বড়ু চণ্ডীদাস এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির দেশ-কালাদি নির্ণয়ে প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন।[১] বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে কবি ও পুথির দেশ বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর; কবির জন্ম ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, পুথির লিপিকাল ১৫৫০ খ্রী অ°।

তাঁহার প্রধান অবলম্বন দুইখানি পুথি। এখানে সামান্যতঃ তাহার পরিচয় ও আলোচনা আবশ্যক। একখানি ৭ পাতা নামহীন সংস্কৃত পুথি, নাম দেওয়া হইয়াছে বাসলী-মাহাত্ম্য; ২য় পাতা নাই। বাকী পাতা কয়খানির এক পিঠে লেখা। রচয়িতা পদ্মলোচন শর্ম্মা। শেষ পাতার নীচে ছোট হরপে দুই পঙ্‌ক্তি কবিতা; তাহা হইতে ১৩৮৭ শক পাওয়া যায়। পুথিতে দেবীদাস ও চণ্ডীদাস দুই সহোদর; পিতা নিত্য-নিরঞ্জন ও মাতা বিন্ধ্যবাসিনী। ইঁহারা ভরদ্বাজকুলোদ্ভব। তীর্থপ্রত্যাগত ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম জ্যেষ্ঠ দেবীদাস [সামন্তভূমির] রাজা হামীর উত্তররায় কর্ত্তৃক বাসলীর পূজক নিযুক্ত হন। চণ্ডীদাসের কবিখ্যাতি ছিল।[২]

এক পিঠে লেখা সম্পূর্ণ পুথি এ যাবৎ আমাদের চোখে পড়িয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। অবশ্য পুথির প্রথম ও শেষ পাতা এক পিঠে লেখা হইতে পারে এবং হয়ও। আলোচ্য পুথি ৬০।৭০—বড় জোর ১০০ বৎসরের বেশী পুরান নয়।

এই চণ্ডীদাস বাসলীর বড়ু অথবা বড়ু চণ্ডীদাস নহেন, হইলে পদ্মলোচন—দেবীদাসের পুত্র কিম্বা পৌত্র যেই হউন, নিশ্চিতই সে কথার উল্লেখ করিতেন। পুথি সন্দিগ্ধ। আর প্রাপ্ত পুথির চণ্ডীদাস সংস্কৃত অথবা অন্য কোন ভাষা-কবিও ত হইতে পারেন।

দ্বিতীয় পুথি কৃষ্ণপ্রসাদ সেনের চণ্ডীদাস-চরিত। পুথি খণ্ডিত, পত্রসংখ্যা ৮০; পাতাগুলি তিন দফায় পাওয়া। কৃষ্ণপ্রসাদের প্রপিতামহ উদয় সেনের সংস্কৃত চণ্ডী-চরিতের আদর্শে রচিত। কৃষ্ণপ্রসাদ আনুমানিক শত বর্ষ পূর্ব্বে ছাতনার রাজার গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। পুথির বর্ণনা হইতে জানা যায়, রাজা হামীর উত্তররায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া চণ্ডীদাস রামী সহ সহজ-সাধন করিতেন এবং অবসরকালে রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক গীত রচনা করিয়া নিত্যাকে শুনাইতেন। রজকিনীও সুগায়িকা। রামী-চণ্ডীদাসকে উপলক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুপুর-রাজ গোপাল সিংহের সহিত হামীরের বিবাদ বাধে। মদনমোহন গোপাল সিংহের হইয়া যুদ্ধ করেন, বিপক্ষে বাসলী। লড়াই ভীষণ হইলেও পরে-পশ্চাৎ একটা

---

১ 'চণ্ডীদাস,' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪২শ ভাগ, ১ম ও ২য় সংখ্যা।

মিটমাট হইয়া যায়। এই সময়ে চণ্ডীদাসের বয়স তেত্রিশের কোলে। যে দিন মুহম্মদ-বিন্-তুঘলক পিতৃহত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসনারূঢ় হন, তৎপূর্ব্বদিবসে অর্থাৎ ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে চণ্ডীদাসের জন্ম। বিষ্ণুপুরে অবস্থানকালীন সুলতান সিকন্দর শাহের (১৩৫৮-১৩৮৯ খ্রী অ°) আহ্বানে চণ্ডীদাস রামীর সহিত পাণ্ডুয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে এক তান্ত্রিককে দীক্ষাদানানন্তর বীরভূম-নান্নুরে গিয়া নিজেকে প্রকট করেন। পাণ্ডুয়া পৌছিয়া প্রথমে বিড়ম্বিত এবং সিদ্ধাইপ্রভাবে পরিণামে সকল বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হন। সিকন্দর চণ্ডীদাসের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। কবি নান্নুর-নিবাসী শম্ভুনাথ অথবা পার্ব্বতীচরণকে তাহার বংশে চণ্ডীদাস নামেই পুনরাবির্ভূত হইবেন বলিয়া বর দেন। কএক মাস গৌড়েশ্বরের আতিথ্য অঙ্গীকার করিয়া সসম্মানে বিদায় লয়েন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে বিদ্যাপতির সহিত মিলন হয়।[৩]

শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু অত পুরু মসৃণ দেশী কাগজের পুথি দেখেন নাই বলিয়া আমাদের একটু ধোঁকা ধরাইয়াছেন। পুথির পাতাগুলি এক স্থানে পাওয়া গিয়াছিল কি না এবং কাগজ, হাতের লেখা এক না পৃথক্, ইত্যাদি আমরা জানিতে পারি নাই।

ওমালী (L. S. S. O'Malley) সাহেবের উক্তি অনুসারে ১৩২৫ শকে (১৪০৩ খ্রী অ°) শঙ্খরায়নামা জনৈক সৈনিক পুরুষ সামন্তভূমি অধিকার করেন এবং তাঁহার পৌত্র তৎপ্রদেশের সীমা বৃদ্ধি করিয়া রাজা হন।[৪] বাসলীর প্রাচীনতম মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রাপ্ত ইষ্টক-লিপিতে ১৪৭৫ শকে (১৫৫৩ খ্রী অ°) এক হামীর উত্তর-রায়কে পাওয়া যায়। আবার পদ্মলোচনের পুথিমতে হামীর ১৩৮৭ শকে (১৪৬৫ খ্রী অ°) অথবা তৎপূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। আর, গোপাল সিংহের (১৭১২-১৭৪৮ খ্রী অ°) সহিত হামীর উত্তররায়ের যুদ্ধও সম্ভবে না। একার্থক বলিয়া গোপালকে কানাইএ (১৩৪৫-১৩৫৮ খ্রী অ°) টানিয়া তুলিবার প্রয়াস একটু বিচিত্র রকমের নয় কি? একাধিক স্থলে মদনমোহনের উল্লেখও লক্ষণীয়। দিল্লী-সম্রাটের সিংহাসনারোহণের তারিখ সে-দেশে ও সে-কালে উদয়সেন কেমন করিয়া পাইলেন, জানা নিতান্ত দরকার। উপরি উক্ত তান্ত্রিক শ্রোত্রিয় রূপচাঁদের নিবাস চন্দননগর। কিন্তু শহরটি খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকের শেষের দিকে তিনখানি গ্রাম—বোড়ো, খলিসানি ও গোন্দলপাড়া লইয়া চন্দননগর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কবির বীরভূম-নান্নুরে গমন ও পার্ব্বতীচরণকে বরদান ব্যাপারে কি যেন একটা মতলব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। চণ্ডীদাস সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে পাণ্ডুয়ার দরবার হইতে ফিরেন; কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত ২৩৭৫ সংখ্যক পুথিতে তাঁহার হৃদয়-বিদারক শোচনীয় পরিণামের কথাই লিপিবদ্ধ।

কৃষ্ণপ্রসাদের পুথির মাল-মশলা যোগাইয়াছে চণ্ডীদাস ও রামীঘটিত উপাখ্যান-সমূহ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সহজ-ধর্ম্মের অভ্যুদয় মহাপ্রভুর পরে। আমরা অন্যত্র দেখাইতে

৩ 'চণ্ডীদাস-চরিত,' প্রবাসী, ১৩৪২, আষাঢ়।

প্রযত্ন করিয়াছি, বড়ু চণ্ডীদাসের রজকিনী-প্রসক্তি ও বিদ্যাপতির সহিত সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ কাল্পনিক।[৫] ভাব কেন, স্থানে স্থানে সহজিয়া ভাষাও অক্ষরশঃ আসিয়া গিয়াছে। উহাতে স্বদেশী যুগের উচ্ছ্বাস আছে, অধুনাতন একখানা চণ্ডীদাস নাটকের দুই তিনটা নামও আছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই শ্রেণীর পুথি কতখানি নির্ভরযোগ্য।

মল্লভূমির ন্যায় বীরভূমিও এক সময়ে নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। সেখানকার বনে আগুন লাগিলে লোকে দেখিত; তীর-ধনুকের সাহায্যে হরিণ শিকার করিত। বৃক্ষ, লতা, ফুল, ফল, উভয় ভূমিরই একরূপ ছিল এবং এখনও আছে। ও-অঞ্চলেও বাঁশ কমই জন্মে। সে দেশে ছোট-খাট পার্ব্বত্য নদীরও অভাব নাই; এবং বর্ষা ব্যতীত সময়ে ঐ সকল নদী পায়ে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।

প্রাচীন পদে নান্নুরে বাসলীকে না পাইলেও চণ্ডীদাসকে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস সহজিয়া ছিলেন না; সুতরাং নিত্যার প্রয়োজনাভাব। আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর ২য় সংস্করণে দেখাইয়াছি, বাগীশ্বরী—সরস্বতী ও বাসলী এক ও অভিন্না। তাঁহাকে বিশালাক্ষীও বলা হয়। সরস্বতীর একটি প্রণাম-মন্ত্র এইরূপ,—

সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনি।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে ॥

সে কালে মল্লভূমি ও বীরভূমির ভাষায় বড় একটা পার্থক্য ছিল না। প্রাকৃত এবং প্রাচীন ভাষা-সাহিত্য লইয়া যাঁহারা একটু বেশী নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এক শব্দের বা বিভক্তির একাধিক রূপ নূতন নহে। তদ্ব্যতীত আখরিয়াগণের অনবধানতায় যাহা কিছু ঘটিয়া গিয়াছে। যে কোন একখানা উৎকৃষ্ট কাব্য লইয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিতে বসিলে দেখা যাইবে, উহার কবিত্ব সর্ব্বত্র সমান নহে। চিত্তবৃত্তিকে দ্রবীভূত ও বিষয়াকারে তথা ভগবদাকারে পরিণত করিতে পুনরুক্তির সার্থকতা অবিসম্বাদী। সুতরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন একাধিক কবির রচনা অথবা সংস্কৃত শ্লোক পরে সংযোজিত, ইত্যাদি কল্পনা করিবার কোন যুক্তিসম্মত কারণ নাই।

বন-বিষ্ণুপুরে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া উহাই পুথির দেশ বলা যায় না। চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত বহু বহু পদ, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা, চতুর্দ্দশ পদাবলী প্রভৃতিও ও-অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। পুথির কাল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের অভিপ্রায়ই গ্রাহ্য। আমাদের যত দূর জানা আছে, এ বিষয়ে তাঁহারা সকলে রাখাল বাবুকেই সমর্থন করেন।

অতঃপর কবি ও পুথির দেশ-কালাদি অবধারণের ভার সুধী-সমাজের উপর দিয়া আমরা অব্যাহতি পাইতে চাই।

দুঃখের বিষয়, শব্দার্থ সম্পর্কে আমরা যোগেশবাবুর সহিত সর্ব্বত্র একমত হইতে পারি নাই। নীচে অল্প কএকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল। যেখানে যে অর্থ সমীচীন মনে হইয়াছে, সেখানে তাহাই দিবার চেষ্টা করিয়াছি। শব্দের রূপ-পরিবর্ত্তনেরও

একটা ধারা আছে। এই ধারার সহিত পরিচিত হইতে হইলে প্রাকৃত ব্যাকরণের আলোচনা আবশ্যক। তদ্ভব শব্দের যথার্থ সংস্কৃত রূপ কোন্‌টি, অন্ততঃ তাহা জানিবার জন্যও প্রাকৃত ব্যাকরণ দেখিতে হইবে। দেশী শব্দের অর্থ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত রূপ কোথায় পাওয়া যাইবে? এই দেশী শব্দের মধ্যে আবার কতক দ্রাবিড়, কতক বা কোল (Austro-Asiatic)-মূলক। এতদ্ব্যতীত এমন অনেক শব্দ আছে, যেগুলি সংস্কৃত বলিয়া আমাদের জানা ছিল, কিন্তু মূলে তাহা সংস্কৃত নয়। সুতরাং প্রাকৃত কেন, অন্যান্য ভাষার সহিত তুলনামূলক আলোচনারও প্রয়োজন আছে।

অনুবন্ধ শব্দের একটা অর্থ অবিচ্ছেদ; 'চির আনুবান্ধ' (২য় সংস্করণ, পৃ° ১৭৮) আমরা ঐ অর্থই ধরিয়াছি। অভরস—অধ্যাপক প্লাট্‌স (J. T. Platts) তাঁহার হিন্দী-ইংরাজী অভিধানে ভরোসা শব্দের অর্থ দিয়াছেন, Hope, Confidence, Trust, Faith; স° ভদ্র-আশা। সুনীতিবাবু ভর-বশ। অভরস শব্দে অবিশ্বাস অর্থ ধৃত হইয়াছে। অমর্ষ হইতে কি করিয়া হয় বুঝিলাম না। অবসই—নিশ্চিতার্থই সহজ ও সুযুক্ত।

আকাইলেক—'আকাইলেক কেশ তোর মুঠিএক মাঝা' (২য় সংস্করণ, পৃ° ৩৫)। 'আকাইলেক' শব্দ কেশের বিশেষণ স্পষ্ট। 'মন টানিলেক' অর্থ অত্যন্ত কষ্ট-কল্পনা। আছিদর—স° ছিত্বর, ছিদ্বর। আজল, আজলী—প্রা° উজ্জু (ঋজু)-ল; স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয়। [Cf A. ajhal adj most ignorant; s. m. a block head.] আড়বাঁশী—অন্য নাম মৌহারী নয়। আড়বাঁশী, আড় ভাবে ধরিয়া বাজাইতে হয়। মৌহারী যন্ত্রটি অধুনা তুম্‌ড়ী (তুব্‌ড়ী) নামে প্রসিদ্ধ (২য় সংস্করণের টীকা দ্রষ্টব্য)। আনচান—<আনছান <অন্নছন্ন <অন্য ছন্দ (২য় সং টীকা দ্র°)। আপোঙষ—আ-√পিষ্‌ পেষণে। রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে হাপসান এবং উত্তর-বঙ্গে আপচান পদের প্রয়োগ লক্ষণীয়। আফার—প্রা° ফার (স্ফার)। প্রচুর। আহুকিতেঁ—√আহুখ্‌ (অভি-√উক্ষ্‌ সেচনে); উচ্চারণ-বৈষম্যে আহুক' এবং ইতেঁ প্রত্যয় যোগে আহুকিতেঁ (টীকা দ্র°)। আঁকিবার কালীর উল্লেখ কোথাও নাই।

উতাপঠ—উৎ-√পট্‌ বিদারণে। খিন্ন, ব্যথিত। উল্লাল—উৎ√লল্‌-অচ্‌ বটে। ক্ষোভ, (কৌতুক নয়)।

কচাল—বাক্‌কলহ, তুল° কচাকচী (চুলাচুলী)। কেশতুল্য সূক্ষ্ম তর্ক' এ কল্পনার রশি যেন একটু ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে। কবল দশ হাটল—প্রকৃত পাঠ, 'হিফিলেক রাধাক বলদ সিংহটাল।' কপোলগণ—শুদ্ধ পাঠ, 'কপোল গল'। কাঁচ আলিতে না দেওঁ পাএ—কা'র লেঠায় থাকি না। কুকুহলে—শব্দটি কুহুহলে; অর্থ—কুতুহলে, কৌতূহল সহকারে। কুলআঁ—'কর কুলআঁ ঘাটে'—[যমুনার] খেয়াঘাটে কর সংগ্রহের ব্যবস্থা।

খঙ্গ—শিবায়নে খাঙ্গা অর্থে কাঙ্গাল, (ক্রুদ্ধ নহে)। খণ্ডবিচনী—'খণ্ডবিচনীর কিবা বাঅ তুলী লৈলোঁ গাএ' অর্থাৎ ভাঁগা কুলার (বিচনীর=ব্যজনীর) বাতাস কিবা [স্বেচ্ছায়] শরীরে লাগাইলাম। খন্ধ—প্রা° খংধ (স্কন্ধ=সমূহ); কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'ষণ্ডো মধ্যমঃ'। শাক-সবজী। খাঁট—চর্য্যাপদে খাণ্ট, মাধব কন্দলির কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে খণ্ট,

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে খাট, কাশীদাসী আশ্রমিক পর্ব্বে খণ্ড, কবিকঙ্কণে খণ্ড, খণ্ডা ; অর্থ—ধূর্ত্ত, শঠ। খণ্ড বা খণ্ডা হইতে খাঁড়াধারী দস্যু হয় কি? খাড়ু—বৈদিক খদ্দি হইতে পারে ; কিন্তু খাড়ু শব্দ প্রা॰ খড়ুঅ (কটক) শব্দজাত। খেউ মতী—শুদ্ধ পাঠ, 'মোর বুধী তো রাখউ মতী', ফলিতার্থ—আমার গোআল-বুদ্ধি তোমার [চঞ্চল] মতিকে [অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইতে] রক্ষা করুক।

গড়াহলি (২য় সং, পৃ° ৩৬)—গড়াগড়ি দিও, অবলুণ্ঠিত হইও ; তুল॰ 'করিহলি উপহাসে' (পৃ॰ ১৩)। গহনে—চর্য্যাপদে গবণ, কৃত্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ড ও ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে গন। গহন, গবন, গন প্রভৃতি শব্দের মূলে গমন। প্রাচ্য হিন্দীতে গমনার্থক গবন শব্দের প্রয়োগ অবিরল। মৈথিলী ভাষায় গওনা বা গৱনা অর্থে দ্বিরাগমন। [গোহন —(চাসীর ভাষা) The inclined path along which the bullocks move in drawing water from a well—J. T. Platts' H. E. Dictionary.] গোবালী —গোপাল'এর প্রা॰ রূপ গোৱাল ; স্ত্রীলিঙ্গে গোৱালী ; (গোপবালী'র প' লুপ্ত নয়)।

ঘোড়াচুলে—'কাকপক্ষদ্বয়ং ঘোটাচূড় ইতি খ্যাতে। কুমারাণামুপনয়নক্রতে শিখাপঞ্চক ইত্যন্যে।' টীকা-সর্ব্বস্ব। [Kākapaksa (p. 357)—Ghoṭa-Cuḍa (Tbh. Sk. goṣṭha-cuḍā)—Journal Asiatique, Paris, Sep. 1926, p. 94.]

চৌহালিনী—আনন্দময়ী, আমোদপ্রিয়া, ক্রীড়ানুরক্তা ; (চৌহান রাজপুতনারীতুল্য ডাকাবুকা অথবা চোয়াড় নারী নহে)। [হিন্দী চুহলী, চুহলিয়া adj. & s. m. Merry, gay, amusing ;—a merry fellow.—J. T. Platts' H. E. Dictionary.]

ছাঁচে—মিছেঁ ছাঁচে, অর্থ—মিথ্যা ছন্দে, ছলাকলায়, (মিথ্যা ও সত্যে নয়)। [ছাঁচ—হিন্দী সাঁচা। সদৃশ, ঢব, mould.]

জুলি—শুদ্ধ পাঠ, 'ভাঁগি জুণি জাএ', 'ছিণ্ডি জুণি জাএ' ; অর্থ—ভাঙ্গিয়া যেন না যায়, ছিঁড়িয়া যেন না যায়।

ঝাঁটাল বন—ঝাঁটাল, 'গোলীঢ়ো ঝাটলো ঘণ্টা-পাটলির্মোক্ষমুষ্ককৌ।' অমর॰ [ঝাটাল—H. H. Wilson's S. E. Dictionary]

টাকার—অর্ব্বাচীন স॰ টক্কার।

তণ্ডী—√তুণ্ড্ আঘাতে। তারপিল—শব্দটা তারপল ; বিদ্যাপতিতে তলপল ; পশ্চিম-রাঢ়ে √তড়পা প্রচলিত। অস্থির করিল, আকুল করিল।

দশমী দুয়ার—'গগনং ব্রহ্মরন্ধ্রং দশমদ্বারমিতি যাবৎ।' [পুরমেকাদশদ্বারমিত্যাদি মন্ত্রের ভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন, 'তচ্চেদং শরীরাখ্যং পুরম্ একাদশদ্বারং ; একাদশ দ্বারাণ্যস্য—সপ্ত শীর্ষণ্যানি, নাভ্যা সহার্ব্বাঞ্চি ত্রীণি, শিরস্যেকং তৈরেকাদশদ্বারং পুরম্।' সিদ্ধাচার্য্যেরা দশম দ্বারের বৈরোচন দ্বার আখ্যা দিয়াছেন।] আমরা কিন্তু কণ্ঠনালীর দ্বার কুত্রাপি পাই নাই। দেহার দেব—দেবের দেব মহাদেব। [দেহা<দেআ<দেবঅ<দেবক] অথবা দেহের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মা। দেউলের দেব কোথা হইতে আসে?

নৌকা—'পাণি লইছে মোকটে' মোচা-খোলা পাণি লইতেছে, তাহার ভিতর জল ঢুকিতেছে। মোকট শব্দে মোচার খোল পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। পাণিফুটি—জলটুকু; অল্পপরিমিত তরল পদার্থ বুঝাইতে উত্তর ও পূর্ব্ব-বঙ্গে 'ফুটি' শব্দ প্রযুক্ত হয়।

পরসিলহে (২য় সং, পৃ° ১২৯)—শব্দটা পসরিলহে, অর্থ—প্রহার করিতেছি বা করিলে। পশ্চিম-বঙ্গে পসার ও√পসার'র প্রয়োগ লক্ষণীয়। পাসলী—পায়ের আঙ্গুলের কড়া, (পাঁয়জোর নয়)।

বসুল—বরং বসুকুল হইতে বসুল হইলে পারে; কিন্তু বসুপুত্র হইতে নয়। রাজকুল হইতে রাউল, রাজপুত্র হইতে নয়। বাড়ী—যষ্টি বা যষ্টি-প্রহার অর্থে বর্দ্ধমান, বীরভূম, হুগলী, ২৪ পরগণা অঞ্চলে প্রচলিত। বিহড়ায়ি—বি-√ঘট্ট বিযুক্তকরণে; (বিহৃত করে নয়)।

ভাষ—স° ভাস, (ভাষ্য নয়)।

রাপাইল— হাঁপাইল? রাহী—'কদমতলাত রাধা রাহী'—রাধা ও আয়ী, কষ্ট-কল্পনা।

সবসলি—শর ও শলি (শল্য)। সাতেসরী—সপ্তসরী-ই যেন সমীচীন মনে হয়।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

সংস্কৃত-সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা

বাংলা সাহিত্যে অগণিত মুসলমান কবির দান ও একাধিক মুসলমান নরপতির আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রেরণার উদাহরণ প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যসেবী মাত্রের নিকটই সুপরিচিত। এই প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মুসলমানগণের উৎসাহ ও সাহায্যে পরিপুষ্ট বাংলা সাহিত্য কেবলমাত্র মুসলমান সংস্কৃতির প্রচারে ব্যাপৃত হয় নাই, পক্ষান্তরে প্রধানতঃ ইহা হিন্দুর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির অনুকূল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। হিন্দুর পুরাণাদির অনুবাদ ও হিন্দুর সম্প্রদায়বিশেষের উপাখ্যান এই সাহিত্যের বহুল অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

পরকীয় সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি মুসলমানগণের এই অনুরাগ কেবল প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্য দিয়াই অভিব্যক্ত হইয়াছে, এমন নহে—সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেও ইহার প্রচুর নিদর্শন রহিয়াছে। আকবর প্রভৃতি রাজগণের উদ্যোগে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পারসীক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল এবং সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে হিন্দুর জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে একাধিক স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল—এ সকল কথা পণ্ডিতসমাজে অল্পবিস্তর সুবিদিত।[১]

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের দিক্ দিয়া এই সকল গ্রন্থের মূল্য উপেক্ষণীয় নহে। অনূদিত ও আলোচিত গ্রন্থের মধ্যে এমন কতকগুলি আছে, যেগুলির সংস্কৃত মূল বর্ত্তমানে অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। সুতরাং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কর্তৃক এই সকল পারসীক গ্রন্থের আলোচনা হইলে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে অনেক মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে এবং মুসলমানগণের সংস্কৃতাভিজ্ঞতার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই দিকে তেমন কোনও আলোচনাই এ পর্যন্ত হয় নাই।

১। Elliot—*History of India*, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭০-৫; J. J. Modi—*King Akbar and the Persian Translation of Sanskrit Books* (Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, ৫ম খণ্ড (১৯২৫), পৃঃ ৮৩-১০৭; M. Z. Siddiqui—*The Services of the Muslims to the Sanskrit Literature* (Calcutta Review, ১৯০৩, পৃঃ ২১৫—২৫), N. Law—Promotion of Learning in India during Muhammadan rule (by Muhummadans) পৃঃ ১৪৭—৫০, ১৮৫ প্রভৃতি। শ্রীবরকৃত রাজতরঙ্গিণীর পরিশিষ্ট হইতে জানা যায় যে, 'কাশ্মীরের আকবর' জাইনউল-আবিদিনের প্রয়োজকতায়ও এইরূপ বহু গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল। শ্রীবর লিখিয়াছেন,—

দশাবতারপৃথ্বীশ-গ্রন্থরাজ-তরঙ্গিণীঃ।
সংস্কৃতাঃ পারসীবাচা বাচকাহাস্থকারয়ৎ॥
ম্লেচ্ছৈর্বৃহৎকথাসারং হাটকেশ্বরসংহিতাঃ।
পুরাণাদি চ তদ্‌যুক্ত্যা বাচ্যতে নিজভাষয়া॥ (শ্রীবরকৃত রাজতরঙ্গিণী—১।৫।৮৫-৬)

উল্লিখিত অনুবাদাদি গ্রন্থ প্রণয়ন ছাড়া মুসলমানগণ সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার-কল্পে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য কার্য করিয়াছিলেন, তাহারও কোন বিবরণ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। অথচ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণকে বৃত্তি ও উপাধি দান করিয়া অনেক মুসলমান রাজা তাঁহাদিগকে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করিয়াছেন—কেহ কেহ প্রত্যক্ষ নির্দেশসহকারে গ্রন্থবিশেষ রচনা করাইয়াছেন, প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে যে সকল বৃত্তান্ত আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা দরকার যে, কেবলমাত্র মুসলমান সংস্কৃতি বা সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ অতীব বিরল[২]। বস্তুতঃ, ইরাণীয়দিগের আবেস্তা ও খ্রীষ্টানদিগের বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদের মত[৩] কোরাণ শরীফের কোনও সংস্কৃত অনুবাদ প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। তাই মনে হয়, সংস্কৃত পণ্ডিতগণের প্রতি আনুকূল্য ও উৎসাহ-প্রদর্শন মুসলমান নরপতিগণের পাণ্ডিত্যপ্রীতি ও সাহিত্যানুরাগেরই নিদর্শন। কলাবিজ্ঞান, অভিধান, কাব্য প্রভৃতি সাধারণের রুচিকর বিষয়েই তাঁহাদের অনুরাগ ছিল বলিয়া মনে হয়।

যে সকল ভারতীয় মুসলমান নরপতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গকে অভিনন্দিত ও উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাংলার জালালুদ্দীনই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। সদ্যঃ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত জালাল এ বিষয়ে পিতা রাজা গণেশের অনুসৃত রীতিরই অনুবর্তন করিয়াছেন। তিনি বৃহস্পতি নামক বিবিধ গ্রন্থরচয়িতা প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে ছয়টী উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রায়মুকুট উপাধি প্রদানের সময় একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়া-

২। মুসলমান নরপতির আদেশে বা সন্তোষ বিধানার্থ রচিত মাত্র একখানি পারসীক গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদের কথা এ পর্যন্ত জানিতে পারিয়াছি। কাশ্মীররাজ মহম্মদ শাহের সন্তোষার্থ শ্রীবর পণ্ডিত প্রসিদ্ধ পারসীক কবি জামিবিরচিত য়ুসুফ জোলেখার প্রখ্যাত কাহিনী অবলম্বন করিয়া কথাকৌতুক নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও জর্জ বুলার ইহার দুইখানি পুথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন (Notices of Sans. Mss. ৮।২৫৮৫ ; Detailed Rept. of a tour of search of Sans. Mss. Kashmir, Rajputana and Central Ind. পৃঃ ৬১)। 'কাব্যমালা'য় ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। পুনার Oriental Book Agencyর কাটালগ (১৯৩০। নং ১৯১) হইতে জানা যায়, Schmidt সাহেবের সম্পাদকতায় ইহার এক ইউরোপীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল—কিন্তু উহা আমি দেখি নাই। উত্তরকালে আধুনিক যুগে কাশ্মীরের হিন্দু রাজা রণবীরসিংহের আদেশে সাহিবরাম কর্তৃক এইরূপ আর একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহার নাম বীররত্নশেখরশিখা। ইহা অখলাক-ই-মোহ্সিনী গ্রন্থের অনুবাদ। ইহার পুথির বিবরণ রঘুনাথ টেম্পল লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুথির ষ্টাইনকৃত কাটালগে প্রদত্ত হইয়াছে।

৩। এ সম্বন্ধে Journal of the Asiatic Society of Bengal নামক পত্রিকায় (১৯২৮।৪৬৫—৬) প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, খ্রীষ্টান মিশনারিগণ ভারতীয় পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কেবল বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। পক্ষান্তরে হিন্দুর বেদ ও পুরাণের অনুকরণে একাধিক পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে বেদের অনুকরণে রচিত ও বেদনামে প্রচারিত গ্রন্থই সমধিক চমকপ্রদ (Asiatic Researchesএর ১৪শ খণ্ডে এফ্‌ এলিস লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁহাকে হাতীর উপর আরোহণ করান হইয়াছিল এবং হার, মুক্তাখচিত কুণ্ডল প্রভৃতি বিবিধ উজ্জ্বল অলঙ্কার ও রত্ন অশ্ব তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল।[৪]

হুমায়ুনের সমসময়ের দিল্লীর অধিপতি সলেম সাহ সারস্বতপ্রক্রিয়া নামক ব্যাকরণ গ্রন্থের টীকাকার চন্দ্রকীর্তির সমাদর ও সম্মান করিতেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫]

এই সকল উৎসাহদাতার মধ্যে প্রখ্যাতনামা আকবরই বোধ হয় সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহারই নির্দেশক্রমে বিট্‌ঠল নামক পণ্ডিত 'নর্তননির্ণয়' নামক নৃত্যবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[৬] সুলতান বুরহান খাঁর নির্দেশানুসারে এই বিট্‌ঠলই বোধ হয়, সঙ্গীত সম্বন্ধে ষড়্‌রাগচন্দ্রোদয়[৭] নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের পারসীভাষা শিক্ষার সৌকর্যসাধনার্থে আকবর সংস্কৃত-ভাষায় একখানি পারসী ভাষার ব্যাকরণ লিখাইবার ব্যবস্থা করেন। এই গ্রন্থখানির নাম পারসী-প্রকাশ, রচয়িতা কৃষ্ণদাস। ইহার সূত্রসংখ্যা ৪৮১। ইহা আট অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলির নাম—সংখ্যাশব্দনির্ণয়, শব্দপ্রকরণ, কারকপ্রকরণ, সমাসপ্রকরণ তদ্ধিতপ্রকরণ, আখ্যাত-প্রকরণ, কৃৎপ্রকরণ। এক যুগে এই গ্রন্থের আদর ছিল বলিয়া মনে হয়—ইহার অনেকগুলি

৪। জ্যোতিষ্মন্মণিপুঞ্জরঞ্জনরুচিং হারং জ্বলৎকুণ্ডলে রত্নৌঘচ্ছুরিতা দশাঙ্গুলিজুষঃ শোচিষ্মতীরূর্মিকাঃ। যঃ প্রাপ্য দ্বিরদোপবিষ্টসকলস্থানেরবিন্দমুপাচ্ছত্রে তৈন্তুরগেশ্চ রায়মুকুটাভিখ্যামভিখ্যাবতীম্॥ Descriptive Cat. Sans. Mss. Ind. Office.—২।১৫৪-৫।

৫। শ্রীমৎসাহিসলেমভূমিপতিনা সম্মানিতঃ সাদরম্।
সূরিঃ সর্বকালিন্দিকাকলিতধীঃ শ্রীচন্দ্রকীর্তিঃ প্রভুঃ॥

Belvalkar—Systems of Sans. Grammar. পৃঃ ৯৮, পাদটীকা ২। সারস্বত ব্যাকরণের টীকাদিরচয়িতা আরও দুই একজনের গ্রন্থে মুসলমান নরপতিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সারস্বতপ্রক্রিয়ার টীকাকার পুঞ্জরাজ মালবের গিয়াস্‌উদ্দীন খিলজীর মন্ত্রী ছিলেন। তর্কতিলক ভট্টাচার্য জাহাঙ্গীরের রাজত্ব-কালে সারস্বতসূত্রের এক টীকা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন—ঐ টীকা হইতেই এরূপ কথা জানিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ এই সকল নামের উল্লেখ দৃষ্টে শ্রীযুক্ত শ্রীধর বেলবেলকর অনুমান করিয়াছেন যে, এই সকল মুসলমান নরপতি স্বল্পায়াসগ্রাহ্য সারস্বত ব্যাকরণের অনুশীলনে উৎসাহ দিয়াছিলেন (System etc. পৃঃ ৯৩)। কিন্তু এই নামমাত্রের উল্লেখ হইতে এতটা অনুমান করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা বিবেচ্য। বস্তুতঃ, স্পষ্ট ইঙ্গিত না থাকিলে কেবল নামমাত্রের উল্লেখ হইতে আলোচ্য প্রবন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই। ফলে, টোডরমল সংকলিত টোডরানন্দ ও ভুবনানন্দ সংকলিত বিশ্বপ্রদীপ গ্রন্থে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে আকবর ও শেরসাহের উল্লেখ থাকিলেও এবং এই দুই গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহাদের উৎসাহদানের কথা মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি (বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর পুথির বিবরণ—৩। ভূমিকা পৃঃ ২৫) কেহ কেহ অনুমান করিলেও স্পষ্ট নির্দেশের অভাবে এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য, এইরূপ অনেক নরপতির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ সংস্কৃত বহু গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৬। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর পুথিশালায় ইহার একখানি পুথি আছে। ঐ পুথি অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধনলেখমালা'য় (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭—১০) ইহার এক বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

৭। এই গ্রন্থ বোম্বাই, মালাবার হিল হইতে ভালচন্দ্র সীতারাম সুকৃথঙ্কর কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

পুথি পাওয়া যায়। ১৯১২ সালে Indian Antiquary পত্রে (পৃঃ ৪৪ প্রভৃতি) ভি. এম. ঘাটে মহাশয় এই গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। তৎপূর্বেই ১৮৮৮ সালে ওয়েবর কর্তৃক জর্মান ব্যাখ্যাসহ ইহার এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

গঙ্গাধর নামক এক ব্যক্তি আকবর সাহির নির্দেশানুসারে 'নীতিসার' নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এই আকবরসাহি প্রসিদ্ধ আকবরের সহিত অভিন্ন হইলেও হইতে পারেন। ইহার একখানি পুথির বিবরণ বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর পুথির বিবরণের মধ্যে (৭।৫৫০৫) পাওয়া যায়।

একাধিক পণ্ডিত আকবরের নিকট হইতে উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 'মুহূর্ত্তমালা' নামক জ্যোতিষগ্রন্থের রচয়িতা রঘুনাথের পিতা নৃসিংহ আকবরের নিকট হইতে স্বীয় জ্যোতির্বিদ্যার নিদর্শনস্বরূপ 'জ্যোতির্বিৎসরস' এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।[৮] মনে হয়, এই নৃসিংহ ও আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে প্রদত্ত পণ্ডিতের তালিকায় উল্লিখিত নরসিংহ[৯] একই ব্যক্তি।

কাদম্বরীনামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গদ্যকাব্যের পূর্বার্ধ ও পরার্ধের টীকারচয়িতা ভানুচন্দ্র ও সিদ্ধচন্দ্র আকবরের নিকট হইতে যথাক্রমে উপাধ্যায় ও খুস্ফহম (?) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহাদের টীকার পুষ্পিকায় উল্লিখিত হইয়াছে।[১০]

শুনা যায়, তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা নারায়ণ ভট্টকে জগদ্গুরু এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।[১১] আইন্-ই-আকবরীতে উল্লিখিত নারায়ণ[১২] ও এই নারায়ণকে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

টোডরানন্দ, তান্ত্রিক প্রভৃতি রচয়িতা নীলকণ্ঠও ইহার প্রদত্ত সম্মানে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন[১৩]।

হরিহরাবলী, পদ্যামৃততরঙ্গিণী, সুভাষিতাবলী, সুভাষিতসার-সমুচ্চয় প্রভৃতি সূক্তিগ্রন্থে অকবরীয় কালিদাস নামক এক কবির কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।[১৪] কবির এই উপাধি স্বগৃহীত, কি আকবর-প্রদত্ত, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

৮। শাহাকব্বরসার্বভৌমতিলকাদ্দিল্লীমতল্লীশ্বরাজ্জ্যোতির্বিৎসরসত্বমাপ পদবীমাসেরিদুর্গগ্রহে ॥

Desc. Cat. Sans. Mss. in the Asiatic Soc. Bengal—তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৬৭।

৯। Indian Historical Quarterly—১৩।৩৩।

১০। ভানুচন্দ্র-লিখিত অংশের পুষ্পিকা :—

পাতিশাহ শ্রীঅকব্বরপ্রদাপিতোপাধ্যায়পদধারকঃ...। ভানুচন্দ্র গ্রন্থের প্রারম্ভেও আকবরদত্ত সম্মানের উল্লেখ করিয়াছেন :—

শ্রীবাচকঃ সম্প্রতি ভানুচন্দ্র অকব্বরক্ষ্মাপতিদত্তমানঃ।

সিদ্ধচন্দ্র-লিখিত অংশের পুষ্পিকা :—

শ্রীঅকব্বরপ্রদত্ত খুস্ফহমাপরাভিধানমহোপাধ্যায়...।

১১। Desc. Cat. Sans. Mss. As. Soc. Beng, ৩য় খণ্ড, Preface পৃঃ XXVIII.

১২। Ind. Hist. Quarterly—১৩।৩৪।

১৩। Hist. of Dharmasastra—Kane, পৃঃ ৪২২

১৪। Desc. Cat. Sans. Mss. As. Soc. Beng. ৭।৫৪৫৪, Peterson—Second Rept. Search of Sans. Mss পৃঃ ৫৭, Bhandarkar Rept. Search of Sans. Mss. Bomb. Presi. (1887-91) পৃঃ LXII.

যে সমস্ত পণ্ডিত আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের প্রসাদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তাজিকরচয়িতা নীলকণ্ঠের পুত্র গোবিন্দ শর্মা,[১৫] কবিকর্ণপূর প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। কবীন্দ্রের অনুজ কামরূপবাসী করণবংশীয় কবিকর্ণপূর জাহাঙ্গীরের নির্দেশক্রমে সংস্কৃত পারসীপদপ্রকাশ নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[১৬] পারসী ভাষার একখানি ব্যাকরণও তিনি সংস্কৃত পদ্যে রচনা করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর নিজে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন কি না, বলিতে পারা যায় না। তবে কাব্যালঙ্কারসূত্রের একখানি পুঁথিতে সেলিম নামাঙ্কিত মুদ্রা দৃষ্টে মনে হয়, তাঁহার গ্রন্থাগারে সংস্কৃত পুঁথিও ছিল।[১৭]

জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজাহানের বিদ্যোৎসাহিতাও কম ছিল না। ইঁহার সন্তোষবিধানের জন্য বেদাঙ্গরায় পারসীপ্রকাশ নামক জ্যোতিষবিষয়ক কোষগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[১৮] ইনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী কবীন্দ্রাচার্যকে 'সর্ববিদ্যানিধান' এই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। বারাণসী ও প্রয়াগে তীর্থ-যাত্রীদের নিকট হইতে কর আদায়ের যে প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদকল্পে কবীন্দ্রাচার্য বহুজন সমভিব্যাহারে সাজাহানের দরবারে উপস্থিত হইলে এই উপাধি প্রদত্ত হয়।[১৯] কথিত হয় যে, পরশুরাম মিশ্র নামক প্রবীণ পণ্ডিতকে সাজাহান 'বাণীবিলাস রায়' উপাধি প্রদান করেন।[২০] সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ইঁহারই সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—এই 'দিল্লীবল্লভেরই' 'পাণিপল্লবতলে' তিনি নবীন বয়স কাটাইয়াছিলেন।

কাশ্মীরের জাইন-উল-আবিদিনের সংস্কৃতানুরাগের উল্লেখ ইতঃপূর্বেই করা হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থের পারসীক অনুবাদ প্রণয়ন করাইয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। সংস্কৃত পুথি সংগ্রহেও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল বলিয়া মনে হয়। তিনি অর্থ ও সংগৃহীত পুথি নানা-স্থান হইতে আনীত পণ্ডিতদিগকে দান করিতেন[২১]—পণ্ডিত পোষণ করিতেন—নিজে যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণের পাঠ শুনিতেন।[২২]

১৫। Desc. Cat. Sans. Mss. As. Soc. Beng—৩। ৭৬৮।

১৬। শ্রীমজ্জহাঙ্গীরমহেন্দ্র ভূপরসামাধ (?) নিদেশরূপম্। করোত্যদঃ সংস্কৃতপারসীকপদপ্রকাশং কবিকর্ণপূরঃ॥ এই প্রসঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় (১৯২৮, পৃঃ ৪৭০) প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৭। Kavindracarya's List (Gaekwad's Oriental Series)—Foreword—p. IV.

১৮। নত্বা শ্রীভুবনেশ্বরীং হরিহরৌ লম্বোদরাদীন্ দ্বিজান্। শ্রীমচ্ছাহজহাননরেন্দ্রপরমপ্রীতিপ্রসাদাপ্তয়ে॥ কৃত্বা সংস্কৃতপারসীকরচনাভেদপ্রদং কৌতুকং। জ্যোতিঃশাস্ত্রপদোপযোগিসরলং বেদাঙ্গরায়ঃ সুধীঃ॥

১৯। Kavindracarya's List—Foreword পৃঃ ৫।

২০। শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ—Saraswati Bhavan Studies, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১—৪।

২১। পুরাণতর্কমীমাংসাঃ পুস্তকানপরানপি। দূরাদানায্য বিত্তেন বিদ্বদ্ভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ॥ (শ্রীবরকৃত রাজতরঙ্গিণী—১।৫।৭৯)
বর্ষা মরুদিব ক্ষ্মাপস্তৎবিদ্যাপ্রত্যায়োৎসুকঃ। অনায়য়ৎ স তান্ সর্বান্ পণ্ডিতান্ নিজমণ্ডলম্॥
রাজা সংরোপিতানর্ঘবৃত্তিদানেন পণ্ডিতান্। অপ্যায়য়জ্জলেনেব মালাকারো মহীরুহান্॥
জোনরাজকৃতরাজতরঙ্গিণী—১০৪৮,১০৫০।

২২। মোক্ষোপায় ইতি খ্যাতং বাশিষ্ঠং ব্রহ্মদর্শনম্। মমুখাদশৃণোদ্ রাজা শ্রীমদ্বাল্মীকিভাষিতম্॥
শ্রীবরকৃতরাজতরঙ্গিণী—১।৫।৮০।

অসালতিপ্রকাশ নামক এক কোষগ্রন্থ[২৩] কাশ্মীরের অসালতি খাঁর নির্দেশক্রমে মীরমীরা-সুত কর্তৃক বিরচিত হইয়াছিল। আবার এই মীরমীরাসুতের আদেশে বেণীদত্ত পঞ্চতত্ত্বপ্রকাশ নামক এক গ্রন্থ[২৪] রচনা করিয়াছিলেন।

পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ বারভূঁইয়ার অন্যতম ঈশা খাঁর পুত্র মুসাখাঁর (১৫৯৯—১৬২৩) আদেশে মথুরেশ শব্দরত্নাবলী নামে এক সংস্কৃত অভিধান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।[২৫]

লোদীবংশাবতংস আহম্মদ খাঁর পুত্র লাড়খাঁ নামক নরপতির মনোরঞ্জনের নিমিত্ত কল্যাণমল্ল অনঙ্গরঙ্গ নামক কামশাস্ত্রের বই লিখিয়াছিলেন।[২৬]

বাংলার সুপ্রসিদ্ধ নবাব শায়েস্তা খাঁ কেবল প্রজাদের ঐহিক সুখসমৃদ্ধির দিকেই দৃষ্টি রাখিতেন, এমন নহে—দেশের সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারই পরিতৃপ্তির জন্য ১৭৮৫ শাকে চতুর্ভুজ কর্তৃক রসকল্পদ্রুম নামে একখানি

২৩।
শ্রীশম্ভুকৌতুকরামলকান্তপুর
বিভ্রাজমাণগিরিজাচরণৌ প্রণম্য।
কাশ্মীরভূমিনগরে প্রকরোতি কোশং
শ্রীমানসালতিমহীবরখাননাম্না ॥

... ...

রাজ্ঞাসালতিখানেন গুণিনা প্রেরিতোঽস্ম্যহম্।
অসালতিপ্রকাশাখ্যং কোশং কুর্বে মহাগুণম্ ॥
শুভশব্দসুবর্ণাঢ্যং পদানুপ্রাসসম্মণিম্।
মীরমীরাসুতঃ কোষং দত্তে গৃহ্নন্তু সদ্বুধাঃ ॥

Oxf. (অউফ্রেকট সংকলিত বোড্‌লিয়ন লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুথির বিবরণ)—৪৪৪।

২৪। পঞ্চতত্ত্বপ্রকাশোঽয়ং বেণীদত্তেন ধীমতা। প্রকাশিতঃ প্রকাশার্থো মীরমীরাসুতাজ্ঞয়া ॥ Desc. Cat. Sans. Mss. As. Soc. Beng. ৬। ৪৭০৯ A; R. L. Mitra. Notices of Sans. Mss.—৬।১৪৩৭.

২৫। Desc. Cat. Sans. Mss. Ind. Office Lib.—২।১০১৬-৭; Oxf. No. 439-40; R. L. Mitra—Notices Sans. Mss. ৩।১১০৫; ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪২, পৃঃ ৬০৬—১০, আশ্বিন ১৩৪৩, পৃঃ ৫৭২—৭।

২৬।
লোদীবংশাবতংসো হতরিপুবনিতানেত্রবারিপ্রপূর-
প্রাদুর্ভূতাম্বু সিন্ধুষ্মিতজবতয়া লীলয়া প্লাবিতাশ্বঃ।
সৎপুত্রঃ খ্যাতকীর্তে রহমদনৃপতেঃ কামসিদ্ধান্তবিদ্বান্
জীয়াচ্ছ্রীলাড়খানঃ ক্ষিতিপতিমুকুটৈর্ঘৃষ্টপাদারবিন্দঃ ॥
অস্যৈব কৌতুকনিমিত্তমনঙ্গরঙ্গগ্রন্থং বিলাসিজনবল্লভমাতনোমি।
শ্রীমান্ কবিরশেষকলাবিদগ্ধঃ কল্যাণমল্ল ইতি ভূমিমুনির্যশস্বী ॥

সংস্কৃত সূক্তিগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল[২৭]। ইহার উপক্রমাংশে শায়েস্তা খাঁর বিস্তৃত বংশপরিচয় দেওয়া হইয়াছে

মুসলমান নরপতিগণের সংস্কৃতানুরাগের আর একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ—স্থানবিশেষে সংস্কৃতকেই দরবারের ভাষার মর্যাদা প্রদান। কাশ্মীরে মুসলমানদের কবরের উপরও কোথাও কোথাও সংস্কৃতলিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ একটী লিপির তারিখ ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দ।[২৮] একজন মুসলমান শাসক স্বীয় কৃত কার্যের বিবরণ সংস্কৃতলিপিতে প্রস্তরের উপর উৎকীর্ণ করাইয়া গিয়াছেন। দিনাজপুরের অন্তর্গত ধুরাইলে এই লিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, মহম্মদসার শাসনকালে নরবাজ খাঁর পুত্র প্রধান মন্ত্রী করাম খাঁ একটী সেতু নির্মাণ করাইয়াছিলেন।[২৯] বাংলার নবাব সিরাজ উদ্দৌলা মাতামহ আলিবর্দি খাঁর পারলৌকিক কৃত্য উপলক্ষে সংস্কৃত পত্র দ্বারা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।[৩০]

মুসলমানরচিত সংস্কৃতগ্রন্থাদির বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে বঙ্গের সপ্তগ্রাম-বিজেতা জরাফ খাঁ ওরফে দরাফ খাঁর রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ একটী গঙ্গাস্তোত্র বাংলাদেশে প্রচলিত আছে।[৩১] শুনা যায়, প্রসিদ্ধ কবি আবদুর রহিম খান খানান সংস্কৃতে খেটকৌতুক নামক একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, তাঁহার রচিত মদনাষ্টকের প্রতি কবিতার প্রত্যেক পঙ্ক্তির অর্ধাংশ সংস্কৃতে ও অর্ধাংশ হিন্দীতে রচিত—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।[৩২]

মুসলমানের হস্তলিখিত সংস্কৃতগ্রন্থের একখানি পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, বর্তমানে ইহা কাশীর সরস্বতীভবনে রহিয়াছে। পুথিখানি বামনসূত্রবৃত্তি নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের। আল্লাবক্স্ কর্তৃক ইহা সর্ববিদ্যানিধান কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতীর জন্য লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।[৩৩] কথিত হয় যে, আল্লা বক্স্ কবীন্দ্রাচার্য কর্তৃক লেখকরূপে

২৭। তস্যানুরঞ্জনায়ৈব গ্রন্থং নবরসাত্মকম্। চতুর্ভুজো রচয়তি স্বপদ্যৈশ্চ পরৈরপি ॥
... ... বাণাশর্ষিশশাঙ্কাব্দে বৈশাখে পূর্ণিমাগুরৌ ॥

Peterson—Catalogue of Sans. Mss. in the Library of the Maharaja of Ulwar—Estract No. 225.

২৮। Stein—Kalhana's Chronicle of the Kings of Kashmir—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩০, পাদটীকা ২ ; Z. D. M. G—৪০।৯ ; Indian Antiquary—২০।১৫৩।

২৯। Niradbandhu Sanyal—List of Inscriptions in the Museum of the Varendra Research Society, Rajshahi – পৃঃ ১৪।

৩০। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে—উদ্ভটসাগর, ৩।৭৪।

৩১। Journ. As. Soc. Beng.—১৬।৩৯৬।

৩২। ভারতবর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৪৩, পৃঃ ২৬৫।

৩৩। Kavindracarya List—Introduction. p.XIII.

নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আর কোনও গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন কি না, জানা যায় নাই।

মুসলমানগণের এইরূপ সাহিত্যপ্রীতির ফলেই বোধ হয়, কেহ কেহ মুসলমান শাসকগণের অনুকূল দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সংস্কৃতে তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত সংকলন বা প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। আকবরকে কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা কেবল দিল্লীশ্বর বলিয়া পরিতৃপ্ত না হইয়া জগদীশ্বর আখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে রচিত কোনও স্বতন্ত্র গ্রন্থ এখন পর্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই। তবে এশিয়াটিক সোসাইটীর পুথিশালায় রক্ষিত জ্বালামুখীস্তোত্রের একখানি পুথির শেষে তাঁহার এক ক্ষুদ্র প্রশস্তি দেখিতে পাওয়া যায়।[৩৪] হয়ত এইরূপ আরও বহু প্রশস্তি রচিত হইয়াছিল। অন্যান্য রাজগণ সম্বন্ধে রচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থের মধ্যে বিজয়পুরকথা, ফতেসাহপ্রকাশ, অসফবিলাস, অহমদাবাদের সুলতান মহম্মদসার জীবনচরিত রাজবিনোদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য[৩৫]।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

৩৪। Desc. Cat. Sons. Mss. As. Sac. Beng—৭।৫৩৪৮।

৩৫। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে সংকলিত 'উদ্ভটসাগর' নামক গ্রন্থে (১২৩, ৩৭৩—৭৭) বিভিন্ন মুসলমান নরপতি সম্বন্ধে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ, নায়কগোপাল প্রভৃতি রচিত কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলী

বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্থান একটু অনন্যসাধারণ—নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া পুরাতন প্রবাহকে অব্যাহত রাখিয়াই তিনি নূতনের খাত খনন করিয়া তাহাতে নবধারার সূত্রপাত করিয়াছেন। সে হিসাবে বাংলা কাব্যসাহিত্যে তিনি গঙ্গাধর—জটায় স্বর্গমন্দাকিনীর সমগ্র গতিবেগ ধারণ করিয়া তিনি মর্ত্ত্যগঙ্গা প্রবাহিত করাইয়াছেন। পুরাতন ধারার তিনি শেষ কবি এবং নূতন ধারার তিনি উদ্বোদ্ধা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লইয়া যিনি আলোচনা করিবেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে এই মূল কথাটা বিস্মৃত হইলে তাঁহার চলিবে না।

ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাংলা দেশের কবি, এই জন্যও বিশেষ করিয়া আজ স্মরণীয়। তাঁহার জীবনী ও কাব্য সম্যক্ অনুধাবন করিলে তদানীন্তন বাংলা সমাজ ও সাহিত্য-জীবনের মূল কেন্দ্রটিও আমাদের লক্ষ্যগোচর হইবে। এই কেন্দ্র হইতে আমরা বাহির ও ভিতরের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে বর্ত্তমানে বিচ্যুত হইয়াছি বলিয়া পুরাতনের সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজিয়া পাইতেছি না। অথচ জাতীয় জীবনের ক্রমোন্নতির পক্ষে এই সূত্র খুঁজিয়া বাহির করা একান্ত আবশ্যক। আমি নীরস ঐতিহাসিক—ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্য ও কবিতায় ছন্দ ও ভাব গত রসের সন্ধান দেওয়া আমার কাজ নয়; কাব্যরসিককে ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বহিঃপরিচয় দিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। ইহা পাঠে যদি কোনও রসিকের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়, তবেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

গ্রন্থাবলী

(১) কালীকীর্ত্তন। ১৮৩৩। পৃ. সংখ্যা ২৭।

ইহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি:—

> শ্রীশ্রী তারা। / ত্রিভুবন সারা। / কালীকীর্ত্তন গ্রন্থ। / লোকান্তর গত ৺ রামপ্রসাদ সেনের কৃত। / শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যত্নানুসারে সংগ্রহণ পূর্ব্বক / সংশোধিত হইয়া কলিকাতাস্থ মৃজাপুরে / শ্রীব্রজমোহনচক্রবর্ত্তির গুণাকর / যন্ত্রে মূদ্রাঙ্কিত হইল। / এই গ্রন্থ গ্রহণে যাঁহার অভিলাষ হয় তিনি মোং / জোড়াসাঁক চাষাধোবা পাড়ায় / শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট অথবা বাগবাজার / নিবাসি শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষের বাটী/তে স্বয়ং কিম্বা লোক প্রেরণ / করিলে প্রাপ্ত হইতে / পারিবেন ইতি। / শকব্দা ১৭৫৫ ইং ১৮৩৩ সাল। /

'কালীকীর্ত্তন'ই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। এই পুস্তকখানির ভূমিকা-স্বরূপ তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

ঈশ্বরস্ত হৃদয়ে পদাম্বুজং সন্নিধায় শশিখণ্ডভালিকে।

অথ কালীকীর্ত্তনানুষ্ঠান।

স্বস্তি কবিরঞ্জনাপরনাম রামপ্রসাদসেনকালীভক্তাবতারাবতারিত নবীন পদবী কালীকীর্ত্তনাভিধান ভক্তিরসপ্রধান মধুরগান পদাবলী পুস্তক অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজনশ্রবণগোচর হয় নাই যদ্যপি গায়ক দ্বারা অথবা অন্য কোনপ্রকারে তাহার যৎকিঞ্চিদংশ কোন২ মহাশয়ের কর্ণপথগত হইয়াও থাকে তথাপি সমুদয় শ্রবণ ব্যতিরেকে তাদৃশাপূর্ব্ব রসাস্বাদন হইবার সম্ভাবনা হয় না ইহাতে তত্তন্মহাশয়েরদের যৎকিঞ্চিদংশ শ্রবণোত্তর কালে তত্তাবদংশ শ্রবণ স্পৃহাতে মনের ব্যগ্রতা সর্ব্বদা থাকে।

অপরঞ্চ কালীকীর্ত্তনব্যবসায়ি গাথক যে কয়েক জন দৃষ্ট হয় তাহারদের উচ্চারণানভিজ্ঞতা ও সামান্যতো অজ্ঞতা প্রযুক্ত গীতকর্ত্তার অভিপ্রেত রস ভাবার্থব্যতিক্রমজন্য রসভঙ্গ হওয়াতে শ্রবণ কালে মনে সুখোদয় না হইয়া বরং খেদোদয় হয় এবং এই পরকীয় দোষে গ্রন্থকর্ত্তার দোষানুমান হওয়াতে তাঁহার এই মহাকীর্ত্তিসুধাকরে কলঙ্কোদয় সম্ভাবনা হইলেও হইতে পারে।

অতএব পূর্ব্বোক্ত নানা দোষ পরীহারার্থ এবং ঐ অপূর্ব্ব গীতগ্রন্থের অবৈকল্যরূপে ও প্রাচুর্য্যরূপে বহুকালস্থায়িত্বার্থ আমি আকরস্থান হইতে মূল-পুস্তক আনয়নপূর্ব্বক সংশোধিত করিয়া কালীকীর্ত্তনপুস্তক মুদ্রিত করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাতে সাধু সদাশয় মহাশয়েরা নয়নাস্তপাত করিলে তাঁহারদের মনে কালীভক্তিকল্পলতাঙ্কুরবৃদ্ধি ও পরগুণগ্রাহিতা প্রকাশ হয় এবং গ্রন্থকর্ত্তার মহা-কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হয় এবং আমারও এতাবৎ পরিশ্রমের সুফলসিদ্ধি হয়।

সংশোধিতামপি ময়া বহুলপ্রয়াসৈর্গীতাবলীং পুনরিমাং প্রতিশোধয়ন্তু। সন্তঃ সুশান্তনয়নান্তনিরীক্ষণেন কৃত্বা কৃপামিহ ময়ীশ্বরচন্দ্রগুপ্তে॥

কালীকীর্ত্তন সংগ্রহকারের উক্তি।

পয়ার। মত্ত হও বন্ধুগণ কালীপদ্মপায়। যে পদ ধরিয়া শিব শিবপদ পায়॥ কালহরা কালদারা কালিকার পদে। ভবভয় নাহি রয় সুখ পদে২॥ শ্যামানাম মোক্ষধাম বেদাগমে কয়। স্মরণ করিলে নামে ধামে টেনে লয়॥ এক চিত্ত করি তাঁরে ভজ এই ভবে। যদি মনে লয় তাহে লয় হবে তবে॥ ঘোর দুর্গে ডাক সদা দুর্গে২ রবে। দিনেশতনয়ক্লেশলেশ নাহি রবে॥ শিবাশিব তেজি সবে শবে ভাব শিবে। শিবাশিবপ্রদা শিবা শিব দেন শিবে॥ ভগ্ন দিয়া মিথ্যা আশা মগ্ন হও ধ্যানে। তারাতত্ব কর তত্ত্ব গুরুদত্ত জ্ঞানে॥ ভাবে ভাব ভাবি ভাব তাহা নহে দূর। ভাবি ভাবি ভাবি

শ্যামা চিত্তে নিত্য রয়॥ অতএব হও সবে ভাবি ভাবাধীন। তারা তারা মুদে ধ্যান কর দিন২॥ শক্তি শক্তিমতে যেই ভজে ভক্তিপানে। তারে তারে তারিণী করুণা দৃষ্টি দানে॥ দেহ দেহশুদ্ধি হেতু মন যোগে যাগে। কালীকালি নাহি দিয়া হৃদে তাহে জাগে॥ কর করযন্ত্রে বাহ্য বিষয় না চাও। নিত্য নিত্য নৃত্যকালী হৃদয়ে নাচাও॥ মূলাধার স্থান তাঁর মহাকালনারী। মূলাধার জ্ঞান কর মহাকালনারী॥ ন্যায় তাঁর ভাব নেয় নানা ন্যায় পেতে। ন্যায় যদি ত্যজ সবে তবে পার পেতে॥ তর্ক করে বৃথা তর্ক চরণে২। তর্ক ত্যজ স্থান পাবে চরমে চরণে॥ দরশন তত্ত্ব নাহি পায় মিছা ভাবে। দরশন পাবে যদি ভাব ভক্তিভাবে॥ তন্ত্রমন্ত্রফাঁদে পড়ে না হইও ভোলা। তন্ত্র কে বুঝিবে তাঁর ভোলা ভেবে ভোলা॥ দেখ সেই মায়ার মায়ার বশ সব। হররাণী হরে হরে করে সদা শব॥ ত্রিভুবন মায়ের মায়ের মূলাধার। কালীরূপ কর চিত্র চিত্ত করি সার॥ সাধকের কোমল কমল হৃদিপরে। শ্যামা থাকে থাকে২ সদানন্দ ভরে॥ যথা শত২ শতদল ফুটে জলে। তেমতি মা সর্ব্বঘটে সর্ব্বঘটে চলে। পেলে দুর্গাপদ তার তরি এই ভব। কিন্তু ভবপারে পারে পাঠাইতে ভব॥ ভব সিন্ধুপার হেতু সেতু কর হরে। ভব সিন্ধু সম দুঃখ নিমিষেতে হরে॥ কারে দিব উপদেশ দেশ ভাল নয়। দ্বেষে২ ধর্ম্ম কর্ম্ম সব পণ্ড হয়॥ নাহি জেনে অহং কার করে অহঙ্কার। জানে না যে জীবন জীবনবিম্বাকার॥ ভব পার হেতু সবে ভবে করে হেলা। না করে সে পদ ভ্যালা ভ্যালা৩॥ বালক বা লোক সব এই কলি কালে। দিন২ জ্ঞানহীন বদ্ধ পাপজালে॥ লঘু সঙ্গে রঙ্গে সদা চালে মনোরথ। লোচন হীনের ন্যায় ভ্রমে ভ্রমে পথ॥ সেই অন্ধ তাঁর স্কন্ধে যেই অন্ধ চড়ে। উভয়ে ভ্রমিতে বর্ত্ম কূপ মধ্যে পড়ে॥ নীচের নিকটে সদা উপদেশ লওয়া। নাবিকেরে অর্থ দিয়া ডুবে পার হওয়া॥ সাধু সহ বাসে হয় বিজ্ঞান লোচন। পরম পদার্থ তাহে হয় দরশন॥ জ্ঞানচক্ষু হত হেতু ইহা নাহি মানে। দর্পণেতে যত সুখ অন্ধে কি তা জানে॥ লোকের বারণমন না মানে বারণ। ললাটের ফেরে ফেরে না জানে কারণ॥ অজ্ঞান মনুষ্য প্রতি বৃথা দিই দোষ। কপালে সকল করে কেন করি রোষ॥ করে করে তম নষ্ট যেই সুধাকর। সে চাঁদে কলঙ্ক গাঁথা ব্যক্ত চরাচর॥ শিবের প্রধান পুত্র সর্ব্বসিদ্ধিদাতা। বিঘ্নহর গণেশের কুঞ্জরের মাথা॥ কর্ম্মভোগ নাহি খণ্ডে শাস্ত্র যুক্তি সার। দেবের দুর্গতি এই মনুষ্য কি ছার॥ ভাল ভাল বিনে ভাল নাহি হয় তায়। অদৃষ্ট অদৃষ্ট লেখা খণ্ডান না যায়॥ কিন্তু সিদ্ধ বাক্য এই পূজ হরদারা। কপালের কপাল তারিণী সর্ব্বসারা॥ কালি দিয়া কালীনাম ললাটেতে রেখে। বিধি দত্ত বিধি যাহা রাখ তাহা ঢেকে॥ গুপ্তমর্ম্ম এই সেই শ্রীনাথের উক্তি। ভাবিলে তাঁহাকে লোক তায় পায় মুক্তি॥ একান্ত বাসনা তাঁর যাহে লোক তরে। তাইতো ঈশ্বর গুপ্ত মর্ম্ম ব্যক্ত করে॥

ত্রিপদী।

ভাব জীব তেজে মায়া মহেশমোহিনীমায়া মহাবিদ্যা মহেশ্বরী তারা। গত কালাগতকাল হৃদে ধর সহকাল কাল সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব কারা॥ করহ নিগূঢ় ভক্তি তাহে পাবে মহাশক্তি যুক্তিযুক্ত ব্যক্ত এই ধরা। জানতো বচনসার করিলে উত্তমাচার সরোবরে মীন পড়ে ধরা॥ কে জানে কালীর মর্ম্ম নখজ্যোতি পূর্ণব্রহ্ম ভাবে মত্ত সর্ব্ব সর্ব্বসহা। ভাবে যথা পুণ্যবানে তদ্রূপ মা কোলে টানে যেমন চুম্বুকে টানে লোহা॥ ত্রিগুণে ভুবনজয়ী বর্ণরূপা ব্রহ্মময়ী কুলকুণ্ডলিনী হংসবধূ। দুর্গানামামৃত পানে সবিশেষ গুণজ্ঞানে বদন কমলে ক্ষরে মধু॥ কখনো পদ্মিনীবামা কখনো চিত্রিণীরামা ছলেতে পুরুষ ছলে নারী। নানা বেশে বেশ ধরে মায়া কত মায়া করে সার মর্ম্ম বুঝিতে না পারি॥ ব্রহ্মারূপে পালে ক্ষিতি বাণীরূপে কণ্ঠে স্থিতি অন্নদা অম্বিকা কাশীমধ্যে। কমলে কমলা হন মাতা কত মতে রণ হরগৌরী হন মধ্যে২॥ দ্বৈত ভাব ত্যাজ্য কর জ্ঞানচক্ষু যত্নে ধর লহ২ সার উপদেশ। জীবে দিতে মোক্ষধাম সেই ব্রহ্ম গুণধাম ধারণ করেন নানাবেশ॥ যে জন যে ভাবে ভাবে তারে তুষ্ট সেই ভাবে না দেন ভক্তের মনে কালি। সদাশিব আত্মারাম কভু সীতা কভু রাম বিধি বিষ্ণু যা রাধা সা কালী॥ কৃষ্ণরূপে বাঁশী করে সদা রাধা নাম করে প্রেমানন্দে প্রফুল্ল গোকুল। কুঞ্জবনে নানা ছলে গোপিকার মন ছলে মনোরম্য স্থান সে গোকুল॥ রাধারূপে ব্রজনারী সে ভাব বুঝিতে নারি কলঙ্কিনী বলে ঘরে পরে। লজ্জাভয় পরিহরি মুখে বলে হরি হরি হরিপ্রেমভূষা অঙ্গে পরে॥ কালীরূপে কাল পরে কটিপরে কর পরে গলে দোলে শবমুণ্ড সব। এলোকেশী সর্ব্বনাশী অট্টহাসী সর্ব্বনাশি অসী করে রণে করে শব॥ শিবরূপে যোগবলে সদা বোম২ বলে হাড়মালা গলে করে শিঙ্গে। গায় ধুলা যোগে ভোলা হয়ে ভোলা ভাব ভোলা শিঙ্গে ফুঁকে পাবে সবে শিঙ্গে। ধনুর্ধারি রামরূপে যুদ্ধ করে নানারূপে পাষাণ ভাষাণ সিন্ধুজলে। ছলেতে হইয়া সীতা জনকে বলিয়া পিতা নিজে নিজাঙ্গনা নিজ বলে॥ হইয়া অদ্বৈতবাদী জগতের বস্তু আদি কালী রাঙ্গা পায় রাখ মন। এক ভিন্ন দুই নয় বিরূপ যে জন কয় ধরাতলে মূঢ় সেই জন॥ উপাসনা ভেদমাত্র বারিপূর্ণ করি পাত্র রবিছায়া দেখ সেই জলে। হবে ব্রহ্ম নিরূপণ ত্রিভুবনে সর্ব্বক্ষণ প্রশংসা প্রদীপ তবে জ্বলে॥ অতএব বন্ধুবর্গ তেজিয়া কর্ম্মের বর্গ ব্রহ্ম উপসর্গ করি রহ। না কর অভক্তি দ্বেষ লয়ে সার উপদেশ ঈশ্বরের ভাব সদা লহ॥

এই পুস্তকের এক খণ্ড রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে।

পরবর্ত্তী কালে—১ পৌষ ১২৬০ সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র "কবিরঞ্জন ৺ রামপ্রসাদ সেনের 'জীবন বৃত্তান্ত' এবং তাঁহার প্রণীত 'কালীকীর্ত্তন' ও কৃষ্ণকীর্ত্তনাভিধান-ভক্তি রসপ্রধান-মধুর গান এবং অবস্থাভেদের শান্তি, করুণা, হাস্য, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীর প্রভৃতি কতিপয় রস ঘটিত পদাবলী" প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার অভিলাষে তিনি ১৭ অক্টোবর ১৮৫৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন :—

> কবিরঞ্জন ৺ রামপ্রসাদ সেন।
>
> উক্ত মহাত্মার "জীবন চরিত" এবং তাঁহার প্রণীত সঙ্গীতাদি নানা বিষয়ক কবিতা সকল আমরা অবিলম্বেই টীকা সহিত পুস্তকাকারে প্রকটন করিব, তাহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরে প্রকাশ করা যাইবেক।...এই বিষয় সংগ্রহ করণার্থ আমরা বিংশতি বৎসরাবধি গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছি,...।

কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত এই পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই।

(২) কবিবর ৺ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত। ১৮৫৫। পৃ. ৬১।

এই পুস্তকের আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ঈশ্বরো জয়তি। / কবিবর ৺ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের / জীবন বৃত্তান্ত / সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক / শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত / কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও বিরচিত হইয়া / কলিকাতা / প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। / ১ আষাঢ় ১২৬২ সাল। / এই গ্রন্থের মূল্য ১ এক তঙ্কামাত্র। /

এই পুস্তকের ভূমিকায় ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

> "পূর্ব্বে কয়েকজন কবির জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া গত মাসের প্রথম দিবসের প্রভাকরে বিশ্ববিখ্যাত মহাকবি ৺ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনচরিত উদিত করিয়াছি, এবং অদ্য সেই বিষয় স্বতন্ত্ররূপে উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। এতন্মধ্যে উক্ত মহাশয়ের প্রণীত অনেকগুলীন অপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট পদ প্রকটিত হইয়াছে,—সেই সকল কবিতা এপর্য্যন্ত কাহারো নেত্র কর্ণের গোচর হয় নাই, তাহার মধ্যে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি ও পারস্য ভাষার চমৎকার চমৎকার কবিতা আছে, যিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন, তিনিই আশ্চর্য্যে অভিভূত হইবেন, তিনিই ভারতচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য বিষয়ের প্রচুর প্রতিষ্ঠা করিতে থাকিবেন। অপিচ আমরা এই গ্রন্থে অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের কয়েকটী কঠিনতর ভাব-ভূষিত গূঢ়ার্থ-ঘটিত কবিতা টীকা সহিত প্রকটন করিয়াছি, তাহাতে সকলের মনে সন্তোষের সঞ্চার হইতে পারিবেক।"

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ।" এই উক্তি ঠিক নহে। ১৮৩৩ সনে ঈশ্বরচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'কালীকীর্ত্তন গ্রন্থে'র কথা বঙ্কিমচন্দ্রের জানা ছিল না।

(৩) প্রবোধপ্রভাকর। ১৮৫৮। পৃ. সংখ্যা ১২২।

ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

> ঈশ্বরোজয়তি।/ প্রবোধপ্রভাকর। / প্রথম খণ্ড। / জ্ঞানগুরু সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ / শ্রীযুত পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃপায় / সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক / শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক / বিরচিত হইয়া / কলিকাতা।/ প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। / সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নম্বর ভবন। / ১ চৈত্র ১২৬৪।/

ইহাতে পিতা-পুত্রের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে "কেবল নীতি এবং হিতোপদেশাদি বহুবিধ শিবকর বিষয় লিখিত হইয়াছে, গদ্যের অপেক্ষা পদ্যের অংশই অধিক।" বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর (১০ মাঘ ১২৬৫) পর তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার যে-সকল রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করিতেছি। এই সকল রচনা প্রথমে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

(৪) হিত-প্রভাকর। ১৮৬১। পৃ. সংখ্যা ১৯২।

ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ :—

> HIT PROBHAKUR. / By the Late / Baboo Issurchunder Goopto. / হিত-প্রভাকর।/ সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক / শ্রীরামচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক / প্রকাশিত হইয়া / কলিকাতা।/ প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।/ সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ / মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নং ভবনে।/ ১১ চৈত্র ১২৬৭।/

গদ্য-পদ্যে বর্ণিত হিতোপদেশের গল্পই এই পুস্তকের বিষয়বস্তু। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

(৫) মহাকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলীর সার সংগ্রহ। রামচন্দ্র গুপ্তের দ্বারা সংগৃহীত। ১৮৬২।

রামচন্দ্র গুপ্তই সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাসংগ্রহ পুস্তিকাকারে খণ্ডশঃ প্রচার করিতে সঙ্কল্প করেন। ইহার প্রথম তিন সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৬৯ সালে (১৮৬২ সনে)। প্রত্যেক সংখ্যায় ৩২ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখা থাকিত। এই তিনটি সংখ্যা আমি বহরমপুরে রামদাস সেনের লাইব্রেরিতে দেখিয়াছি। প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্রটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ঈশ্বরোজয়তি / মহাকবি / ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের / বিরচিত কবিতাবলীর / সার সংগ্রহ / প্রথম ভাগ / প্রথম সংখ্যা / সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুপ্তের দ্বারা / সংগৃহীত হইয়া / কলিকাতা।/ সংবাদ প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল / সন ১২৬৯ সাল / মূল্য প্রত্যেক ফরমার হিসাবে /০ এক আনা মাত্র /

ইহার ৪র্থ সংখ্যা ১২৭৬ সালে, ৫ম—৭ম সংখ্যা ১২৮০ সালে, এবং ৮ম সংখ্যা ১২৮১ সালে প্রকাশিত হয়। [illegible]

১৩ মার্চ্চ ১৮৭৯ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' সম্পাদক রামচন্দ্র গুপ্তের একটি বিজ্ঞাপনে ইহার ৮ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশের সংবাদ আছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে ইহার ৮খানি সংখ্যাই আছে, তবে সবগুলি প্রথম সংস্করণের নহে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রামচন্দ্র গুপ্তের সংস্করণ ছাড়া ঈশ্বরচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর অন্ততঃ আরও তিনটি সংস্করণ পরবর্ত্তী কালে প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলিতে ঈশ্বরচন্দ্রের সকল রচনাই স্থান পাইয়াছে, এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় ঈশ্বরচন্দ্রের এমন বহু রচনা আছে, যাহা গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। নিম্নে তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হইল।

(ক) কবিতাসংগ্রহ। সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। [১৫ই আশ্বিন] ১২৯২ সাল। পৃ. সংখ্যা ৩৪৮।

ইহার ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ" মুদ্রিত হইয়াছে।

পর বৎসর ১লা মাঘ, ১২৯৩ সালে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে এই কবিতা-সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ড (পৃ. সংখ্যা ৩৪৮) প্রকাশিত হয়।

(খ) কবিবর স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত। বসুমতী আফিস। আশ্বিন ১৩০৬। পৃ. সংখ্যা ১৭০।

বসুমতী আপিস হইতে পরে ১ম ও ২য় ভাগ গ্রন্থাবলী (পৃ. সংখ্যা ৩৮০) বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা-সহ একত্রে প্রকাশিত হয়।

(গ) গ্রন্থাবলী। প্রথম খণ্ড। ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত। ১৩০৮ সাল। পৃ. সংখ্যা ৩৩৬।

ভূমিকায় সম্পাদক লিখিয়াছেন, "এই খণ্ডে, কবিতা-সংগ্রহে প্রকাশিত কবিতা ব্যতীত আরো অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইল।"

এই গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড (পৃ. সংখ্যা ৩৭৬) ১৩০৮ সালেই প্রকাশিত হয়।

(৬) বোধেন্দু বিকাস। ১৮৬৩।

ইহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

Bodhaindu Vicasa / By the late Babu Issur / Chunder Goopto. Published by / Ram Chunder Goopto. /

বোধেন্দু বিকাস। / প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ / অর্থাৎ স্বভাবানুযায়ী বর্ণন / মহাকবি ৺ ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত। / প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুপ্ত / কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / কলিকাতা। / প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। / সিমুলিয়া নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রিট নং ৫৪ / ১২৭০ সাল। /

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-

সাময়িক পত্র পরিচালন

সাংবাদিক হিসাবে সে-যুগে ঈশ্বরচন্দ্রের বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। তিনি যে-সকল পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

সংবাদ প্রভাকর

বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই লিখিয়াছেন, 'সংবাদ প্রভাকর' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। 'সংবাদ প্রভাকর'ই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সর্ব্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। কিন্তু প্রথমে ইহা সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের তারিখ ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১ (১৬ মাঘ ১২৩৭, শুক্রবার)। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের কণ্ঠদেশে এই দুইটি শ্লোক মুদ্রিত থাকিত ; শ্লোক দুইটি সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের রচিত :—

॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥

॥ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকরঃ ॥

॥০০০॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং
পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥০০০॥

॥০০০॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু
চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥০০০॥

'সংবাদ প্রভাকর'-প্রকাশে ঈশ্বরচন্দ্রের সাহায্যকারী ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর। যোগেন্দ্রমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক এবং তাঁহার কবিতার গুণগ্রাহী। তাঁহারই ব্যয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথমে চোরবাগানের একটি মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। কয়েক মাস পরে—১২৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে ঠাকুরবাড়ীতে 'সংবাদ প্রভাকর' মুদ্রণের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইল। কিন্তু ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুতে "প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।" দেড় বৎসর পরে—২৫ মে ১৮৩২ (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯) তারিখে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের প্রচার রহিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ইহারও মাস-তিনেক পূর্ব্বে 'সংবাদ প্রভাকরে'র সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' লেখেন :—

> ... প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাস [১২৩৮] পর্য্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্ম্ম পক্ষ ছিলেন তৎপরে গুপ্ত মহাশয় ঐ পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে ধর্ম্মদ্বেষী হন নাই কেননা ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়া ৬৯ সংখ্যক কিরণ প্রকাশ করিয়া গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিয়াছেন আর তাঁহার দর্শন হওয়া ভার ......।

চারি বৎসর পরে, ১০ আগষ্ট ১৮৩৬ (২৭ শ্রাবণ ১২৪৩) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' পুনঃপ্রকাশিত হয়, তবে এবার সাপ্তাহিকরূপে নহে,—বারত্রয়িক (সপ্তাহে তিন বার) রূপে। ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

> ১২৪৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্ব্বার বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ করি তখন এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি আমাদিগের এমন সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসংসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে পাতুরেঘাটানিবাসী সাধারণ-মঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও তদগ্রজ বাবু গোপালচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান করিলেন এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্যকক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ত্রুটি করেন না।—'সংবাদ প্রভাকর', ১ বৈশাখ ১২৫৩।

এই ভাবে তিন বৎসর সগৌরবে চলিবার পর ১৪ জুন ১৮৩৯ (১ আষাঢ় ১২৪৬) তারিখ হইতে 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়।

'সংবাদ প্রভাকর' বহু বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ইহা যে সে-যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের বাংলা সংবাদপত্র ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির প্রাথমিক রচনাগুলি 'সংবাদ প্রভাকরে'ই প্রকাশিত হয়। আরও একটি কারণে 'সংবাদ প্রভাকরে'র নিকট আমরা বিশেষভাবে ঋণী। দীর্ঘকাল পরিশ্রম ও নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীন কবিদিগের বহু অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে তিনি অগ্রসর না হইলে বোধ হয় এত দিন কবিদিগের এই সকল রচনার কোন অস্তিত্বই থাকিত না। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের মাস-পয়লার কাগজে তিনি এগুলি সযত্নে মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কয়েকটির তালিকা দিতেছি :—

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	—১ আশ্বিন, ১ পৌষ, ১ মাঘ ১২৬০।
৺ রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)	—১ শ্রাবণ ১২৬১।
৺ রাম [মোহন] বসু	—১ আশ্বিন, ১ কার্ত্তিক, ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১।
৺ নিত্যানন্দদাস বৈরাগী	—১ অগ্রহায়ণ ১২৬১।
৺ হরু ঠাকুর	—১ পৌষ ১২৬১।
৺ রাসু, নৃসিংহ ও ৺ লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস	—১ মাঘ ১২৬১।

প্রাচীন কবি-প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৫ (১ মাঘ ১২৬১) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

> প্রাচীন কবি।—...আমরা বহুকালাবধি নিয়ত নিকর চেষ্টা ও প্রচুর প্রযত্নে প্রকর পরিশ্রম পুরঃসর এ পর্য্যন্ত যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশ পত্রস্থ করিয়াছি, ক্রমে করিতেছি এবং ক্রমে ক্রমে আরো প্রকাশ করিব, কিছুই গোপন রাখিব না। যে উপায়ে হউক যত পাইব ততই মুদ্রিত করিব।
>
> আমরা পূর্ব্বে ৺ রামপ্রসাদ সেন, ৺ রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধু বাবু, ৺ রাম বসু, ৺ নিতাই-দাস বৈরাগী ও তাঁহার সাহায্যকারিগণ, ৺ হরু ঠাকুর, ৺ অজু গোঁসাই, গোঁজলা গুঁই, কৃষ্ণ মুচী ও লালুনন্দলাল প্রভৃতি কতিপয় মৃত কবিকে কীর্ত্তির সহিত সজীব করিয়াছি। অদ্য আবার

৺রায় নৃসিংহ ও ৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসকে* জীবিত করিলাম, অদ্যাবধি ইঁহারা এই বিশ্ব বিপিনে অমর হইয়া বিচরণ করিবেন।...

ঈশ্বরচন্দ্রের একান্ত বাসনা ছিল, এই সকল কবিওয়ালাদের রচনা তাঁহাদের জীবন-চরিত-সমেত পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি তাহা করিয়া যাইতে পারেন নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলে বঙ্গসাহিত্যের মহোপকার করিবেন সন্দেহ নাই।

সংবাদ রত্নাবলী

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমীদার বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ই শ্রাবণে 'সংবাদ রত্নাবলী' প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন।"

'সংবাদ রত্নাবলী' একখানি সাপ্তাহিক পত্র। ইহার সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন :—

বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে 'সংবাদ রত্নাবলী' আবির্ভূত হইল। মহেশ চন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছু মাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম। রত্নাবলী সাধারণ সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্ম্মে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্ব্বতন সম্পাদক ৺রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হয়েন।—'সংবাদ প্রভাকর', ১ বৈশাখ ১২৫৯।

২৪ জুলাই ১৮৩২ তারিখে প্রকাশিত হইয়া 'সংবাদ রত্নাবলী' "এক বৎসর আট মাস তিন দিবস" পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।† ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র গুপ্তও লিখিয়াছেন,—

গুণাকর প্রভাকরকর বহুকাল রত্নাবলীর সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না, তাহা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে শ্রীক্ষেত্রাদি তীর্থদর্শনে গমন করিয়া কটকে পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্যামামোহন রায় পিতৃব্য মহাশয়ের সদনে কিছু দিবস অবস্থান করিয়া এক জন অতি সুপণ্ডিত দণ্ডির নিকট তন্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন, এবং তাহার কিয়দংশ বঙ্গভাষায় সুমিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন।—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ বৈশাখ ১২৬৬।

পাষণ্ডপীড়ন

২০ জুন ১৮৪৬ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন,—

১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষণ্ডপীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্ব্বে কেবল সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধপুঞ্জ প্রকটিত হইত, পরে ৫৪ সালে কোন

---

* 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে '৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস' রচনাটি হরিশ্চন্দ্র মিত্র-সম্পাদিত 'মিত্র-প্রকাশে' (১৫ আগষ্ট ১৮৭০) পরবর্ত্তী কালে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

† 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস,' ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১-৬০ দ্রষ্টব্য।

বিশেষ হেতুতে পাষণ্ডপীড়ন, পাষণ্ডপীড়ন করিয়া, আপনিই পাষণ্ড হস্তে পীড়িত হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক জনেক কৃতঘ্ন ব্যক্তি যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধার্ম্মিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগ দান করতঃ ঐ সালের ভাদ্র মাসে পাষণ্ডপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করিল, সুতরাং আমাদিগের বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।—'সংবাদ প্রভাকর', ১ বৈশাখ ১২৫৯।

'সম্বাদ ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ "পূর্ব্বে বন্ধুরূপে প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন" কিন্তু "১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবল হয়। ঈশ্বরচন্দ্র 'পাষণ্ডপীড়ন' এবং তর্কবাগীশ 'রসরাজ' পত্র অবলম্বনে কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ করেন।"

সংবাদ সাধুরঞ্জন

'পাষণ্ডপীড়ন' উঠিয়া যাইবার পর ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৪৭) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা প্রতি-সোমবার প্রভাকর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইত। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

প্রচণ্ড পাষণ্ড তরু প্রভঞ্জনঃ। সমস্ত সল্লোক মনোহসুরঞ্জনঃ॥
সদাসদালোচন লোচনাঞ্জনঃ। প্রকাশতে সংপ্রতি সাধুরঞ্জনঃ॥
॥ * ॥ প্রচণ্ড পাষণ্ডরূপ তরুপ্রভঞ্জন। সমস্ত সজ্জনগণ মানসরঞ্জন॥
॥ * ॥ সদা সৎ আলোচন লোচন অঞ্জন। সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরঞ্জন॥

'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রমণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ স্থান পাইত। কিছু দিন পরে 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল হইলে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা নবকৃষ্ণ রায়ের নাম সম্পাদক-রূপে প্রকাশ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—"'সাধুরঞ্জন' ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর [পর] কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল।" এই উক্তি ঠিক নহে। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পর বৎসরের (১২৬৬) বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল। কি অবস্থায় ইহার প্রচার বন্ধ হয়, তাহা ৫ আষাঢ় ১২৬৬ (১৮ জুন ১৮৫৯) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত সম্পাদকীয় উক্তি পাঠ করিলে জানা যাইবে :—

"কি কারণে সংবাদ সাধুরঞ্জন পত্র মাসত্রয়* হইল অপ্রকাশ রহিয়াছে, আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে তদ্বিবরণ বিদিত করা আবশ্যক বোধ করিলাম,

* ২০ জুন ১৮৫৯ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিত হয় :—"আমারদিগের সহকারি সম্পাদকের অনবধানতাবশতঃ গত শনিবাসরীয় প্রভাকরে লিখিত হইয়াছে, যে, প্রায় মাসত্রয় হইল, সাধুরঞ্জন অপ্রকাশ রহিয়াছে, কিন্তু তাহা নহে, বৈশাখ [১২৬৬] মাসেও সাধুরঞ্জন প্রকাশ হইয়াছে,...।"

গুণাকর প্রভাকর পত্র গ্রাহক মহোদয়দিগের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন, যে এতৎ পত্রের পূর্ব্বতন সম্পাদক ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় নীতি, ইতিহাস ও বিবিধ সৎপ্রবন্ধ এবং রহস্য ও অন্যান্য বিষয়ে কবিতাদি প্রকাশকরণার্থ উক্ত পত্রের সৃজন করিয়াছিলেন, তাঁহার লিপিনৈপুণ্যগুণে সাধুরঞ্জন অল্পকালের মধ্যেই আপনার নামানুরূপ কার্য্য-সাধন করাতে সাধারণ-সমাজে সম্যক বিধায়েই আদর প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানবিশারদ পণ্ডিত অবধি বিদ্যালয়ের ছাত্র পর্য্যন্ত অনেকেই সমাদরে সাধুরঞ্জন পত্র গ্রহণ করেন, কুলবালারাও অন্তঃপুরে তাহা পাঠ করিয়া পরস্পর আমোদিতা হইতেন, এবং কেহ কেহ তাহাতে প্রকাশার্থ কবিতা লিখিয়াও পাঠাইতেন, সাধুরঞ্জন পত্র এই ভারতবর্ষের বহুদেশে এইরূপে সমাদৃত হইলে কলিকাতার সরিফ সাহেব তাহাতে আপন কার্য্যালয়ের বিজ্ঞাপন সকল প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন, ঐ সময়ে ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বিবেচনা করিলেন, সাধুরঞ্জন পত্রে যখন প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন সকল আসিতে আরম্ভ হইল তখন তাহা আর আপনার নামে রাখা কর্ত্তব্য নহে, অতএব জ্ঞাতিভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায়কে তাহার সম্পাদক নামে পরিচিত করিলেন, নবকৃষ্ণ রায় ঐ সময়ে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে থাকিয়া মেডিকেল কালেজে চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন, সাধুরঞ্জনের লিপিকার্য্য কি অন্যান্য বিষয়ের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না, প্রভাকর সম্পাদক ও তাঁহার সহকারিরাই তাহার সকল কার্য্য পরিচালন করিতেন, শ্রীমান নবকৃষ্ণ রায় কেবল নামমাত্র সম্পাদক ছিলেন।

পরন্তু ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় পরলোক গমন করিলে উক্ত নবকৃষ্ণ রায় সাধুরঞ্জন পত্র স্বয়ং গ্রহণ করিয়া প্রকাশকরণের প্রার্থনা করাতে আমরা বলিলাম যে, সাধুরঞ্জন পত্র স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ কর, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, তাহা হইতে যে কিছু উৎপন্ন হইবেক, তাহাও তোমাকে দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু সাধুরঞ্জনের স্বত্ব তোমাকে দিতে পারি না, যেহেতু তাহা তোমার সম্পত্তি নহে, তোমার নামে কেবল বেনামী করা হইয়াছিল, একথা ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আপনার শেষ উইলপত্রে স্পষ্টরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিস্তর ভদ্রলোকেও ইহার সাক্ষি আছেন, আমারদিগের এই উত্তর শ্রবণ করিয়া নবকৃষ্ণ রায় কোন কথার উল্লেখ মাত্র না করিয়া এক [দিবস] আমার-দিগের অজ্ঞাতসারে সরিফ সাহেবের কার্য্যালয়ে [গমন করিয়া] সাধুরঞ্জন পত্রের সরিফ সেলের বিজ্ঞাপনের যে ছয় মাসের বিলের টাকা ছিল, তাহা আনয়ন করেন, আমরা তাঁহাকে এই অন্যায় ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কোন উত্তর না করিয়া রজনীযোগে যন্ত্রালয় হইতে সাধুরঞ্জন পত্রের হেড অর্থাৎ শিরোভূষণ এবং রুল ইত্যাদি লইয়া এক মাসের অধিক হইল, প্রস্থান করিয়াছেন, আর আমারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, এইক্ষণে লোকের নিকটে বলিয়া

অন্য যন্ত্র হইতে প্রকাশ করিবেন, কিন্তু সংবাদ পত্র প্রকাশ করা সকলের সাধ্য নহে।

সংবাদ সাধুরঞ্জন পত্র কয়েক মাস অপ্রকাশ থাকিবার মূল কারণ, অতি সংক্ষেপে উপরিভাগে লিখিলাম, অধুনা ঐ পত্র পুনঃপ্রকাশে আমরা বিশেষরূপেই যত্নবান আছি, তাহাতে যদ্যপি একান্তই কৃতকার্য্য হইতে না পারি তবে সাধুরঞ্জনের পরিবর্ত্তে অপর পত্র প্রকাশ করিয়া অনুগ্রাহক পত্রগ্রাহক মহাশয়দিগের নিকটে প্রেরণ করিব।

শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায়কে বিশ্বাসপাত্র ও অতি আত্মীয় বিবেচনা করিয়াই বিশুদ্ধ-স্বভাব ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার নামে সাধুরঞ্জন প্রকাশ করিয়াছিলেন, অধুনা তিনি আমারদিগের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিলেন, ইহাতে তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক ও আত্মীয়··· ধর্ম্মসংহারক ব্যতীত আর [কি বলিতে] পারি? ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় গ্রাসাচ্ছাদন ও পুস্তকাদি ক্রয় করণের টাকা দিয়া তাঁহার বিদ্যানুশীলনবিষয়ে বিশিষ্টরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, সময়ে সময়ে তাঁহার পরিবার প্রতিপালনবিষয়ে সাহায্য করিতেও ক্রটি করেন নাই, এবং তাঁহার পরলোকগমন হইলেও আমরা নবকৃষ্ণ রায়কে সর্ব্ববিষয়েই সাহায্য করিয়াছি, তাঁহাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিতাম, তাঁহার প্রতি এক দিবসের নিমিত্তও স্নেহশূন্য হই নাই, প্রভাকর যন্ত্রালয়ের অনেক কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু কি পরিতাপ! তাঁহার এমত দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল যে, অতি সামান্য অর্থের নিমিত্ত আমারদিগের সেই সুদৃঢ় স্নেহরজ্জুকে একেবারে ছেদ করিয়া গেলেন। বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হইলে লোকের এইরূপ অবস্থানন্তর ঘটিয়াই থাকে, কতিপয় কুচক্রির কুপরামর্শ শ্রবণ করত সাধুরঞ্জনের হেড চুরি ও টাকা হরণ করিয়া অভিমানভরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সাধুরঞ্জন পত্র স্বয়ং প্রকাশ করিয়া সম্পাদক হইবেন, অধুনা তাঁহার কুচক্রকারি কুমন্ত্রিগণ কোথায়! কৈ সাধুরঞ্জন পত্র প্রকাশ হইল না?"

ইহার পর 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্র আর প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার পরিবর্ত্তে প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কাগজখানির নাম 'সংবাদ দ্বিজরাজ।' ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয় ১৮৫৯ সনের ১৯এ সেপ্টেম্বর। এই সংখ্যায় সম্পাদকীয় উক্তিতে প্রকাশ :—

...সংবাদ প্রভাকর পত্রের অন্তর্গত যে প্রকার সাধুরঞ্জন পত্র ছিল এই দ্বিজরাজ পত্রও সেই প্রকার হইবেক।

ঈশ্বরচন্দ্র দীর্ঘজীবী ছিলেন না, সম্যক্ শিক্ষালাভের সুযোগও তাঁহার জীবনে ঘটে নাই; এই অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার স্বল্পপরিসর জীবনে বাংলা দেশের প্রাচীন ও আধুনিক কবি-সম্প্রদায়কে দেশের লোকের পরিচিত করাইবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন। কবি-প্রতিভার বিচারে যদিও বা ঈশ্বর গুপ্ত কোনও দিন বিস্মৃত হন, তাঁহার কবিপ্রীতি ও দেশপ্রীতি চিরদিন আমাদের আদর্শস্থল হইয়া থাকিবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ ষ্টুয়ার্ট

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের শেষ দশকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মূলতঃ এদেশের অজ্ঞ জনসাধারণকে কুসংস্কারমুক্ত করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোকে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীগণ ব্যতীত কয়েক জন ইংরেজ ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাঠ্যপুস্তকাদি রচনা করিয়া এদেশের বালক-বালিকাগণকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে কিঞ্চিৎ শিক্ষিত করিয়া তোলা সেই উদ্দেশ্যের শুভ পরিণতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই সকল সহৃদয় ব্যক্তির জীবন ও কীর্ত্তির বিশদ ইতিহাস বড়-একটা পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গতঃ কেহ কেহ ইঁহাদের নামোল্লেখমাত্র করিয়া গিয়াছেন। মালদহের গোয়ামাল্‌টিতে জন্ এলার্টন্, চুঁচুড়ায় রেভারেণ্ড রবার্ট মে, বর্দ্ধমানে ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ ষ্টুয়ার্ট, কালনা ও চন্দননগরে জন্ ডি পীয়ার্স‌ন ও জে হার্লি এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। আজিকার দিনে ইঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। আমরা ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি। সেইগুলি সাজাইয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইল।

বর্দ্ধমানে স্কুল প্রতিষ্ঠা

ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট বর্দ্ধমানস্থিত প্রভিন্‌শিয়াল ব্যাটেলিয়ানের অ্যাড্‌জুটাণ্ট ছিলেন। তাঁহারই যত্ন চেষ্টায় বর্দ্ধমান মিশন গঠিত হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখানে এক খণ্ড জমি ক্রয় করিয়া এক জন মিশনরীর থাকিবার উপযুক্ত বাসগৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। চার্চ মিশনরী সোসাইটীর সংস্রবে বর্দ্ধমানে শিক্ষাবিস্তারের কাজ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের তত্ত্বাবধানে আরম্ভ হয়; তিনি এখানে দুইটি বাংলা স্কুল স্থাপনা করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা হয় দশ, ছাত্র-সংখ্যা এক হাজার। স্কুলসমূহের মাসিক ব্যয় ছিল ২৪০ টাকা। কার্য্যারম্ভের সময় ষ্টুয়ার্টকে বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; বিরুদ্ধবাদীরা রটাইয়া দিয়াছিল যে এদেশের শিশুদিগকে জাহাজে পুরিয়া বিলাতে চালান দেওয়ার মতলবেই সাহেব স্কুল ফাঁদিয়া বসিয়াছেন! কোন পুস্তকে যীশুখ্রীষ্টের নামোল্লেখেই তখন যথেষ্ট বাধার উদ্ভব হইত। বর্দ্ধমানে তখন পাঁচটি শাস্ত্রানুমোদিত বিদ্যালয় ছিল—মিশনরী স্কুলের প্রভাবে পাছে তাহাদের বিদ্যালয়গুলি ভাঙিয়া যায় এই ভয়ে শিক্ষকেরা সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের স্কুলে কেহ ছেলে পাঠাইলে ইহারা তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করিত। ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট যেখানে যেখানে স্কুল স্থাপনা করিতেন সেখান হইতেই বাছিয়া বাছিয়া উপযুক্ত কর্ম্মঠ

শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন*—তাহাতে বিরুদ্ধবাদীদের কথায় লোকের ক্রমশঃ অবিশ্বাস জন্মাইতে থাকে এবং শীঘ্রই ঐ পাঁচটি বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। ছাপা-বই প্রথম প্রবর্ত্তন করার সময়ও বাধার সৃষ্টি হয়—দেশীয়দের আশঙ্কা হইয়াছিল তাহাদের ছেলেদের ফাঁদে ফেলিয়া জাতি নষ্ট করিবার ইহাও এক প্রকার ষড়যন্ত্র! কারণ ইতিপূর্ব্বে হাতে-লেখা পুথির সাহায্যে পাঠাভ্যাসই রেওয়াজ ছিল। এমন কি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পর্য্যন্ত বহুকষ্টে ছাপার বই পড়িতে পারিতেন—বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা করা ত দূরের কথা! ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট চুঁচুড়ার পরলোকগত মে সাহেবের পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন—তিনি নিজেও এই পদ্ধতির কিছু সংস্কার করিয়াছিলেন। এই সকল বিদ্যালয়ে গ্রহগণিত ও ইংলণ্ডের ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত ষ্টুয়ার্ট সাহেব গবর্ণমেণ্ট যে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য নিরন্তর চেষ্টিত তাহা তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য কোম্পানী বাহাদুরের কতকগুলি আইনকানুন ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এই আইনগুলি পড়িয়া শাসকদের সম্বন্ধে ছাত্রদের সুধারণা বদ্ধমূল হইবে এবং প্রীতি ও প্রেম শেষ পর্য্যন্ত আনুগত্যে পরিণত হইবে।

সুবিধা পাইলেই ষ্টুয়ার্ট সাহেব দেশীয়দের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন। তিনি বাংলা বেশ ভাল জানিতেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারে তিনি কোনদিন ভয় পাইতেন না; হিন্দুধর্ম্মের গুহ্য গায়ত্রী একটি পুস্তিকায় ছাপিয়া তিনি গ্রন্থকার হিসাবে নিজের নামও প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন—সেকালের পক্ষে তাহা দুঃসাহসই বলিতে হইবে। তাঁহার ভয় ছিল তিনি নাম না দিলে সম্পূর্ণ দোষ মিশনরীদের ঘাড়ে পড়িবে।

ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের বর্দ্ধমানস্থিত স্কুলগুলির যথেষ্ট সুনাম ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি যখন কলিকাতার অনেকগুলি বাংলা স্কুলের পরিচালন-ভার গ্রহণ

---

* 'মনোরঞ্জনেতিহাস'-প্রণেতা তারাচাঁদ দত্ত বর্দ্ধমানে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের স্কুলের এক জন শিক্ষক ছিলেন। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণের (১৮১৮-১৯) চতুর্থ পৃষ্ঠায় তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ :—

> "বর্দ্ধমানের ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের কর্ম্মচারী তারাচাঁদ দত্ত সোসাইটির নিকট একটি গল্পপুস্তক পাঠাইয়াছেন—গল্পগুলি অংশতঃ ইউরোপীয় কাহিনী হইতে গৃহীত—ভাষা ভাল এবং সমস্তটা সুরুচির পরিচায়ক। এই পুস্তকের নাম 'মনোরঞ্জনেতিহাস'.বা 'প্লিজিং টেল্‌স্'—কলিকাতার মিশন প্রেসে এখন ইহার দুই হাজার খণ্ড বাংলা ভাষায় এবং এক হাজার ইংরেজী-বাংলায় (সামনা-সামনি) মুদ্রিত হইতেছে। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির করেসপণ্ডিং সেক্রেটরী মিঃ ডব্লিউ এইচ পীয়ার্স ইহার ইংরেজী অংশ লিখিয়া দিয়াছেন।"

'মনোরঞ্জনেতিহাস' পুস্তকের বাংলা, এবং ইংরেজী-বাংলা—দুইটি সংস্করণই ১৮১৯ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এগুলি দেখিয়াছি। বাংলা-সংস্করণ 'মনোরঞ্জনেতিহাস' পুস্তকের আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

> মনোরঞ্জনেতিহাস; / অর্থাৎ / বালকেরদিগের জ্ঞানদায়ক ও নীতিশিক্ষক উপাখ্যান. / শ্রী তারাচাঁদ দত্ত কর্ত্তৃক. / স্কুলবুক সোসাইটি দ্বারা / মিশন্ ছাপাখানাতে মুদ্রিত করা গেল. /...1819.

করেন, তখন তাঁহারা নিকোলাস উইলার্ড নামে এক জন যুবাপুরুষকে এই সকল প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়া পাঁচ মাসের জন্ত ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের স্কুলের পদ্ধতি শিক্ষা করিতে বর্দ্ধমানে পাঠাইয়াছিলেন। এই পদ্ধতিতে পুরাতন পদ্ধতির অর্দ্ধেক ব্যয়ে অল্পসংখ্যক শিক্ষকের সাহায্যে অধিকসংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব ছিল। উইলার্ড ১৮১৯ সনের মে মাসের গোড়ায় বর্দ্ধমান যাত্রা করেন; তাঁহার সহিত পাঁচ জন বাঙালী শিক্ষকও শিক্ষালাভ করিতেছিলেন।

গ্রন্থাবলী

ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের রচিত কয়েকখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির বিস্তৃত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। বর্ণমালা (?)* — ১৮১৮।

ইহার সম্বন্ধে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির প্রথম বার্ষিক বিবরণের (১৮১৭-১৮) ২য় পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—

> 1. A set of elementary Bengalee Tables, with short reading lessons intermixed, by Lieut. J. Stewart, Adjutant of the Provincial Battalion of Burdwan. Seven tables in all have been printed at the Serampore Press at the Society's charge ;...

২। উপদেশ কথা। ১৮১৭ (?)

এই পুস্তকখানি প্রথমে ১৮১৭ (?) সনে 'ইতিহাস কথা' নামে বাংলায় প্রকাশিত হয়; পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে 'উপদেশ কথা' নামে প্রচারিত হইয়াছিল। এই সংস্করণ দুইটি কাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের বর্দ্ধমানস্থিত স্কুলের ছাত্রবৃন্দের জন্ম মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৮২০ সনের মে মাসে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি 'উপদেশ কথা'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।† এই সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে।

---

* ১৮২৫ সনে "মোং ইটালি শ্রীযুত পিয়স সাহেবের ছাপাখানায়" "ষ্টুয়ার্ট সাহেবকৃত বর্ণমালা রিপ্রিন্ট" মুদ্রিত হয়।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ৮৩ দ্রষ্টব্য।

† 11. About two years age there was printed, on account of another Institution, and under the title of *Oopodes Cotha,* a selection from Stretch's Beauties of History, with other matter, the whole translated into Bengalee under the superintendence of Captain Stewart. That Gentleman presenting it to the Society with a request to print a second edition, the same number of copies, both Bengalee and Anglo-Bengalee, have been voted as of the *"Pleasing Tales."*—Second Report of the Calcutta School-Book Society. Second Year, 1818-19. (1819), p. 4.

ইহার মলাটের উপর "3rd Edit. May 1820. 2000." মুদ্রিত আছে। পুস্তকখানির পৃ. সংখ্যা ৭২ ; আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

উপদেশ কথা, / (ইতিহাসের সুবচন.) / পরন্তু / ইংলণ্ডীয়োপাখ্যানের চুম্বক, / এবং ঈণ্ডিয়ার বিষয়ে ইংলণ্ডীয় স্বল্প ব্যবস্থা. / ষ্টেওয়ার্ট সাহেব কর্ত্তৃক রচিত. /

Stewart's / Oopodes-Cotha, / (*Or, Moral Tales of History*) : / With an Historical Sketch of England, And Her Connection / With India. / Bengalee—3rd Edition. / C. S. B. S. / Calcutta : / Printed for the Calcutta School-Book Society. / *At the School-Press, Dhurumtula.* / 1820. /

পুস্তকে ভূমিকা-স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত অংশটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

সমাচার.

—০—

এই কেতাবের মধ্যে স্বতন্ত্র২ দুই অংশ পাওয়া যায়, প্রথম ভাগ ষ্ট্রেচ্‌ সাহেবের ইতিহাসছটা নামে গ্রন্থ এবং অন্যোন্য গ্রন্থহইতে কতক২ স্থূলার্থ সংগ্রহ করিয়া এ দেশীয় মতে কিঞ্চিৎ সাজাইয়া তর্জ্জমা করা গিয়াছে. দ্বিতীয় ভাগে তিন প্রকরণ, এক ইংলণ্ডীয়েরদিগের অজ্ঞানতা ও বিধর্ম্মাচরণ বিনাশপূর্ব্বক জ্ঞানশীল পশ্চিম দেশস্থেরদিগের মধ্যে মাননীয় হইবার সংক্ষেপ বিবরণ. দ্বিতীয় এ দেশেতে সাহেব লোকেরদের প্রথম আগমনের কিঞ্চিৎ বিবরণ. তৃতীয় সরকারের রাজস্বের নিয়ম বন্ধনার্থে অন্যোন্য কারণের নিমিত্তে এই বঙ্গদেশের জন্যে কোন২ প্রধান আইন.

———

দেখ ; পূর্ব্বে এই গ্রন্থ কোন২ সাহেব লোকির নিজ ব্যয়ের দ্বারা দুইবার ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু প্রথমে ইহার নামকরণ ইতিহাস কথা ছিল ; অনন্তর যখন এই গ্রন্থকে শুদ্ধ করিয়া কিছু বাহুল্য করা গেল, তৎকালে উপদেশ কথা খ্যাত হইল.

'উপদেশ কথা' পুস্তকের "নির্ঘণ্ট" নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ; ইহা হইতে পুস্তকের বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যাইবে :—

পুস্তকখানির ৬৮-৭২ পৃষ্ঠায় "অভিধান" অংশে কতকগুলি শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে অর্থসমেত কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা হইল :—

আরোপিত,	কল্পিত, কৃত্রিম, মিথ্যা.
কাল্পনিক,	ভণ্ডতপস্বী, শঠ.
চর্য্যা,	আচারণ, ব্যবহার.
জাতিভ্রষ্ট,	পিরালি, যাহার জাতি গিয়াছে.
নৈতা,	সীমা, ঠিকানা.
পক্ষপাত,	গণতা.
প্রতিনিধি,	তুল্য.
বিপ্লুত,	বিচলিত.
বিরোধী,	বিবাদী, ঝকড়াউ.
সংঘটিত,	সম্মিলিত.
সঙ্কলন,	আনুকুল্য করণ.

'উপদেশ কথা'র বাংলা-ইংরেজী সংস্করণও ১৮২০ সনের মে মাসে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহার একাধিক খণ্ড রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে। পুস্তকখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৮+৬৮ ; দক্ষিণ পৃষ্ঠায় বাংলা, বাম পৃষ্ঠায় ইংরেজী অংশ।

৩। তমোনাশক। ১৮২৮। পৃ. সংখ্যা ৩২।

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের কয়েক খণ্ড আছে। ইহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> Tomonasuck / or / *The Destroyer of Darkness.* / By / James Stewart. / —ঃ— / তমোনাশক / অর্থাৎ / দেবদেবী বিষয়ক বিবরণ। / বৰ্দ্ধমানের জেমেস ষ্টুএর্ট সাহেবের কৃত। / কলিকাতায় ছাপা হইল / ১২৩৪ শাল। /—/ Printed at Calcutta. / 1828. /

পুস্তকের বিষয়বস্তু :—

'তমোনাশক' পুস্তকের "ভূমিকা" অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> সকল জাতীয় লোকেরদের অন্তঃকরণ দেব পূজা করাতে অদ্বিতীয় চিরস্থায়ি ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইয়াছে, পুর্ব্বকালে ইংলণ্ড দেসিয়েদের ব্যবহার ও ধর্ম্ম সেই প্রকার অর্থাৎ প্রতিমা পূজাদিতে রত

ছিল, তাহাদের দুই দেবতা থর ও ওডন প্রধান রূপে মান্য ছিল যেমন হিন্দুদের কালী ও দুর্গা, এবং ব্রাহ্মণের তুল্য ড্রুইড নামে এক জাতি ছিল, ও তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি বালকের ন্যায় ছিল, আর জগতের বৃত্তান্ত কিছু জানিত না, এক্ষণে ঈশ্বরদত্ত সত্যজ্ঞান পাইয়া পৃথিবীস্থ অন্য লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, ইহা তোমরা দেখিতেছ, আরও তোমরা নিশ্চয় জান, যদ্যপি একজন এদেশস্থ লোক জজ্ কিম্বা মেজেষ্ট্রেট হইত তবে সকল লোকের ঘুস লইয়া ও পক্ষপাত করিয়া অবিচার দ্বারা কত গোল মাল [পৃ. ২] ইত্যাদি করিত, তোমরা বোধ কর যে ঈশ্বর মহাত্মা, এবং পুত্তুল আরাধনা করাতে ঈশ্বর হইতে তোমাদের অন্তঃকরণ পূর্ণরূপে গিয়াছে, ইহাতে আমি বলি, স্বয়ংজীবি অপ্রপঞ্চ অতুল্যপরাক্রম ঈশ্বর যিনি তাঁহারি আরাধনা করা কর্ত্তব্য, কোন দেশীয়লোক আপন বুদ্ধিতে বিচারদ্বারা ঈশ্বরকে কখন জ্ঞাত করিতে পারে নাই, এবং ঈশ্বরকে উপযুক্ত রূপে আরাধনা করিতে পারে না, পাশান ও কাষ্ঠ প্রভৃতি রহিত অদ্বিতীয় ঈশ্বর যিহহাকে আরাধনা করিতে হইবে, আর দেখ অদ্বিতীয় ঈশ্বর হইতে মনকে পরাঙ্মুখ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অন্য এক খণ্ড ওজর করিয়া বলে যে কাষ্ঠ কিম্বা পাশান ঈশ্বর নহে, কিন্তু ঐ সকলেতে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয় এবং তাহারদিগকে এই বিষয়ে যদি প্রমাণ জিজ্ঞাসা করা যায় তবে উত্তর দেয়, যে মন্ত্রের শক্তিতে হয়, সে যাহা হইক, এমত কি মন্ত্রের শক্তি আছে যে ঈশ্বরকে সেই মন্ত্র দ্বারা আবির্ভাব করাণ যায়? এই রূপ আবির্ভাব হইলে তাহারা বড় সন্তুষ্ট হয় কেননা আপন বশীভূত এমত দেবতা পাইয়াছি যে তাহা হইতে পাপ মোচন পাইব এবং মনের বাঞ্ছিত যাহা তাহাও পাইব।

[৩] এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে এমত যে কুব্যবহার অমিলন ও মিথ্যা কহা চলিত আছে সে কেবল দেব দেবীর দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হয়, কেননা যাহা মনুষ্য ধ্যান করে তাহার চরিত্র সেই প্রকার হয়, দেবদেবীর বিষয়ে যেমত শাস্ত্রেতে লিখিত আছে, তাহা আমি তদ্রূপ লিখি, এবং বুদ্ধিমান লোকেরা এই সকল মনে বিবেচনা করিবেন, বাঙ্গালিরদের প্রতি আমার যেমন স্নেহ ও ভালবাসা উপকার চিন্তা তাহা প্রকাশিত আছে ইহকালে ও পরকালে যেন দুঃখ ভোগ না হয়, ইহা আমার প্রার্থনা, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে ঈশ্বরের বিষয় ভাবনার কথা উপযুক্ত আছে বটে, যেমন আমি শাস্ত্র হইতে এই পুস্তকের মধ্যে প্রমাণ দিতেছি, যে সকল অগ্রাহ্য কথা লিখিত আছে সে কেবল পূর্ব্বলোকেরদের বুদ্ধি অনুসারে রচিত হইয়াছে, এই পুস্তক পড়িলে জ্ঞাত হইবেন, প্রতিমা পূজা করাতে তোমরা সকল কালাফিরিঙ্গীর ন্যায় হইতেছ, উহারা পুত্তুলিকাতে পূজা করে, বাঙ্গালির ব্যবহার বিষয়ে আমি কিছু কহি, সাংসারিক ব্যবহার বস্ত্রাদি পরিধানের এবং পরিবারাদির কথা কহিতে আবশ্যক নাই, সে সকল থাকুক, ভাল, কিন্তু খাদ্যাখাদ্য ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিবেচনা [৪] করা এ সকল অতি মূর্খের কথা, ইহার দিষ্টান্ত দেখ, গয়লার ঘরে অপবিত্র স্থানে স্থিত এবং সর্ব্বদা অশুচি যে তাহার স্ত্রীপুত্র তাহাদের স্পর্শেতে দুষ্ট ও অপবিত্র যে ভাণ্ড তাহাহইতে দুগ্ধ লইয়া পাত্রান্তরে রাখিয়া ব্রাহ্মণ সকল দুগ্ধ খায়, সেই আপন পাত্র যদি অন্য কেহ স্পর্শ করে তবে ব্রাহ্মণের জাতি যায়, এবং ময়রা ও দোকানিরা দুগ্ধাদির দ্বারা মিঠাই প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণকে বিক্রয় করে, ব্রাহ্মণ সকল তাহা ভোজন করে ইহাতে কিছু জাতির ক্ষতি হয় না, আর দেশান্তর হইতে নৌকার উপর তণ্ডুলাদি আনে তাহার উপর নাবিকেরা পাক করিয়া খায়, তাহাতে উৎসৃষ্ট মৎস্যাদি থাকে, তাহা ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিলে দোষী হয়েন না, অন্য এক প্রমাণ দেখ, জাহাজের উপর অনেক২ বস্তু অর্থাৎ মরিচ ও এলাচ, লবঙ্গ জায়ফল প্রভৃতি আইসে, তাহা স্বচ্ছন্দে সকলে খায়, কিন্তু সেই জাহাজে আনীত অন্য২ বস্তু অর্থাৎ পিপরমেন্ট প্রভৃতিকে ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট বলিয়া খায় না, কেননা ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট ভোজন করিলে

জাতি নষ্ট হয়, দেশদেশান্তর ব্যবহার থাকুক, কিন্তু এমত্ করাতে বুঝ না যে ঈশ্বরের বিচারেতে যে কিছু পুণ্য হয়, কিম্বা উদ্ধার হয়, তিনি অর্থাৎ [৫] পরমেশ্বর অন্তঃকরণের মালিন্য, ও কুচিন্তা, এবং কুব্যবহার জানিয়া বিচার করেন, জীবের মন যদি পরস্ত্রীর প্রতি কামাভিলাসেতে যায়, ও পরের ধনাদিতে লুব্ধ হয়, তবে ঈশ্বরের সাক্ষাতে সেই কুকর্ম্ম এবং তাহার উচিত দণ্ড তেঁহ দেন, প্রকৃত কথা এই যে বাহ্য শরীরাদির বিষয় কেবল পশুর তুল্য হয় তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছু সম্বন্ধ নাই কিন্তু মনের সহিত জানিবা, আরো দেখ মনুষ্য মরিলেই প্রেত শরীর হয় পরে পুত্রাদি তাহার শ্রাদ্ধ করিলে পূর্ণ সম্বৎসরানন্তর সেই মনুষ্য প্রেতশরীর ত্যাগ করিয়া অন্য এক ভোগ শরীর পায়, শ্রাদ্ধ না করিলে প্রেতই থাকে ইহাতে বুঝা যায় যে সকল বিষয় কেবল মনুষ্যের হস্তগত তাহাতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কিছুই নাই। বাঙ্গালিদের বিবাহের বিষয় দেখ দেখি বড়২ কুলীন ব্রাহ্মণেরা অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া অনেক২ বিবাহ করেন পরে তাহারা যে স্ত্রীর নিকট লাভের বিষয় অতিশয় বুঝেন তাহারদিগের তত্ত্বাবধারণ করেন অন্য২ দুঃখিনী স্ত্রী সকল মনঃপীড়াতে দগ্ধ হইয়া কালযাপন করে আর তাহার মধ্যে কেহ২ দুঃখ সহিতে না পারিয়া ধর্ম্মবিপর্য্যয় কর্ম্ম করে এবং ঐ কুলীনেরা ব্যয়কুণ্ঠ [৬] প্রযুক্ত খরচ করিতে না পারিয়া আপন কন্যা কিম্বা ভগিনীরদের বিবাহ দেন না বলেন যে বর মেলে না আর কোন২ ধনলোভি অনেক ধন পাইবার আসাতে ঐ ব্রাহ্মণেরা কন্যা বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়া কন্যাকে অধিক বয়স্কা অর্থাৎ যুবতী প্রায় করিয়া রাখে, পরে জাত্যাদি বিবেচনা না করিয়া এমত বরের চেষ্টা করেন যে তাহাতে বরের একচিহ্নও পাওয়া যায় না, তাহাতে ঐ পরাধীনা কন্যার বৃদ্ধাদি পতিতে মনঃ সন্তোষ না হওয়াতে কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, এইরূপ বিবাহ হওয়াতে দুঃখি ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ কন্যা না পাইয়া অব্রাহ্মণ জাতিভ্রষ্টাদির কন্যা ব্রাহ্মণ কন্যা জ্ঞান করিয়া বিবাহ করেন, পরে অন্য২ প্রধান ব্রাহ্মণ এবং কুটুম্বেরদিগকে বউভাতে খাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ বধূর হস্তে সপাত্র অন্ন দিয়া বধূর পরিবেশন দ্বারা ভোজন করান, তাহাতে গৃহস্থ নির্দ্দোষী হয়, হিন্দুদিগের প্রধান যে ব্রাহ্মণ তাহারদিগের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অন্য২ জাতির কথা কি কহিব কেননা গুরুর ব্যবহার জানিলে শিষ্যের বিষয় আপনি জানা যায়, ইহাতে বোধ হয় যে বাঙ্গালিদিগের ধর্ম্মানুসন্ধান প্রায় নাই।

[৭] অপর ব্রাহ্মণ সকল যজ্ঞোপবীতকে কর্ণের উপর রাখিয়া মলমূত্রাদি ত্যাগ করে ইহার কারণ তাহারা বলে যে গুরু মন্ত্র প্রদান করিলে কর্ণ পবিত্র স্থান হয়, একি আশ্চর্য্য ঐ নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা কিছু বিবেচনা করে না যে মন্ত্রদ্বারা যদি কর্ণ পবিত্র হয় তবে আন্তরিক ও শুদ্ধ হইতে পারে তাহাদের এরূপ করাতে কেবল বালকের বুদ্ধি প্রকাশ হয়।

১৮৩৫ সনে ক্যালকাটা খ্রীষ্টীয়ান ট্র্যাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটি 'তিমিরনাশক' (পৃ. সংখ্যা ২০)— এই পরিবর্ত্তিত নামে 'তমোনাশকে'র একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার এক খণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।

মৃত্যু

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। জীবনের শেষ দিকে তিনি নানা ভাবে শোক দুঃখ পাইয়াছিলেন।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসের গোড়ার দিকে যে-সকল বিদেশীয় পণ্ডিত ইহাকে

গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, ষ্টুয়ার্ট তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ভাষাও অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। এই হিসাবে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের নাম আমাদের স্মরণীয়।

ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টকে স্মরণ করিবার সময় এই কথাটাই বিশেষভাবে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, যে-কারণেই হউক, বাঙালীর ছেলেদের আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য তখনকার দিনে না-ছিল কোনও বিদ্যালয়, না-ছিল কোনও পাঠ্যপুস্তক। ইঁহারা নিজেদের চেষ্টায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হন নাই, ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়া নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া সেগুলি বিতরণ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন; কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি ও স্কুল সোসাইটি পরে এই কার্য্যে অগ্রসর হন। বাংলা দেশের পক্ষে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ফলপ্রসূ হইয়াছে কি না, আজকাল অনেকে সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা নিজেরা এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া যত দিন ইহার প্রাধান্য স্বীকার করিব, তত দিন ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট-প্রমুখ সহৃদয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নাম শ্রদ্ধার সহিত আমাদিগকে উচ্চারণ করিতে হইবে।*

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* এই প্রবন্ধ-সঙ্কলনকালে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য লইয়াছি:—J. Long: *Hand-Book of Bengal Missions* (1848), pp. 79-80, 90-92. First and Second Reports of the

বৌদ্ধ অপদান

অপদান শব্দের অর্থ "পবিত্র কর্ম্ম" অথবা "বীরোচিত কর্ম্ম"।[১] প্রত্যেক অপদানে নায়ক এবং নায়িকার অতীত জন্মের ইতিহাস পাওয়া যায়। জাতক ও ইহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, জাতকে কোন না কোন বুদ্ধের অতীত জীবনী বর্ণিত আছে; কিন্তু অপদানে প্রধানতঃ যে বৌদ্ধ ভিক্ষু 'অরহত্ব' লাভ করিয়াছে, তাহার জীবনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

অপদান বৌদ্ধ ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ। ইহা সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায় নামক গ্রন্থের শেষ পুস্তক। ইহা একটী সুলিখিত কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মহৎ কর্ম্মগুলি বিশদভাবে বর্ণিত আছে। বৌদ্ধ যুগের বৌদ্ধসঙ্ঘের ৫৫০ জন পুরুষ এবং ৪০ জন স্ত্রীলোকের ব্যক্তিগত জীবনবৃত্তান্ত ইহাতে পাওয়া যায়। থেরথেরীগাথার টীকায়ও এই সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের পালি টেক্‌ষ্ট সোসাইটী এই গ্রন্থখানিকে দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান, যথা—পূজা, বন্দনা, দান প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

অপদান গ্রন্থে পীঠস্থান, (মৃতের) স্মৃতিচিহ্ন এবং সমাধি-স্তূপের আবশ্যকতা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা পাওয়া যায়। এই পুস্তকে পশু পক্ষী, বৃক্ষলতা, ফুল ফল, জাতি, ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রভৃতির চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে। স্থপতিবিজ্ঞান, ভাস্কর্য্য প্রভৃতির উল্লেখও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। আমরা এখানে গ্রন্থখানির উল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনা করিব। ইহার পূর্ব্বে এই গ্রন্থের আলোচনা আর কেহই করেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত এতজ্জাতীয় বিষয়ের নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে।

পশু, পক্ষী, মৎস্য, সর্প, উদ্ভিদ্, ফুল, ফল প্রভৃতির বিবরণ[২]

চক্রবাক—লালবর্ণ রাজহংসী (জাতক সং ৪৫১ এবং ৪৫২)। ইহাদিগকে Anas Casarca বলা হয়। চিত্রকূট পর্ব্বতের উপরিভাগে যে সকল শিশু রাজহংসী দলে দলে বাস করিত, তাহারা খাদ্যানুসন্ধানে বহির্গত হইয়া পুনরায় স্ব স্ব বাসস্থানে ফিরিয়া আসিত। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাহারা পুনরায় খাদ্যসংগ্রহের জন্য বহির্গত হইত।[৩]

দিন্দিভা—একটী পক্ষীর নাম, সম্ভবতঃ তিত্তির পক্ষী। একজন ব্যাধ একটী লুব্ধ তিত্তির পক্ষী ধরিয়া, তাহাকে খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া সযত্নে শিক্ষা দিত এবং আদর করিত। যখন তাহাকে অরণ্যে লইয়া যাওয়া হইল, তখন তাহার চীৎকারে নিকটস্থ অন্যান্য তিত্তির পক্ষীগুলি প্রলুব্ধ হইল।[৪]

১। Vide Avadana, Apadana by M. Winternitz (Journal of the Taisho University, Vols. VI-VII).

২। *Apadāna*, pp. 15 foll., 346-47, 362-63, 368, 383. 394.

৩। *Jātakas*, Nos. 187,370, 429। ৪। *Jāt*, No. 319.

হংস—সাধারণতঃ রাজহংস (Barhut, fig. 107)। বিমানবথু নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকায় (পৃঃ ৫৭) সুবর্ণময় রাজহংসের উল্লেখ আছে। রবি-হংস একপ্রকার রাজহংসের নাম।

জীব-জীব—(অথবা জীবংজীব)—জীবঞ্জীব পক্ষীর নামান্তর।

কোকিলা, করবিকা[১]— ভারতীয় কোকিল, ইহারা সুকণ্ঠী (মধুরস্বরা)।[২] কোকিল দুই বর্ণের—কৃষ্ণবর্ণ ও বিচিত্রবর্ণ।[৩] জাতকে (সং ৫৩৬) তিন প্রকার ভারতীয় কোকিলের উল্লেখ আছে, যথা,—পরাভূত, চেলাবক এবং ভীম্‌কার।

কোঞ্চ—[৪] বিমানবথুর টীকায় সারস ক্রোঞ্চ শব্দের প্রতিশব্দস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পুস্তকে কেশগুচ্ছযুক্ত সারসের উল্লেখ আছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, বজ্রনাদে সারসের গর্ভসঞ্চার হয় ; সুতরাং বজ্রকে উহাদের পিতা এবং বিদ্যুৎসমেত মেঘকে উহাদের পিতামহ বলা হয়।[৫]

কালকণ্ণিকা—একপ্রকার অশুভসূচক পক্ষী।[৬]

কোসিকা—(পেচক)—ইহারা বাঁশের বনে আশ্রয় লয় এবং কাকের ভয়ে উহার মধ্যে লুকাইয়া থাকে। একদল কাক একটী পেচককে আক্রমণ করিয়া উহাকে ভূপাতিত করিয়াছিল।[৭]

কুক্কুটি[৮] (মুরগী)—মুরগীরা ডানা মেলিয়া ডিম্বের উপর বসে এবং উহাকে উষ্ণ রাখে। তার পর উহারা ডিম্বগুলির মধ্যে স্বধর্ম্ম সঞ্চার করে। প্রথমতঃ মস্তক গঠিত হয় ; পরে পা, নখ, পাখা, মুখ প্রভৃতি গঠিত হয়। এইরূপে ডিম্বগুলির সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হয়। ডিম্বের উপরের ছাল পাতলা হইলে তাহার ভিতরে আলো প্রবেশ করে। তার পর ছোট ছোট মুরগীর ছানাগুলি ডিম্বগুলি হইতে বহির্গত হইবার জন্য তাহাদের ঘাড় বাহির করে এবং পা দিয়া তাহাদের মাথায় আঘাত করে।[৯]

মিলিন্দপন্‌হের (মিলিন্দ প্রশ্নের) মতে কুক্কুটের কতকগুলি অসাধারণ গুণ আছে,—(১) কুক্কুটেরা খুব প্রাতঃকালে ডাকে ; (২) ইহারা পায়ের দ্বারা মাটি সরায় এবং মাটি সরাইয়া যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য পায়, তাহা ভক্ষণ করে ; (৩) যদিও ইহাদের চক্ষু আছে, তথাপি ইহারা রাত্রিকালে অন্ধ ; (৪) ইহাদিগকে যষ্টির দ্বারা তাড়াইবার চেষ্টা করিলেও ইহারা আপন বাসস্থান পরিত্যাগ করে না।

১। *Papancasudani*, III, 382-83. ইহা চঞ্চু দ্বারা সুপক্ক আম্র ভক্ষণ করে এবং সুমিষ্ট রস পান করে। তার পর ইহা পাখা দ্বারা উড়িতে চেষ্টা করে এবং সুমধুর স্বরে গান করে। বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে করবিকার অপর একটী নাম কলবিঙ্ক। (Vide Ind. Cul. Vol. I, p, 123).

২। *Vimāna Vatthu Commentary*, p. 57. Cf. *Papancasudani*, III, 382-383.

৩। *Vimāna Vatthu Commentary*, p. 57.

৪। *Jāt*, No. 506. ৫। *Jāt*. No. 274.

৬। *Jat*, No. 206. ৭। *Jat*, No. 226.

৮। Pea-hen in a border country, *Jat*, No. 491.

কুকুৎথা—(Phasianus Gallus)

কুররা—(সামুদ্রিক ঈগল পক্ষী)।

মোরা—(ময়ূর)[১], (Barhut, Fig. 91)।

পারেবতা[২]—(পায়রা), (Barhut, Fig. 94)।

পোক্‌খরসাতকা—(এক জাতীয় সারস, Ardea Siberica)।

রবিহংসা—এক প্রকার হংস।

সতপত্ত—(কাঠঠোকরা) (Barhut, Fig. 103)। জাতক[৩] হইতে জানা যায় যে, ইহারা বৃক্ষের উপরিভাগে বসিয়া থাকে। ইহারা একজাতীয় সারস।

সেনক—(বাজপক্ষী)—ইহা হিংস্রপ্রকৃতি।[৪] যে গৃহে হত্যাকাণ্ড হয়, সাধারণতঃ তথায় এই পক্ষী গমনাগমন করে।[৫]

শিখি—(ময়ূর)। ইহার মাথায় কেশগুচ্ছ আছে।

সুক, সারি (শুক, শারী)—শুক পক্ষী খুব দ্রুত উড়িতে পারে। যখন উহারা বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়, তখন উহাদের চক্ষুই প্রথম নষ্ট হয়। উহাদের আদি বাসস্থান হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে ছিল।[৬] সুস্বাস্থ্যপ্রাপ্ত শুক পক্ষীকে মধু ও খই খাইতে এবং চিনি-মিশ্রিত জল পান করিতে দেওয়া হয়।[৭]

তম্বচূড়কা—(মোরগ)।

অপদানে নিম্নলিখিত পক্ষীগুলির উল্লেখ নাই, যথা—ময়না[৮], শকুনি[৯], কুনাল পক্ষী[১০] ময়হক[১১] এবং চিরিটিক[১২]। ময়না অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ এবং প্রয়োজনীয়। শকুনিরা সাধারণতঃ কবরস্থানে বিচরণ করে এবং গরু, মহিষ প্রভৃতি জন্তুদের মাংস ভক্ষণ করে। ময়হক পক্ষী পর্ব্বতের গুহায় বাস করে এবং অশ্বত্থ বৃক্ষের উপর বিশ্রাম করে। উহারা "আমার" "আমার" বলিয়া চীৎকার করে। জাতকে গরুড় পক্ষীরও উল্লেখ আছে[১৩]। ইহারা হিমালয় প্রদেশস্থিত শিমূল গাছে অবস্থান করে।

মাছ

মগ্‌গুরা—মাগুর মাছ।

মুঞ্জরোহিত—(Cyprinus Rohit)—একজাতীয় পোনা মাছ। মুঞ্জরোহিত ও রোহিচ্চ একই মাছের নাম। বাংলা দেশে ইহাকে রুই মাছ বলা হয়।

১। ময়ূরের নানা বৈচিত্র্যের উল্লেখ জাতকে পাওয়া যায়—*Jataka* (Fausboll), VI, pp. 497, 539, 540. 535.

২। *Jātaka*, No. 375.

৩। *Jat*, No. 206. ৪। *Jat*, No. 168. ৫। *Jat*, No. 546.

৬। *Jat*, No. 255, No. 429. ৭। *Jat*, No. 329.

৮। *Jat*, No. 546. ৯। *Jat*, No. 399. ১০। *Jat*, No. 536.

১১। *Jat*, No. 390. ১২। *Jat*, No. 526.

১৩। *Jat*, No. 543. জৈন গ্রন্থে গরুড়কে বেণুদেব বা বিষ্ণুদেব বলা হইয়াছে। (Jaina Sutras, II. p. 290).

পাঠীন—Silurus Boalis নামে পরিচিত।[১] **পাবুস**—এক জাতীয় মাছ।

সম্বুল—অজ্ঞাত। **বালজ**—অজ্ঞাত।

গঙ্গা ও যমুনা নদীর মাছ জাতকে উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণিত আছে। উপরোক্ত তালিকার মধ্যে তিমি মাছের উল্লেখ নাই। ইহারা সমুদ্রে বাস করে। দীঘনিকায়ের টীকা সুমঙ্গলবিলাসিনীতে ইহাদের উল্লেখ আছে।[২] জাতকে বোহার নামে এক জাতীয় মৎস্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার আকৃতি ভয়ানক।[৩]

কুলিরকা—জাতকে সুবর্ণময় কাঁকড়ার উল্লেখ আছে[৪]। ইহারা কর্কট-গিরিহ্রদ নামক স্থানে বাস করে।[৫]

সরীসৃপ

অজগরা—অজগর সর্প নামে পরিচিত (Boa coustrictor)।

কিন্নরী—অপ্সরা। ইহারা সাধারণতঃ জলে বাস করে।

কুম্ভীলা—কুমীর। (Barhut, fig. 77)।

ওগহা—অজ্ঞাত।

সপ্পা—সর্প। (Barhut, fig 116).

সর্প চারি জতীয় :—(১) বিরূপকৃখ সর্প, (২) এরাপথ সর্প, (৩) ছব্যাপুত্ত সর্প, এবং (৪) কণ্‌হা-গোতম সর্প।[৬]

সুমসুমার—কুমীর। **তন্তিগ্‌গাহা**—অজ্ঞাত।

মৎস্য এবং কচ্ছপ তাহাদের স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা কখন্ বৃষ্টি হইবে, অথবা কখন্ অনাবৃষ্টি হইবে, তাহা বুঝিতে পারে।[৭] অপদানে ভেক এবং জল-সর্পের উল্লেখ নাই। জাতকে সবুজবর্ণ ভেক (Barhut, fig. 117) এবং মৎস্যভোজী জলসর্পের উল্লেখ আছে।[৮] অপদানে ভোঁদড়ের উল্লেখ নাই। ইহারা মাংসাশী জলচর প্রাণী। ইহাদের দেহখানি লম্বা, পাগুলি জোড়া, লোমগুলি ছোট ছোট এবং গায়ের বর্ণ বাদামী। ইহারা মৎস্যভোজী।[৯]

জীব জন্তু

অচ্ছকোক—ভল্লুক।

অস্‌সা—অশ্ব। (Barhut, figs. 13A এবং 77)। **বলাহ** ও **সিন্ধু**—উৎকৃষ্ট অশ্ব (Barhut, Pt. XXVI, fig. 136)। সিন্ধুঘোটক যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। ইহাদিগকে উৎকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া হয় এবং সযত্নে রাখা হয়।[১০]

১। *Jat,* No. 451.

২। Pt. II, p. 487 ; তুল. Barhut Inscriptions by Barua and Sinha, p. 61, 62.

৩। No. 529. ৪। No. 267. ৫। *Jat.* No. 389.

৬। *Jat,* No. 203 ; Atanatiya Suttanta Digha.

৭। *Jat,* No. 178 ; Dhaniya Sutta, Sutta Nipata Commentary.

৮। No. 239. ৯। *Jat,* No. 316. ১০। *Jat,* No. 23.

কপিশবর্ণ অশ্ব—জাতকে ইহার উল্লেখ আছে।[১]

পক্ষিরাজ অশ্ব—(Barhut, Pt. XXVI, fig. 136)। ইহারা শ্বেতকায়; চক্ষু কাকের মত; চুলগুলি তৃণের মত এবং ইহারা আকাশে উড়িতে পারে।[২]

দীপী[৩]—চিতাবাঘ। জাতকে[৪] বিচিত্রবর্ণ চিতাবাঘের উল্লেখ আছে।

এনি—এক জাতীয় মৃগ। আর এক জাতীয় মৃগ বায়ু-মৃগ (wind antelope) নামে পরিচিত। ইহারা অত্যন্ত ভীরু। যে স্থানে ইহারা একবার মানুষ দেখে, সে স্থান প্রায় এক সপ্তাহের জন্য ত্যাগ করে। কোন স্থানে ভয় প্রাপ্ত হইলে ইহারা আজীবন সে স্থানে যায় না।[৫]

মাতঙ্গ[৬]—হস্তী। (Barhut, figs. 32, 50)। হস্তীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও প্রতিপালককে বিনষ্ট করে।[৭] জাতকে[৮] হস্তি-শিক্ষা এবং হস্তি-উৎসব বর্ণিত আছে। হস্তি-উৎসবে এক শত হস্তী শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইত, এবং সূক্ষ্ম স্বর্ণজাল, স্বর্ণ-নিশান এবং স্বর্ণ-ভূষার দ্বারা সুসজ্জিত হইত এবং যেখানে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত; সেই স্থানটীকে উত্তমরূপে সাজান হইত।[৯] ছদ্দন্ত নামে এক জাতীয় উচ্চশ্রেণীর হস্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। (Barhut, fig. 128)। ইহাদের দন্ত সুবিখ্যাত। আরও দশ প্রকার হস্তীর উল্লেখ পপঞ্চসূদনীতে পাওয়া যায়।[১০]

মিগা—সাধারণ মৃগ।[১১] একপ্রকার বিচিত্রবর্ণ মৃগ আছে; ইহাদের রং সোনার মত।[১২] **পসদা** (চিত্রবিচিত্র মৃগ)।

সীহা—সিংহ। (Barhut, figs. 4, 13A, 13B, 54)। সংযুত্তনিকায়ের টীকা সারত্থপকাসিনীর মতে সিংহ চারি প্রকার:—(১) তৃণভোজী সিংহ, (২) কৃষ্ণকায় সিংহ, (৩) ঈষৎ পীতবর্ণ সিংহ এবং (৪) বড় বড় কেশরযুক্ত সিংহ। তৃণভোজী সিংহ পারাবত-বর্ণ গাভীর মত। কৃষ্ণকায় সিংহ তৃণভোজী কৃষ্ণবর্ণের গাভীর মত। ঈষৎ পীতবর্ণ সিংহ পলাশ বৃক্ষের বর্ণসদৃশ, মাংসাশী গাভীর মত। শেষোক্ত সিংহের স্কন্ধে বড় বড় কেশর আছে।

১। *Jat.* No. 158. ২। *Jat,* No. 196. ৩। Cf. *Jat,* No. 510.

৪। No. 547 : Cf. Milinda Panho, pp. 368-369. ৫। *Jat,* No. 14.

৬। হস্তী প্রভৃতির যুদ্ধের বিবরণ—Brahmajala Suttanta, Digha I.

৭। *Jat.* No. 161. ৮। No. 163. ৯। *Jat,* No. 163.

১০। Papancasudani, II, p. 6.

১১। জাতকে মৃগ-শিকারের বিবরণ আছে (*Jat.* No. 12)। জাতকে এক প্রকার মৃগের বর্ণনা আছে, উহার রং সোনার মত। উহার আগেকার এবং পিছনকার পা লাক্ষার মত এক প্রকার জিনিষের দ্বারা আবৃত। উহার শিং দুইটী রূপার মালার মত, চক্ষু দুইটী গোল মণির মত, এবং মুখ লাল পশমের মত (No. 359)। এই বিবরণ হইতে আমাদের মনে হয় যে, এই মৃগটী কাল্পনিক। বারাণসীর বাজারে হরিণমাংস বিক্রয় হইত (*Jat,* No. 315)।

ইহার মুখের রং লাক্ষার বর্ণের ন্যায় এবং ইহার লেজ পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কেশরটী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, দক্ষিণ দিকে দোদুল্যমান এবং পৃষ্ঠের উপরে লম্বিত।[১]

মুগ্‌গপোতা—অজ্ঞাত। **তরচ্ছয়**—তরক্ষু।

বকভেরণ্ডকা—নেকড়ে বাঘ (Barhut, fig. 109) এবং (শৃগাল) (Barhut, fig. 97)। একটী সিংহ এবং একটী শৃগালীর মিলনের ফলে যে সিংহশাবক জন্ম গ্রহণ করে, উহার আঙ্গুল, নখ, কেশর, রং এবং আকৃতি বাপের মত এবং উহার স্বর মায়ের মত হয়।[২]

বানরা—বানর। **বরাহা**[৩]—শূকর। **ব্যাগ্‌ঘা**—বাঘ (Barhut, figs. 55,70)।

তরু, লতা, ফুল ও ফল

অলক—সম্ভবতঃ Morinda citrifolia.

আলুল—(আলুক ?) ইহা Dioscorea alata অথবা Dioscorea globasa—এই দুইটীর মধ্যে যে কোন একটী।

আমলক—Phyllanthus embliea. এই গাছটী অতি সুন্দর। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ইহাদের ফুল ফোটে।

অম্ব—আম।

অম্বাটক—ইহা আমড়া নামে বাংলা দেশে সুপরিচিত।

অঙ্কোল—Alangium lamarckii. এই গাছটী কণ্টকে পরিপূর্ণ। গ্রীষ্মকালে ইহাদের ফুল ফোটে।

অশোক—Saraca asoca. এই গাছটী অত্যন্ত সুন্দর; গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ইহার ফুল ফোটে। ফুলগুলি বেশ সুন্দর, বড় বড় এবং গুচ্ছে গুচ্ছে শোভিত। যখন প্রথম ফোটে, তখন ইহাদের রং কমলা লেবুর মত; ক্রমশঃ রং লাল হইতে থাকে এবং নানারূপ আভা প্রাপ্ত হয়। ইহারা রাত্রিকালে সুগন্ধে চারি দিক্ আমোদিত করে। ইহা হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়।

অশ্বকর্ণ—শাল গাছের অপর নাম। গ্রীষ্মকালে ইহাতে ফুল ফোটে।

অতিমুত্ত (অতিমুক্ত)—মাধবীলতা নামে সুপরিচিত। বর্ষাকালে এবং শীতকালে ইহাদের ফুল ফোটে। ফুল খুব সুন্দর এবং সুগন্ধযুক্ত। অতিমুক্তের অপর নাম তিনিস (Diospyros glutinosa)। ইহাদের ফুল মুক্তার মত সাদা।

বন্ধুজীব—Pentapetes Phoenicea. একপ্রকার গাছ; ইহাদের ফুলগুলি লাল। সংস্কৃতে ইহাদিগকে **বন্ধুলি** অথবা **বন্ধুক** ফুল বলা হয়।

বেল—Aegle marmelos.

ভল্লাটক—Semecarpus anacardium. বাদামজাতীয়।

১। Part. 2. p. 283. ২। *Jat*, No. 188. ৩। *Jat*, No. 186,

বিভিটক—বহেড়া (Terminalia belerica)। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল ফোটে। ফুলগুলি ঈষৎ ধূসর বর্ণের। হরীতকী, বিভীতক এবং আমলক—এই তিন প্রকার বয়ড়া বাণিজ্যে ব্যবহৃত হইত। ইহারা বাংলা দেশে ত্রিফলা নামে সুপরিচিত।

বিম্বিজাল—বিম্বী অথবা বিম্বিকার অপর একটী নাম তেলাকুচা (cephalandia indica)। ইহাদের ফুল সাদা এবং বড়। ইহাদের ফল পাকিলে খুব লাল হয়।

চম্পক—চাঁপা। বর্ষাকালে ইহাদের ফুল ফোটে এবং সুগন্ধে মন মোহিত করে।

ধব—conocarpus latifolia. এই গাছটী গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়। শীতকালে ইহাদের ফুল ফোটে। ইহাকে সচরাচর ধাঘ্রি বাবলা বলা হয়।

গিরিপুন্নাগ—সম্ভবতঃ Mallotus philippinensis.

হরিতক—Terminalia chebula. একটী বড় গাছ। গ্রীষ্মকালে ইহাদের ফুল ফোটে। ফুলগুলি ছোট ছোট; ফলগুলি ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হয়।

ইসিমুগ্‌গ—বাংলা দেশে দুই প্রকার গাছ আছে; শ্বেত মুর্গ এবং লাল মুর্গ। ইংরাজীতে celosia argentea এবং celosia cristata নামে সুপরিচিত। বর্ষাকালে এবং শীতকালে এই গাছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

জম্বু—Eugenia Jambolana. গ্রীষ্মকালে ইহার ফুল ফোটে। ইহা কাল জাম নামে পরিচিত।

জীবক—পিয়ালের অপর নাম।

কদলি—কলা গাছ (Barhut, figs. 121 এবং 127).

কলম্ব (কলম্বি ?)—ইহার ইংরাজী নাম Ipomœa reptaus। ইহাদের ফুল বড় এবং গোলাপ ফুলের মত রং। অমরের মতে ইহার অপর নাম সর। অমর কলম্ব শব্দটী বৃন্তরূপে ব্যবহার করিয়াছেন (বৈশ্যবর্গ, শ্লোক ১০১)।

কন্দলি—বর্ষাকালে ইহাদের ফুল ফোটে। ফুলগুলি নীলবর্ণ এবং লতাগুলি মাটির ভিতর প্রবেশ করে। মেদিনীর মতে কদলী এবং কন্দলি একই গাছ।

কর—Punica granatum. করক নামে এক প্রকার গাছ আছে; উহা ডালিমের নামান্তর।

করন্দ—Carissa carandas. একটী বড় গুল্ম গাছ। ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ এবং এপ্রিল মাসে ইহাদের ফুল ফোটে। ইহাদের ফল খাওয়া হয় এবং ইহা দ্বারা আচার ও পিষ্টক তৈয়ারী করা হয়। উড়িষ্যায় Carissa diffusaকে কুরুন্দ (করঞ্চা) বলা হয়।

কর্ণিকা—অগ্নিমন্থ (Premua integrifolia) ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

কর্ণিকার—Cassia fistula. একটী ছোট গাছ; ফুলগুলির রং হলুদের ন্যায় এবং সুগন্ধযুক্ত।

কেতক—Pandanus adoratissimus. সাধারণতঃ বর্ষাকালেই ফুল ফোটে। পুরুষ

কেবুক—Costus speciosus. গুল্ম গাছ। ইহাতে পত্রযুক্ত বৃন্ত আছে। এই গাছ অত্যন্ত সুন্দর। বর্ষাকালে ফুল ফোটে।

কোল—Ziziphus jujubaর ফল কোল নামে সর্ব্বত্র পরিচিত।

কোবিলাড়—Bavhini variegata. ইহাদের ফুলগুলি বেশ বড়। ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ মাসে ফুল ফোটে।

কুটজ—Holarrhena antidysenterica. ইহা একটী ক্ষণভঙ্গুর গুল্ম গাছ। ইহার ফুলগুলি সাদা এবং গন্ধপূর্ণ।

লবুজ—Artocarpus lakoocha. ইহা একপ্রকার ফলের গাছ।

মধুক—Bassia latifolia. ইহা একটী মধ্যাকৃতি গাছ। মার্চ্চ এবং এপ্রিল মাসে ইহার ফুল ফোটে। ফুল সুন্দর এবং গন্ধপূর্ণ।

মল্লিকা—Jesmin বর্ষাকালে ইহাদের ফুল ফোটে। ফুল সাদা এবং গন্ধযুক্ত।

মাতুলুঙ্গ—লেবু। (Citrus medica)।

নাগ—নাগকেশর (Mesua ferrea)। এই গাছটী বেশ সুন্দর; ফুলগুলি বড় বড়, সুন্দর এবং গন্ধপূর্ণ। গ্রীষ্মারম্ভে ইহাদের ফুল ফোটে।

নিগ্রোধ—বট গাছ (Barhut, fig. 31).

নিম্ব—Melia azadirachta। এই গাছটী সুন্দর এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহাদের ফুল গন্ধযুক্ত।

নীপ—কদম্ব। গাছটী বেশ বড়। বর্ষাকালে ফুল ফোটে।

পতুম—পদ্ম (Nelumbium speciosum)।

পলাস—Butea frondasa. পলাশ গাছ। ফুল অতি সুন্দর। মার্চ্চ এবং এপ্রিল মাসে ফুল ফোটে। ফুলগুলি কমলা লেবুর মত লাল, কিন্তু নীচের দিকে রূপার মত সাদা।

পনস—Artocarpus integrifolia.

পাটলি—পারুল Bignonia Suaveolens (Barhut, fig. 26). এই গাছটী মধ্যাকৃতি; ফুল সুন্দর এবং গন্ধপূর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল প্রস্ফুটিত হয়।

পিয়াল—Buchanania latifolia. এই গাছটী বড়, কিন্তু ফুলগুলি ছোট। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল ফোটে। ফুলগুলি সাদা এবং হলদে।

পুণ্ডরিক—শ্বেত পদ্ম।

পুন্নাগ—Calophyllum inophyllum। এই গাছটী অত্যন্ত সুন্দর। ইহাদের ফুল সাদা এবং গন্ধযুক্ত। প্রায় সমস্ত বৎসরই ফুল ফোটে।

সাল—Shorea robusta (Barhut, fig. 28)।

সলল—Pinus Devadara. সম্ভবতঃ দেবদারু গাছ।

সিমুল—Bombax malabaricum. এই গাছটীর উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। শীতকালের শেষভাগে ইহাদের ফুল ফোটে। ফুলগুলি বেশ বড় এবং লাল।

সিন্ধুবন্ত—নিসিন্দা (Vitex negunda), ইহা ছোট এবং সুন্দর গুল্ম গাছ। সমস্ত বৎসরই ফুল ফোটে। ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

টগর—Tabernaemontana Coronaria. ফুলগুলি খুব সাদা এবং রাত্রিকালে খুব সুগন্ধ বিস্তার করে।

তিলক—Symplocos racemosa. সংস্কৃতে লোধ্র নামে পরিচিত।

তিনসুলিক—ইহাকে Andropogan narous অথবা Andropagan squarrosus (খসখস) বলা হয়।

তিণ্ডুক—গাব (Diospyrus glutinosa). এই গাছটী মধ্যাকৃতি। মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে ইহাদের ফুল ফোটে। ফুলগুলি সাদা এবং বড়। কেহ কেহ আবলুস গাছকে 'তিণ্ডু' বলিয়া থাকেন। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Diospyrus melanoxylon

উদ্দালক—চালতা (Dillenia indica). যখন ফুল ফোটে, তখন এই গাছ দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর হয়। ইহার ফুলগুলি বেশ বড় এবং গন্ধপূর্ণ। ইহার অপর নাম শ্লেষ্মাতক (Cordia myxa)।

উডুম্বর—ডুমুর গাছ (Ficus glomerata) (Barhut, fig. 30)।

বকুল—Mimusops elengi. ইহার ফুল সাদা এবং গন্ধযুক্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল ফোটে।

লোক ও জাতি

অলসন্দকা—আলেক্‌জান্দ্রিয়ার লোক।

অন্ধকা—অন্ধ্র নামে সুপরিচিত। কলিঙ্গের দক্ষিণে এই শক্তিশালী জাতি বাস করিত। ধনকটক অথবা অমরাবতী ইহাদের রাজধানী ছিল।

অপরান্ত—পশ্চিম-ভারতের অধিবাসী।

বব্বরা—বব্বর এবং বর্ব্বর একই জাতির নাম। উত্তরাপথবাসী[১] কম্বোজ, গন্ধার এবং কিরাতগণের সহিত ইহারা সংশ্লিষ্ট।

ভগ্‌গ—ভগ্‌গ অথবা ভর্গ একটী গণতান্ত্রিক জাতি। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধযুগে ইহারা উত্তর-ভারতে বাস করিত।[২]

চীনরট্‌ঠা—চীন-সাম্রাজ্যের অধিবাসী।

দমিড়া—দমিড়গণ তামিল নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। দক্ষিণ-ভারতের ইহারা একটী শক্তিশালী জাতি ছিল।[৩]

হত্থিপোরিকা—সম্ভবতঃ অযোধ্যার উত্তর-পূর্ব্বে কুরুদের রাজধানী হস্তিনাপুরের অধিবাসী।

১। I. C. Vol I, p. 389. ২। I. C. Vol. I. p. 391.

৩। মল্লিখিত A Short Account of the Damilas (Quarterly Journal of the

ইসিণ্ডা—ইহাদের পরিচয় অজ্ঞাত।

কারূষ অথবা **করূষ**—প্রাচীন ভারতের সর্ব্বজনবিদিত একটী জাতি। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ইহারা বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।[১]

কাসিকা—যুক্তপ্রদেশস্থিত কাশীর অধিবাসী।[২]

কোলকা—সম্ভবতঃ ইহারা কোলারবাসী।

কোসলকা—উত্তর-ভারতের কোশল নামক শক্তিশালী রাজ্যের অধিবাসী। ইহা বহু পূর্ব্বেই মগধরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

মধুরকা—যুক্তপ্রদেশস্থিত মথুরানগরবাসী। মথুরা (মধুরা) এবং মোহোলি সচরাচর অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান মথুরা হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মোহিলি সহর অবস্থিত। প্রাচীন ভারতে মধুরা অথবা মথুরা নামে আর একটী সহর ছিল। ইহা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বৈগি নদীতটস্থ পাণ্ড্যরাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল। উত্তর-ভারতের মথুরা হইতে পৃথক্ করিবার জন্য ইহাকে দক্ষিণ-মথুরা বলা হইত।[৩]

মলয়া সোম্নভূমকা—মলয়দেশীয় সুবর্ণভূমির অধিবাসী।

মলয়ালকা—মলয় দেশের অধিবাসী।

কুসিনারার মল্ল—ইহারা একটী গণতান্ত্রিক জাতি।[৪]

মট্ঠলা—ইহাদের পরিচয় অজ্ঞাত।

মেকলা—ইহারা একটী ক্ষুদ্র জাতি। বর্ত্তমান অমরকণ্টক পর্ব্বত ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের মধ্যবর্ত্তী দেশে ইহারা বাস করিত।[৫]

মুণ্ডকা—সম্ভবতঃ পর্ব্বতবাসী মুণ্ডাগণ। সাঁওতাল পরগণা, ছোট নাগপুর, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ এবং হিমালয়ের নিম্নদেশে ইহাদের বাস আছে।

ওড্ডকা—ওড্রা অথবা উড্রা। পশ্চিম-মেদিনীপুর, মানভূম, পূর্ব্ব-সিংভূম এবং দক্ষিণ-বাঁকুড়ায় ইহারা বাস করিত।

পল্লবকা—দক্ষিণ-ভারতের একটী জাতি। ইহারা উত্তরভারতের কোন একটী জাতি হইতে উদ্ভূত। কাঞ্চীপুরে ইহাদের রাজধানী ছিল।[৬]

সাকুলা—সম্ভবতঃ সাকল অথবা সাগল দেশের অধিবাসী। ইহা বেক্ট্রিয়ার রাজা মিনান্দরের রাজধানী ছিল।

১। মল্লিখিত Ancient Indian Tribes (Vol. 2, pp. 31—33) দ্রষ্টব্য।

২। মল্লিখিত Ancient Indian Tribes, Ch. I দ্রষ্টব্য।

৩। মল্লিখিত Geography of Early Buddhism, p. 21 দ্রষ্টব্য।

৪। মল্লিখিত Some Ksatriya Tribes of Ancient India, pp. 147 foll দ্রষ্টব্য।

৫। মল্লিখিত Ancient Indian Tribes, Vol. 2, p. 28 দ্রষ্টব্য।

৬। The Early Pallavas by D. C. Sircar দ্রষ্টব্য।

শবরা—ইহারা একটী অনার্য্য জাতি। দক্ষিণাপথের কোন একটী অংশে ইহারা বাস করিত।[১]

সুদ্দকা—মহাভারতের শূদ্রকগণ। ইহারা Oxydrakai নামে পরিচিত। ইহাদের রাজধানী ছিল উচ (অথবা কুচ)।[২]

সুপ্পারিকা—বেসিন হইতে ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং বোম্বাই হইতে ৩৭ মাইল উত্তরে থানা জেলার অন্তর্গত সুরপারক অথবা সোপারার অধিবাসী।

সুরট্‌ঠা—সৌরাষ্ট্র অথবা গুজরাট অথবা কাথিয়াড় দেশের অধিবাসী।[৩]

বেলবকা—ইহাদের পরিচয় অজ্ঞাত।

যোনকা[৪]—ইহারা গ্রীক নামে পরিচিত।

পেশা

তখনকার লোকেরা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য নানা পেশা অবলম্বন করিত ; অপদানে উল্লিখিত পেশাগুলির বিশদ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।[৫]

অনিকট্‌ঠা—রাজার দেহরক্ষী, প্রাণ-রক্ষী।

চম্মকারা—(অথবা রথকারা)—চর্ম্মকার, চর্ম্মশোধক, অশ্বসজ্জাকার।

চাপকারা—ধনু-নির্ম্মাতা।

দোবারিকা—দ্বার-রক্ষক।

দুস্‌সিকা—বস্ত্রব্যবসায়ী।

গন্ধিকা—গন্ধ-ব্যবসায়ী।

হথারুহা—হস্তিচালক।

হত্থিপালা—হস্তিপালক।

কম্মারা—কর্ম্মকার।

কট্‌ঠহারা—কাষ্ঠ-সংগ্রহকারী।

কুম্ভকারা—কুম্ভকার।

লোহকারা—লৌহকার, তাম্রকার।

মণিকারা—মণিকার।

নলকারা—ঝুড়ি প্রস্তুতকারক।

পেসকারা—তন্তুবায়।

পেস্‌সিকা—চাকর।

পুপ্‌ফছড্ডকা—পুষ্প অপসারক।

রজকারা—রজক।

সোম্নকারা—স্বর্ণকার।

সুপিকা—পাচক।

তচ্ছকা—সূত্রধর।

তেলিকা—তৈল-প্রস্তুতকারক।

টিপুকারা—টিন-কর্ম্মকার।

তুম্নবায়া—দরজী।

উদহারা—জল-বাহক।

উসুকারা—বাণ-নির্ম্মাতা।

এই তালিকার মধ্যে কৃষক এবং গো-রক্ষকের কোন উল্লেখ নাই।

১। I. C. Vol. I, p. 305. মল্লিখিত Some Notes on Tribes of Ancient India.

২। N. L. De—Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, p. 195.

৩। ঐ, p. 183. ৪। I C. Vol. I, pp. 343 foll.

৫। এই প্রসঙ্গে Rhys Davidsএর Buddhist India গ্রন্থে (পৃঃ ৮৮) উল্লিখিত পেশার তালিকা তুলনীয়।

ভৌগোলিক তথ্য

অপদানে উল্লিখিত নদী প্রভৃতির বৃত্তান্ত নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

ভাগিরথী—গঙ্গার অপর নাম; ইহা হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠ পুণ্য নদী।

চন্দভাগা—চন্দ্রভাগা নদী। ইহা হিমালয় পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়াছে। ইহার তীরে একটী জলপরী বাস করিত; সে বুদ্ধদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিল।[১]

চিনতা—এই নদী বুদ্ধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল।[২]

গঙ্গা—গঙ্গা নদী বাঙ্গালা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং সাহারণপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহা সাগরদ্বীপের নিকটস্থ সাগরে পতিত হইতেছে।

মহী—পঞ্জাব প্রদেশের একটী নদী। ইহা গণ্ডক নদীর শাখা।

নর্ম্মদা—ইহা অমরকণ্টক পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া কাম্বে উপসাগরে পতিত হইতেছে। এই নদী ও সাগরের সঙ্গমস্থল হিন্দুদিগের একটী পুণ্য তীর্থস্থান।

সরস্বতী—ইহা হিন্দুদিগের একটী পবিত্র নদী। ইহা সেওয়ালিক নামক হিমালয়াঞ্চলের সিরমুর পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া আম্বালার সমভূমিতে পতিত হইতেছে।

সরভূ—সরযূ নামে সুপরিচিত। ঘোগ্রা অথবা গোগ্রা ইহার অপর একটী নাম। প্রাচীন অযোধ্যা ইহার তীরে অবস্থিত।

সিন্ধু—সিন্ধু নদ।

যমুনা—ইহা গঙ্গার মত একটী পবিত্র নদী।

হিমালয় অঞ্চলের কতকগুলি পর্ব্বতের নাম নিম্নে দেওয়া হইল:—**অনোম, অসোক,** ভূতগন, চাবল, গোতম, হারিত, কুক্কুর, লম্বক, রোমস, সোভিত, বসভ এবং বিকট।

হিমালয় হইতে অনতিদূরে চাবল নামে একটী পর্ব্বত ছিল; এখানে বুদ্ধ সুদস্সন একটী গুহার মধ্যে বাস করিতেন।[৩] নিসভ পর্ব্বতের উপরিভাগে পর্ণকুটীরে সুসজ্জিত সুভূতি ঋষির আশ্রম ছিল।[৪] কুক্কুর পর্ব্বতে মন্ত্রবিদ্ একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল।[৫] বসভ পর্ব্বতের পাদদেশে জনৈক ব্রাহ্মণের আশ্রম ছিল। ইনি মন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বুদ্ধদেবের মহৎ উপদেশবাক্যগুলি আলোচনা করিতেন।[৬] সোভিত পর্ব্বতের উপরিভাগে বক্কুলের জন্য একটী আশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইনি শিষ্যগণ সহ এখানে বাস করিতেন।[৭]

চিত্তকূট—ইহা বুন্দেলখণ্ডস্থিত কাম্তানাথ পর্ব্বত। ইহা মন্দাকিনী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে রামচন্দ্র বনবাসকালে কিছু দিনের জন্য বাস করিয়াছিলেন।

গন্ধমাদন—রুদ্রহিমালয়ের একটী অংশ। কেহ কেহ বলেন, ইহা কৈলাস পর্ব্বতের একটী অংশ। ইহা কৈলাস পর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। এই পর্ব্বতের উপর

১। Apadana, p. 450. ২। Apadana, p. 428.
Apadana, p. 451. ৪। Apadana, p. 67. ৫। Apadana, p. 155.
৬। Ibid, p. 167. ৭। Ibid, p. 328.

বদরিকাশ্রম বিদ্যমান। কথিত আছে, হনুমান্ ইহার একটী অংশ লইয়া আসিয়াছিল। জাতকে[১] ইহাকে পাষাণ-গিরিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বেভার পর্ব্বত—ইহা মগধ দেশের একটী পর্ব্বত। গিরিব্রজ সহর পাঁচটী পর্ব্বতের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং এই পর্ব্বত তাহাদের মধ্যে একটী।

বন্ধুমতী—এই সহরে একটী রাজোদ্যান ছিল।[২]

চম্পা—অঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী। ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী চম্পানগর এবং চম্পাপুর নামে যে দুইটী গ্রাম আছে, সম্ভবতঃ চম্পা তাহাদেরই নামান্তর।[৩]

গিরিব্বজ—মগধ দেশের প্রাচীন রাজধানী। রাজগৃহের পুরাতন নাম।[৪]

হংসবতী—কয়েক জন থেরী (যাহাদের গাথা থেরীগাথার মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে) পূর্ব্বজন্মে এই সহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বুদ্ধদেব এই সহর পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং একজন কুম্ভকার তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিল।[৫] ইহা গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।[৬] অপদানে ইহা একটী সহর বলিয়া বর্ণিত আছে। এখানে সুজাত নামে একজন ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি একজন ধনী এবং খ্যাতনামা শিক্ষাগুরু ছিলেন।[৭]

জেতবন—বুদ্ধদেব এই স্থান পরিদর্শন করেন এবং এখানে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেন।[৮] অনাথপিণ্ড বুদ্ধদেব ও তাঁহার সঙ্ঘকে এই স্থানটী দান করেন। ইহা শ্রাবস্তী (বর্ত্তমান সাহেটমাহেট) হইতে এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।[৯]

সাগল অথবা **সাকল**[১০]—এখানে কপিল ব্রাহ্মণের কন্যা সুচিমতী বাস করিতেন। বুদ্ধদেবের নিকট ইনি ধর্ম্মোপদেশ লাভ করেন।[১১]

সাবত্থী[১২]—এই সুন্দর শ্রাবস্তী নগরে একজন উপাসকের গৃহে কস্‌সপ প্রতিপালিত হন। তার পর তিনি বুদ্ধের উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১৩]

উরুবেলা—গয়া অথবা বুদ্ধগয়া[১৪] হইতে ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

উত্তরকুরু—ঘারওয়াল এবং হূণদেশের উত্তরাংশ। তিব্বত এবং পূর্ব্বতুর্কিস্থান ইহার অন্তর্গত ছিল। জাতকের মতে ইহা হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।[১৫]

বঙ্গ—বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গ।[১৬]

১। Jatak, No, 547. ২। Apadana, p. 456.

৩। B. C. Law—Geography of Early Buddhism, pp. 6-7.

৪। ঐ, p. 8 foll. ৫। Apadana, p. 444. ৬। ঐ, p. 599.

৭। ঐ, p. 37. ৮। ঐ, p. 470.

৯। B. C. Law—Geography of Early Buddhism, p. 44 ; Sravaasti in Indian Literature (Mem. Arch. Surv. Ind.) No. 50, p. 22 foll.

১০। B. C. Law—Some Ksatriya Tribes of Ancient India, pp. 217 foll.

১১। Apadana, p. 583.

১২। B. C. Law—Sravasti in Indian Literature (Mem. Arch. Surv. Ind. No. 50).

১৩। Apadana, p. 614.

১৪। N. L. De,—Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, pp 212-13.

১৫। Cowell, Vol. V, p. 167 ; N. L. De—Geog. Dictionary of Ancient and

অট্টালিকা এবং স্থপতিবিজ্ঞান

অগ্‌গিসালা—অগ্নিশালা।

আপণ—দোকান।

চচ্চর—প্রাঙ্গণ।

চঙ্কম—বেড়াইবার স্থান।

দ্বারকোট্‌ঠক—তোরণদ্বারের উপরে ভাণ্ডার।

গুহা—গহ্বর।

জন্তাঘর—স্নানঘর।

কূটাগার—চূড়াবিশিষ্ট ঘর।

মণ্ডপ—বড় তাঁবু।

নহানঘর—স্নান-ঘর।

পাকার—চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাচীর।

পরিখা—পরিখা।

পাসাদ—প্রাসাদ।

রাজুয্যান—রাজোদ্যান।

সঙ্ঘারাম—আশ্রম।

বিভিন্ন সম্প্রদায়

অপদানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একটী তালিকা পাওয়া যায়। পদকা,[১] লটুকা,[২] নিগণ্ঠা (বন্ধন-মুক্ত—বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহারা মহাবীরের শিষ্য জৈন বলিয়া খ্যাত), পুপ্‌ফসাতকা (যাহারা পুষ্প-পরিচ্ছদ পরিধান করে), তেদণ্ডিকা[৩] (যাহারা ত্রিদণ্ড বহন করে), একসিখা (যাহাদের একটী শিখা আছে), আজীবিকা (যাহারা মক্‌খলি গোসালের শিষ্য), বিলুওবী[৪], গোতমা (যাহারা গোতমের শিষ্য), দেবধম্মিকা (যাহারা বুদ্ধের মতাবলম্বী), পরিবত্তকা[৫], সিদ্ধিপত্তা (যাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে), কোণ্ডপুগ্‌গলিকা (অথবা কোধপুগ্‌গলিকা, ক্রুদ্ধ লোক), তপস্‌সী (তপস্বী), এবং বনচারী (বনবাসী)।[৬]*

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

১-২। ইহাদের পরিচয় অজ্ঞাত।

৩। Rhys Davids, Buddhist India, p. 145

৪। ইহাদের পরিচয় অজ্ঞাত। ৫। অজ্ঞাত।

৬। ইহারা বুদ্ধের সমসাময়িক ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষ। Anguttara, III, pp. 276-77. Rhys Davids, Introduction to the Kassapa-Sihanada Suttanta S. B. B. Vol. II, pp. 220 foll.

* ১৩৪৪।৭ই পৌষ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

যে-সকল কীর্ত্তিমান্ পুরুষ জীবনের আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া যাইবার অবকাশ পান, তাঁহারা ভাগ্যবান্। তাঁহাদের জীবৎকালেই তাঁহাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিলব্ধ আদর্শ ও চিন্তাধারা দেশের ও জাতির জনগণের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে; নিজেদের জীবন ও কীর্ত্তির জীবন্ত আদর্শ সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে দীপ্যমান থাকে বলিয়াই তাঁহাদের মহিমাও শনৈঃ শনৈঃ বিকশিত হইতে থাকে; নিছক বাঁচিয়া থাকিয়াই তাঁহারা উত্তরোত্তর যশের শিখরে উঠিতে সক্ষম হন। কিন্তু মৃত্যু যাঁহাকে অকালে সাধারণের দৃষ্টিপথের বাহিরে লইয়া যায়, আদর্শ প্রতিষ্ঠিত অথবা চিন্তাধারা বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বেই যাঁহাকে বিদায় লইতে হয়—সেই হতভাগ্য পুরুষের মহিমময় ভবিষ্যতের সম্ভাবনা মাত্র প্রত্যক্ষ করিয়া আশান্বিত ভক্তজনের সান্ত্বনা কোথায়? মাত্র ত্রিশ বৎসরের অসম্পূর্ণ জীবনে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার বহুধাবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রের বহু আরব্ধ কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই; সেজন্য সমসাময়িক অনেক আত্মীয়বন্ধু শোক প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিংশবৎসরাধিক অর্দ্ধশতাব্দীর অন্ধকার যবনিকা তুলিয়া আজ আমরা বুঝিতে পারিতেছি, অতিপরিচয়ের প্রীতি অথবা স্নেহ কালীপ্রসন্নের যথার্থ সত্তাকে উপলব্ধি করিবার পথে বাধা জন্মাইয়াছিল; তাঁহারা ভোরের পাখীর কাকলিমাত্র শুনিয়াছিলেন, তিমির-বিদারণ অরুণরাগ প্রত্যক্ষ করেন নাই; যুগান্তের পরপার হইতে আজ আমরা সেই অস্ফুট আলোর আভাস পাইতেছি এবং চকিত-বিস্ময়ে অনুভব করিতেছি যে, অকালমৃত্যু আকাশমার্গে এই জ্যোতিষ্কের গতিপথ সহসা রুদ্ধ করিয়া না দাঁড়াইলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধেই আমরা বঙ্গগগনে আর একটি ভাস্বর মহিমা প্রত্যক্ষ করিতাম।

তুলনার দ্বারা আমাদের বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হইবে। কালীপ্রসন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের দুই বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যখন পরলোকগমন করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তখন 'ললিতা ও মানসে'র কাব্যবিলাস এবং বৈদেশিক বাণীসাধনা ত্যাগ করিয়া মাত্র দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী রচনা শেষ করিয়াছেন। 'বঙ্গদর্শনে'র সম্ভাবনা তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সেই স্বল্পকালের জীবনেই সমাজে, রাষ্ট্রে এবং সাহিত্যে এমন সকল কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাহার আলোচনা ও বিবৃতি এ যুগেও আমাদের অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক করিতেছে। কালীপ্রসন্নের বহুমুখী প্রতিভার এবং বিচিত্র কর্ম্মজীবনের অদ্ভুত পরিচয় লাভ করিয়া পাঠকমাত্রেই নিঃসংশয়ে স্বীকার করিবেন যে, এই কীর্ত্তিমান্ পুরুষ দীর্ঘজীবী হইলে বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতি লাভবান্ হইত—উনবিংশ শতাব্দীর কালীপ্রসন্নকে বিংশ শতাব্দীতে পরিচিত করাইবার জন্য লেখককে এতখানি পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করিতে হইত না।

বাল্যজীবন

কালীপ্রসন্ন কলিকাতা জোড়াসাঁকো-নিবাসী প্রসিদ্ধ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের প্রপৌত্র, জয়কৃষ্ণ সিংহের পৌত্র, এবং নন্দলাল সিংহের পুত্র। সেকালের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির জন্মতারিখ লইয়া যেরূপ মতভেদ আছে, কালীপ্রসন্নের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার চরিতকারেরা তাঁহার জন্মতারিখ ১৮৪১ সন বলিয়া মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে উহা ১৮৪০ সন।

কালীপ্রসন্ন নন্দলাল সিংহের একমাত্র সন্তান। পুত্রের জন্ম-উপলক্ষে সিংহ-পরিবারে সমারোহের সহিত যে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল, 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে তাহার বিবরণ ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখের 'ক্যালকাটা কুরীয়ার' পত্রে অনূদিত হইয়াছিল। বিবরণটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> Nautch in Celebration of the Birth of a Child.—Last night a series of Nautches commenced at the residence of Baboo Nundolaul Sing, at Jorasanko, in celebration of the birth of his first child, a boy, which took place lately. There were a large assemblage of native gentlemen and professors of Sanscrit present on the occasion; the former were highly gratified with the musical performances of the nautch girls, and the latter with the valuable presents of Cashmere Shawls, etc.—*Prabhakur.*

কালীপ্রসন্ন শৈশবে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা নন্দলাল ওরফে ছাতু সিংহের ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হয় (৬ এপ্রিল ১৮৪৬)। স্বনামধন্য হরচন্দ্র ঘোষ কালীপ্রসন্নের অভিভাবক এবং পিতৃ-সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

১৮৫৪ সনের ৫ই আগষ্ট বাগবাজারের প্রসিদ্ধ বসু-বংশের লোকনাথ বসুর ভ্রাতা বেণীমাধব বসুর কন্যার সহিত চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক কালীপ্রসন্নের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> শ্রাবণ, ১২৬১।...মৃত বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের সুশীল পুত্র শ্রীমান্ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের শুভ বিবাহ বাগবাজার নিবাসি মিষ্টভাষি সদ্বিদ্বান্ শ্রীযুত রায় লোকনাথ বসু বাহাদুরের ভ্রাতৃকন্যার সহিত অতি সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে।—'সংবাদ প্রভাকর,' ১৬ আগষ্ট ১৮৫৪।*

কিছু দিন পরে কালীপ্রসন্নের স্ত্রীবিয়োগ হইলে তিনি চন্দ্রনাথ বসুর এক কন্যার সহিত পরিণীত হন।

---

* ৮ আগষ্ট ১৮৫৪ তারিখে 'সম্বাদ ভাস্কর'ও লিখিয়াছিলেন :—"গত শনৈশ্চর বাসরীয় [৫ আগষ্ট] যামিনীযোগে আমারদিগের প্রিয় বন্ধু পরলোকগত বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের বংশধর পুত্র শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবুর উদ্বাহ কার্য্য রঙ্গপুরের সদর আমীন শ্রীযুত বাবু বেণীমাধব বসুর কন্যার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে...।"

৪ আগষ্ট ১৮৫৪ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' ভ্রমক্রমে লিখিয়াছিলেন যে, "কালীপ্রসন্ন সিংহের শুভবিবাহ... লোকনাথ বসু বাহাদুরের কন্যার সহিত নির্ব্বাহ হইবেক।" কালীপ্রসন্নের চরিতকারেরা এই ভ্রমের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা

বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠাকাল

বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভাষার অনুশীলন। অনেকে বলেন, ১৮৫৫ সনে বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ইহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৩ সন মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। ১৮৫৬ সনের জানুয়ারি মাসে ইহার প্রথম সাম্বৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হইলে পরবর্তী ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ৭ মাঘ শনিবার যামিনী ৭ ঘণ্টার সময়ে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাম্বৎসরিক সভা নির্ব্বাহিত হইয়াছে, এই সভা দ্বারা দেশের যে কত হিতসাধন হইবেক তাহা বলা যায় না। এই সভার বয়ঃক্রম এক বৎসর হইল ইহার মধ্যে দেশের অনেক কুপ্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, প্রথমতঃ ইতিপূর্ব্বে এই কলিকাতা নগরে একটিও বাঙ্গালা সভা ছিল না, শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করিবাতে অধুনা অনেক ভদ্রসন্তানেরা আপনাপন বাটীতে এক এক বাঙ্গালা সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন…আমরা দেশীয় সকল ব্যক্তিকে এই পরামর্শ প্রদান করি যে শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দৃষ্টান্তের অনুগামি হউন, তাহা হইলে বোধ করি অত্যল্পকাল মধ্যে দেশস্থ তাবতেই সভ্যতাসোপানে পদার্পণ করিতে পারিবেক।

১৮৫৬ সনের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত সাম্বৎসরিক সভার উপরি উদ্ধৃত বিবরণে "এই সভার বয়ঃক্রম এক বৎসর হইল"—কথাগুলি হইতে ধরিয়া লওয়া স্বাভাবিক যে, বিদ্যোৎসাহিনী সভা ১৮৫৫ সনে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাম্বৎসরিক সভাগুলি যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয় নাই ; বর্ষকালমধ্যেই প্রথম তিনটি সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হয়। ১৯ জানুয়ারি ১৮৫৬ তারিখে বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক সভা হয় সত্য, কিন্তু তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন যে পর বৎসরের ১৪ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, একাধিক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত "বিজ্ঞাপন" হইতে তাহা জানা যাইবে :—

> ২ মাঘ বুধবার রাত্রি ৮ ঘণ্টার সময়ে বিদ্যোৎসাহিনী সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভা হইবেক, দর্শক মহাশয়গণ সভারোহণ করত বাধিত করিবেন।—শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক। ('সংবাদ প্রভাকর', ৯ জানুয়ারি ১৮৫৭)

বিদ্যোৎসাহিনী সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভা প্রসঙ্গে ১২ জানুয়ারি ১৮৫৭ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় একটি সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল। ইহা পাঠ করিলে সভার প্রতিষ্ঠাকাল যে ১৮৫৩ সন, তাহা বুঝিতে কোন বাধা হইবে না :—

> বন্ধু হইতে প্রাপ্ত
>
> বিদ্যোৎসাহিনী সভা।
>
> যোড়াসাঁকোর বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুরোধে প্রকাশ করিতেছি যে আগামি ২রা মাঘ বুধবার সন্ধ্যার সময় শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের বাটীতে উক্ত সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভা হইবেক, সভ্য এবং দর্শক মহাশয়েরা ঐ সময়ে উপস্থিত হইবেন, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে যেরূপ ঐক্য অভাব তাহাতে যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা

বিশেষতঃ যখন সভার উন্নতি এবং স্থায়িত্ব সকল সভ্যের সমবেত যত্ন এবং চেষ্টার উপর সম্যক রূপে নির্ভর করে, তখন তিন বৎসর এমত সুদীর্ঘকাল জীবিতা রহিয়াছে ইহাই অতিশয় আশ্চর্য্য এবং কে না অম্লান বদনে সভা সংস্থাপক শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন বাবুকে এবং সভ্যদিগকে সাধুবাদ করিবেন ; ...

এই সকল কারণে আমি মনে করি, বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৩ সন,—১৮৫৫ নহে। এ-সম্বন্ধে একটি প্রমাণও উদ্ধৃত করিতেছি। ১৪ জুন ১৮৫৩ (১ আষাঢ় ১২৬০) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিবরণ।...৺নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্য এক সভা করিয়াছেন।

এই সভাই যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রথমাবস্থায় এবং পরেও অনেক দিন কালীপ্রসন্ন ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সভার বিজ্ঞাপন হইতে আমরা আরও কয়েক জনের নাম সম্পাদকরূপে পাই ; ইঁহারা উমেশচন্দ্র মল্লিক, ক্ষেত্রনাথ বসু ও রাধানাথ বিদ্যারত্ন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভায় সাহিত্যালোচনা

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য ছিলেন। এই সভা সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন কালীপ্রসন্নের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়।... তাঁহার বাড়ীর দোতালায় একটি Debating Club ছিল, আমি সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। সেই স্থানে ৺কৃষ্ণদাস পালের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এখনও আমার বেশ মনে আছে, যেদিন কৃষ্ণদাস পাল commerce সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন ; ইংরাজিতে তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।...আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, কিন্তু বাঙ্গালায়। আমি ছেলে মানুষ বলিয়াই হৌক বা আর কোনও কারণেই হৌক, প্রবন্ধগুলির জন্য আমি প্রশংসা পাইতাম। একদিন আমার একটি প্রবন্ধের আলোচনা হইতেছিল—কি বিষয়ে সে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এখন আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় বিধবা-বিবাহের উপর,—এমন সময় একজন সভ্য বলিয়া উঠিলেন, 'ছেলে মানুষের প্রশংসা ক'রে ক'রে রাত কাটান যাবে নাকি ?' কালী সিংহ সভার নাম দিয়াছিলেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' ; দুষ্ট লোকে তাহার নামকরণ করিল 'মদ্যোৎসাহিনী সভা'। তিনি সভার patron গোছ ছিলেন।...মধ্যে মধ্যে সভ্যদিগের ভোজনাদির ব্যবস্থা হইত ; আমি কিন্তু কখনও আহারাদিতে যোগদান করি নাই। ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪-৮৫)

বিদ্যোৎসাহিনী সভায় অনেক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি পঠিত ও আলোচিত হইত। কালীপ্রসন্নও স্বরচিত অনেক প্রবন্ধ এই সভায় পাঠ করিতেন। এক জন প্রত্যক্ষদর্শী বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্বন্ধে 'সমাচার সুধাবর্ষণ' পত্রে (১৬ই-১৭ই আগষ্ট ১৮৫৫) যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা হইল :—

আমরা গত শনিবাসরীয় যামিনী যোগে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভায়' গমন করিয়াছিলাম...। ন্যূনাধিক দুই শত ভদ্র সন্তান ঐ সভায় বিদ্যমান ছিলেন, কালীপ্রসন্ন বাবু প্রসন্ন বদনে সমাদর

দিগের পত্র সকল পাঠ করিলেন, কানপুর দিনাজপুর বগুড়া বালেশ্বরাদি নানা স্থানীয় গুণগ্রাহক গ্রাহক মহাশয়েরা বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা গ্রহণার্থ পত্র লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ঐ সকল পত্র পাঠ করিয়া মূল প্রস্তাব অর্থাৎ বাণিজ্য বিষয়ে কিং উপকার, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ ব্যক্ত করিলেন তৎপরে সভা সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ শর্ম্ম মল্লিখিত বিস্তারিত রূপে ঐ সকল বিষয় ব্যক্ত করেন অনন্তর কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবু ঈষদ্‌হাস্য প্রসন্ন বদনে বলিলেন সভ্য ও দর্শক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রস্তাবিত বিষয়ে যে ভাষায় যিনি যাহা বলিতে পারেন বক্তৃতা করুন তাহাতে আমরা আহ্লাদিত হইয়া সভার কার্য্য এবং উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ বলিয়াছি অনুভব করি সর্ব্বসাধারণ লোকেরা বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকাতেই তাহা দেখিতে পাইবেন।"

সাধারণতঃ শনিবার সন্ধ্যাকালে বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধিবেশন হইত। সভায় কি ধরণের প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি হইত, তাহার আভাস দিবার জন্য সেকালের সংবাদপত্র হইতে কয়েকটি "বিজ্ঞাপন" উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) আগামি শনিবাসরে সি, জে, মনটেগিউ [ডেভিড হেয়ার একাডিমির প্রধান শিক্ষক] সাহেবের বক্তৃতা করিবার ভার ছিল, অকস্মাৎ তাঁহার কোন বাধা ঘটিবায় তিনি আগামি শনিবারে আসিতে অক্ষম, আগামি শনিবারের পর শনিবারে তিনি "Labour its importance dignity piety and triumphant results" এই বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, "মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব কি ?" এই বিষয়ক প্রস্তাব শ্রীযুত প্রিয়মাধব বসুর দ্বারা এই শনিবারে পঠিত হইবেক।— শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা। ('সংবাদ প্রভাকর' ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬)।

(২) অদ্য শনিবার সন্ধ্যার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রকাশ্য সভা হইবেক, দর্শক ও সভ্যগণ সভাস্থ হইয়া বাধিত করিবেন। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সম্পাদকীয় আসনে এইবার শেষ উপবেশন করিয়া বঙ্গদেশের কুরীতি বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।—শ্রীউমাচরণ নন্দী। কর্ম্মাধ্যক্ষ। ('সংবাদ প্রভাকর,' ১৫ মার্চ্চ ১৮৫৬)

(৩) আগামী শনিবার সন্ধ্যার পরে যুগলসেতুস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় শ্রীযুত কার্কপেট্রিক সাহেব "Sentiments proper to the age and Country" অর্থাৎ দেশকাল বিষয়োপযোগী অভিপ্রায় বিষয়ে লেক্‌চর অর্থাৎ উপদেশ করিবেন, অতএব উক্ত বিষয়ে সভ্য ও বিদ্যোৎসাহি দর্শক মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। সম্পাদক। ('সংবাদ প্রভাকর', ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬, বুধবার)

সুলিখিত প্রবন্ধের জন্য বিদ্যোৎসাহিনী সভা মাঝে মাঝে পুরস্কার প্রদান করিতেন। এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্র হইতে দুইটি "বিজ্ঞাপন" উদ্ধৃত করিতেছিঃ —

(১) "জগতে সুখি কে ?" এই বিষয়ক প্রবন্ধ যে ব্যক্তি লিখিতে ইচ্ছা করেন উত্তম হইলে বিচার মতে ২২ আষাঢ়ের মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা তাঁহাকে ২০০ দুই শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন, ৮ পেজি ফরমার, ১ ফরমার ন্যূন হইলে গ্রহণযোগ্য নহে।—কালীপ্রসন্ন সিংহ। সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষ। ('সংবাদ প্রভাকর', ৪ জুন ১৮৫৬)

(২) "হিন্দুধর্ম্মের উৎকৃষ্টতা" বিষয়ক প্রবন্ধ নানা প্রকার প্রমাণাদি সহিত লিখিতে হইবে, যিনি লেখকগণের মধ্যে বিচারে উত্তম হইবেন তাঁহাকে বিদ্যোৎসাহিনী সভা তিন শত মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন ২ মাঘ সাম্বৎসরিক সভায় প্রেরণ করিতে হইবেক।—শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক। ('সংবাদ প্রভাকর,' ৪ নবেম্বর ১৮৫৬)

বিদ্যোৎসাহিনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তক-পত্রিকা

কালীপ্রসন্ন যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই বিদ্যোৎসাহিনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়; এগুলির বিস্তৃত পরিচয় "কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনা"-বিভাগে দেওয়া হইয়াছে।

কালীপ্রসন্নের রচনা ছাড়া, অন্ততঃ আরও দুইখানি পুস্তক বিদ্যোৎসাহিনী সভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়:—

> বিজ্ঞাপন।—নিম্নলিখিত পুস্তক বিক্রয়ার্থ তত্ত্ববোধিনী সভায় প্রস্তুত আছে।
>
> মনুষ্যের মহত্ত্ব কি　...　মূল্য ৶০
>
> বালকরঞ্জন দুইখণ্ডে বিভক্ত　...　" ।/০
>
> শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।
>
> বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

প্রথমখানির লেখক প্রিয়মাধব বসু, দ্বিতীয়খানির লেখক হালিশহর খাসবাটী নিবাসী উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়; 'বালকরঞ্জন' ১৮৫৫ সনের শেষাশেষি প্রকাশিত হয়।

'বিধবোদ্বাহ নাটক' নামে উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের আরও একখানি পুস্তক বিদ্যোৎসাহিনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে বলিয়া ১৬ আগষ্ট ও ২০ নবেম্বর ১৮৫৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত "সভার অধ্যক্ষগণ মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ে অক্ষম হইবায়" গ্রন্থকার নিজব্যয়ে মুদ্রাঙ্কন করাইতেছেন বলিয়া ৮ জুলাই ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' বিজ্ঞাপিত করেন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র-স্বরূপ 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও কালীপ্রসন্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা "সাময়িক পত্রাদি পরিচালন"-বিভাগে পাওয়া যাইবে।

বিদ্যোৎসাহিনী সভায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও পাদরি লঙের সম্বর্দ্ধনা

বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইবার সৌভাগ্য বোধ হয় মাইকেলের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে। বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন ও তাহার সাফল্য দেখিয়া গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিবরকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখে একটি সভার আয়োজন করেন। এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য মাইকেলের গুণানুরক্ত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই আমন্ত্রণ-লিপি উদ্ধৃত করিতেছি:—

> My dear Sir,
>
> Intending to present Mr. Michael M. S. Dutt with a silver trifle as a mite of encouragement for having introduced with success the Blank verse

into our language, I have been advised to call a meeting of those who might take a lively interest in the matter at my house on the occasion of the presentation, in order to impart as much of solemnity as it is capable of receiving, while retaining its private character and therefore to serve perhaps its purpose better ; I shall therefore be obliged, and I have no doubt all will be pleased, by your kind presence at mine on Tuesday next, the 12th Instant at 7 P. M.

Yours truly
Kaly Prussunno Singh
Calcutta the 9th February 1861.

সম্বর্দ্ধনা-সভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সমাগম হইয়াছিল। বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে একখানি মানপত্র ও একটি মূল্যবান সুদৃশ্য রজত পানপাত্র উপহার দিয়াছিলেন। মানপত্রখানি এইরূপ :—

এড্রেস।—

মান্তবর শ্রীল মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু।

কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং।

যে প্রকারে হউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্ত্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকর্ত্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোচর নাই। আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অনুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ক্রটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম হয়ত সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শনজনিত দুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময় বর্ত্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্নবান হউন। আপনা কর্ত্তৃক যেন ভাবি বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী

জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজি ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার অর্পণ উৎসবে যে এ সকল মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাঁহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন।

কলিকাতা
বিদ্যোৎসাহিনী সভা
২ ফাল্গুন ১৭৮২ শকাব্দা। বিদ্যোৎসাহিনীসভা সভাবর্গাণাম্।*

এই মানপত্রের উত্তরে মাইকেল বাংলায় একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার অনুলিপি নিম্নে দেওয়া হইল :—

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে, এদেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়! তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা।

বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বসুমতী সেই জল প্রাপ্তে যাদৃশ উর্ব্বরতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য।

আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এ-প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সমাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি ইতি। ('সোমপ্রকাশ,' ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১)

রাজনারায়ণ বসুকে এই সম্বর্দ্ধনা সম্বন্ধে মাইকেল একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

You will be pleased to hear that not very long ago the বিদ্যোৎসাহিনী সভা —and the President Kali Prasanna Singh of Jorasanko, presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers. Fancy! I was expected to speechify in Bengali!

কালীপ্রসন্ন মাইকেলের প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন। কবির সম্বর্দ্ধনা করিয়াই তিনি নিজ কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই,—'হুতোম প্যাঁচার নকৃশা'য় অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য' বিশ্লেষণ করিয়া দেশবাসীকে মাইকেলের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

* ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' হইতে উদ্ধৃত।

বাঙ্গালী সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।

'—শুনিয়াছে বীণা ধ্বনি দাসী,
পিকবর রব নব পল্লব মাঝারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !'

হায় ! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। সংসারের নিয়মই এই প্রিয় বস্তুর নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদ্‌গুণরাজির পরিচয় প্রদান করে ; তখন আমরা মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি। অনুতাপ আমাদিগের শরীর জর্জ্জরিত করে, তখন তাহারে স্মরণীয় করিতে যত চেষ্টা করি, জীবিতাবস্থায় তাহা মনেও আইসে না।

মাইকেল মধুসূদন দত্তজ জীবিত থাকিয়া যত দিন যত কাব্য রচনা করিবেন, তাহাই বাঙ্গলা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলধিজল হইতে রত্ন উদ্ধারপূর্ব্বক বহুমানে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্ন লাভে কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি এবং অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই ; কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদিগের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণে লজ্জিত হইব।—'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,' আষাঢ়, ১৭৮৩ শক, পৃ. ৫৫-৫৬।

মাইকেলের সম্বর্দ্ধনার পর-বৎসর কালীপ্রসন্ন পাদরি লঙকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। এদেশবাসীর অকৃত্রিম সুহৃদরূপে পাদরি লঙকে তিনি বিশেষ সম্মান করিতেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ইংরেজীতে প্রচার করার অভিযোগে নীলকরেরা লঙের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিলে কালীপ্রসন্ন স্বয়ং সুপ্রীমকোর্টে গিয়া মকদ্দমার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন। এই মকদ্দমায় বিচারপতি স্তর মর্ড্যান্ট ওয়েলস্ যখন লঙের এক মাস কারাবাস ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ করেন (২৪ জুলাই ১৮৬১), তখন কালীপ্রসন্নই অগ্রসর হইয়া অযাচিত ভাবে লঙের অর্থদণ্ড—সহস্র মুদ্রা আদালতে গণিয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে কালীপ্রসন্ন শুনিলেন—লং স্বদেশ যাত্রা করিতেছেন। তিনি বিদ্যোৎ-সাহিনী সভার পক্ষ হইতে বিদায়ের প্রাকালে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে বিস্মৃত হন নাই। এই উপলক্ষে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ৩ মার্চ ১৮৬২ তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

Saturday, 1st March...

The Biddotshahinee Shabha headed by Baboo Kaliprossunno Sing presented an excellent valedictory Address to the Rev. James Long on the day of his departure. The address does honor to those from whom it emanated.

সমাজসংস্কার-কার্য্যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা

কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিনী সভা কেবলমাত্র সাহিত্যালোচনার বৈঠক ছিল না ;

বিদ্যাসাগর যখন বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগরকে ভক্তি করিতেন; বিদ্যাসাগরও তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। ১৮৫৬ সনের গোড়ায় যখন বিধবা-বিবাহ-আইন জারি করিবার আয়োজন চলিতেছিল এবং এই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে আবেদনপত্র পেশ হইতেছিল, তখন বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিয়া বহু গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এই সম্পর্কে ১২ মে ১৮৫৬ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন :—

> বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবাবিবাহ পক্ষে লেজিস্‌লেটিব কৌন্সেলে যে দরখাস্ত দিতে ইচ্ছা করিতেছেন তাহাতে তিন সহস্র ভদ্র লোকের স্বাক্ষর হইয়াছে, যদ্যপি কেহ স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছা করেন বিদ্যোৎসাহিনী সভায় আগমন করিলেই স্বাক্ষর পুস্তক পাইবেন।

১৮৫৬ সনের জুলাই মাসে বিধবা-বিবাহ-আইন জারি হইলে, কালীপ্রসন্ন সংবাদপত্রে ঘোষণা করেন যে, যিনি বিধবা-বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহাকে বিদ্যোৎসাহিনী সভা হইতে এক সহস্র মুদ্রা দেওয়া হইবে। ২২ নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> বিজ্ঞাপন।—বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবা বিবাহেচ্ছু ব্যক্তিবর্গকে জ্ঞাত করিতেছেন যে ১৭৭৭ শকীয় উনবিংশ সভায় সভার অধ্যক্ষ মহোদয়গণ প্রতি বিবাহে এক২ সহস্র মুদ্রা প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন, অতএব প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ পত্রে স্বাক্ষরিত হইলেই বিবাহের পূর্ব্বে বিদ্যোৎসাহিনী সভা সঙ্কল্পিত অর্থ প্রদান করিবেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

এই সময় আরও একটি ব্যাপারে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন আন্দোলন করিয়াছিলেন। উহা কলিকাতা নগরপ্রান্তে বেশ্যাদিগের বাসস্থল নির্দ্দেশকরণ সম্বন্ধে। এই প্রসঙ্গে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে যে আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইবার প্রস্তাব হয় তাহা ১৯ নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছিল। আবেদনপত্রখানি এইরূপ :—

> প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।
>
> বিদ্যোৎসাহিনী সভা, কলিকাতা নগরপ্রান্তে বেশ্যাদিগের বাসস্থল নির্দ্দিষ্ট জন্য লেজিসলেটিব কৌন্সলে আবেদন করিবেন, আবেদনপত্র আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি পাঠকবর্গের বিদিতার্থ প্রভাকরে প্রকাশ করিবেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।
>
> নগরপ্রান্তে বেশ্যাগণ বসতিকরণ কারণ বঙ্গদেশবাসিগণের ভারতবর্ষীয় লেজিসলেটিব কৌন্সেলে আবেদন।
>
> মহামহিম ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়গণ সমীপেষু।
>
> নিম্ন স্বাক্ষরিত বঙ্গদেশবাসীদিগের সবিনয় নিবেদন এই যে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত করায়

নিরাকরণ করাই ছত্রধরদিগের উচিত কার্য্য ও তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। এক্ষণে পুলিস কর্ত্তৃক যেরূপ শান্তিরক্ষা হইতেছে বর্ণন বাহুল্য, অতি সুচারুরূপেই হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই, নগরীয় যাবতীয় শান্তিরক্ষার মধ্যে বেশ্যাকুল দ্বারা তাহার অনেক অংশের ক্রটি হয়, কারণ বারযোষাকুল সমস্ত রাত্রি মদ্যপান দ্বারা গীতবাদ্যাদির কোলাহলে এত উৎপাত আরম্ভ করে যে ভদ্রলোক মাত্রেই উক্ত পল্লীতে শয়নাগার ত্যাগকরণে বাধ্য হন, চৌর্য্য কার্য্যদ্বারা যে সমস্ত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয় তাহা কেবল ঐ বারললনাগণের ব্যবহার কারণ। রাত্রিকালে মদ্য বিক্রয় যাহা ভয়ানক শান্তিভঙ্গ তাহা কেবল বারযোষাগণের নিমিত্তে হয়, কলহ, মদ্যপান দ্বারা জীবন সংহার, ব্যসন দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি ভয়ানক অত্যাচার করণ এই বারস্ত্রীগণের আলয়েই সম্পাদিত হয়, আরো বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের ইহা স্বভাব সংশোধন বলিলেও বলা যাইতে পারে, কারণ তাহারা কি প্রাতঃকালে কি সায়ংকালে সাবকাশ হইলেই এই কদাচার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, বেশ্যা সংখ্যার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে তাহার তাৎপর্য্য কি কেবল তাহাদিগের প্রতি কোন উক্ত নিয়ম অদ্যাবধি প্রচলিত হয় নাই বলিয়াই তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া যথেচ্ছা তাহাই করিতেছে, কেবল যে বেশ্যাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবায় এত উৎপাত হইতেছে তাহাও নহে, বঙ্গদেশীয় ধনবানগণ স্বীয় স্বীয় বসতবাটীতেও অধিক ভট্টালোভী হইয়া ভদ্রপল্লীমধ্যে বেশ্যাগণকে স্থান দান করিয়া অতুল সুখ প্রাপ্ত হইতেছেন যদ্দারা এক ঘর বেশ্যাবৃদ্ধি হইবায় সেই ভদ্রপল্লী একেবারে অভদ্র নিয়মে পরিপূর্ণ হইতেছে অতি নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক ধনবান মান্য বংশের প্রাসাদের নিকটেই বেশ্যানিকেতন কেবলই ভয়ানক ব্যবহার প্রদর্শিত হইতেছে। অতএব হে সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাগণকে নগরের প্রান্তে একত্রে নিবসতির আজ্ঞা করুন নতুবা কোন প্রকারেই ভদ্র ধনবানগণ এই বিশাল ধনপূর্ণ ভদ্র নগর বাসের উত্তম স্থল বোধ করিতে পারেন না। যদ্যপি রাজা হইয়া প্রজাদিগের শুভ চীৎকারের সময়ে কালার ন্যায় ব্যবহার করেন তাহা হইলে সেই রাজার রাজত্বের কীর্ত্তি কোন কালেই পতাকা রূপে উড্ডীন হইতে পারে না।

অতি পূর্ব্বে সোণাগাজি নামক স্থান বেশ্যাদিগের বাসস্থল ছিল অদ্যাপিও তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় পূর্ব্ব সময়ে যেরূপ শান্তিরক্ষার নিয়ম ছিল মধ্যে তাহার উল্লেখ না হইবায় একেবারে তাহা মিলিত হইয়া গিয়াছে, অযোধ্যা, কাশী, দিল্লী ইত্যাদি নগরে এবং ইউরোপীয় নানা নগরে এই প্রকার রীতি প্রচলিত আছে তজ্জন্য আমরা বিনীতভাবে এই নিবেদন করি যে দেশীয় স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও শান্তিকার্য্য উত্তমরূপ নির্ব্বাহ জন্য সভামহোদয়েরা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র পল্লী নির্দ্দিষ্ট করুন যদ্দারা আমাদের ঈপ্সিত বিষয় সুসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

মহোদয়গণ

আমরা আপনাদিগের নিতান্ত অনুগত ভৃত্য।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

১৮৫৭ সনে বিদ্যোৎসাহিনী সভা জনসাধারণের সুবিধার জন্য একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপনের আয়োজন করিতেছিলেন—সংবাদপত্রে এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ১২ মার্চ্চ ১৮৫৭ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশ :—

পুস্তকালয় সংস্থাপন।—আমরা শুনিলাম যোড়াসাঁকো বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্যেরা এক সাধারণ বা শাখা প্রকাশ্য পুস্তকালয় সংস্থাপন করিবেন, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাহাতে উচিত মত সাহায্য করিবেন, এবং আরো অবগতি হইল ঐ সভার সভ্যেরা বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবেন॥

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা নাট্যশালার নবজীবন লাভ হয়। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক পুরাতন হইলেও এ পর্য্যন্ত উহা একটা স্থায়ী কীর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। এই বিফলতার একটি প্রধান কারণ বাংলা ভাষায় নাটকের অভাব। এক লেবেডেফ ১৭৯৫-৯৬ সনে ও নবীন বসু ১৮৩৫ সনে তাঁহাদের নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয় করান ; অন্য সকলেই শেক্সপীয়রের নাটক অথবা কোন সংস্কৃত নাটকের ইংরেজী অনুবাদ অভিনয় করাইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৫৭ সনে কলিকাতায় একসঙ্গে তিনটি থিয়েটারে বাংলা নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল ; তন্মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ কালীপ্রসন্নের উদ্যোগেই ১৮৫৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় ; ইহা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সহিত সংযুক্ত ছিল।* এই রঙ্গমঞ্চ পর-বৎসরের ১১ই এপ্রিল † শনিবার উন্মোচিত হয় ও উহাতে প্রথম অভিনীত হয় ভট্টনারায়ণ-কৃত 'বেণীসংহার' নাটকের রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক একটি বাংলা অনুবাদ। এই অভিনয় সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকরে' নিম্নোদ্ধৃত বিবরণটি প্রকাশিত হয় :—

> যুগলসেতু নিবাসি সিংহবাবুদিগের ভবনে গত শনিবার [১১ এপ্রিল] সন্ধ্যার পর মহাসমারোহে নাট্যক্রীড়া হইয়াছিল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার আর্থর বুলার সাহেব, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী মেং সিসিল বিডন সাহেব প্রভৃতি ৫।৭ জন প্রধান ইংরাজ এবং নগরীয় অনেক আঢ্য মহাশয়েরা ঐ নাট্য ক্রীড়া দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নাট্য কৌতুক দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং বাবুরা সাহেবদিগকে পান ভোজনে পরিতোষ করিয়াছেন।—'সংবাদ প্রভাকর,' ১৫ এপ্রিল ১৮৫৭, বুধবার।

'বেণীসংহার' নাটকে কালীপ্রসন্ন নিজেও অভিনয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিনয় খুব প্রশংসার্হ হইয়াছিল। প্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া তিনি স্বয়ং নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ১৮৫৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী'র অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহার 'বিজ্ঞাপন' পাঠে আমরা বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমির কথা ও নাটক-রচনার উদ্দেশ্য জানিতে পারি :—

> বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ বহুকালাবধি বঙ্গবাসিগণ দর্শন করেন নাই, কারণ অতি পূর্ব্বকালে মহাকবি কালিদাসাদির দ্বারা যে সমস্ত সংস্কৃত নাটক রচিত হয়, তাহারই অনুরূপ হইত, পরে প্রায়

---

* "The *Bidyotshahinee Theatre* is in the second year of its existence." *Hindoo Patriot,* 3 Decr. 1857.

† আমার 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' (পৃ. ৪৪) এই অভিনয়ের তারিখ "৯ই এপ্রিল" দেওয়া আছে। ইহা ভুল, এবং এই ভুলের জন্য প্রধানতঃ দায়ী ১৬ এপ্রিল ১৮৫৭ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশিত এক জন দর্শকের পত্র ; তাহাতে অভিনয়ের তারিখ "৯ই এপ্রিল, শনিবার" মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষও তাঁহার লিখিত কালীপ্রসন্ন সিংহের ইংরেজী জীবন-চরিতে (পৃ. ২৮) এই ভুল তারিখের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

দুই তিন শত বৎসর অতীত হইল সংস্কৃত ভাষায় নাটক ও অনুরূপাদি এককালেই রহিত হইয়াছে, সেই অবধি আর কোন ধনবান্ ভবনে নাটকাদির অভিনয় হয় নাই। পরে সেক্সপিয়র ও অন্যান্য ইংরাজি নাটকাদি বঙ্গদেশে অভিনয় হইলে হিন্দুগণের সংস্কৃত ও বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ করিতে ইচ্ছা হয়। উইলসন্ সাহেব লেখেন প্রায় অশীতিবর্ষ অতীত হইল কৃষ্ণনগরাধিপতি ৺ প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় বাহাদুরের ভবনে চিত্রযজ্ঞ নামক এক সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ হয়, কিন্তু রঙ্গভূমির নিয়মাদির অনুবর্ত্তী হইয়া অভিনয় করেন নাই, ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইবায় কারণ অনেকের মনোরঞ্জন হয় নাই।

এক্ষণে এই বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে বঙ্গবাসী গণ পুনরায় বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ দর্শনে পারগ হইলেন। প্রথমতঃ বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে ভট্টনারায়ণ প্রণীত বেণীসংহার নাটকের শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কৃত বাঙ্গলা অনুবাদের অভিনয় হয়, যে মহাত্মারা উক্ত অভিনয় সময়ে রঙ্গভূমিতে উপনীত ছিলেন, তাঁহারাই তাহার উত্তমতার বিষয়ে বিবেচনা করিবেন, ফলে মান্যবর নটগণ যথাবিহিত নিয়ম ক্রমে অনুরূপ করায় দর্শক মহাশয়দিগের প্রীতিভাজন ও শত শত ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন।

পরে উপস্থিত দর্শক মহোদয়গণের নিতান্ত আগ্রহাতিশয়ে এবং তাঁহাদিগের অনুরোধ বশতঃ পুনরায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে অনুরূপ কারণই বিক্রমোর্ব্বশী অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল, এক্ষণে বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের পাঠযোগ্য এবং নাগরীয় অন্যান্য রঙ্গভূমির অনুরূপ যোগ্য হইলে আমরা শ্রম সফল হইবে।

২৪ নবেম্বর ১৮৫৭ তারিখে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে বিক্রমোর্ব্বশী নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হয়। এই অভিনয় প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

> যোড়াসাঁকো নিবাসি ধনরাশি বিদ্যোৎসাহি শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটীর বৈঠকখানাস্থিত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে গত দিবস রজনী ৮ ঘটিকা হইতে একাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত নাট্যক্রীড়াছলে 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের অনুরূপ প্রদর্শিত হয়, তদ্দর্শনার্থ কয়েক জন সুসভ্রান্ত প্রধান ইংরাজ এবং বহু সংখ্যক এতদ্দেশীয় মান্য লোকের সমাগম হইয়াছিল, নেপথ্য এবং নাট্যশালার সুসজ্জায় এবং নট নটী প্রভৃতি সমুদয় কেলিকিল অর্থাৎ ক্রীড়ক কদম্বের ক্রীড়ায় তাবতেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।
>
> এতদ্দেশীয় নাট্যক্রীড়ার প্রাচীন প্রথা, যাহা বহুকাল পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া সাধারণের গোচরপথের অগোচর রহিয়াছে, তাহার পুনরুদ্দীপনে যাঁহারা যত্নশীল হইতেছেন, আমরা সাধুবাদ সহযোগে অগণ্য ধন্যধ্বনি-সম্বলিত তাঁহারদিগকে নমস্কার করিতেছি,......।—'সংবাদ প্রভাকর', ২৫ নবেম্বর ১৮৫৭, বুধবার।

৩রা ডিসেম্বর তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই অভিনয়ের এক সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহা পাঠে জানা যায়, কালীপ্রসন্ন স্বয়ং পুরূরবার ভূমিকা কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন।

১৮৫৮ সনে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' প্রকাশিত হয়। এখানি তাঁহার নিজস্ব রচনা—কোন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ নহে। এই বৎসরের ৫ই জুন তারিখে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে নাটকখানির মহলা দেওয়া হইয়াছিল, 'সংবাদ প্রভাকরে'র নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে একথা জানা যাইবে :—

> আগামি শনিবার ৭ ঘন্টার সময় কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গভূমিতে শ্রীযুত বাবু

কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত সাবিত্রী সত্যবান নাটকের আভিনায়িক পাঠ হইবেক এরূপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে ইংরাজী সেক্‌সপিয়র প্রভৃতি নাটক যেরূপ পঠিত হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপে পঠিত হইবেক অধিকন্তু ইহাতে বিস্তর গীত সংযোজিত হইবায় তাহা যন্ত্রের সহিত মিলাইয়া গান করা যাইবেক।—'সংবাদ প্রভাকর,' ৪ জুন ১৮৫৮, শুক্রবার।

শুধু নাট্যকলা নহে, সঙ্গীতের উন্নতিকল্পেও কালীপ্রসন্নের বিশেষ চেষ্টা ছিল। হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর "৺কালিপ্রসন্ন সিংহ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

একজন বিশিষ্ট গায়কের মুখে শুনিয়াছি যে বিখ্যাত মহাভারতের অনুবাদক ৺কালিপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় স্বাভাবিক অলাবুর তুম্বের অনুকরণে কাগজের তুম্ব প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকাস্থ বৈঠকখানার মজলিসে আনা হইয়াছিল, তৎসাহায্যে গাওনাও হইয়াছিল। কাগজের তুম্ব অনেকটা শুষ্ক অলাবু তুম্বের কাছাকাছি যায়; কিন্তু কাষ্ঠের করিলে সেরূপ হয় না।

৺কালিসিংহ মহাশয়ের তাম্বুরু নামক কলাবতী বীণার এরূপ কাগজের তুম্বী নির্ম্মাণের চেষ্টার জন্য সমস্ত সঙ্গীত সমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। ('পুণ্য'—পৌষ, মাঘ ১৩০৫, পৃ. ১৯০)

সাময়িক পত্রাদি পরিচালন

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'

বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' মাসে মাসে প্রকাশিত হইত, প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক আনা কিন্তু সভার সভ্যেরা বিনামূল্যে এক খণ্ড করিয়া পাইতেন। ইহাতে কালীপ্রসন্নের রচনাবলী—বিশেষতঃ যে-সকল প্রবন্ধ তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে পাঠ করিতেন—প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যা সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে।* পত্রিকার মলাটের উপর মুদ্রিত আছে :—

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা।/ মাসিক প্রকাশ্য।/ শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ দ্বারা বিরচিত।/ বাঙ্গাল হরপিরিয়ার যন্ত্রে মুদ্রিত।/

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২০ এপ্রিল ১৮৫৫ তারিখে। এই সংখ্যায় "বিজ্ঞাপনে" কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছেন :—

যদিও আমার তাদৃশ বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি হয় নাই, তথাপি বিদ্যাবন্ত ব্যক্তিব্যূহের উৎসাহে এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রতি সংখ্যায় ১০ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখা থাকিত। প্রথম দুই সংখ্যায়—সভ্যতার বিষয়, চাঞ্চল্য; বাল্য-বিবাহ, কৌলীন্য, ও বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা, এই কয়টি প্রবন্ধ আছে। কালীপ্রসন্নের বাল্য-রচনার নিদর্শন-স্বরূপ শেষোক্ত প্রবন্ধটি হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

...মুসলমান রাজারা রাজনীতি অনভিজ্ঞ ছিলেন, প্রজাদিগকে কিরূপ পালন করিতে হয় তাহা না জানাতে পালন স্থলে পীড়ন করিতেন, এবং এই দোষেই তাঁহাদিগের রাজ্য নষ্ট হয়।

* এই দুই সংখ্যার বিস্তৃত পরিচয় ১৩৪৩ সালের তৃতীয় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (পৃ. ১২৬-৩৪) প্রকাশ করিয়াছি।

> হিন্দু প্রজারা আর সহ্য করিতে না পারিয়া আপনাদিগের পরিত্রাণ নিমিত্ত ইংরাজদিগকে আহ্বান করিয়া বাঙ্গালারাজ্য অধিকার করিবার সদুপায় করিয়া দিলেন কিন্তু ব্রিটীশ্ গবরণ্মেণ্ট্ও বিজাতীয় পক্ষপাতশূন্য নহেন। মুসলমানদিগের অধীনে পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে পাওয়া যাইত না বলিয়া কেহ পরিশ্রম করিত না। কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা হয় তাহাও ভাল ছিল। এক্ষণে অবাধে বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে সকলের মন উজ্জ্বল হইতেছে কিন্তু কি মনস্তাপ! যে ইংরাজদিগের সমকৃতবিদ্য হইলেও তাহারদিগের ন্যায় উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক জন ইংরাজ যে কর্ম্ম করে যদি সেই কর্ম্ম এক জন্ বাঙ্গালি নির্ব্বাহ করেন তাহা হইলেও তাহার বেতন সেই ইংরাজের ন্যায় হইবে না, সমান বেতন পাওয়া দূরে থাকুক অপেক্ষাকৃত পারগ হইলেও সে পদ তাঁহার পাইবার বিষয় কি, ইহাকে কি বিজাতীয় পক্ষপাত বল না। এক্ষণে একবার আকবর বাদসাকে স্মরণ করি, তাঁহার সময়ে যোগ্যব্যক্তি হইলেই রাজ্যের গুরুতর কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে পারিত হিন্দু কি মুসলমান তাহার বিচার ছিল না। তাঁহার নিকট বিদ্যাই পূজ্য হইত, যেমন একচন্দ্র গগনমণ্ডলে উদয় হইয়া পৃথিবীর সকল অন্ধকার হরে, সেইরূপ তিনি উদয় হইয়া পূর্ব্বমত মুসলমানদিগের রাজধর্ম্ম অনভিজ্ঞতা রূপ যে অন্ধকার ছিল, তাহা হরিয়াছিলেন দেখ ব্যবস্থাপক কৌনসলে এক্ষণে প্রজাদিগের কোন হাত না থাকাতে কত অমঙ্গলের সম্ভাবনা কোন আইন প্রচার কালে প্রজাদিগের মত গ্রহণ হয় না ইহাতে তাহারা কোন নিয়ম অকল্যাণকর জ্ঞান করিলেও স্তব্ধ থাকে পরন্তু মুসলমানদিগের প্রতি কোন দোষারোপ করা যাইতে পারে না তাহারা যে কালে রাজা ছিল সে কালে অসভ্যতাই সবল ছিল কিন্তু এইক্ষণে অসভ্যতা দূর হইয়া সভ্যতার সোপান বর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদিগের বৃটীশ গবরণমেণ্ট সভ্য বলিয়া লোকবিখ্যাত আছেন অতএব বিজাতীয় পক্ষপাত থাকিতে ঐ বিষয়ে গবরমেণ্ট সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে অবশ্যই লজ্জা পাইবেন।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' সম্ভবতঃ এক বৎসরের অধিক কাল প্রকাশিত হয় নাই।

'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা'

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র পর ১৮৫৬ সনের জুলাই (?) মাসে কালীপ্রসন্ন 'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' নামে আর একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' পরবর্ত্তী ৬ই আগষ্ট তারিখে লেখেন :—

> 'সর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশিকা' অর্থাৎ প্রাণি বিদ্যা, ভূতত্ত্ব বিদ্যা, ভূগোল বিদ্যা ও শিল্প সাহিত্যাদি দ্যোতক মাসিক পত্রিকা। ইতাভিধেয় এক খানি নূতন পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়া তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, পত্রিকা প্রকাশক বা প্রকাশকগণ যে যে বিষয় লিখিয়াছেন তাহার প্রায় সমুদয়াংশকেই উত্তম বলিতে হইবেক, যেহেতু তাহাতে সুসাধু সরল বঙ্গ ভাষায় অতি পরিষ্কাররূপে অভিপ্রায় সকল ব্যক্ত হওয়াতে ঐ পত্রিকা সর্ব্ব সাধারণের পাঠোপযোগী হইয়াছে, বিশেষতঃ 'কুতর্ক দমন' নামক প্রথম প্রস্তাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, আমারদিগের পত্রের পরিমাণ দীর্ঘ নহে একারণ আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, তাহা সাধুরঞ্জন পত্রে প্রকটিত হইবেক, অধুনা আমরা জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে এই সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা পত্রিকা অবনীমণ্ডলে চিরস্থায়িনী হইয়া সকলকে সকল প্রকার তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করিয়া তাঁহার

বিদ্যোৎসাহিনী সভা-সম্পাদক কালীপ্রসন্নই যে 'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' প্রকাশ করেন 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা'র নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

সমাচার।...বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক সর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশিকা নামক এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। (১ম খণ্ড, ৮ সংখ্যা, ১২৬৩)

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'

'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' পত্রিকার পর কালীপ্রসন্নকে আমরা আর একখানি মাসিকপত্র সম্পাদন করিতে দেখি। ইহা 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই পত্রিকার প্রথম ৬ পর্ব্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন। ৭ম পর্ব্ব সম্পাদন করেন কালীপ্রসন্ন।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহের' সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়া কালীপ্রসন্ন ৭ম পর্ব্বের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৭৮৩ শক) ভূমিকা-স্বরূপ যাহা লেখেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

১৭৭৬ [১৭৭৩ ?] শকে বঙ্গভাষানুবাদক-সমাজের আনুকূল্যে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং তদবধি ক্রমাগত ছয় বৎসর যথানিয়মে উদিত হইয়া আসিতেছে। কেবল মধ্যে কিয়ৎকাল বঙ্গভাষানুবাদক-সমাজের অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হওয়ায় তাহার অন্যথা হইয়াছিল।...বিবিধার্থ কি বিদ্যাবতী রমণীকুল কি তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতসমাজ, সর্ব্বত্রই তুল্য সম্মানে পরিগৃহীত হইয়াছে; এমন কি বর্ণ-পরিচয়বিহীন বালকগণও শুদ্ধ চিত্র দর্শনাভিলাষে বিবিধার্থের প্রকাশ-কাল প্রতীক্ষা করিয়াছে।...

বিবিধার্থ এতাবৎ কাল যাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রযত্নে পূর্ব্বোল্লিখিত বহুতর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর আন্দোলনে পাঠকবর্গের স্নেহভাজন হইয়াছে—যিনি বাঙ্গালিভাষারে বিবিধ তত্ত্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন—এক্ষণে তিনি এতৎ পত্রের সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করায় বিবিধার্থ বিলক্ষণ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। জন্মদাতা হইতে স্বতন্ত্রিত ও সহসা অপরিচিত-হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে অনেকে ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারেন; বিশেষত শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পরিবর্ত্তে তৎপদে অপর ব্যক্তির সুশৃঙ্খলে কার্য্য নির্ব্বাহ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। বিবিধার্থ যে প্রকার পত্র, মিত্র মহাশয়ই তাহার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন; অনুবাদক-সমাজ, বিবিধার্থ সহৃদয়-সমাজের স্নেহভাজন ও পাঠকমণ্ডলীর নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় নহে জানিয়াই অগত্যা আমারে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; কিন্তু বিবিধার্থ-সম্পাদন-পদ স্বীকার করিয়া আমি অসমসাহসিকতার কার্য্য করিয়াছি। সাহিত্য-সংসারে আমার নাম অশ্রুতপূর্ব্ব; সুতরাং এতাদৃশ অসদৃশ গুরু ভার মাদৃশ জন দ্বারা অব্যাঘাতে নির্ব্বাহিত হইবে এমত আশা করা যায় না; কেবল ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক গন্তব্য পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন ভরসা আছে, আমি সাবধানে সেই পথে তাঁহার অনুসরণ করিলে ক্রমে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইব। সচ্ছিদ্র মণিখণ্ডে সূত্র প্রবেশনের ন্যায় আমার পক্ষে অসুলভ হইবে না।...শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ সম্পাদক।

কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র ৭ম পর্ব্ব—১৭৮৩ শক,* বৈশাখ-অগ্রহায়ণ—সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহার পর আর 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' প্রকাশিত হয় নাই।

---

* 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র ৭ম পর্ব্বের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ভুলক্রমে "১৭৮২ শক" মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ এই তারিখ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন :—"Kali Prossunno began to edit the Magazine from Baisakh, 1782 *Saka*, corresponding to April, 1860."—*Memoirs of Kali Prossunno Singh* (1920), p. 88.

'পরিদর্শক'

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র পর কালীপ্রসন্ন এবার একখানি দৈনিক সংবাদপত্র কিছু দিন পরিচালন করিয়াছিলেন। পত্রখানির নাম 'পরিদর্শক'; ইহা ১৮৬১ সনের জুলাই (?) মাসে প্রথম প্রচারিত হয়, তখন ইহার সম্পাদক ছিলেন জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'-সম্পাদনকালে কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শকে'র সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন :—

> পরিদর্শক।—এক খানি যথাবিহিত দৈনিক পত্রের নিমিত্ত আমরা বহু দিবসাবধি ক্ষুব্ধ ছিলাম; পরিদর্শক আমাদিগের সে মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালিসমাজ পরিদর্শক হইতে যত উপকার লাভে সমর্থ হইবেন, সোমপ্রকাশের প্রকাশ পূর্ব্বে অন্যান্য বহুল সংবাদপত্র হইতে তাহা প্রত্যাশা করা যায় নাই। পরিদর্শকের এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনটন দেখা যায়। আমরা পরিদর্শক হইতে যত দূর প্রত্যাশা করি, তাহার ক্ষুদ্র কলেবর সে ভার সহনে অসমর্থ; তন্নিমিত্ত আমরা পরিদর্শকসম্পাদকদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সাধারণের উপকারার্থ কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরিদর্শকের কলেবর বৃদ্ধি করুন।

'পরিদর্শক' পত্রের অনটনের উল্লেখ করিয়াই কালীপ্রসন্ন ক্ষান্ত হন নাই; সে অনটন দূর করিবার জন্য শেষে তিনিই অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৮৬২ সনের ১৪ই নবেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৯) হইতে কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শক' পত্রের সম্পাদক হন, সঙ্গে সঙ্গে পত্রের কলেবরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 'সোমপ্রকাশ' লিখিলেন :—

> পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবর বৃদ্ধি।—এই অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনাবধি পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। এ দুটীই আমাদিগের আনন্দের হেতু হইয়াছে। পরিদর্শক দৈনিক পত্র। পাঠকগণ দৈনিক পত্র দ্বারা বহু বিষয় অবগত হইবার বাসনা করেন। কিন্তু এত দিন উহার যে রূপ ক্ষুদ্র অবয়ব ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখন উহার আকার বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় উহাতে সমাবেশিত হইবে। দ্বিতীয় আহ্লাদের বিষয় এই, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উন্নতি কল্পে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ও যত্ন আছে। তিনি লাভার্থী নহেন। পরিদর্শকের আয়ের ন্যূনতা দর্শন করিলে তিনি যে ভগ্নোৎসাহ হইবেন, সে সম্ভাবনা নাই। বৃহদাকার পত্রের নিত্য কার্য্য সমাধান স্বল্পব্যয়সাধ্য নয়, জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহার তৎসম্পাদন সামর্থ্যও আছে। আমরা প্রথমাবধি কয়েক খানি পরিদর্শক অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম। যে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, প্রায় তাহার সমুদায়গুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ('সোমপ্রকাশ', ২৪ নবেম্বর ১৮৬২)

কিন্তু কয়েক মাস যাইতে-না-যাইতেই কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শক' প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৮৬৩ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারি 'সোমপ্রকাশ' লিখিলেন :—

> আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, পরিদর্শক অকালে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। বাঙ্গলা ভাষায় এক খানিও উৎকৃষ্ট দৈনিক সম্বাদ পত্র নাই। পরিদর্শককে দেখিয়া আমাদিগের কথঞ্চিৎ এই আশা জন্মিয়াছিল যে ইহা ক্রমে সেই ক্ষোভ দূর করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু তাহাও উন্মূলিত হইল। সম্পাদক বিরক্ত হইয়া পরিদর্শক উঠাইয়া দিলেন। তিনি বিরাগের যে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গ্রাহকগণের অনাদর উহার অন্তত্তর বলিয়া উপন্যস্ত হইয়াছে।...আমরা সম্পাদকের

একটী সঙ্কোভ অনুচিত প্রতিজ্ঞা দেখিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইলাম। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বাঙ্গালি সমাজের এরূপ অবস্থা থাকিতে তিনি আর বাঙ্গালিদিগের উপকার করিবেন না। তাঁহার সদৃশ দেশহিতৈষী উদারস্বভাব ব্যক্তিরা যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তবে কাহা হইতে সমাজের অবস্থা সংশোধিত হইবে ?

কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনা

"এই ভারতবর্ষে কত কত মহাবলপরাক্রান্ত রাজাধিরাজেরা সুদূরবিস্তৃত পন্থা, সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা ও দুর্গম দুর্গ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু কালের ভীষণ দশনে সেই সকলেরই কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিবে না। কত কত সুসমৃদ্ধ জনপদ গহন বিপিনে পরিণত ও নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কেবল জ্ঞানচিহ্নস্বরূপ গ্রন্থাদি ভিন্ন অপর কীর্ত্তিমাত্রই বিনশ্বর। গ্রন্থাদি ভাষার সহিত চিরদিন বর্ত্তমান থাকে এবং নবাবির্ভূত লোকের নিকট চিরদিন নবীন বলিয়া প্রতীত হয়।"—কথাগুলি কালীপ্রসন্ন সিংহের। জ্ঞানচিহ্নস্বরূপ তিনি যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি—বিশেষ করিয়া 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' ও অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের গদ্য-অনুবাদ তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি। কালানুসারে তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দিতেছি :—

(১) **বাবু নাটক।** ১৮৫৩ (?)

১৪ ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত "বিজ্ঞাপন" হইতে এই নাটকখানির কথা জানা যায় :—

> পূর্ব্বে প্রায় দুই বৎসর গত হইল আমি একবার বাবু নাটক্ নামক গ্রন্থ রচিয়া প্রকাশ করি কিন্তু তাহা এক্ষণে এমত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে কত লোক চারি মুদ্রা স্বীকার করিয়াও পান নাই, অতএব আমি পুনরায় মুদ্রিত করিবার অভিলাষি, যদ্যপি কেহ গ্রাহক শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে তাঁহাকে গ্রাহকগণ মধ্যে গণ্য করা যাইবেক মূল্য ॥০, বিনা স্বাক্ষরকারী ৸০ মাত্র। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। সম্পাদক।

(২) **বিক্রমোর্ব্বশী নাটক।** সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭। পৃ. সংখ্যা ৮৫।

ইহার বাংলা আখ্যাপত্র এইরূপ :—

> বিক্রমোর্ব্বশী নাটক।/ মহাকবি কালীদাস বিরচিত।/ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক মূল / সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বাঙ্গলা ভাষায় / অনুবাদিত।/ কলিকাতা/ বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ। / তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে / শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ দ্বারা মুদ্রিত। / ১৭৭৯ শক। /

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি ও উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে 'বিক্রমোর্ব্বশী নাটক' আছে।

ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন :—

> প্রস্তাবিত গ্রন্থের কিয়দংশ পূর্ণচন্দ্রোদয়-পত্রে প্রকটিত হইয়াছিল ;…রচনাচাতুর্য্য-দৃষ্টে প্রতীত হইতেছে যে ইদানীন্তনের বিষয়ী গ্রন্থকারদিগের ন্যায় প্রশংসিত সিংহ মহাশয় ভট্টাচার্য্যদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই ; যেহেতু ইহাতে নস্যের গন্ধমাত্র বোধ হয় না।—'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ', আশ্বিন ১৭৭৯ শক, পৃ. ১২৭।

(৩) **সাবিত্রী সত্যবান নাটক।** ১৮৫৮। পৃ. সংখ্যা ।৵০+৯৮।

'বাবু নাটক'-এর ন্যায় এখানিও কালীপ্রসন্নের নিজস্ব রচনা। ইহার ইংরেজী ও বাংলা আখ্যাপত্র এইরূপ :—

Shabitree Shotyobhan Natuck. / A / Comedy / By / Kaliprosono Sing / *Member of the Asiatic and Agricultural and Horticultural / Societies of India, and of the British Indian Association, / and President of the Bedoyth Shahine Shobha / of Calcutta, etc. etc. etc.* / Calcutta / Printed by G. P. Roy & Co. for Bedoyth Shahine Shobha, No. 67/ Emaumbarry Lane, Cossitollah. / 1858. /

সাবিত্রী সত্যবান নাটক। / শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ / প্রণীত। / কলিকাতা। / জি, পি, রায় এণ্ড কোং দ্বারা বিদ্যোৎসাহিনী / সভার কারণ মুদ্রিত, / কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৬৭। / শকাব্দা ১৭৮০ / বিনা মুল্যেন বিতরিতবাং। /

গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনটিও এখানে উদ্ধৃত করা হইল :—

বিজ্ঞাপন।

সাবিত্রী সত্যবান নাটক, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। মহাভারতীয় বন পর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতোপাখ্যানে সাবিত্রী সত্যবান বিষয়ক আখ্যায়িকা বিশেষ রূপে লিখিত থাকায় এস্থলে সে বিষয় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতোপাখ্যানের সাবিত্রী চরিত হইতে কেবল মর্ম্ম মাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে, নতুবা কোন কোন স্থান অসংলগ্নবোধে পরিত্যক্ত স্থান বিশেষে নূতন ঘটনায় অলঙ্কৃত করা গিয়াছে, যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহারা অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, যে মহাভারতীয় সাবিত্রী সত্যবানের উপাখ্যান অতীব সুন্দর, ইহার রমণীয়ভাব ও কমনীয় প্রতিভার দ্বারা পাঠকগণ সময়ে সুন্দর রসে সম্মোহিত হয়েন তাহার সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ বঙ্গীয় স্ত্রীলোকের সাবিত্রী সত্যবান উপাখ্যান বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক, যদ্দারা পাতিব্রত্য ধর্ম্মের উদাহরণ স্বরূপে ও ধর্ম্মজ্ঞান শিক্ষায় তদনুসরণে সমর্থা হইবে। এক্ষণে সাবিত্রী সত্যবান উপাখ্যান নাটকাকারে পরিণত করিয়া সহৃদয় পাঠকগণ সমীপে সমর্পণ করিলাম, বিদ্যোৎসাহী মহোদয় গণের পাঠ যোগ্য এবং নগরীয় অন্যান্য রঙ্গভূমির অভিনয়ার্হ হইলেই পরিশ্রম ও ধন ব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব।

কলিকাতা
বিদ্যোৎসাহিনী সভা
১৭৮০ শকাব্দা } শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে এক খণ্ড 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' আছে।

(৪) **মালতী মাধব নাটক।** ১৮৫৯। পৃ. সংখ্যা ।৵০+৯১।

ইহার ইংরেজী আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

Malatee Mudhaba / A / Comedy / of / Bhubabhootee. / *Translated into Bengalee from the original Sanscrit,* / By /Kali Prusno Sing. /

বাংলা আখ্যাপত্র এইরূপ :—

মালতী মাধব নাটক। / মহাকবি ভবভূতি বিরচিত। / শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে / বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত। / কলিকাতা। / জি, পি, রায় এণ্ড কোং দ্বারা বিদ্যোৎসাহিনী / সভার কারণ মুদ্রিত, / শকাব্দা ১৭৮০ / বিনা মূল্যেন বিতরিতব্যং। /

গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপন" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

মালতীমাধব নাটক মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল, বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের অবিকল লালিত্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা নিরর্থক, কারণ অবিকল অনুবাদিত গ্রন্থ সহজেই পাঠ করিতে ঘৃণা বোধ হয়, বিশেষতঃ প্রত্যেক পদের বাঙ্গালা অর্থ ও শব্দানুকরণে যথার্থ ভাব সংরক্ষণ করা কাহারও সাধ্য নহে, ইহার প্রথম উদ্যম স্বরূপে মহাকবি কালিদাস প্রণীত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকেই সংপূর্ণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্নিমিত্ত এবার তাহা হইতে সতন্ত্রিত হইতে হইয়াছে।...

মদ্রচিত মৎপ্রণীত ও মদনুবাদিত অন্য অন্য নাটক হইতে মালতীমাধবের ভাষারও প্রভেদ হইয়াছে, কারণ অভিনয়ার্হ নাটক সকল ইদানিন্তন যে ভাষায় লিখিত হইতেছে আমিও সেইরূপ অবলম্বন করিয়া ঈপ্সিত বিষয় সুসিদ্ধ করণ মানসে সচেষ্ট ছিলাম, এক্ষণে সহৃদয় রঙ্গপ্রিয় মহোদয়গণ মালতীমাধব নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ অভিনয়ার্হ ও পাঠ্য বিবেচনা করিলেই পরিশ্রম ও ধন ব্যয় সফল বিবেচনা করিব।

কলিকাতা।
বিদ্যোৎসাহিনী সভা।
শকাব্দা ১৭৮০। } শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

(৫) **হিন্দু-পেট্রিয়ট সম্পাদক মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন।** ১৮৬১। পৃ. সংখ্যা ১৬।

১৪ জুন ১৮৬১ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে কালীপ্রসন্ন এই পুস্তিকাখানি রচনা করিয়া সাধারণের মধ্যে বিতরিত করেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র তৎসম্পাদিত *Indian Field* পত্রে এই পুস্তিকাখানির সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

We have received a funeral euloge by Baboo Kalí Prossunno Singh on the late editor of the *Hindoo Patriot* which has been published at the Pooran Sangraha Press. The language used is chaste and classical but perhaps too refined and elevated for common readers. The writer depicts the character and delineates the career of the late Harish Chunder Mookerjee. He calls on his fellow-countrymen to open their purse-strings to commemorate the distinguished services of the deceased and we trust the call will be cordially responded to. *

---

* শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ-রচিত *Memoirs of Kali Prossunno Singh* (1920) পুস্তকের ৫০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে ও তদন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে এই পুস্তিকার দুই খণ্ড আছে।

(৬) হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রথমে খণ্ডশঃ পুস্তিকাকারে ১৮৬১ (?) সনে প্রকাশিত হয়। এরূপ এক খণ্ড পুস্তিকা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে আছে। পুস্তিকাখানির (পৃ. সংখ্যা ১৬) আখ্যাপত্র এইরূপ :—

> হুতোম প্যাঁচার / কলিকাতার নক্‌শা। / চড়ক। / প্রথম খণ্ড। / "উৎপৎস্যতেস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা। / কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥" / ভবভূতি। / আশ্‌মান। / রামপ্রেসে মুদ্রিত। / নং ৮৪ হুঁকো রাম বসুর ইষ্ট্রীট। / মূল্য পয়শায় দুখানা। /

ইহার উপহার-পৃষ্ঠায় "১৭৮৩ শক" (= ১৮৬১ ?) পাইতেছি। পুস্তিকার ভূমিকা-স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত অংশটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> বিজ্ঞাপন।—হুতোম প্যাঁচা এখন মধ্যে মধ্যে ঐ রূপ নক্‌শা প্রস্তুত করবেন। এতে কি উপকার দর্শিবে, তা আপনারা এখন টের পাবেন না; কিন্তু কিছু দিন পরে বুঝ্‌তে পারবেন। হুতোমের কি অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু হয় ত সে সময় হতভাগা হুতোম্‌কে দিনের ব্যালা দেখ্‌তে পেয়ে কাক ও ফরমাসে হারামজাদা ছেলেরা ঠোঁট ও বাঁস দিয়ে, খোঁচাখুঁচি করে মেরে ফেলবে স্থতরাং কি ধিক্কার কি ধন্যবাদ হুতোম কিছুই শুনতে পাবেন না।

এই পুস্তিকায় দুইখানি লাইন-এনগ্রেভিং আছে। একখানি—"হুতুম প্যাঁচা আশ্‌মানে বসে নক্‌সা উড়াচ্চেন"; অপরখানি—"ঠণ ঠণের হঠাৎ অবতার"।

১৮৬২ সনের শেষার্দ্ধে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। ইহার এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে। পুস্তকখানির ইংরেজী ও বাংলা আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

> Sketches by Hootum / illustrative of / Every Day Life and Every Day / People. / Vol. 1 / "By heaven, and not a master tought." / "Mislike me not for my complexion." / Shakespeare. / Calcutta. / Bose and Company, Printers & Publishers. / 1862. /

> হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। / (প্রবন্ধ কল্পনা।) / প্রথম ভাগ। / স্বর্গাদিদ মনুপ্রাপ্তং নাচার্য্য মুখ কন্দরাৎ প্রকাশায় চরিত্রাণাং মহত্বস্যাত্মন স্তথা। / চিত্তবৃত্তেশ্চ দত্তাস্মৈ প্রতিভা পরিমর্জ্জিতা। / কলিকাতা। / রাম প্রেস্ / বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রচারিত। / দরজী পাড়া। / ১৭৮৪। /
> [পৃ. সংখ্যা ১৭৬]

পুস্তকের আরম্ভেই একটি অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা। কবিতাটি এই :—

> হে শারদে! কোন্ দোষে তুমি দাসী ও চরণতলে ?
> কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান ?
> এ কুৎসিতে! কোন্ লাজে সপত্নী সমাজে পাঠাইব,
> হেরিলে মা এ কুরূপে—দুষিবে জগৎ—হাঁসিবে
> সতিনী পোড়া; অপমানে উভরায়ে কাঁদিবে

শেষের সংস্করণগুলিতে এই কবিতাটির পরিবর্ত্তে একটি টপ্পার দুই পংক্তি দেওয়া আছে।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র দ্বিতীয় ভাগ অল্প দিন পরেই প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম দুই ভাগ একত্রে (পৃ. ১৮০+৫৪) প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ সনে এবং পুনর্মুদ্রিত হয় (পৃ. ১৩৮+৫৪) ১৮৬৮ সনে। এই দুই সংস্করণের পুস্তক ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।

(৬) কল্‌কেতার হাট্‌হদ্দ। ১৮৬৪ (?)

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার পুস্তকাগার হইতে সম্প্রতি আমাকে এক খণ্ড 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা', ১ম-ভাগ (১ম সংস্করণ) দিয়াছেন, এবং ইহার সহিত একত্রে বাঁধা ৬৮ পৃষ্ঠার এক খণ্ড পুস্তকের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

পুস্তকখানির আখ্যাপত্র নাই। ইহা চারিটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ :—আলীপুরের কৃষিপ্রদর্শন, (২) সরস্বতী পূজা, (৩) পল্লীগ্রাম তীর্থ, (৪) উপসংহার। পুস্তকের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে ইহার প্রকাশকাল যে ১৮৬৪ সন তাহা জানিতে পারা যায় :—

> আজ ১২৭০ সালের ৬ই মাঘ সোমবার......(১ম পৃষ্ঠা)
>
> হুতোম [১৮৬২ সনে প্রকাশিত] আজো দুবছর হয় নাই বাহির হয়েছে,...(পৃ. ২৪)

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ইহা কালীপ্রসন্নেরই রচনা বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে। ৪৯ পৃষ্ঠার নিম্নোদ্ধৃত পাদটীকাটি আমার অনুমান সমর্থন করে :—

> (৫) সহরে যাত্রা কবির সময় যে রকম সমারোহ হয়ে থাকে, তদ্বিষয় প্রথম ভাগ হুতোম প্যাঁচার নক্‌সার বারোয়ারি পূজা গর্ভাঙ্কে দেখ।

এই পুস্তকখানিই বোধ হয় 'কল্‌কেতার হাট্‌হদ্দ'। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা', ১ম ভাগের (১ম সংস্করণ) শেষে 'কল্‌কেতার হাট্‌হদ্দ' পুস্তকের এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছিল :—

> যদি হুতোমের নক্‌শার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সহৃদয় সমাজে গ্রাহ্য হয় তবে হুতোম প্যাঁচা লিখিত
>
> কল্‌কেতার হাট্‌হদ্দ
> অর্থাৎ
> Mysteries of Calcutta
>
> পুস্তকের ছাপা আরম্ভ করা যাবে।

আমার মনে হয় 'কল্‌কেতার হাট্‌হদ্দ' প্রকাশিত হইয়াছিল। আলোচ্য পুস্তকের ৮ম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পাদটীকায় "হাট্‌হদ্দ" কথাটির প্রয়োগও পাইতেছি :—

> (২) এই পরিচ্ছেদে ও পরিচ্ছেদান্তরে যে সকল ব্রাহ্মের কুক্রিয়ার হাটহদ্দ আছে...

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের আর একটি খণ্ড আছে ; তাহাও আখ্যা-পত্রবিহীন। পুস্তক-তালিকায় ইহা 'আলীপুরের কৃষিপ্রদর্শন' নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

(৭) পুরাণসংগ্রহ। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত। ১-১৭শ খণ্ড। ১৮৫৮-৬৬।

কয়েক জন পণ্ডিতের সাহায্যে কালীপ্রসন্ন মূল সংস্কৃত হইতে মহাভারত গদ্যে অনুবাদ করেন। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে পণ্ডিত-সংগ্রহের জন্য ২ জুলাই ১৮৫৮ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' তিনি নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন :—

> বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিজ্ঞাপন।—বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে কোনো সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ কারণ ১০ জন পণ্ডিতের প্রয়োজন আছে, বেতন ১০, ১২, ১৬ টাকা, বেলা ১০টা হইতে তিনটা পর্যান্ত সভাগারে উপস্থিত থাকিতে হইবেক, এবং দেবনাগর অক্ষরও জানা আবশ্যক হইতেছে যাহারা উক্ত পদ গ্রহণেচ্ছুক হন আমার নিকট আসিলেই সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।—শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

কালীপ্রসন্ন এই অনুবাদ-গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছিলেন 'পুরাণসংগ্রহ'। নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে জানা যাইবে ১৮৫৮ সনের জুলাই মাসের মাঝামাঝি মহাভারতের অনুবাদ-কার্য্য আরম্ভ হয় এবং রামায়ণ-অনুবাদের সঙ্কল্পও কালীপ্রসন্নের ছিল :—

> বিজ্ঞাপন।—মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয়েরা ১লা শ্রাবণ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় উপস্থিত হইবেন, ঐ দিনে রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদারম্ভ হইবে। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।
> —'সংবাদ প্রভাকর,' ১৩ জুলাই ১৮৫৮।

মহাভারতের অনুবাদ-কার্য্য শেষ করিয়া সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশ করিতে দীর্ঘ আট বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার ১৭শ বা শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৮৮ শকে (১৮৬৬)। "অষ্টাদশ পর্ব্ব অনুবাদের উপসংহার" রূপে কালীপ্রসন্ন ১৭শ খণ্ডের শেষে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ১৭৮০ শকে সৎকীর্ত্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া ৭ জন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই আট বর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অদ্য সেই চিরসঙ্কল্পিত কঠোর ব্রতের উদ্‌যাপনস্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্ব্বের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম।...অনুবাদসময়ে মূল মহাভারতের কোন স্থলই পরিত্যাগ করি নাই ও উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক কোন অংশই সন্নিবেশিত হয় নাই; অথচ বাঙ্গালাভাষার প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন পাইয়াছি এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে সকল দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, সেগুলির নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম।...
>
> বহু দিবস সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক পরিচালনার বিলক্ষণ অসদ্ভাব হওয়াতে আপাতত মূল মহাভারতের হস্তলিখিত পুস্তকসমুদায়ের পরস্পর এপ্রকার বৈলক্ষণ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, ২।৪ খানি গ্রন্থ একত্র করিলে পরস্পরের শ্লোক, অধ্যায় ও প্রস্তাবঘটিত অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তন্নিবন্ধন অনুবাদকালে সবিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমি বহুযত্নে আসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত এবং শোভাবাজারের রাজবাটীর, মৃত বাবু আশুতোষ দেবের ও শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকালয়স্থিত, তথা আমার প্রপিতামহ দেওয়ান ৺ শান্তিরাম সিংহবাহাদুরের কাশী হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তকসমুদায় একত্রিত করিয়া বহুস্থলের বিরুদ্ধভাবের ও ব্যাসকূটের সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক অনুবাদ করিয়াছি। এই বিষয়ে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় আমারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।...
>
> আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়দ্ভাগ পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সরলহৃদয়ে মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না। তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন। ফলত বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠাবস্থাবধি আমি যে কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না।...সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনুবাদিত ভাগ হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল সংগ্রহ করিয়া অমিত্রাক্ষর পদ্যে ও নাটকাকারে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমারে বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছেন।

যে সকল মহাত্মারা সময়ে সময়ে আমার সদস্যপদে ব্রতী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের ব্যাকরণের অধ্যাপক ও সংস্কৃত রঘুবংশের বাঙ্গলা অনুবাদক ৺ চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, ৺ কালীপ্রসন্ন তর্করত্ন, ৺ ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরমাত্মীয় ৺ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৺ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও ৺ অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি ১০ জন অনুবাদশেষের পূর্ব্বেই অসময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সকল মহাত্মাদিগের নিমিত্ত আমারে চিরজীবন যার পর নাই দুঃখিত থাকিতে হইবে।

এক্ষণকার বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রামসেবক বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সদস্যদিগকে মনের সহিত সকৃতজ্ঞচিত্তে বার বার নমস্কার করিতেছি। এই সমস্ত সুবিচক্ষণ কর্ণধারদিগের কৃপাবলেই আমি অনায়াসে মহাভারতস্বরূপ সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম।...

মহাভারতের প্রত্যেক খণ্ড তিন সহস্র মুদ্রিত হয়। সমগ্র গ্রন্থ বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে প্রার্থীদিগকে দান করা হইয়াছিল।

(৮) বঙ্গেশবিজয়।

কালীপ্রসন্ন এই নামে একখানি গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। ১৮৬৮ সনে ইহার দুই ফর্ম্মা ছাপাও হইয়াছিল, * কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। / মূল, অন্বয় ও মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত / বঙ্গানুবাদ আচার্য্যগণের টীকানুযায়ী / পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। / জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ। / পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধা ভক্তিংসুখীভবেৎ ॥ / ৩৮ নং নন্দলাল দের ষ্ট্রীট, বরাহনগর, "শ্রীরামকৃষ্ণ- / লাইব্রেরী" হইতে শ্রীসত্যচরণ মিত্র কর্ত্তৃক / প্রকাশিত। / কলিকাতা। / শক ১৮৩৩।১৩১৮।১৯১১। / মূল্য উত্তম বাঁধাই ৸০ বার আনা / [পৃ. সংখ্যা ৫১২]

---

* প্রতাপচন্দ্র ঘোষ তাঁহার বাল্যবন্ধু কালীপ্রসন্নের নামে 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন। ইহার ভূমিকায় (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ সনে লিখিত) প্রকাশ :—

"...গ্রন্থের নাম 'বঙ্গেশবিজয়' দিয়া মুদ্রাঙ্কনার্থে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমার বন্ধু দ্বারা পাঠাইলে শুনিলাম যে, উক্তাভিধেয় শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের রচিত একখানি গ্রন্থের দুই ফরমা ভট্টাচার্য্য যন্ত্রে ছাপা হইয়াছে, একারণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের, তথা শ্রীযুক্ত সিংহ মহোদয়ের ও আমার মধ্যস্থ আত্মীয়ের অনুরোধে 'বঙ্গেশবিজয়' নামের পরিবর্ত্তে এই গ্রন্থের

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার এক খণ্ড শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্তের নিকট দেখিয়াছি। পুস্তকে "প্রকাশকের নিবেদনে" প্রকাশ :—

গদ্য মহাভারতের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অনুবাদক পুণ্য শ্লোক ধনকুবের ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ এই সংস্করণ যন্ত্রস্থ করিয়া অকালে স্বর্গারোহণ করেন, সুতরাং এতাবৎকাল ইহা আদৌ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। আমরা তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে জীর্ণ শীর্ণ কীটদষ্ট হস্তলিখিত পুঁথির প্রকাশসত্বের ভার গ্রহণ করিয়া মহাত্মার শেষ কীর্ত্তি স্বরূপ এই "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" সাধারণের সুবিধার জন্য সুবৃহৎ পকেট এডিসনে প্রকাশ করিলাম।

কালীপ্রসন্ন-লিখিত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র "ভূমিকা" নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

মহাভারতীয় ভীষ্ম পর্ব্ব জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণ, ভূমি, ভগবদ্গীতা ও ভীষ্মবধ এই চারি পর্ব্বে বিভক্ত। এই পর্ব্ব পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বতন হিন্দুরা সকল কার্য্যই ধর্ম্মের অনুমোদিত করিয়া সম্পন্ন করিতেন। যুদ্ধ যে এমন নৃশংস ব্যবহার, তাহাও ধর্ম্ম বুদ্ধিতেই সম্পাদিত হইত। উভয় পক্ষ, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, যে সকল সাংগ্রামিক নিয়ম সংস্থাপিত করেন, তাহাতেই উহা সপ্রমাণ হইতেছে। উভয় পক্ষই মধ্যে মধ্যে আপনাদের সংস্থাপিত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতেন বটে, কিন্তু যিনি ঐ রূপ করিতেন, তিনি জনসমাজে অন্যায়কারী বলিয়া সাতিশয় নিন্দনীয় হইতেন। এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যে ভূরি ভূরি লোক ক্ষয় ও অনিষ্ট ঘটনা হইবে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে উভয় পক্ষই বিলক্ষণ রূপে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুর্য্যোধন স্বার্থপরতায় ও যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলে অধর্ম্ম হয়, এই রূপ সংস্কারেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ব্যাসদেবের সময়ে কিরূপ ভূগোল বিদ্যার আলোচনা হইত, জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণ ও ভূমি পর্ব্বে তাহাও এক প্রকার অবগত হওয়া যায়।

ভগবদ্গীতা পাঠ করিলে পূর্ব্ব পুরুষদিগের বিদ্যা বুদ্ধি স্মরণ করিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতে হয়। কত শতাব্দী অতীত হইল ভগবদ্গীতা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু উহার অধিকাংশ মতের সহিত অধুনাতন বিখ্যাত আন্বিক্ষিকী ও ত্রয়ী বেত্তাদিগের মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে ভ্রান্তিসংকুল মতও নিবেশিত আছে যথার্থ বটে, কিন্তু উহার মধ্যে যে সকল অমূল্য সত্য অক্ষত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই ভারতবর্ষীয় আন্বিক্ষিকী ও ত্রয়ী বেত্তাদিগের গৌরবের একমাত্র দৃষ্টান্ত হইতে পারে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে যুদ্ধপরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তই ভগবদ্গীতা অবতারিত হইয়াছে, সুতরাং যুদ্ধোৎসাহ উদ্দীপিত করা উহার যত উদ্দেশ্য, মনোবিদ্যা প্রভৃতি প্রচার করা তত উদ্দেশ্য ছিল না। ভগবদ্গীতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সঞ্জয় একেবারে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করাইতেছেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কোন স্থলেই যুদ্ধের কথা উল্লিখিত হয় নাই। ব্যাসদেব কেবল মহাভারতের ষট্‌সম্পাদিতা সম্পাদন করিবার নিমিত্তই এই রূপ কৌশল করিয়াছেন।

পূর্ব্বতন হিন্দুরা কিরূপ উৎসাহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, অরাতিগণকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত দুর্ব্বিষহ কষ্টকে কেমন আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিতেন, ধর্ম্ম রক্ষার অনুরোধে প্রাণত্যাগ কেমন সামান্য বোধ করিতেন, কি প্রকারে সেনাপতি নিয়োগ, সেনা বিভাগ, যুদ্ধযাত্রা, ব্যূহ নির্ম্মাণ, যুদ্ধ আরম্ভ, যুদ্ধ অবহার ও নিরুদ্বেগে বিশ্রাম করিতেন এবং যুদ্ধে মৃত ও আহত ব্যক্তিদিগের প্রতি কিরূপ আচার করিতেন, ভীষ্ম বধ পর্ব্ব পাঠ করিলে বিলক্ষণ জ্ঞাত হওয়া যায়। ফলত যিনি তন্ন তন্ন করিয়া ইতিহাস পাঠ করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি ভীষ্ম পর্ব্বে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ

সেব্য কঠিন ব্রতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তাহা যে নির্ব্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব, আমার এ প্রকার ভরসা নাই। ভগবদ্গীতা অনুবাদ করিয়া যে লোকের নিকট যশস্বী হইব, এমত প্রত্যাশা করিয়াও এ বিষয়ে হস্তার্পণ করি নাই। যদি জগদীশ্বর-প্রসাদে পৃথিবী-মধ্যে কুত্রাপি বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকে, আর কোন কালে এই অনুবাদিত পুস্তক কোন ব্যক্তির হস্তে পতিত হওয়ায় সে ইহার মর্ম্মানুধাবন করত হিন্দু কুলের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মহিমা অবগত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

এই সকল পুস্তক ছাড়া কালীপ্রসন্ন বহু প্রবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন। তাহার অনেকগুলি 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম দুই সংখ্যা ছাড়া এই পত্রিকার অন্য সংখ্যাগুলি এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

ডেবিড হেয়ার সাম্বৎসরিক সভাতেও কালীপ্রসন্ন কয়েক বার প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।* ডেবিড হেয়ারের মৃত্যুর পর প্রতি বৎসর জুন মাসে এই সভার অধিবেশন হইত; সভায় বহু মান্যগণ্য লোকের সমাগম হইত, প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতাদিও হইত। কালীপ্রসন্ন নিজ বাটীতে কয়েক বার এই সাম্বৎসরিক সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। এই স্মৃতিসভায় তিনি যে সকল বাংলা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

১ জুন	১৮৫৬,	১৪শ সাম্বৎসরিক সভা		প্রবন্ধ।
১ জুন	১৮৫৭,	১৫শ	"	বঙ্গভাষার অনুশীলন সম্বন্ধে প্রবন্ধ।
১ জুন	১৮৫৯,	১৭শ	"	বাংলা নাটক
২ জুন	১৮৬১,	১৯শ	"	প্রবন্ধ।
১ জুন	১৮৬৩,	২১শ	"	কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ।†

কালীপ্রসন্নের এই সকল রচনার কোনটিই এ-যাবৎ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।

কালীপ্রসন্ন সিংহের বদান্যতা

কালীপ্রসন্নের বদান্যতা ছিল অনন্যসাধারণ এবং বহুমুখী; দেশের বহুবিধ হিতকর কার্য্যে ব্যক্তিগত ভাবে এবং সামাজিক ভাবে অকাতরে দান করিতে তাঁহার মত সে-যুগে আর কাহাকেও দেখি না। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে সত্যই লিখিয়াছেন, "তিনি যেমন তাঁহার Purse-এর সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন, তেমন আর কেহই জানিত না।" তাঁহার বদান্যতার বিস্তৃত পরিচয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভবপর নহে। আমরা এখানে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

---

* Peary Chand Mittra : *A Biographical Sketch of David Hare,* (1877), pp. 94, 99, 101-02 দ্রষ্টব্য।

† ১ জুন ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

"বিবিধ সংবাদ। ১৬ জ্যেষ্ঠ।—১লা জুন সোমবার শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে মৃত মহাত্মা ডেবিড হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সাম্বৎসরিক সমাজে বঙ্গদেশীয় কৃষিকার্য্যের বর্ত্তমান অবস্থার সমালোচন, কৃষিকার্য্যের উপযোগিতা, কৃষিসমাজ ও কৃষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা এবং কৃষিজাত দ্রব্য ও কৃষিসাধন অস্ত্র ও যন্ত্রাদি প্রদর্শনের মহোপকারিতা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

মাতৃভাষা-চর্চায় ছাত্রদের উৎসাহ দান

ছাত্রদিগকে বাংলা-রচনায় উৎসাহিত করিবার জন্য কালীপ্রসন্ন সময়ে সময়ে পদক ও পুরস্কার বিতরণ করিতেন। ১ জুন ১৮৫৮ তারিখের 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' পত্রে প্রকাশ—

> ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছাত্রদের শিক্ষার পরীক্ষায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ইংরাজি চারি শ্রেণীতে বাঙ্গালা বিষয়ে প্রশ্ন প্রদান ও উত্তম লেখক চারি বালককে পদক প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালা শিক্ষার পরীক্ষা করিয়া, ছাত্রগণকে পারিতোষিক দিয়া এবং এক বক্তৃতা দ্বারা তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি সিংহ মহাশয়ের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।*

সাহিত্যের উৎসাহদাতা

মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে কালীপ্রসন্ন অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। লেখক-বর্গের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ মাঝে মাঝে তিনি পুরস্কার ঘোষণা করিতেন—বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিবরণে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

'সংবাদ প্রভাকর' যন্ত্রালয়ে চৈত্র মাসের শেষ দিবসে একটি সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইত। সম্মিলনে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সমাগম হইত, প্রবন্ধাদি পঠিত হইত, ভোজেরও ব্যবস্থা ছিল। এই বার্ষিক সম্মিলনে বহু লেখককে পুরস্কার বিতরণ করা হইত। এই সকল পুরস্কার দিতেন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা; তাঁহাদের মধ্যে কালীপ্রসন্নের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। এরূপ পুরস্কার প্রদানের একটি বিবরণ ১ বৈশাখ ১২৬৮ সালের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—

> বঙ্গভাষা লেখক ও অন্য ভাষা হইতে বাঙ্গালা অনুবাদকদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ প্রভাকর পত্রের বর্ষবৃদ্ধির আনন্দজনক এই বার্ষিকী সভায় পারিতোষিক প্রদানের যে নিয়ম এতৎপত্রের জন্মদাতা কবিবর গুণাকর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কতিপয় দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহি ব্যক্তি-দিগের বিশেষানুরাগ ও সাহায্য দ্বারা নিরূপণ করিয়াছিলেন...বহুবাজার নিবাসি বহুগুণসম্পন্ন বিদ্যানুরাগী সরলস্বভাব বাবু ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কয়েক বৎসর ঐ বিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন,...। উমেশ বাবুর অভাবে উক্ত লেখক ও অনুবাদকগণের উৎসাহবর্দ্ধন বিষয়ে আমারদিগেরও অনুরাগ অনেকাংশে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল, কিন্তু যুগলসেতুনিবাসি ধনরাশি বিদ্যোৎসাহী সরলস্বভাব সুপ্রসন্নচিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধন বিষয়ে সমধিক উৎসাহী হইয়া যথেষ্ট রূপে আনুকূল্য করাতে আমারদিগের ঐ ক্ষুণ্ণোৎসাহ বর্দ্ধমান হইয়াছে, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন বিষয়ে কালীপ্রসন্ন বাবুর যেরূপ অনুরাগ ও যত্ন আছে, তাহা সাধারণের অবিদিত নাই, তিনি ঐ বিষয়ে কেবল অর্থ ব্যয় করিতেছেন, এমত নহে, স্বয়ং লেখনীধারণ পূর্ব্বক অবিশ্রান্তরূপে পরিশ্রমও করিতেছেন, বঙ্গভাষার সুলেখকদিগকে তিনি সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করেন, এবং তাহারদিগের দ্বারাই সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকেন, স্বয়ং মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপন করিয়া মহাভারতাদি মহাপুরাণ ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থাদি বঙ্গভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক উত্তম রূপে মুদ্রাঙ্কণ করিয়া অকাতরে সাধারণকে বিতরণ করাতে যে উপকার হইতেছে তাহা

---

* "পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রে বিগত শতাব্দীর বাংলার কথা," 'ভারতবর্ষ,' আশ্বিন ১৩৩৯, পৃ. ৫৬১।

বিবেচনা করিলে স্বদেশহিতেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের নিকটে বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করিতে হইবেক। অধুনা আমরা এইস্থলে তাঁহার বিষয় অধিক না লিখিয়া পরমেশ্বরের নিকটে একান্তচিত্তে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি অরোগী এবং দীর্ঘায়ু হউন, এবং বঙ্গভাষার উন্নতিবর্দ্ধন বিষয়ে তাঁহার যত্ন ও অনুরাগ এবং উৎসাহ ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকুক, স্বজাতীয় ভাষার অবস্থা সংশোধন বিষয়ে তিনি অবিচলিত অনুরাগ প্রকাশ করিয়া আপনার যথার্থ কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিতেছেন, তিনি তদ্বিষয়ে যে সমস্ত সৎসঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইলে এদেশের এক চির উপকার সাধন করা হইবেক। পুরাবৃত্তলেখক মহানুভবেরা হেমাক্ষরে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের গুণাবলী বর্ণন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় অনুবাদের নিমিত্ত দুইটি প্রশ্ন প্রদান করিয়াছিলেন, যথা।

ইংলণ্ডীয় কবিবর তামস্ মুর সাহেবের বিরচিত লালারুক বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ পারিতোষিক ১০০ টাকা।

টড্ সাহেবের রাজস্থাননামক পুস্তক হইতে উদয়পুরের রাজকুমারী কৃষ্ণকুমারীর বিচিত্র চরিত্র বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ পারিতোষিক ৩০ টাকা।

ইহার মধ্যে কোন অনুবাদক লালারুক অনুবাদ করিয়া প্রেরণ করেন নাই, ...।

দ্বিতীয় বিষয়, অর্থাৎ কৃষ্ণকুমারীর বিচিত্র চরিত্র বর্ণন দুই জন অনুবাদ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু গোঁসাই দাস গুপ্তের লেখা পরীক্ষকদিগের বিবেচনায় উত্তম হওয়াতে তাঁহাকে অবধারিত পারিতোষিক ৩০ টাকা প্রদানানুমতি হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় পদ্য রচনাবিষয়ে তিনটি বিষয় প্রেরণ করেন যথা।

রূপকচ্ছলে সমস্ত রজনীবর্ণন, বঙ্গভাষার সমালোচন এবং তাহার বর্ত্তমান অবস্থাবর্ণন কবিতা ৪০০ পঁক্তির ন্যূন না হয়, পারিতোষিক ৫০ টাকা,...শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়মাধব বসুর রচনা উত্তম হওয়াতে তিনি অবধারিত পঞ্চাশত মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বিতীয় বিষয়, নগর মধ্যে রজনী সম্ভোগ এবং কলিকাতা নগরের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণন। কবিতার সংখ্যা চারিশত পঁক্তির অধিক না হয়, এই বিষয় কেবল শ্রীযুক্ত রাধামাধব মিত্র লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন,...তাঁহাকে অবধারিত ত্রিশ টাকা প্রদান করা গেল।

শেষ প্রস্তাব গদ্য রচনা পুরাণ পাঠের ফল, এই বিষয়ে যে কয়েকটি রচনা আসিয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী সেনের রচনা পরীক্ষকদিগের বিবেচনায় উত্তম হওয়াতে তাঁহারা উভয় লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ অবধারিত পারিতোষিক ত্রিংশৎ মুদ্রা সমভাগ করিয়া দিবার আদেশ করিয়াছেন।

১২৭০ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির বার্ষিক সভার জন্যও কালীপ্রসন্ন স্বনামে ও বেনামীতে কয়েকটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। পুরস্কারের বিষয়গুলি এই :—

শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের প্রদত্ত।

পুরাণ পাঠের ফল কি ?

পরিমাণ প্রভাকর পত্রের চারি ফরমা, পুরস্কার ২৫ টাকা।

পরীক্ষক ব্রহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুত অযোধ্যানাথ পাকড়াসী।

শ্রীমুলুকচাঁদ শর্ম্ম প্রদত্ত।

লিখিবেন, তাঁহার এই লেখা অন্যূন বিংশতি পত্র হয়, পারিতোষিক ১০ টাকা মাত্র, পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়।

দ্বিতীয়, বঙ্গদেশাধিপতি সুবিখ্যাত রাজা বল্লাল সেনের জীবন বৃত্তান্ত ১২ পেজি ফরমার এক শত পৃষ্ঠার ন্যূন না হয়, পারিতোষিক ৪০ চল্লিশ টাকা।

পরীক্ষক শ্রীযুত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ও বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ।...('সংবাদ প্রভাকর', ২৫ মার্চ্চ ১৮৬৪)

কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিতায় অনেক লেখক তাঁহাদের সাহিত্যচর্চার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৬৩ সনের ৩০ নবেম্বর তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

নূতন পুস্তক।...বাঙ্গলা নাগানন্দ। ইহা সংস্কৃত নাগানন্দের অনুবাদ। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুমতি অনুসারে এই অনুবাদ করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন বাবু ইহার সমুদয় ব্যয় দিয়াছেন। লেখা মন্দ নহে। চিতপুর পুরাণসংগ্রহ যন্ত্রে মুদ্রিত ; ...

কালীপ্রসন্ন সাহিত্যিকগণকে নানা ভাবে সাহায্য করিতেন। ১৮৬২ সনের মাঝামাঝি ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য তৎসম্পাদিত 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রে কতকগুলি কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করার অপরাধে নূতন ফৌজদারী বিধিমতে ধৃত হইয়া জেলে গমন করিলে, কালীপ্রসন্নই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে জামিনে খালাস করেন। এই সম্পর্কে ৯ জুন ১৮৬২ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' নিম্নের সংবাদটি প্রকাশিত হয় :—

The same paper [*The Sajjan Ranjan*] mentions that Baboo Kali Prosunno Sing has got the editor of the *Russoraj* released from jail by paying into Court the adjudged amount for bail for his appearance during trial.

বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ দ্বারা স্বদেশের অশেষবিধ কল্যাণের কথা স্মরণ করিয়া কালীপ্রসন্ন সময়ে সময়ে এই সকল পত্রিকার উন্নতিবিধানের জন্য অর্থসাহায্য করিতেন। ইহার দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

(ক) ১৮৬১ সনের মে মাসে 'ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্র' নামে রাজনীতি-সংক্রান্ত একখানি পাক্ষিক সমাচার পত্র তারকচন্দ্র চূড়ামণির সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। এই পত্র প্রকাশে সাহায্যার্থ কালীপ্রসন্ন সম্পাদককে পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছিলেন। ('সোম-প্রকাশ,' ১ জুলাই ১৮৬১)

(খ) ১৩ অক্টোবর ১৮৬২ তারিখে 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, জোড়াসাঁকোস্থ প্রসিদ্ধ দাতা স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সোমপ্রকাশের উন্নতির নিমিত্ত ২০০ টাকা দান করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন তত্ত্ববোধিনী সভাকে একটি মুদ্রাযন্ত্র দান করিয়াছিলেন (১৮৫৬ সনে ?) বলিয়া জানা যায়। শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

কালীপ্রসন্ন নিজে একটি প্রেশ কিনিয়া তত্ত্ববোধিনী সভাকে দান করেন। তাহা আজও আদি-ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে লাগিতে রহিয়াছে। তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ঐ সময়ে

মিশিয়াছিলেন। আমাদের যতদূর স্মরণ হয় তাহাতে আদিব্রাহ্মসমাজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি ঝাড় দিয়াছিলেন। সেটী রূপান্তরিত হইয়া আজও সমাজের ত্রিতলে বিরাজমান। মাঘোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদায়দানের আংশিক ভারও তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ("৺কালীপ্রসন্ন সিংহ," 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', জ্যৈষ্ঠ ১৮৪২ শক, পৃ. ৩৭)

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, কালীপ্রসন্ন পাঁচ ছয় বৎসর ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই সমাজে নিয়মিত ভাবে অর্থ দান করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ শকের কার্ত্তিক সংখ্যা (১৮৫৬) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (পৃ. ১০৩) "দানপ্রাপ্তির বিবরণে" "শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ... ১০ টাকা"—এই উল্লেখ পাইতেছি। ১৭৮২ শকের আষাঢ় সংখ্যা (১৮৬০) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে "সাম্বৎসরিক দান। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ...১৫০" উল্লেখ আছে। ১৭৮৩ শকেও তাঁহার দানের প্রাপ্তিস্বীকার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে পাওয়া যায়। ১৮৫৭ সনে তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণার্থ তিনি অন্যতম "যন্ত্রাধ্যক্ষ" নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন ('তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ফাল্গুন ১৭৭৮ শক, পৃ. ১৬০)।

কালীপ্রসন্ন যে কেবল বাংলা পত্রিকাগুলিরই প্রতি সদয় ছিলেন এরূপ মনে করিলে অন্যায় হইবে। শিক্ষিত স্বদেশবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত ইংরেজী পত্রিকাগুলির প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। ১৮৬১ সনে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *Mookerjee's Magazine* (১ম পর্ব্ব) প্রকাশিত হয়। ইহার মুদ্রণের সাহায্যার্থ কালীপ্রসন্ন স্বয়ং একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া শম্ভুচন্দ্রকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যায়। কিছু দিন পরে, ১৮৬২ সনের মে মাসে গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গলী' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রের সাহায্যার্থ কালীপ্রসন্ন মুদ্রাযন্ত্রটি দান করিয়াছিলেন।* সম্ভবতঃ এই প্রসঙ্গেই 'সোমপ্রকাশ' ৫ জানুয়ারি ১৮৬৩ তারিখে লিখিয়াছিলেন:—

বিবিধ সংবাদ।...১৭ই পৌষ বুধবার। আমরা এবারের বাঙ্গালি পত্র পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। সম্পাদক বলেন, স্বদেশহিতৈষী প্রসিদ্ধ দাতা বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ ঐ পত্রের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র মুদ্রাযন্ত্রের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। জানুয়ারি মাস অবধি ঐ পত্রের অবয়ব বৃদ্ধি হইবে। কালীপ্রসন্ন বাবুর তুল্য সৎ কার্য্যে উৎসাহ দাতা লোক অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'দূরবীণ'

১৪ জুন ১৮৬১ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে পরিবারবর্গের জন্য তিনি একখানি বাড়ী ও হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস ভিন্ন আর কিছুই সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। এ অবস্থায় 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র ন্যায় দেশহিতকর পত্রের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। এই সময় কালীপ্রসন্নই 'হিন্দু পেট্রিয়ট'কে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রের পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া প্রেস ও পত্রের

সর্ব্বস্বত্ব ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা শুধু পত্রিকাখানি রক্ষা পায় নাই, পরন্তু হরিশ্চন্দ্রের পরিবারবর্গও যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন। স্থানাভাবে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র পরবর্ত্তী ইতিহাস এখানে দেওয়া সম্ভবপর নহে।

হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় দেশহিতব্রতের প্রতি কালীপ্রসন্ন বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। সুষ্ঠুভাবে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন-স্থাপনে সহায়তার জন্য কালীপ্রসন্ন একখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়া দেশবাসীর প্রতি তাঁহার নিবেদন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে 'হরিশ মেমোরিয়াল ফণ্ডে' পাঁচ শত টাকা দান করেন; এমন কি হরিশ্চন্দ্র-স্মৃতিমন্দির স্থাপনার্থ বাদুড়বাগানে দুই বিঘা জমি দান করিবার প্রস্তাব করিয়া স্মৃতি-সমিতিকে ৯ নবেম্বর ১৮৬২ তারিখে পত্র লিখিয়াছিলেন। সমিতি এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই।

নীলকর-অত্যাচার প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়টে' আর্চিবল্ড হিল্‌স নামে এক জন সাহেব কর্ত্তৃক হরমণি নাম্নী এক রমণীর সতীত্বনাশের উল্লেখ করেন। হিল্‌স হরিশ্চন্দ্রের নামে মানহানির মকদ্দমা করিয়াছিলেন। ১৮৬২ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারি আলীপুরে এই মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় এবং বাদী মকদ্দমার খরচখরচার ডিক্রী পান। হরিশ্চন্দ্র তখন মৃত; কয়েক শত টাকা মকদ্দমা-খরচের দায়ে তাঁহার বাড়ীখানি বিক্রয় করিবার কথা হইতেছিল। এই সময় কালীপ্রসন্ন হরিচন্দ্রের গৃহরক্ষা-তহবিলে শত মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশ :—

> বাঙ্গালী বলেন হিল সাহেবের মকদ্দমায় মৃত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যে বাটী বিক্রয়ের কথা হইতেছিল, ঐ বাটী রক্ষার্থ এক্ষণে ৫১৬ টাকা চাঁদা হইয়াছে। যাঁহারা এই চাঁদায় দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ও বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দানই উচ্চ হইয়াছে। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের দান ১০০ টাকা।

কালীপ্রসন্ন এক সময় আর একখানি সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া উহার পরিচালনে সহায়তা করিয়াছিলেন।* এই কাগজখানির নাম 'দূরবীণ', ইহা ফার্সী সংবাদপত্ররূপে ১৮৫৪ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়।†

দুর্ভিক্ষে দান

দানবীর কালীপ্রসন্ন জাতিনির্ব্বিশেষে দান করিতেন। ১৮৬২ সনে ল্যাঙ্কাশায়ার দুর্ভিক্ষ-

---

* "His patronage of the press was catholic, for he extended it even to that Urdu newspaper, the *Doorbin*, the proprietary right in which he bought at the instance of a Mahomedan friend [Nawab Abdul Latif Khan Bahadur.] —*The Hindoo Patriot* for July 25, 1870.

† "পারস্য ভাষায় দূরবীন নামে এক নূতন পত্র প্রকাশারম্ভ হইয়াছে তাহার লেখা অতি উত্তম, তাহাতে নানা স্থানের সংবাদাদি প্রকাশ হইয়া থাকে আমরা ঐ পত্রের দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পরিমাণ সিটিজানের ন্যায়, প্রতি সপ্তাহে দুই দিবস প্রকাশ হয়, ছাপা অতি উত্তম, মাসিক মূল্য দুই টাকা মাত্র যাঁহার প্রয়োজন হয় নীমতলার মসজীদ বাটীতে পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।"—'সংবাদ

তহবিলে তিনি সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। এই সংবাদ আমরা ১৫ ডিসেম্বর ১৮৬২ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে পাই। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিয়াছিলেন :—

> We are glad to see the subscriptions in aid of the Lancashire [Famine] Fund are pouring in rapidly. Some of our leading townsmen have subscribed munificently. Rajah Pertaub Chunder Sing has contributed another thousand. The other one-thousand-wallahs are Ranee Surnomoyee, Baboo Prosunno Coomar Tagore, Baboo Kali Prossunno Sing, and Baboo Herallaul Seal. Lesser stars then follow...

১৮৬১ সনে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। ইহার নিবারণকল্পে কালীপ্রসন্ন নিজে সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> একবার উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে খুব দুর্ভিক্ষ হয়। সেই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজে একটা সভা হয়। সেই সভায় পিতৃদেব বেদী হইতে যেরূপ মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন তাহা আমি কখন ভুলিব না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া লোকেরা এমনি মুগ্ধ ও উত্তেজিত হইয়াছিল যে, যাহার কাছে যাহা কিছু ছিল, তৎক্ষণাৎ সে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে দান করিল। কেহ আঙ্গুল হইতে আংটি খুলিয়া দিল, কেহ ঘড়ি ও ঘড়ির চেন্ খুলিয়া দিল। আমার স্মরণ হয় ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার বহুমূল্য উত্তরীয় বস্ত্র (বোধ হয় শাল) তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দান করিলেন। ("পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি," 'প্রবাসী', মাঘ ১৩১৮, পৃ. ৩৮৯-৯০)

জনহিতকর কার্য্যে দান

কলিকাতায় যখন বিশুদ্ধ পানীয় জলের সৃষ্টি হয় নাই, তখন কালীপ্রসন্ন বিলাত হইতে চারিটি ধারাযন্ত্র আনাইয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।' এই প্রসঙ্গে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ৬ ডিসেম্বর ১৮৬৫ তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

> বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দত্ত দুই সহস্র টাকা দ্বারা ইংলণ্ড হইতে ধারাযন্ত্র ৪টী আনয়ন করা হইয়াছে। উহার ব্যয় সর্ব্বশুদ্ধ ২৯৮৫।৶০ আনা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্থাপনের ব্যয় স্বতন্ত্র দেওয়া হইবে।*

স্বাজাত্যবোধ

স্যর মর্ডাণ্ট ওয়েলস্ সুপ্রিম কোর্টের বিচারাসন হইতে প্রায়ই বলিতেন বাঙালী মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। নীলদর্পণ-মকদ্দমায়ও তিনি এইরূপ কটুবচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সমগ্র জাতিকে এরূপভাবে অপমানিত করায় তাঁহার বিরুদ্ধে চারি দিকেই অসন্তোষের গুঞ্জনধ্বনি

* ১১ ডিসেম্বর ১৮৬৫ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে প্রকাশ :—We are glad to notice that the Town will be soon provided with four drinking fountains, the cost of which has been defrayed by Baboo Kaliprossono Sing with his usual liberality. The same gentleman we are told has applied to Emperor Napolean for permission to translate into Bengalee his Imperial Majesty's Life of Julius Caeser.

শোনা যাইতে লাগিল। ২৬ আগষ্ট ১৮৬১ তারিখে দেশীয় নেতৃবর্গ রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে এক বিরাট সভা করিলেন। নির্ভীক কালীপ্রসন্নও এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন; শুধু যোগদান করিয়াছিলেন বলিলে ঠিক হইবে না,—বাঙালী-চরিত্রে অযথা কলঙ্ক-লেপনের জন্য তিনি বিচারপতি ওয়েলসের বিরুদ্ধে এই জনসভায় বক্তৃতা করিতেও শঙ্কিত হন নাই। সভায় রাজা রাধাকান্ত দেব, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

ওয়েলসের বিরুদ্ধে বহু সহস্র লোকের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মারফৎ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬১ তারিখে বিলাতে সেক্রেটরী-অব-ষ্টেট স্যর চার্লস্ উডের নিকট পাঠান হইল। এই আবেদনের উত্তরে পরবর্ত্তী ২৪ ডিসেম্বর তারিখে স্যর চার্লস উড গবর্ণর-জেনারেলকে লেখেন :—

> 2. I regret that any language used on the Bench of Justice should be supposed by any persons to convey general imputations on the moral character of the whole Native inhabitants of Bengal...
>
> 3. I will conclude by expressing a hope that the feelings of which this memorial contains the evidence, may of themselves subside with time and reflection, that those who hold the Judicial office may be sensible of how great importance it is that their denunciations of crime may not be interpreted into hasty imputations against a whole people or country.*

কালীপ্রসন্নের 'হুতোমে'র ভাষায় "সেই অবধি ওয়েলসও ব্রেক হলেন"।

১৮৬৩ সনে ওয়েলস্ যখন এদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন যাঁহারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কালীপ্রসন্নও অন্যতম।† ইহা তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব বলিতে হইবে।

প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসন্ন মনে মনে ইংরাজ-বিদ্বেষ পোষণ করিবার মত অনুদার ছিলেন না। বরং দেখা যায়, যে-সকল ইংরেজ এদেশের হিতসাধন করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে মোটেই পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ক্ষমাশীল ব্যবহারের জন্য লর্ড ক্যানিং এদেশবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি বহু ইংরেজের—বিশেষতঃ বণিক্-সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন ক্যানিঙের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। তিনি একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন; পুরস্কারের বিষয় ছিল—"শ্রীযুক্ত লার্ড ক্যানিঙ বাহাদুর ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশের কি কি উপকার করিয়াছেন,...শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাহার উত্তর লিখিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।" পুরস্কৃত রচনাটি 'লার্ড কেনীং' নামে ১৮৬১ সনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।‡

---

* ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৬২ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট্' দ্রষ্টব্য।

† সোমপ্রকাশ', ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬৩, পৃ. ৬৫৯ দ্রষ্টব্য।

ইহার পর লর্ড ক্যানিঙের স্বদেশগমনের সঙ্কল্পের কথা যখন প্রচারিত হইল, তখন তাঁহাকে কি ভাবে সম্মানিত করা যায়, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য টাউন-হলে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬২ তারিখে এক বিরাট জনসভা হয়। এই সভায় স্থির হয়, রাজা রাধাকান্ত দেব, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, মৌলবী আবদুল লতীফ প্রমুখ নেতৃবর্গ লর্ড ক্যানিঙের নিকট উপস্থিত হইয়া এদেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে একখানি মানপত্র দিবেন। এই সকল দেশনায়কের দলে কালীপ্রসন্নও ছিলেন। পরবর্তী ১৪ই মার্চ লর্ড ক্যানিংকে মানপত্র দেওয়া হয়। সভায় আরও স্থির হইয়াছিল, চাঁদা তুলিয়া লর্ড ক্যানিঙের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই স্মৃতিরক্ষাকল্পে কালীপ্রসন্ন সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।*

নীলকর-পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখমোচনকারী লেফটেনাণ্ট গবর্ণর স্যর জন্ পীটার গ্রাণ্ট যখন এদেশ ত্যাগ করেন, সেই সময় তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দনপত্র দিবার জন্য দেশের যে-সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি ২২ এপ্রিল ১৮৬২ তারিখে বেলভিডিয়ার হাউসে সমবেত হইয়াছিলেন, কালীপ্রসন্ন তাঁহাদের অন্যতম।† গ্রাণ্ট সাহেবের স্মরণার্থ তহবিলেও কালীপ্রসন্ন শত মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।‡

স্বনামধন্য অধ্যাপক ডি. এল. রিচার্ডসন যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন যে-সকল কৃতবিদ্য ব্যক্তি তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র ও পাথেয়স্বরূপ কয়েক সহস্র মুদ্রার থলি প্রদান করেন, কালীপ্রসন্ন ও তাঁহাদের মধ্যে এক জন।

বিচারকের কার্য্য

১৮৬৩ সনে কালীপ্রসন্ন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও জষ্টিস অব দি পীস্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৪ মে ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

> আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ অনরারী মেজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন অনেক বার অস্থায়ী ভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যও করিয়াছিলেন। ৩ জুন ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ, "কলিকাতা পুলিসের প্রধান মাজিষ্ট্রেট ব্রাম্নন সাহেব অশ্ব হইতে পতিত হইয়া বিচারালয়ে আসিতে অশক্ত হওয়ায় অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার কার্য্য করিতেছেন এবং ব্রাম্নন সাহেবের নিয়োগের পূর্ব্বে সিংহ মহাশয় ঐ পদে কিছু দিন কার্য্য করিয়াছিলেন।"§ ১৮৬৪ সনেও তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে দুই মাস কাজ করিয়াছিলেন; ৩১ অক্টোবর ১৮৬৪ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখেন :—

> Baboo Kally Prossunno Sing has been requested by the Commissioner of Police to officiate for Mr. Dickens, the Southern Division Magistrate,

* ৩১ মার্চ্চ ১৮৬২ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' দ্রষ্টব্য।

† *The Indian Field* for 26 April 1862.

‡ ৬ জুলাই ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' দ্রষ্টব্য।

§ "সংবাদ প্রভাকরে বাংলার পুরাতনী," 'ভারতবর্ষ,' ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ. ৪৫৪।

for two months. It is but bare justice to the Baboo to say that he has taken the shine out of all the Honoraries of Calcutta, whether European or native, and the public spirit which he is exhibiting by thus employing his leisure for the benefit of the public is indeed entitled to high commendation.

বিচারকার্য্যে কালীপ্রসন্নের সুনাম ছিল। সে-যুগের সংবাদপত্রে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ২০ আগষ্ট ১৮৬৪ তারিখের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' নামক ইংরেজী সংবাদপত্রে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি প্রকাশিত হয় :—

News of the Week. Saturday, 20th August.—The *Lahore Chronicle* thus speaks of the impartial decision of a case by our energetic Honorary Magistrate Baboo Kali Prosonno Singh :—We quote the following Police Report from the *Englishman,* not because the *Honorary* Magistrate by whom it was tried is a Bengalee gentleman of independent and self-reliant character—Baboo Kali Prosono Sing—who won't allow himself to be turned from doing what he believes to be—and what we believe was—right even by the arguments of a High Court practitioner. Our contemporary should know that Baboo Kali Prosono has become since his accession to the Honorary Magisterial bench of Calcutta a terror to Bengalee Villains and European rogues.

১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে :—

A blind beggar was the other day brought up before Baboo Kali-prossonno Singh, Honorary Magistrate, on a charge of begging for alms in the Streets. The appearance of the man at once excited the sympathy of the Magistrate who far from punishing him gave him a donation of 2 Rs. out of his own pocket and promised him a monthly relief of one Rupee. A letter to the Secretary of the District Charitable Society was also directed to be written. We wish however the Magistrate had shown some sense of his displeasure to the over-zealous Police Officer, who hauled up a blind man for begging.

আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৫ তারিখে কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে নিম্নাংশ প্রকাশিত হয় :—

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ।—ডেলি নিউসের একজন পত্র প্রেরক বলেন, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট একদিন মিউনিসিপাল সংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বিচার কালে হেলথ আফিসর ডাক্তার টনিয়র সম্মুখে ছিলেন; ডাক্তার টনিয়র বলিলেন নেটিবদিগের সাক্ষ্য বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই কথায় কালীপ্রসন্ন বাবু বলেন, অনেক মিউনিসিপাল সংক্রান্ত মোকদ্দমা আমার নিকট উপস্থিত হয়, অতএব আমি কোন মিউনিসিপ্যাল আফিসরের কথা শুনিয়া তাহার বিচার করিব না। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীদিগের সাক্ষ্যও আমি অগ্রাহ্য করিব না। সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় সাক্ষিদিগের কথা যত দূর বিশ্বাস করি, সম্ভ্রান্ত দেশীয় লোকের কথা তত দূর বিশ্বাস করিব। একটি কথাও মান্য করিব না। টনিয়র সাহেব দেখি দ্বিতীয় ওয়েলস হইলেন।

মৃত্যু

২৪ জুলাই ১৮৭০ (৯ শ্রাবণ ১২৭৭) তারিখে কালীপ্রসন্ন অপুত্রক অবস্থায় অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে সেটি উদ্ধৃত করা হইল :—

> Among the wealthy and aristrocratic classes of Calcutta there are few, young or old, that could equal the accomplishments of Kali Prossono Singh, whose death during the last week it is our melancholy duty to record. The only son of a wealthy father, he left his college studies while very young, and his character gave little indication of any future worth or usefulness. But as he with increased years imbibed a taste for the pleasures of opulence and youth, he also imbibed higher and more refined tastes, and became such an ardent lover of literature and wit as few of his class have ever seen. His celebrated translation of the *Mahavarata,* which before his time never stood in decent Bengali, and the free distribution of the fifteen volumes of his great work, made him popular with every native of Bengal that could spell a sentence of his mother-tongue. His exquisite sketches of Calcutta society published under the humorous title of, *Hootum* are inimitable, and would not, we advisedly say, dishonor the genius of a Swift or a Dickens. He it was who originally introduced into Bengal the taste for indigenous theatricals, and his translation of *Vikramorvasi* was the first play ever represented in a Bengali stage. He started a daily vernacular newspaper, under the model of English journalism, called the *Paridarshaka,* for some time conducted the well-known Bengali monthly journal *Vividartha Sungraha,* and when the *Hindoo Patriot* was on the verge of ruin, he rescued it at great expense, and entrusted it to competent hands. Nor was he wanting in public spirit. The ardent co-operation which he rendered to Dr. Duff during Famine of 1861 in the N. W. Provinces, the ready help which Mr. Long received from him during the *Nil Durpan* troubles, and the munificent gift of the stone fountains which he made to the Municipality amply testify to this. Handsome, young, rich, and generous he was ever a prey to the temptations that infest native society, and to nothing more than the dreadful vice of intemperance. Last Sunday at about 3 o'clock P. M. he died of a disorder of the liver brought on by his excesses, in the 29th year of his age.—*The Indian Mirror* for 29 July (Friday), 1870.

উপসংহার

কালীপ্রসন্ন সিংহের বহুমুখী প্রতিভা এবং আরব্ধ ও অসম্পূর্ণ বহুবিধ কীর্ত্তির এই সংক্ষেপ-পরিচয়ের মধ্যে সমগ্র মানুষটির যে রূপ প্রায় সপ্ততি বৎসরের ব্যবধানেও আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে, কলিকাতার ধনী জমিদার বা বাবুসম্প্রদায়ের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ

জীবনকে মধ্যপথে খণ্ডিত করিয়া বাংলাদেশ ও জাতিকে যে কতখানি বঞ্চিত করিয়াছে, এই অসম্পূর্ণ ইতিহাস হইতে আমরা তাহা উপলব্ধি করিয়া আজিও ক্ষুব্ধ না হইয়া পারি না। এই সামান্য পরিচয় হইতেই আমরা নিঃসন্দেহে আজ বলিতে পারি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালীর সামাজিক জীবনের বহুবিধ সংস্কার ও উন্নতির ভিত্তিমূলে যুবক কালীপ্রসন্নের নাম চিরকাল ক্ষোদিত থাকিবে; তাঁহার হৃদয়ের উদারতা, স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধ, শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য ও সমাজ সংস্কারে তাঁহার দূরদর্শিতা ও অধ্যবসায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহাকে চিরদিন আমাদের স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

কালীপ্রসন্ন যে আদর্শ অনুসরণ করিয়া জীবনে চলিতে চাহিয়াছিলেন, তদানীন্তন সুখবিলাসলালিত ধনি-সন্তানদের তাহা কল্পনার অতীত ছিল; তাঁহার জীবনে এই আদর্শ পরিপূর্ণতা লাভ করিলে বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ইতিহাস আরও কিছুপরিমাণ গৌরবময় হইত। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু এদেশের পক্ষে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা।

মহাভারতের উপসংহারে কালীপ্রসন্ন আপন জন্মভূমির উন্নতি বিষয়ে যে কামনা করিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া প্রসঙ্গের শেষ করিতেছি,—

> জগদীশ্বরসমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, দেশীয় ক্ষমতাশালী ধনবান্ ব্যক্তিরা কায়মনে জন্মভূমির উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হইয়া ধনের সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক অবিনশ্বর সৎকীর্ত্তি লাভ করুন। তাঁহাদিগের যশঃসৌরভে ভূমণ্ডল পরিপূরিত হউক। বিদ্যার বিমলজ্যোতি সাধারণের হৃদয়নিহিত মোহান্ধকার দূর করুক। দীর্ঘকালমলিনা ভারতবর্ষের সৌভাগ্য দিন দিন নবোদিত শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি হউক। সহৃদয় সাধু জনেরা নিরাপদে চিরদিন স্বদেশীয় সাহিত্যরসাস্বাদনে কালাতিপাত করুন এবং শত শত অনুবাদক, গ্রন্থকার ও কবিবরেরা জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ভাষাদেবীরে অনুপম অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া সাধুসমাজের মনোরঞ্জন করত অমরতা লাভ করুন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দু জ্যোতিষে শককাল

প্রস্তাবনা—সংশয়

হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে সাধারণতঃ শককালের উল্লেখ দ্বারা সময় নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। মাত্র দুচার স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। যথা, আচার্য্য আর্য্যভট লিখিয়াছেন, ৩৬০০ কল্যব্দে তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর ছিল।[১] কালিদাস নামে জনৈক গণক লিখিয়াছেন যে, ৩০৬৮ কলিকালে তিনি 'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ' প্রণয়ন করেন।[২] টীকাকার মক্কিভট্ট একটা উদাহরণে "হংসোভব" (৪৪৭৮) কল্যব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।[৩] শতানন্দ-(১০২১ শক) প্রমুখ দুতিন জন জ্যোতিষী কল্যব্দের সঙ্গে সঙ্গে শকাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন[৪]। এতদ্ব্যতীত আর কোথাও শকাব্দ ভিন্ন কল্যব্দ বা অপর কোন অব্দের প্রয়োগ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। হিন্দুস্থানে বহু অব্দের প্রচলন আছে। বিভিন্ন প্রদেশে লোকসাধারণ বিভিন্ন অব্দের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। আবার বিক্রমাব্দ বা সংবৎ সমধিক প্রসিদ্ধ। অথচ জ্যোতিষশাস্ত্রে সর্ব্বত্র শকাব্দ ব্যবহৃত হয় কেন? উহার মধ্যে হিন্দুজ্যোতিষের কোন অজ্ঞাত পুরাকাহিনী নিহিত আছে কি? অধিকাংশ পণ্ডিতবর্গ মনে করেন যে, জ্যোতিষের শকাব্দ এবং প্রচলিত শকাব্দ—যাহা সাধারণতঃ শালিবাহনশকাব্দ নামে পরিচিত—অভিন্ন। উহার আরম্ভ ১৩৫ বিক্রমসংবতে বা ৭৮ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু কেহ কেহ উহাতে সংশয় করেন। তাঁহারা বলেন, অন্ততঃ আচার্য্য বরাহমিহির কর্ত্তৃক ব্যবহৃত শককালের আদি উহা হইতে পারে না। ঐ শকাব্দের প্রারম্ভ কখন হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের বিভিন্ন জনে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন বটে। কিন্তু উহা যে, প্রচলিত শককাল হইতে ভিন্ন, উহার প্রারম্ভ যে ১৩৫ বিক্রমসম্বতে নহে, এ বিষয়ে তাঁহাদের সকলে একমত। আমরা এখানে ঐ বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। প্রচলিত শকাব্দ কে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা এখনও নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিশ্চিত হয় নাই। উহা শালিবাহনশকাব্দ নামে খ্যাত। কিন্তু ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রাজা সাতবাহন বা শালিবাহন উহার প্রবর্ত্তক কি না, সন্দেহ। এ

১। 'আর্য্যভটীয়', কালক্রিয়াপাদ, ১০ম শ্লোক। এবিষয়ে লেখকের "আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ('সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ১২৯-১৫৮ পৃষ্ঠা; বিশেষত, ১২৯ পৃষ্ঠা।

২। "বর্ষে সিন্দুরদর্শনাম্বরগণৈর্যাতে কলৌ সম্মিতে।
মাসে মাধবসংজ্ঞিতেহত্র বিহিতো গ্রন্থক্রিয়োপক্রমঃ।"

'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ', ২২।২১

এই বচনানুসারে ৩৪ (=৩১০২—৩০৬৮) খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে কালিদাস জীবিত ছিলেন। উহা সত্য নহে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি বস্তুতঃ ১১০০শকের প্রায়কালের লোক।

৩। 'সিদ্ধান্তশেখর', ২।৩২ (টীকা)

৪। শতানন্দকৃত 'ভাস্বতী', ১।১-৩।

দেশের প্রাচীন জ্যোতিষিগণ ঐ বিষয়ে কি বলিয়াছেন, আমরা প্রসঙ্গক্রমে তাহাও সংগ্রহ করতঃ এখানে লিপিবদ্ধ করিব। যাঁহারা উহার বিশেষ চর্চ্চা করেন, হয় ত তাঁহাদের কোন উপকারে আসিবে।

সংশয়ের হেতু—একাধিক শককাল

প্রধানতঃ তিনটা হেতুতে বরাহমিহিরের শককাল সম্বন্ধে লোকের মনে সংশয় জন্মিয়াছে। প্রথমতঃ, একাধিক শকাব্দের সদ্ভাব। দ্বিতীয়তঃ, বিশিষ্ট নামোল্লেখের অভাব। এবং তৃতীয়তঃ দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনীধারার স্থলে স্থলে সংমিশ্রণ।

বিখ্যাত ফরাসী পুরাতত্ত্ববিদ্ ফিনো লিখিয়াছেন[৫] যে, কম্বোজ দেশের লাউ প্রদেশের অধিবাসিগণ তিনটা শককালের ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা, চুল্লশকরাজ, মহাশকরাজ ও বুদ্ধশকরাজ। উহাদের প্রারম্ভ যথাক্রমে ৬৩৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ তারিখে, ৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে এবং ৫৪৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের বৈশাখ মাসে ভগবান্ বুদ্ধের নির্ব্বাণের পরের দিনে। দ্বিতীয়টা বিশেষভাবে শিলালেখাদিতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা যায়, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ হইতে একটা অব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। এবং উহাকেও 'শক' বলা হইত। প্রাচীন কম্বোজ দেশ হিন্দুস্থানেরই উপনিবেশবিশেষ। সুতরাং হিন্দুস্থানেও এক সময়ে ঐ শকত্রয় প্রচলিত ছিল। বোধ হয়[৬] 'যুধিষ্ঠিরশকে'র ব্যবহারও কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়।[৭] কালিদাস গণক (১১০০ শক প্রায়) লিখিয়াছেন,—

"যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনৌ নরাধিনাথৌ বিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেঽনু নাগার্জ্জুনমেদিনীবিভুর্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্ শককারকাঃ নৃপাঃ॥"[৮]

'যুধিষ্ঠির, বিক্রম, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন ও বলি (বা বহ্নি), এই ছয় জন রাজা শককারক।" মুনীশ্বর ও (১৫৫৩ শক) এই শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি 'বিক্রমশক' ও 'শালিবাহনশকে'র নামোল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায় যে, হিন্দুস্থানে একাধিক শকাব্দের সদ্ভাব আছে। সময় নির্দ্দেশে ঐ সকল শকাব্দের নামের 'যুধিষ্ঠির', 'বিক্রম' প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অংশ সর্ব্বদা উল্লিখিত হয় না, দেখা যায়। শুধু শক বা শাক বলিলে লোকে সাধারণতঃ শালিবাহনশককেই বুঝিয়া থাকে।

৫। *Bull. Ecol. Franch. Extr. Orient, XVII, 1917.*

৬। আমরা 'বোধ হয়' বলিয়াছি। কারণ, উত্তরভারতে প্রচলিত বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দের আদিও যে উহাই, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না (পরে দেখ)।

৭। "The Age of Kalidas" নামক প্রবন্ধে আপ্পাশাস্ত্রিধৃত 'জিনবিজয়' গ্রন্থের বচন। ('সংস্কৃত-চন্দ্রিকা', ৯ম খণ্ড)।

৮। 'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ', ১০।১১০। এই শ্লোকের পাঠান্তর আছে।

"যুধিষ্ঠিরাদ্বিক্রমশালিবাহনৌ ততো নৃপঃ স্যাদ্বিজয়াভিনন্দনঃ।

সেরূপ সম্বৎ বলিলে বিক্রমসম্বৎকে বুঝায়। কিন্তু কখন কখন উহার ব্যতিরেকও দেখা যায়। একটা শিলালেখে আছে, উহা ১২৭৫ শাকে, চিত্রভানুসংবৎসরে, মার্গশীর্ষ শুক্লা পঞ্চমী, শনিবারে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উহা যে কোন্ 'শক,' তাহা বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশিত হয় নাই। কানিংহাম দেখাইয়াছেন, ঐটা বিক্রমশক বা বিক্রমসংবৎ; শালিবাহনশক নহে। ১২৭৫ বিক্রমসংবতেরই বার্হস্পত্য সংবৎসরের নাম চিত্রভানু। উহার ধারাবাহিক সংখ্যা, প্রভবাদি গণনায়, ১৬।১২৭৫ শালিবাহনশকের বার্হস্পত্য সংবৎসর, উত্তরীগণনারীতি মতে, বিকারীন, ৩৩ সংখ্যক; দক্ষিণী গণনারীতি মতে, বিজয়, ২৭ সংখ্যক। উভয়েই চিত্রভানু হইতে বহু ব্যবধানে অবস্থিত।

জ্যোতিষিক শকাব্দ ও কল্যব্দ

হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে কলিগত অহর্গন অর্থাৎ কলির প্রারম্ভ হইতে কোন অভীষ্ট সময় পর্য্যন্ত যত সাবন দিন ব্যতীত হইয়াছে, কলিযুগের সেই অতীত দিনসমূহ গণনার বিধি আছে।[৯] উহাতে আছে যে, প্রথমে ঐ অভীষ্ট সময়ের শকাব্দের সহিত ৩১৭৯ যোগ করিতে হইবে। যথা, বৃদ্ধভাস্কর (৪৪৪ শকপ্রায়) লিখিয়াছেন,—

"নবাদ্রিরূপাগ্নিসংযুক্তা মহীভুজাং শকেন্দ্রনাম্নঃগতবর্ষসংগ্রহাৎ।"[১০]

"নবাদ্র্যেকাগ্নিসংযুক্তা শকাব্দঃ দ্বাদশাহতাঃ।
চৈত্রাদিমাসসংযুক্তাঃ পৃথ· যুগাধিকৈঃ ॥"[১১]

অপর জ্যোতিষিগণও তাহাই বলিয়াছেন।

"নবাদ্রিচন্দ্রানলসংযুতো ভবেচ্ছকক্ষিতীশাব্দগণো গতঃ কলেঃ।"[১২]

—লল্ল (৪২৭ শকপ্রায়)

"কল্পপরার্দ্ধে মনবঃ ষট্‌কস্য গতশ্চতুর্যুগত্রিঘনাঃ।
ত্রীণি কৃতাদীনি কলের্গোঽশৈকগুণাঃ শকান্তেঽব্দাঃ।
নবনগশশিমুনিকৃতনবযমনগানন্দেন্দব শকনৃপান্তে ॥"[১৩]

—ব্রহ্মগুপ্ত (৫৫০ শকাব্দ)

"যাতাঃ কলের্নবনগেন্দুগুণঃ শকান্তে"[১৪]

—শ্রীপতি (৯৬১ শক)

৯। গ্রহাদির পরিভ্রমণকালের আরম্ভ হইতে অভীষ্ট মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত সাবনদিনসমূহের নাম অহর্গন। সৃষ্টি হইতে বর্ত্তমান চতুর্যুগের কলিযুগের আরম্ভ পর্য্যন্ত কত দিন গত হইয়াছে, তাহা পরিগণিত হইয়া আছে। কলিগত অহর্গন গণনা করিয়া উহার সহিত যোগ দিলেই অভীষ্ট সময়ের অহর্গন পাওয়া যায়। গণনা-লাঘবার্থই এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে।

১০। 'মহাভাস্করীয়', ১।৪ ১১। 'লঘুভাস্করীয়', ১।৪ ১২। 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ', ১।১৫

"যাতাঃ ষণ্মনবো যুগানি ভমিতান্যন্যদ্যুগাঙ্‌ঘ্রিত্রয়ং
নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ।
গোহন্দদ্রিকৃতাঙ্কদস্রনগগোচন্দ্রাঃ শকাব্দান্বিতাঃ
সর্ব্বে সঙ্কলিতা পিতামহদিনে স্যুর্বর্ত্তমানে গতাঃ ॥"[১৫]

—(দ্বিতীয়) ভাস্কর (১০৭২ শক)

শতানন্দের 'ভাস্বতীতে' আছে, ৪২০০ কল্যব্দ = ১০২১ শকাব্দ[১৬]। মল্লিকার্জ্জুন সূরি ও চণ্ডেশ্বর লিখিয়াছেন,[১৭]—

৪২৭৯ কলিগতাব্দ = ১১০০ শক,

৪২৮৬ কলিগতাব্দ = ১১০৭ শক।

আরও অধিক বচন উদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। এইরূপে দেখা যায়, এ সকল জ্যোতিষিগণ এক বাক্যে প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে, কলির ৩১৭৯ বৎসর গতে চৈত্র-শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে শকাব্দের আরম্ভ হয়। সুতরাং কল্যব্দের আদি নির্ণীত হইলেই হিন্দুজ্যোতিষে ব্যবহৃত শককালের আদিও নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়।

তাহাদের আরম্ভকাল

হিন্দু জ্যোতিষে সৃষ্টির প্রথম হইতে কালগণনা হইয়া থাকে। ঐ কালকে আবার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগ, মন্বন্তর, কল্প ইত্যাদি প্রকারে বিভাগ করা হইয়া থাকে। এবং তাহাদের প্রত্যেকের পরিমাণও নির্দ্দিষ্ট আছে। সৃষ্টি হইতে কলিযুগের আরম্ভ পর্য্যন্ত ১,৯৫৫,৮৮০,০০০ সৌর বৎসর। সৃষ্টির পর সূর্য্য, চন্দ্র, তাহাদিগের পাতস্থান এবং উচ্চ নীচ বিন্দুগুলি সকলেই পৃথিবী ও অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম বিন্দুর সহিত সমসূত্রপাতে ছিল। সুতরাং সূর্য্য চন্দ্রাদির গতির হার জানা থাকিলে কলির প্রারম্ভে উহাদের সংস্থান গণনা করিয়া বলা যায়। বস্তুত হিন্দু জ্যোতিষগ্রন্থে কোন অভীষ্ট সময়ে গ্রহাদির মধ্যানয়নের বিধি সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে স্পষ্টতই উল্লিখিত আছে যে, কলিযুগের প্রারম্ভে সূর্য্যোদয়সময়ে মধ্য সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহসমূহ সমসূত্রে শূন্য দেশান্তরে অবস্থিত ছিল।[১৮] উহা হইতে গণনা করিয়া সুবিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ বেলি-প্রমুখ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নির্ণয় করেন যে, ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ১৮ (কি ১৯) ফেব্রুয়ারি তারিখে সূর্য্যোদয়ে হিন্দু জ্যোতিষোক্ত কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছে। ঐ সিদ্ধান্ত এখন সকলে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। তদনুসারে শককালের আদি ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থির হয়। অতএব হিন্দু জ্যোতিষে ব্যবহৃত শককাল ও শালিবাহনশককাল অভিন্ন বলিয়া সিদ্ধ হয়। ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে, যুগমন্বন্তরাদি কালবিভাগ কল্পিত। সেই হিসাবে কলিকালের

১৫। 'সিদ্ধান্তশিরোমণি', মধ্যমাধিকারে কালমানাধ্যায়, ২৮শ্লোক। ১৬। 'ভাস্বতী' ১।২

১৭। শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, "প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্ব্বিদ্ মল্লিকার্জ্জুন সূরি," 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ৮৩-৯৪ পৃষ্ঠা; বিশেষতঃ ৮৪-৫ পৃষ্ঠা।

১৮। যথা 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'।

আদিও এক প্রকার কল্পিত। শকাব্দের ৩১৭৯ বৎসর পূর্বে আকাশে গ্রহাদির অবস্থিতি বস্তুত পর্য্যবেক্ষণ করত যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা নহে, বোধ হয়।

পৌরাণিক কলিকাল

যুগমন্বন্তরাদি কালবিভাগের উল্লেখ মহাভারত পুরাণাদিতেও পাওয়া যায়[১৯]। ঐ বিষয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের সঙ্গে তাহাদের কোন ভেদ নাই[২০]। কলিযুগের পূর্বে কত কাল গত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও জ্যোতিষশাস্ত্র এবং ইতিহাসপুরাণাদির মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু পুরাণাদিতে বিশেষভাবে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দ্বারা কলিকালের আরম্ভ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, গ্রহাবস্থিতির উল্লেখে নহে। যথা, 'বিষ্ণুপুরাণে' উক্ত হইয়াছে,—

"যদৈব ভগবদ্বিষ্ণোরংশো যাতো দিবং দ্বিজ।
বসুদেবকুলোদ্ভূতস্তদৈব কলিরাগতঃ" ॥[২১]

'হে দ্বিজ! যে সময়ে ভগবান্ বিষ্ণুর বসুদেবের কুলে জাত অংশ (অর্থাৎ কৃষ্ণ) স্বর্গ গমন করেন, সেই সময়েই কলি আগমন করিয়াছে'।

"যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগং............... ... ॥"[২২]

'যে দিন যে সময়ে কৃষ্ণ স্বর্গে গমন করেন, সেই দিন সেই সময়েই কলিযুগ আরম্ভ হয়[২৩]।' ভাগবতাদি অপর কোন কোন পুরাণেও ঐ প্রকার উক্তি পাওয়া যায়।[২৪]

ঐ সকল পুরাণে কিঞ্চিৎ ভিন্ন মতও দেখিতে পাওয়া যায়।

"তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥"[২৫]

'হে দ্বিজোত্তম! তাঁহারা (সপ্তর্ষিগণ) পরীক্ষিৎকালে কিন্তু মঘায় ছিলেন। তখন দ্বাদশশতবৎসরাত্মক কলি প্রবৃত্ত হয়।' কলিকালের পরিমাণ দিব্য মানে ১২০০ বৎসর। তাই বলা হইয়াছে, "দ্বাদশশতবৎসরাত্মক কলি" অর্থাৎ 'যে কলির পরিমাণ

১৯। 'মহাভারত', শান্তিপর্ব্ব, ২৩১।৩১১ অধ্যায়, বনপর্ব্ব, ১০৮।২২; 'বিষ্ণুপুরাণ,' ১।১।১২; ১।৩।৫।

২০। একমাত্র দ্বিতীয় আর্য্যভটগৃহীত যুগমন্বন্তরাদি বিভাগ পৌরাণিক মত হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন।

২১। 'বিষ্ণুপুরাণ', ৪।২৪।৩৫

২২। 'বিষ্ণুপুরাণ', ৪।২৪।৪০। এই শ্লোকাংশ 'মৎস্যপুরাণ' (২৭৩।৪৮) এবং 'ভাগবতে' (১২।২।৩৩)ও আছে।

"যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ ॥" (ভাগবত)

২৩। 'বিষ্ণুপুরাণ', ৪।২৪।৩৬, ৫।৩৮।৮ প্রভৃতিতেও দ্রষ্টব্য।

২৪। 'ভাগবত', ১২।২।৩৩; আরও দেখ ১।৩।৪৫; ১।১৮।৫-৬; ১২।২।২৯; 'ব্রহ্মপুরাণ', ২১২।৮৫।

১২০০ (দিব্য) বৎসর, সেই কলি।'[২৬] পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেকসময় হইতে পরীক্ষিৎ-কাল আরম্ভ। সুতরাং ঐ বচনের মূলে কলির প্রারম্ভেই পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক হয়। পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেকের কিয়ৎকাল পরে, তাঁহার রাজত্বকালেই কলি প্রবৃত্ত হয়, এরূপও বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে যে কলিকাল আরম্ভ হয় নাই, ঐ বচনমূলে তাহা প্রতিপন্ন হয়। কৃষ্ণের দেহত্যাগের অন্তত ছয় মাস পরে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক হয়। সুতরাং কৃষ্ণের দেহত্যাগের দিনেই যে কলিযুগ আরম্ভ হয়, সে কথা টিকে কই? কৃষ্ণের মাহাত্ম্য খ্যাপনার্থই ঐ প্রকার কল্পিত হইয়াছে কি না, বিবেচ্য। পক্ষান্তরে 'বায়ুপুরাণে' আছে,—

"অষ্টাবিংশতিমে তদ্দ্বাপরস্যাংশস্য সংক্ষয়ে।
নষ্টে ধর্ম্মে তদা জজ্ঞে বিষ্ণুর্বৃষ্ণিকুলে প্রভুঃ॥"[২৭]

'অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপরের সন্ধ্যাংশ সম্যক্ ক্ষয় হইলে, ধর্ম্ম নষ্ট হয়। তখন ভগবান্ বিষ্ণু বৃষ্ণিকুলে জন্ম গ্রহণ করেন।' এই মতে কৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বেই কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল।

মহাভারতের মত

কলিকালের আরম্ভ সম্বন্ধে 'মহাভারতে' যে প্রমাণসমূহ পাওয়া যায়, এখন আমরা উহাদের আলোচনা করিব। তথায় এক স্থলে আছে, কলি ও দ্বাপরের অন্তরে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হইয়াছিল।

"অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ॥"[২৮]

ঐ কালনির্দ্দেশটি অতি স্থূল, সন্দেহ নাই। কলি ও দ্বাপর যুগের ঠিক সন্ধিকালেই

২৬। কেহ কেহ 'বিষ্ণুপুরাণের এই বচন ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের মতে উহার তাৎপর্য্য, পরীক্ষিতের সময়ে কলির ১২০০ বর্ষ গত হইয়াছিল। ঐ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। কেন না, উক্ত বচনের ঠিক পূর্ববর্ত্তী শ্লোকে কথিত আছে যে, কৃষ্ণের দেহত্যাগের পরেই কলি প্রবেশ করে। কৃষ্ণের দেহত্যাগের ১২০০ বৎসর পরে পরীক্ষিৎ বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা সম্ভব নহে। ভাগবতের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন,—"দ্বাদশাব্দশতাত্মক ইতি। দিব্যেন মানেন সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশাভ্যাং সহ যো দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ স কলিঃ তদা" ইত্যাদি। (ভাগবত, ১২।২।৩১)।

২৭। 'বায়ুপুরাণ, ৯৮।৯৭

২৮। আদিপর্ব, ২।১৩। কোন কোন পুরাণে আছে যে, কৃষ্ণ "দ্বাপরান্তে" জন্ম গ্রহণ করেন।

"পুরা গর্গেণ কথিতমষ্টাবিংশতিমে যুগে।
দ্বাপরান্তে হরের্জন্ম যদোর্ব্বংশে ভবিষ্যতি॥"—(বিষ্ণুপুরাণ, ৫।২৩।২৫)

এখানে 'দ্বাপরান্তে' অর্থ দ্বাপরের শেষভাগে, 'দ্বাপরের শেষ হইলে' নহে। কেন না, উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বলরামের সহিত রেবতীর বিবাহোপলক্ষে বলা হইয়াছে, "সাম্প্রতম্ ভূতলেঽষ্টাবিংশতিতমস্য মনোশ্চতুর্যুগমতীতপ্রায়ম্ আসন্নো হি তৎ কলিঃ।" (ঐ, ৪।১।২৩)। সুতরাং ঐ সময়ে কলি আসে নাই। অতএব কৃষ্ণের জন্ম

যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহাই বিবক্ষিত কি? যদি উহার কিঞ্চিৎকাল আগে বা পরে হইয়া থাকে, তবে কত কাল অন্তরে হইয়াছিল, তাহা না বলিলে কালজ্ঞান সূক্ষ্ম বলা যাইতে পারে না। কলির পরিমাণ ৪৩২০০০ সৌর বৎসর এবং দ্বাপরের পরিমাণ ৮৬৪০০০ সৌর বর্ষ। তাহাদের সন্ধিসময়ের হাজার দুই হাজার এ দিকে কিম্বা ঐ দিকে কোন ঘটনা ঘটিলেও ঐ দীর্ঘ কালের অপেক্ষায় উহাকে সন্ধিকালের ঘটনা বলা যাইতে পারে। তাই বলিয়াছি, ঐ কালনির্দ্দেশ স্থূল। তবে 'মহাভারতোক্ত' অপর প্রমাণ দ্বারা আরও সূক্ষ্ম কাল নিরূপণ করা যায়। মহাযুদ্ধের সময়ে ভীষ্ম দুর্য্যোধনের নিকটে কৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

"দ্বাপরস্য যুগস্যান্তে আদৌ কলিযুগস্য চ।
সাত্বতং বিধিমাস্থায় গীতঃ সঙ্কর্ষণেন যঃ॥" ২৯

সেই প্রকার ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন,—

দ্বাপরস্য কলেশ্চৈব সন্ধৌ পর্য্যবসানিকে।
প্রাদুর্ভাবঃ কংসহেতোর্ম্মথুরায়াং ভবিষ্যতি॥" ৩০

সুতরাং বলরাম ও কৃষ্ণ দ্বাপরের শেষ ভাগে এবং কলির প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব কৃষ্ণের জীবিতকালেই কলির আরম্ভ হয়।

রাজসূয়মহাযজ্ঞের পর ঈর্ষাবিদগ্ধ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া পুত্রস্নেহদুর্বল ধৃতরাষ্ট্র দ্যূতক্রীড়ায় সম্মতি দেন। তাহা শুনিয়া ধীমান্ বিদুর ভাবিলেন, কলি আসিবার সময় হইয়াছে ("কলিদ্বারমুপস্থিতম্" ৩১)। তাহাতে বোঝা যায়, তখনও কলি আসে নাই।

পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে গন্ধমাদন পর্বতে হনুমান্ ভীমকে বলিয়াছিলেন, অচিরে কলিকাল প্রবৃত্ত হইবে। সাগরলঙ্ঘনকালে হনুমান্ যেই রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ভীম সেই রূপ দেখিতে আগ্রহ করেন। হনুমান্ উত্তর করেন, তাহা সম্ভব নহে। কেন না,—

"কালাবস্থা তদা হ্যন্যা ন সা বর্ত্ততি সাম্প্রতম্॥ ৬॥
অন্যঃ কৃতযুগে কালস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরঃ।
অয়ং প্রধ্বংসনঃ কালো নাদ্য তদ্রূপমস্তি মে॥
... ...
এতৎ কলিযুগং নাম অচিরাদ্ যৎ প্রবর্ত্ততে।
যুগানুবর্ত্তনং ত্বেতৎ কুর্বন্তি চিরজীবিনঃ॥ ৩৮॥" ৩২

বনবাসকালে যুধিষ্ঠির যখন গন্ধমাদন পর্বতে প্রবেশ করেন, তাহার প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে ধনঞ্জয় তপস্যার্থ গিয়াছিলেন৩৩। অস্ত্রলাভানন্তর অর্জ্জুনের প্রত্যাগমনের পর

২৯। ভীষ্মপর্ব্ব, ৬৬।৪০। ৩০। শান্তিপর্ব, ৩৩৯।৮৯। ৩১। সভাপর্ব, ৪৯।৫২। ৩২। বনপর্ব, ১৪৯ অধ্যায়।

পাণ্ডবগণ গন্ধমাদন পর্বতে কুবের-প্রদত্ত গৃহে চারি বৎসর বাস করেন। তৎপূর্বে ছয় বৎসর অতীত হইয়াছিল[৩৪]। সুতরাং ষষ্ঠ বর্ষের শেষ ভাগে হনুমানের সহিত ভীমের সাক্ষাৎ হয়। তাহার প্রায় আট বৎসর পরে কুরুক্ষেত্র-মহাযুদ্ধ হয়। এইরূপে দেখা যায়, ভারতযুদ্ধের প্রায় আট বৎসর পূর্বেও দ্বাপর যুগ ছিল। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন,—

"সংক্ষেপো বর্ত্ততে রাজন্! দ্বাপরেঽস্মিন্নরাধিপ।" [৩৫]

সুতরাং তখনও দ্বাপর যুগ বর্ত্তমান।

অপর পক্ষে, যুদ্ধের শেষভাগে কলিকাল প্রবর্তিত ছিল দেখা যায়। মহাসমরের উপসংহারে গদাযুদ্ধে ভীম দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করেন। নাভির নীচে আঘাত করা গদা-যুদ্ধের নীতি-বিগর্হিত। সুতরাং উহা অধর্ম্ম। ভীমের এবম্বিধ অধর্ম্মাচরণে বলরাম অতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। তাঁহাকে শান্ত করিতে গিয়া কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

"প্রাপ্তং কলিযুগং বিদ্ধি"[৩৬] 'কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে জানিবে।'

তিন মতের পৌরাণিক সমন্বয়

এইরূপে আমরা মহাভারতপুরাণাদিতে কলিযুগের আরম্ভ সম্বন্ধে তিনটা মতের সন্ধান পাই। এক মতে কৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে কলিযুগের আরম্ভ। অপর মতে কৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বেই কলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তৃতীয় মতে কলির প্রারম্ভ কৃষ্ণের জীবনকালেই, তাঁহার দেহত্যাগের প্রায় ছত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বে, কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের আরম্ভকালেই হয়। এই শেষোক্ত মতবাদ বিশেষভাবে মহাভারতে এবং প্রথম মতবাদ মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে পরিগৃহীত হইয়াছে। এই বাদত্রয়ের একটা সামঞ্জস্যের আভাসও পুরাণে পাওয়া যায়। যথা বিষ্ণুপুরাণে আছে,—

"যদা স পাদপদ্মাভ্যাং পস্পর্শেমাং বসুন্ধরাম্।
তাবৎ পৃথ্বীপরিষঙ্গে সমর্থো নাভবৎ কলিঃ॥"[৩৭]

ভাগবতে সেই কথার প্রতিধ্বনি হইয়াছে,—

"যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাসে রমাপতিঃ।
তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরিক্রান্তুং ন চাশকৎ॥[৩৮]

তথায় আরও স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে (১।১৮।৫)—

"তাবৎ কলির্ন প্রভবেৎ প্রবিষ্টোঽপীহ সর্ব্বতঃ।" ইত্যাদি

এই মতে কৃষ্ণ সশরীরে বর্ত্তমান থাকিতেও কলিকাল ছিল বটে। কিন্তু তখন উহার কোন প্রভাব ছিল না। কৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে কলির প্রভাব বৃদ্ধি পায়; উহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়। তাই পুরাণাদিতে বলা হইয়াছে, তখন হইতেই কলির প্রারম্ভ।

৩৪। বনপর্ব, ১৭৬।৫।

৩৫। ভীষ্মপর্ব, ১০।১৫; আর দেখ, ১০।৪।

এই সামঞ্জস্য দ্বারা কলির আদি নিরূপিত হয় না। এমন কি, উহার প্রত্যাসন্ন-ফলও পাওয়া যায় না। কেন না, কলির সন্ধ্যার পরিমাণ পুরাণ ও জ্যোতিষের মতে ১০০ দিব্য বর্ষ বা ৩৬০০০সৌর সংবৎসর। কৃষ্ণের বর্ত্তমান কালে ঐ সময়ের কতটা অতীত হইয়াছিল, উল্লিখিত হয় নাই।

মহাভারতে কথিত আছে যে, দুর্য্যোধন কলির অংশ। লোকসংহার হেতুই তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"কলেরংশস্তু সংজজ্ঞে ভুবি দুর্য্যোধনো নৃপঃ।" ইত্যাদি।[৩৯]

তাঁহার জন্ম হইতে কলির আরম্ভ কি ? কিন্তু এইরূপ অনুমান করিলে অনেক অসঙ্গতি আসিয়া পড়ে।

আধুনিক মত

আধুনিক কালে কেহ কেহ অভিনব প্রকারে মহাভারত ও পুরাণের উক্তিসমূহের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এ বিষয়ের বিস্তৃত অলোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন কালে এদেশে নানা প্রকারের মহাযুগ বা চতুর্যুগ গণনার রীতি ছিল। যথা—চার বছরে যুগ, পাঁচ বছরে যুগ, বার হাজার বছরের মহাযুগ। এ সকল বর্ষ সৌর বর্ষ। চতুর্ব্বর্ষাত্মক যুগের চারি বছর যথাক্রমে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামে অভিহিত হইত। পঞ্চবর্ষাত্মক যুগ গণনায় সত্যাদি বিভাগ হইত না। বার হাজার বছরের মহাযুগে সত্যাদি যুগের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৮০০, ৩৬০০, ২৪০০ ও ১২০০ সৌর বর্ষ। প্রত্যেক যুগে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ যথাক্রমে ৪০০, ৩০০, ২০০ ও ১০০ সৌর বর্ষ। এটাকে মধ্যম যুগ ও চার বছরের যুগকে ক্ষুদ্র যুগ বলা যাইবে। এতদ্ব্যতীত একটা বৃহৎ মহাযুগ গণনার রীতি ছিল। উহাতে কলির পরিমাণ ১২০০ দিব্য বর্ষ বা ৪৩২০০০ সৌর বর্ষ। এ সকল যুগ গণনার উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়। অধুনা যুগ বলিতে সাধারণত বৃহৎ যুগকেই বুঝায়। রায় মহাশয় বলেন, কলিযুগ সত্যই পরীক্ষিৎ হইতে আরম্ভ। তবে উহা জ্যোতিষিক কলি বা ৩১৭৯ শকপূর্বমুখ কলি নহে। ১২০০ দিব্যবর্ষাত্মক পাদৈকধর্ম্ম কলি বা বৃহৎ কলি। ভীমহনুমান্‌সংবাদোক্ত কলি ক্ষুদ্র কলি বা কলিবর্ষ। যদি বৃহৎ কলি হয়, তবে বলিতে হয়, ঐ অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত। কৃষ্ণ-বলরাম-সংবাদে কৃষ্ণের মুখে ক্ষীণধর্ম্ম কলিযুগের কথা বসাইয়া কবি আপনাকে অর্বাচীন প্রতিপন্ন করিয়াছেন। "অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োঃ" বাক্যস্থ কলি ও দ্বাপর বর্ষাত্মক। ঐ সময়ে মধ্যম দ্বাপর এবং মধ্যম কলিরও অন্তর ছিল। ইহাই রায় মহাশয়ের সুদীর্ঘ আলোচনার সারমর্ম্ম।[৪০] অপর পক্ষে, বৈদ্য বলেন, চার বছরে মহাযুগ-গণনা রীতি মহাভারতে বস্তুত নাই। কোন কোন বচন হইতে আপাতদৃষ্টিতে আছে বলিয়া মনে হয় বটে। কিন্তু তিনি দেখাইয়াছেন, সূক্ষ্ম বিচার করিলে ঐ অনুমান নির্ম্মূল প্রমাণিত

৩৯। 'আদিপর্ব', ৬৭।৮৭। পরমর্ষি ব্যাসও ধৃতরাষ্ট্রকে এরূপ বলিয়াছিলেন। স্ত্রীপর্ব্ব, ৮।২৭

হয়।[৪১] আপন কল্পনার সঙ্গে যাহার সঙ্গতি হয় না, তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিলে কোন বাস্তব সামঞ্জস্য হয় না। বিশেষ হেতু ব্যতীত প্রক্ষিপ্ত বলিলে মহা অনর্থের সৃষ্টি হয়। ধর্ম্মক্ষীণতার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকায় নিশ্চিত হয় যে, হনুমান্, অশ্বত্থামা, ব্যাস ও কৃষ্ণ-কথিত কলি বৃহৎ কলিই। কেহ কেহ মনে করেন যে, ভারতযুদ্ধ শেষ হইবার দেড় মাস পরে কলিযুগ আরম্ভ হয়[৪২]। মহাভারতের কৃষ্ণোক্তির সহিত ইহার বিরোধ হয়।

জ্যোতিষে পৌরাণিক প্রভাব

পৌরাণিক কলিকালের প্রারম্ভ এবং জ্যোতিষিক কল্যব্দের প্রারম্ভ অভিন্ন কি না, সন্দেহ। অপর কথায়, কুরুক্ষেত্র-মহাসমর কিম্বা কৃষ্ণের দেহত্যাগ ও পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান ৩১৭৫ শালিবাহনশকপূর্ব্বাব্দে (বা ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে) ঘটিয়াছিল কি না, সন্দেহ। ঐ যুদ্ধ বস্তুত কবে ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নানা মত আছে। অধিকাংশ আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে উহা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৫শ হইতে ১৩শ শতকের ঘটনা। কেহ কেহ ত উহাকে আরও পরেকার বলিয়াও প্রচার করিয়াছেন। সে বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আমাদের পক্ষে বর্ত্তমানে নিষ্প্রয়োজন। আমরা প্রসঙ্গক্রমে যথাপ্রয়োজন কোন কোন প্রাচীন মতের উল্লেখ করিব। তৎপূর্বে প্রদর্শন করিব যে, পূর্বোক্ত পৌরাণিক মতের প্রভাব জ্যোতিষশাস্ত্রের উপরও পড়িয়াছে। কোন কোন হিন্দু জ্যোতিষী স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন, কুরুক্ষেত্র-মহাযুদ্ধের সময় হইতেই কলিযুগের আরম্ভ। যথা, আচার্য্য (দ্বিতীয়) আর্য্যভট (৪২১ শক) লিখিয়াছেন,—

"কাহো মনবো ঢ মনুযুগ শ্‌খ গতাস্তে চ মনুযুগ ছ্‌না চ।
কল্পাদের্যুগপাদা গ চ গুরুদিবসাৎ ভারতাৎ পূর্বম্॥"[৪৩]

'ব্রহ্মার এক দিনে ১৪ মন্বন্তর এবং এক মন্বন্তরে ৭২ মহাযুগ। কল্পের আদি হইতে ৬ মন্বন্তর অতীত হইয়াছে। সপ্তম মনুর ২৭ মহাযুগও গিয়াছে। বর্ত্তমান মহাযুগের তিন পাদ ভারত পর্য্যন্ত, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত গিয়াছে।' সেইরূপ আচার্য্য শ্রীপতি (৯৬১ শক) বলেন,—

"বর্ত্তমানে কদিনে মনবঃ ষট্ সপ্তমস্য চতুর্যুগসংখ্যা।
ভৈর্মিতাহস্তু চ যুগত্রয়মব্দ্ ভারতাদ্ গুরুদিনাচ্চ গতং প্রাক্॥"[৪৪]

এই দুই স্থলে 'ভারত' শব্দে 'ভারতযুদ্ধ' গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু সূর্য্যদেব যজ্বাপ্রমুখ টীকাকারগণ বলেন, ভারতবংশজাত যুধিষ্ঠিরাদিই ভারত। তাঁহাদিগকে উপলক্ষণ করত দ্বাপরের শেষ গুরুদিবসকেই ভারতগুরুদিবস বলা হইয়াছে। ঐ দিনে যুধিষ্ঠিরাদি রাজ্য পরিত্যাগ করতঃ মহাপ্রস্থান করেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে[৪৫]।

৪১। 'হিন্দী মহাভারত মীমাংসা', ৪২৬ পৃষ্ঠা। ৪২। শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, 'যুধিষ্ঠিরের সময়' প্রবন্ধ।

৪৩। 'আর্য্যভটীয়', ১।৩। ৪৪। 'সিদ্ধান্তশেখর', ১।২৩।

৪৫। "ভরতবংশজাতা যুধিষ্ঠিরাদয়ো ভারতাঃ তৈরুপলক্ষিতত্বাৎ দ্বাপরান্তিমো গুরুদিবসো ভারতগুরু-

ভরতবংশজ বলিলে একমাত্র পাণ্ডবগণকে বুঝাইবে কেন? আসল কথা, পৌরাণিক প্রসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া ঐ প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। 'ভারত' অর্থে 'ভারতযুদ্ধ' ধরিলে কল্যব্দের আরম্ভ সম্বন্ধে মহাভারতোক্ত মতবাদের সহিত সামঞ্জস্য হয়।

কালিদাস গণক (১১ শকপ্রায়) লিখিয়াছেন,—

"যুধিষ্ঠিরাব্দে বেগযুগাম্বরাগ্নয় (৩০৪৪) কলম্ববিশ্বে (১৩৫)২ ভ্রথথাষ্টভূময়ঃ (১৮০০০) ততোঽযুতং লক্ষচতুষ্টয়ং ক্রমাৎ ধরাদৃগষ্টা (৮২১)বিতি শাকবৎসরাঃ ॥"[৪৬]

সুতরাং যুধিষ্ঠিরাব্দের ৩০৪৪ + ১৩৫ বা ৩১৭৯ বর্ষ গতে শালিবাহনাব্দের আরম্ভ। অতএব এই মতে কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দ অভিন্ন দেখা যায়।

জ্যোতিষিক কল্যব্দের প্রচার

কালক্রমে পুরাণ-প্রভাবিত জ্যোতিষিক কল্যব্দই সর্বত্র প্রচলিত হয়। অপর কথায়, কল্যব্দ বলিলে লোকে ৩১৭৯ শকপূর্বাব্দমুখ কলিকেই বুঝিয়া থাকে; এবং ঐ সময়েই ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল কিম্বা যুধিষ্ঠিরাদি মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন মনে করিয়া থাকে।

চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর এক শিলালেখে এক মন্দির নির্ম্মাণের তারিখ আছে।[৪৭]

ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সপ্তাব্দশতযুক্তেষু শ (? গ)তেষব্দেষু পঞ্চসু ॥
পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্‌সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাং ॥"

ইহাতে স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে যে, ভারতযুদ্ধ হইতেই কলিকাল আরম্ভ হয়। এবং ভারতযুদ্ধ হইতে ৩০ + ৩০০০ + ৭০০ + ৫ = শকাব্দ হইতে ৫০ + ৬ + ৫০০ — সুতরাং শকাব্দের ৩১৭৯ বৎসর পূর্বেই ভারতযুদ্ধ হয় এবং তখন হইতেই কল্যব্দ আরম্ভ হয়।[৪৮]

'কলিযুগরাজবৃত্তান্তে' উক্ত আছে,—

"পঞ্চবিংশতিবর্ষেষু প্রযাতেষু কলৌ যুগে।
যুধিষ্ঠিরজ্ঞাপনার্থে লৌকিকোঽব্দঃ প্রবর্তিতঃ ॥"[৪৯]

৪৬। 'জ্যোতির্বিদাভরণ', ১০।১১১

৪৭। *Epigraphia Indica*, III, P.P. 7.

৪৮। এই সম্বন্ধে নরসিংহ স্বামি-লিখিত "The Kaliyuga, Yudhisthira and Bharatayuddha Eras" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (*Indian Antiquary*, XL, pp. 162—)

নরসিংহ স্বামী লিখিয়াছেন, যুধিষ্ঠির ১৫ বৎসর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাধীনে থাকিয়া এবং ৩৬ বৎসর স্বতন্ত্রভাবে মোট ৫১ বৎসর রাজত্ব করেন। অতঃপর কৃষ্ণের দেহত্যাগের সমাচার পাইয়া মহাপ্রস্থান করেন। এ কথা সত্য নহে।

৪৯। 'কলিযুগরাজবৃত্তান্ত', ৩য় ভাগ, ৩য় অধ্যায়। এই গ্রন্থ আমরা দেখি নাই। অপরের গ্রন্থে

'কলিযুগের ২৫ বৎসর গতে যুধিষ্ঠিরের স্মৃত্যর্থ লৌকিকাব্দ প্রবর্তিত হয়।' এটা কোন্ কলি? জ্যোতিষিক কলি, না পৌরাণিক কলি, না মহাভারতের কলি? যুধিষ্ঠিরের স্মৃতিরক্ষার্থ প্রচলিত অব্দ তাঁহার তিরোধানের কিছু কাল পরে আরম্ভ হইয়াছিল, এরূপ কল্পনা সমীচীন নহে। তাই বলিতে হয় যে, উহার অব্যবহিত পরে বা তৎপূর্বে উহা প্রবর্তিত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরে রাজ্যাভিষেক, অশ্বমেধমহাযজ্ঞানুষ্ঠান, মাতৃশোক, কৃষ্ণশোক, মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ ব্যতীত যুধিষ্ঠিরের জীবনের অপর কোন বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ মহাভারতাদিতে পাওয়া যায় না। যুদ্ধের পর ছয় মাসের মধ্যে যুধিষ্ঠির রাজা হন। তাহার স্বল্পকাল পরে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। যুদ্ধের ১৮ বৎসর পরে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী এবং ৩৬ বৎসরে কৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। উহার অল্প কাল পরে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করেন। সুতরাং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হইতে ২৫ বৎসরে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই, যাহার স্মৃত্যর্থ একটা নূতন অব্দ প্রবর্তিত হইয়াছিল মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং ঐ বচনোক্ত কলি 'মহাভারতে'র কলি নহে।

যদি পৌরাণিক কলি হয়, বলিতে হয়, মহাপ্রস্থানের ২৫ বৎসর পরে যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করেন; উহারই স্মৃত্যর্থ লৌকিকাব্দ প্রবর্তিত হয়। আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি,[৫০] মহাপ্রস্থানের দীর্ঘ কাল পরে স্বর্গারোহণ ঘটে। ঐ কাল ২৫ বৎসর হওয়া অসম্ভব নহে। যদি প্রকৃত পক্ষে তাহাই হয়, তবে উক্ত বচনের কলি পৌরাণিক কলি।

যাহা হউক, এ সকল কল্পনা মাত্র। কারণ, অন্য প্রকারে প্রমাণিত হয় যে, উহা জ্যোতিষিক কলি। লৌকিকাব্দ বিশেষ ভাবে কাশ্মীরেই প্রচলিত। সুতরাং তথা হইতেই প্রমাণ সংগ্রহ করা উচিত। স্বকৃত 'ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা-বিবৃতি-বিমর্শিনী' বা 'বৃহতী-বিমর্শিনী'র অন্তে কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ দর্শনাচার্য্য অভিনবগুপ্ত উহার রচনা-কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"ইতি নবতিতমেঽস্মিন্ বৎসরেঽন্ত্যে যুগাংশে
তিথিশশিজলধিস্থে মার্গশীর্ষাবসানে।
জগতি বিহিতবোধাং ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাং
ব্যবৃনুত পরিপূর্ণাং প্রেরিতঃ শম্ভুপাদৈঃ॥"

এখানে ৪০৯০ সপ্তর্ষিসম্বৎ বা লৌকিকাব্দকেই 'নবতিতম' বৎসর বলা হইয়াছে। তাহাতে পাওয়া যায়—

(১) ৪০৯০ লৌকিকাব্দ = ৪১১৫ কল্যব্দ

সুতরাং এই কল্যব্দ এবং 'কলিযুগরাজবৃত্তান্তে' উক্ত কল্যব্দ অভিন্ন। কহ্লন পণ্ডিত লিখিয়াছেন,—

"লৌকিকাব্দে চতুর্বিংশে শককালস্য সাম্প্রতম্।
সপ্তত্যভ্যধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরাঃ ॥"[৫১]

তাহা হইতে পাওয়া যায়,—

(২) ৪২২৪ লৌকিকাব্দ=১০৭০ শককাল

(১) ও (২) হইতে আমরা পাই—

৪২৪৯ কল্যব্দ=৪২২৪ লৌকিকাব্দ=১০৭০ শকাব্দ

সুতরাং ঐ কল্যব্দের প্রারম্ভ শকাব্দের ৩১৭৯ বৎসর পূর্বে। অতএব উহা জ্যোতিষিক কল্যব্দ।

অনর্থের উৎপত্তি

কলিকালের প্রারম্ভ সম্বন্ধে জ্যোতিষিক ও পৌরাণিক প্রবাদের সংমিশ্রণের ফলে বড় অনর্থের উদ্ভব হইয়াছে। তাহাতে আচার্য্য বরাহমিহিরের সময় সম্বন্ধে একটা অযথা সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা ক্রমে তাহা প্রদর্শন করিব। বরাহমিহির-বিরচিত 'বৃহৎসংহিতা'য় কথিত আছে,—

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ ॥"[৫২]

নৃপতি যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসনকালে সপ্তর্ষিগণ মঘায় ছিলেন। শককালের সহিত "ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বি" যোগ করিলে ঐ রাজার সময় পাওয়া যায়।[৫৩] এই বচনটি নাকি 'গর্গসংহিতা'র। বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় উহার অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র। বরাহের উক্তি ("কথয়িষ্যে বৃদ্ধগর্গমতাৎ") হইতে বুঝা যায়, বৃদ্ধগর্গের মতানুসারে তিনি ঐ প্রকার বলিয়াছেন। কহ্লন পণ্ডিতও (১০৭০ শক) স্বপ্রণীত 'রাজতরঙ্গিণী'তে উহাকে ধরিয়াছেন।[৫৪] ঐ মতে পাওয়া যায়, "শককালে"র "ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বি" বৎসর পূর্বে যুধিষ্ঠির জীবিত ছিলেন। উহা যে কোন্ "শককাল", তাহা বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হয় নাই। তাহাতেই শঙ্কা উৎপত্তির অবকাশ হইয়াছে।

কহ্লন মনে করেন, গর্গোক্ত "শককাল" শালিবাহন-শকই ; "ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বি"=২৬২৫। তাই তিনি লিখিয়াছেন, কুরুপাণ্ডবগণ ৬৫৩ (=৩১৭৯—২৫২৬) কল্যব্দে (জ্যোতিষিক) বর্ত্তমান ছিলেন।

৫১। 'রাজতরঙ্গিণী', ১।৫২। ৫২। 'বৃহৎসংহিতা', ১৩।৩।

৫৩। 'ঐ রাজার সময়' বাক্যের তাৎপর্য্য কি, চিন্তনীয়। ঐ সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন, এই সাধারণ অর্থেই উহাকে গ্রহণ করিতে হইবে? না কি 'যুধিষ্ঠিরাব্দই' উহার বিবক্ষিত মর্ম্ম? এই শেষোক্ত অর্থে গ্রহণ করিলে বুঝিতে হয় যে, শকাব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দের অন্তর নির্দেশ করাই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের উদ্দেশ্য।

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভূবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥"[৫৫]

যাঁহারা মনে করেন যে, কুরুপাণ্ডবগণ "দ্বাপরান্তে" (দ্বাপরের শেষ ভাগে বা কলির প্রারম্ভে) বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদিগকে কহ্লন মোহগ্রস্ত ও মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন।

"ভারতং দ্বাপরান্তেঽভূদ্বার্ত্তয়েতি বিমোহিতাঃ।
কেচিদেতাং মৃষা তেষাং কালসংখ্যা প্রচক্রিরে॥"[৫৬]

এইরূপে দেখা যায়, গর্গোক্তির সার্থক্য রক্ষার জন্য কহ্লন পণ্ডিত মহাভারতপুরাণ-পন্থীদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। কল্যব্দের আদি সম্বন্ধে তিনি জ্যোতিষিক মত অঙ্গীকার করিয়াছেন।

শাক্যকালবাদ

পৌরাণিক মতবাদের সঙ্গে কঠোর বিরোধ হয় বলিয়া কেহ কেহ কহ্লনের ব্যাখ্যা সঙ্গত মনে করেন না। তাঁহারা উক্ত বচনের ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের প্রায় সকলেই কহ্লনের ন্যায় মনে করেন যে, কল্যব্দের আরম্ভ শালিবাহন-শকের ৩১৭৯ বৎসর পূর্বে। তবে কহ্লন গর্গবরাহোক্ত শককালকে শালিবাহন-শককাল ধরিয়া যুধিষ্ঠিরের সময় এ দিকে, ৬৫৩ কল্যব্দে টানিয়া আনিয়াছেন। আর ইহাঁরা ঐ শককালকে শাক্যকাল গ্রহণ করতঃ উহার আদি শালিবাহন-শকারম্ভের পূর্বে ঠেলিয়া নিয়াছেন। তাঁহারা উহাকে বরাহমিহিরের বচন বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই বলেন, বরাহ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত শাককাল শাক্যকালই।

রামপ্রসাদ বলেন,[৫৭] বরাহমিহির কর্ত্তৃক ব্যবহৃত শককাল বস্তুত শাক্যকাল। উহা শালিবাহন-শকাব্দ এবং বিক্রমশকাব্দ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। উহার আরম্ভ ৬২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, শাক্যমুনি গৌতমের জন্মদিনে। তাঁহার মতে, কুরুক্ষেত্র-মহাসমর ৩১৩৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সংঘটিত হয়।

গোপাল আয়ার মনে করেন,[৫৮] গর্গবচনের প্রচলিত পাঠ ভুল। উহাতে 'শককাল' স্থলে 'শাক্যকাল' পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে। উহার আরম্ভ ৫৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, শাক্যমুনি গৌতমের মহাপরিনির্বাণের দিনে। তাঁহার মতে 'ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিক' = ২৬ × ২৫ = ৬৫০। সুতরাং যুধিষ্ঠির ৬৫০ + ৫৪৩ অর্থাৎ ১১৯৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জীবিত ছিলেন। অতএব কল্যব্দের প্রারম্ভ ১১৭৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

৫৫। ঐ, ১।৫১, ৫৬। ঐ, ১।৪৫

৫৭। Rama Prasad, "The Date of the Bhagavad Gita," *Theosophist*, 1908, pp. 512, 619, 708.

অধ্যাপক রামদেব লিখিয়াছেন,[৫৯] গর্গোক্ত শককাল শাক্যসিংহ বা শকসিংহ গৌতমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাল। গৌতমের ৫০ বৎসর বয়ঃকালে উহা প্রবর্তিত হয়। গৌতমের জন্ম শালিবাহনাব্দের ৭০১ (= খ্রীষ্টাব্দের ৬২৩) বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। অতএব ৬২৩ – ৪৯ = ৫৭৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ঐ শককাল প্রচলিত হয়। পরে তিনি এই মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করেন। তখন লিখেন,[৬০] শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের পর যুধিষ্ঠিরের দেহান্ত হয়। ঐ সময় হইতেই কলিযুগের আরম্ভ। উহা ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ঘটে। বরাহমিহিরের মতে যুধিষ্ঠিরের মৃত্যুর ২৫২৬ বর্ষ পরে শককাল আরম্ভ হয়। সুতরাং শককালের প্রারম্ভ ৩১০২ – ২৫২৬ বা ৫৭৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়[৬১] গোপাল আয়ারের ন্যায়, মনে করেন যে, গর্গ-বরাহ-মিহির-ব্যবহৃত শককাল প্রকৃত পক্ষে শাক্য বা বুদ্ধকাল এবং বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দিন হইতেই উহার প্রারম্ভ। কিন্তু তন্মতে উহার আদি ৫৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং "ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বি" = ২৫৫৬। তাহাতে যুধিষ্ঠিরের কাল ২৫৫৬ + ৫৪৬ বা ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হয়। এই প্রকারে কল্যব্দের আদি এবং যুধিষ্ঠিরের সময় সম্বন্ধে পৌরাণিক প্রবাদের সঙ্গে ঐ গর্গ-বরাহ-বচনের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়।

পারস্যশককালবাদ

নারায়ণ শাস্ত্রী বলেন,[৬২] বরাহমিহিরধৃত গর্গবচনোক্ত শককালের আরম্ভ ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। কলিযুগের প্রারম্ভ ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তাহার ২৬ বৎসর পরে ৩০৭৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, লৌকিকাব্দ বা সপ্তর্ষিকালের আদিতে, যুধিষ্ঠির দেহত্যাগ করেন। গর্গ-বচনের মতে শককালের সহিত ২৫২৬ যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরের সময় পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ শককালের আদি নিশ্চয়ই ৩০৭৬—২৫২৬ বা ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এইরূপে নারায়ণ শাস্ত্রী মনে করেন যে, হিন্দুজ্যোতিষে ব্যবহৃত শককালের আদি ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তিনি বলেন, ঐ শকের প্রবর্ত্তক সুপ্রসিদ্ধ পারস্যরাজ সাইরস। গ্রীক ইতিবৃত্তলেখক হেরোদোতাস ও জেনোফনের বিবৃতি হইতে জানা যায়, ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বীর সাইরস মিডিয়া দেশকে পরাস্ত করতঃ পারস্য সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনা করেন। পারস্যের ইতিহাসে উহা নবযুগের সূচনা করে। উহার স্মৃতিরক্ষার্থ সাইরস এক নবীন সংবৎ প্রবর্ত্তন করেন। ঐ সংবৎ হিন্দুস্থানেও প্রচলিত হয়। এবং উহাই কালক্রমে হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৫৯। শ্রীরামদেব প্রণীত 'ভারতবর্ষ কা ইতিহাস,' প্রথম খণ্ড, ১৯৬৮ বিক্রমসম্বৎ, ৩৫৮ পৃষ্ঠা।

৬০। 'ভারতবর্ষ কা ইতিহাস', তৃতীয় খণ্ড, শ্রীরামদেব ও শ্রীসত্যকেতু বিদ্যালঙ্কার প্রণীত, ১৯৯০ সম্বৎ, ১৩ পৃষ্ঠা।

৬১। D. N. Mukhopadhyaya, "Gupta Era," *Indian Historical Quarterly*, VIII (1932), pp. 88 ff.

৬২। T. S. Narayana Sastri, *The Age of Sankara*, Part I—A, Madras, 1916,

হিন্দুগণ পারস্তসংবৎ কেন গ্রহণ করিলেন, তাহার একটা হেতুও নারায়ণ শাস্ত্রী প্রদর্শন করিয়াছেন। সিন্ধুদেশের রাজা ঐ যুদ্ধে সাইরসের বিশেষ সহায়তা করেন; বস্তুত তাঁহার সাহায্যেই সাইরসের বিজয় হয়। গ্রীক ইতিবৃত্তলেখকগণ তাহা লিখিয়াছেন। সেই হেতু ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দকে পারস্তবাসীদিগের ন্যায় সিন্ধুদেশবাসীরাও গৌরবের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সাইরস-প্রবর্ত্তিত নবীন অব্দের ব্যবহার করিতে লাগিলেন। পারস্ত দেশের উত্তরভাগস্থ শকাই প্রদেশ = (সংস্কৃত শাকদ্বীপ) হইতে সাইরসের অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল। সেই হেতু সিন্ধিগণ তাঁহাকে শক বলিতেন এবং তৎকর্ত্তৃক প্রবর্তিত অব্দকে শকাব্দ নামে অভিহিত করেন। ঐ শকাব্দই কালক্রমে সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রচলিত হয়।

হিন্দুজ্যোতিঃশাস্ত্রে ব্যবহৃত শককাল যে, পারস্ত শককাল, শালিবাহনশকাব্দ নহে, তাহার সমর্থনার্থ নারায়ণ শাস্ত্রী নিম্নলিখিত যুক্তি দিয়াছেন।

(১) শককাল হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্রে 'শকভূপকাল', 'শকেন্দ্রকাল', 'শকনৃপতিকাল' প্রভৃতি নামেও অভিহিত ইহয়া থাকে। তাহাতে বুঝা যায়, উহার প্রবর্ত্তক কোন শকরাজা। বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন শকদিগকে যুদ্ধে পরাজয় ও হত্যা করেন। সেই হেতু তাঁহারা 'শকারি' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগের দ্বারা প্রবর্তিত অব্দকে 'শকনৃপকাল' ইত্যাদি বলা যাইতে পারে না।

(২) উৎপল ভট্ট লিখিয়াছেন, ৮৮৮ শাকের চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী, বৃহস্পতি বারে তিনি 'বৃহজ্জাতকবিবৃতি' প্রণয়ন করেন।

"চৈত্রমাসস্থ পঞ্চম্যাং সিতায়াং গুরুবাসরে।
বস্বষ্টবস্থমিতে শাকে কৃতেয়ং বিবৃতির্ময়া॥"

৮৮৮ শাক = ৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিলেই যথোক্ত বার ও তিথি ঠিক ঠিক পাওয়া যায়। ৮৮৮ শালিবাহনশকাব্দের (= ৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের) চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি বৃহস্পতি বারে নহে। সেই হেতু সুধাকর দ্বিবেদী[৬৩] উৎপলের শ্লোকের পাঠ নিম্নপ্রকারে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন ;—

"ফাল্গুনস্থ দ্বিতীয়ায়ামসিতায়াং গুরোর্দিনে।
বস্বষ্টবস্থমিতে শাকে কৃতেয়ং বিবৃতির্ময়া॥"

এই পরিবর্ত্তন ন্যায্য নহে। উৎপল ভট্টের মূল উক্তি হইতে সিদ্ধ হয় যে, তাহাতে ব্যবহৃত শাক শালিবাহনশাক নহে। উহার আদি ৮৮৮ − ৩৩৮ বা ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

(৩) স্বকৃত 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'র উপসংহারে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, ১০৩৬ 'শকনৃপকালে' তাঁহার জন্ম এবং ৩৬ বৎসর বয়সে তিনি ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ 'শকনৃপকাল'কে শালিবাহনশককাল ধরিলে ভাস্করাচার্য্য বিখ্যাত পারসী পর্য্যটক

৬৩। সুধাকর দ্বিবেদিকৃত 'গণকতরঙ্গিণী', কাশী, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ, ২২ পৃষ্ঠা।

অল্‌বিরুনির পরবর্ত্তী কালে আসিয়া পড়েন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কেন না, ৯৫২ শাকে রচিত অল্‌বিরুনির 'ভারতবিবরণ' গ্রন্থে ভাস্করাচার্য্যের নামোল্লেখ আছে। বেবরের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা কথিত আছে।

(৪) চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর ঐহোল শিলালেখে আছে,—

"ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সহাব্দশতযুক্তেষু শতেষব্দেষু পঞ্চসু॥
পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্‌সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম্॥"

ইহাতে পাওয়া যায়,—

৩১৩৫ ভারতযুদ্ধাব্দ = ৫৫৬ শকনৃপকাল

৩১৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হয়। সুতরাং ৩১৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভারতযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৩১৪০ – ৩১৩৫ = ৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। শকাব্দের আরম্ভ ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ধরিলে ৫৫৬ – ৫৫০ = ৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (?)। বৎসরারম্ভের পার্থক্য হেতুই এখানে ১ বৎসরের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। সুতরাং তাহা ধর্ত্তব্য নহে। এইরূপে উক্ত শিলালেখ হইতে সিদ্ধ হয় যে, তত্রস্থ শকাব্দের প্রারম্ভ ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। ঐ পূর্বোক্ত শিলালেখের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির পাঠ সম্বন্ধে মতান্তর দৃষ্ট হয়। কাহারও কাহারও মতে উহার পাঠ এই,—

"সপ্তাব্দশতযুক্তেষু গতেষব্দেষু পঞ্চসু।"

এই পাঠানুসারে—

৩৭৩৫ ভারতযুদ্ধাব্দ = ৫৫৬ শকাব্দ

সুতরাং ভারতযুদ্ধের ৩১৭৯ (= ৩৭৩৫ – ৫৫৬) বৎসর পরে ঐ শকাব্দের আরম্ভ। সুতরাং উহা শালিবাহনশকাব্দই। শিলালেখোক্ত শকাব্দকে শালিবাহনশকাব্দ বলিয়া প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়েই শাস্ত্রীজী বলেন, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এই পাঠপরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। তৎপূর্বে সকলে "সহাব্দশতযুক্তেষু" ইত্যাদি পাঠই স্বীকার করিতেন।

বরাহমিহিরের কাল সম্বন্ধে জল্পনা

আচার্য্য বরাহমিহিরের কাল সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বাদিগণ নানাপ্রকার জল্পনা করিয়াছেন। তৎকৃত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় রোমকসিদ্ধান্ত মতে অহর্গন আনয়নেব বিধি বর্ণিত হইয়াছে[৬৪]। উহাতে গৃহীত করণাব্দ ৪২৭ "শককাল"। উহাকে সাধারণে পঞ্চসিদ্ধান্তিকার করণাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ শককালকে শাক্যকাল মনে করিয়া পূর্বোক্ত বাদিগণ অনুমান করেন যে, বরাহমিহির ১১৬ (গোপাল আয়ার), ১১৯ (ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) বা ১২৩ (নারায়ণ শাস্ত্রী) খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরাজ লিখিয়াছেন—

"নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যো দিবং গতঃ"[৬৫]

'আচার্য্য বরাহমিহির ৫০৯ শাকে স্বর্গগমন করেন।' সুতরাং তিনি ৩৪, ৩৭ বা ৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। একটা প্রাচীন কিম্বদন্তী আছে যে, তিনি উজ্জয়িনীর সুবিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নব রত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন। ঐ বিক্রমাদিত্য শালিবাহনশকের ১৩৫ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। পূর্বোক্ত বাদিগণ বলেন, তাঁহাদিগের মতবাদ অনুসারেই ঐ কিম্বদন্তীর সত্যতা রক্ষিত হইতে পারে। অন্যথা উহাকে অমূলক বলিতে হয়।

রামপ্রসাদের মতবাদানুসারে, ১১৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং রামদেবের মতে, ৬৫ কি ৬৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আচার্য্য বরাহমিহিরের মৃত্যু হয়।

শাক্যকালবাদে দোষারোপ—বুদ্ধনির্বাণকাল

বরাহমিহির কর্ত্তৃক ব্যবহৃত 'শককালে'র (বা শাক্যকালের) আদি সম্বন্ধে সকল শাক্যকালবাদিগণ একমত নহেন। আমরা দেখিয়াছি, উহার আরম্ভ কাহারও মতে ভগবান্ বুদ্ধদেবের জন্মদিনে, ৬২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (রামপ্রসাদ); কাহারও মতে তাঁহার মহানির্বাণের দিনে, ৫৪৩ (গোপাল আয়ার) বা ৫৪৬ (ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। আবার কাহারও মতে তাঁহার ৫০ কি ৫২ বর্ষ বয়সে, ৫৭৪ কি ৫৭৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উহা প্রবর্ত্তিত হয় (রামদেব)। ঐ সকল বাদের সত্যাসত্য পরীক্ষার জন্য বুদ্ধদেবের সময় সঠিক জ্ঞাত হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্ত্য প্রাচ্যবিদ্‌গণ বুদ্ধের নির্বাণকাল সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা কোন নির্ব্বিবাদ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের বিভিন্ন জনে বিভিন্ন তারিখ পাইয়াছেন। যথা, খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৪৭৭, ৪৮০, ৪৮৩, ৪৮৬, ৪৮৮, ৪৮৯, ইত্যাদি।

কানিংহামের বিচারে ৪৭৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বুদ্ধ নির্বানলাভ করেন। গয়ায় প্রাপ্ত একটা শিলালেখে উহার লিপিকাল নিম্নপ্রকারে নিবদ্ধ হইয়াছে।

"ভগবতি পরিনির্বৃত্তে সংবৎ ১৮১৯ কার্ত্তিক বদি ১ বুধি" ইত্যাদি।[৬৬]

কানিংহাম গণনা করিয়া বলেন যে, ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবারে ঐ শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তাহাতে পাওয়া যায়, বুদ্ধের নির্ব্বাণ ৪৭৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে হইয়াছিল। এইরূপে কানিংহাম মনে করেন যে, ঐ শিলালিপি তৎকর্ত্তৃক অপর উপায়ে নিরূপিত বুদ্ধনির্বাণকালের সমর্থন করে। সুব্বা রাও,[৬৭] কানিংহামের গণনার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

৬৫। 'খণ্ডখাদ্যক' আমরাজকৃত টীকা সহ, পণ্ডিত শ্রীববুয়া মিশ্র জ্যোতিষাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯১৫, ১০৯ পৃষ্ঠা।

৬৬। A. Cunningham, *Corpus Inscriptionum Indicarum*, 1, PP. 20-3.

তিনি দেখাইয়াছেন যে, ঐ শিলালিপি সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসে উক্ত বুদ্ধনির্বাণকালের সমর্থন করে। ঐ ইতিহাসের মতে বুদ্ধের পরিনির্বাণকাল খৃষ্টাব্দের ৫৪৩ বৎসর পূর্বে।

কোন কোন প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধের জীবনের মুখ্য ঘটনাবলীর বার ও তিথি এবং সে সময়ে তাঁহার বয়স লিপিবদ্ধ আছে। বিশপ বিগন্দেৎ-রচিত 'গৌতমের জীবনী'তে উহাদের অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। সে সকলের ভিত্তিতে গণনা করিয়া স্বামী কন্নুপিল্ল্য নির্ণয় করেন যে, একমাত্র ৪৭৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে নির্ব্বাণ ধরিলেই জ্যোতিষিক গণনায় উহাদের সামঞ্জস্য হয়। অন্য কোন অব্দে নির্ব্বাণ ধরিলে ঐগুলি মোটেই মিলে না[৬৮]। বুদ্ধের নির্বাণকাল সম্বন্ধে অন্য যতগুলি মত প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রত্যেকটির বিচার করত পিল্ল্য মহাশয় জোর করিয়াই বলিয়াছেন, বুদ্ধের নির্বাণ ৪৭৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে ব্যতীত অপর কোন বৎসরে হইতেই পারে না।

পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য পিল্ল্য[৬৯] এ বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাসে বিবৃত আছে যে, গৌতম বুদ্ধ ৬৮ ঈশান শগের বৈশাখী পূর্ণিমায় শুক্রবারে জন্মগ্রহণ করেন; ৯৬ ঈশান শগে, বৈশাখী পূর্ণিমায়, শুক্রবারে, ২৯ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন; ১০৩ ঈশান শগে বৈশাখী পূর্ণিমায় বুধবারে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন; ১০৭ ঈশান শগে, আদি পূর্ণিমায়, শনিবারে, সূর্য্যোদয়সময়ে, তাঁহার পিতা দেহত্যাগ করেন; ১৪৮ ঈশান শগে, বৈশাখী পূর্ণিমায়, মঙ্গলবারে, তিনি নির্বাণলাভ করেন। এই সকল তিথি বারের কতকগুলি 'শিলপথিকরম্' নামক প্রাচীন তামিল গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ ঈশান শগের প্রারম্ভকাল তথায় বিবৃত হয় নাই। ঐ সকল জ্যোতিষিক ঘটনার আধারে গণনা করিয়া সুব্রহ্মণ্য পিল্ল্য নির্ণয় করেন যে, ঈশান শগের আদি ৬৪১ খৃষ্টপূর্বাব্দে। সুতরাং ভগবান্ বুদ্ধের জন্ম ৫৭৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে, গৃহত্যাগ ৫৪৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে, বুদ্ধত্বলাভ ৫৩৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে, পিতার মৃত্যু ৫৩৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং নির্বাণলাভ ৪৯৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তিনি বলেন, একমাত্র ৪৯৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ব্যতীত ৬০০ হইতে ১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের অন্তর্ব্বর্ত্তী অপর কোন অব্দে বুদ্ধের নির্বাণ হইয়াছিল ধরিলে পূর্বোক্ত সমস্ত তিথি ও বারের সমন্বয় পাওয়া যায় না। ৪৮৩ খৃষ্টপূর্বাব্দের ২৭শে বৈশাখ এবং ৪৮৬ খৃষ্টপূর্বাব্দের ৩১শে বৈশাখ মঙ্গলবার পূর্ণিমা ছিল। সুতরাং তাহাতেও নির্বাণ-তিথি ঠিক ঠিক পাওয়া যায় বটে। কিন্তু অপর তিথি বারসমূহ মিলে না।

বুদ্ধের জন্ম এবং নির্বাণকাল সম্বন্ধে এই সকল সিদ্ধান্তের কোনটাই পূর্বোক্ত শাক্যকালবাদিগণের অনুমানসমূহের কিঞ্চিৎমাত্রও অনুকূল নহে।

৬৮। *Ind. Ant.*, *XLIII*, 1914, PP. 197—

৬৯। Pundit E. M. Subramania Pillai, "The Date of Buddha Nirvana," *Indian*

সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসের মতে বুদ্ধের নির্বাণকাল ৫৪৪ খৃষ্টপূর্বাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমা। তাহার পরের দিন হইতে বিগণিত নির্বাণাব্দের প্রচলন এক সময়ে ভারতবর্ষ, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল; দেখা যায়, সুদূর লাউ প্রদেশেও উহার ব্যবহার ছিল। পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এই তারিখ রামপ্রসাদ ও গোপাল আয়ারের মতের কতকটা অনুকূল বটে। কিন্তু হিন্দু জ্যোতিষে ব্যবহৃত শককালের আদি যে উহা হইতে পারে না, কিঞ্চিৎ পরে আমরা নিঃসংশয়রূপে তাহা প্রতিপাদন করিব।

শাক্যকালবাদিগণের কেহ কেহ মনে করেন যে, পূর্বোক্ত বরাহবচনের "ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বি" বাক্য ২৫ X ২৬ কিম্বা ২৫৫৬ সংখ্যা খ্যাপন করে। কিন্তু প্রাচীন টীকাকার উৎপল ভট্টের মতে উহা ২৫২৬ সংখ্যাবোধক।

পারস্যশককালবাদে ত্রুটি

পারস্যশককালবাদের সমর্থনে নারায়ণ শাস্ত্রী যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সকল ভ্রমাত্মক। তাঁহার গণনা মতে, উৎপল ভট্ট (৮৮৮ শাক) ৩৩৮ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। তাহা সম্ভব নহে। কেন না, উৎপল আর্য্যভট ('আর্য্যভটীয়'কার') ও ব্রহ্মগুপ্তের (জন্ম ৫২০ শক) নামোল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে বহু বচন অনুবাদ করিয়াছেন[৭০]। তিনি ব্রহ্মগুপ্তকৃত খণ্ডখাদ্যকের (রচনাকাল ৫৮৭ শক) টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং উৎপল অবশ্যই আর্য্যভট ও ব্রহ্মগুপ্তের অর্বাক্‌কালের লোক। ইহাঁদের কেহই শালিবাহন-শকের পূর্বাব্দের নহে (পরে দেখুন)। "চৈত্রমাসস্য পঞ্চম্যাং" ইত্যাদি শ্লোক উৎপলের 'বৃহজ্জাতকবিবৃতি'তে এবং "ফাল্গুনস্য দ্বিতীয়ায়াং" ইত্যাদি শ্লোক তাঁহার 'বৃহৎসংহিতা-বিবৃতি'তে পাওয়া যায়। তাহা না জানিয়া শাস্ত্রী মহাশয় সুধাকর দ্বিবেদীর প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোক দ্বিবেদীজীর মনঃকল্পিত নহে। প্রথম শ্লোকোক্ত 'শাক'কে শালিবাহনশকাব্দ বলিয়া ধরিলে বার মিলে না সত্য। তাহাতে অনুমান হয়, ঐ শ্লোকের অধুনা প্রচলিত পাঠে কিঞ্চিৎ ভুল আছে। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত বিশেষ পর্য্যালোচনা করতঃ তৎসম্বন্ধে এরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন[৭১]। শাস্ত্রীর পারস্য-শককালবাদানুসারে প্রথম শ্লোকোক্ত তিথি ও বার পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত তিথি বার পাওয়া যায় না।

অল্‌বিরুনি আচার্য্য ভাস্করের নামোল্লেখ করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। কেন না, তাঁহার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির ঐ স্থলের পাঠ ভ্রষ্ট। বেবর অতি স্পষ্টভাবে ঐরূপ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। উল্লেখ করিয়া থাকিলেও ঐ ভাস্কর "সিদ্ধান্তশিরোমণিকার" ভাস্কর হইতে ভিন্ন ব্যক্তি হইবেন। তাহাও তিনি লিখিয়াছেন। অপর একজন প্রাচীন ভাস্করের

৭০। উৎপলভট্ট-রচিত 'বৃহৎসংহিতা-বিবৃতি' দেখ।

অস্তিত্ব আমরা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছি[৭২]। যাহা হউক, অল্‌বিরুনির উক্তি লইয়া ঐ কল্পনা জল্পনা বস্তুত নির্ম্মূল। কেন না, সাকাউ কর্ত্তৃক সম্পাদিত অল্‌বিরুনির গ্রন্থে ভাস্করের নাম নাই। এই সংস্করণই এখন প্রামাণ্য বলিয়া পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃত হইয়া থাকে। পারস্য-শককালবাদ অনুসারে "সিদ্ধান্তশিরোমণি"কার ভাস্করাচার্য্যের (জন্ম ১০৩৬ "শককাল," গ্রন্থরচনাকাল ১০৭২ শক) জন্ম ৪৮৬ খৃষ্টাব্দে এবং গ্রন্থরচনা ৫২২ খৃষ্টাব্দে স্থির হয়। উহাতে তিনি আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত অপেক্ষা প্রাচীন হইয়া পড়েন। তাহা সম্ভব নহে। কারণ, ভাস্কর ব্রহ্মগুপ্তের নামোল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত তিনি স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্রহ্মগুপ্তের "ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত" অনুসারে স্বকীয় "সিদ্ধান্তশিরোমণি" রচনা করিয়াছেন। (পরে দেখুন)।

দ্বিতীয় পুলকেশীর শিলালেখ সম্বন্ধে শাস্ত্রী ভীষণ ভুল করিয়াছেন। উহার যে পাঠ তিনি প্রকৃত বলিয়া অঙ্গীকার করেন, সেই পাঠ দ্বারাও তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কারণ, তাহাতে পাওয়া যায়, ৩১৩৫ ভারতযুদ্ধাব্দ = ৫৫৬ শকনৃপকাল। তাঁহার মতে, ৩১৩৫ ভারতযুদ্ধাব্দ = ৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ। সুতরাং ৫৫৫ শকনৃপকাল = ৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। তাহাতে ঐ শককালের আদি ৫৬২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হয়। সাধারণত ভারতযুদ্ধাব্দ ও কল্যব্দের আদি অভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সে হিসাবে ঐ শকাব্দের আদি ৫২৩ খৃষ্টাব্দে হয়। অতএব কোন প্রকারের গণনাতেই ঐ শিলালেখ দ্বারা পারস্যশককালবাদ সমর্থিত হয় না। এই সহজ গণনাটি শাস্ত্রীজী কেন ধরিতে পারিলেন না, তাহাই আশ্চর্য্য মনে হয়। চীন পর্য্যটক হুয়েন-সাং ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। তখন দ্বিতীয় পুলকেশী প্রবল প্রতাপে সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। পর্য্যটক তাহা বিবৃত করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, তিনি ৬০৮—৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ছিলেন। সুতরাং তাঁহার শিলালেখোক্ত 'শকনৃপকাল'কে শালিবাহনশকাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিলেই ঐ সকল ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য হইতে পারে।

বাদদ্বয় খণ্ডন

এইরূপে শাক্যকালবাদ ও পারস্যশককালবাদের দোষ ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া, আমরা এখন সাক্ষাৎভাবেই উহাদের খণ্ডন করিব। আমরা সিদ্ধ করিব যে, হিন্দুজ্যোতিষে ব্যবহৃত শককালের আদি ৬২৩ হইতে ৫৪৩ (কি ৪৭৭) খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে হইতেই পারে না। প্রথমতঃ বৃদ্ধভাস্করাচার্য্যপ্রমুখ সকল হিন্দু জ্যোতিষিগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, কলিকালের ৩১৭৯ বৎসর গতে শককালের আরম্ভ। জ্যোতিষিক কল্যব্দের প্রারম্ভ ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। ইতিপূর্বে ঐ সকল বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং সিদ্ধ হয়, জ্যোতিষিক শককালের প্রারম্ভ ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। অতএব উহা শালিবাহনশককালই। তাহাতে কোন সন্দেহ

৭২। Bibhutibhusan Datta, "The two Bhaskaras," *Indian Historical Quarterly*

হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন, ৫৫০ শকে, ৩০ বৎসর বয়সে তিনি 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত' রচনা করেন। ঐ শকের আদি ৬২৩ হইতে ৫৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে ধরিলে বলিতে হয়, ব্রহ্মগুপ্ত শালিবাহনশকারম্ভের পূর্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে' তিনি আর্য্যভট ও তৎপ্রণীত 'দশগীতিকা' ও 'আর্য্যাষ্টশতে'র নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের প্রতি নানা দূষণ দিয়াছেন। তাঁহার নিজের উক্তি অনুসারে ঐ আর্য্যভট ৩৬০০ কল্যব্দে (= ৪২১ শালিবাহনশকাব্দে) বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটের প্রাগ্বর্ত্তী হইতে পারেন না। এ বিষয়ে অপর প্রমাণ ক্রমে প্রদর্শিত হইবে। এইরূপে দেখা যায়, শাক্যকালবাদ ও পারস্যশককালবাদের কোনটাই হিন্দু জ্যোতিষে প্রাপ্ত প্রমাণ প্রয়োগে টিকে না।

আর্য্যভট, লাটদেব ও বরাহমিহির

বরাহমিহির আর্য্যভট ও লাটদেবের নামোল্লেখ করিয়াছেন[৭৩]। সুতরাং তিনি তাঁহাদিগের সমকালীন বা অর্ব্বাক্‌কালীন, সন্দেহ নাই। পুরাকালে হিন্দুস্থানে আর্য্যভট নামে একাধিক জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। তন্মধ্যে দুই জনের রচিত গ্রন্থ বর্ত্তমানে পাওয়া যায়। 'মহাসিদ্ধান্ত'-কার আর্য্যভট ৮৭০ শকাব্দের প্রায়কালে জীবিত ছিলেন। 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভট লিখিয়াছেন, তিনি কলির "ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টিঃ" অর্থাৎ ৬০ × ৬০ = ৩৬০০ বর্ষ গতে, সুতরাং ৪২১ শালিবাহনশকাব্দে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মনে করেন, বরাহমিহিরোক্ত আর্য্যভট ইঁহাদের হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। তিনি ১১৯ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের—তন্মতে বরাহমিহিরের সময়ের পূর্ব্বেকার লোক। ঐ সময়ে আর্য্যভট নামে জনৈক জ্যোতিষীর সম্ভাবের অপর কোন প্রমাণ যদিও মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইতে পারেন নাই, কিন্তু উহাকে অসম্ভব বলা যাইতে পারে না। 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভট অপেক্ষা প্রাচীন এক আর্য্যভটের সম্ভাবের অনুমান কতিপয় হেতুতে আমরা ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে করিয়াছিলাম[৭৪]। পরে অন্য হেতু দ্বারা আমাদের ঐ অনুমান আরও দৃঢ় হইয়াছে[৭৫]। কিন্তু ঐ বৃদ্ধ আর্য্যভট ১১৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগেকার লোক কি না বলিতে পারি না। সে যাহা হউক, তথাপিও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমান সমীচীন নহে। কেন না, বরাহমিহির লাটদেবের নাম করিয়াছেন। এক লাটদেব 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভটের (৪২১ শক) শিষ্য। আমরা তাহা প্রমাণ করিয়াছি[৭৬]। তদ্ব্যতীত লাটদেব নামে অপর কোন প্রাচীন জ্যোতিষীর

৭৩। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', ১৫।২০ (আর্য্যভট); ১।৩ ও ১৫।১৮ (লাটদেব)।

৭৪। Bibhutibhusan Datta, "Two Aryabhatas of Al-Biruni," *Bull. Cal. Math. Soc., XVII*, 192‹, pp 59-74; বিশেষত ৬৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৭৫। শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, "আচার্য্য আর্য্যভট ও ভূভ্রমণবাদ," 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩৪২ বঙ্গাব্দ ১৬৭ পৃষ্ঠা।

৭৬। শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, "আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ," 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩৪০

সদ্ভাবের সন্ধান এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বলিতে হয়, বরাহোক্ত লাটদেব এবং 'আর্য্যভটীয়'কারের শিষ্য লাটদেব অভিন্ন ব্যক্তি। অতএব তদুক্ত আর্য্যভটও 'আর্য্যভটীয়'কার হওয়াই সম্ভব। 'পঞ্চসিদ্ধান্তো'ক্ত একটা বচন 'আর্য্যভটীয়ে' পাওয়া যায়[৭৭]। বরাহমিহিরও স্বীকার করিয়াছেন ("তৈরেবোক্তং"—১৫।২১) যে, তিনি অপরের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে ঐ অনুমান আরও দৃঢ় হয়।

নারায়ণ শাস্ত্রী বলেন, বরাহমিহিরোক্ত আর্য্যভট ও 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভট সত্যই অভিন্ন ব্যক্তি। তবে তিনি মনে করেন যে, আর্য্যভটের উক্তির প্রচলিত "ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টিঃ" পাঠ ভুল। উহা প্রকৃতপক্ষে 'ষষ্ট্যব্দানাং ষড়্‌ভিঃ' হইবে। সুতরাং আর্য্যভট ৬০×৬ বা ৩৬০ কল্যব্দে অর্থাৎ ২৭৪২ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব ১২৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে বরাহমিহিরের পক্ষে তাঁহার নামোল্লেখ অসম্ভব হয় না। আমরা অন্যত্র প্রকৃষ্টরূপে দেখাইয়াছি যে, প্রচলিত "ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টিঃ" পাঠই শুদ্ধ[৭৮]। সুতরাং শাস্ত্রীর মত ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত। এইরূপে প্রমাণিত হয় যে, বরাহমিহির ৪২১ শালিবাহনশকের সমকালীন বা অর্ব্বাক্‌কালীন লোক।

৪২৭ শালিবাহনশক ও বরাহমিহির

৪২৭ শালিবাহনশাকে কিম্বা তাহার পরেও বহারমিহির বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা সুনিশ্চিতরূপে সিদ্ধ করা যায়। স্বকৃত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় বরাহমিহির চন্দ্র ও সূর্য্যের এবং বুধ, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন[৭৯]। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষমতে সূক্ষ্ম গণনা করিলে দেখা যায়, ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ, রবিবারের মধ্যাহ্নকালিক চন্দ্র সূর্য্যের সংস্থিতিই তিনি দিয়াছেন। গ্রহসমূহের অবস্থিতি ঐ দিন মধ্যরাত্রির। ঐ মধ্যরাত্রিতেই সোমবার আরম্ভ হইয়াছে। খরেগৎ তাহা বিশেষ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন[৮০]। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'র করণাব্দ ৪২৭ শকের চৈত্র শুক্ল প্রতিপৎ সোমবার[৮১]। ঐ শককে শালিবাহনশক বলিয়া গ্রহণ করিলে পাওয়া যায়, ঐ তারিখ ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ, সোমবার। এইরূপে দেখা যায়, ৪২৭ শালিবাহনশকের চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ্ তারিখের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী মাধ্যাহ্নিক চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থিতি এবং মধ্যরাত্রিক বুধ শুক্র মঙ্গল গ্রহের স্থিতি বরাহমিহির লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় কলিগতাহর্গন গণনার

৭৭। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা,' ১৫।২৩; 'আর্য্যভটীয়,' ৪।১৩। 'আর্য্যভটীয়ে' আছে—"অৰ্দ্ধরাত্রঃ স্যাৎ" আর 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকায়' আছে—"অৰ্দ্ধরাত্রঃ সঃ"। এই পাঠভেদ নগণ্য।

৭৮। "আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ" নামক প্রবন্ধ দেখ।

৭৯। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা,' ৯ম অধ্যায়ে চন্দ্র ও সূর্য্যের অবস্থিতি এবং ১৬ অধ্যায়ে বুধ, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের অবস্থিতি বিবৃত হইয়াছে।

৮০। M. P. Kharegat, "On the interpretation of certain passages in the Panch-Siddhantika of Varahamihira," *Journ. Bom. Br. Roy. Asiat. Soc.*, XIX, 1895-7,

বিধি বর্ণিত আছে[৮২]। সেই বিধি অনুসারে গণনা করিয়া সুধাকর দ্বিবেদী দেখাইয়াছেন যে, কলির প্রারম্ভ হইতে ১,৩১৭,১২৩ দিন গতে চন্দ্রসূর্য্যাদির যে অবস্থিতি গণনা দ্বারা পাওয়া যায়, তাহাই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এইরূপেও ৪২৭ শালিবাহনশকের চৈত্রশুক্ল-প্রতিপদ্, সোমবার পাওয়া যায়।

ভাস্করাচার্য্যোক্ত 'শকনৃপকাল'

(দ্বিতীয়) ভাস্করাচার্য্যোক্ত 'শকনৃপকাল' সম্বন্ধে শাক্যকালবাদিগণ স্পষ্টত কিছু বলেন নাই। কিন্তু পারস্যশককালবাদী নারায়ণ স্বামী মনে করেন, উহাও পারস্যশককাল, শালিবাহনশককাল নহে। অধ্যাপক শ্রীসত্যকেতু বিদ্যালঙ্কারও স্বীকার করিয়াছেন[৮৩]। তাঁহাদের মত যে ভ্রান্ত, ভাস্করাচার্য্য যে প্রকৃতপক্ষে শালিবাহনশকাব্দেরই ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার কতিপয় প্রমাণ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে আরও একটা প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতেছে। শ্রীপতিকৃত 'জাতকপদ্ধতি'র টীকায় কৃষ্ণদৈবজ্ঞ—ইনি ভাস্করের 'বীজগণিতে'র টীকাকার—খানিখানার[৮৪] জন্মকাল ও তিথি নিম্নপ্রকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—কল্যব্দ = ৪৬৫৭, বিক্রমসম্বৎ = ১৬১৩, শালিবাহনশক = ১৪৭৮, 'ব্রহ্মতুল্য' অব্দ = ৩৭৩ এবং 'সিদ্ধান্তরহস্য' অব্দ = ৩৬; "অত্র বর্ষে মার্গশীর্ষ শুক্ল ১৪ সোমে ঘটিকা ৫" ইত্যাদি। এ সকলই গতাব্দা। ইহা হইতে জানা যায়, 'ব্রহ্মতুল্য' ১১০৫ এবং 'সিদ্ধান্তরহস্য' ১৪৪২ শালিবাহন অব্দে রচিত হয়। ভাস্করাচার্য্য-প্রণীত 'করণকুতূহলে'রই অপর নাম 'ব্রহ্মতুল্য'। তিনি নিজেই উহাকে ব্রহ্মতুল্য বলিয়াছেন। গণেশ দৈবজ্ঞ-প্রণীত 'গ্রহলাঘবে'রই অপর নাম 'সিদ্ধান্তরহস্য'। করণকুতূহলেও আছে, উহার আরম্ভ-কাল ১১০৫ শক। এইরূপে নিশ্চিত হয়, (দ্বিতীয়) ভাস্করাচার্য্য-ব্যবহৃত শককাল সত্যই শালিবাহনশককাল।

গর্গবরাহবচন ভ্রমাত্মক

যে গর্গবরাহবচনমূলে হিন্দু জ্যোতিষের ইতিহাসে, বিশেষত বরাহমিহিরের কাল সম্বন্ধে এত অনর্থের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে, সে বচনের সত্যতা সম্বন্ধে আজকাল অনেকে সন্দেহ করিয়াছেন। চিন্তামণি বিনায়ক বৈদ্য বলেন,[৮৫] যুধিষ্ঠিরের কাল সম্বন্ধে বরাহমিহিরের বচন সত্য হইতে পারে না। কেন না, কলিকালের আরম্ভ সম্বন্ধে মহাভারতোক্ত মত এবং অপর জ্যোতির্ব্বিদ্‌গৃহীত মতের সঙ্গে উহার ঐক্য হয় না। ঐ বচন বৃদ্ধগর্গের হইতে

৮২। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', ১।৮।

৮৩। শ্রীসত্যকেতু বিদ্যালঙ্কার প্রণীত 'মৌর্য্য-সাম্রাজ্য কা ইতিহাস,' এলাহাবাদ, ১৯৮৫ সম্বৎ, ৪৬ পৃষ্ঠা।

৮৪। সম্রাট্ আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁর পুত্র প্রসিদ্ধ কবি ও বীর আবদুর রহমানেরই অপর নাম খানিখানা।

পারে না। কেন না, তিনি নিশ্চয়ই শকাব্দের প্রক্‌কালীন লোক। খুব সম্ভব, তিনি 'মহাভারত'কালেরও প্রাগ্বর্ত্তী। 'মহাভারতে' তাঁহার নামোল্লেখ[৮৬] এবং তৎকৃত সংহিতার ইঙ্গিত[৮৭] আছে। অধিকন্তু অধুনা প্রাপ্ত 'গর্গসংহিতা'তে ঐ বচন নাই। এই সকল হেতুতে বৈদ্য মনে করেন, বরাহমিহিরই ভুল করিয়াছেন। তৎপরে শঙ্করবালকৃষ্ণ দীক্ষিতও বলিয়াছেন, 'গর্গবরাহোক্ত এই কাল কেবল কল্পিত।"[৮৮] সপ্তর্ষির গতি সম্বন্ধে বৃদ্ধগর্গের মতের উল্লেখ করিতে গিয়া বরাহমিহির ঐ উক্তি করিয়াছেন। ঐ গতি অনুসারে গণনা করিলে যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ২৭০০ বা তাহার দুই তিন প্রভৃতি গুণ বৎসর অতীত হইয়াছে পাওয়া যায়। গর্গবরাহোক্ত কালের সঙ্গে ইহার সঙ্গতি হয় না। আসল কথা, এই কাল গণনার কোন অর্থ নাই। কারণ, সপ্তর্ষির গতি নাই। মহাভারতপুরাণবচনের সঙ্গে অসঙ্গতি ব্যতীত এই সকল হেতুতেও দীক্ষিত মনে করেন যে, ঐ কাল নিশ্চয়ই কল্পিত। বরাহমিহির-বিবৃত বৃদ্ধগর্গমত এবং উৎপল ভট্ট-ধৃত বৃদ্ধগর্গ-বচনের আধারে গণনা করিয়া শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় দেখাইয়াছেন যে, বৃদ্ধগর্গ খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতকের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন[৮৯]। সুতরাং শালিবাহনশকাব্দের ব্যবহার তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে।

৮৬। "গর্গস্রোতো মহাতীর্থমাজগামৈককুণ্ডলী ॥১৪॥ তত্র গর্গেণ বৃদ্ধেন তপসা ভাবিতাত্মনা।
কালজ্ঞানগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ ব্যতিক্রমঃ ॥১৫ উৎপাতা দারুণাশ্চৈব শুভাশ্চ জনমেজয়।
সরস্বত্যাঃ শুভে তীর্থে বিদিতা বৈ মহাত্মনা ॥১৬॥ তস্য নাম্না চ তত্তীর্থং গর্গস্রোত ইতি স্মৃতং।
তত্র গর্গং মহাভাগমৃষয়ঃ সুব্রতা নৃপ। উপাসাঞ্চক্রিরে নিত্যং কালজ্ঞানং প্রতি প্রভো ॥১৭॥"
—শল্যপর্ব, ৩৭ অধ্যায়।

৮৭। মহর্ষি গর্গ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, শিবের প্রসাদে তিনি কলাবিদ্যার ৬৪ অঙ্গে জ্ঞান লাভ করেন।

চতুঃষষ্ট্যঙ্গমদদৎ কলাজ্ঞানং মমাদ্ভুতম্।
সরস্বত্যাস্তটে তুষ্টো মনোযজ্ঞেন পাণ্ডব ॥"—অনুশাসনপর্ব, ১৮।৩৮

বৈদ্য লিখিয়াছেন, এখানে লক্ষিত গ্রন্থ 'বৃদ্ধগর্গসংহিতা' মনে হয়। পুনার ডেকান কালেজের পাণ্ডুলিপিসংগ্রহে 'বৃদ্ধগর্গসংহিতা'র একখানি পাণ্ডুলিপি আছে। উহার প্রথম অধ্যায়ে ৬৪ অঙ্গের উল্লেখ আছে। মহাভারতোক্ত জ্যোতিষিক বহু বচনের ঐ গ্রন্থোক্ত বচনের সহিত মিল আছে। তাহাতে মনে হয়, মহাভারতকার উহার উপযোগ করিয়াছেন। [মহাভারত-মীমাংসা,' ৪৩৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা]

৮৮। 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র,' ১১৮ পৃষ্ঠা।

৮৯। 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ,' ৫৬-৮ পৃষ্ঠা।

শককালের প্রবর্ত্তক

প্রচলিত শকাব্দ সাধারণত শালিবাহনশকাব্দ নামে বিশেষ খ্যাত। কিন্তু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা সাতবাহন বা শালিবাহন সত্য সত্যই উহার প্রবর্ত্তক কি না, অনেকে সংশয় করেন। বস্তুত এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। প্রতীচ্য বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ সম্প্রতি

ভারতে শকরাজগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া উহার ব্যবহার করেন। তাহা হইতে উহা 'শককাল' নামে সাধারণের মধ্যে পরিচিত হইয়াছে [৯০]। প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষিগণ এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। চতুর্ব্বেদাচার্য্য পৃথূদক স্বামী (৭৮৬ শক) লিখিয়াছেন,—

"শকা নাম ম্লেচ্ছা রাজানস্তে যস্মিন্ কালে বিক্রমাদিত্যেন ব্যাপাদিতা স কালোঽত্যর্থং প্রসিদ্ধঃ। তং কালং বর্ষসংখ্যাং বর্ষে জ্ঞাত্বা ততস্তস্মাৎ কালাৎ..."[৯১]।

শঙ্করনারায়ণ (৭৯১ শক)—

"আসীৎ কিল তাবত্যতীতে কলিযুগে শকেন্দ্রো নাম নরেন্দ্রঃ সার্ব্বভৌমঃ। তেন কৃতা সমস্তভূমণ্ডলে স্বনামসম্বন্ধতা ততঃ প্রভৃতি কলিবর্ষাণামাত্মপ্রসিদ্ধ্যর্থম্। ততো জ্যোতির্জ্ঞানপারগৈঃ শিষ্যপ্রশিষ্যানুক্রমং পরম্পরয়া সা স্মর্য্যতে।"[৯২]

ভট্টোৎপল (৮৮৮ শক)—

"শকা নাম ম্লেচ্ছজাতয়ো রাজানস্তে যস্মিন্ কালে বিক্রমাদিত্যদেবেন ব্যাপাদিতাঃ স কালো লোকে শক ইতি প্রসিদ্ধঃ। তস্মাচ্ছকেন্দ্রকালাৎ শকনৃপবধাদারভ্যাভীষ্টবর্ষং যাবৎ তানি বর্ষাণি···শকভূপকালং শকনৃপসময়ং।"[৯৩]

আমরাজ (১২০১ শকপ্রায়)—

"শাকঃ শককালঃ। শকা নাম ম্লেচ্ছা রাজানস্তে যস্মিন্ কালে বিক্রমাদিত্যেন ব্যাপাদিতাঃ স শকসম্বন্ধী কালঃ শাক ইত্যুচ্যতে।"[৯৪]

পরমেশ্বর (১৩৩১ শক)—

"পুরা জলনিধিবসনামিমামুর্ব্বীং শকেন্দ্রা ইতি বিখ্যাতাঃ নরেন্দ্রাঃ কিল শশাস্থঃ। তদা তন্নামকীর্ত্তনায় তৎকৃতগৌরবৈর্জ্যোতির্জ্ঞানপারগৈরাচার্য্যৈস্তেষ্বিমাং শাসৎস্থ যেঽতীতাব্দাস্তে শকাব্দা ইত্যভিহিতাঃ। তৎপ্রভৃতি যেঽতীতাস্তেঽপি তৎসম্বন্ধিন ইতি তচ্ছিষ্যপ্রশিষ্যসজ্জনপরম্পরয়া স্মর্য্যতে। তৎ প্রসিদ্ধ্যেদমুক্তং শকাব্দা ইতি।"

নৃসিংহ (১৫৪৩ শক)—

"শকনৃপস্যান্তে। শকাশ্চ তে নরাশ্চ তান্ পাতীতি শকনৃপো বিক্রমাদিত্যঃ। যথা মৃগপ্রাণহরে সিংহে মৃগপতিপ্রয়োগস্তথা শকনৃপপ্রয়োগো বিক্রমাদিত্যে। 'শকনামানো ম্লেচ্ছাস্তে ব্যাপাদিতা যস্মিন্ কালে বিক্রমার্কেণ স কালো লোকে শকেন্দ্রকাল ইত্যুচ্যতে' ইতি ভট্টোৎপলোক্তেঃ। য এব বিক্রমাস্যান্ত স এব শালিবাহনাদিরিত্যুচ্চাবচজনপ্রসিদ্ধম্।"[৯৫]

মুনীশ্বর (১৫৫৩ শক)—

"শকাখ্যম্লেচ্ছনরান্ পিবতি মারয়তীতি শকনৃপো বিক্রমাদিত্যঃ। তস্যান্তে বিরামে

৯০। *Cambridge History of India*, . Vol. I, Cambridge, 1922, pp. 583, 585.

৯১। খণ্ড-খাদ্যক, ১।৩ (টীকা)

৯২। লঘুভাস্করীয়, ১।৪ (টীকা)

৯৩। বৃহৎসংহিতা, ৮।২০-১ (টীকা)

৯৪। খণ্ডখাদ্যক, ১।৩-৫ (টীকা)

শালিবাহনশকাদাবিত্যর্থঃ। 'যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনৌ'—ইত্যাদি কলিযুগীয়ষট্ শক-নৃপসংগ্রহশ্লোকে বিক্রমশকানন্তরং শালিবাহনশকারম্ভ উক্তঃ"[৯৬]।

এক শঙ্করনারায়ণ ব্যতীত উপরি উক্ত অপর সকলেই বলিয়াছেন যে, 'বিক্রমাদিত্য', 'বিক্রমার্ক' বা 'বিক্রমাদিত্যদেব'ই শককালের প্রবর্ত্তক। তিনি শকনামক ম্লেচ্ছজাতীয় রাজাকে বধ করেন। তাহার স্মৃতিরক্ষার্থ প্রবর্ত্তিত অব্দের নাম 'শকাব্দ' রাখেন। নৃসিংহ ও মুনীশ্বর ইহাকে 'শালিবাহনশক'ও বলিয়াছেন। কিন্তু শালিবাহন যে বিক্রমাদিত্যেরই অপর নাম, তাহা বলেন নাই। তাঁহাদের লেখা হইতে বরং বিপরীতই বুঝা যায়। শঙ্করনারায়ণের মতে, শকেন্দ্র জনৈক স্বার্ব্বভৌম রাজার নাম। তিনি "আত্মপ্রসিদ্ধির উদ্দেশ্যে" কল্যব্দের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া স্বসময় হইতে শকাব্দ নাম রাখেন। অলবিরুনি উভয় মতের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,[৯৭] শক একজন রাজার নাম। কাহারও মতে তিনি শূদ্র, অপরের মতে প্রতীচ্য বিদেশী ছিলেন। তিনি বড় অত্যাচারী ছিলেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মুলতান ও লূণীদুর্গের মধ্যবর্ত্তী করুর নামক স্থানে তাহাকে পরাজিত ও বধ করেন। ঐ অত্যাচারী রাজা নিহত হইলে লোকের বিশেষ আনন্দ হয়। শকবধের স্মৃতিরক্ষার্থ শকাব্দ প্রবর্ত্তন করেন।

প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষিগণ বিভিন্ন নামে ঐ অব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃদ্ধভাস্কর উহাকে 'শকাব্দ' ও 'শকেন্দ্রনামক মহারাজগণের বর্ষ' বলিয়াছেন। লল্ল "শকক্ষিতীশাব্দ," বরাহমিহির 'শকেন্দ্রকাল', 'শকভূপকাল' ও 'শককাল'; ব্রহ্মগুপ্ত 'শকান্তে অব্দ', 'শকনৃপান্তে অব্দ', শ্রীপতি 'শকান্তে' এবং ভাস্কর 'শকনৃপস্যান্তে বৎসর' বা শকাব্দ। ঐ সকল স্থানে 'অন্ত' শব্দ অবধিবাচক। মক্কিভট্ট তাহাই বলিয়াছেন,—"শকান্ত ইত্যত্রান্তশব্দোঽবধি-পর্য্যায়ঃ।...শকান্তে শকাবধৌ কালে শকবর্ষপ্রারম্ভাৎ পূর্ব্বং"। সুতরাং 'শকাব্দ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—শক হইতে প্রচলিত অব্দ। 'শককাল' শক হইতে কাল। ঐ 'শক', 'শকনৃপ', 'শকভূপ' বা 'শকক্ষিতীশ' কে? নৃসিংহ ও মুনীশ্বর 'শকনৃপ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, —'শকজাতির হত্যাকারী' অর্থাৎ বিক্রমাদিত্য। 'শকভূপ' শব্দের না হয়, সেই প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে—'শকভূমির ধ্বংসকারী'। 'শকক্ষিতীশ=শকের শাশনকর্ত্তা' অর্থাৎ শকধ্বংসকারী বিক্রমাদিত্যই শকারি বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুনীশ্বর 'অন্ত' শব্দের ভিন্নার্থ করিয়াছেন। অন্ত=বিরাম। শকারি বিক্রমাদিত্যের অন্তে বা বিরামে প্রচলিত অব্দ শকাব্দ। এই ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত। একটা প্রাচীন লেখে আছে,—"শকনৃপতিরাজ্যাভিষেক-সংবৎসরেষ্বতিক্রান্তেষু পঞ্চসু শতেষু।" ইহা দেখিয়া সমসাময়িক বৃদ্ধভাস্করের কথাই মনে পড়ে, 'শকেন্দ্রনাম্নাং মহীভুজাং গতবর্ষসংগ্রহঃ'। 'শক' বা 'শকেন্দ্র' রাজার রাজ্যাভিষেক হইতেই অব্দ প্রচলিত হইয়াছে। নৃসিংহ ও মুনীশ্বরের ব্যাখ্যা ঠিক নহে।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

৯৬। 'মরীচি, (৯১ পৃষ্ঠা)

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস

১৮৫৮—৬৭

গত তিন বৎসরের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় আমি ১৮৫৮ হইতে ১৮৬৭ সনের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা সাময়িক পত্রগুলির বিবরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই বিবরণ মোটেই পূর্ণাঙ্গ নহে। কারণ, সে-যুগের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাই এখন অপ্রাপ্য। নূতন অনুসন্ধানের ফলে আমার প্রবন্ধগুলির ত্রুটি ক্রমশঃ নজরে পড়িতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কয়েকখানি নূতন পত্রিকার বিবরণ দেওয়া হইল, এবং পূর্ব্বে যে-সকল পত্রিকার পরিচয় দিয়াছি, তাহাদেরও কোন-কোনটির বিবরণ নূতন করিয়া লিখিত হইল।

ভারতরঞ্জন

১৮৬২ সনের জানুয়ারি মাসে আজিমগঞ্জে ধনসিন্ধু যন্ত্রালয় হইতে 'বিশ্বমনোরঞ্জন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র কিছু দিনের জন্য প্রকাশিত হয়। ওয়েঙ্গার লিখিয়াছেন, এই 'বিশ্বমনোরঞ্জন' ১৮৬৪ সনে 'ভারতরঞ্জন' নামে ধনসিন্ধু যন্ত্রালয় হইতে বাহির হয়; 'বিশ্বমনোরঞ্জন' ও 'ভারতরঞ্জন'—উভয় পত্রেরই স্বত্বাধিকারী ছিলেন নবকিশোর সেন।*

অমাবস্যা

এই নামের একখানি মাসিক পত্রিকা ১৮৬২ সনের জুন (?) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' ৭ জুলাই ১৮৬২ তারিখে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

> বিবিধ সংবাদ।...২২এ আষাঢ় শনিবার।...আমরা অমাবস্যা নামে এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার মূল্য দুই পয়সা মাত্র। অমাবস্যা জগৎকে যেমন আলোকময় করে, ইহা কি সেইরূপ করিবে।

পরিদর্শন

যদুনাথ তর্কভূষণের সম্পাদকত্বে 'ভারত পরিদর্শন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৬৩ সনের ১৫ই জুন প্রকাশিত হয়।† এক বৎসর যাইতে না যাইতেই পত্রিকাখানির প্রচার রহিত হইয়াছিল। ওয়েঙ্গার লিখিয়াছেন, সাপ্তাহিক 'ভারত পরিদর্শন' মাসিক আকারে 'পরিদর্শন' নামে ১৮৬৪ সনের শেষাশেষি চিৎপুর পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হয়।‡ ১৮৬৫ সনের ১৬ই জানুয়ারি তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রাপ্ত পুস্তক-পত্রিকার তালিকার মধ্যে 'পরিদর্শন' পত্রিকার এইরূপ উল্লেখ আছে :—

> *Acknowledgments*...Puridurshan, a Monthly Magazine in Bengalee, Calcutta.

---

* J. Wenger : *Catalogue of Sanskrit and Bengalee Publications printed in Bengal.* 1865. P. 58.

† ১৩৪২ সালের ২য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৯১ পৃষ্ঠায় আমি 'ভারত পরিদর্শক' পত্রের

শিক্ষা দর্পণ। ও সংবাদসার

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনে ১২৭১ সালের বৈশাখ মাসে 'শিক্ষা দর্পণ। ও সংবাদসার' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। কাগজখানি ফুলস্কেপ আকারের, প্রতি সংখ্যায় আট পৃষ্ঠা থাকিত। ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য দুই আনা এবং বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা ছিল। "এই পত্র হুগলী বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সেই যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়।" প্রত্যেক সংখ্যায় "সংবাদসার" নাম দিয়া দুই-তিন পাটি সংবাদ থাকিত। প্রথম সংখ্যা 'শিক্ষা দর্পণ। ও সংবাদসারে' প্রকাশিত ভূমিকার নিম্নোদ্ধৃত অংশপাঠে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে :—

> শিক্ষাদর্পণ। যে সকল দেশে বিদ্যাচর্চ্চার বাহুল্য এবং সুতরাং বিদ্যালয় এবং শিক্ষক সংখ্যার আধিক্য হইয়াছে, সর্ব্বত্রই শিক্ষা-প্রণালী-প্রদর্শক এবং তৎসম্বন্ধীয় সংবাদ প্রদায়ক সাময়িক পত্রিকা সকল প্রচারিত হইয়া থাকে। যে ব্যাপারটী দেশের অবস্থা বিশেষ ঘটিলে স্বতঃই ঘটে, তাহার কারণান্তর অনুসন্ধান করা এক প্রকার নিষ্প্রয়োজন বলিলেই হয়। দেশের সেই অবস্থা-বিশেষই তাহার কারণ।
>
> বাঙ্গালা দেশের এক্ষণে সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে কিনা, নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। কিন্তু আমাদিগের মনে এই শিক্ষা দর্পণ প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় প্রথম উদিত হওয়ার, এবং কেহ ও কত ব্যক্তিই বা ইহার গ্রাহক হইবেন, তাহা নিশ্চয় রূপে না জানিয়াও ইহা লিখিতে, ছাপাইতে এবং নানা স্থানে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবার হেতু, দেশের উল্লিখিতরূপ অবস্থার সংঘটন অথবা আমাদিগের মনের ভ্রম মাত্র, এই দুই বই আর কিছুই হইতে পারে না। ঐ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত কারণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখাই আমাদিগের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য।
>
> যাহাদিগের নিকট এই পত্রিকা যাইবে যদি তাঁহারা সকলে অথবা তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ইহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া অগ্রিম দেয় মূল্য প্রেরণ করেন, তবে বুঝিব যে, দেশ মধ্যে যাহাতে এমত এক খানি কাগজ চলে, দেশের তাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে;— নচেৎ ইহা প্রস্তুত করিতে ও পাঠাইতে যে কএকটী টাকা লোকসান হইবে, তাহা—আমাদিগেরই আক্কেল সেলামী!

> এই পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে, এমত সময়ে কোন আত্মীয় ব্যক্তি আসিয়া কি লিখিতেছ যে বলিয়া কাগজ খানি লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন; আমরা, লেখাটা কেমন লাগিল বুঝিবার জন্য তাঁহার মুখের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। বন্ধু মহাশয় কাগজ খানি রাখিয়া দিয়া কহিলেন "বেস্ খোলা কথা লেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন ও সকল কথা লেখা হয় নাই—কাগজটী কত দিন অন্তর বাহির হইবে?" বৎসরের প্রথম হইতে বাহির করিবার জন্য এইবারে যাহা করি; কিন্তু ইহার পর অবধি প্রতি মাসের শেষ দিবসে বাহির করিবার চেষ্টা করিব—অন্ততঃ পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বাহির হইবেই হইবে; মাসিক পত্রিকা সকল যেমন কখন২ ছয় মাস সাত মাস বিলম্বে বাহির হয়, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহার সেরূপ দশা হইবে না। "কাগজটী কত বড় হইবে?" সচরাচর চারি পেজী আট পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ হইবে;—প্রথম সংখ্যার পত্রিকা দেখিলেই গ্রাহকেরা ইহার আকার

মূল্য। এত অল্প মূল্যে কাগজ করিয়া কোন রকমে বাজে খরচ করা পোষায় না, এই জন্যই এক বৎসরের দাম আগামী লইব এবং কাগজটী এক বৎসর চালাইতে প্রতিজ্ঞা করিব; যদি এক বৎসর না চালাই, যিনি যে মূল্য দিবেন সমুদায় ফেরৎ পাঠাইয়া দিব। "বেস্ বলিলে, কিন্তু সংবাদপত্রের সম্পাদককে কে চিনে—ওরা একেলা একশ—লেখে এক জন বলে আমরা—সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের ঘর নাই দ্বার নাই—এমন কি, উহাদের নাম পর্য্যন্তও নাই—তুমি টাকা ফেরৎ দিবে বলিলে কে বিশ্বাস করিবে?" বন্ধু মহাশয়ের এই প্রশ্নের কি উত্তর করিব ভাবিতে ছিলাম, এমত সময়ে আমাদিগের যন্ত্রাধ্যক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বন্ধু মহাশয় যে বৈষম্য উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া স্বয়ং গ্রাহক বর্গের টাকার জামিন হইতে স্বীকার করিলেন।

যন্ত্রাধ্যক্ষ বলিলেন টাকার জামিন হইব তাহাতে দুঃখ নাই—কিন্তু যেমন করিয়া এই সকল কাজ করিতে হয় তেমন করিয়া করিলে কাগজ খানির দ্বারা বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ হইতে পারিত। লোকে বলে নামে কি এসে যায়, কিন্তু নামে অনেক হয়। এই কাগজটীর নাম শিক্ষা দর্পণ না রাখিয়া "হিন্দু দর্পণ" অথবা—তার চেয়েও ভাল—'ব্রাহ্ম দর্পণ' রাখুন—আর শিক্ষা প্রণালী টুণালী লিখিব না বলিয়া গবর্ণমেণ্টের দোষ লিখিব এই প্রতিজ্ঞা করুণ—আর—লোকে টাকার কথা বলিতে হইলে যেমন আস্তে২ কহে সেই রূপ স্বরে—প্রাচীন সংবাদপত্রের সম্পাদক দুই একটীর কিছু২ মর্য্যাদা রাখুন—তাহা হইলে আমিই প্রতিজ্ঞা করিতেছি দাম দুই আনা না হইয়া দুই টাকা করিয়া সব্‌স্ক্রিপ্‌সন্ তুলিয়া দিব।

বন্ধু মহাশয় ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন যন্ত্রাধ্যক্ষ মন্দ পরামর্শ দিতেছেন না। সেই পরিশ্রম করিতে হইবে—সেই ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইবে—তবে লাভটা ছাড় কেন? যেমন করে কাজ করিতে হয় তাহাই কেন কর না? আমরা উত্তর করিলাম, সকল কার্য্যেই অর্থলাভ আকাঙ্ক্ষা করিলে চলে না; কোন কর্ম্ম টাকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হয়, কোন কর্ম্ম বা অন্য দিকে দৃষ্টি করিয়া করিতেই অধিক প্রবৃত্তি জন্মে। ধর্ম্মের ধ্বজা তুলিয়া টাকা রোজকার করায় প্রবৃত্তি নাই—গবর্ণমেণ্টকে গালি দিলে গবর্ণমেণ্ট কিছুই বলেন না বিলক্ষণ জানা আছে, সুতরাং "পাইকের বঁড়াই" করিয়া বাহাদুরী দেখাইতে নিতান্ত ঘৃণা হয়—আর যন্ত্রাধ্যক্ষ যে ঘুস দিবার কথা বলিতেছেন, তাহার দিন আর নাই—এক্ষণকার সম্পাদকেরা আর টাকা খাইয়া মন্দকে ভাল ও ভালকে মন্দ বলেন না। তাঁহারা অনেকেই দেশহিতৈষা গুণে বিভূষিত হইয়া আছেন এবং যথেষ্ট পরিমাণে সংবাদপত্র দেশে নাই ইহাই স্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহারা যে সুপ্রশস্ত পথের পথিক হইয়াছেন, যদি আমাদিগকেও তন্মধ্যে সমভিব্যাহারী পায়েন, তবে সরল হৃদয়ে আনন্দ প্রকাশই করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

বন্ধু মহাশয় কহিলেন, কার্য্যটী এমন গুরুতর নহে যে পরিশ্রম করিলে সুসিদ্ধ না হয়—তবে আমার ইচ্ছা এই যে, শিক্ষাদর্পণ নাম দিয়াছ বলিয়া যেন কেবল বালকদিগকে কেমন করিয়া ক, খ, আর শতিকা প্রভৃতি শিখাইতে হয় তাবন্মাত্র লিখিয়াই নিবৃত্ত না হও। পল্লীগ্রামের লোকেরা কোন ভাল বিষয়ের কথা শুনিতে পায়েন না—তাঁহাদের মধ্যে কেবল দলাদলীর আর নিমন্ত্রণের কথাই হইয়া থাকে—অতএব প্রামাণিক সংবাদপত্র সমস্ত হইতে ফলোপধায়ক ও শুশ্রূষাজনক কতকগুলি কতকগুলি করিয়া সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলে তাদৃশ লোকদিগের অনেক উপকার দর্শিতে পারে; সংবাদগুলি কি পুরাতন হইবে বটে—কিন্তু নিতান্ত উপবাসক্লিষ্ট ব্যক্তিকে পর্য্যুষিতান্ন প্রদান করিলেও

যাইতেছে, তাঁহার মর্ম্ম অনেকেই অবগত হয় না, অথচ আইন না জানায় লোকের যে দোষ হয়, আইন কিছু সেই দোষের দণ্ড দিতে ছাড়ে না। অতএব নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমস্তের সারসংগ্রহ করিয়া দিলে পত্রিকার উপকারিতা এবং সুতরাং ইহার গৌরবেরও বৃদ্ধি হইতে পারিবে। ফলতঃ শিক্ষা শব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করিয়া লইলে শিক্ষাদর্পণের মধ্যে লিখা যাইতে না পারে এমন কথাই নাই। জর্ম্মণ দেশীয় এক জন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন যে, শিক্ষা গ্রহণ করাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের এক মাত্র উদ্দেশ্য; মনুষ্য দেহ ধারণের আর দ্বিতীয় প্রয়োজন নাই।

যন্ত্রাধ্যক্ষ এই সকল কথাতেও বিশিষ্ট রূপে তুষ্ট হইলেন না, বোধ হয়। কাগজের নামটা তাঁহাকে ভাল লাগে নাই। তিনি কাপি চাহিলেন এবং উল্লিখিত কথোপকথনে সকল কথাই এক প্রকার বলা হইয়াছে দেখিয়া ও অন্য রূপে লিখিবার সময়াভাব প্রযুক্ত ইহাই লিখিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলাম। ইহাই আমাদিগের প্রতিজ্ঞা পত্র।

১২৭৪ সালের পৌষ সংখ্যা (৪র্থ ভাগ, ৯ম সংখ্যা) হইতে পত্রিকাখানির নামকরণ হয় 'শিক্ষা দর্পণ। ও মাসিক পত্রিকা'। এ-সম্বন্ধে ঐ পৌষ সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

বিজ্ঞাপন। বর্ত্তমান মাস হইতে শিক্ষাদর্পণ ও বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা সঁমিলিত হইল; এবং সেই জন্য শিক্ষাদর্পণেরও পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহাকে "শিক্ষাদর্পন ও মাসিক পত্রিকা" নাম দেওয়া গেল। বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকার গ্রাহকগণ, তাঁহাদের নিকট প্রাপ্য মূল্য হুগলি বুধোদয় যন্ত্রালয়ে শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। পৌষ মাস পর্য্যন্তই বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকার মূল্যই প্রাপ্য রহিল। পর মাস হইতে গ্রাহকগণকে ডাক মাসুল সমেত বার্ষিক ১॥০ টাকা দিতে হইবে।

বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকার গ্রাহকগণ, বোধ হয় শিক্ষাদর্পণ ও মাসিক পত্রিকার প্রতি অনাস্থা করিবেন না।—শ্রীকেশবচন্দ্র মিত্র।

১৮৬৯ সনের ১৬ই এপ্রিল হইতে ভূদেব বাবু 'এডুকেশন গেজেট' পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার দ্বারা 'শিক্ষাদর্পণে'র প্রয়োজন মিটিতেছিল; সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি পরের মাস হইতে 'শিক্ষাদর্পণে'র প্রচার রহিত করেন।

'শিক্ষা দর্পণ' পত্রের ফাইল।—

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় :—১ম ভাগ হইতে ৪র্থ ভাগ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১২৭৫ সাল)।

হিন্দু ইণ্টারপ্রীটার

কলিকাতার গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স ১৮৬৪ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাসে *Hindoo Interpreter* নামে একখানি দ্বিভাষিক—ইংরেজী-বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহা পাক্ষিক ("Bi-monthly") এবং "More a politico ethical magazine" ছিল বলিয়া জে. ওয়েঞ্জার উল্লেখ করিয়াছেন।* এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হস্তগত হইবার পর ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' যাহা লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

We have to acknowledge with thanks the first number of the *Hindoo Interpreter*, a diglot newspaper, started by the enterprising

is no criterion to judge it by, but if its conductors will earnestly and perseveringly pursue the high and laudable object they have in view, they will deserve success, though they may not command it. Diglots unfortunately do not find much favor in Bengal... ..

প্রত্নকম্রনন্দিনী

১৮৬৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কাশী হইতে 'প্রত্নকম্রনন্দিনী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহা "পৌর্ণমাসিকা"—অর্থাৎ প্রতি-পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী।

'প্রত্নকম্রনন্দিনী' একখানি ধর্ম্মমূলক মাসিক পত্রিকা। মুখ্যতঃ বৈদিক ধর্ম্মের আলোচনা ও প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহ (এবং কোন কোন সংখ্যায় বঙ্গানুবাদ সহ) মূল বেদ এবং মীমাংসাদি দর্শন ইহাতে প্রকাশিত হইত। বৈদিক ধর্ম্মের আলোচনা বিষয়ক সংস্কৃত প্রবন্ধ ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই থাকিত। সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক আলোচনাও থাকিত, তবে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইত না।

'প্রত্নকম্রনন্দিনী' পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকমালা শোভা পাইত :—

ব্রহ্মাণ্ডকারুং করণাস্থলিপ্সুং কারুণ্যসিন্ধুং সমশক্তিমন্তম্।
বোধাব্ধিবেত্তং মননেন মান্যং বন্দেহমীশং জগদেকবন্ধুম্॥
সংসটীকসাঙ্গবেদদর্শনাদিকাশিনী সাধুবোধবর্দ্ধিনী হ্যনেকশাস্ত্রশালিনী।
রাজতাদসৌ সুচিত্তচিৎপ্রফুল্লকারিণী প্রত্নকম্রনন্দিনী চিরংধরাবিহারিণী॥

'প্রত্ন কম্র নন্দিনী' পত্রিকার ফাইল।—

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—প্রথম তিন-চার বর্ষ (অসম্পূর্ণ)।
ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১ম-৪০শ সংখ্যা (১৮৬৭-৭০)

নব পত্রিকা

১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে, অর্থাৎ ১৮৬৭ সনের শেষাশেষি—'নব পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন হীরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকাখানি ২৬৮ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীটস্থ জ্ঞানদীপক যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া ১২-২০ নং কুমারটুলি ষ্ট্রীট হইতে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত। 'নব পত্রিকা'য় ৬ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখা থাকিত। †

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* J. Wenger : *Catalogue of Sanskrit and Bengalee Publications printed in Bengal.* 1865. P. 58.

† Appendix (No. III) to the *Calcutta Gazette* for Wednesday June 10, 1868, quarter

সংযোজন

সোমপ্রকাশ

১৮৫৮ সনের ১৫ই নবেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫) 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

১৮৬৫ সনের ২রা জানুয়ারি হইতে দ্বারকানাথ কিছু দিনের জন্য 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদকীয় আসন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' নিম্নোদ্ধৃত অংশটি প্রকাশিত হইয়াছে ঃ—

বিজ্ঞাপন।

> আমি ক্রমে ক্রমে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছি। তন্নিবন্ধন, সোমপ্রকাশে যথোচিত মনোযোগ দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমি আজি অবধি ইহার সম্পাদকতা ভার অন্য হস্তে সমর্পণ করিলাম। কিন্তু সোমপ্রকাশ আমার প্রতিষ্ঠিত, ইহার প্রতি আমার সবিশেষ যত্ন আছে, অন্য অন্য অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের অবিরোধে যতদূরসাধ্য সাহায্য দান দ্বারা ইহার উন্নতি সাধন চেষ্টায় কখন পরাঙ্মুখ হইব না।......
>
> শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

দ্বারকানাথ যাঁহার হস্তে 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদনের ভার অর্পণ করেন, তিনি মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ। ৫ জুন ১৮৬৫ তারিখে "সম্পাদককৃত বিজ্ঞাপন" প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার নীচে "শ্রীমোহনলাল বিদ্যাবাগীশ সোমপ্রকাশ সম্পাদক" নাম পাইতেছি।

১৮৭৮ সনে ভার্ণাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট নামক আইন হইলে, "রাজকোপে পড়িয়া সোমপ্রকাশের এক বর্ষ আয়ু ক্ষয় হইয়া" যায়। পরে ১৯ এপ্রিল ১৮৮০ (৮ বৈশাখ ১২৮৭) তারিখ হইতে "২৩শ ভাগ ১ম সংখ্যা" সোমপ্রকাশ "নব কলেবর ধারণ করিয়া···কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত" হয়। এই সংখ্যায় "সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জন্ম" প্রস্তাব হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি ; ইহা হইতে "সোম-প্রকাশ" কি কারণে বন্ধ হয় এবং কেনই বা পুনঃপ্রকাশিত হয়, তাহার বিবরণ পাওয়া যাইবে।

> যে কারণে সোমপ্রকাশের মৃত্যু হয়, তদ্বৃত্তান্ত বোধ হয় পাঠকগণ বিস্মৃত হন নাই। সোমপ্রকাশের লাহোরস্থ সংবাদদাতার পত্র প্রকাশ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট আমাদের নিকটে হাজার টাকা ডিপজিট ও মুচলকা চান। আমরা তদ্দানে সমর্থ না হওয়াতে সোমপ্রকাশ প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।......
>
> যেরূপে সোমপ্রকাশের পুনর্জন্ম লাভ হয় তদ্বৃত্তান্ত এই—
>
> সোমপ্রকাশের হুগলীস্থ সংবাদদাতা বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ আমাদের অজ্ঞাতসারে বঙ্গদেশের মাননীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আশলি ইডেন সাহেবের নিকটে মোচলকা ও ডিপজিট বিনা সোমপ্রকাশের পুনঃপ্রচারার্থ আবেদন করেন [২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৮০]।......
>
> কয়েক দিন অতীত হইলে পর ঐ দুর্গাপ্রসন্ন আমাদিগকে এক খানি পত্র লিখিলেন এবং সেই সঙ্গে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কৃত রেজোলিউসনের একটী নকল পাঠাইয়া দিলেন। তাহা এই—

Dated the 16th March 1880.

......Ordered that the petitioner be informed that no application such as this can be considered unless submitted by the Editor or publisher of the "Someprakash" and that if the Editor desires to make any representation on the subject of the publication of his Newspaper he can do so verbally to the Lieutenant Governor or to the Secretary to the Government.

......দুর্গাপ্রসন্নের পত্র পাইয়া আমাদের বিষম চিন্তা ও সঙ্কট উপস্থিত হইল।......আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা সোমপ্রকাশের প্রচারার্থ পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন।......

গত ২০এ চৈত্র হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক অনরেবল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পালকে সঙ্গে লইয়া মাননীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, আমরা পূর্ব্বে যেরূপ স্বাধীনভাবে স্বমত প্রকাশ করিয়া সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদন করিতাম, সেইরূপই করিব। তিনি একখানি লিখিত আবেদন করিতে কহিলেন।

আবেদন করা হইলে, ১০ই এপ্রিল ১৮৮০ তারিখে বাংলা-সরকার দ্বারকানাথকে 'সোমপ্রকাশ' পুনঃপ্রকাশ করিবার অনুমতি-পত্র পাঠাইয়াছিলেন।

সোমপ্রকাশ প্রচারের শেষোক্ত অনুমতি পত্র আমাদিগের হস্তগত হইলে পর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি শ্রীযুত হোরেস ককরেল সাহেব আমাদিগকে ডাকাইয়া লইয়া যান এবং এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, সোমপ্রকাশে অসঙ্গত বিষয় প্রকাশ না হয়, এবং আমরা স্বচক্ষে না দেখিয়া কোন বিষয় মুদ্রিত হইতে না দি।......

অতঃপর ইণ্ডিয়ান আসোসিএসন সভা ও বাবু লালমোহন ঘোষ মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ একান্ত আবশ্যক। বাবু লালমোহন ঘোষ উক্ত সভার প্রেরিত হইয়া সোমপ্রকাশের নিমিত্ত বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডে গিয়া পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় সোমপ্রকাশের মৃত্যুনিবন্ধন তুমুল আন্দোলন করিয়াছেন।......

ভ্রম-সংশোধন

"কালীপ্রসন্ন সিংহ"

১৩৪৪।২য় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত "কালীপ্রসন্ন সিংহ" প্রবন্ধে একটি ভুল আছে। "কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনা"-বিভাগে (পৃ. ১০৩) যে পুস্তকখানিকে 'কল্‌কেতার হাট্‌হদ্দ' বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম, সেখানি প্রকৃতপক্ষে ১৮৬৫ সনে প্রকাশিত 'সমাজ কুচিত্র। মাতৃভূমির প্রতি বঙ্গীয় যুবকগণের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত এক নিশাচর প্রণীত।' ইহা 'হুতোম'কে উৎসর্গীকৃত। এই পুস্তকের দুইটি খণ্ড বিলাতে আছে।

পুস্তকখানি পাঠ করিলে কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনা বলিয়াই ধারণা হয়। এ বিষয়ে আমরা আরও বিস্তৃত অনুসন্ধান করিতেছি।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান

সূচনা

অনেকের ধারণা, প্রাণিবিজ্ঞান একটী অতি আধুনিক শাস্ত্র ও প্রধানতঃ য়ুরোপীয়গণই ইহার উদ্ভোক্তা। প্রাণিজগতের সম্যক্ ও ধারাবাহিক পর্য্যালোচনা মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে, ইহাই অনেকের মত। কিন্তু ইহা ভুল। আমাদের দেশের মনীষিগণ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই জীবগণের রীতি-নীতি, স্বভাব, গঠন, জননক্রিয়া, বুদ্ধিবৃত্তি, সন্তান পালন প্রভৃতি বিষয় লক্ষ্য করিয়া, নানা সংস্কৃত গ্রন্থে, নানা কথাচ্ছলে তৎসম্বন্ধে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, জীবদিগের বিভিন্নরূপ শ্রেণীবিভাগও তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন; জীবগণের সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে ভুলেন নাই। তাহার পর বীজ-বিজ্ঞান ও ভ্রূণশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহারা একটা নির্ভুল ধারণা রাখিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যেরূপ ধারাবাহিক ভাবে শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে সত্য সত্যই অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, পুরাণ, ভাগবত, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, কাব্য প্রভৃতি বহু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থে আমরা বহু প্রাণিবিষয়ক শ্লোক পাইয়া থাকি। কথা ও উপমাচ্ছলে শ্লোকগুলির অবতারণা করা হইলেও উহা হইতে আমরা বহু মূল্যবান্ বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান্ পাই। এই বিক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি সঙ্কলন করিয়া একত্রিত করিলে উহাই একটি সুচিন্তিত প্রাণিবিজ্ঞান গ্রন্থে পরিণত হইতে পারে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, আমাদের দেশে পূর্ব্বে শুধু প্রাণিবিজ্ঞান বলিয়া কোন পুস্তক ছিল কি না? কে বলিতে পারে যে, ছিল না? পূর্ব্বেকার কয়খানি পুস্তকই বা আমরা পাইয়া থাকি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশবশতঃ অনেক প্রাচীন পুস্তকই গ্রন্থকীটের উপদ্রবে নষ্ট হইয়া যায়। তাহা ছাড়া বৈদেশিক আক্রমণ ও যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতিতে কত পুরাতন হিন্দু ও বৌদ্ধ পুস্তকাগার যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহা ছাড়া প্রয়োজনের সময় নিছক ধর্ম্ম ও দর্শনমূলক গ্রন্থাদি ছাড়া অন্যান্যবিষয়ক পুস্তকগুলির রক্ষাকল্পে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ তত সচেষ্ট হন নাই। ফলে দর্শন ও ধর্ম্মপুস্তকগুলির ন্যায় বিজ্ঞানের পুস্তকগুলি, বিপর্য্যয়ের মধ্যে প্রায়ই রক্ষা পায় নাই। কয়েকখানি চিকিৎসাবিজ্ঞান ছাড়া প্রায় সমুদয় ইতিহাস, অর্থনীতি ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পুস্তক রক্ষা পায় নাই। যে দুই একখানি আমরা এখন পাইয়া থাকি, তাহাদের "বিষয়ের" সমধিক উৎকর্ষ হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, বহুকাল হইতেই ঐ বিষয়গুলি এদেশে আলোচিত হইয়া আসিতেছিল এবং এ সম্বন্ধে বহুবিধ পুস্তক সে যুগে প্রচলিত ছিল। কিরূপ প্রচেষ্টাদ্বারা চরক ও সুশ্রুত আদি পুস্তকগুলি রক্ষিত

বৃক্ষের তলদেশে তাম্রপেটিকায় আয়ুর্ব্বেদপুস্তকাদি প্রোথিত আছে" বলিয়া তাঁহাদের সন্ততিদিগকে নির্দ্দেশ দিয়া যাইতেন। রাজ্যবিপ্লবের পর সন্ততিগণ সেই নির্দ্দেশ বা উইল অনুযায়ী পিতা বা পিতামহের মৃত্যুর বহু বৎসর পর সেই সকল পুস্তক উদ্ধার করিতে সমর্থ হইত। এইরূপ প্রচেষ্টায় কেবলমাত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় ধর্ম্ম, দর্শন ও চিকিৎসা-পুস্তকগুলিই রক্ষিত হইয়াছিল। বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি ধর্ম্ম ও দর্শনপুস্তকাদির তুলনায় সে যুগে অল্প প্রয়োজন বিধায় এই ভাবে রক্ষিত হয় নাই।

অনেক তথ্য বা জ্ঞান আবার এদেশে শ্রুতি বা স্মৃতি দ্বারা শিষ্যপরম্পরায় রক্ষিত হইত। কদাচিৎ উহা লিপিবদ্ধ হইত। অধুনাপ্রাপ্ত যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থে কথাচ্ছলে প্রাণিবিষয়ক তথ্যের উল্লেখ দেখা যায়, কে বলিতে পারে যে, তাহা কোনও একখানি সুলিখিত তৎকালীন প্রাণিবিজ্ঞানপুস্তক হইতে গৃহীত হয় নাই? বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, ঐ সকল শ্লোক কোনও একখানি অধুনালুপ্ত প্রাণিবিজ্ঞানের পুস্তক হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। প্রমাণস্বরূপ আমরা অনেক সময় একই প্রাণিবিষয়ক শ্লোক বিভিন্ন পুস্তকগুলির মধ্যে সমভাবেই পাইয়া থাকি। এমন কি, কোনও কোনও শ্লোকে উহাদের ভাষা ও শব্দের মধ্যেও কোন পার্থক্য দেখা যায় না। প্রমাণস্বরূপ মাত্র কয়েকটী তুলনামূলক শ্লোক বিভিন্ন পুরাণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পরাশর উবাচ

তির্য্যক্‌স্রোতাস্তু যঃ প্রোক্তস্তৈর্য্যগ্‌যোন্যঃ স উচ্যতে।
উর্দ্ধস্রোতাস্ততঃ ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ॥
ততোঽর্ব্বাক্‌স্রোতসঃ সর্গঃ সপ্তমঃ সতু মানুষঃ॥—বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাংশ, ৫অঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

তির্য্যক্‌স্রোতস্তু যঃ প্রোক্তস্তির্য্যগ্‌যোন্যঃ স পঞ্চমঃ।
ততোঽর্দ্ধস্রোতসাং ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ॥
ততোঽর্ব্বাক্‌স্রোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ॥—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৪৯ অধ্যায়।

উপরিউক্ত শ্লোক দুইটীতে যে সকল জীব চারিটী পায়ের উপর ভর দিয়া চলে ও তজ্জনিত তির্য্যক্‌গতিতে আহারাদি গ্রহণ করে, তাহাদের তির্য্যক্ জীব বলা হইয়াছে ও যে সকল জীব সোজা হইয়া চলে ও তাহার ফলে আহারাদি উপর হইতে নিম্নে গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অর্ব্বাক্ জীব বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, শব্দ দুইটী শ্রেণীবাচক ও বৈজ্ঞানিক শব্দ। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রথম শ্লোকটী বিষ্ণুপুরাণকার পরাশরের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন ও দ্বিতীয় শ্লোকটী মার্কণ্ডেয় তাঁহার মার্কণ্ডেয় পুরাণে নিজের নামে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে,

নিজ নিজ গ্রন্থে তুলিয়া লইয়াছেন মাত্র। আর দুইটী অনুরূপ শ্লোক উক্ত পুস্তক দুইখানি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

পরাশর উবাচ

গৌরজঃ পুরুষা মেষা অশ্বা অশ্বতরাঃ খরাঃ।
এতান্ গ্রাম্যান্ পশূন্ প্রাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধ মে॥
শ্বাপদো দ্বিখুরো হস্তী বানরঃ পক্ষিপঞ্চমঃ।
ঔদকাঃ পশবঃ ষষ্ঠাঃ সপ্তমাস্তু সরীসৃপাঃ॥—বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাংশ, ৫অঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

গৌরজো মহিষো মেষঃ অশ্বাশ্বতরগর্দ্দভাঃ।
এতান্ গ্রাম্যান্ পশূনাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধ মে॥
শ্বাপদং দ্বিখুরং হস্তী বানরাঃ পক্ষিপঞ্চমাঃ।
ঔদকাঃ পশবঃ ষষ্ঠাঃ সপ্তমাস্তু সরীসৃপাঃ॥—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৪৯ অধ্যায়।

উপরিউক্ত শ্লোক কয়টী ছাড়া বিভিন্ন সংস্কৃত পুস্তকাদি হইতে এই বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ আরও চারিটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে শ্লোক কয়টী লিখিত। উহা পাঠে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার হিন্দুদিগের সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। শ্লোক কয়টীতে জলজ জীব হইতে স্থলজ জীবের উৎপত্তি ও পরে স্থলজ জীব হইতে পর পর স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ ও সর্ব্বশেষে বানর ও মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। একটী জীব হইতে অপর একটী জীবের উৎপত্তি হইতে কত লক্ষ বৎসর সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহারও একটা হিসাব দেওয়া আছে। শ্লোক কয়টীর রচনা বিভিন্নরূপ হইলেও বক্তব্য বিষয় একই। সময় নির্দ্দেশ ছাড়া প্রতিপাদ্য বিষয়ে শ্লোক-রচয়িতাগণ সম্পূর্ণরূপেই একমত। শ্লোক কয়টীতে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে কথাচ্ছলে বিজ্ঞানের অবতারণা করা হইয়াছে।

চতুরশীতিলক্ষানি চতুর্ভেদাশ্চ জন্তবঃ। অণ্ডজাঃ স্বেদজাশ্চৈব উদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ॥
একবিংশতিলক্ষানি হ্যণ্ডজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। স্বেদজাশ্চ তথৈবোক্তা উদ্ভিজ্জাস্তৎ-প্রমাণতঃ॥
জরায়ুজাশ্চ তাবন্তো মনুষ্যাদ্যাশ্চ জন্তবঃ। সর্ব্বেষামেব জন্তুনাং মানুষত্বং সুদুর্লভম্॥
—গরুড়পুরাণ, ২য় অধ্যায়।

জলজা নবলক্ষানি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ। কৃময়ো রুদ্রসংখ্যাকা পক্ষিণাং দশলক্ষকম্॥
ত্রিংশলক্ষানি পশবশ্চতুর্লক্ষানি মানুষাঃ। সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ॥

স্থাবরাস্ত্রিংশল্লক্ষাশ্চ জলজা নবলক্ষকাঃ। কৃমিজা দশলক্ষাশ্চ রুদ্রলক্ষাশ্চ পক্ষিণঃ ॥
পশবো বিংশলক্ষাশ্চ চতুর্লক্ষাশ্চ মানবাঃ। এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে ॥
—কর্ম্মবিপাক।

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্। কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ ॥
ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষঞ্চ বানরাঃ। ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥
—বিষ্ণুপুরাণ।

এইরূপে পুরাণ ও তৎকালীন বিভিন্ন সংস্কৃত পুস্তকাদি পাঠে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় আখ্যানভাগেই উক্তরূপ একার্থক শ্লোক পাওয়া যায়। এমন কি, তাহাদের ভাষার মধ্যেও প্রায় কোন পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু ঐ পুস্তকগুলির দর্শনসম্বন্ধীয় আখ্যানভাগে ভাষা, অর্থ ও ভাবের প্রচুর প্রভেদ লক্ষিত হয়। দর্শনভাগে তাঁহারা ভিন্নমত হইলেও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় শ্লোকে তাঁহারা এক মতই প্রকাশ করেন; শব্দগুলিও ব্যবহার করেন এক রকমের। তাহার পর ঐ শ্লোকগুলির লিখনভঙ্গি হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐ শ্লোকগুলি অধুনালুপ্ত তৎকালীন কোনও বিজ্ঞানপুস্তকে প্রচলিত মতবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কতক বা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে; কতকগুলি বা হুবহু নকল করিয়া লওয়া হইয়াছে। উপরের "পরিকীর্ত্তিতা" শব্দটী প্রণিধানযোগ্য। তাহার পর ধারাবাহিক ও সুলিখিত বিজ্ঞানশাস্ত্রমাত্রেই কতকগুলি পরিভাষা-মূলক বা Technical বৈজ্ঞানিক শব্দ থাকে। আমাদের তথাকথিত প্রাণিবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় শ্লোক বা পুস্তকগুলিতেও ঐরূপ বহু শব্দ ব্যবহৃত হইত। জরায়ুজ, অণ্ডজ, রসজ, স্বেদজ, পোতজ, উদ্ভিজ্জ, স্থলজ, জলজ, ঊর্দ্ধক, অর্দ্ধক, অর্ব্বাক্, গন্ধবেদী, ঔদক, সরীসৃপ, একতোদত, উভয়তোদত, একশফ, দ্বিশফ, পঞ্চনখ, রূপবেদী, শফ, নখ, স্পর্শবেদী, শব্দবেদী, কর্ম্মবেদী, অনস্থিকা, অপাদা, কোশস্থ, চর্ম্মপক্ষ, নূপুরক, খড়্গী, শৃঙ্গী, জজ্ঘাল প্রভৃতি শ্রেণীবাচক শব্দগুলি যে প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষামূলক বা Technical শব্দ, তাহাতে কোন ভুল নাই। ঋগ্বেদ হইতে পুরাণ পর্য্যন্ত বিভিন্ন যুগের গ্রন্থগুলির মধ্যে উক্ত শব্দগুলির সম অর্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার ইহার সত্যতা প্রমাণ করে। প্রমাণস্বরূপ নিম্নে মাত্র কয়েকটী শ্লোক প্রদত্ত হইল।

"যে কে **চোভয়তোদতঃ**"—ঋগ্বেদ, পুরুষসূক্ত।
"রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চো**ভয়তোদতঃ**"—শ্রীমদ্ভাগবত।
"পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চো**ভয়তোদতঃ**"।—মনুসংহিতা।
"ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষাহুরনুষ্ট্রাং**শ্চৈকতোদতঃ**"॥ মনুসংহিতা, ৫ অঃ।

উক্ত শ্লোক কয়টী যথাক্রমে ঋগ্বেদ, ভাগবত ও মনুসংহিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

তিনখানি গ্রন্থেই আমরা এই "উভয়তোদত" ও "একতোদত" শব্দ দুইটী একই অর্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাই। হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞানে 'একতোদত' অর্থে যে সকল জীবের একবার করিয়া দাঁত উঠে, তাহাদের বুঝায় ও 'উভয়তোদত' অর্থে যে সকল জীবের দুইবার দাঁত উঠে অর্থাৎ দুধ-দাঁত পড়িয়া গিয়া তেলা-দাঁত উঠে, তাহাদিগকে বুঝায়। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। এখন এই শব্দ দুইটীর বিভিন্ন গ্রন্থে একই অর্থে উক্তরূপ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, এই দুইটী শব্দ পরিভাষামূলক বৈজ্ঞানিক শব্দরূপেই তৎকালে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। এইরূপ বহু বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রাচুর্য্য হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, প্রাণিবিজ্ঞান বলিয়া একখানি পৃথক্ বিজ্ঞানশাস্ত্র হয় ত আমাদের দেশে পুরাকালে প্রচলিত ছিল। ইহা ছাড়া শাস্ত্রকারগণ নিজ শাস্ত্রে প্রাণিসম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির উল্লেখ করিবার সময় প্রায়ই "ইতি কথিতঃ" বলিয়া তাঁহাদের বক্তব্য শেষ করেন। ইহার কারণ, বোধ হয় পুরাকালে অপর কোনও গ্রন্থকার বা তাঁহার গ্রন্থের নাম নিজগ্রন্থে উল্লেখ করার প্রথা ছিল না। কিংবা হস্তলিখিত পুথিগুলি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে ও কবিতাগুলির সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই এই রীতির প্রচলন ছিল। প্রমাণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটী পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পংক্তি কয়টী দাল্‌ভ্য কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি রুরু, কারণ্ডব ও কঙ্কজীব সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, সেই বিবরণ যে, কোন একখানি অনুক্তনামা (Unnamed) পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা প্রকারান্তরে তিনি বলিয়াই দিয়াছেন। উপরিউক্ত পক্ষী ও হরিণ জীব সম্বন্ধে বিবরণসম্বলিত নিম্নে উদ্ধৃত পংক্তি কয়টী অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। তবে কোন্ পুস্তক হইতে পঙ্‌ক্তি কয়টী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। পুস্তকখানি এখনও পাওয়া যায় নাই।

> "**কূলেচরমাহ**……রুরুঃ শরদি শৃঙ্গত্যাগী।
> তল্লক্ষণং উচ্যতে—বিকটবহুবিষাণঃ শম্বরাকারদেহঃ, সলিলতটচরিত্বাৎ সঞ্চরেভ্যো বিচিত্রঃ। ত্যজতি শরদি শৃঙ্গং রৌতি"—ইত্যসৌ রুরুঃ স্যাৎ।
> কারণ্ডবঃ শুক্লহংসভেদোঽল্পঃ **অন্যে করহরমাহুঃ।**
> উ**ক্তঞ্চ**—'কারণ্ডবঃ কাকবক্ত্রো দীর্ঘাঙ্ঘ্রিঃ কৃষ্ণবর্ণভাক্" ইতি।
> **প্রসহানাহ**…কঙ্কঃ দীর্ঘচঞ্চুর্ম্মহাপ্রাণঃ।
> **উক্তঞ্চ**—কঙ্কঃ স্যাৎ কঙ্কমল্লাখ্যো বাণপত্রার্হপক্ষকঃ।
> লোহপৃষ্ঠো দীর্ঘপাদঃ পক্ষাধঃ পাণ্ডুবর্ণভাক্॥" ইতি।

দর্শনপুস্তকাদিতেই আমরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু প্রাণিবিষয়ক শ্লোক পাইয়া থাকি। ধরা যাউক, কোনও একজন দার্শনিক দর্শনসম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিলেন। সহজেই বুঝা যায় যে, একজন দার্শনিকের পক্ষে ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া বিশেষ করিয়া

সেই দর্শনশাস্ত্রে নানা কথা ও উপমাচ্ছলে তাঁহাকে শুধু প্রাণিবিষয়ক কেন, উদ্ভিদ্‌শাস্ত্র সম্বন্ধেও অনেক বিষয় উল্লেখ করিতে দেখা গেল। এখন আমরা যদি বলি যে, পূর্ব্বে প্রাণি-বিজ্ঞান বলিয়া একাধিক শাস্ত্রগ্রন্থ ছিল এবং উহা হইতেই নানা সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ নানা প্রাণিবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে বোধ হয়, বিশেষ অন্যায় হয় না।

বস্তুতঃ প্রাণিবিজ্ঞান বলিয়া একটী পৃথক্ বিদ্যা যে পুরাকালে এদেশে বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা নিম্নলিখিত উক্তিটীতে পাইয়া থাকি। শুধু প্রাণিবিজ্ঞান কেন, অন্যান্য বহুবিধ অধুনালুপ্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের উল্লেখ ইহার মধ্যে আমরা পাইয়া থাকি। উহাতে নারদ, শনৎকুমারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কি কি শাস্ত্র বা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে বলিতেছেন। অধীত বিষয়গুলির মধ্যে আমরা ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, পিত্র্য বা পিতৃসম্বন্ধীয়, রাশি বা অঙ্কশাস্ত্র, দৈব বা আবহাওয়া, নিধি বা ধনবিদ্যা, বাকোবাক্য বা তর্কশাস্ত্র, একায়ন বা নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা বা ভূমিকম্পাদি উৎপাতসম্বন্ধীয় বিদ্যা, **ভূতবিদ্যা বা প্রাণিবিজ্ঞান**, ক্ষত্রবিদ্যা বা যুদ্ধশাস্ত্র, নক্ষত্রবিদ্যা, **সর্পবিদ্যা**, দেবজন বা সুগন্ধিবিদ্যার বা শাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই।

"ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং, পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং, দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং **ভূতবিদ্যাং** ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাম্ এতদ্‌ভগবোহধ্যেমি ॥"—ছান্দোগ্য, ৭অ, ১ খণ্ড, ২।

ভূত অর্থে মনুষ্যেতর প্রাণীদিগকেই বুঝায়। দর্শনশাস্ত্রে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক নামে মনুষ্যদিগের তিন প্রকার দুঃখের কথা বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে আধিভৌতিক দুঃখ অর্থাৎ যে দুঃখ হিংস্রজন্তু আদি দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রে ভূতবলি অর্থে পশু পক্ষী প্রভৃতিকে প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রী বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং ভূত অর্থে যে প্রাণিবর্গই বুঝাইয়া থাকে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। সর্ব্বভূতে দয়া অর্থে সর্ব্বপ্রাণীতে দয়া বুঝায়। এই জন্য "ভূতবিদ্যা" অর্থে আমরা প্রাণিবিদ্যাই বুঝিয়াছি। এই ভূতবিদ্যা ছাড়া 'ভূততন্ত্র' বলিয়া অপর একটী বিদ্যার উল্লেখ আমরা কোনও কোনও শাস্ত্রগ্রন্থে পাই বটে, কিন্তু আমার মতে উহা একটী পৃথক্ শাস্ত্র। ভূতবিদ্যা বলিতে প্রাণিবিদ্যা ও ভূততন্ত্র বলিতে মানসিক রোগের চিকিৎসামূলক কোনও গ্রন্থ বুঝাইত বলিয়াই মনে হয়। উপরের অংশে ভূতবিদ্যা বা প্রাণিবিজ্ঞান ব্যতীত সর্পবিদ্যারূপ প্রাণিবিজ্ঞানের একটী বিভাগবিশেষেরও উল্লেখ দেখা যায়। তৎকালে সর্পের সংখ্যা-ধিক্যবশতঃ সর্পভীতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বোধ হয় বিশেষ করিয়া এই সর্পবিদ্যার প্রচলন হইয়াছিল। তাই আয়ুর্ব্বেদাদি পাঠে কৃমি কীটাদির ন্যায় সর্পাদি সম্বন্ধেও অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। ইহা ছাড়া প্রাণিবিষয়ক বহু বিজ্ঞান-

সাহিত্যাদিতে আমরা পাইয়া থাকি। প্রমাণস্বরূপ শালিহোত্র গ্রন্থের কথা বলা যাইতে পারে। শালিহোত্রই ইহার রচয়িতা ছিলেন। পঞ্চতন্ত্র উপাখ্যানে আমরা ইঁহার উল্লেখ পাই মাত্র। কতিপয় অশ্ব ও বানর পুড়িয়া গেলে, কোনও রাজা এই শালিহোত্রের সন্ধান লন। পঞ্চতন্ত্রে ইহার বর্ণনা আছে। কিন্তু এই শালিহোত্র এখন একখানি অধুনা-লুপ্ত গ্রন্থ। ইহার কোনও খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নাই। ইহা ছাড়া 'আগদ তন্ত্র' নামক এক প্রকার শাস্ত্রের উল্লেখ আমরা আয়ুর্ব্বেদাদি গ্রন্থে পাই। কীটবিদ্যা এই আগদ তন্ত্রের অন্তর্গত। কিন্তু এই তন্ত্রের একখানি পুস্তকও আমরা পাই নাই। তবে পালকপীয়-প্রণীত গজায়ুর্ব্বেদ এবং জয়দত্ত ও নকুল-প্রণীত অশ্ব-গবায়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি কয়েকখানি চিকিৎসামূলক প্রাণিবিজ্ঞান এখনও পাওয়া যায়। সে যুগে অশ্ব, গজ ও গবাদির রক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার জন্য হিন্দুগণ ঐ সকল শাস্ত্রগ্রন্থ বিশেষ ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই কারণেই ইহাদের কয়েকখানি এখনও আমরা পাইয়া থাকি। এই চিকিৎসামূলক প্রাণিবিজ্ঞান ছাড়া কয়েকখানি সাধারণ প্রাণিবিজ্ঞানও আমরা পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে শৈনিকশাস্ত্রম্ (Hucking birds) ও মৃগপক্ষিশাস্ত্রম্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমখানি স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে উদ্ধার করেন, দ্বিতীয়খানি স্বর্গীয় ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ বিহার হইতে প্রাপ্ত হন। দুইখানিই প্রাচীন হস্ত-লিখিত গ্রন্থ। পুস্তক দুইখানি যে সঙ্কলিত গ্রন্থ, তাহা উহার প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেই বুঝা যায়। ইহা ছাড়া আর একখানি সুলিখিত প্রাণিবিজ্ঞান পুস্তকও পাওয়া যায়; উহার নাম তত্ত্বার্থাধিগম। উমাস্বাতি নামক একজন জৈন কবি উহার রচয়িতা। ইহা ছাড়া দাল্‌ভ্য ও লাদায়নের প্রাণিসম্বন্ধীয় বিবরণও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই সকল গ্রন্থ হইতে আমরা সবিশেষ বুঝিতে পারি যে, পুরাকালে হিন্দুস্থানে প্রাণি-বিজ্ঞানের বিশেষ প্রচলন ছিল। চেষ্টা করিলে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এইরূপ আরও অনেক গ্রন্থ উদ্ধার করা যাইতে পারে। আমি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া নিম্নলিখিত কয়খানি প্রাচীন প্রাণিবিজ্ঞানের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, উহাদের একখানিও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। হয় ত সব কয়খানিই লুপ্ত হইয়া থাকিবে। নিম্নে উহাদের নামের একটী তালিকা দিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব শেষ করিলাম। পুস্তকগুলি সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিব।

ক। সরীসৃপবিষয়ক।—১। লতাবিস্ফোটক। ২। উজ্জয়িনী গ্রন্থ। ৩। ভূসরীসৃপ-রাজভাষা। ৪। নাগার্জ্জুনতন্ত্র। ৫। মণিলতা গ্রন্থ। খ। পক্ষিবিষয়ক—১। খেচরীমালা। ২। বিহঙ্গমতন্ত্র। ৩। হিমাদ্রিশাখাতন্ত্র। ৪। ভূমালা গ্রন্থ। ৫। ভীম্বরী গ্রন্থ। গ। স্তন্যপায়িবিষয়ক।—১। পুষ্পমালা গ্রন্থ। ২। শকুন্ত লেখ। ৩। নিষাদতন্ত্র। ৪। নিষাদমহাভাষ্য। ৫। জীবধর্ম্ম। ৬। সংগোপন গ্রন্থ। ৭। শাখামৃগ গ্রন্থ। ঘ। প্রাপ্ত গ্রন্থাদি—১। মৃগপক্ষিশাস্ত্রম্। ২। তত্ত্বার্থাধিগম। ৩। শৈনিকশাস্ত্রম্।

এইবার কি ভাবে আমাদের নষ্ট প্রাণিবিজ্ঞান উদ্ধার লাভ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমরা জানি, পূর্ব্বকালে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ চীন ও তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া, তিব্বতের বৌদ্ধ মঠ প্রভৃতিতে রক্ষিত ছিল। বিদেশীয়দিগের আক্রমণের সময় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ নেপালে নীত হইয়াছিল। তাহাদের অনেকগুলি নেপাল দরবার-পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। ঐ সকল দেশে শীতের প্রাধান্য হেতু গ্রন্থকীটের উপদ্রব নাই। পুস্তকগুলিও নষ্ট হয় নাই। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ঐ দুইটী দেশ হইতে হিন্দুর অধুনালুপ্ত প্রাণিবিজ্ঞানের উদ্ধার হইতে পারে। কিন্তু উহা যদি নাও সম্ভব হয়, তাহা হইলেও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। নানা সংস্কৃত গ্রন্থ, কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রসমুদয়ে বিক্ষিপ্ত প্রাণিসম্বন্ধীয় তথ্যসকল একত্র সংগ্রহ করিলে উহাই একটী ধারাবাহিক প্রাণিবিজ্ঞানশাস্ত্রে পরিণত হইতে পারিবে। লুপ্ত প্রাণিবিজ্ঞান উদ্ধার লাভ করিবে সত্য, কিন্তু ঐ তথ্যসমুদয় এত সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত আছে যে, সাধারণের পক্ষে উহার প্রকৃত অর্থ সব সময় বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না। কোন কোন শ্লোক আবার রূপকচ্ছলে লিখিত। সেই জন্য তাহার অর্থ নির্ণয় করা কঠিন। দার্শনিক শ্লোকগুলির যথার্থ ব্যাখ্যা পণ্ডিতগণ প্রদান করিয়াছেন সত্য। কিন্তু বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির তাঁহারা প্রায়ই ভুল অর্থ করিয়া গিয়াছেন। তাহার কারণ, গত পাঁচ ছয় শতাব্দী যাবৎ চর্চ্চার অভাবে তাঁহারা বিজ্ঞান একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অনেকে জোর করিয়া বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির আবার দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। উহাদের যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। এই শ্লোকগুলির বেশীর ভাগ দর্শনসম্বন্ধীয় পুস্তকের মধ্যে কথাচ্ছলে লিখিত হওয়ায় তাঁহারা ঐরূপ ভুল করিয়াছেন। এই রূপকাত্মক শ্লোকগুলির বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যথার্থ অর্থ নির্ণয় দ্বারাই এখন হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার সম্ভব হইতে পারে।

বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত প্রাণিসম্বন্ধীয় বিক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই আমি আমাদের দেশের নষ্ট প্রাণিবিজ্ঞান উদ্ধার করিতে মনস্থ করিয়াছি। কারণ, আমার বিশ্বাস, লুপ্ত প্রাণিবিজ্ঞান হইতেই ঐ শ্লোকগুলি গৃহীত হইয়াছিল। কিরূপ প্রণালীতে উহা সম্ভব হইবে, তাহার একটী সহজ দৃষ্টান্ত দিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব আমি শেষ করিব।

ধরা যাউক, কোন একজন লোক ছোট ছোট কাঠের টুকরা দিয়া তৈয়ারী একটী খেলনার বাড়ী টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। কয় দিন পরে বাটী ফিরিয়া সে দেখিতে পাইল যে, সেই খেলনার বাড়ীখানি কে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে ও উহার টুকরাগুলা চারি দিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি টুকরাগুলি কোনটী উঠান, কোনটী ছাদ, কোনটী রাস্তা, কোনটী বা রোয়াক হইতে উঠাইয়া আনিয়া পুনরায় গৃহখানি তৈয়ারী করিতে সুরু করিয়া দিল। কিন্তু টুকরাগুলি সম্ভবমত স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত করার পর দেখা গেল যে একটী থাম, রোয়াকের কিছু অংশ ও একটী জানালা পাওয়া

যাইতেছে না। কিন্তু লোকটী হতাশ হইল না। সে জানালার ফাঁকের উপযুক্ত একটী জানালা গৃহের অপর একটী প্রাপ্ত জানালার অনুরূপ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া লইল। তাহার পর রোয়াকের অপ্রাপ্ত অংশ ও থামটাও ঐরূপ ভাবে তৈয়ারী করিয়া, গৃহখানি পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

এইরূপ ভাবে নষ্ট প্রাণিবিজ্ঞান আমরাও উদ্ধার করিতে পারি। কিরূপে উহা সম্ভব হইতে পারে, সে সম্বন্ধে মাত্র একটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। একশফ ও দ্বিশফ বলিয়া দুইটী বৈজ্ঞানিক শব্দ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির মধ্য হইতে আমি উদ্ধার করিলাম। একখুরবিশিষ্ট প্রাণীদিগের বৈজ্ঞানিক নাম "একশফ" ও দ্বিখুর-বিশিষ্ট প্রাণীদিগের বৈজ্ঞানিক নাম "দ্বিশফ"। কিন্তু হস্তী প্রভৃতি পঞ্চখুরবিশিষ্ট জীবও আমরা দেখিতে পাই। হস্তীর ন্যায় পাঁচ-খুরো জীবের সন্ধান হিন্দুগণ জানিতেন না, ইহা বলা হাস্যকর। সহজেই বুঝা যায় যে, যাঁহারা দ্বিশফ ও একশফ শব্দ বিভিন্ন গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা পঞ্চশফ শব্দটীও ব্যবহার করিয়াছিলেন। তবে তাহা আমরা এখন পাইতেছি না। এ স্থলে আমরা এই একশফ ও দ্বিশফ শব্দের অনুকরণে পঞ্চশফ শব্দটীও বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারি। এইরূপে অধুনা প্রাপ্ত কয়েকখানি প্রাণিবিজ্ঞান-গ্রন্থ ও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত প্রাণিবিষয়ক বিক্ষিপ্ত * শ্লোকগুলির যথার্থ অর্থ নির্ণয় করিয়া যে, একখানি ধারাবাহিক ও সম্পূর্ণ হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ রচিত হইতে পারে, তাহা আমি পরে দেখাইব।

শ্রেণীবিভাগ

শ্রেণীবিভাগ প্রাণিবিজ্ঞানমাত্রেরই প্রথম অধ্যায়। য়ুরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ জীবদিগের দৈহিক গঠন ও তাহার ক্রমোন্নতির বা devolpementএর বিষয় লক্ষ্য করিয়া জীবদিগের শ্রেণীবিভাগ করেন। বাহ্য ও আভ্যন্তরিক গঠন অনুসারেই তাঁহারা জগতের যাবতীয় প্রাণিগণকে বিভিন্ন শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যেমন আমিবা প্রভৃতি এককোষ জীবগণকে এককোষ ও বহুকোষ উর্দ্ধতন জীবগণকে বহুকোষ জীব বলিয়াছেন। বহুকোষ জীবগণের মধ্যে যাহাদের অস্থি আছে, তাহাদিগকে অস্থিক বা দণ্ডী জীব ও যাহাদের অস্থি নাই, তাহাদিগকে নিরস্থিক জীব বলা হইয়াছে। এই অস্থিক বা

* তৎকালীন বিজ্ঞ সমাজে রূপক শ্লোক লেখা একটা বাহাদুরীর বিষয় ছিল। যে সকল শ্লোকে সহজ অর্থ দেওয়া হইত, তাহাও আবার অতি সংক্ষেপে লিখিত হইত। গুরুর আশ্রমে শিষ্যগণ এই সংক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির সহজ অর্থ বুঝিয়া লইয়া মাত্র স্মরণশক্তির সাহায্যের জন্য পঠিত শাস্ত্রগুলির সারস্বরূপ ঐ সংক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি লিখিয়া লইয়া তাহারা গৃহে ফিরিত। এইরূপ সংক্ষিপ্ত লিখনপদ্ধতির প্রচলন থাকায় এই মুদ্রাযন্ত্রের যুগেও আমরা সংক্ষিপ্ত পুরাণ শ্লোকই পাইয়া থাকি। এই সংক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির যথার্থ অর্থ বুঝাইবার জন্য পরে পণ্ডিতগণ পরস্পরবিরোধী বহু টীকা লিখিতে বাধ্য হন। মধ্য যুগে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত পীঠগুলির

দণ্ডী জীবগণও আবার তাহাদের দেহের গঠন অনুসারে চক্রতুণ্ডি, শ্বাসপটী, মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী, এই সাতটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত। অপর দিকে নিরস্থিক জীব-গণকেও আবার এই একই নিয়ম অনুসারে পর্ব্ববদী, চিপিটজীব, বর্ত্তুল কৃমি প্রভৃতি "দেশে" ভাগ করা হয়। পূর্ব্বকথিত দণ্ডিদেশের ন্যায় এই সকল জীবদেশও বহু বিভাগে বিভক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ পর্ব্ববদীদেশের কথা বলা যাইতে পারে। এই পর্ব্ববদীদেশ বা phylum, খোলকী, লৌতেয়, সন্দংশমুখী, দ্বিযুগ্মপদী ও ষট্পদী, এই পাঁচটী বিভাগে বিভক্ত। এই দৈহিক বিভাগ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ প্রাণীদিগের শ্রেণীবিভাগ করিবার চেষ্টা করেন নাই! কিন্তু হিন্দু মনীষিগণের প্রাণীদিগের এই দৈহিক বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা প্রাণীদিগের মানসিক ও জননবিভাগরূপ আরও দুইটী শ্রেণীবিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। চারি প্রকার শ্রেণীবিভাগ সে যুগে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। উহাদিগকে যথাক্রমে মানসিক, জনন, দৈহিক ও স্বভাববিভাগ বলা হইত। শেষোক্ত বিভাগটী প্রাণীদিগের ভৌগোলিক অবস্থিতি ও তজ্জনিত স্বভাবের উপর নির্ভর করে। এই চতুর্ব্বিধ শ্রেণীবিভাগই হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও, তাঁহারা প্রথম দুইটী বিভাগের উপর বেশী প্রাধান্য দিতেন। দার্শনিক মতগুলির ন্যায় এই কয় প্রকার বিভাগই বহুকাল হইতে শিষ্যপরম্পরায় (parallel school of thought) একই সঙ্গে পাশাপাশি চলিয়া আসিতেছে। একটীর পর অপর একটীর উদ্ভব হইয়াছে কি না, বলা বড় কঠিন। কারণ, প্রমাণপুস্তকগুলির সব কয়খানিই প্রাচীন পুস্তক। ঐ সকল গ্রন্থ সমসাময়িক মনীষিগণ দ্বারা প্রণীত হইয়াছিল। এইবার প্রাণীদিগের এই চতুর্ব্বিধ শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা যাউক।

মানসিক বিভাগ

প্রাণীদিগের আহার বিহার, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া এই মানসিক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে প্রাণীদিগের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমিক আবির্ভাব ও তাহার অনুশীলন প্রাণীদিগের দৈহিক উন্নতির একমাত্র কারণ। সৃষ্টিক্রম বুঝাইবার সময় আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। হিন্দুমতে এই বুদ্ধিবৃত্তিই প্রাণীদিগের মধ্যে নূতন অভ্যাসের সৃষ্টি করিত। আর সেই অভ্যাসজনিত কর্ম্ম তাহাদের দেহে নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। তাঁহাদের মতে এই বুদ্ধিবৃত্তি কতকটা স্বাভাবিক ভাবে ও কতকটা স্বকীয় চেষ্টায় বংশানুক্রমে প্রাণিগণ লাভ করিয়াছে। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আর্য্য মনীষিগণ কেবল মাত্র মানসিক গঠনের উপর ভিত্তি করিয়াও প্রাণীদিগের একপ্রকার বিজ্ঞান-সম্মত শ্রেণীবিভাগ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত আদি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টী এই ভাগবত হইতেই লওয়া হইয়াছে। ভাগবতকার বৈষ্ণব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য শ্লোক কয়টীর অবতারণা করিলেও উহাতে এই মানসিক বিভাগ

যে জীব, তাহাদেরও যে প্রাণ আছে, তাহা তাঁহারা জানিতেন। তাই মুক্তকণ্ঠে তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, পশু ও বৃক্ষাদির মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই; উভয়ের মধ্যেই প্রাণ আছে, উভয়ই জীব। ইহা ছাড়া এই শ্লোক হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, প্রথমে স্থাবর জীবের সৃষ্টি হয়, তাহার পর আবির্ভাব হয় জঙ্গম জীবের। পরিশেষে এই জঙ্গম জীবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সৃষ্টি হয়।

পশুবৃক্ষাদিভেদেন জীব এব স্বতঃ স্থিতঃ।
সংসৃতৌ ব্যত্যয়স্তেষাং মুক্তৌ তত্তৎস্বরূপতা ॥
তত্র স্থাবরমুক্তেভ্যো বরা জঙ্গমমুক্তকাঃ।
তেভ্যো মানুষমুক্তশ্চ বিপ্রমুক্তাস্ততোঽধিকাঃ ॥—ভাগবত।

জীব বলিতে পশ্বাদির সহিত বৃক্ষাদিকেও বুঝায়। মনুও তাঁহার সংহিতায় এই একই কথা বলিয়া গিয়াছেন।* ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাণসত্তা দৈহিক উন্নতি লাভের পূর্ব্বেও জীবগণ অর্জ্জন করিতে পারে। সুগঠিত মস্তিষ্ক ব্যতিরেকেও প্রাণীদিগের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির আবির্ভাব হইতে পারে, ইহাই ছিল হিন্দুদের বিশ্বাস। তাঁহাদের মতে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমাবির্ভাবের ফলেই মস্তিষ্ক ও স্নায়ুপিণ্ডাদির আবির্ভাব বা ক্রমোন্নতি হইয়াছে। তাই উদ্ভিদ্-গণ ও বিশেষ করিয়া কীটভুক্ বা হিংস্র উদ্ভিদাদি এবং নিম্নশ্রেণীর নিরস্থিক জীবদিগের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাই। বুদ্ধিবৃত্তির এইরূপ পরিচয়কে অনেকে Reflex action বা প্রতিঘাতপ্রসূত বলিয়া অভিহিত করেন। আমি বলিব, এই Reflex actionই প্রথম অবস্থার বুদ্ধিবৃত্তি। একই বুদ্ধিবৃত্তিকেই আমরা তাহাদের ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে এই Reflex action বা প্রতিঘাতী, instinctive বা আত্মিক, ও intelligence বা বুদ্ধি বলিয়া থাকি। স্নায়ুপিণ্ড বা মস্তিষ্ক এই সব বৃত্তিগুলির আধার মাত্র। হিন্দু মতে এই বৃত্তিগুলির ক্রমাবির্ভাবের ফলেই তাহাদের অতি প্রয়োজনীয় আবাসস্বরূপ এই মস্তিষ্ক ও স্নায়ুপিণ্ডের সৃষ্টি হয়। তাই প্রাণিগণ যতই বুদ্ধিমান্ ও উন্নত হয়, তাহাদের মস্তিষ্কের পরিমাণও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। ১ সংখ্যক চিত্রটী দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে। চিত্রটীতে বিভিন্ন জীবের মস্তিষ্কের পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে দেখান হইয়াছে। "হিন্দু সৃষ্টিক্রম" শীর্ষক আলোচনায় এ সম্বন্ধে বিশদ ভাবে বলিব। তাঁহাদের এই জ্ঞানের জন্যই, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিয়াছেন যে, বৃক্ষগণও জীব। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা পশু ও

* উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে বীজকাণ্ডপ্ররোহিণঃ।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহুপুষ্পফলোপগাঃ ॥
তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতা কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ ॥—মনুসংহিতা।

বৃহৎকাণ্ডবিশিষ্ট, পুষ্পশোভিত, ফলবন্ত, ওষধি প্রভৃতি যাবতীয় স্থাবর জীব, যাহারা কর্ম্মহেতু তমসাবৃত হইয়া রহিয়াছে, যাহাদের প্রজ্ঞা বাহির হইতে বুঝা যায় না, কিন্তু যাহারা ভিতরে ভিতরে সুখদুঃখ অনুভব করে,

বৃক্ষাদিকে সমভাবেই জীব নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই জীবজগৎকে তাঁহারা আবার স্থাবর ও জঙ্গম, এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। উদ্ভিদ্‌জগৎকে স্থাবর ও জীব-জগৎকে জঙ্গম নামে তাঁহারা অভিহিত করেন। স্থাবর অর্থে যাহারা স্থির থাকে, ইচ্ছামত চলাফিরা করে না, তাহাদের বুঝায়। জঙ্গম অর্থে যাহারা ইচ্ছামত চলাফিরা করে বা করিতে পারে, তাহাদের বুঝায়।

ইহা ছাড়া সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধেও হিন্দুদিগের কিরূপ নির্ভুল জ্ঞান ছিল, এই শ্লোকটী হইতে তাহার একটা সঠিক ধারণা আমরা পাই। যাহা হউক, স্থাবর জীব উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের অন্তর্গত। হিন্দুগণ জঙ্গম জীব সম্বন্ধে (প্রাণিজগৎ) কি বলিয়াছেন, আমরা এখন তাহার আলোচনা করিব। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি হইতে আমরা দেখিতে পাই, মানসিক পর্য্যায়ে যাবতীয় প্রাণিগণ যথাক্রমে স্পর্শবেদী, রসবেদী, গন্ধবেদী, শব্দবেদী, রূপবেদী ও কর্ম্মবেদি-রূপ ছয়টী ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। শ্লোক কয়টী মূল ভাগবত হইতে লইয়াছি।

জীব
- স্থাবর
- জঙ্গম
  - স্পর্শবেদী
  - রসবেদী
  - গন্ধবেদী
  - শব্দবেদী
  - রূপবেদী
  - কর্ম্মবেদী
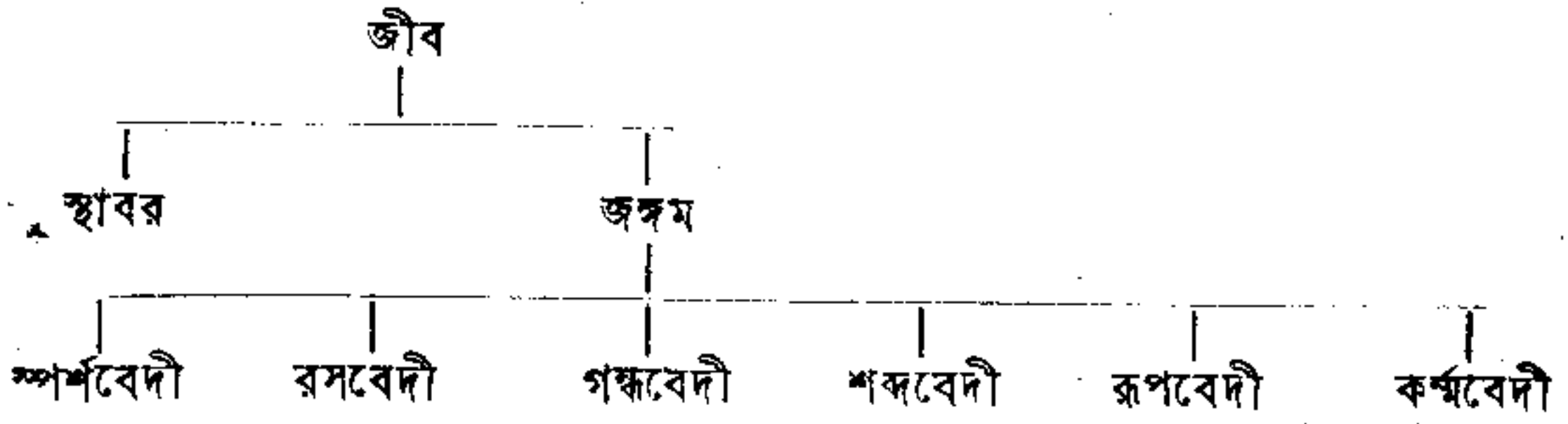
জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাঃ ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥
অত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ ॥
রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাঃ চতুষ্পাদঃ ততো দ্বিপাৎ ॥
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারঃ তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।—ভাগবত।

শ্লোকটীতে প্রথমে প্রস্তরাদি অজীব, তাহার পর উদ্ভিদাদি প্রাণবন্ত জীবদিগের কথা বলা হইয়াছে। এই প্রাণবন্ত জীবগণের মধ্যে যাহারা চিত্তবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ভাগবতের মতে সচিত্ত জীব। সচিত্ত জীব বলিতে ভাগবতকার জঙ্গম জীবকেই (Animal) বুঝাইয়াছেন। সচিত্ত জীবদিগের চিত্তাদি ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যেই প্রকাশ পায়। সেই জন্য জীবদিগের মধ্যে এই ইন্দ্রিয়াদির ক্রমাবির্ভাব ও ক্রমোন্নতি, জীবদিগের বিভিন্নরূপ চিত্তবৃত্তি অনুযায়ী সাধিত হইয়াছে বলিয়া আর্য্যগণ বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের মতে এই চিত্তবৃত্তিসমূহের (আবির্ভাবের পর) প্রয়োজন অনুসারে প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি হয়। এই ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তিই আর্য্যগণের মতে

এই পাঁচটি চিত্তবৃত্তি আছে। পর পর (যথাক্রমে) জীবদিগের মনে ইহাদের বিকাশ হয়। ফলে পর পর স্পর্শেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় প্রভৃতি পাঁচটী ইন্দ্রিয়ও ঐ সকল বৃত্তিসমূহের আধারস্বরূপ জীবদেহে স্থান পাইয়াছে। এই সব ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা চালিত অভ্যাস বা কার্য্যাদি দ্বারা জীবগণ নূতন নূতন দেহাকৃতি লাভ করে। এই ভাবে নূতন নূতন যোনি (Species) বা জীববিশেষের সৃষ্টি হয়। ফলে জীবদিগের এই মানসিক বিভাগ যে, জীবদিগের ক্রমবিকাশের উপর ভিত্তি করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে। এইবার এই মানসিক বিভাগ সম্বন্ধে বলা যাউক। উক্ত শ্লোকে প্রকারান্তরে মানসিক পর্য্যায়ে কোন্ জীবটী কোন্ জীবের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাও বলা হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, প্রথমে স্পর্শবেদী জীব, তাহার পর রসবেদী জীব, তাহার পর শব্দবেদী জীব ও তৎপরে রূপবেদী জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে স্পর্শবেদী জীব সম্বন্ধেই বলিব।

স্পর্শবেদী

পূর্ব্বোক্ত শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, যে সকল জীব কেবলমাত্র স্পর্শ দ্বারা আহারাদি সংগ্রহ, চলা ফেরার কার্য্য ও জননক্রিয়া সমাধান করে, তাহাদিগকে আর্য্যগণ স্পর্শবেদী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আহার সংগ্রহ (food procuring), চলা ফেরা (locomotion) ও জননক্রিয়া (propagation of generation), এই তিনটী ধর্ম্ম দ্বারা জীব বাঁচিয়া থাকে। স্পর্শশক্তি দ্বারা এই কার্য্যত্রয় যাহাদের সাধিত হয়, তাহাদিগকেই স্পর্শবেদী বলা হইয়াছে। তাঁহাদের মতে কীট পতঙ্গ আদি ষট্পদী জীব (Insecta) ব্যতীত যাবতীয় নিরস্থিক জীব স্পর্শবেদী প্রাণী। এই জীবগণ তাহাদের দেহস্থিত শুঁয়া (cillia), শুঁড় (tentacle) বা অনুরূপ অঙ্গাদিদ্বারা আহারাদি স্পর্শ করে। ঐরূপ স্পর্শ দ্বারা দ্রব্যকণাকে আহারাদিরূপে বুঝিতে পারিয়া, উহা তৎক্ষণাৎ তাহারা উদরস্থ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ স্পর্শশক্তি দ্বারাই পরস্পরকে চিনিয়া লইয়া মিলিত হয়। আমিবা, সিলেন্ট্রেটা, স্পঞ্জিলা, ষ্টার ফিস্ (তারা মাছ), জোঁক, কেঁচ, কেন্নু, গলদা, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি নিরস্থিক জীব এই স্পর্শবেদী জীবের অন্তর্গত। কেবলমাত্র কীটপতঙ্গ (Insecta) ব্যতীত যাবতীয় নিরস্থিক জীব হিন্দুমতে এই স্পর্শবেদী জীবের মধ্যে পড়ে। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও চক্ষু আছে, কিন্তু উহা বিশেষ সুগঠিত বা কার্য্যকারী নয়। কারণ, পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ঐ জীবগুলির চক্ষু নষ্ট করিয়া দিলেও কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ না করিয়া তাহারা জীবন ধারণ করে ইহারা জীবনধারণের জন্য কেবল মাত্র স্পর্শশক্তির (Touch sensation) উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

বিভিন্নরূপ পরীক্ষা দ্বারা ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি। আলোক নিক্ষেপ ও যন্ত্রশব্দের দ্বারা এই জীবদিগের [illegible]

নাই। তবে বন্দুকের ন্যায় কঠোর শব্দ বা জোরাল টর্চ্চের আলো দ্বারা ইহাদের গতির বৃদ্ধি হইতে দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অন্যান্য কারণ আছে। ভীষণ শব্দে বায়ুর স্তর পরিবর্ত্তিত হয় ও সেই বায়ুর চাপ জীবদেহে পতিত হওয়ায় জীববিশেষের স্বাভাবিক গতি স্বভাবতই বর্দ্ধিত হয়। সেইরূপ জোরাল আলো জীবদেহে নিক্ষিপ্ত হইলে উত্তাপ সঞ্চারিত হয় এবং উত্তাপ ও শব্দে জীবগণের গতি বর্দ্ধিত হয়। উত্তাপ ও শব্দজনিত বায়ুসঞ্চালনও এই জীবগণ স্পর্শশক্তি দ্বারা অনুভব করে। তবে ইহা পরোক্ষ ভাবে ঘটিয়া থাকে। এইখানে স্পর্শশক্তি বুঝাইতে আমরা ইংরাজী touch, heat, cold ও pain (স্পর্শ, উষ্মা, শৈত্য ও কষ্টবোধ) এই চতুর্বিধ Sensation বা বোধ বুঝিব। আমি সাধারণতঃ একটী কাচের বাক্সের মধ্যে কেঁচ, জেঁাক, কেন্নু, শুঁয়াপোকা প্রভৃতি জীব লইয়া স্বল্পশক্তি টর্চ্চের আলো ও ছোট ঘণ্টা দ্বারা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষান্তে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। মৎকল্পিত স্পর্শবিদ্ যন্ত্রটী চিত্রে দেখুন। কোন সময়েই মৃদু আলোক বা স্বল্প শব্দ দ্বারা তাহাদের গতির পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু সূক্ষ্ম কেশ দ্বারা সামান্যরূপ স্পর্শে তাহারা দ্রুত ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়াছে। এইরূপ পরীক্ষা ব্যতিরেকে তাহাদের গতি লক্ষ্য করিলেও উক্ত সত্য সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হই। তাহাদের অনেকেই সম্মুখস্থ শুয়া ও বোধিকা (feeler) প্রভৃতি অঙ্গাদি দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিতে করিতে অগ্রসর হয়। জলমধ্যেও তাহারা এইরূপে অগ্রসর হয়। খাদ্যকণাও তাহারা প্রথমে স্পর্শ করিয়া খাদ্যরূপে বুঝিতে পারিলে তবে গ্রহণ করে। স্ত্রী-সন্নিধানও তাহারা এই স্পর্শ দ্বারা জানিতে পারে। ইহাদিগকে পুরাপুরি স্পর্শবেদী জীবই বলা যাইতে পারে। কোন কোন নিরস্থিক জীবকে কোনও বিশেষ রসের সংস্পর্শে আসিয়া বা আলোকসম্পাতের মধ্যে পড়িয়া দৈহিক হ্রাস বা বৃদ্ধিরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে দেখা যায়। আমিবা আদি এককোষ জীব ও কেঁচুয়া, শামুক, ঝিনুক, জেঁাক আদি বহুকোষ জীবগণকে বিশেষ বিশেষ রসের মধ্যে ডুবাইয়া বা আলোকসম্পাতের মধ্যে ফেলিয়া অনেকে উক্তরূপ ফল পাইয়াছেন। এজন্য অনেকে মনে করেন যে, তাহাদের দর্শন বা রসের অনুভূতি আছে। কিন্তু উহা ভুল। আমরা জানি, বহু ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র বীজকোষ দ্বারা জীবমাত্রেরই দেহ গঠিত হইয়া থাকে। নিরস্থিক জীবদিগের দেহে এই বীজকোষগুলি অস্থিক প্রাণীদিগের ন্যায় ঘনসন্নিবিষ্ট নয়। কোষগুলির গাত্রাচ্ছাদনও থাকে কিছু পাতলা। কোষগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট না হওয়ায় ও সেই কোষগুলির গাত্রাচ্ছাদন পাতলা থাকায় উক্তরূপ রসসংযোগ বা আলোকপাত দ্বারা উহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ একপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া সাধিত হয়। আর তজ্জন্যই জীব-দিগের ব্যবহারের মধ্যে এই তারতম্য লক্ষিত হয়। এইরূপ বোধকে আমরা স্পর্শবোধই বলিব। তবে ইহা পরোক্ষভাবে ঘটিয়া থাকে। এইবার অনেকে বলিবেন যে, তাহাই যদি হয়, তবে কোনও কোনও নিরস্থিক জীবের মধ্যে চক্ষু পরিলক্ষিত হয় কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই চক্ষু কখনই সুগঠিত হয় না। এই সম্বন্ধে শম্বুক, চিংড়ি

মতে নিরস্থিক জীবদিগের মধ্যে কোনরূপ বর্ণবোধ নাই। তাহা ছাড়া চিঙড়ি আদি জীব প্রায়ই আলো পছন্দ করে না। তবে যদি লোহিত (লাল কাচের মধ্য দিয়া) আলো উপর হইতে (Vertically) সরল ভাবে তাহাদের উপর ফেলা যায়, তবে অন্ধকার অপেক্ষা উহারা লোহিত আলোই বেশী পছন্দ করে। কিন্তু এই লোহিত আলোক পার্শ্ব হইতে (Horizontally) ফেলিলে উহা তাহারা পছন্দ করে না।* এই পরীক্ষাও হেস সাহেব করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হিন্দুমতে চিত্তবৃত্তির আধারস্বরূপে ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি হয়। চিঙড়ি জীবের এই ব্যবহার ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহাদের মধ্যে দর্শনরূপ এই বিশেষ চিত্তবৃত্তির আবির্ভাব আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু উহার পরিশেষ হয় নাই। সেই জন্য উহার আধারস্বরূপ চক্ষু দুইটীরও গঠন সম্পূর্ণ হয় নাই। সেকারণ উহাদের চক্ষু দুইটী বিশেষ কার্য্যকরও নয়। এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শ্বেত আলো তাহারা উপভোগ করিতে পারে না। কিন্তু শ্বেত আলোর অংশবিশেষ লোহিত আলোক তাহাদের উপভোগ্য।* অথচ লোহিত আলোর সংস্পর্শে আসা তাহাদের সাধারণ ভাবে ঘটিয়া উঠে না। এইরূপে বুঝা যায় যে, পূর্ণায়তন চক্ষু গঠনের একটী ধাপমাত্র আমরা চিঙড়ি প্রভৃতির চক্ষুর মধ্যে দেখিতে পাই। চিঙড়ির চক্ষুর গঠন সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইলে ইহার স্বাভাবিক ব্যবহারের তারতম্য ঘটিত এবং তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালীও ভিন্নরূপ হইত। আর এইরূপ হইলে চিঙড়ি অপর একটী জীবে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। তবে চিঙড়ির পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কাহারও কাহারও এই সৌভাগ্য হইয়াছিল। ফলে তাহারা উর্দ্ধতর কোন জীবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। চক্ষুহীন নিকৃষ্ট জীব হইতে চক্ষুষ্মান্ উন্নত জীবের সৃষ্টির মধ্যবর্ত্তী সময়ে যে সকল মাঝামাঝি জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল, এই চিঙড়ি আদি জীব ছিল তাহাদের একটী। সেই জন্যই এই চিঙড়ির চক্ষু সুগঠিত হয় নাই। দৃষ্টিবোধের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে ধীরে ধীরে চক্ষুরও গঠন সাধিত হয়। চক্ষুহীন জীব হইতে চক্ষুষ্মান্ জীব সৃষ্ট হয়। গঠন শেষ হইবার পর ইহার কার্য্যকারিতা ধরা পড়ে, অর্দ্ধগঠিত অবস্থায় কোন ইন্দ্রিয়াদিই কার্য্যকারী হয় না। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ইন্দ্রিয়াদির বিকাশই ক্রম-বিকাশের মূল ভিত্তি। প্রথম অবস্থায় সকল জীবই ছিল স্পর্শবেদী, তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী ছিল একই রকমের। পরে এই স্পর্শবেদী জীব হইতে রসনেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির ক্রমাবির্ভাবের ফলে অন্যান্য জীবের সৃষ্টি হয়। যাহা হউক, এই স্পর্শবোধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, এই দুই প্রকারে সাধিত হয়। শম্বুক, ঝিনুক প্রভৃতি জীবের সারা

---

* Bell, J.C. 1906, The reactions of the crayfish. Harvard, Psych. Studies, Vol. 2, P. 615.

1910. Neue Untersuchungen uber den Lichtsinn. bei wirbellosen Tieren. Ibid, Bd. 136, S. 282.

দেহব্যাপী স্পর্শকোষ বিস্তৃত থাকে। প্রত্যক্ষ ভাবে স্পর্শজ্ঞানের জন্য অন্যান্য জীবদের ন্যায় ইহাদের সকলের বোধিকা বা Feeler নাই। খাদ্যকণা ভাসিতে ভাসিতে ইহাদের গাত্র স্পর্শ করিলে, তবে ইহারা খাদ্যকে খাদ্যরূপে জানিয়া লয়। মাকড়সারও এই স্পর্শবোধ অনেক সময় পরোক্ষ ভাবে সাধিত হয়। তাহারা জাল বুনিয়া, সেই জালের উপর অবস্থান করে। সেই জালে সামান্যমাত্র কম্পনও তাহাদের স্পর্শবোধ জাগ্রত করে। জালে শিকার পড়িবামাত্র তাহাতে কম্পন আরম্ভ হয়। মাকড়সাও জানিতে পারে যে, তাহার জালে শিকার পড়িয়াছে। Negal সাহেবের মতে* মাকড়সার গন্ধবোধ একেবারেই নাই। ইহাদের চক্ষু আছে বটে, তবে বর্ণবোধ নাই। তাহারা সকলেই বর্ণবোধহীন বা colour blind, ফলে এই কম্পনের উপরই তাহারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। স্পর্শদ্বারাই তাহারা এই কম্পন অনুভব করে। তাই মাকড়সারও সারা দেহে এই স্পর্শকোষ বিস্তৃত আছে। শুধু মাকড়সা কেন, কীটপতঙ্গ (Insecta) ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পর্ববদ্ধী জীব সম্বন্ধেও এইরূপ বলা চলে। গলদা, কাঁকড়া আদি জীবের দেহ শক্ত খোলা দিয়া ঢাকা থাকে বটে, কিন্তু সেই জন্য তাহাদের দেহে, বোধিকাদ্বয়ে ও শুঁয়ার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক প্রকার সূক্ষ্ম কেশ দেখা যায়। চিংড়িমাছের চিত্রটি দেখুন। এই সূক্ষ্ম কেশসকল স্পর্শকোষ দ্বারাই গঠিত। স্পর্শদ্বারাই ইহারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। কৃমি আদি জীবের দেহে বোধিকা বা অনুরূপ কোন অঙ্গাদি নাই। ইহাদের অনেকেই পরগাছারূপে অন্য জীবের দেহাভ্যন্তরে বাস করে। কিন্তু ইহাদের দেহেও অসংখ্য স্পর্শকোষ বিদ্যমান আছে। চিপিট কৃমিজাতীয় Planaria জীবের মাথার কাছ বরাবর দুইটী বিশেষ ক্ষুদ্র অপাঙ্গ আছে। বার্ডেন সাহেব বলেন, উহারা স্পর্শবোধক। এই অপাঙ্গদ্বয়ের স্পর্শবোধ এত বেশী যে, স্রোতের অনতিদূরে কোনও খাদ্যাদি থাকিলে, সেই খাদ্যকণাস্পৃষ্ট জলকণার স্পর্শ হইতেই তাহা তাহারা জানিয়া লয়। তারা মাছ অপর একটী নিরস্থিক জীব। ইহাদের স্পর্শজ্ঞানও ঠিক এই Planaria জীবের ন্যায়। পাদপার্শ্বস্থ Poda দ্বারাই সম্ভবত তাহাদের এত বেশী স্পর্শজ্ঞান জন্মে। তারামাছের ছবি দেখুন। একটী চিমটা দ্বারা এক খণ্ড মাংস তাহাদের "পোডার" সম্মুখে ধরিলে তাহাদিগকে সেই মাংসের দিকে আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। কিন্তু খাদ্য দূরে ধরিলে তাহারা বুঝিতে পারে না। সেই জন্য রসজ্ঞান অপেক্ষা স্পর্শজ্ঞান তাহাদের মধ্যে বেশী বলিয়া মনে হয়। তবে Podar কোষগুলির মধ্যে কোনও প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্যও এইরূপ হইতে পারে। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়াছি। এই রাসায়নিক বোধকে আমরা

---

* Mc. Cook, H. C., 1889—1893. American spiders and their spinning work. 3 Vols.

Pritchett, A. H. 1904, Hearing and Smell in spiders. Am. Nat, Vol. 38, P. 859.

1894. Zur. Physiologie und Psychologie der Actinien, Ibid. Bd. 59, S. 415.
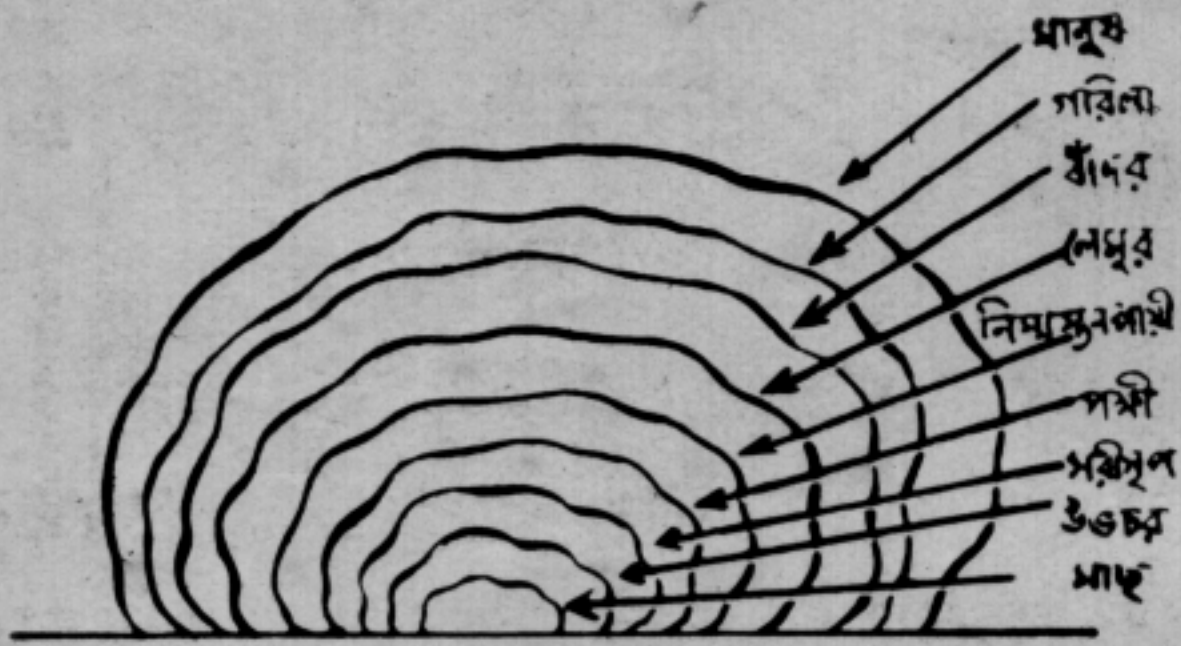
১। জীবভেদে মস্তিষ্কের পরিমাণভেদ

৪। তারা মাছ
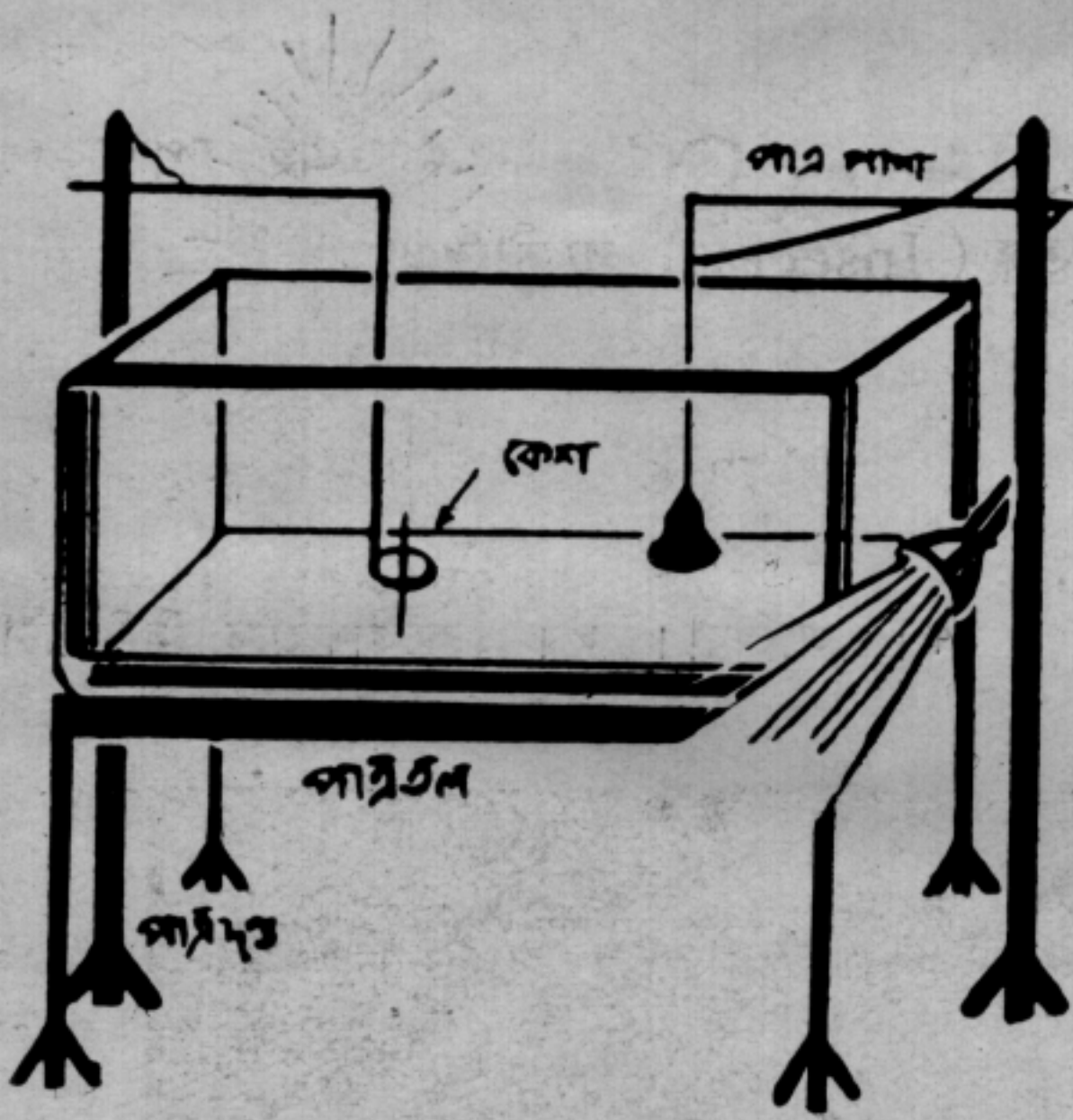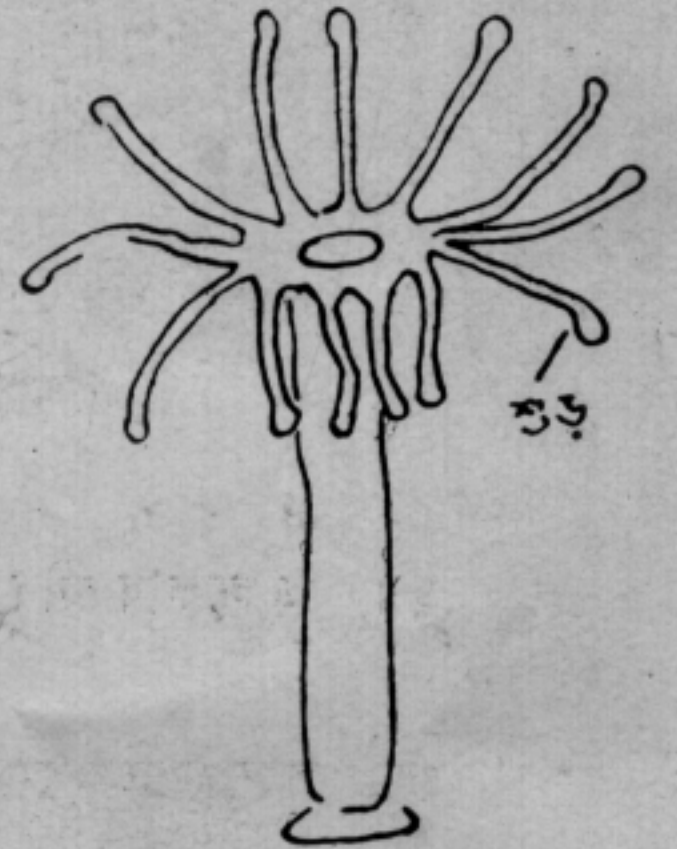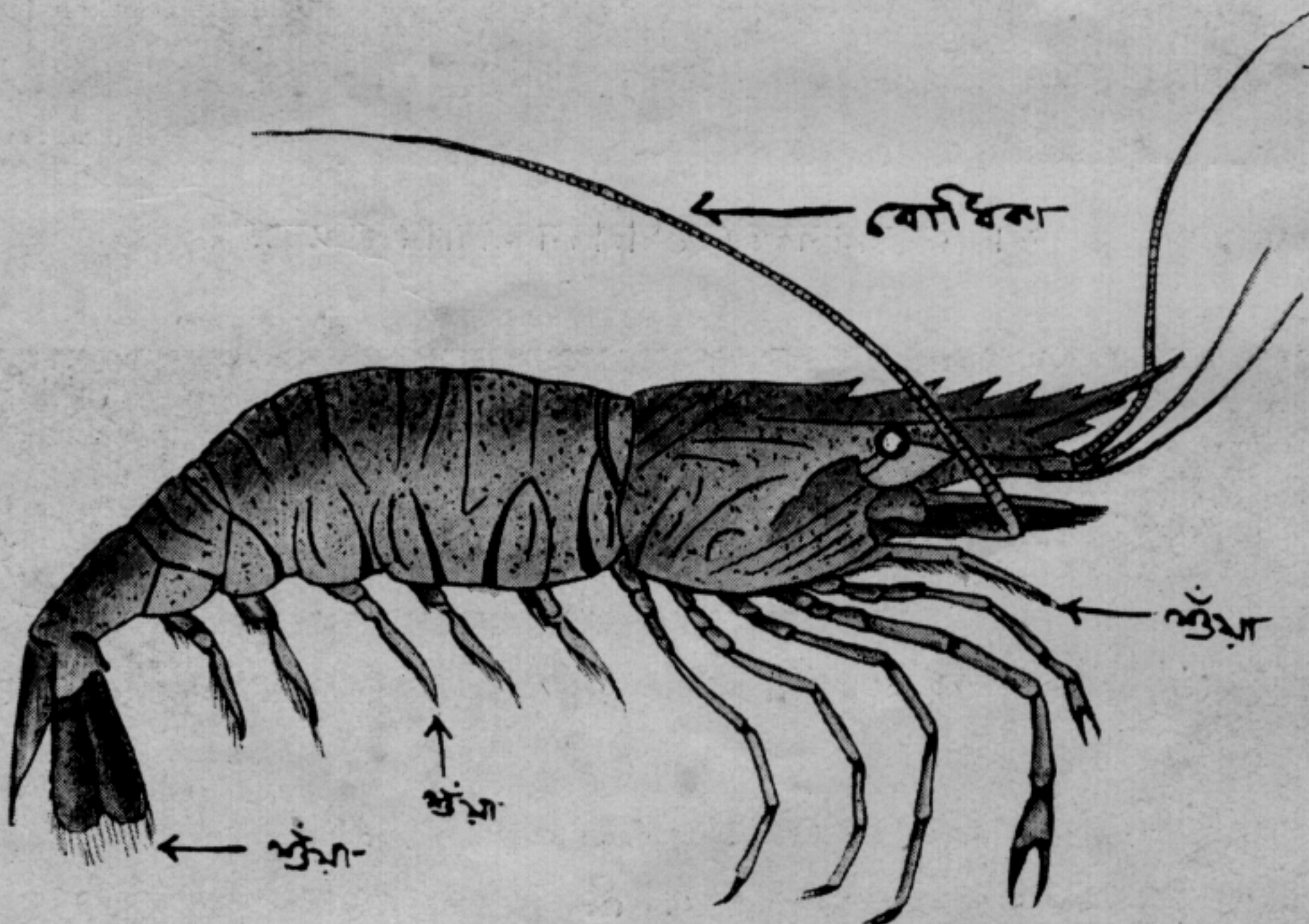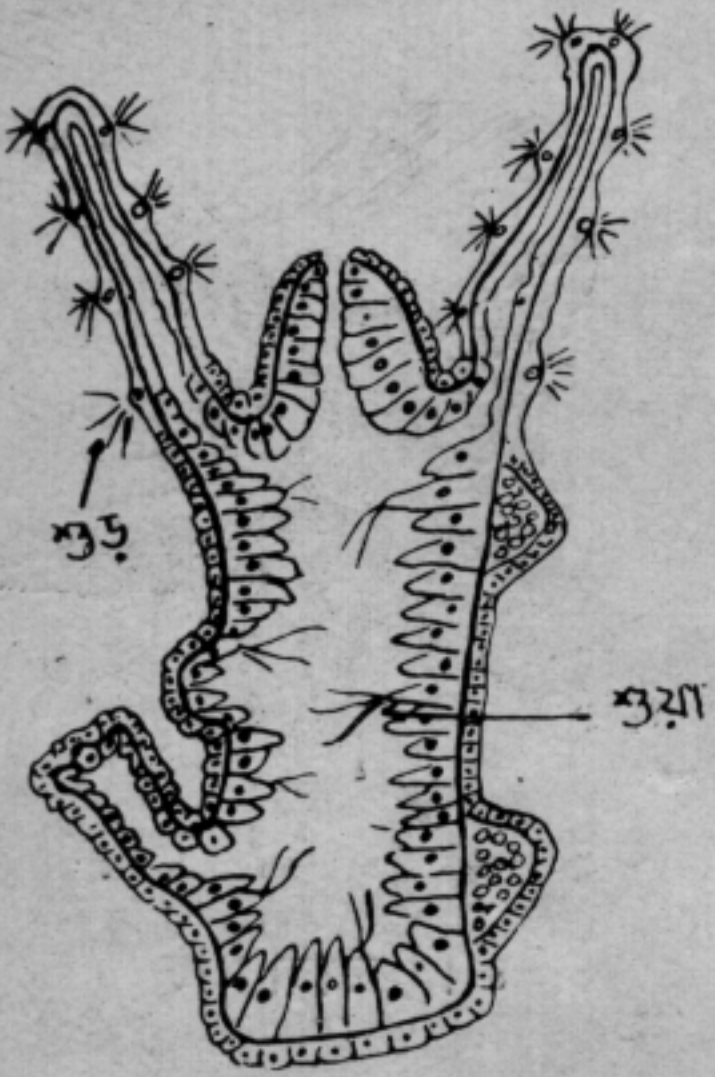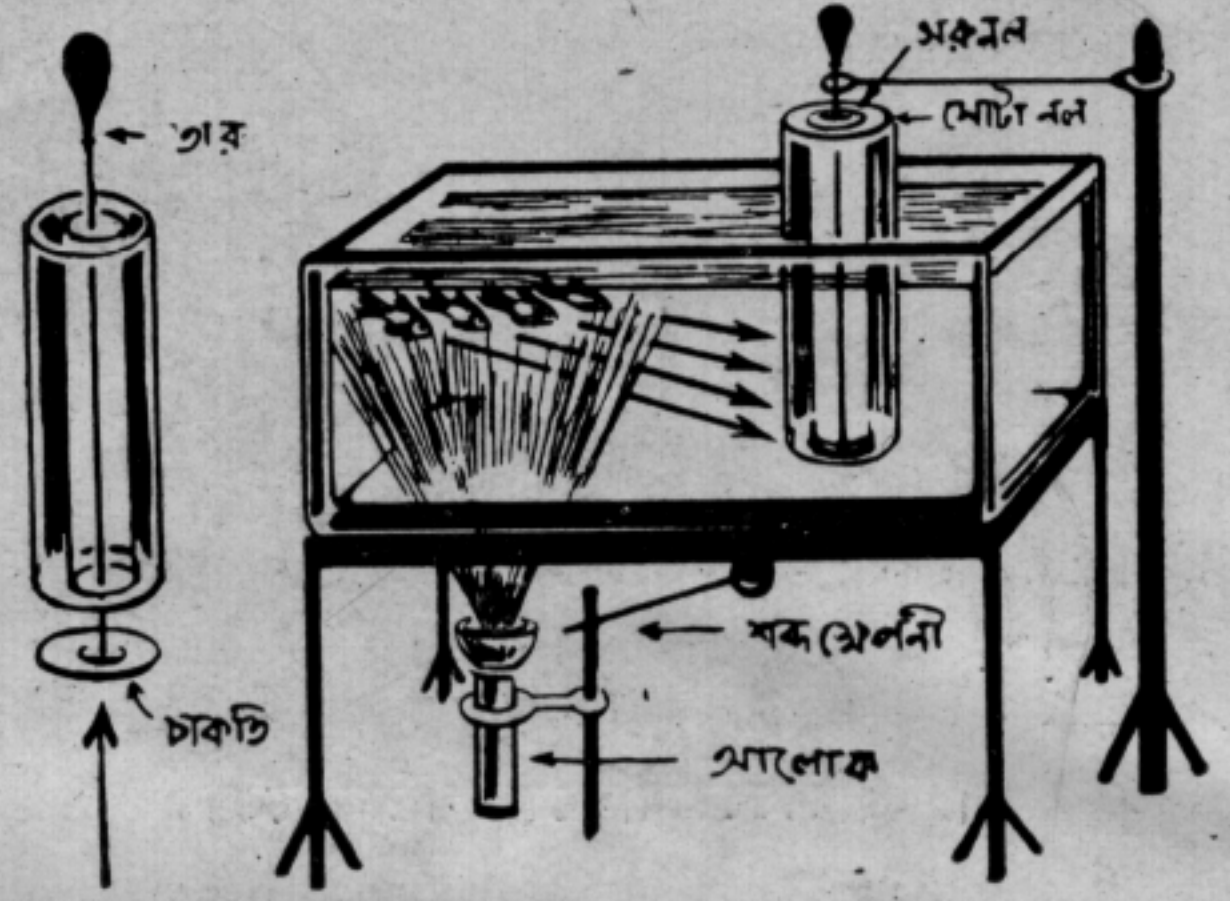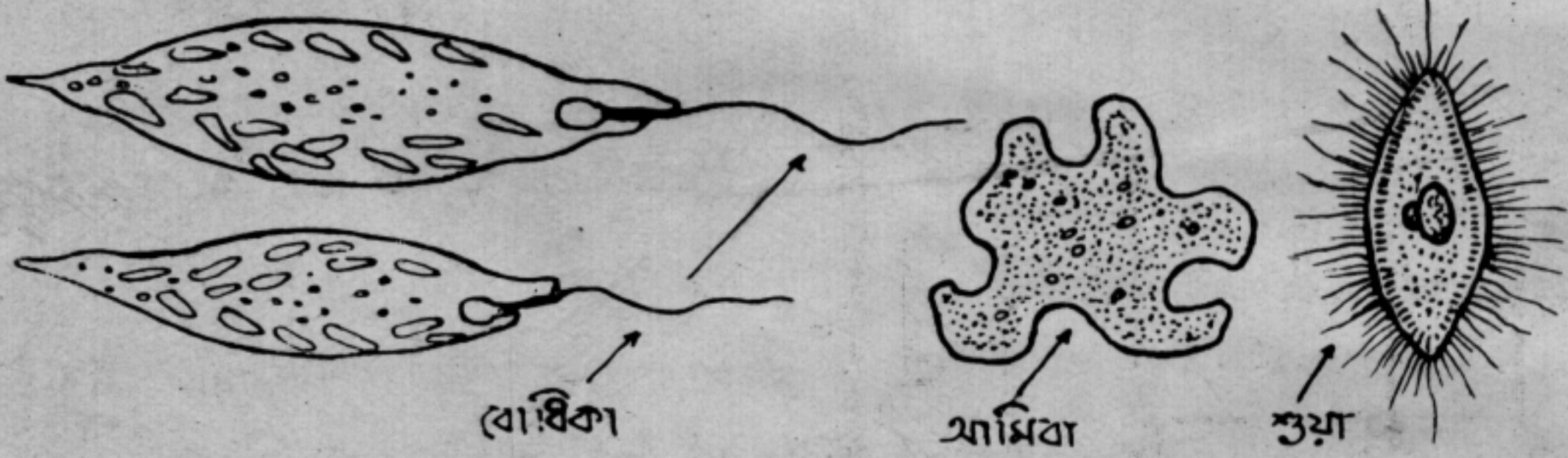
৫ (ক)। হাইড্রা, বহির্দ্দৃশ্য

২। স্পর্শবিদ্‌যন্ত্র
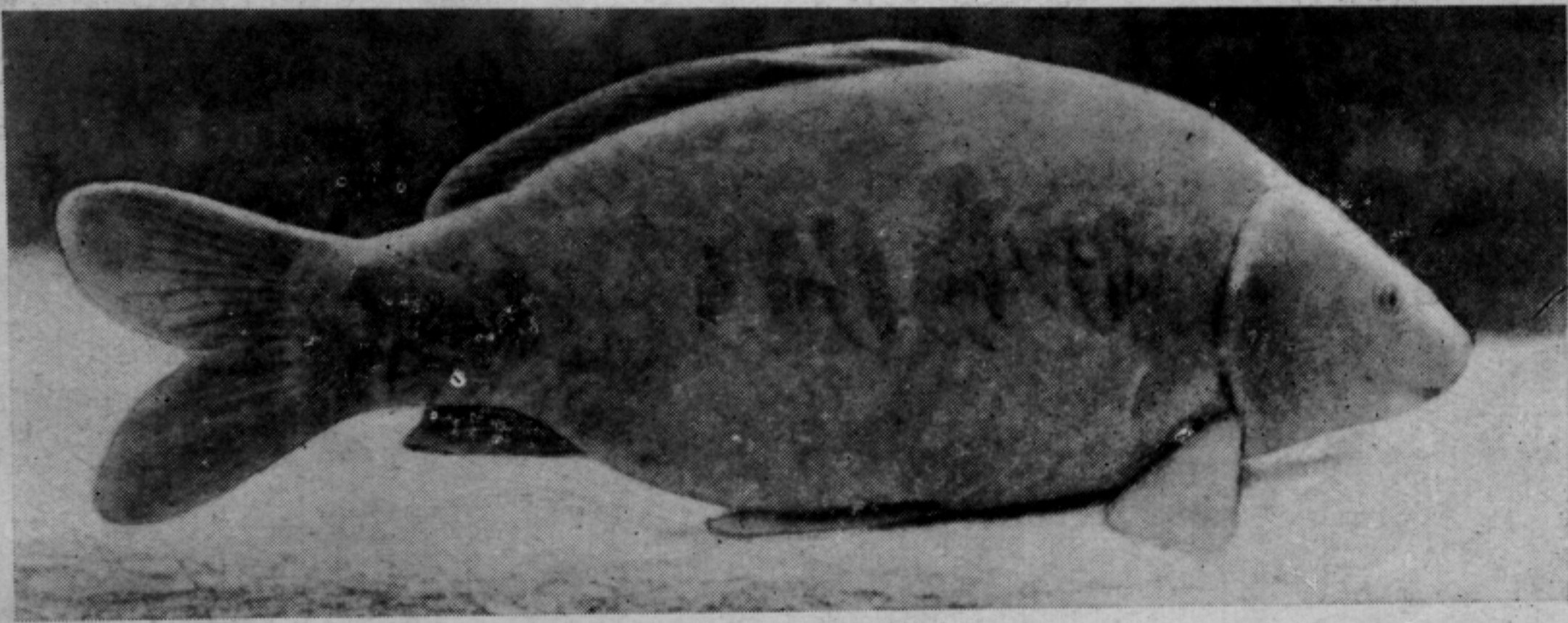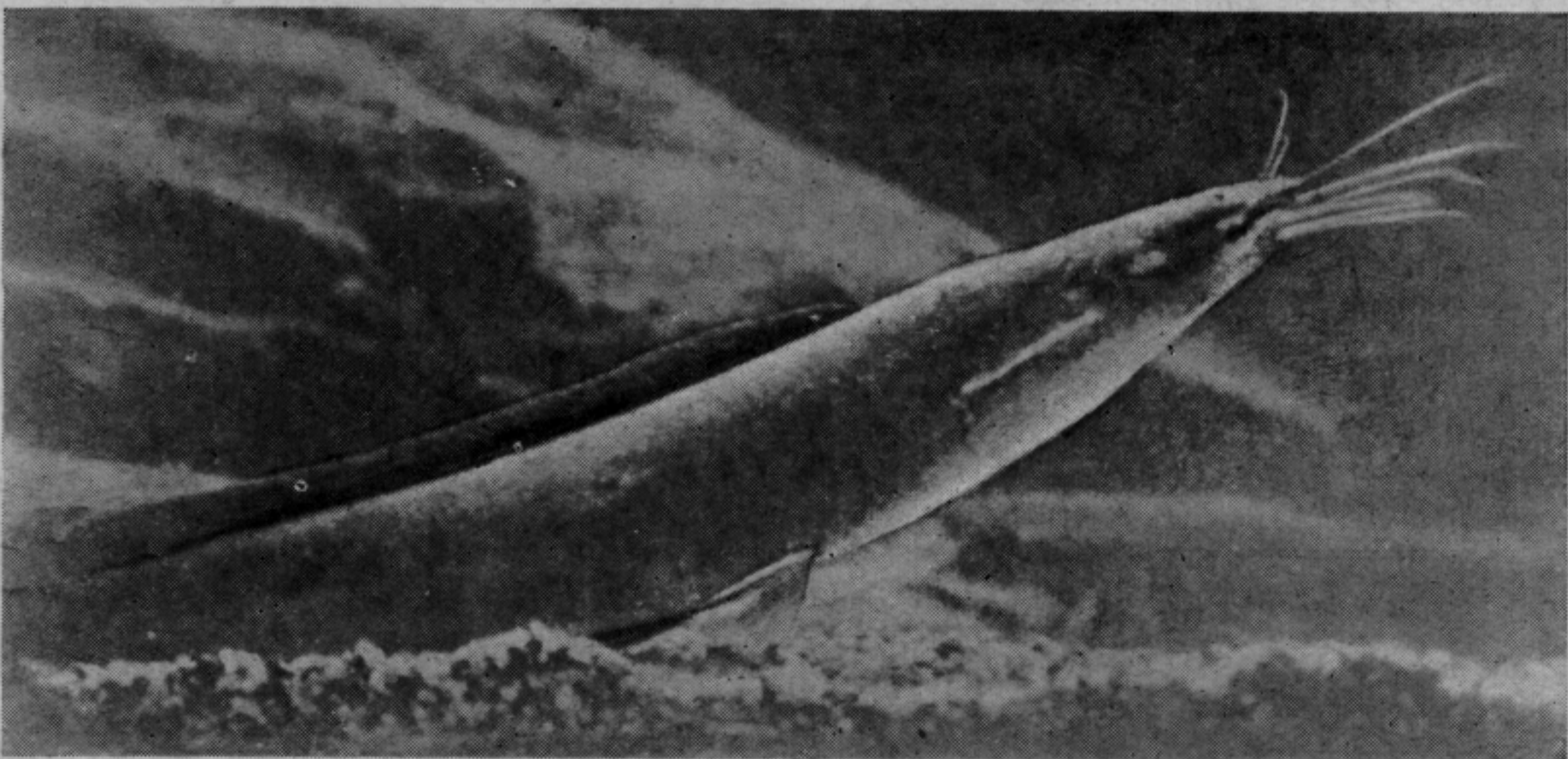
৩। চিঙ্‌ড়ি মাছ

স্পর্শবোধই বলিব। হাইড্রা আদি জীবের স্পর্শবোধ * এত বেশী যে, এক খণ্ড মাংস তাহাদের শুঁড়গুলিতে ছোঁয়াইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়, কিন্তু মাংসের পরিবর্ত্তে কাষ্ঠখণ্ড ব্যবহার করিলে উক্তরূপ ফল পাওয়া যায় না। তবে ঐ ক্ষেত্রেও তাহাদের স্পর্শবোধ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার (Chemical) দ্বারা সাধিত হয় বলিয়াই মনে হয়। হাইড্রা আদি জীবের দেহাভ্যন্তরের কোষগুলির সমাবেশ হইতেও তাহাদের স্পর্শবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ৫ (ক, খ) সংখ্যক চিত্রে দেখা যাইবে যে, এই জীবটীর স্পর্শবোধক (Tentacle) শুঁড় আছে। ইহার খাদ্যনলীর দুই পার্শ্বের কোষগুলির আবার শুয়া থাকে। এই শুয়া দ্বারা খাদ্যকণাগুলিকে খাদ্যরূপে বুঝিতে পারিয়া তবে তাহারা গ্রহণ করে। পুরাপুরি এককোষ জীবদিগের দেহেও এই স্পর্শবোধের জন্য একাধিক শুঁড় দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন Paramacium জীব। কালক্রমে তাহাদের দেহের চারি ধারে একটী পুরু আবরণের সৃষ্টি হওয়ায় কেবলমাত্র স্পর্শবোধের জন্যই তাহাদের এই শুয়া বা flagilar আবির্ভাব হয়। ৬ সংখ্যক চিত্র দেখুন।

তবে প্রথম এককোষ জীব আমিবার শুঁড় নাই। ৭ সংখ্যক চিত্র দেখুন। তাই তাহারা সমস্ত দেহ দিয়াই স্পর্শবোধ করে। স্পর্শবোধ দ্বারাই তাহারা অখাদ্য পরিত্যাগ করে ও খাদ্য বাছিয়া লয়। পরীক্ষাদ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, Insecta ব্যতীত সমস্ত নিরস্থিক জীবই স্পর্শবেদী জীব। ইহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে রস, দৃষ্টি প্রভৃতি অন্যান্যবিষয়ক বোধ যে একেবারে নাই, তাহা নয়। বিশেষ করিয়া কোনও কোনও উচ্চতম নিরস্থিক সম্বন্ধে ত এ কথা একেবারেই বলা চলে না। তবে স্পর্শজ্ঞান অপেক্ষা অন্যান্যবিষয়ক বোধ তাহাদের যে অনেক কম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রস ও দৃষ্টি প্রভৃতির অভাবে তাহারা বাচিতে পারে, কিন্তু স্পর্শবোধের অভাব হইলে তাহাদের পক্ষে এক মুহূর্ত্তও বাচা অসম্ভব। কারণ, ইহারা সকলেই স্পর্শবেদী জীব।

স্পর্শবেদী জীবের উপবিভাগ থাকাও অসম্ভব নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্পর্শবোধ বলিতে শীতবোধ বা cold sensation, উষ্মাবোধ বা heat sensation, কষ্ট বোধ বা pain sensation বুঝায়। তাহার পর কঠিন বা মৃদু স্পর্শ (pressure) প্রভৃতিরও তারতম্য অছে। বহুপ্রকারের স্পর্শবেদী জীব যে নাই, তাহা কে বলিতে পারে? কোন কোন নিরস্থিক জীবে হয় ত-উষ্মাকোষের আধিক্য আছে। ইহাদের উষ্মাবেদী বলা যাইতে পারে। কোন কোন জীবের দেহে হয় ত স্পর্শকোষের (touch spot) আধিক্য দেখা যাইবে। তবে এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান এখনও হয় নাই। আমি যত দূর পরীক্ষা করিয়াছি, তাহাতে জোঁকের মধ্যে শৈত্য-বোধ, কেঁচোর মধ্যে উষ্মাবোধ ও কেন্ন জীবের

* 1894. zur. Physiologie und Psychologie der Actiuien. Ibid. Bd. 59. S, 415.

মধ্যে স্পর্শবোধ বেশী দেখিয়াছি। ইহাদের ব্যবহার ও তদনুযায়ী দেহাকৃতি হয় ত তাহাদের এই বিভিন্নরূপ বোধাধিক্যের উপর নির্ভর করে। তবে উহা এখনও অনুসন্ধান-সাপেক্ষ।

রসবেদী

স্পর্শবেদী জীবগণের পরই হিন্দু মনীষিগণ মৎস্যাদিকে মানসিক পর্য্যায়ে দ্বিতীয় স্থান দিয়া থাকেন। মৎস্যকে তাঁহারা রসবেদী জীব নামে অভিহিত করেন। ইহাদের গাত্র কঠিন আঁশ দ্বারা আবৃত থাকায় ইহাদের স্পর্শবোধ হয় না। তাহার পর জলের মধ্যে তাপের কোনও হ্রাস বৃদ্ধি নাই। সেই জন্য শীত উষ্ণ প্রভৃতি বোধের তাহাদের প্রয়োজনও নাই। গভীর জলে বাস করায় ইহাদের দৃষ্টিশক্তিরও বিশেষ পরিচালনা সম্ভব হয় না। আমরা জানি, বেগুনি, নীল, সবুজ, পীত, কমলা প্রভৃতি সাতটী বর্ণদ্বারা শ্বেত আলোক গঠিত। জলমধ্যে লোহিত আলোক ১০০ মিটারের নিম্নে একেবারেই দৃষ্ট হয় না। সেইরূপ ৫০০ মিটারের নীচে জলমধ্যে সমস্ত সবুজ আলোক বিনষ্ট হইয়া যায়। একমাত্র বেগুনি রঙই ১০০০ মিটার নিম্ন পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। ডুবুরিরা মাত্র ৩০ মিটার জলের মধ্যে নামিলে লোহিত বর্ণকে আর লোহিত বলিয়া বুঝিতে পারে না; তখন লাল তাহাদের কাছে কাল বলিয়া প্রতীত হয়। কেবলমাত্র চক্ষুদ্বারা জলমধ্যে জীবন নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। তাহার উপর ইহাদের চক্ষুও সবিশেষ সুগঠিত ও কার্য্যকর নয়। ইহাদের কর্ণযন্ত্র আছে বটে। কিন্তু মাছ তাহাদের কর্ণদ্বারা সমতা (balance) ও দেহভার রক্ষা করে মাত্র। আমরা জানি যে, এই কর্ণ দ্বারা জীবগণ শ্রবণ ও ভার রক্ষা, এই দুই প্রকারে উপকৃত হয়। কর্ণযন্ত্র অপসারিত করিলে আমরা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারি না। কর্ণের অংশবিশেষ, অর্দ্ধচন্দ্রাকার নলীত্রয়ে একপ্রকার জলীয় পদার্থ থাকে। এই জলীয় পদার্থের উত্থান ও পতন হইতে জীবগণ তাহাদের দেহের সমতা বা ভার রক্ষা করে। কর্ণের শ্রবণাংশ বা কোচেলা ইহাদের নাই। তাই মৎস্যের কর্ণযন্ত্রও ভার রক্ষার (balance) সহায়ক হয় মাত্র। Kreidl এবং আরও অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে মাছ একেবারেই শুনিতে পায় না। * বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা তাঁহারা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

আর্য্য মনীষিগণের মতে মুখবিবরের চারি পার্শ্বস্থ পাতলা চামড়া দ্বারা ইহারা জল স্পর্শ করে; স্পর্শ বলিতে এখানে রসগ্রহণ বুঝিব। কারণ, রসকোষ দ্বারাই তাহারা উক্তরূপে জল স্পর্শ করিয়া থাকে। ঐ রসকোষ ইহাদের সমস্ত মুখবিবর, মস্তক ও দেহে ছড়াইয়া আছে। এইরূপ স্পর্শদ্বারা তাহারা জলমধ্যস্থিত খাদ্যাখাদ্য ও তাহার অবস্থান নিরূপিত করে। জলমধ্যস্থ খাদ্যাখাদ্য জলের স্বরূপ বদলাইয়া দিয়া থাকে।

---

* 1895. Vebes die. Schallper caption der Fische. Pflügers Arch, Bd. 61. S. 450.
1896. Ein. weiterer versuch uber der angebliche Horenlines Glockenzeichens

মুখের ভিতরকার পাতলা চামড়া দ্বারা মৎস্য জলের গুণাগুণ (composition of water) বিচার করে। শত্রুসন্নিধানবশতঃ জলের চাঞ্চল্যও (wave length and wave circle) তাহারা এই ভাবে মুখবিবরে উপলব্ধি করিয়া সাবধান হয়। অনেক ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র জীব ও জলজ উদ্ভিদ্ মৎস্যগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে। জলের মধ্যে এই সকল উদ্ভিদ্ বা জীববিশেষ অবস্থান করিলে জলের আস্বাদ বদলাইয়া যায়। এই জন্য দূর হইতেই জলের আস্বাদন দ্বারা মৎস্য জীব তাহাদের খাদ্যাদির সঠিক অবস্থান জানিয়া লয়। তাহা ছাড়া জলের এই গুণাগুণ ও চাঞ্চল্য তাহাদের গতিও নির্দ্ধারিত করে। মৎস্য জীবের জলে বুদ্বুদ্ কাটার উদ্দেশ্য শুধু শ্বাসক্রিয়া নয়, উক্তরূপ রস উপলব্ধিও মৎস্যগণ এই ভাবে করিয়া থাকে। মৎস্য জীবের উভয় পার্শ্বে দুইটী পার্শ্বরেখা দেখা যায়। উহাদিগকে বাহির হইতে দুইটী সাদা রেখার মতন (lateral line) মনে হয়। বোধ হয়, এই পার্শ্বরেখা দুইটীও কতক পরিমাণে রসবোধ কার্য্যে মৎস্যের সহায়ক হয়। তাহার পর স্ত্রীমৎস্যের সন্নিধানও এই রসবোধ দ্বারা পুংমৎস্যেরা বুঝিতে পারে। ঋতুকালে স্ত্রী-মৎস্যদিগের দেহ হইতে একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ (sceretion) নির্গত হয়। এই রাসায়নিক পদার্থ পুংমৎস্যের দেহ স্পর্শ করা মাত্র তাহারা বীজ ছাড়িতে থাকে। এই ভাবে পরস্পরের সন্নিধান পরস্পরে অবগত হইয়া তাহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বীজ ছাড়ে। পরে ভাসিতে ভাসিতে অদূরস্থ স্ত্রীবীজের সহিত পুংবীজ মিলিত হইলে মৎস্যশিশুর উৎপত্তি হয়। মৎস্য জীব তাহাদের আহার সংগ্রহ, চলাফেরা, জননক্রিয়া প্রভৃতি কার্য্যে একান্ত ভাবে যে এই রসবোধের উপর নির্ভর করে, তাহাদের দেহে রসকোষের আধিক্যই তৎসম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অন্যান্য জীবে রসকোষ (Taste cell) মাত্র জিহ্বার মধ্যে অবস্থিত থাকে। কিন্তু মৎস্য জীবের শুধু মুখবিবরে নয়, সমস্ত গাত্রে এই রসকোষ প্রভূত সংখ্যায় ছড়াইয়া রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে সুবিখ্যাত প্রাণিবিষয়ক গ্রন্থ Parker and Haswell, II volএর ১০৫ পৃষ্ঠায় বিশেষ উল্লেখ আছে। নিম্নের পাদটীকায় উহার কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।*

মৎস্য জীবের এই রসকোষের আধিক্য দেখিয়া তাহারা যে রসবেদী জীব, এ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হই। কি ভাবে সমস্ত দেহ দিয়া তাহারা রস গ্রহণ করে, তাহা আমরা ৯ ও ১০ সংখ্যক চিত্রদ্বয় হইতে বুঝিতে পারিব। নিম্নোক্তরূপ কয়েকটী পরীক্ষা দ্বারাও আমি উক্তরূপ সত্যে উপনীত হইয়াছি। এই পরীক্ষা একপ্রকার যন্ত্রদ্বারা সমাধা হইয়া থাকে। যন্ত্রটী মৎকর্তৃক কল্পিত ও নির্ম্মিত হইয়াছে। ১১ সংখ্যক রসবিদ্‌যন্ত্র দেখুন।

একটী চৌবাচ্চাকার কাচের পাত্র জলপূর্ণ করিয়া কয়েকটি লোহিত মৎস্য তাহাতে ছাড়িয়া দিলাম। তাহার পর পাত্রটীর এক পার্শ্ব বা তলদেশে আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করিলাম। কিন্তু

* The sense of taste has for its special taste buds, similar in general character to the end buds in the skin and composed of narrow rod-shaped cells. In fishes these are widely distributed in the mouth, branchial cavities and on the outer

মৎস্যগুলিকে উপর হইতে নিম্নে নামিতে দেখা গেল না। জলের উপরকার ভাসমান খাদ্যকণা ছাড়িয়া কেহই নীচে নামিল না। ইহার পর খাদ্যকণাগুলি উঠাইয়া লওয়া হইল, তত্রাচ কেহ আলোকরশ্মি দ্বারা আকৃষ্ট বা ভীত হইয়া স্থান পরিত্যাগ করিল না। জলের এক পার্শ্বে মৃদু আলোড়ন দ্বারা বা পাত্রের তলদেশে মৃদু আঘাত করিয়াও তাহাদের মধ্যে কোন চাঞ্চল্যের আবির্ভাব হইল না। পরে মৎস্যশিশুগুলির চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়া, সেই জলে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তাহার পর কাচের একটা মোটা নল সেই পাত্রের ভিতরকার জলমধ্যে কতকটা দূরে নামাইয়া দিলাম। তৎপরে অপেক্ষাকৃত একটী সরু নলের তলদেশ একটী টীনের গোল চাকৃতি দিয়া আবৃত করিয়া, ঐ নলটী পূর্ব্বোক্ত স্থূল নলের ভিতর দিয়া জলের তলদেশে নামাইয়া দেওয়া হইল। আর চাকতির সহিত একটী সরু শক্ত তার এমন ভাবে আটকাইয়া রাখা হইল যে, ইচ্ছামত উহা উপর হইতে টানিয়া বা ঠেলিয়া ঐ সরু নলটীর তলার মুখ বন্ধ করা বা খোলা যাইতে পারে। ইহার পর জলের উপর কিছু খাদ্যকণা দিয়া দেখা গেল যে, মাছ কয়টী উপরে আসিয়া আহার্য্যের চারি ধারে আপনা হইতেই একে একে মিলিত হইতেছে। তাহার পর সেই নলটীর মধ্যে distilled water ভর্ত্তি করিয়া, উহা সেই মোটা নলের মধ্য দিয়া জলের নীচে নামাইয়া দিয়া, উপর হইতে উক্তরূপে তারটী ঠেলিয়া দিয়া, উভয়বিধ জলের মিশ্রণ ঘটান হইল। কিন্তু উহাতে মৎস্যগণ উপর হইতে নিম্নে আকৃষ্ট হইল না। পরে এইরূপ পরীক্ষা চিনির জলের (sugar water) সাহায্যে করা হইলে দেখা গেল, মৎস্যগণ তৎক্ষণাৎ উপর হইতে নিম্নে নামিয়া আসিতেছে। চক্ষুষ্মান্ ও চক্ষুহীন (হৃতচক্ষু) উভয়বিধ মৎস্য দিয়াই উল্লিখিত পরীক্ষা মৎকর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে এবং উহাদ্বারা আমি একপ্রকারই ফল পাইয়াছি। osmetic pressure ও জলের আলোড়ন প্রভৃতি যাহাতে জলতলে উক্তরূপ মিশ্রণের বাধা ঘটাইতে না পারে, সেই জন্যই চাকতি ও স্থূল নলটী ব্যবহার করিয়াছি। চিত্র হইতে উহা বুঝা যাইবে।

মৎস্য যে রসবেদী জীব, সে সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ। কিন্তু কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক বলেন যে, মৎস্যের জীবন যাপনের জন্য দৃষ্টিশক্তিও তাহাদের বিশেষ সহায়ক হয়। তাঁহারা নাকি এ বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এই পরীক্ষা অল্লায়তন কাচের চৌবাচ্চার মধ্যে করিয়াছেন। অগাধ জলরাশির মধ্যে তাহাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখেন নাই। জলমধ্যে মাত্র ৩০ মিটার নিম্নে দৃষ্টিশক্তির কি রকম ব্যতিক্রম হয়, সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি। ৩০ মিটার জলের নিম্নে যে লাল রঙ্‌কে লাল বলিয়া বুঝা যায় না, লাল রঙ্ কাল হইয়া যায়, তাহা সকলেই জানেন। জলের গভীরতা অনুযায়ী অন্যান্য বর্ণও অনুরূপভাবে লুপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহা ছাড়া বায়ুর ন্যায় জলেরও বিভিন্ন স্তর আছে। স্তরের বিভিন্নরূপ ঘনত্ব হেতু আলোর সরল গতি সব সময় অব্যাহত থাকে না। মরুভূমিতে মরীচিকা প্রভৃতির ন্যায় জলমধ্যেও

মৎস্যের কোনওরূপ সাহায্যে ত আসেই না, বরং উহা তাহাদের বিশেষ বিপদের কারণ হইয়া উঠে। ধূসর কাচের (opaque glass) মধ্য দিয়া যেমন কেবলমাত্র প্রতিহত আলো (diffused light) ও অস্পষ্ট রূপ বা ছায়াদি দেখা যায়, মৎস্যের চক্ষু দিয়াও তেমনি মাত্র আলোর ঘনত্ব বুঝা যায়, কোনও বস্তুবিশেষ পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয় না। তবে অনেক বৈজ্ঞানিকই মৎস্যের দৃষ্টিহীনতা সম্বন্ধে সন্দিহান। হয় ত উহাদের দৃষ্টিশক্তি আছে; কিন্তু তাহা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কোনও স্থির বস্তুকে তাহারা বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারে না—অবশ্য যতক্ষণ না ঐ বস্তুবিশেষ নড়িয়া উঠে। তাহার পর মাত্র দুই এক ফুটের মধ্যে বস্তুবিশেষ থাকিলে তবে তাহারা উহা দেখিতে পায়—তাহাও আবার ছায়াকারে দেখে। তাহার উপর বস্তুবিশেষের পরিস্থিতি, আকার ও উহার দূরত্ব বুঝা মৎস্যের পক্ষে অসম্ভব। মানুষও কেবলমাত্র চক্ষুদ্বারা বস্তুবিশেষের দূরত্ব বুঝিতে পারে না। স্পর্শবোধ ও দৃষ্টিবোধ, এই উভয়বিধ বোধের সমন্বয় দ্বারাই দ্রব্যাদির দূরত্ব মানুষের বোধগম্য হয়। স্পর্শবোধের অভাবে বঙ্গদেশের লোকেরা পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া পর্ব্বতাদির দূরত্ব সম্বন্ধে প্রায়ই ভুল মত প্রকাশ করে। কিন্তু ঐরূপ ভুল পার্ব্বত্য প্রদেশবাসীরা করে না। কারণ, যাওয়া আসার ফলে তাহাদের দূরত্বসম্বন্ধীয় স্পর্শবোধ জন্মিয়াছে। মানুষেরই যখন এই ভুল হয়, তখন মৎস্য ত দূরের কথা। তবে স্পর্শবোধ যেমন মানুষের দৃষ্টিশক্তির সহায়ক হয়, রসবোধ কি মৎস্যাদির সেইরূপ দৃষ্টিশক্তির সহায়ক হয়? কিন্তু আমার মনে হয়, চক্ষু না থাকিলেও মৎস্য বাচিয়া থাকিতে পারে। জীবন যাপনের জন্য তাহাদের রসবোধই যথেষ্ট। তাহাই যদি হয়, তবে তাহাদের চক্ষু থাকার প্রয়োজন কি? অনেকে মনে করেন, শুধু দেখিবার জন্য চক্ষু ব্যবহৃত হয়; কিন্তু উহা ভুল। আরও অনেক বিষয়ে উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। মৎস্যের কথাই ধরা যাউক। মৎস্য চক্ষু দ্বারা শুধু আলোক গ্রহণ করে না, আলোক শোষণও করিয়া থাকে। বিষয়টী একটু বুঝাইয়া বলা দরকার। আমরা জানি, পারিপার্শ্বিক বর্ণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জীবগণের দেহে বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন মরুবাসী জীবগণ ধূসর বর্ণের হয়, আর মেরুবাসী জীবগণ হয় বরফের ন্যায়ই সাদা। কারণ, ইহাতে তাহাদের আত্মরক্ষার সুবিধা হয়। পারিপার্শ্বিক বর্ণের সহিত মিশিয়া থাকায় শত্রুগণ তাহাদের খুঁজিয়া পায় না। আমার মতে চক্ষু দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়। মাছের চক্ষুর উপর লাল আলো ফেলিলে দেখ যায় যে, মাছের দেহটীও লাল হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে "The Animal Mind" নামক পুস্তকের ১৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত ছত্র কয়টী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। * পরীক্ষার

---

* These fishes become strikingly bluish on blue ground, greenish on green ground and so forth, adapting themselves to blue, green, yellow, orange, pink and brown and less successfully to red. The colour-changes are brought about by certain pigment controlling mechanism in the skin which are connected with the sympathetic nervous system. But the colour stimulus acts through its effect on the eyes : the changes do not occur if the eyes are covered......if one eye

দ্বারা এই সব নিরূপিত হইয়াছে। এই পরীক্ষা বৈজ্ঞানিক Mast সাহেব সুচারুরূপেই করিয়াছেন। লাল, নীল ও সবুজ আবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া তিনি মৎস্যদিগকে যথাক্রমে লাল, নীল ও সবুজ হইতে দেখিয়াছেন। মৎস্তদিগের চক্ষু আবৃত করিয়া দিবার পর কিন্তু তাহাদের দেহের বর্ণপরিবর্ত্তন আর হয় নাই। তাহার পর ইহাদের একটী চক্ষুর উপর কালো ও অপর চক্ষুর উপর সাদা আলো ফেলিয়া তিনি দেখিয়াছেন যে, মৎস্যগণ ধূসর বর্ণের হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু মৎস্যের এই রূপ পরিবর্ত্তনের জন্য কেহ যেন মনে না করেন যে, মৎস্য একটী রঙ্ হইতে অপর একটী রঙ্ বাছিয়া লইবার ক্ষমতা রাখে। এরূপ ক্ষমতা মৎস্যের নাই। বৈজ্ঞানিক Watson সাহেবও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ মত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। "Animal Mind"এর ১৬৩ পৃষ্ঠায় তাঁহার মত সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ লিখিত আছে। নিম্নের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। * Watson সাহেবের এই মত হইতেও আমরা বলিতে পারি যে. দৃষ্টিশক্তি মৎস্যে বেশী কিছু কাজে আসে না। চক্ষু না থাকিলেও তাহারা অনায়াসে বাচিয়া থাকিতে পারে। এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির উপর মৎস্য বিশেষ নির্ভর করে না। তাহারা জীবনধারণার্থ রসবোধের উপরই সমধিক নির্ভর করে। এখন দেখিতে হইবে, মৎস্য ছাড়া আর কোনও জীব এই রসবেদী শ্রেণীর মধ্যে পড়ে কি না? আমার মনে হয়, নিম্নতম উভচর জীবগণকে রসবেদী জীবদিগের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। তবে ভেকাদি উচ্চতম উভচর জীবগণকে শব্দবেদী জীবদিগের মধ্যেই ফেলা উচিত। ভেক, বেঙাচি অবস্থায় রসবেদী জীব হইলেও ভেক অবস্থায় শব্দবেদী জীব। রসবেদী জীব হইতে শব্দবেদী জীবের সৃষ্টি হইবার সময় যে সকল মাঝামাঝি জীব সৃষ্ট হইয়াছিল, ভেকাদি জীব ছিল তাহাদের একটী। তাই শৈশবে থাকে তাহারা রসবেদী, আর প্রাপ্তবয়সে হইয়া পড়ে শব্দবেদী। আমার মনে হয়, পৃথিবীর প্রথম উভচর জীব রসবেদীই ছিল। তাহাদের জীবন যাপনের প্রণালী ছিল—আজকালকার ফুসফুস মাছের (lungs fish) ন্যায়। বেশীর ভাগ সময় তাহারা জলেই থাকিত, যেমন ফুসফুস মাছেরা থাকে। যাহা হউক, মানসিক পর্য্যায়ে "রসবেদী" বলিতে প্রাণীদিগের একটী প্রাথমিক বিভাগ বুঝায়। এখন দেখিতে হইবে, মানসিক পর্য্যায়ে প্রাথমিক বিভাগের কোন উপবিভাগ ছিল কি না। সহজ বুদ্ধিতে আমরা দেখিতে পাই যে, সমুদয় রসবেদী জীব নিম্নলিখিত ভাবে দুইটী বিশিষ্ট উপবিভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজীতে

---

* Ordinarily we mean when we say that an animal is sensitive to difference in wave length that such stimuli play a role in the adjustment of the animal to food, sexual objects, shelter, escape from the enemies etc. i. e. that such stimuli initiate actively in arcs which end "in the striped muscles." Because the changes of colour are produced not by such arcs, but by the sympathetic nervous

ইহাদিগকে যথাক্রমে fresh water fish এবং salt water fish বলা হইয়া থাকে। হিন্দুগণও এই সম্বন্ধে ভাবিয়াছিলেন। নিম্নের শ্লোকটীতে ইহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

নাদেয়া মধুরা মৎস্যা গুরবো মারুতাপহাঃ।
সামুদ্রা গুরবঃ স্নিগ্ধা মধুরা নাতিপিত্তলাঃ॥—আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

বিভিন্নরূপ জলের বিভিন্নরূপ প্রকৃতি হইয়া থাকে। জলের প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে রসেরও তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। রসের তারতম্য অনুসারে ব্যবহারেরও তারতম্য ঘটে। জীবের ব্যবহার অনুযায়ী আবার তাহাদের দেহেরও পরিবর্ত্তন হয়। তাই আমরা নদী পুষ্করিণীর মিষ্ট ও সমুদ্রের নোনা, এই উভয়বিধ জলের অধিবাসিরূপে দুই জাতীয় মৎস্যের মধ্যে আকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাই। বস্তুতঃ জল মিষ্ট ও নোনা, দুই প্রকারেরই হয়। এই ভাবে উপবিভাগ সৃষ্টি বিজ্ঞানসম্মত হইবে কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়। এই বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিতে আমি অপারগ। তবে শ্লোকটী হইতে আমরা মৎস্যের ভৌগোলিক বিস্তার ও উপবিভাগ সম্বন্ধে একটা আভাস পাই। মৎস্যের বিস্তার (migration) জলের লবণাংশের পরিমাণের উপরই যে বিশেষ নির্ভর করে, তাহা সকল বৈজ্ঞানিকই স্বীকার করেন। এই জন্য এইরূপ উপবিভাগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা যায়।

গন্ধবেদী

রসবেদী জীবগণের পর মানসিক পর্য্যায়ে গন্ধবেদী জীবগণ তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ভ্রমর, মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি কীট পতঙ্গকে আর্য্য মনীষিগণ গন্ধবেদী পর্য্যায়ভুক্ত করেন। কীটাদি জীব, মৎস্যাদি জীব অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব, তথাপি মানসিক পর্য্যায়ে আর্য্যগণ তাহাদের রসবেদী অর্থাৎ মৎস্যাদির উপরে স্থান দিলেন কেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। আমরা জানি যে, কোনও একটি অধুনাপ্রাপ্ত নিকৃষ্ট জীব হইতে কোনও একটি উৎকৃষ্ট জীবের জন্ম হয় নাই। তথাকথিত নিকৃষ্ট জীবগণ উৎকৃষ্ট জীবগণের দূর বা নিকটতম ভাই মাত্র। উভয়ের ক্রমবিকাশ একই কোন জীব হইতে, ভিন্ন ভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার বা আবর্ত্তনের মধ্যে পড়ায় বিভিন্নরূপে হইয়াছে। উভয়েরই পূর্ব্বপুরুষ একই কোন জীব ছিল। বংশপরম্পরায় ক্রমিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাহারা দুইটি ভ্রাতৃবংশের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। একটি গন্ধবেদী ও অপরটি রসবেদী জীব। তাহা ছাড়া ইহাদের মানসিক গঠন মৎস্যাদি জীব হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। ইহাদের সমাজ-গঠনরীতি অতি অদ্ভুত। ইহাদের রাজা, রাণী, সৈন্য, সেনাপতি, মজুর, ঘরবাড়ী, দুর্গ, প্রাসাদ, ভাণ্ডার, পালিত পশু, সবই আছে। ইহারা যুদ্ধবিগ্রহ করে, বন্দিশালায় বন্দী রাখে, শান্তি স্থাপনা করে, আহতদের শুশ্রূষা করে—পিপীলিকা, উই, মৌমাছি প্রভৃতির জীবনপদ্ধতি লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝা যাইবে। ভূতাত্ত্বিকগণ জানেন যে, পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম Insecta বা গন্ধবেদী ব্যতীত সমুদয় নিরস্থিক জীবের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ কেবলমাত্র স্পর্শবেদী জীবের সৃষ্টি হয়। তাহার পর

অন্তর্গত কোন ক্রমলুপ্ত জীব হইতে) একটী ধারায় গন্ধবেদী জীব ও অপর একটী ধারায় রসবেদী জীবের সৃষ্টি হয়। তাহার পর রসবেদী জীব হইতে আবার প্রথম উভচর জীবের বিকাশ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম উভচরগণও ছিল মৎস্যাদির ন্যায়ই রসবেদী। প্রথম উভচর সৃষ্টির অনেক পরে স্পর্শবেদী জীবের অন্তর্গত কোনও একটী ক্রমলুপ্ত পর্ব্ববদী জীব হইতে প্রথম ধারায় গন্ধবেদী জীবের সৃষ্টি হয়। গন্ধবেদী জীবের পর পৃথিবীতে প্রথম (স্পর্শবেদীর দ্বিতীয় ধারা হইতে) শব্দবেদী জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। ভেকাদি উন্নত ধরণের উভচর জীবগণ ছিল পৃথিবীর এই প্রথম শব্দবেদী জীব। পূর্ব্বকথিত রসবেদী নিম্ন উভচর জীব হইতেই শব্দবেদী (ভেকাদি) উচ্চ উভচর জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। উচ্চ উভচর জীব হইতে পরে পৃথিবীতে আবার সরীসৃপাদি অন্যান্য শব্দবেদী জীবের আবির্ভাব হয়। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পৃথিবীতে ষট্‌পদী (Insecta) ব্যতীত সমুদয় নিরস্থিক জীবের সৃষ্টি হয় সর্ব্বপ্রথম। ইহারা সকলেই ছিল স্পর্শবেদী জীব। স্পর্শবেদী জীবের সৃষ্টি সম্পূর্ণ হইলে তবে মৎস্যাদি ও প্রথম উভচর জীবের সৃষ্টি হয়। এই উভয়বিধ জীব ছিল রসবেদী জীব। রসবেদী জীবের সৃষ্টির অনেক পরে সৃষ্ট হয় ষট্‌পদী জীব (Insecta)। ইহাদিগকেই আমরা গন্ধবেদী বলি। তবে স্পর্শবেদী হইতে বিভিন্ন ধারায় ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। গন্ধবেদী জীবের সৃষ্টির পর রসবেদী হইতে (স্পর্শবেদীর দ্বিতীয় ধারা) সৃষ্ট হয় ভেকাদি উচ্চ উভচর ও সরীসৃপাদি জীব। এই দুইটি জীবকে আমরা শব্দবেদী জীব বলি। নিম্নলিখিত ভূতত্ত্ববিষয়ক তালিকা দেখুন।

জুরাসিক ...	পক্ষী জীব	রূপবেদী জীব
ট্রিয়াসিক ... পারমিয়ান ...	ডাইনেসিরাম সরীসৃপ ও উভচর ভেকাদি	শব্দবেদী জীব
কারবেনিফিরাস ...	ষট্‌পদী জীব (কীট পতঙ্গাদি)	গন্ধবেদী জীব
ডিভোনিয়ান ... স্লুরিয়ান ... ওর্ডোভিসান ...	নিম্নোভচর (সালেমেণ্ডার) ফুসফুস মাছ মৎস্যজীব	রসবেদী জীব
ক্যামব্রিয়ান ...	যাবতীয় নিরস্থিক জীব— ষট্‌পদী ব্যতীত	স্পর্শবেদী জীব

উদ্ধৃত তালিকাটিতে মানসিক পর্য্যায়ে কোন্ কোন্ জীব পর পর কি ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা দেখান হইয়াছে। স্পর্শবেদীর পর রসবেদী, রসবেদীর পর গন্ধবেদী, গন্ধবেদীর পর শব্দবেদী ও শব্দবেদীর পর যে রূপবেদী জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, উক্ত তালিকাটি তাহা সপ্রমাণ করে। ভূতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা মাটি খুঁড়িয়া এই প্রমাণ বাহির করিয়াছেন। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আর্য্যগণ রসবেদী জীবের পর গন্ধবেদী জীবের স্থান দিয়া কোনও অন্যায় করেন নাই।

ষট্পদী জীবকে (Insecta) আর্য্যগণ গন্ধবেদী জীব কেন বলিয়াছেন, এইবার সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব। যে সকল জীব কেবলমাত্র ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে আহারাদি সংগ্রহ ও চলাফিরার কার্য্য করে, তাহাদিগকে ইহারা গন্ধবেদী জীব বলিয়াছেন। অনেক অপরূপ ও সুন্দর পুষ্পাদি বস্ত্রাবৃত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পতঙ্গগণ সেই পুষ্পের দিকে আকৃষ্ট হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, রূপ অপেক্ষা গন্ধই তাহাদিগকে আকৃষ্ট করে। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা আর্য্য মনীষিগণের সিদ্ধান্ত মৎকর্ত্তৃক নির্ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কোনও কোনও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ডারোইন সাহেবের যৌন মতটী (sexual selection) খণ্ডন করিবার জন্য উক্তরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। Lull সাহেবের Organic Evolution ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক পুস্তক। উক্ত পরীক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথাই এই পুস্তকে বিশেষ ভাবে লিখিত আছে।

তাহার পর পুংপতঙ্গ সাধারণতঃ রূপবান্ হয়। কোনও কোনও স্ত্রীপতঙ্গ মোটেই রূপবান্ হয় না। ডারোইন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পূর্ব্বে মনে করিতেন যে, পুংপতঙ্গের রূপই স্ত্রীপতঙ্গদিগকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এ ক্ষেত্রেও রূপ অপেক্ষা গন্ধই স্ত্রীপতঙ্গগণকে পুংপতঙ্গের দিকে আকৃষ্ট করে। পুংপতঙ্গের রঙিন পক্ষের ছেদ ও দেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কেবলমাত্র গন্ধ দ্বারা তাহারা পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইয়া মিলিত হইতেছে। লাল সাহেবের উপরিউক্ত পুস্তক পাঠে, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও যে এই পক্ষচ্ছেদ প্রভৃতি পরীক্ষা দ্বারা উক্ত সত্যে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি। আমি নিজেও এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা সমান ফল পাইয়াছি। ইহাতে বুঝা যায় যে, গন্ধ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই স্ত্রী ও পুংপতঙ্গ পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, পতঙ্গ বা কীটাদি জীবের শুঁয়া বা Antennaeর মধ্যে গন্ধকোষ বর্ত্তমান আছে। কোন কোন পতঙ্গ পচা মাংসাদিতে ডিম্ব রক্ষা করে। কারণ, এই পচা মাংস হইতে তাপ সংগ্রহ দ্বারা তাহাদের ডিম্বগুলি স্ফুটিত হয়। কিন্তু এই বিশেষ পতঙ্গটীর Antennae (বোধিকা) ছেদন করিয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহারা সেই পচা মাংসাদি খুঁজিয়া বাহির করিতে ত পারেই নাই; এমন কি, স্ত্রীপুরুষের সংযোগও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।* McIndoo সাহেবের মতে

শুধু Antennaeতে নয়, তাহাদের দেহের সর্ব্বত্রই এই গন্ধকোষ বর্ত্তমান আছে। তাঁহার মতে বিশেষ করিয়া উহাদের পক্ষমূলে ও পদমধ্যে এই গন্ধকোষগুলি বর্ত্তমান আছে।* McIndoo সাহেব গুবরে পোকা, পিঁপড়া, মৌমাছি ও ভীমরুল দ্বারা পরীক্ষান্তে উক্তরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। আমরা জানি, পিপীলিকা মৌমাছি আদি সামাজিক জীব। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এই সকল Insecta বা ষট্‌পদী জীবের অত্যদ্ভুত সামাজিক জীবন কেবলমাত্র গন্ধবোধের উপরই নির্ভর করে। পিপীলিকা আদি জীবগণ তাহাদের বাসভবন ও সঙ্গিগণকে গন্ধ দ্বারাই খুঁজিয়া বাহির করে। প্রায় দেখা যায়, পিপীলিকাগণ গমনাগমনের জন্য একই পথ ব্যবহার করে। গন্ধদ্বারাই তাহারা তাহাদের পথ চিনিয়া রাখে। এক মাইলেরও অধিক দূর হইতে পুংপতঙ্গগণ গন্ধদ্বারা স্ত্রীপতঙ্গগণকে খুঁজিয়া বাহির করে। তাহা ছাড়া খাদ্যাদির অবস্থানও তাহারা এইরূপে বহু দূর হইতেই নিরূপিত করে—পরীক্ষা দ্বারা ইহা জানা গিয়াছে। এ বিষয়ে Animal Mind নামক পুস্তকের ৯১-১০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সমুদয় কীট জীব (land insect) ও পতঙ্গাদি (flying insect) জীব, তাহাদের স্ত্রী পুরুষের মিলন, খাদ্য আহরণ, বাসভূমি নিরূপণ, আত্মরক্ষা, সন্তান পালন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য কেবলমাত্র গন্ধের উপরই নির্ভর করে। বিছা বাহির হইলেই তেলাপোকা জীবকে আত্মরক্ষার্থ আমরা ইতস্ততঃ উড়িতে দেখি। বিছার আবির্ভাব যে গন্ধ দ্বারাই তেলাপোকারা জানিতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, কীট পতঙ্গাদি বা Insecta জীবমাত্রই হিন্দুমতে গন্ধবেদী জীবের অন্তর্গত। শব্দকণা যেমন বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া বহু দূরে নীত হয়, গন্ধকণাও তেমনি বায়ু দ্বারা বহু দূর পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে। বেতার যন্ত্র যেমন বহু দূরের শব্দকণাগুলি যন্ত্রদ্বারা ধরিয়া লয়, Insecta জীবের দেহমধ্যস্থ গন্ধকোষগুলিও তেমনি গন্ধকণাগুলি ধরিয়া লয়। তাহাদের গন্ধকোষগুলির মধ্যে নিহিত রাসায়নিক পদার্থ হয় ত তাহাদের এই কার্য্যে সহায়ক হয়। বায়ুর গতির বিপরীত দিক্ হইতেও মক্ষিকাকে আমি ফুলের দিকে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়াছি। মক্ষিকাদিগকে উপবাস করাইয়া রাখিলে হয় ত এই গন্ধকোষের শক্তির হ্রাস হয়। বন্দী অবস্থাপন্ন মক্ষিকাদিগকে উপবাস করাইয়া রাখিয়া আমি তাহাদের ঘ্রাণশক্তির হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটিতে দেখিয়াছি। যাহা হউক, এই গন্ধবেদী জীবের কোন উপবিভাগ ছিল কি না, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। গন্ধবেদী জীবের উপবিভাগ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ এখনও সংগ্রহ করিয়া উঠা যায় নাই। তবে গন্ধ বহুপ্রকারের হইয়া

---

* McIndoo, N.E., 1914. The olfactory sense of the honey bee. Jour. Exper. Zool., vol. 16, p. 265.

1914. The olfactory sense of the hymenoptera. Proc. Nat. Acad. Sci., Philadelphia, April, 1914.

1914. The olfactory sense of insects. Smithsonian. Misc. Col., Vol.

থাকে। এক একপ্রকার গন্ধ দ্বারা এক একপ্রকার গন্ধবেদী জীব যে চালিত হয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। Greber সাহেব এই সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন।* এক একজাতীয় ষট্‌পদী (insecta) এক একপ্রকার গন্ধ পছন্দ করে। বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভিন্ন প্রকার গন্ধদ্রব্য রক্ষা করিয়া আমিও এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছি। তাহাতে আমার মনে হয়, এক একজাতীয় ষট্‌পদী জীব এক একপ্রকার গন্ধ দ্বারা চালিত হয়। গন্ধের বিভিন্নতার জন্য একজাতীয় ষট্‌পদীর সহিত আর একজাতীয় ষট্‌পদীর যৌন মিলন সম্ভব হয় না। গন্ধের বিভিন্নতারূপ প্রাচীরের জন্যই একই স্থানের মধ্যে বহুজাতীয় ষট্‌পদী স্ব স্ব জাতিগত স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। এই জন্য নির্ব্বিচার যৌন মিলন দ্বারা তাহারা একজাতিতে পরিণত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে সঙ্কর জাতির উদ্ভবও এই জন্য হয় নাই। এই গন্ধরূপ প্রাচীরের জন্যই (পরিমিত স্থানের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও) তাহাদের মধ্যে নির্ব্বিচার যৌন মিলন সম্ভব হয় না। তাই আজ পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫০০,০০০০ জাতীয় ষট্‌পদী জীব দেখিতে পাই। উত্তর আমেরিকার কথাই ধরা যাউক। উত্তর আমেরিকায় সর্ব্বশুদ্ধ মাত্র এক হাজারজাতীয় পক্ষী আছে, কিন্তু ঐ দেশে একমাত্র মক্ষিকার জাতিই দশ হাজারের উপর। বিভিন্নজাতীয় ষট্‌পদীর বিভিন্নরূপ গন্ধই বোধ হয় ইহার কারণ। গন্ধরূপ স্বাতন্ত্র্য হইতেই তাহাদের মধ্যে এতগুলি জাতির সৃষ্টি হইয়াছে কি? গন্ধের সূক্ষ্মতা একমাত্র গন্ধবেদীরাই বুঝিতে পারে। ইহারা শব্দ করে বটে, কিন্তু সেই শব্দ তাহাদের মুখবিবর হইতে আসে না—পাখার সঙ্ঘর্ষের দ্বারা তাহারা শব্দ করে। তবে সেই শব্দ তাহাদের নিজেদের কোনও কাজে আসে না। কারণ, শব্দজ্ঞান তাহাদের একেবারেই নাই। Forel সাহেব তাহা প্রমাণ করিয়াছেন† তাহাদের কৃত এই শব্দ, শব্দবেদী সরীসৃপাদির পক্ষে (টিকটিকি আদি) তাহাদিগকে শিকাররূপে পাইবার সুযোগ দেয় মাত্র। দর্শনশক্তি যে তাহাদের কোনও কাজেই আসে না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একমাত্র গন্ধই তাহাদের সম্বল। কারণ, তাহারা গন্ধবেদী।

শব্দবেদী

আর্য্যমতে মানসিক পর্য্যায়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করে—এই শব্দবেদী জীবগণ। ভেকাদি উচ্চ উভচর জীব ও সর্পাদি সরীসৃপ জীবগণ হিন্দু শাস্ত্রকারগণের মতে শব্দবেদী জীব। প্রথমে সরীসৃপ জীবের কথাই বলা যাউক। মৎস্যাদির ন্যায় ইহাদের গাত্র আঁশদ্বারা আচ্ছাদিত। সুতরাং স্পর্শবোধ ইহাদের অল্পই জন্মে। সেই জন্য সর্পাদি জীব তাহাদের খাদ্যাদির উপর দিয়া চলিয়া গেলেও খাদ্যকে খাদ্য বলিয়া বুঝিতে পারে না। তাহার পর ইহাদের দৈহিক উচ্চতা কম। গর্ত্ত, আবর্জ্জনাস্তূপ ও গভীর জঙ্গলে বাস করায় ইহাদের

* 1889. Uber die Empfindlichkeit einiger. Meerthieregegen Riech—stoffe. Biol. Cent., Bd. 8, S. 743.

† 1818. Sur les Sensation des insect. Recueil Zool. Suisse. T. 4 pg. 1.

দৃষ্টিপথ অনেক সময় অবরুদ্ধ থাকে। সেই জন্য সাধারণতঃ শব্দদ্বারা ইহারা শিকারের অবস্থিতি-স্থান নিরূপিত করে। ইহারা শব্দ শুনিবামাত্র বুঝিতে পারে যে, তাহাদের খাদ্য বা শিকার কোথায় ও কিরূপ অবস্থায় আছে। সেই শব্দের গতি অনুধাবন করিয়া তাহারা শিকারের অনুসরণ করে। আমি স্বচক্ষে অনেক সর্পকে সোজা পথ অনুসরণ করিয়া, পরে হঠাৎ পিছন ফিরিয়া ভেক ধরিতে দেখিয়াছি। অভ্যাসবশতঃ সরীসৃপ জাতির শব্দ অনুধাবনশক্তি, ঘ্রাণ ও দৃষ্টিশক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়া থাকে। সাপ, কুম্ভীর, গোহাড়গিল, টিকটিকি প্রভৃতির ভঙ্গিগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, তাহারা সব সময় মস্তক কিছু উচ্চ করিয়া শব্দ অনুধাবনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। চলিতে চলিতে থামিয়া গিয়া, ঐরূপ ভাবে তাহারা শব্দ অনুধাবন করে ও তাহার পর আবার চলিতে সুরু করে। মাথাটি কিছু বামে বা দক্ষিণে কাত করিয়া তাহারা শব্দ শুনিবার চেষ্টা করে। বাগিচা ও জঙ্গলে গোধা প্রভৃতি সরীসৃপ জীবের এইরূপ আচরণ আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। অনেকে জানেন, সাপ বাঁশী শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসে। সংস্কৃত অভিধানে দেখা যায় যে, সর্পের একটি নাম "চক্ষুঃশ্রবাঃ"। চক্ষু দিয়াও যেন ইহারা শুনিতে পায়। ইহাদের চক্ষুঃশ্রবা বলা হইয়াছে কেন? আমাদের চক্ষুপত্র বায়ু বা বিপুল শব্দাভিঘাতে প্রায়ই মুদ্রিত হইয়া পড়ে। সর্পাদি জীবের চক্ষুপত্র নাই। শব্দজনিত বায়ুর আলোড়ন কি ইহাদের চক্ষুর পর্দ্দার উপর সরাসরি আঘাত করে? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে সেই আঘাতজনিত শব্দবোধ কি অসম্ভব? আমার মনে হয়, আর্য্য মনীষিগণ সর্পের এই সব বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন। শব্দজনিত জলের আলোড়নও হয় ত কুম্ভীরাদির পত্রহীন চক্ষুর উপর এইরূপ কার্য্যকারী হয়। তাহার পর নৌকাপথে আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, অনেক কুম্ভীর নদীসৈকতে শুইয়া আছে ও অদূরে বসিয়া পক্ষিগণ তান ধরিয়াছে। কুম্ভীরগণ চুপ করিয়া তাহা শুনিতেছে। পক্ষিগণও উড়িয়া গেল, কুম্ভীরসকলও সেই স্থান ত্যাগ করিল। গভীর জলের অন্ধকার-মধ্যে শব্দই কুম্ভীরদিগের শিকার ধরিবার সহায়ক হয়। স্ত্রীপুরুষের সন্নিধানও এই শব্দ দ্বারাই তাহারা জানিতে পারে। স্ত্রী ও পুরুষ সর্পগণ শব্দ দ্বারাই পরস্পর পরস্পরের সন্নিধান অবগত হয়। ঋতুকালে (Breeding time) তাই তাহারা প্রচুর শব্দ করে। আমেরিকা দেশের Rattle Snakeএর লেজে ঝুনঝুনির ন্যায় এক রকম শব্দযন্ত্র আছে। টিকটিকিরাও বোধ হয়, এই একই কারণে লেজ দ্বারা শব্দ করিয়া থাকে। কাচের জারের মধ্যে জীবন্ত সাপ রাখিয়া আমি দেখিয়াছি যে, জারের বাহিরে ভেক রাখিলেও তাহারা বিচলিত হয় না। কিন্তু সূক্ষ্ম জাল দ্বারা আবৃত বাক্সের মধ্যে রাখিয়া সামান্য মাত্র শব্দদ্বারা সেই সাপকে আমি আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছি। একটী কাচের বাক্সে টিকটিকি রাখিয়া, উহাদিগকে যথাক্রমে রঙিন আলোক ও বিভিন্ন গন্ধদ্বারা আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে উহারা বিচলিত হয় নাই। কিন্তু সামান্যমাত্র শব্দেই তাহারা ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়াছে। তাহার পর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোন বস্তু স্থিরভাবে থাকিলে, সেই বস্তুবিশেষের

স্বরূপ তাহাদের উপলব্ধি হয় না। বস্তুর দূরত্বও তাহারা নিরূপিত করিতে পারে না। বস্তুর দূরত্ব ও স্বরূপ তাহারা শব্দ দ্বারাই নিরূপণ করে। তাহার পর চক্ষুর দ্বারা সমতল ভূমির দ্রব্যাদিই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহারা সমতল ভূমিতে খুব কমই বাস করে। অপরিসর গর্ত্ত, আবর্জ্জনাস্তূপ ও জঙ্গলই তাহাদের বাসভূমি। ফলে এই অনতিউচ্চ জীবদিগের দৃষ্টিশক্তি কাজে খুব কমই আসে। স্থলজ সরীসৃপের কথা বলা হইল। এইবার জলজ সরীসৃপের কথা বলিব। কুম্ভীর অধ্যুষিত কোন জলাশয়ে কেহ যদি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে সে কুম্ভীর দ্বারা ধৃত হয় না। কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়াইয়া শব্দ করিলে তৎক্ষণাৎ সে ধৃত হয়। জলের উপর মাথা তুলিয়া শিকারের অবস্থিতি তাহারা কোনও কোনও সময়ে দেখিয়া লয় বটে, কিন্তু কেবলমাত্র দৃষ্টির দ্বারা বস্তুবিশেষের স্বরূপ বা দূরত্ব তাহারাও নিরূপণ করিতে পারে না। ফলে অনেক সময় তাহারা আন্দাজের উপর নির্ভর করে ও প্রায়ই শিকার ধরিতে অকৃতকার্য্য হয়। কিন্তু তাহাদের শব্দবোধ তাহাদিগকে শিকারাদি সম্বন্ধে অব্যর্থসন্ধানী করিয়া তুলে। শব্দ করিবামাত্র কাহারও আর নিস্তার থাকে না। মৎস্যাদি বা অন্যান্য জলজ জীব ধরিবার সময় তাহারা কেবলমাত্র শব্দের উপরই নির্ভর করে। ভারতবর্ষের বহু তীর্থস্থানে পুষ্করিণীতে কূর্ম্ম জীব বাস করে। খাবার লইয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলে তাহারা তীরের নিকট আসে। পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে তাহাদের এইরূপ ব্যবহার অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বাহিরের শব্দ জলের মধ্যে প্রবেশ করে কি না ও করিলে কত দূর পর্য্যন্ত করে, তাহা ভাবিবার বিষয়। কেহ কেহ বলেন, শব্দের বেগে জলে কম্পন উপস্থিত হয় ও সেই কম্পনদ্বারা কূর্ম্ম জীবের শব্দবোধ হয়। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে মৎস্যগণ অনুরূপ কম্পন দ্বারা আকৃষ্ট হয় না কেন? তাহারা রসবেদী বলিয়া কি? পুরীর জগন্নাথধামে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণীতে বহু বৃহদাকার মৎস্য ও কূর্ম্ম আছে। তবে "আয় আয়" করিয়া ডাকিলে কেবলমাত্র কূর্ম্মগণই তীরে আসে। বাহিরের শব্দ জলমধ্যে কতক দূর পর্য্যন্ত যে শুনা যায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জলমধ্যেও এক স্থানের শব্দ অপর এক স্থান হইতে শুনা যায়। জলমধ্যে মাত্র সরীসৃপ জীবই এই শব্দ অনুধাবন করিতে পারে। কারণ, আসলে তাহারা ডাঙ্গার জীব, মাত্র অভ্যাসবশতই তাহারা জলে বাস করে। তাহার পর জলের মধ্যে দৃষ্টিশক্তি কিরূপে ব্যাহত হয়, তাহা আমি রসবেদী জীবের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় বলিয়াছি। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, সরীসৃপ জাতির দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তি অপেক্ষা শব্দবোধ অনেক বেশী, অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম শব্দও তাহারা ধরিতে পারে। অপর জীবদিগের অবোধ্য শব্দ তাহাদের অতি সহজে বোধগম্য হয়। শব্দবোধ অর্থে আমরা একটী শব্দ হইতে অপর একটী শব্দের বিভিন্নতা বুঝিবার ক্ষমতাবিশেষও বুঝিব। এই শব্দবোধ তাহাদের দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। আমি একটী টিকটিকির চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়া দেখিয়াছি যে, সে অনায়াসে বাচিয়া আছে

ভেকের শব্দে আকৃষ্ট হয়; কিন্তু অন্য কোন জীবকৃত শব্দে তাহারা আকৃষ্ট হয় না। মানুষের পদশব্দে তাহারা পলাইয়া যায়, কিন্তু গবাদির পদশব্দে তাহারা বিচলিত হয় না। অবশ্য তাহাদের এই আচরণ স্বভাবপ্রসূত বা instinctive, বুদ্ধিপ্রসূত নয়। এই সব কারণে সরীসৃপ জীবকে শব্দবেদী জীব বলিলে কোনও অন্যায় হয় না।

ইহাদের চক্ষুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও কিছু বলা উচিত। মৎস্য ও ভেকাদির ন্যায় ইহাদের চক্ষুও আলোক শোষণের কার্য্য করে। আমাদের মতে মৎস্য ও ভেকাদির ন্যায় চক্ষুর সাহায্যেই ইহাদের গাত্রবর্ণের বিকাশ হইয়াছে। এই জন্য যে সকল টিকটিকি পুরুষানুক্রমে গৃহাদির দেওয়ালে বাস করে, তাহাদের গাত্রবর্ণ সাদা হয়। মেটে ঘরের টিক-টিকিরা হয় মেটে রংবিশিষ্ট। বহু পুরুষ অতিবাহিত হওয়ায় ইহাদের গাত্রবর্ণ স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কৃকলাস জীব এখনও গাত্রবর্ণ পরিবর্ত্তন করে। শ্যামল বৃক্ষাদির অধিবাসী টিকটিকি জীব ভিন্নবর্ণের হইয়া থাকে। সর্পাদির গাত্রবর্ণও তাহাদের আবাসস্থল অনুযায়ী হইয়া থাকে। ক্রমবিকাশ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বলিব। যে বর্ণপরিবর্ত্তন মৎস্য ও উভচরে এক পুরুষে সাধিত হয়, সরীসৃপ জীবে তাহা সম্পন্ন হইতে বহু পুরুষের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ভেকাদি উচ্চোভচর জীবগণও যে শব্দবেদী জীব, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম ইহাদেরই শব্দবোধ জন্মে। ইহাদের কর্ণযন্ত্র বিশেষ সুগঠিত। তাহার পর শব্দ করিবার ক্ষমতাও ইহাদের আছে। আমার মনে হয়, শব্দদ্বারাই ইহারা স্ত্রীসন্নিধান লাভ করে। কারণ, জননক্রিয়ার জন্য ইহাদের পরস্পর পরস্পরের সন্নিকটে আসিবার প্রয়োজন হয়। তাহার পর জলমধ্যে যে দৃষ্টি ব্যাহত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্থলেও দৃষ্টিবোধ তাহাদের বিশেষ কাজে আসে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সরীসৃপ জীবের ন্যায়ই ইহারা দৃষ্টিদ্বারা দ্রব্যবিশেষের স্বরূপ ও দূরত্বাদি নিরূপণ করিতে অক্ষম হয়। দ্রব্যাদি স্থির থাকিলে উহার স্বরূপ তাহাদের বোধগম্য হয় না। মৎস্যের ন্যায় ভেকাদিরও গাত্রবর্ণ পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের বর্ণানুযায়ী বদলাইয়া থাকে। এবং মৎস্যের ন্যায় ইহাদের চক্ষু নষ্ট করিয়া দিলে উক্তরূপ বর্ণপরিবর্ত্তন ইহাদেরও দেহে ঘটে না। রানা হেক্সাভ্যাক্‌টাইলা নামক ভেক লইয়া আমি এই পরীক্ষা করিয়াছি। পুকুরের জলজ উদ্ভিদ্ যেখানে বেশী থাকে, সেইখানেই ইহারা থাকিতে ভালবাসে। গাছের রঙের সহিত নিজেদের দেহের রং সমান বলিয়া ইহাদের অবস্থিতি শত্রুরা জানিতে পারে না। ইহাদের গাত্রবর্ণ ঠিক সবুজ পাতার ন্যায়। জলশূন্য স্থান বা পরিষ্কার জলে উহাদের রাখিলে অল্প সময়ের মধ্যেই উহাদের গাত্রবর্ণ সীসার মত হয়। ইহাদিগকে চক্ষুহীন করিয়া সবুজ রঙের জলজ বৃক্ষাদির মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াও দেখিয়াছি, ইহাদের গাত্রবর্ণ সীসার ন্যায়ই রহিয়া গিয়াছে। রূপদর্শন অপেক্ষা রূপ পরিবর্ত্তনের জন্যই ইহাদের চক্ষুর প্রয়োজন বেশী। এই জন্যই বোধ হয়, ইহাদের চক্ষু সুগঠিত দেখা যায়।

আত্মরক্ষার্থও যে এই শব্দবোধ কিরূপ পরিমাণে তাহাদের সহায়ক হয়, তাহাও বলা কঠিন। কারণ, ভেকভুক্ জীবগণ নিঃশব্দেই সমাগত হয়। আত্মরক্ষার এই অক্ষমতার জন্যই বোধ হয়, হাজার হাজার ভেকশিশু জন্মিলেও মাত্র কয়েকটী করিয়া ভেক পুষ্করিণী আদিতে আমরা জীবিত দেখিতে পাই। মৃত্যুর হার বেশী বলিয়া জন্মের হারও ইহাদের বেশী। বংশরক্ষাকল্পেই তাহাদের শব্দবোধের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই জন্য ঋতুকালে ভেককে ডাকিতে দেখা যায়। এই ভাবে তাহাদের সত্যকার জীবন-মরণ সমস্যা এই শব্দবোধের উপরই নির্ভর করে। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে আবার কি জল, কি স্থল, উভয় ক্ষেত্রেই ভেক তাহাদের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শব্দবোধশক্তিদ্বারা আত্মরক্ষা ও আহার সংগ্রহাদি করিয়া থাকে। Yerke সাহেবের মতে ভেক বহুবিধ শব্দই শুনিতে পায় ও সেই অনুপাতে আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত হয়। এ বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষাও তিনি করিয়াছিলেন।* তাঁহার মতে অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শব্দ, যাহা অপরাপর জীবের বোধের অগম্য, তাহা ভেকাদি ও সরীসৃপ জীবগণ ধরিয়া লইতে পারে। অভ্যাস দ্বারাই তাহারা এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। দৈহিক অনুচ্চতা এবং অপরিসর ও অন্ধকারময় বাসস্থানের জন্য বাধ্য হইয়াই তাহাদিগকে এই অভ্যাস লাভ করিতে হইয়াছে।

শব্দবেদী জীবগণের মধ্যে কোন উপবিভাগ ছিল কি না, সেই সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করিব। উপবিভাগ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ এখনও পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। তবে শব্দবেদী জীবদিগকে শব্দগ্রহণের ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে উপবিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—হ্রস্ববেদী ও দীর্ঘবেদী। শব্দের আলোড়ন বা প্রবাহের তারতম্য অনুযায়ী এই দুই প্রকার বিভিন্নরূপ বোধের সৃষ্টি হয়। যে সকল শব্দ মনুষ্যগণও অতি সূক্ষ্মতা হেতু অনুধাবন করিতে পারে না, টিকটিকি আদি জীব সেই সকল শব্দ অনুধাবন করিতে পারে। সুতরাং ইহাদিগকে হ্রস্ববেদী বলা যাইতে পারে। কুম্ভীরাদি জীব জলমধ্যে বাস করায় হ্রস্ববেদী জীব। জলমধ্যে শব্দ সূক্ষ্মভাবেই অনুভূত হয়। কূর্ম্মাদিও ইহাদের মধ্যে পড়ে। অপর দিকে সর্পাদি জীব দীর্ঘবেদী। ইহাদের অনুধাবনের জন্য সুদীর্ঘ স্বরের প্রয়োজন হয়।

শব্দবেদী
├── হ্রস্ববেদী
└── দীর্ঘবেদী
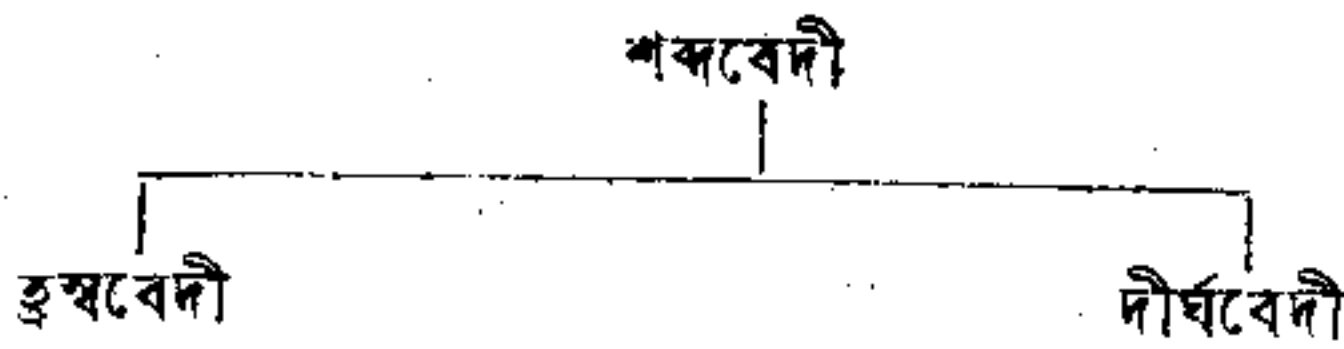
রূপবেদী

কাকাদি পক্ষিগণকে আর্য্য মনীষিগণ মানসিক পর্য্যায়ে পঞ্চম স্থান প্রদান করিয়াছেন। পক্ষিকুলকে তাঁহারা রূপবেদী জীব বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহাদের মতে পক্ষিকুলের

* 1903. The instincts, etc., III. Auditory Reactions of frog. Ibid., Vol.

সুদৃঢ় (Cartilaged) ও দীর্ঘ চঞ্চুর স্পর্শ দ্বারা আহারাদি সম্বন্ধীয় বোধ হয় না। তাহার পর চঞ্চুর অনুপাতে জিহ্বা অনেক সময় ক্ষুদ্র হওয়ায় জিহ্বা দ্বারা তাহারা খাদ্যাদি স্পর্শ করিতে অপারগ হয়। কোন্‌টী খাদ্য ও কোন্‌টী বা খাদ্য নয়, তাহা উহারা চক্ষু দ্বারা দৃষ্টি সহযোগে বুঝিতে পারে, এ বিষয়ে তাহারা জিহ্বার সাহায্য লয় না। খাদ্যাখাদ্যের বিচার তাহারা খাদ্যের বর্ণ দেখিয়া নিরূপিত করে। উন্মুক্ত প্রান্তরে একটী দূষিত জলপূর্ণ কলস ও একটী মিষ্ট জলপূর্ণ কলস রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, বায়সগণ কলসোপরি বসিয়া, নিম্নে কয়েকবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ও তাহার পর সেই মিষ্ট জল পান করে। কোন অবস্থাতেই তাহারা দূষিত জল পান করে না। আমি নিজে এই পরীক্ষা করিয়াছি। তাহার পর অরণ্যের মধ্যে বর্ণ ও আকার দেখিয়া ইহারা বিষাক্ত ও সুমিষ্ট ফল চিনিয়া লয়। অনেক মিষ্ট ফল বিষাক্ত ফলের অনুরূপ হয়, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি দ্বারা ইহারা ঐ ফলের স্বরূপ বুঝিয়া লইতে পারে। যে ভুল মানুষে করিয়া থাকে, তীব্র বর্ণবোধ হেতু ইহারা সে ভুল কদাপি করে না। চিল প্রভৃতি পক্ষিগণ এক মাইল ঊর্দ্ধ হইতেও নিম্নের জিনিষ চিনিয়া লয়। বংশানুক্রমে চক্ষুর অতিব্যবহারে ইহাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক বেশী তীক্ষ্ণ ও কার্য্যকরী হইয়াছে। সেই জন্য পক্ষীদিগের চক্ষুদ্বয় বিশেষ সুগঠিত হইয়া থাকে। তাহার পর ইহাদের দেহ পালকে ঢাকা থাকায় স্পর্শবোধ ইহাদের মধ্যে তীক্ষ্ণ হয় না। রসবোধের প্রয়োজনীয়তাও কম। ইহারা গিলিয়াই আহার করিয়া থাকে। জিহ্বার স্বল্প ব্যবহার হেতু ইহাদের জিহ্বার তলদেশের রসকোষগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

তাহার পর শ্রবণযন্ত্র বা "কোচেলা"রূপ যে যন্ত্র কর্ণমধ্যে থাকায় স্তন্যপায়ী জীবগণের সুরবোধ জন্মে, সেই শ্রবণ বা কোচেলা যন্ত্র পক্ষীদিগের নাই। ইহাদের কেহ কেহ হুবহু কথা বা শব্দ নকল করে বটে, কিন্তু ইহাদের কদাপি সুরবোধ জন্মে না। স্বরবোধ ও সুরবোধ এক জিনিষ নয়। সুরের তারতম্যের জ্ঞান ইহাদের মধ্যে নাই। সর্পাদির ন্যায় মিষ্ট সুর ইহাদিগকে কখনও আকুল করে না। অতি সূক্ষ্ম স্বর ইহারা কখনও গ্রহণ করিতে পারে না। অপর দিকে একটী সুর হইতে অপর একটী সুরের পার্থক্য ইহারা কখনও বুঝে না। ইহাদের সুরবোধ নাই বলিলেই চলে। বন্দুকের ন্যায় উৎকট শব্দ ব্যতিরেকে স্বল্প শব্দে পক্ষিকুল বিশেষ বিচলিতও হয় না। সেই জন্য কাকাদি তাড়াইবার সময় কেবলমাত্র চীৎকার করিলে বিশেষ ফল হয় না। কিন্তু চীৎকারের সঙ্গে হাত-পা নাড়িলে নীচে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবামাত্র কাক পলায়ন করে। তাহার পর পক্ষিকুল দূরের শব্দ ভাল করিয়া শুনিতে পায় না। কিন্তু দূরের দ্রব্যাদি তাহারা ভাল করিয়াই দেখিতে পায়। দ্রব্যাদির স্বরূপও তাহারা বুঝিতে পারে। কারণ, তাহারা রূপবেদী জীব।

ডারোইন সাহেবের যৌন মতও (sexual selection) আর্য্য মনীষিগণের এই মত কিয়ৎপরিমাণে সমর্থন করে। ডারোইনের মতে পক্ষিকুলের রূপজ্ঞান তাহাদের

মন ভুলাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। ডারোইনের মতের বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতগণ রূপবান্ পুংকীটাদির পক্ষচ্ছেদ ও তাহাদিগকে বস্ত্রাবৃত করিয়া, তাঁহার এই যৌন জনন-মতটীর খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান (জানিতেন না) যে, পতঙ্গ জীবগণ গন্ধবেদী জীব, রূপবেদী জীব নয়। পতঙ্গ জীব সম্বন্ধে যাহা সত্য, রূপবেদী পক্ষিকুল সম্বন্ধে তাহা সত্য নাও হইতে পারে। স্ত্রীপক্ষী, পুংপক্ষীর রূপচ্ছটা দেখিয়া যে আকৃষ্ট হয়, তাহা খুবই সত্য। বিশেষ অবলোকন দ্বারা উহার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। এমন কি, পুং ও স্ত্রীকোকিল, উভয়েই কৃষ্ণবর্ণের হইলেও তাহাদের দেহাবয়বের গঠন এবং বর্ণসামঞ্জস্যের প্রভেদ ও তারতম্য লক্ষিত হয়। পুংকোকিলের গাত্রবর্ণের জলুস কিছু অধিক হইয়া থাকে। পক্ষিকুলের দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতাহেতু, পুংকোকিলের দেহের এই জলুস স্ত্রীকোকিলের চোখে ধরা পড়ে। পক্ষিকুলের মধ্যে এই জননপ্রথা সম্বন্ধে ডারোইনের মতের কেহ প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু কোকিল সম্বন্ধে ডারোইন সাহেব তাহাদের বর্ণসামঞ্জস্য উপেক্ষা করিয়া, তাহাদের গলার স্বরের কথা আনিয়াছেন। তাঁহার মতে পুংকোকিলের মিষ্ট গলা স্ত্রীকোকিলকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু উহা ভুল। পক্ষিকুল রূপবেদী জীব, শব্দবেদী নয়। পক্ষীর ন্যায় নিম্ন প্রাণীর মধ্যে একমাত্র দৃষ্টিবোধই সম্ভব হয়। মনুষ্য ব্যতীত সুরবোধ আর কোন জীবের থাকিতে পারে না। দৃষ্টিবোধ চক্ষুর উপর নির্ভর করে, আর সুরবোধ নির্ভর করে সুগঠিত মস্তিষ্কের উপর। সুরের ভাল মন্দ ও তারতম্য বিচার সভ্যতার উচ্চ শিখরে না উঠিলে মানুষের ভিতরও থাকে না। স্বরবোধ ও সুরবোধ বিভিন্ন জিনিষ। পক্ষীদিগের মধ্যে স্বরবোধ (অর্থাৎ একটী স্বর হইতে অপর একটী স্বরের প্রার্থক্য বোধ) নাই, সুরবোধ ত দূরের কথা। শব্দ বা স্বর কোন কোন পক্ষী নকল করে বটে, কিন্তু একটী স্বর হইতে অপর একটী স্বরের পার্থক্য তাহারা বুঝে না। স্বরবোধ সরীসৃপদের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু পক্ষীদিগের মধ্যে দেখা যায় না। তাহা ছাড়া মনে রাখিতে হইবে যে, পৃথিবীর দশ হাজার প্রকার পক্ষীর মধ্যে মাত্র কাকাতুয়া, ময়না প্রভৃতি কয়টী মাত্র পক্ষী শব্দ নকল করিতে পারে। ইহাদের শব্দশিক্ষা অনেকটা মূকবধির বালকদের শিক্ষার অনুযায়ী হইয়া থাকে। শব্দশিক্ষকের মুখনির্গত শব্দের সহিত তাহার জিহ্বাও সমানে নড়িতে না দেখিলে পক্ষীরা সেই শব্দ নকল করিতে পারে না। তাই খাঁচা ঢাকা থাকিলে পক্ষীরা বাহিরের শব্দ নকল করে না। জিহ্বার সঞ্চালন দেখিয়াই তাহারা শব্দের নকল করিয়া থাকে।

পুংকোকিলের স্বর শুনিয়া, স্ত্রীকোকিল তাহার কাছে আসিতে পারে, কিন্তু তাহাকে পছন্দ করা বা না করা তাহার স্বরের উপর নির্ভর করে না। অনেক সময় দেখা যায় যে, একটী পুংকোকিলের কাছে আসিয়াও স্ত্রীকোকিলটী যখন অপর একটী পুং-কোকিলের স্বর শুনে, তখন সে আবার তাহার কাছে উড়িয়া যায়। তবে এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পুংকোকিলের দেহকান্তি (grace and built) দেখিয়াই স্ত্রীকোকিল তাহাকে

শিক্ষিত মনুষ্যগণই বলিতে পারে না। তবে দুইটী কোকিলের মধ্যে কাহার দেহ অধিকতর কান্তিযুক্ত, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। রূপবেদী পক্ষিকুলের রূপবোধ সহজেই হইয়া থাকে। গলার স্বর পক্ষীদিগের পরস্পরের অবস্থানস্থান বুঝাইয়া দেয় বটে, কিন্তু যৌন মিলন সব সময়েই পুংপক্ষীদিগের রূপের উপর নির্ভর করে, তাহাদের গলার স্বরের উপর নয়।

এখানেও ডারোইন সাহেব আর একটী ভুল করিয়াছেন। সেই জন্য বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতগণ তাঁহার জননমতটী উক্তরূপ যুক্তি দেখাইয়া অত সহজে খণ্ডন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না যে, পক্ষিকুল রূপবেদী জীব, শব্দবেদী নয়। অন্য দিকে বিশেষ করিয়া পুংপতঙ্গ, পুংমৎস্য (মৎস্যবিশেষ) ও পুংময়ূরের রূপচ্ছটার কারণস্বরূপ পণ্ডিতগণ বলেন যে, কি স্ত্রী বা কি পুরুষ, সমান তেজ লইয়া সকলেই জন্মগ্রহণ করে। তবে সেই তেজ স্ত্রীজীবগণের জননযন্ত্র ধারণ, সন্তান প্রসব ও পালনাদি কার্য্যে ব্যয়িত হয়। পুংজীবের এই সব বালাই নাই, সেই জন্য তাহাদের সেই অতিরিক্ত তেজ পুংময়ূরের, পুংমৎস্যের ও পুংপতঙ্গের রূপচ্ছটায়, পুংহরিণের শৃঙ্গের বাহুল্যে, পুংহস্তীর দন্তে, মনুষ্যের গুম্ফশ্মশ্রুতে ও পুংকোকিলের গলার স্বরে পর্য্যবসিত হয়। তবে আমার মতে গলার স্বর সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। কারণ, গলার স্বর একটা কার্য্যবিশেষ। অন্য দিকে বর্ণবিন্যাস বা শৃঙ্গ দন্তাদি জীবদিগের দেহের অংশবিশেষ। অতিরিক্ত তেজ দৈহিক বর্দ্ধনেই পর্য্যবসিত হইতে পারে মাত্র। তাহা ছাড়া শব্দ করার ক্ষমতা শুধু কোকিল কেন, সকল জীবের মধ্যেই আছে। তবে মানুষের কাছে কোনটী কর্কশ, কোনটী বা মিষ্ট বলিয়া মনে হয়। কারণ, মানুষ বুদ্ধিজীবী জীব। মানুষের সঙ্গে পক্ষীর তুলনা চলে না। *

যাহা হউক, দৃষ্টিবেদী জীবের মধ্যে এই যৌন বাহুল্য (secondary sexual character) পুংজীবের দেহের সাধারণ কান্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া যৌন জননের সহায়ক হয়। কিন্তু মৎস্যাদি রসবেদী ও পতঙ্গাদি গন্ধবেদী জীবের উহা কোনও কাজে আসে না।

এইবার রূপবেদী জীবের উপবিভাগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। প্রধানতঃ দুইটী উপবিভাগে রূপবেদী জীবকে মানসিক পর্য্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে। এইরূপ উপবিভাগের সূচনা নিম্নের শ্লোকটীতে পাওয়া যায়।

---

* স্বরের তারতম্য জীবদিগের স্বরযন্ত্র বা vocal cordএর গঠন অনুসারে হইয়া থাকে। হিন্দু মনীষিগণ জীবদিগের গলার বিভিন্নরূপ স্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনার জন্য তাঁহারা জীবমাত্রেরই স্বর লক্ষ্য করিতেন। কোন্ কোন্ জীবের গলার স্বরে কোন্ কোন্ সুরের সৃষ্টি হয়, বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া তাহা তাঁহারা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ময়ূরঃ ষড়্জমাখ্যাতি ঋষভং বক্তি চাতকঃ। ছাগো গান্ধারমাচষ্টে ক্রৌঞ্চো বদতি মধ্যমং॥
কোকিলঃ পঞ্চমং রূতে মেঘো বদতি ধৈবতম্। নিষদং ভাষতে হস্তী ত্বেতদ্‌ব্রহ্মাদিসম্মতম্॥
ময়ূর-বৃষভ-মেষ-কাক-কোকিলবাজিনঃ। মাতঙ্গাশ্চ ক্রমেণাহুঃ স্বরানেতান্ সুদুর্গমান্।

দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্ রাত্রাবন্ধাস্তথাঽপরে।
কেচিদ্ দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ॥—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, সপ্তশতী চণ্ডী।

এই ভাবে আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি পাখীর দিবালোক বা সাদা আলো ভিন্ন উপায় নাই। অন্ধকার বা কৃষ্ণালোকে তাহাদের চক্ষু নিষ্ক্রিয় থাকে। আবার পেচকাদি কতকগুলি পক্ষীর পক্ষে অন্ধকার বা কৃষ্ণালোকই প্রয়োজনীয়। দিবালোকে তাহাদের চক্ষু সক্রিয় হয় না। এক দল আলো চায় না, অপর দল আলো চায়। ইহা ছাড়া ইউরোপীয় পণ্ডিত Hess ও Breed* পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পক্ষী জীব একটী বর্ণ অপেক্ষা অপর একটী বর্ণ বেশী পছন্দ করে। অর্থাৎ ইহাদের বর্ণবোধ বর্ত্তমান।† রাত্রিচর ও দিবাচর, উভয়বিধ পক্ষী সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য।

দেশবিদেশের আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী প্রকৃতিরাণী এক এক প্রকার বর্ণবিন্যাস ধারণ করেন। ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই বর্ণবিন্যাসের পরিবর্ত্তন ঘটে। ফলে যে সকল পক্ষী পূর্ব্বতন বর্ণবিন্যাসের পক্ষপাতী, তাহারা এই নূতন বর্ণবিন্যাস সহ্য করিতে পারে না। তখন অভীষ্ট বর্ণবিন্যাসের লোভে তাহারা অপর প্রদেশে প্রস্থান করে। বসন্ত ঋতুতে যে বর্ণবিন্যাস প্রকৃতিবাণী ধারণ করেন, শীতের আগমনে তাহা তিনি পরিত্যাগ করেন। কোকিল জীবগণও তৎক্ষণাৎ যে দেশে বসন্ত তখনও আছে বা নূতন আসিতেছে, এইরূপ অপর কোনও দেশের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করে। পক্ষাবৃত ও উষ্ণশোণিত হইয়াও পক্ষিগণ যে শীতের সহিত যুঝিতে অক্ষম, এ কথা সত্য নয়। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাইব, এক এক জাতীয় পক্ষী এক একপ্রকার বর্ণ বা বর্ণবিন্যাস পছন্দ করে। রাত্রিচর পক্ষী সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যাইতে পারে। রাত্রে বর্ণসমুদয় বিকৃতরূপে প্রতীত হয় বটে, কিন্তু রাত্রিচর পক্ষীর পক্ষে উহার স্বরূপ বাছিয়া লওয়া অসম্ভব নয়। ইহা ছাড়া দিবাচর পক্ষী আলোর তারতম্য (degree of light) ও রাত্রিচর পক্ষী অন্ধকারের তারতম্য অনুযায়ীও চালিত হয়। ইহা ছাড়া রাত্রিচর ও দিবাচর পক্ষীর মধ্যে স্বভাবের বিভিন্নতার সহিত আকৃতিগত পার্থক্যও দৃষ্ট হয়। পেচক আদি রাত্রিচর পক্ষীর মুখ চেপ্টা হইয়া থাকে। রূপবোধের বিভিন্নতাই কি ইহার কারণ?

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

---

* 1908. Unter Suchungen über die Ausdehnung des pupillomotorisch wirksamen Bezirkes der Netzhaut und über pupillomotorischen Aufnahmsorgane Ibid. Bd. 58, S 182.

Breed, F. S., 1911. The development of certain instincts and habits in Chicks. Behav. Monographs, Vol. 1. No. 1 Serial No. 1.

1912. Reactions of Chicks to Optical Stimuli. Jour. Animal Behav., Vol. 2. P. 280.

† (a) "Breed using coloured screens through which colour passed and offering a choice of passages differently illuminated obtained evidence of colour discrimination in the chick."

(b) For days, Hess found that the makinal effect was produced by the yellow

বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের বয়স

বীরশ্রেষ্ঠ মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন কত বৎসর জীবিত ছিলেন, বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের সময়ে তাঁহার বয়স কত ছিল, সে বিষয়ে আধুনিক লেখকগণের নানা জনে নানা-প্রকার উক্তি করিয়াছেন। চিন্তামণি বিনায়ক বৈদ্য মহাশয় লিখিয়াছেন,—"মহাভারতে লিখিত আছে, যুদ্ধের সময়ে অর্জ্জুনের বয়স ৬৫ বৎসর ছিল। হরিবংশ ও অন্যান্য পুরাণের মতে কৃষ্ণ অর্জ্জুন হইতে ১৮ বৎসরের বড়।"[১] শ্রীকেশবলক্ষ্মণ দপ্তরী অনুমান করেন, যুদ্ধকালে অর্জ্জুনের বয়স ৫৪ কিম্বা ৫৮ বর্ষ ছিল, তাহার বেশী নহে[২]। অপর পক্ষে ডক্টর শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু মনে করেন, "যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণের বয়স ৪২ বৎসরের অধিক হইতে পারে না।...যুদ্ধকালে পরীক্ষিৎপিতা অভিমন্যুর বয়স ১৬র কম হইতে পারে না। অভিমন্যু অপেক্ষা অর্জ্জুন অন্ততঃ ২৫ বৎসরের বড়।...যুদ্ধকালে অর্জ্জুনের বয়স ৪১এর কম হইতে পারে না। অর্জ্জুন অপেক্ষা কৃষ্ণ ছয় মাসের বড়। অতএব ঠিক ৪২ বৎসর বয়সেই কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন।...আর এক দিক্ দিয়াও এই গণনা সমর্থিত হইবে। যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন অপেক্ষা তিন চারি বৎসরের বড়। অর্থাৎ যুদ্ধকালে যুধিষ্ঠিরের বয়স অন্ততঃ ৪৫। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির অপেক্ষা অন্ততঃ ২০ বৎসর বড় ও ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র অপেক্ষা অন্ততঃ ২০ বৎসর বড়। যুদ্ধকালে ভীষ্মের বয়স আনুমানিক ৮৫। যুধিষ্ঠিরের বয়স আরও অধিক হইলে ভীষ্মের বয়সও বেশী ধরিতে হইত। ৮৫ বয়সের পরেও যুদ্ধ করা বিশেষ সম্ভব মনে হয় না[৩]।"

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করেন, ১৫০৯ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে কৃষ্ণের জন্ম এবং ১৪৫৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ভারতযুদ্ধ হয়[৪]। এই অনুমান সত্য হইলে বলিতে হয়, কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের সময়ে অর্জ্জুনের বয়স ৫৬ বৎসর প্রায় ছিল। কেন না, অর্জ্জুন কৃষ্ণের প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন।

'মহাভারতে'র কোন কোন সংস্করণে দেখা যায়,[৫] মহারাজ জনমেজয়ের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বৈশম্পায়ন বলেন,—

১। 'কল্যাণ,' কৃষ্ণাঙ্ক, ৩৩১ পৃষ্ঠা। তৎপূর্ব্বে 'হিন্দী মহাভারত মীমাংসা'য় তিনি লিখিয়াছেন, "যুদ্ধের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ৮৩ বর্ষবয়স্ক ছিলেন এবং অর্জ্জুনের বয়স ৬৫ বা ততোধিক ছিল।" (১৬৮ পৃষ্ঠা)। যুদ্ধের সময়ে অর্জ্জুনের বয়স যে ৬৫ ছিল, 'মহাভারতে'র কোথায় তাহা পাইয়াছিলেন, তিনি লেখেন নাই।

২। শ্রীকেশবলক্ষ্মণ দপ্তরী, "কংসবধকালনির্ণয়," 'বিবিধবিজ্ঞানবিস্তার' (নাগপুর) ৬০ বর্ষ, ২০২ পৃষ্ঠা।

৩। শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত 'পুরাণপ্রবেশ", ৯২ পৃষ্ঠা।

৪। 'ভারতবর্ষ', ২১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা।

৫। মুম্বাইস্থ নির্ণয়সাগরযন্ত্রে মুদ্রিত এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সংস্কৃত

"পাণ্ডবানামিহায়ুষ্যং শৃণু কৌরবনন্দন।
জগাম হাস্তিনপুরং ষোড়শাব্দো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১১ ॥
ভীমসেনঃ পঞ্চদশো বীভৎসুর্বৈ চতুর্দ্দশঃ।
ত্রয়োদশাব্দৌ চ যমৌ জগ্মতুর্নাগসাহ্বয়ম্ ॥ ১২ ॥
তত্র ত্রয়োদশাব্দানি ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিতাঃ।
ষণ্মাসান্ জাতুষগৃহান্মুক্তা জাতো ঘটোৎকচঃ ॥ ১৩ ॥
ষণ্মাসানেকচক্রায়াং বর্ষং পাঞ্চালকে গৃহে।
ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিত্বা পঞ্চ বর্ষাণি ভারত! ॥ ১৪ ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে বসন্তস্তে ত্রীণি বর্ষাণি বিংশতিম্।
দ্বাদশাব্দানথৈকঞ্চ বভূবুর্দ্যূতনির্জ্জিতাঃ ॥ ১৫ ॥
ভুক্ত্বা ষট্‌ত্রিংশতং রাজন্! সাগরান্তাং বসুন্ধরাম্।
মাসৈঃ ষড়্ভির্মহাত্মানঃ সর্ব্বে কৃষ্ণপরায়ণাঃ ॥ ১৬ ॥
রাজ্যে পরীক্ষিতং স্থাপ্য দিষ্টাং গতিমবাপ্নুবন্।
এবং যুধিষ্ঠিরস্যাসীদায়ুরষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ১৭ ॥"[৬]

এই বচনমূলে মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বলেন, "কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময়ে যুধিষ্ঠির প্রভৃতির বয়স যথাক্রমে ৭২, ৭১, ৭০ ও ৬৯ বৎসর এবং কয়েক মাস ও দিন অতীত হইয়াছিল।"[৭]

আচার্য্য দ্রোণের উক্তি হইতে জানা যায়, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে অর্জ্জুন "তরুণ" ছিলেন।[৮] বীরবর কর্ণও সেইরূপ বলিয়াছেন, অর্জ্জুন তখন "যুবা"।[৯] ঐ যুদ্ধের কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে, উত্তরগোগৃহযুদ্ধের সময়ে, বৃহন্নলাছদ্মবেশী অর্জ্জুন "বজ্রসংহননো যুবা," "সিংহসংহননো যুবা" বলিয়া বিরাটরাজপুত্র উত্তর বর্ণনা করিয়াছেন।[১০] ৬৫ কিম্বা ৭০ বর্ষবয়স্ক ব্যক্তিকে 'তরুণ' বা 'যুবা" বলা যায় কি? মহাযুদ্ধকালে দ্রোণাচার্য্যের বয়স ৮৫ হইয়াছিল। 'মহাভারতে' অতি স্পষ্টবাক্যে তাহা উক্ত হইয়াছে। তাঁহাকে "আকর্ণ-পলিতশ্যাম···বৃদ্ধ" বলা হইয়াছে।[১১] সুতরাং ৭০ বছরের লোককে 'যুবা' বলা যাইতে পারে কি?

৬। সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ, ১২০ অধ্যায়। নির্ণয়সাগর সংস্করণ, ১৩৪ অধ্যায়।

৭। শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ লিখিত "যুধিষ্ঠিরের সময়" 'ভারতবর্ষ,' ২৪শ বর্ষ, ২য় খণ্ড (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ), ৮ পৃষ্ঠা। তৎসম্পাদিত 'মহাভারতে'র আদিপর্ব্বের ১৭শ খণ্ডের শেষেও তিনি ঐ প্রকার উক্তি করিয়াছেন।

৮। 'মহাভারত' বঙ্গবাসী সংস্করণ, দ্রোণপর্ব, ১১।২২। অতঃপর 'মহাভারতে'র উল্লেখে যেখানে কোন বিশেষ সংস্করণের নাম স্পষ্টত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, সেখানে এই বঙ্গবাসী সংস্করণই বুঝিতে হইবে।

৯। ঐ, দ্রোণপর্ব্ব, ১৫০।১৬।

১০। ঐ, বিরাটপর্ব্ব, ৬৯।২ ও ১০; আরও দেখুন, "বৃহদ্বারণাভো যুবা" ঐ (৩৬।১৬) "যুবা বারণ-যূথপোপমঃ" (৭১।১৫) ইত্যাদি।

১১। আকর্ণপলিতশ্যামো বয়সাশীতিপঞ্চকঃ। রণে পর্য্যচরদ্দ্রোণো বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ।—দ্রোণপর্ব্ব, ১৯২।৪৩

"যে যুবান আসপ্ততেঃ" এবং

"আষোড়শাদ্ভবেদ্বালস্তরুণস্তত উচ্যতে।
বৃদ্ধঃ স্যাৎ সপ্ততেরূর্দ্ধং বর্ষীয়ান্ নবতেঃ পরম্ ॥"

এই দুইটী আধুনিক স্মৃতিবচনের আধারে শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন, ৭০ বছরের লোককে যুবা বলা যাইতে পারে। অধিকন্তু তিনি বলেন, অর্জ্জুন ১০৬ বছর জীবিত ছিলেন ; সুতরাং ৭০ বছর বয়সে তাঁহার যৌবন থাকা সম্ভব।[১২] কিন্তু তাঁহার এই যুক্তি সমীচীন কি না বিবেচ্য। ঐ হিসাব মতে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ১+৫+২৩+১৩ অর্থাৎ ৪২ বৎসর পরে মহাযুদ্ধ বাধে, যুদ্ধকালে দ্রোণাচার্য্যের বয়স ৮৫ ছিল। সুতরাং স্বয়ম্বরের সময় তাঁহার বয়স ৪৩ ছিল। অতএব উক্ত স্মৃতিবচন অনুসারে, তখন তাঁহাকে যুবা বলিতে হয়। কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎকাল পরে—বৎসরের অধিক নহে—বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাঁহাকে "বৃদ্ধ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[১৩]

পূর্বোক্ত 'মহাভারত'-বচনে অপর ক্রটিও আছে। তন্মতে পাণ্ডবেরা জতুগৃহে ৬ মাস ছিলেন। অন্যত্র আছে, তাঁহারা সেখানে "পরিসংবৎসর" ছিলেন।[১৪] উহার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার্থ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় টীকা করিলেন, "পরিশব্দোঽত্র বর্জনার্থঃ…তেন ষণ্মাসাবস্থিতানিত্যর্থঃ।" ইহা কষ্টকল্পনা মাত্র। 'পরি' যদি ঐ স্থলে বর্জ্জনার্থই হয়, তবে কি বর্জ্জন করিতে হইবে ? 'সংবৎসর' শব্দের সঙ্গে যুক্ত থাকায় উহাকেই বর্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু তাহা ত হইতে পারে না। ছয় মাস যে বাদ দিতে হইবে, তাহা তিনি কোথায় পাইলেন ?

আরও বিশেষ কথা। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা সকলে এক এক বৎসরের বড় ছোট ছিলেন না।[১৫] অর্জ্জুন, ভীম অপেক্ষা অন্ততঃ দুই বৎসরের ছোট ছিলেন। তাহা অনায়াসে প্রমাণ করা যায়। 'মহাভারতে' স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে যে, ভীম ও দুর্য্যোধন

আকর্ণপলিতশ্যামো বয়সাশীতিপঞ্চকঃ। ত্বৎকৃতে ব্যচরৎ সংখ্যে সতু ষোড়শবর্ষবৎ ॥—ঐ, ১৯১।৬৪

আরও দেখুন—আচার্য্যস্তু বৃদ্ধস্তু—ঐ, ১৯৫।৪৯

১২। তৎসংস্কৃত মহাভারত, বিরাট পর্ব্ব, ৪৯।৫-৭ শ্লোকের তৎকৃত টীকা।

১৩। ভীষ্ম ও দ্রোণকে লক্ষ্য করিয়া বিদুর বলিয়াছিলেন,—

"ইমৌ হি বৃদ্ধৌ বয়সা প্রজ্ঞয়া চ শ্রুতেন চ"—আদি পর্ব্ব, ২০৫।৫

১৪। আদিপর্ব্ব, ১৪৮।১।

১৫। মহাভারতে আছে,—

"অনুসংবৎসরং জাতা অপি তে কুরুসত্তমাঃ।
পাণ্ডুপুত্রা ব্যরাজন্ত পঞ্চ সংবৎসরা ইব ॥"—আদিপর্ব্ব, ১২৪।১২

ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন, পাণ্ডবেরা সকলে এক এক বৎসরের বড় ছোট ছিলেন। কিন্তু উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, এক এক বছর বয়সে পাণ্ডবদিগকে পাঁচ পাঁচ বছরের মতন দেখাইত। টীকাকার নীলকণ্ঠ উভয় প্রকারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম ব্যাখ্যা যে সঙ্গত নহে, তাহা পরে প্রমাণিত

একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।[১৬] যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের অপেক্ষা বৎসরাধিক বড় ছিলেন। কেন না, গান্ধারীর গর্ভ হওয়ার এক বছর পরে কুন্তী "গর্ভার্থে" ধর্ম্মরাজকে আহ্বান করেন।[১৭] দুই বৎসর পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণ সত্বেও গান্ধারীর কোন সন্তান উৎপন্ন হয় নাই। তার পর কুন্তীর পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া মনোদুঃখে কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গান্ধারী আপন গর্ভ পাত করেন। তাহার এক বৎসর পরে, পরমর্ষি ব্যাসের তপঃপ্রভাবে, ঐ মাংসপিণ্ড হইতে প্রথমে দুর্য্যোধনের জন্ম হয়।[১৮] এই উপাখ্যান অলৌকিক হইলেও 'মহাভারতে' বিবৃত আছে। উহার সহজ মর্ম্ম এই লওয়া যাইতে পারে যে, ভীম যুধিষ্ঠির হইতে বৎসরাধিক ছোট। ভীমের জন্মের পর পাণ্ডুর আদেশে কুন্তী একবৎসরব্যাপী এক মাঙ্গলিক ব্রত অনুষ্ঠান করেন। পাণ্ডু নিজেও কঠোর তপস্যা করেন। দীর্ঘকাল পরে ('কালেন মহতা') তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র যথাভিলষিত সর্বগুণসম্পন্ন পুত্র বর দেন। তৎপরে কুন্তী গর্ভার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করেন।[১৯] সুতরাং উহার বৎসরেক পরে অর্জ্জুনের জন্ম হয়। এইরূপে দেখা যায়, অর্জ্জুন ভীম অপেক্ষা অন্ততঃ দুই বৎসরের ছোট। 'দীর্ঘকাল' যদি ২।৩ বছর হয়, তবে ৩।৪ বছরের ছোট। অথচ ঐ হিসাব মতে, অর্জ্জুন ভীম হইতে এক বছরের ছোট।

গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধন নিহত হইলে, পুত্রশোকে বিলাপ করিতে করিতে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন,—

"বালভাবমতিক্রান্তান্ যৌবনস্থাংশ্চ তানহম্।
মধ্যপ্রাপ্তাংস্তথা শ্রুত্বা হৃষ্ট আসন্ তদানঘ॥
তানদ্য নিহতান্ শ্রুত্বা হতৈশ্বর্য্যান্ হতৌজসঃ॥"[২০]

'হে অনঘ, তাহারা বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনাবস্থায়, তথা (যৌবনাবস্থা অতিক্রম করিয়া) প্রৌঢ়াবস্থায় পড়িয়াছে শুনিয়া তখন আমি আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আজ তাহাদিগকে হতৈশ্বর্য্য, হতবীর্য্য ও নিহত শ্রবণ করিয়া' ইত্যাদি। 'মধ্যপ্রাপ্ত' অর্থ, নীলকণ্ঠ বলেন, "প্রৌঢ়াবস্থায় পতিত"। মানুষের পূর্ণ আয়ু শত বৎসর। সুতরাং মধ্য বয়স ৫০ বৎসর। পঞ্চাশের পরেই মধ্যাবস্থা আরম্ভ। অতএব ঐ ধৃতরাষ্ট্রবাক্য হইতে বোঝা যায়, মৃত্যুসময়ে দুর্য্যোধন সবে ৫০ বৎসর পার হইয়াছিলেন মাত্র। যদি তাঁহার বয়স মোট ৫১ ধরা যায়—তদপেক্ষা বেশী অধিক হইতে পারে না,[২১]—যুদ্ধকালে অর্জ্জুনের বয়স ৪৮।৪৯ বৎসর হয়।

১৬। আদিপর্ব্ব, ১১৫।২৬; ১২৩।১৯। ১৭। আদিপর্ব, ১২৩।১।

১৮। আদিপর্ব, ১১৫।৯। ১৯। আদিপর্ব, ১২৩।২৫। ২০। শল্যপর্ব, ২।৭।

২১। কেন না, ঐ বিলাপ প্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে "বজ্রসংহননো যুবা" বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছিলেন। (সৌপ্তিকপর্ব, ১।৭)। তাহাতে অনুমান হয়, দুর্য্যোধন মৃত্যুসময়ে সবে মাত্র যৌবনাবস্থা অতিক্রম করিয়া মধ্যাবস্থায় পড়িয়াছিলেন। অন্যথা ধৃতরাষ্ট্রের এই উক্তিদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। বাল্য, যৌবন, মধ্য এবং জরা বা বৃদ্ধ, মানুষের এই চারি অবস্থার গণনা 'মহাভারতে'র একাধিক স্থলে পাওয়া যায়। যথা,সৌপ্তিকপর্ব,

উপরে প্রদর্শিত কারণে পাণ্ডবগণের বয়সবিষয়ক পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকসমূহের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ হয়। সেই হেতু আমরা স্বতন্ত্রভাবে বীরবর অর্জ্জুনের বয়স নিরূপণ করিতে প্রয়াস করিব। তৎপূর্বে আর একটা বিষয়ে প্রণিধান করিতে বলি।

কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও ভীম অপেক্ষা বয়সে ছোট এবং নকুল ও সহদেব অপেক্ষা বড়। সেই হেতু তিনি যুধিষ্ঠির ও ভীমকে প্রণাম করিতেন; তাঁহাদের পাদস্পর্শ করিতেন। নকুল ও সহদেব তাঁহাকে প্রনাম করিতেন।[২২] অর্জ্জুনের সখা হিসাবেই যে তিনি এরূপ করিতেন, তাঁহার গুরুজনকে গুরুবৎ মান্য করিতেন, তাহা নহে। কৃষ্ণ সত্যই অর্জ্জুনের সমবয়স্ক ছিলেন। এমন কি, তাঁহার বড় ভাই বলরামও যুধিষ্ঠিরের পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিতেন।[২৩] যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন হইতে ৩।৪ বছরের বেশী বড় নহে। সুতরাং বৈদ্য মহাশয় যে মনে করেন, কৃষ্ণ অর্জ্জুন হইতে ১৮ বৎসর বড়, 'মহাভারতে'র মতে উহা সত্য নহে। কেন না, তাহাতে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির হইতে বড় হন। আরও দেখুন, মহাযুদ্ধকালে কৃষ্ণও অর্জ্জুনের ন্যায় "তরুণ" ছিলেন।[২৪] ৮৫ বৎসরের দ্রোণাচার্য্য যদি "বৃদ্ধ" হন, ৮৩ বৎসরবয়স্ক কৃষ্ণ "তরুণ" হইতে পারেন না।

কুরুক্ষেত্রমহাসমরের প্রাক্কালে পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীরগণের শৌর্য্য বীর্য্য আলোচনা-প্রসঙ্গে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র অর্জ্জুন সম্বন্ধে সঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন,—

"একান্তবিজয়স্ত্বেব শ্রূয়তে ফাল্গুনস্য চ।
ত্রয়স্ত্রিংশৎসমাহূয় খাণ্ডবেঽগ্নিমতর্পয়ৎ ॥"[২৫] ইত্যাদি।

'কিন্তু ফাল্গুনীর কেবল বিজয়েরই কথা শুনা যায়। ত্রয়স্ত্রিংশবর্ষবয়স্ক (ফাল্গুনী) খাণ্ডবারণ্যে অগ্নিকে আহুতি দিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন।' এখানে ত্রয়স্ত্রিংশৎসমাঃ + আহূয় = ত্রয়স্ত্রিংশৎসমাহূয়, এই সন্ধি আর্ষ প্রয়োগ। টীকাকার নীলকণ্ঠ তাহাই বলিয়াছেন।

কেহ কেহ উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করেন। যথা, "তিনি খাণ্ডবারণ্যে ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসর হুতাশনের তৃপ্তিসাধন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।" কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় এই প্রকারে উহার ভাষান্তর করিয়াছেন।[২৬] নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যার মর্ম্ম দুর্বোধ্য। তিনি লিখিয়াছেন, "ত্রয়স্ত্রিংশৎ সমাঃ বর্ষাণি অতীতা ইত্যর্থঃ।" উহাকে তিন ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে;—(১) তেত্রিশ বৎসর অতীত হইলে ফাল্গুনী খাণ্ডবারণ্যে অগ্নিকে আহুতি দিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন; (২) 'ফাল্গুনী খাণ্ডবারণ্যে তেত্রিশ বৎসর ধরিয়া অগ্নিকে আহুতি দিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন; অথবা (৩) 'তেত্রিশ বৎসর অতীত হইল, ফাল্গুনী

২২। বনপর্ব, ২২।৪৫; আরও দেখুন, আদিপর্ব, ২২১।৪০; সভাপর্ব, ২।২১ ইত্যাদি।

২৩। আদিপর্ব, ১৯১।২০।

২৪। মহাযুদ্ধের উদ্যোগের সময়ে সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্রকে কৃষ্ণার্জ্জুন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—"শ্যামৌ বৃহন্তৌ তরুণৌ" ইত্যাদি। (উদ্যোগপর্ব, ৫৯।১০।)

২৫। 'মহাভারত', বঙ্গবাসী সংস্করণ, উদ্যোগপর্ব, ৫২।১০; সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ ৫২।৯।

খাণ্ডবারণ্যে অগ্নিকে আহুতি দিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন।' এই তৃতীয় ব্যাখ্যাই নীলকণ্ঠের অভিপ্রেত মনে হয়। বৈদ্য মহাশয়ও তাহাই বুঝিয়াছিলেন।[২৭]

'মহাভারতে' অতি স্পষ্ট বাক্যে বিবৃত হইয়াছে যে, খাণ্ডববনদাহ পনর দিন ধরিয়া হইয়াছিল।

"তদ্বনং পাবকো ধীমন্ দিনানি দশ পঞ্চ চ।
দদাহ কৃষ্ণপার্থাভ্যাং রক্ষিতঃ পাকশাসনাৎ॥"[২৮]

'হে ধীমান্, কৃষ্ণ এবং পার্থকর্ত্তৃক ইন্দ্র হইতে পরিরক্ষিত হইয়া অগ্নি পঞ্চদশ দিনে সেই বন দগ্ধ করিয়াছিল।' সুতরাং খাণ্ডববনদাহে হুতাশনের তেত্রিশ বৎসর লাগিয়াছিল, এ কথা সত্য নহে। যে সময়ে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে ঐ উক্তি করিয়াছিলেন, সে সময়ের—কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের উদ্যোগকালের—তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে খাণ্ডবদাহ হইয়াছিল, এ ব্যাখ্যাও সমীচীন নহে। কিঞ্চিৎ পরে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইবে। ঐ সকল কারণে আমরা প্রথম ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে পাওয়া যায়, খাণ্ডবারণ্যদাহের সময়ে মহাবীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের বয়স ৩৩ বৎসর হইয়াছিল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় "ত্রয়স্ত্রিংশৎসমাহুয়" বাক্যের ভিন্নার্থ করিয়াছেন।[২৯] নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যাকে তিনি "হেয়" বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। তন্মতে, 'ত্রয়স্ত্রিংশৎ'=তেত্রিশ দেবতা, 'সমাহুয়'=আহ্বান করিয়া। তেত্রিশ দেবতা বুঝাইতে তেত্রিশ সংখ্যার প্রয়োগ অসঙ্গত নহে। কিন্তু উহার দৃষ্টান্ত 'মহাভারতে'র অপর কুত্রাপি পাই নাই। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে খাণ্ডববন দাহের সময়ে অর্জ্জুনের বয়স ৫৫ বৎসর ছিল।

খাণ্ডববনদাহের প্রাক্কালে অগ্নির প্রার্থনায় বরুণ অর্জ্জুনকে সুদিব্য গাণ্ডীব ধনু, তথা অক্ষয় তূণীরদ্বয় এবং কপিধ্বজ রথ প্রদান করেন।[৩০] তদবধি গাণ্ডীব ধনু বরাবর তাঁহারই নিকটে ছিল। মহাপ্রস্থানের পরই উহা অগ্নিকে প্রত্যর্পিত হইয়াছিল।[৩১] উত্তরগোগৃহের যুদ্ধের প্রারম্ভে বৃহন্নলাছদ্মবেশী অর্জ্জুন বিরাটরাজপুত্র উত্তরের নিকট গাণ্ডীব ধনুর পুরাতন কাহিনী বিবৃত করেন।

"এতদ্বর্ষসহস্রন্তু ব্রহ্মা পূর্বমধারয়ৎ।
ততোহনন্তরমেবাথ প্রজাপতিরধারয়ৎ॥

২৭। 'হিন্দী মহাভারত মীমাংসা'।

২৮। 'মহাভারত', আদিপর্ব, ২২৮।৪৬; আরও দেখুন, ২৩৪।১৫। এই বিষয়ে লেখকের "মহাভারতে স্থানীয়মানতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য। ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, ২৬১-২ পৃষ্ঠা)।

২৯। তিনি লিখিয়াছেন, "ত্রয়স্ত্রিশদিতি বিভক্তিলোপ আর্ষঃ। দ্বাদশাদিত্যাঃ, একাদশ রুদ্রাঃ, অষ্টৌ বসবঃ, ধাতা, ইন্দ্রশ্চেতি ত্রয়স্ত্রিংশতং সুরান্ খাণ্ডবে সমাহুয়" ইত্যাদি।

৩০। 'মহাভারত' আদিপর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২২৫।৪; সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ; ২১৮।৬।

ত্রীণি পঞ্চশতঞ্চৈব শক্রোঽশীতিঞ্চ পঞ্চ বৈ।
সোমঃ পঞ্চশতং রাজা তথৈব বরুণঃ শতম্॥
পার্থঃ পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ বর্ষাণি শ্বেতবাহনঃ॥" [৩২]

'প্রথমে ব্রহ্মা উহা (গাণ্ডীব ধনু) সহস্র বর্ষ ধারণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রজাপতি ৫০৩ বর্ষ, ইন্দ্র ৮৫ বর্ষ, চন্দ্র ৫০০ বর্ষ,[৩৩] রাজা বরুণ ১০০ বর্ষ এবং শ্বেতবাহন অর্জ্জুন ৬৫ (?) বর্ষ উহা পর পর ধারণ করিয়াছিলেন।'

টীকাকার নীলকণ্ঠ মনে করেন যে, এইখানে ব্রহ্মাদির বেলায় "বর্ষ" শব্দে 'দৈব বর্ষ' বুঝিতে হইবে। হিন্দু জ্যোতিষের মতে, মানুষের এক সৌর সংবৎসরে দেবতাদিগের এক দিন; ৩৬০ সৌর সংবৎসরে এক দৈব বর্ষ। সুতরাং ব্রহ্মাদির বেলায় মূলের বর্ষ শব্দ ৩৬০ সৌর সংবৎসরাত্মক। কিন্তু পার্থের বেলায় "বর্ষ" শব্দ "বৃষ্টিপর," সুতরাং 'অর্দ্ধসংবৎসরাত্মক' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।[৩৪] বর্ষ শব্দ বৃষ্টিপর হইতে পারে। 'আশ্বলায়ন শ্রুতি', 'অমরকোষ' এবং 'মেদিনীকোষে'র প্রমাণ সাহায্যে নীলকণ্ঠ তাহা নিশ্চিতরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার মতে, উত্তরগোগৃহ-যুদ্ধের পূর্বে ৩২½ বৎসর যাবৎ গাণ্ডীব ধনু অর্জ্জুনের নিকট ছিল।

নীলকণ্ঠ এ বিষয়ে জনৈক প্রাচীন টীকাকারের ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মতে গাণ্ডীব ধনু অর্জ্জুনের নিকট প্রকৃত পক্ষে ৬৫ সংবৎসর ছিল। কিন্তু ঐ কালের সমস্তটাই উত্তরগোগৃহযুদ্ধের পূর্ববর্তী নহে। কতকটা পরবর্ত্তীও। এই অতীত এবং অনাগত উভয় কাল একত্রে লইয়া মোট ৬৫ সংবৎসর পার্থ গাণ্ডীব ধনু ধারণ করিয়াছিলেন। "পার্থঃ পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ" ইত্যাদি বাক্যে বৃহন্নলা তাহাই উত্তরকে বিবৃত করিয়াছিলেন। ইহাই ঐ প্রাচীন টীকাকারের অভিমত।

নীলকণ্ঠ ঐ প্রাচীন ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, উহা সত্য হইলে, মূলে "অধারয়ৎ" ('ধারণ করিয়াছিল') এই অতীত কাল প্রয়োগের কোন সার্থক্য থাকে না। দ্বিতীয়তঃ বৃহন্নলা (অর্জ্জুন) পার্থের আয়ুষ্কাল জানিতেন, এ কথা কল্পনা করিয়া লইলেও ঐ প্রাচীন ব্যাখ্যাতা কি প্রকারে তাহা অবগত হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। কার্য্যতঃ তাহা প্রতিপাদন করাও যায় না। সুতরাং নীলকণ্ঠ বলেন, তাঁহার ব্যাখ্যা সমাদরযোগ্য কি না বিচার্য্য। অপর পক্ষে তিনি বলেন, তৎকৃত ব্যাখ্যানু-

---

৩২। ঐ, বিরাট পর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৪৩।৫-৬; সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ, ৩৯।৫—৬½।

৩৩। "ষট্‌শতং"=১০৬, এই প্রকার বৈদিক প্রয়োগও 'মহাভারতে' পাওয়া যায়। (বিরাট পর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২৩।৩৩)। সুতরাং "পঞ্চশতং" শব্দে ১০৫ও বুঝাইতে পারে। এই অর্থ গ্রহণ করিলে পাওয়া যায়, প্রজাপতি ১০৮ এবং সোম ১০৫ বৎসর গাণ্ডীবধনু ধারণ করিয়াছিলেন।

৩৪। "অত্র ব্রহ্মাদীনাং বর্ষাণি দেবমানেনৈব জ্ঞেয়ানি, যো হ্যস্মাকং সৌরঃ সংবৎসরঃ, স তেষামেকং

যায়ী ৩২½ বৎসরের হিসাব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১৩ বৎসর দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় হেতু বনবাসে ও অজ্ঞাতবাসে এবং ১২ বৎসর দ্রৌপদীবিষয়ক ব্রতভঙ্গাপরাধজনিত বনবাসে ব্যতীত হইয়াছিল। বাকী ৭½ বৎসর দিগ্বিজয়, রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতিতে কাটিয়াছিল।

যাহা হউক, "পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ বর্ষাণি" বাক্যের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া নীলকণ্ঠ "ত্রয়স্ত্রিংশৎসমাহূয়" বাক্যের তদ্‌গৃহীত ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উভয় বাক্যেরই তৎকৃত ব্যাখ্যার সার মর্ম্ম এই, যুদ্ধোদ্যোগের ৩৩ বৎসর পূর্বে খাণ্ডবদাহ হইয়াছিল। এই সামঞ্জস্য দেখিয়াই বৈদ্য মহাশয় নীলকণ্ঠের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু নীলকণ্ঠের অনুমান বিচারসহ নহে। আমরা ক্রমে তাহা দেখাইব।

একই বাক্যের প্রথম পাঁচ স্থলে 'বর্ষ' শব্দ একার্থক, শেষ এক স্থলে ভিন্নার্থক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে কেন, তাহার কোন যুক্তি নীলকণ্ঠ দেন নাই। যে হিসাব মিলাইবার অভিপ্রায়ে তিনি ঐ প্রকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার লেখা হইতে বোধ হয়, সে হিসাব ভুল। দ্রৌপদী বিষয়ে পঞ্চ পাণ্ডবেরা নিজেদের মধ্যে যে নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, দৈবক্রমে মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুনকে উহা ভঙ্গ করিতে হয়। সেই অপরাধে তাঁহাকে ১২ বৎসর বনবাস করিতে হইয়াছিল। খাণ্ডবদাহের, সুতরাং গাণ্ডীব ধনু লাভের পূর্বেই ঐ ঘটনা ঘটে; পরে নহে। অতএব নীলকণ্ঠের প্রদত্ত হিসাব গ্রাহ্য নহে। সুতরাং প্রাচীন ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে নীলকণ্ঠ-কৃত দ্বিতীয় শঙ্কা তাঁহার বিরুদ্ধেও করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, এই বিষয়ে নীলকণ্ঠের মত এবং তদুল্লিখিত প্রাচীন মত, উভয়ই ভ্রান্ত। কেন না, উত্তরগোগৃহযুদ্ধের পূর্বে গাণ্ডীব ধনু অর্জ্জুনের নিকট ১৫ বৎসরের বেশী থাকিতে পারে না। এবং তৎপরে তিনি ৩৬ বৎসর উহা ধারণ করিয়াছিলেন। তাহা প্রমাণ করা যায়। যথা—

(ক) খাণ্ডববনদাহের পূর্বে অর্জ্জুন সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুত পক্ষে দ্রৌপদীবিষয়ক ব্রতভঙ্গাপরাধজনিত বনবাসকালের শেষ ভাগে অর্জ্জুন দ্বারকায় গিয়া সুভদ্রাকে হরণ করত বিবাহ করেন। বিবাহের পর অর্জ্জুন কিছু কাল দ্বারকাতে এবং কিছু কাল পুষ্করে বাস করেন। তৎপরে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।[৩৫] ঐ সময়ে সুভদ্রা বরাবর তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। কেন না, বাড়ী ফিরিয়া তিনি যখন মাতা কুন্তী ও পত্নী দ্রৌপদীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখনও "লাল চেলী পরা" সুভদ্রা তাঁহার পার্শ্বে ছিলেন, দেখা যায়।[৩৬] অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়াছেন শুনিয়া দ্বারকা হইতে বলরাম ও কৃষ্ণ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ এবং অন্যান্য লোকজন সমভিব্যাহারে নানাবিধ যৌতুক লইয়া তথায় আগমন করেন। "বহুদিন" আনন্দে ও উল্লাসে ব্যতীত করিয়া, বলরাম অপরাপর সকলকে লইয়া দ্বারকা যাত্রা করেন। কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রিয়সখা অর্জ্জুনের

৩৫। 'মহাভারত,' আদিপর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২২১।১৩। সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ ২১৪ অধ্যায়।

নিকট থাকিয়া যান। তাঁহারা কখন কখন যমুনা নদীর তীরে মৃগয়া করিতে যাইতেন। অতি আমোদ আহ্লাদের মধ্যে তাঁহাদের দিন কাটিতেছিল। ঐ সময়ে বীর বালক অভিমন্যুর জন্ম হয়।[৩৭] তাহার কিছু দিন পরে গ্রীষ্মকালসমাগমে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, সুহৃদ্‌বর্গাদি সহ প্রতিদিন যমুনায় জলবিহার করিতে যাইতেন।

"ততঃ কতিপয়াহস্য বীভৎসুঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ।
উষ্ণানি কৃষ্ণ বর্ত্তন্তে গচ্ছাবো যমুনাং প্রতি॥" ইত্যাদি।[৩৮]

তথায় এক দিন একান্তে অগ্নি তাঁহাদের নিকটে সমুপস্থিত হইয়া খাণ্ডববনদাহে সাহায্য প্রার্থনা করেন। অনন্তর কৃষ্ণার্জ্জুনের সাহায্যে উহা প্রকৃতই সম্পাদিত হয়। এইরূপে দেখা যায়, খাণ্ডবারণ্যদাহের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে অভিমন্যুর জন্ম হয়।[৩৯] ঐ সময়টা উর্দ্ধতম পক্ষে কত হইতে পারে, তাহাও একপ্রকার অনুমান করা যায়। উহা আট মাসের বেশী হইতে পারে না। কেন না, বর্ষাকালে মৃগয়া সম্ভব নহে। সুতরাং কৃষ্ণার্জ্জুন বর্ষান্তে যমুনা নদীর তীরে মৃগয়ায় যাইতেন; তৎপূর্বে নহে ধরা যায়। বর্ষান্ত হইতে গ্রীষ্মসমাগম আট মাস মাত্র। অথবা বর্ষাকালে মৃগয়া করিতেন ধরিলে, ঐ সময়ের পরিমাণ ৯ কি ১০ মাস হয়। খাণ্ডবদাহের ঠিক আট, কি দশ মাস পূর্বে অভিমন্যুর জন্ম হইয়াছিল, এ কথা আমরা বলিতেছি না। যখন কুরুক্ষেত্র-মহাসমর হয়, তখন বীর বালক অভিমন্যু ১৬ বৎসরে পড়িয়াছে।

"তস্যায়ং ভবিতা পুত্রো বালো ভুবি মহারথঃ।
ততঃ ষোড়শবর্ষাণি স্থাস্যত্যমরসত্তমাঃ॥
অস্য ষোড়শবর্ষস্য স সংগ্রামো ভবিষ্যতি।"[৪০]

'ইনি তাঁহারই (অর্জ্জুনেরই) পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। বাল্যকালেই তিনি মহারথ বলিয়া জগতে প্রখ্যাত হইবেন। হে দেবগণ! তিনি ষোল বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন। তিনি ষোল বৎসরে পড়িলে সেই যুদ্ধ (কুরুক্ষেত্র-মহাসমর) হইবে।' উত্তরগোগৃহযুদ্ধের কয়েক মাস পরেই মহাসমর আরম্ভ হয়। পূর্বোক্ত যুদ্ধের অব্যবহিত পরে অভিমন্যুর সহিত উত্তরার পরিণয় হয়। বিবাহের পর সপ্তম মাসে অভিমন্যু নিহত হন। উত্তরা বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—

"এতাবানিহ সংবাসো বিহিতস্তে ময়া সহ।
ষণ্মাসান্ সপ্তমে মাসি ত্বং বীর নিধনং গতঃ॥"[৪১]

৩৭। ঐ, ২২১। ৬৫-৬। ৩৮। ঐ, ২২২।১৪।

৩৯। কৃষ্ণার্জ্জুনের জলবিহারে সুভদ্রাও যোগ দিতেন। (আদিপর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২২২।২৩, সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ, ২১৫।২৬), দ্রৌপদীবিষয়ক ব্রতভঙ্গের নিমিত্ত অর্জ্জুনের বনবাসকালের শেষ ভাগে অর্জ্জুন সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। সুতরাং ঐ বনবাস খাণ্ডবদাহের পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। নীলকণ্ঠ অন্যথা বলিয়া ভুল করিয়াছেন।

৪০। 'মহাভারত,' আদিপর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৬৭।১১৭। সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ, ৬২।১১৮।

সুতরাং উত্তরগোগৃহযুদ্ধের ছয় মাস পরে মহাসমর হয়। অতএব খাণ্ডববনদাহের সময় হইতে উত্তরগোগৃহযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত পনর বৎসরের অধিক হইতে পারে না।

(খ) খাণ্ডববনদাহের অবসানে সুপ্রসিদ্ধ দানব শিল্পী ময়, কৃষ্ণকর্ত্তৃক মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য এক অপূর্ব সুন্দর সভা নির্ম্মাণ করিতে আদিষ্ট হন। তিনি সানন্দচিত্তে উহাতে সম্মত হন। চৌদ্দ মাসে ("মাসৈঃ পরিচতুর্দ্দশৈঃ")[৪২] তিনি ঐ মহৎ কার্য্য শেষ করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির ঐ সভায় প্রবেশ করিবার পর দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে রাজসূয় মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে বলেন। পরমর্ষি দ্বৈপায়ন এবং কৃষ্ণ ঐ প্রস্তাবের সমর্থন করেন। তখন যুধিষ্ঠির ঐ যজ্ঞ করিতে মনস্থ করেন। উহা সম্পন্ন করিতে কত সময় লাগিয়াছিল, তাহা বিবৃত হয় নাই। জরাসন্ধবধ, দিগ্বিজয় ও যজ্ঞক্রিয়া, সমস্ত ব্যাপারগুলিতে মোটামুটি বৎসরেক কাল লাগিয়াছিল ধরিলে বেশী হয় না, বরং অতি কমই হয়। ঐ যজ্ঞের তের বৎসরাধিক পরে উত্তরগোগৃহের যুদ্ধ হয়। এই প্রকারেও পাওয়া যায় যে, খাণ্ডবারণ্য দাহের পনর বৎসর পরে ঐ যুদ্ধ সংঘঠিত হয়।

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটা শঙ্কা করা যাইতে পারে। 'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে, রাজসূয় মহাযজ্ঞান্তে অভিমন্যু দ্রৌপদীর পুত্রগণের সহিত পার্বতীয় রাজাদিগকে পৌঁছাইতে গিয়াছিলেন।

"দ্রৌপদেয়াঃ সসৌভদ্রাঃ পার্বতীয়ান্ মহীপতীন্ ॥
অন্বগচ্ছৎ……………………।"[৪৩]

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত মতে ঐ সময়ে অভিমন্যুর বয়স আড়াই বৎসরের বেশী হইতে পারে না। আড়াই বৎসরের শিশুর পক্ষে রাজাদিগকে পৌঁছাইতে যাওয়া সম্ভব কি? ঐ সময়ে অভিমন্যু বড় হইয়াছিল অনুমান করিলে একটা সামঞ্জস্য হইতে পারে বটে। মৃত্যুসময়ে অভিমন্যু ষোল বৎসরে পড়িয়াছিল, এই বচনের সঙ্গে ঐ অনুমানের বিরোধ হয়। যুদ্ধকালে দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও অভিমন্যু যে অপ্রাপ্তযৌবন শিশু বা "বালক"মাত্র ছিল, তাহার বহু প্রমাণ 'মহাভারতে' পাওয়া যায়।[৪৪]

শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মনে করেন, "পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ বর্ষাণি"=পঞ্চানি বর্ষাণি চ ষষ্টিং বর্ষাণি চ। প্রথম 'বর্ষ' শব্দের অর্থ 'সংবৎসর'; দ্বিতীয় 'বর্ষ' শব্দের অর্থ 'ঋতু'। বৎসরে ছয় ঋতু। সুতরাং ৬০ ঋতুতে ১০ বৎসর। সুতরাং এইরূপে পাওয়া যায়, অর্জ্জুন পনর বৎসর গাণ্ডীব ধারণ করিয়াছিলেন।

'বর্ষ' শব্দ যে ছয় মাসাত্মক হইতে পারে, তাহার প্রমাণ নীলকণ্ঠ উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু 'ঋতু' অর্থেও যে উহা প্রযুক্ত হইত, তাহার কোন প্রমাণ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় দেন নাই। তিনি মনে করেন যে, ঐ প্রকার উভয়পর অর্থই মহাভারতকারের অভিপ্রেত ছিল। "পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ" এই দ্বিপদ প্রয়োগ হইতেই তাহা বুঝা যায়। অন্যথা,

৪২। ঐ, সভাপর্ব, ৩।৩৭। ৪৩। সভাপর্ব, ৪৫।৪৯।

তিনি 'পঞ্চষষ্টিঞ্চ' বলিতেন। এই যুক্তি একেবারেই নিঃসার। ঐ বাক্যের কিঞ্চিৎ পূর্বেই ৮৫ বুঝাইতে মহাভারতকার 'পঞ্চাশীতি' না বলিয়া "অশীতিঞ্চ পঞ্চ চ" বলিয়াছেন। ছন্দের খাতিরেই তাঁহাকে পদ ভাগ করিতে হইয়াছে।

আমাদের মনে হয়, "পার্থঃ পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ বর্ষাণি শ্বেতবাহনঃ" উক্ত শ্লোকের শেষাংশের এই প্রচলিত পাঠ ভুল। প্রাচীন আচার্য্যগণ উহাকে বিনা সন্দেহে শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। সেই হেতু নানা প্রকারে কষ্টকল্পনা করিয়া এবং গোঁজামিল দিয়াও উহার অর্থসামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই। আধুনিক টীকাকারের কল্পনা আরও উদ্ভট। সত্য বটে, ঐ পাঠ অনেক পুরাতন। টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরি ১৫০০ শক-প্রায়কালে জীবিত ছিলেন। সুতরাং প্রায় চারি শত বৎসর ধরিয়া উহা প্রচলিত আছে। তথাপি অর্থসামঞ্জস্য হয় না বিধায় উহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। উহাকে দুই প্রকারে সংশোধন করা যায়। যথা,—

(১) "পার্থঃ পঞ্চদশৈঞ্চব বর্ষাণি শ্বেতবাহনঃ।"

(২) "পার্থঃ হি পঞ্চ চৈকঞ্চ বর্ষাণি শ্বেতবাহনঃ।"

ইহাদের যে-কোনটি দ্বারা অর্থসঙ্গতি হয়। "পঞ্চ চৈকঞ্চ" = ১৫, এই প্রয়োগ 'মহাভারতে' আছে। আমরা ইতিপূর্বে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি।[৪৫] এই প্রকার সংশোধনে মূলের ছন্দোভঙ্গ হয় না।[৪৬] প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে, প্রচলিত পাঠ ও আমাদের সংশোধিত পাঠের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। লেখকের ভ্রমে "পঞ্চদশৈঞ্চব" বা "হি পঞ্চ চৈকঞ্চ" স্থলে "পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ" হওয়া অসম্ভব নহে। তাহাতে মনে হয়, সংশোধিত পাঠদ্বয়ের একটি আদিতে 'মহাভারতে'র প্রকৃত পাঠ ছিল। লেখকদোষে উহা প্রচলিত পাঠে পরিণত হইয়াছে।

রাজসূয় যজ্ঞ হইতে চৌদ্দ বৎসরে, সুতরাং উত্তরগোগৃহযুদ্ধের কয়েক মাস পরে মহাযুদ্ধ বাধে। তাহার ছত্রিশ বৎসর পরে মহাবীর অর্জ্জুন মহাপ্রস্থান করেন। 'মহাভারতে' উহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। নরসিংহ স্বামী লিখিয়াছেন, মহাযুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির ১৫ বৎসর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাধীন থাকিয়া এবং ৩৬ বৎসর স্বতন্ত্রভাবে, মোট ৫১ বৎসর রাজত্ব করেন।[৪৭] এ কথা সত্য নহে। মহাযুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরেই যুধিষ্ঠির রাজ্য ত্যাগ করত মহাপ্রস্থান করেন। কুরুক্ষেত্রমহাযুদ্ধের অবসানে পুত্র-শোকাতুরা গান্ধারী কৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে,—

"ত্বমপ্যুপস্থিতে বর্ষে ষট্‌ত্রিংশে মধুসূদন।
হতজ্ঞাতির্হতামাত্যো হতপুত্রো বনেচরঃ॥
কুৎসিতেনাভ্যুপায়েন নিধনং সমবাপ্স্যসি॥"[৪৮]

৪৫। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৪৪৩ বঙ্গাব্দ।

৪৬। প্রচলিত পাঠের ছন্দঃও নির্দ্দোষ। প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃগণ যে উহাকে সন্দেহ করেন নাই, তাহার একটি কারণ ইহা হইতে পারে।

৪৭। S. P. L. Narasimha Swami, "The Kaliyuga, Yudhisthira and Bharatayuddha

'হে মধুসূদন! ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর সমুপস্থিত হইলে তুমিও নিশ্চয়ই জ্ঞাতি, অমাত্য এবং পুত্রহারা হইয়া বনচারী হওত অতি কুৎসিত উপায়ে নিধন প্রাপ্ত হইবে।' ঐ অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। বস্তুতই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ হইতে ছত্রিশ বৎসরে বৃষ্ণি-বংশ মদের নেশায় উন্মত্ত হইয়া আত্মকলহে ধ্বংস হয়। তদ্দৃষ্টে নির্বিণ্ণ হইয়া কৃষ্ণ তপস্যার্থ গহন বনে গমন করেন।[৪৯] তথায় ব্যাধশরে আহত হইয়া দেহত্যাগ করেন।

"ষট্‌ত্রিংশেঽথ ততো বর্ষে বৃষ্ণীনামনয়ো মহান্।
অন্যোন্যং মুষলৈস্তে তু নিজঘ্নুঃ কালচোদিতাঃ॥"[৫০]
"বিমৃশন্নেব কালং তং পরিচিন্ত্য জনার্দনঃ।
মেনে প্রাপ্তং স ষট্‌ত্রিংশং বর্ষং বৈ কেশিসূদনঃ॥
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তা গান্ধারী হতবান্ধবা।
যদনুব্যাজহারার্ত্তা তদিদং সমুপাগমৎ॥"[৫১] ইত্যাদি।

ঐ ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসরে হস্তিনাপুরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিবিধ দুর্নিমিত্ত দেখিয়া কোন মহাদুর্ঘটনার আশঙ্কা করিতেছিলেন।

"ষট্‌ত্রিংশে ত্বথ সম্প্রাপ্তে বর্ষে কৌরবনন্দনঃ।
দদর্শ বিপরীতানি নিমিত্তানি যুধিষ্ঠিরঃ॥"[৫২]

কিয়দ্দিন পরে তিনি ঐ ভীষণ সংবাদ অবগত হন।

ঐ সংবাদ শ্রবণে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সংসার পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে এবং অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ তিনি পত্নী ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে ধর্ম্ম কামনায় প্রব্রজ্যা করেন।[৫৩] তাহার কিছুকাল পরে মহাবীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন মেরুপর্ব্বতের সন্নিকটে বালুকাময় ভূমিতে দেহত্যাগ করেন।[৫৪]

কৃষ্ণের দেহত্যাগের কত কাল পরে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করেন এবং তদনন্তর কত সময়ে অর্জ্জুন প্রাণত্যাগ করেন, এবার তাহা আলোচনা করা যাইবে। 'মহাভারত' হইতে ঐ বিষয়ে কি সন্ধান পাওয়া যায়, দেখিতে হইবে। কুরুপাণ্ডবের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে উহার প্রামাণ্যই সর্বাপেক্ষা অধিক। সাক্ষাৎভাবে 'মহাভারতে' ঐ বিষয়ে কিছু লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং পরোক্ষ উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

'মহাভারতে' বিবৃত আছে, কৃষ্ণের দেহত্যাগের সপ্তম দিবসে ("সপ্তমে দিবসে প্রায়াৎ") অর্জ্জুন অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় বালকবালিকা এবং নারীগণকে লইয়া দ্বারকা হইতে যাত্রা

৪৯। বনযাত্রার পূর্ব্বে কৃষ্ণ বসুদেবকে বলেন, —"নাহং বিনা যদুভির্যাদবানাং পুরীমিমামশকং দ্রষ্টুমদ্য। তপশ্চরিষ্যামি নিবোধ তন্মে রামেন সার্দ্ধং বনমভ্যুপেত্য।"—মৌষল পর্ব, ৪।৯

৫০। মৌষল পর্ব, ১।১৩। ৫২। ঐ, ১।১। ৫৩। মহাপ্রস্থানিকপর্ব, প্রথম অধ্যায়।

করেন।[৫৫] পঞ্চনদের পথে আসিতে দস্যুরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। কতিপয়কে হত্যা করে এবং কতিপয়কে ধনরত্ন সহ লুণ্ঠন করে। অবশিষ্ট লোকজন সমভিব্যাহারে তিনি কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। এবং তথায় তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেন। কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থরাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়।[৫৬] এ সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া বিষাদকাতর অর্জ্জুন মহর্ষি ব্যাসের দর্শনার্থ তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানের পর মহর্ষি বলেন, এখন তোমাদের সংসার হইতে যাওয়ার সময় আসিয়াছে।

"গমনং প্রাপ্তকালং ব ইদং শ্রেয়স্করং বিভো।" [৫৭]

অর্জ্জুন তৎপূর্ব্বেই উহা বুঝিয়াছিলেন। দ্বারকা থাকিতেই তিনি বসুদেবের নিকট উহা প্রকাশ করেন।

"রাজ্ঞঃ সংক্রমণে চাপি কালোহয়ং বর্ত্ততে ধ্রুবম্।
তমিমং বিদ্ধি সম্প্রাপ্তং কালং কালবিদাং বরঃ॥"[৫৮]

ব্যাসাশ্রম হইতে অর্জ্জুন হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার মুখে বৃষ্ণিবংশের আত্মকলহে নিধন ও কৃষ্ণের দেহত্যাগের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই মহারাজ যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানের সঙ্কল্প করেন। প্রথমে অর্জুন, পরে অপর ভ্রাতৃগণের সমক্ষে তিনি উহা প্রকাশ করেন। তাঁহারা বিনা আপত্তিতে তাহাতে সম্মত হন। তখন পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসাইয়া পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ ধর্ম্মার্থে প্রব্রজ্যা করেন ("প্রব্রজন্ ধর্ম্মকাম্যয়া")।

অর্জ্জুনের দ্বারকা হইতে যাত্রার পর মহাপ্রস্থান পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণ কোন কাজে দীর্ঘসূত্রতা করিয়াছিলেন, মনে হয় না। সমস্ত কাজ তাঁহারা যথাসম্ভব সত্বর সম্পাদন করিয়াছিলেন। কেন না, কৃষ্ণবিরহে তাঁহারা সংসার শূন্য বোধ করিতেছিলেন। প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলেন।[৫৯] সেই হেতু সংসার ছাড়িয়া যাওয়ার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ অবস্থায় কোন কাজে বৃথা সময়ক্ষেপ সম্ভব নহে। এ সকল বিচার করিয়া বলা যাইতে পারে যে, কৃষ্ণের দেহত্যাগ হইতে মহাপ্রস্থান পর্য্যন্ত ছয় মাস, না হয় বৎসরেক সময় লাগিয়াছিল, ততোধিক নহে। 'ভাগবতে' আছে, অর্জ্জুনের হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকায় গমন এবং পুনরায় হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত মোট সাত মাস লাগিয়াছিল।[৬০] এই উক্তি কতটা নির্ভরযোগ্য, বলা যায় না। কেন না, কাহিনী হিসাবে 'মহাভারত' এবং অপর পুরাণের সঙ্গে 'ভাগবতে'র এ সম্বন্ধে বহু পার্থক্য আছে।[৬১]

৫৫। মৌষলপর্ব, ৭।৩২। ৫৬। মৌষলপর্ব, ৭ম অধ্যায়। ৫৭। ঐ, ৮।৩২।

৫৮। ঐ, ৭।৪।

৫৯। অর্জ্জুন পরমর্ষি ব্যাসকে বলিয়াছিলেন,—

"ন চেহ স্থাতুমিচ্ছামি লোকে কৃষ্ণবিনাকৃতঃ।"—(মৌষলপর্ব, ৮।১৫)

৬০। 'ভাগবত', ১।১৪।৭।

৬১। যথা, 'ভাগবতে' বিবৃত হইয়াছে যে, বিদুর তীর্থযাত্রায় গমন করিয়া যদুকুলধ্বংস দেখিয়া আসিয়া-

যাহা হউক, আলোচ্য স্থলে সাত মাস লাগা বেশী মনে হয় না। তৎপরে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক ইত্যাদি ব্যাপারে তিন চারি মাস অতীত হইয়াছিল ধরিলে, পাওয়া যায়, কৃষ্ণের দেহত্যাগের সাত আট মাস পরে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করেন।

বল্কলাদি ধারণ করতঃ সন্ন্যাসীর বেশে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করেন এবং যোগযুক্ত হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে বহু দেশ, নদী ও সাগর পর্য্যটন করেন।

"যোগযুক্তা মহাত্মানস্ত্যাগধর্ম্মমুপেয়ুষঃ।
অভিজগ্মুর্বহূন্ দেশান্ সরিতঃ সাগরাংস্তথা॥" [৬২]

হস্তিনাপুর হইতে তাঁহারা পূর্বাভিমুখে যাত্রা করেন। ক্রমে "লৌহিত্য সাগরে"র তীরে সমুপস্থিত হন। নীলকণ্ঠ মনে করেন, উদয়াচলপ্রান্তস্থ সাগরই লৌহিত্য সাগর। তাহা সত্য নহে। 'মহাভারতে'ই আছে, লৌহিত্য নদীবিশেষ। মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশে'ও লৌহিত্য নদীর উল্লেখ আছে।[৬৩] বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্র নদেরই প্রাচীন নাম লৌহিত্য। সুতরাং পাণ্ডবগণ পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যান্ত গিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহারা দক্ষিণ মুখে চলিতে থাকেন। তদনন্তর লবণসমুদ্রের উত্তর তীর দিয়া পাণ্ডবগণ ক্রমশ দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে গমন করেন। অতঃপর আবার আবর্ত্তন করতঃ পশ্চিম দিকে গিয়া, সমুদ্র-পরিপ্লাবিত দ্বারকা নগরী সন্দর্শন করেন। তথা হইতে পুনরায় ঘুরিয়া তাঁহারা উত্তর দিকে গমন করিতে থাকেন। যোগধর্মী পাণ্ডবগণ এইরূপে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ("প্রদক্ষিণাং চিকীর্ষন্তঃ পৃথিব্যা যোগধর্মিনঃ")। অতঃপর বরাবর উত্তর দিকে চলিতে চলিতে তাঁহারা হিমালয় পর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উহা অতিক্রম করিতে করিতে তাঁহারা "বালুকার্ণব" ও মেরুপর্বত দেখিতে পাইলেন।

"দদৃশুর্যোগযুক্তাশ্চ হিমবন্তং মহাগিরিং॥
তং চাপ্যতিক্রমন্তস্তে দদৃশুর্বালুকার্ণবম্।
অবৈক্ষন্ত মহাশৈলং মেরুং শিখরিণাং বরম্॥"[৬৪]

ঐ স্থলে তাঁহারা তাড়াতাড়ি চলিতেছিলেন। সেই সময়ে দ্রৌপদী ধরাতলে নিপতিত হন। ক্রমে যুধিষ্ঠির ব্যতীত অপর পাণ্ডবগণও পথভ্রষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করেন।[৬৫]

এই বর্ণনা পড়িয়া অনায়াসে প্রতীতি হয় যে, পাণ্ডবগণ সমগ্র উত্তরভারত প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। মূলে আছে, তাঁহারা "পৃথিবী' প্রদক্ষিণ করিতে মানস করিয়া-

---

বজ্রকে মথুরার রাজা করেন (১।১৫।৩৯)। কিন্তু 'মহাভারতে'র মতে, যদুকুলনাশের প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে বিদুর দেহত্যাগ করেন; বজ্র ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হন। 'ভাগবতে'র অন্যত্র (১১।৩০।৪৮; ১১।৩১।২৫) আছে, বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যাভিষিক্ত করা হইয়াছিল। সুতরাং এ বিষয়ে 'ভাগবত' আত্মবিরোধ করিয়াছে। অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা নিষ্প্রয়োজন।

৬২। মহাপ্রস্থানিকপর্ব, ১।৩০। ৬৩। রঘুবংশ, ৪।৮১।

ছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তকেই পৃথিবী বলা হইয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে তাঁহারা যান নাই। দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া থাকিলে তাঁহাদিগকে পশ্চিম দিকে যাত্রার পর দ্বারকা পৌছিতে উত্তর-পশ্চিম দিকে বা প্রায় উত্তর অভিমুখে চলিতে হইত। কিন্তু বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা বরাবর পশ্চিম দিকে চলিয়াই দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখান হইতেই উত্তরাভিমুখে আবর্ত্তন করেন। হিমালয় অতিক্রম করতঃ তাঁহারা মেরুপর্বতের সন্নিকটে "বালুকার্ণবে" গিয়াছিলেন। মধ্য এশিয়ার বালুকাময় মরুভূমি ব্যতীত ঐ বালুকাসমুদ্র আর কিছু নহে। মেরুপর্বত মধ্য এশিয়াতেই। তাঁহারা ঐ স্থলে শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতেছিলেন ("গচ্ছতাং শীঘ্রং") বলাতে ঐ অনুমান আরও দৃঢ় হয়। উত্তপ্ত মরুভূমিতে যাত্রীদিগকে তাড়াতাড়িই পথ অতিক্রম করিতে হয়। এইরূপে দেখা যায়, অর্জ্জুন মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতে মেরুপর্বতের সন্নিকটে প্রাণত্যাগ করেন।

সমগ্র উত্তরভারত প্রদক্ষিণপূর্বক হিমালয় অতিক্রম করতঃ মধ্য এশিয়ায় গমন করিতে অবশ্যই দীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল। পদব্রজেই তাঁহারা পর্য্যটন করিতেছিলেন। কোথাও বিশ্রাম না করিয়া বরাবর চলিতেছিলেন, এরূপ মনে করার কোন হেতু নাই। তাড়াতাড়ি করার কোন প্রয়োজনও ছিল না। কোন নির্দিষ্ট কালের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিবার লক্ষ্যও তাঁহাদের ছিল বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। ধর্ম্মার্জনের অভিপ্রায়েই তাঁহারা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন ("প্রব্রজন্ ধর্ম্মকাম্যয়া")। সুতরাং স্থানে স্থানে বিশ্রাম করতঃ সাধন ভজন করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন মনে করাই স্বাভাবিক। অধিকন্তু বালুকার্ণবে পৌছিয়া শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতেছিলেন বলাতেই বুঝা যায় যে, তৎপূর্বে তাঁহারা শীঘ্র গমন করেন নাই। সুতরাং মহাপ্রস্থানের পর অর্জ্জুন অন্ততঃ তিন চারি বৎসর জীবিত ছিলেন, বলা যাইতে পারে। ঐ সময়ের কমে সমগ্র উত্তরভারত পদব্রজে প্রদক্ষিণ করত মেরুপর্বত পর্য্যন্ত পৌছা যায় কি ?

এইরূপে অর্জ্জুনের জীবিতকালের নিম্ন হিসাব পাওয়া যায়,—

জন্ম	হইতে	খাণ্ডবদাহ	পর্য্যন্ত = ৩৩ বৎসর
খাণ্ডবদাহ	,,	উত্তরগোগৃহ যুদ্ধ	,, = ১৫ বৎসর (প্রায়)
উত্তরগোগৃহযুদ্ধ	,,	কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ	,, = ½ ,, ,,
কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ	,,	মহাপ্রস্থান	,, = ৩৬ ,, ,,
মহাপ্রস্থান	,,	দেহত্যাগ	,, = ৩ ,, ,,
জন্ম	হইতে	দেহত্যাগ	পর্য্যন্ত = ৮৭½ বৎসর (প্রায়)

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পঞ্চচত্বারিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গাব্দ ১৩৪৫

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

বঙ্কিমচন্দ্র

ENGRAVED & PRINTED BY
THE BENGAL AUTOTYPE CO., CAL.

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
১৩৪৫

প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন

বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "আমি 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতাম।" তাঁহার ঐ প্রচেষ্টা যে অনেকাংশে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল, এ কথা অসংকোচে বলা যায়। এ সম্পর্কে তাঁহার নিজের কথা এই :—

> যেমন কুলিমজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্রে নিজের 'মজুরদারি'র উল্লেখ করিলেন—ইহা বিনয়ের পরাকাষ্ঠা বটে, কিন্তু এ আত্মগ্লানি অনাবশ্যক। প্রকৃত কথা এই, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বহুমুখী ছিল—সেই জন্য তিনি একাধারে কবি, শিল্পী, সমালোচক, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, দার্শনিক, সামাজিক ও ধর্ম্মবেত্তা ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহা হইতে উৎসারিত যে বিবিধ ধারা বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও শ্রীবৃদ্ধ করিয়াছিল, আমাদের আলোচ্য প্রত্নতত্ত্বধারা ঐ বিভিন্ন ধারাসমূহের অন্যতম।

নানা ভাবে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করা যায়—প্রাচীন মুদ্রা মূর্ত্তি পুথি পুস্তক লিপি লেখ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের ভগ্নাবশেষ, ভূগর্ভ হইতে খনিত সৌধ শিলা সীল সজ্জা সরঞ্জাম ভূষণ বেশ অলঙ্কার প্রভৃতি উপকরণসমূহের যুগপৎ বা পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহার দ্বারা। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ প্রাচীন গ্রন্থাদির উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার প্রত্নতথ্য নির্মাণ করিতেন। তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধে' সংগৃহীত "দ্রৌপদী", "প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি", "আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম-শিল্প" প্রভৃতি প্রবন্ধ ঐরূপ অনুসন্ধানের ফল এবং তাঁহার "বাঙ্গালীর বাহুবল", "ভারত-কলঙ্ক", "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার"—বিশেষতঃ তাঁহার "বাঙ্গলার ইতিহাস", "বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" (৭ পরিচ্ছেদ) প্রভৃতি নিবন্ধ তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণার জাজ্বল্য নিদর্শন।

প্রত্নতত্ত্ব গতিশীল শাস্ত্র—দিন দিন অনুসন্ধানের ফলে নবতর উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে এবং নূতন আলোক সম্পাতের ফলে প্রাচীন সিদ্ধান্ত সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত

সমর্পিতং গরুড়ধ্বজং' ভূপ্রোথিত ছিল—সুতরাং "যীশুখ্রীষ্টের অনুকরণে বাসুদেব কৃষ্ণের অবতারত্ব"—এই পাশ্চাত্ত্য উক্তির কোন চরম উত্তর ছিল না। বিশেষতঃ ঐ যুগে হারপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর খনন হইতে আবিষ্কৃত সুপ্রাচীন "সিন্ধুসভ্যতা" স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

প্রত্নতত্ত্বের উর্বর ক্ষেত্র প্রাচ্যবিদ্যা। যাঁহারা প্রাচ্যবিদ্যার আলোচক ও গবেষক, তাঁহাদিগকে 'Orientalist' বলে। বঙ্কিম-যুগে এ দেশে বেবার, লাসেন, কোলব্রুক, গোল্ডষ্টকর, উইলসন, ম্যাক্সমুলর প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌গণের একাধিপত্য ছিল। তাঁহারা যে প্রভূত শ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রত্নতত্ত্বা-লোচনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন—ইহা অবিসংবাদিত; তবে ইহাও নিঃসংশয় যে, তাঁহারা প্রধানতঃ 'গরিমাগ্রন্থির' (superiority complex এর) ফলে অনেক সময় অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। ঐ ওরিয়েণ্টালিষ্টদিগের প্রতি "দ্রৌপদী" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বেশ রোষ-কটাক্ষ করিয়াছেন,—

> ইউরোপীয়েরা এ দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থসকল কিরূপ বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচনা পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্য-জগতে আর কিছুই হইতে পারে না। আর মূর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই! এখনও অনেক বাঙ্গালী তাহা পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য এ কথাটা কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। সকলেই কোলব্রুকের নাম শুনিয়াছেন। অধ্যাপক গোল্ডষ্টকর ইঁহাকে Prince of Orientalists—'প্রাচ্যবিদ্যাবিদের অধিরাজ' বলিয়াছেন। বস্তুতঃ কোলব্রুকের মত নিপুণ গবেষক ও নৈষ্ঠিক পণ্ডিত পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তাঁহার একটা প্রকাণ্ড ভুল দেখুন। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন,—যাঁহাদের উৎকট বৈরাগ্য হইয়াছে অথচ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই—দেহান্তে তাঁহাদের মোক্ষ হয় না—'প্রকৃতিলয়' হয়—"বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ" (সাংখ্যকারিকা)। ঐ প্রকৃতিলয় কি, এখানে তাহার আলোচনা করিব না—গত বৈশাখের 'পরিচয়ে' সে আলোচনা করিয়াছি।

সাংখ্যকারিকার প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের গুরুর গুরু গৌড়পাদ প্রকৃতিলয়ের অর্থ করিয়াছেন—

মৃতঃ অষ্টাসু প্রকৃতিষু প্রধানবুদ্ধ্যহংকারতন্মাত্রেষু লীয়তে।

সকলেই জানেন, সাংখ্যমতে 'অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ'—অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার ও পঞ্চ তন্মাত্র। যিনি প্রকৃতিলীন, তিনি ঐ অষ্ট তত্ত্বের কোন এক তত্ত্বে সুদীর্ঘ কাল বিলীন থাকেন, তদন্তে তাঁহার 'ভবপ্রত্যয়' বা পুনর্জ্জন্ম হয়। সাংখ্যমতের যাঁহারা পল্লবগ্রাহী, এ কথা তাঁহাদেরও অবিদিত নয়। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যাবিদের অধিরাজ কোলব্রুক কি বলিতেছেন, শুনুন,—

> Gaurapada makes the meaning of the phrase sufficiently clear;

to liberation ; it is only the term of one series of migrations, the soul being immediately reinvested with another *person*, and commencing a new career of migratory existence until knowledge is attained.

প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান অবদান—'কৃষ্ণচরিত্র'। কৃষ্ণচরিত্র একাধারে ধর্মতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব। ধর্মতত্ত্বের কথা এখানে কিছু বলিব না, কিন্তু কি প্রকারে ও প্রণালীতে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়—পাঠক যদি তাহা শিখিতে চান, তবে নিবিড় ভাবে এই 'কৃষ্ণচরিত্র' অধ্যয়ন করুন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' প্রথমতঃ মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন—তিনি নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন, মহাভারত কল্পনামূলক কাব্য নয়, অনেকাংশে প্রামাণিক ইতিহাস (History)। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, যে সকল প্রাচীন গ্রন্থে কৃষ্ণের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মহাভারতই প্রাচীনতম—তাহার পর হরিবংশ ও পুরাণ (ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি)। হরিবংশ মহাভারতের খিলপর্ব্ব—হরিবংশেই উল্লেখ আছে, উহা মহাভারতের পরিশিষ্টরূপে রচিত। পুরাণ কি সত্যই প্রাচীন গ্রন্থ—না, পাশ্চাত্যদিগের সিদ্ধান্তিত খ্রীষ্টপর দশম হইতে চতুর্দ্দশ শতকে সংকলিত অর্বাচীন গ্রন্থ? স্মরণ রাখিতে হয়, প্রাচীন ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে—এমন কি, অথর্ববেদেও পুরাণের নাম পাওয়া যায়।

ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ—অথর্ববেদ, ১১।৭।২৪

পুরাণং বেদঃ সোঽয়ম্ ইতি কিঞ্চিৎ পুরাণম্ আচক্ষীত—শতপথব্রাহ্মণ, ১৩।৪।৩।১৩

ইতিহাসঃ পুরাণং—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২।৪।১০

ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্—ছান্দোগ্য, ৭।১।১

'পুরাণার্থবিশারদ' মহর্ষি বেদব্যাস তদানীং প্রচলিত ঐ 'পুরাণ' আখ্যান উপাখ্যান গাথা ও কল্প সংগ্রহ করিয়া পুরাণসংহিতা নামে এক সংগ্রহগ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।

পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৬।১৬

মহামুনি ব্যাস ঐ পুরাণসংহিতা স্বশিষ্য লোমহর্ষণকে প্রদান করেন—

পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ।

তৎশিষ্য কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংসপায়ন সেই মূল সংহিতার উপর তিনখানি উপসংহিতা প্রস্তুত করেন।

কাশ্যপঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংসপায়নঃ।

লোমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৬।১৯

এই চারিখানি সংহিতাই ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি অষ্টাদশ পুরাণের ভিত্তি। এ ভাবে বেদব্যাসকে অষ্টাদশ পুরাণের বক্তা বলা অসঙ্গত নয়।

অষ্টাদশপুরাণানাং বক্তা সত্যবতীসুতঃ।

অর্থাৎ আদিতে পুরাণ এক ছিল, পরে অষ্টাদশ হইয়াছিল

প্রশ্ন উঠিবে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব যুগে ঐ অষ্টাদশ পুরাণের অন্ততঃ কয়েকখানি বিদ্যমান ছিল কি না? নিশ্চয়ই ছিল—কারণ, আমরা দেখিতে পাই, আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রে পুরাণ হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

অথ পুরাণে শ্লোকৌ উদাহরতি
অষ্টাশতসহস্রাণি যে প্রজামীষিরর্ষয়ঃ ইত্যাদি।—আপস্তম্ব, ২।২

ঐ দুই শ্লোক কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে অধুনা-প্রচলিত বিষ্ণুপুরাণে, মৎস্যপুরাণে ও ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে পাওয়া যায়।

আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রের আর এক স্থলে নাম করিয়া ভবিষ্যপুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

আভূতসংপ্লবাং তে সর্গজিতঃ পুনঃ সর্গে বীজার্থা ভবন্তি ইতি ভবিষ্যপুরাণে—আপস্তম্ব-ধর্মসূত্র, ২।২৪।৫-৬

আপস্তম্ব কত দিনের লোক? প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ ব্যুলার সাহেব বলেন, আপস্তম্ব খুব সম্ভব, পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী (পাণিনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতকে জন্মিয়াছিলেন)—অধস্তন পক্ষে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের লোক।

পাণিনির কালনির্ণয় সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ আছে, কিন্তু তিনি যে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা একরূপ নিঃসংশয়। কারণ, যে সময় পাণিনি সূত্র-রচনা করেন, তখনও 'নির্ব্বাণ' শব্দ মোক্ষ-অর্থে প্রচলিত হয় নাই এবং 'আরণ্যক' শব্দ দ্বারা আরণ্যক গ্রন্থ বুঝাইত না। পাণিনির সূত্র দুইটি এই :—

'অরণ্যং মনুষ্যে'—অরণ্য শব্দের উত্তর 'ঞ্চিক' প্রত্যয় দ্বারা অরণ্যবাসী মনুষ্যবাচক 'আরণ্যক' শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

'নির্ব্বাণোঽবাতে'—নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ নির্ব্বাত (বায়ুশূন্য স্থান)।

আর এক কথা। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, কয়েকখানি পুরাণ নিজ নিজ সঙ্কলন-কাল স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণকার বলিতেছেন—অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ সম্প্রতি ভারতবর্ষের সম্রাট্।

অভিমন্যোঃ উত্তরায়াং…পরীক্ষিৎ জজ্ঞে যোঽয়ং সাম্প্রতং এতৎ ভূমণ্ডলং অখণ্ডিতায়তি ধর্মেণ পালয়তীতি—বিষ্ণুপুরাণ, ৪।২০।১২-৩

গরুড়পুরাণ বলেন, জনমেজয়ই বর্ত্তমান রাজা এবং তাঁহার উত্তর ভবিষ্য রাজবংশ কীর্ত্তন করেন।

সুহোত্রাণি রমিত্রশ্চ পরীক্ষিৎ অভিমন্যুজঃ।
জনমেজয়স্ত চ সুতো ভবিষ্যাংশ্চ নৃপান্ শৃণু।—গরুড়পুরাণ, ১৪৪।৪২

মৎস্যপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন যে, অধিসীমকৃষ্ণ (ইনি জনমেজয়ের প্রপৌত্র) 'সাম্প্রতং যো মহাযশাঃ'।

অথাশ্বমেধেন ততঃ শতানীকস্ত বীর্য্যবান্।
যজ্ঞেঽধিসীমকৃষ্ণাখ্যঃ সাম্প্রতং যো মহাযশাঃ।

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্টজন্মের অনেক পূর্ব্ব হইতে অষ্টাদশ পুরাণের অন্ততঃ কয়েকখানি বিদ্যমান ছিল। অতএব পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ উড়াইয়া দিবার যোগ্য নয়।

তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের বিবরণে প্রধানতঃ মহাভারতেরই ব্যবহার করিয়াছেন। এই মহাভারত 'শতসাহস্রী' অর্থাৎ লক্ষ শ্লোকাত্মক—উহা উগ্রশ্রবা-সৌতি-বিরচিত। সৌতি বলেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব (ইনি শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক) চব্বিশ হাজার শ্লোকাত্মক ভারতসংহিতা নামে এক আদিগ্রন্থ রচনা করেন—

চাতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।

ভারতসংহিতার বক্তা সঞ্জয় এবং শ্রোতা ধৃতরাষ্ট্র। উহার আরম্ভ ছিল পাণ্ডুর দিগ্‌বিজয়ে—'পাণ্ডুর্জিত্বা বহূন্ দেশান্ যুধা চ বিক্রমেণ চ' এবং অবসান ছিল ভারত-যুদ্ধের পর পাণ্ডব-বিজয়ে। সেই জন্য ভারতসংহিতার নাম ছিল 'জয়'—'ততো জয়ম্ উদীরয়েৎ।'

ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন ঐ ভারতসংহিতা সম্প্রসারণ করিয়া অর্জ্জুনপৌত্র জনমেজয়ের সর্পসত্রে পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ সম্প্রসারিত গ্রন্থই মহাভারত। মহাভারতের বক্তা বৈশম্পায়ন এবং শ্রোতা জনমেজয়। যত দূর ধরিতে পারা যায়, বৈশম্পায়নের মহাভারতে অষ্টাদশ পর্ব্ববিভাগ ছিল না, সমগ্র গ্রন্থ এক শত পর্বাধ্যায়ে (chaptersএ) বিভক্ত ছিল।

পরে শৌনকের নৈমিষারণ্যে-অনুষ্ঠিত দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞে সেই মহাভারত সৌতি কর্তৃক সমবেত ঋষিসভায় পঠিত হইয়াছিল। আদিম ভারতসংহিতার এই দ্বিতীয় সংস্করণই প্রচলিত মহাভারত। সৌতিই মহাভারতকে অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত করেন। পরবর্ত্তী কালে উহাতে যোগ-বিয়োগ হয় নাই, তা বলি না; তবে মোটের উপর প্রক্ষেপ সত্ত্বেও প্রচলিত মহাভারত সৌতি-রচিত মহাভারতই বটে।

ভারতসংহিতা সম্প্রসারিত হইয়া কবে মহাভারতে পরিণত হইয়াছিল? নিঃসংশয়ে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতকে পাণিনির সময় মহাভারত প্রচলিত ছিল। পাণিনিতে যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল, কুন্তী, দ্রোণ ও বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণ) প্রভৃতির শুধু উল্লেখ আছে, তাহা নয়—পাণিনি 'মহাভারত' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন—

মহান্ ব্রীহ্যপরাহ্ণ-গৃষ্টীষ্বাস-জাবাল-ভার-ভারত-
হৈলিহিল-রৌরব-প্রবৃদ্ধেষু—পাণিনিসূত্র, ৬।২।৩৮

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রেও মহাভারতের উল্লেখ আছে—

সুমন্তু-জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈল-সূত্র-ভাষ্য-ভারত-
মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যাঃ যে চান্যে আচার্য্যাস্তে সর্ব্বে তৃপ্যন্তু—৩।৪

আশ্বলায়নের সময়ে সম্ভবতঃ ভারত ও মহাভারত উভয়ই বিদ্যমান ছিল। কারণ, তিনি যাঁহাদিগের তর্পণ করিতে বলিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে 'ভারত-ও-মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যাঃ' রহিয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ ব্যুলার সাহেব বলেন, আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্র খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ

হউক, তাঁহার পূর্ব্বে ভারতসংহিতা যে মহাভারতের আকার ধারণ করিয়াছিল, ইহা নিঃসংশয়।

উপরে যে ভাবে ভারত-সংহিতা ও মহাভারতের সম্বন্ধ নির্ণয় করিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র যে ঠিক তাহাই করিয়াছেন, তাহা নয়। তবে মোট সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁহার ঐ-রূপই মত।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা স্থাপন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে বিচার উত্থাপন করিয়াছেন। ঐ বিচারও বেশ নিপুণ বিচার। তদ্দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি—কবি-ভক্ত-ভাবুকের কল্পনাপ্রসূত রূপকমাত্র নহেন।

এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, ঋগ্‌বেদসংহিতার কয়েকটি সূক্তের ঋষি একজন কৃষ্ণ। এ কৃষ্ণ বাসুদেব কৃষ্ণ কি না, নির্ণয় করা দুরূহ। তবে ছান্দোগ্য উপনিষদে যে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, আঙ্গিরস-ঘোর-ঋষি যাঁহাকে 'অক্ষিত' ও 'অচ্যুতে'র উপদেশ করিয়াছিলেন, তিনি খুব সম্ভব বাসুদেব কৃষ্ণ—

তদ্‌এতদ্‌ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা উবাচ। অপিপাস এব স বভূব।

ছান্দোগ্য হইতে প্রাচীনতর কৌষীতকী ব্রাহ্মণেও ঐ আঙ্গিরস ঘোরের ও কৃষ্ণের নামোল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ঐ কৃষ্ণ ও ছান্দোগ্যের দেবকীপুত্র কৃষ্ণ অভিন্ন ব্যক্তি। তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের একটি মন্ত্রেও কৃষ্ণ-শব্দ পাওয়া যায় (বঙ্কিমচন্দ্র ইহার উল্লেখ করেন নাই)—

উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শতবাহুনা।

ইহার অর্থ—'শতবাহু কৃষ্ণ বরাহরূপে পৃথিবীর উদ্ধার করিয়াছিলেন' অথবা 'শতবাহু কৃষ্ণবর্ণ বরাহ কর্ত্তৃক পৃথিবী উদ্ধৃতা হইয়াছিল'—তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। অতএব প্রমাণস্থলে ঐ মন্ত্রের মূল্য অত্যল্প।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা প্রসঙ্গে পুরাণের একটি মূল্যবান্ উপকরণের ব্যবহার করেন নাই—সে উপকরণ পুরাণান্তর্গত 'বংশ' বা genealogy। সকলেই জানেন, পুরাণ পঞ্চলক্ষণ—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত।

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

সেই প্রাচীন যুগে চারণেরা বিখ্যাত রাজবংশের ও ঋষি-বংশের যে সকল genealogy সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, পুরাণ-সংকলনের সময় ঐ সকল 'বংশ' তাহাতে রক্ষিত হইয়াছিল। যদুবংশের genealogy ঐরূপ 'বংশ' এবং কয়েকখানি পুরাণে ঐ বংশ-তালিকায় শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ উল্লেখ আছে। কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা প্রতিপাদন পক্ষে ইহা অকাট্য প্রমাণ।

'রাধয়া মাধবো দেবঃ মাধবেনৈব রাধিকা'—কৃষ্ণলীলায় রাধার বিশিষ্ট স্থান। অথচ মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ—এমন কি, ভাগবতেও রাধার নামগন্ধ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে'র দ্বিতীয় খণ্ডে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন এবং ব্রজ-গোপীর কথা বলিতে রাসের কথা তুলিয়াছেন। হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে রাস আছে, কিন্তু রাধা নাই, অথচ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণে রাধিকাই রাসেশ্বরী। পুরাণদ্বয়ের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তই প্রাচীনতর। ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার শ্রীরাধাকে যে বিশিষ্ট স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই একটা বিলম্বিত বিবর্ত্তনের দীর্ঘ ইতিহাস বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন নাই—করাও সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি এ ক্ষেত্রে যাহা করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্নতত্ত্বের একটা অজ্ঞাতপূর্ব অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইয়া রাধার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নূতন আলোকসম্পাত হইয়াছে।

হোরেস উইলসন (ইনি পুরাণ লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন) বলিতেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অতি অপ্রাচীন গ্রন্থ, উহার বয়ঃক্রম মাত্র দুই তিন শত বৎসর—অতএব কৃষ্ণলীলায় রাধার যোগ নিতান্ত আধুনিক। আমরাও নির্বিবাদে ঐ মত উদরস্থ করিতাম। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমতঃ 'কৃষ্ণচরিত্রে' ঐ মতের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। তিনি বলেন, জয়দেব গোস্বামী একাদশ শতকের শেষ ভাগের লোক। তাঁহার 'গীতগোবিন্দে'র কথা কে না জানেন? ঐ গীতগোবিন্দের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ আর নায়িকা শ্রীরাধা। গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি এই :—

> মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ
> নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে! গৃহং প্রাপয়।
> ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
> রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥

—'রাধে! আকাশ দেখ, ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, বনভূমি তমালদ্রুমে অন্ধকারময়। তাহাতে আবার রজনী উপস্থিত। আমার এ শিশুটি (শ্রীকৃষ্ণ) ভয়শীল—তুমিই ইহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহে পঁহুছিয়া দাও।' নন্দের এই নিদেশে পথিস্থ কুঞ্জদ্রুমাভিমুখে চলিত রাধা-মাধবের যমুনাকূলে অনুষ্ঠিত বিজনকেলিসমূহ জয়যুক্ত হউক।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, যে সময় গীতগোবিন্দ রচিত হয়, সে সময় ঐ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রচলিত ও অতিশয় সম্মানিত না থাকিলে, গীতগোবিন্দ লিখিত হইত না এবং বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায় তখন সুবিজ্ঞাত না থাকিলে, গীতগোবিন্দের 'মেঘৈর্মেদুরম্' ইত্যাদি প্রথম শ্লোক কখনও রচিত হইত না। এ কথার তাৎপর্য্য কি?

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, গীতগোবিন্দের ঐ প্রথম শ্লোকের ভাবার্থ বেশ অস্পষ্ট—টীকাকার, কি অনুবাদকার, কেহই উহা বিশদ করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের উক্ত পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে জয়দেবের ঐ 'মেঘৈর্মেদুরম্' শ্লোকের ভাবার্থ বেশ বিস্পষ্ট হয়। কিরূপে?

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বলেন, একদা নন্দ, শিশু কৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া বৃন্দাবনের ভাণ্ডীরবনে গোচারণ করিতেছিলেন—

ইতিমধ্যে মায়া-শিশু শ্রীকৃষ্ণ মায়া দ্বারা আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করিলেন—

চকার মায়য়াকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্নং নভো মুনে।

সেই মেঘাবৃত গগন ও শ্যামল কানন দেখিয়া বজ্রাঘাত ও ঝঞ্ঝাবাতের শব্দে নন্দ ভীত হইলেন—নন্দো ভয়মবাপ হ।

মেঘাবৃতং নভো দৃষ্ট্বা শ্যামলং কাননান্তরং।
ঝঞ্ঝাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দংচ দারুণম্॥ ১৫।৪

নন্দ বলিতে লাগিলেন—'কি করি, কোথা যাই—ভবিতা বালকস্য কিম্? শিশুর কি উপায় হয়?' এদিকে শ্রীকৃষ্ণ যেন ভয়ে ভীত হইয়াই পিতার কণ্ঠ ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

মায়াভিয়া ভয়েভ্যশ্চ পিতুঃ কণ্ঠং দধার সঃ।

এমন সময় শ্রীরাধা (তিনি তখন পূর্ণ কিশোরী) শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপনীত।

এতস্মিন্ অন্তরে রাধা জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্।

নন্দ, রাধিকার রূপলাবণ্যে বিস্মিত হইয়া সাশ্রুনেত্রে ভক্তিভরে বলিলেন—'আমি ঋষিমুখে শুনিয়াছি, তুমি পরাপ্রকৃতি—কমলার অপেক্ষাও হরি-প্রিয়া।'

জানামি ত্বাং গর্গমুখাৎ পদ্মাধিকপ্রিয়াং হরেঃ।
পরাং নির্গুণমচ্যুতাম্ + +॥

—'হে ভদ্রে! এই তোমার প্রাণনাথকে গ্রহণ কর—যথাসুখে বিচরণ কর—পরে মনোরথ পূর্ণান্তে আমার পুত্র আমাকে দিও'—

গৃহাণ প্রাণনাথঞ্চ গচ্ছ ভদ্রে! যথাসুখং।
পশ্চাৎ দাস্যসি মৎপুত্রং কৃত্বা পূর্ণং মনোরথম্॥ ১৫।১৫

রাধা মধুর হাস্য করিয়া বালককে গ্রহণ করিলেন—

জগ্রাহ বালকং রাধা জহাস মধুরং সুখাৎ।

এবং কৃষ্ণকে সানন্দে বক্ষে ধারণ করিয়া যথেপ্সিত দূরদেশে গমন করিলেন—

এবমুক্ত্বাতু সানন্দং কৃত্বা কৃষ্ণং স্ববক্ষসি।
গত্বাদূরে তং নিনায় বাহুভ্যাং চ যথেপ্সিতম্॥ ১৫।২৫

স্মৃতিমাত্রে সেই বিচিত্র কাননে অপূর্ব্ব রাসমণ্ডলের আবির্ভাব হইল—রাধা বিস্মিত নেত্রে দেখিলেন—সেখানে পীতাম্বর বনমালী মদনমোহন কিশোর শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত রহিয়াছেন—

পুরুষং কমনীয়ঞ্চ কিশোরং শ্যামসুন্দরং।
কোটিকন্দর্পলীলাভং চন্দনেন বিভূষিতম্॥

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! সেই ক্রোড়স্থ শিশু অন্তর্ধান করিয়াছেন—তাঁহার স্থলে নবযুবা শ্যামসুন্দর!

রাধিকা অনিমেষ নয়নে সেই রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন—তাঁহার চিত্ত লালসায় পূর্ণ হইল—তিনি 'মদনাতুরা' হইলেন—

নিমেষরহিতা রাধা নবসঙ্গমলালসা।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গী সস্মিতা মদনাতুরা॥

ইহার পর 'রহঃকেলয়ঃ' যেমন হওয়া উচিত, সম্পন্ন হইল—কোনরূপ অঙ্গহানি হইল না—

পুনস্তাঞ্চ সমাকৃষ্য সস্মিতাং বক্রলোচনাং।
ক্ষতবিক্ষতসর্ব্বাঙ্গাং নখদন্তৈশ্চকার হ॥

রতিরণের পর রাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের বেশবিন্যাস করিতে গেলেন—কি আশ্চর্য্য! অমনি শ্রীকৃষ্ণ কিশোর রূপ পরিহার করিয়া পূর্ব্ববৎ শিশুরূপ পরিগ্রহ করিলেন! রাধা কি করেন? ত্বরায় বৃন্দাবন হইতে বহির্গত হইয়া মেঘজলের মধ্যে আর্দ্র বসনে রোরুদ্যমান শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া নন্দ-গৃহে উপনীত হইলেন এবং যশোদাকে পুত্র প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন—

গৃহাণ বালকং ভদ্রে স্তনং দত্ত্বা প্রবোধয়।

যশোদা তাহাই করিলেন—

যশোদা বালকং নীত্বা চুচুম্ব চ স্তনং দদৌ।

ইহাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বিবরণ—জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুরম্' শ্লোক যে, এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে কি?

বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন—বর্ত্তমান আকারেও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ জয়দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের পূর্ব্বগামী।

বঙ্কিমচন্দ্র ইহাও দেখাইয়াছেন যে, পঞ্চম শতকে রচিত কালিদাসের 'মেঘদূতে'ও বর্হাপীড়াভিরাম গোপবেশ বিষ্ণুর উল্লেখ আছে—

বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিণা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ

কিন্তু শ্রীরাধা যে তাঁহার বামে, তাহার নিশ্চয়তা কি?

অনেক দিন অবধি ইহাই পর্য্যন্ত ছিল। ঘটনাক্রমে কয়েক বৎসর হইল 'হালসপ্তশতী' নামক প্রাকৃত শ্লোকসংগ্রহগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়। ঐ গ্রন্থে রাধিকার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। প্রাকৃত শ্লোকটি এই :—

মুখমারুতেণ তং কহ্ন! গোরঅং রাহিআঁএ অবণোন্তো।
এতাণং বল্লবীণং অন্নাযং বি গোরবং হরসি॥ ১।৮৯

ইহার সংস্কৃত রূপ এই :—

মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ! গোরজো রাধিকায়া অপনয়ন্।
এতাসাং বল্লবীনাম্ অন্যাসামপি গৌরবং হরসি॥

—'রাধিকার মুখসক্ত গোধূলি মুখমারুতে অপনোদন করিয়া হে কৃষ্ণ! তুমি অন্য গোপিকাদিগের গৌরব হরণ করিতেছ।'

হাল কত দিনের লোক? এ বিষয় লইয়া মতভেদ আছে। অধ্যাপক সেনা (Senart) বলেন, হাল খ্রীষ্টপর তৃতীয় শতকের লোক। অপরে বলেন, তিনি প্রথম শতাব্দীর লোক। যাহাই হউক, হালের সংগৃহীত এই প্রাকৃত শ্লোক নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব কৃষ্ণলীলায় রাধার যোগ কোন মতেই অর্ব্বাচীন নহে। এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত কালসহকারে দুর্ব্বল না হইয়া দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

প্রত্নতত্ত্ব-ক্ষেত্রে ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অবদান। তিনি কত বড় প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন—কিরূপ নিপুণ গবেষক ও সূক্ষ্ম বিচারক ছিলেন—এই রাধাতত্ত্বের আলোচনাই তাহার চরম নিদর্শন।

"কলিকাতা" নামের ব্যুৎপত্তি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্‌-এ, ডি-লিট্‌

কলিকাতা-নগরী অধিবাসি-সংখ্যায় এবং অন্য বহু কারণে ভারতবর্ষের বৃহত্তম ও সর্বপ্রধান নগরী। সমগ্র ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে, লণ্ডনের পরেই কলিকাতার স্থান। "কলিকাতা" এই নামটী, ইহার ইংরেজী উচ্চারণ "ক্যাল্‌কাটা" ও বানান Calcutta রূপে (জরমানেরা এই নাম লেখে Kalkutta রূপে ও উচ্চারণ করে "কাল্‌কুতা" বা "কালকুটা," এবং ইউরোপের বহু জাতি Calcutta বা Kalkutta লেখে ও "কাল্‌কুতা" উচ্চারণ করে), এখন পৃথিবীর সর্বত্র সুপরিচিত। আমরা সকলেই জানি, কলিকাতা শহর খুব প্রাচীন স্থান নহে। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ ও উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ হইতে কলিকাতার গৌরবের পত্তন। ইহার কয়েক শতক পূর্বে কলিকাতার কোনও বিশেষ পরিচয় নাই। তবে অনুমান হয়, অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ হইতে, একটী বড় বা সমৃদ্ধ স্থান হিসাবে কলিকাতার নাম অন্ততঃ দক্ষিণ-বঙ্গে সুপরিচিত হইয়াছিল, এবং ষোড়শ শতকে ইহার নাম বাঙ্গালার বাহিরেও পঁহুছাইয়াছিল। সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে কলিকাতা বিখ্যাত স্থান হইয়া দাঁড়ায়।

দেড় শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ভারতে ব্রিটিশ-রাজ্যের রাজধানী হইবার গৌরব ছিল যে নগরীর, সেই কলিকাতা-নগরীর নামের ব্যুৎপত্তি এখনও নির্ধারিত হইল না, ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয়। সাধু বা পুরাতন বাঙ্গালার রূপ "কলিকাতা," কলিকাতা-অঞ্চলে ও পশ্চিম-বঙ্গে প্রচলিত কথিত বাঙ্গালার (চলিত-ভাষার) রূপ "ক'ল্‌কাতা, ক'ল্‌কেতা (কোল্‌কাতা, কোল্‌কেতা)," পূর্ব-বঙ্গে প্রচলিত কথিত বাঙ্গালার রূপ "কইল্‌কাতা, কইল্‌কাত্তা," উড়িয়া ভাষার রূপ "কলিকতা," পশ্চিমের হিন্দুস্থানীর রূপ "কল্‌কতা" বা "কল্‌কত্তা," এবং সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে প্রথম ইংরেজীতে Hedges হেজেস্‌ কর্তৃক লিখিত Calcutta, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ওলন্দাজ-লেখক Valentijn ভ্যালেনটাইন কর্তৃক লিখিত Collecatte, ও ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসীদিগকর্তৃক লিখিত Colicotta ও Calecuta—এইগুলি লইয়া, এই শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছে। নিম্নে সংক্ষেপে প্রচলিত ব্যুৎপত্তিগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে।

[১] "কালীঘাট" শব্দের বিকারে "কলিকাতা" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মতটীতে অনেকেই বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই মত একেবারেই গ্রহণযোগ্য নহে—প্রাচীন বইয়ে "কলিকাতা" ও "কালীঘাট" দুইটী বিভিন্ন স্থান বলিয়া উল্লিখিত; এবং "কালীঘাট" শব্দ ভাষায় এখন বিদ্যমান আছে, হঠাৎ "কলিকাতা" এই বিকৃত রূপ, সুপরিচিত অর্থ-যুক্ত

[২] এক ইংরেজ সাহেব এই অঞ্চলে প্রথম যখন আসেন, তখন কলিকাতা-অঞ্চলে লোকের বসতি বেশী ছিল না। সাহেবের ঐ স্থানের নাম জানিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু তখন স্থানটীর কোনও নাম ছিল না। সাহেব দেখিলেন, এক জন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটিতেছে। জমীর দিকে হাত দেখাইয়া হিন্দুস্থানীতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন (সাহেব হইলেই প্রথম হিন্দুস্থানীতে কথা বলিবেন !), এ জায়গার নাম কি ? ঘাসিয়াড়া কখনও সাহেব দেখে নাই, সে তাঁহার কথা বুঝিতে পারিল না, ভাবিল, সাহেব তাহার কাটা ঘাসের স্তূপের দিকে দেখাইয়া বোধ হয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন এই ঘাস সে কবে কাটিয়াছে। তাই সে হিন্দুস্থানীতে বলিল, "হুজুর, কল্ (কাল) কাটা।" সাহেব তাহাতে বুঝিলেন, স্থানটীর নাম "কাল্‌কাটা", তাহা হইতে "ক্যালকাটা" Calcutta ও পরে বাঙ্গালায় "কলিকাতা" বিখ্যাত হইয়া উঠিল। বাল্যকালে ইস্কুলে পড়িবার সময়ে এই রূপ গল্প করিয়া আমরা আমোদ করিতাম। কলিকাতা-শব্দের এই ব্যুৎপত্তিকে অবশ্য বিচারের যোগ্য বলিয়া কেহ মনে করিবেন না। কিন্তু অন্ততঃ আর একটী দেশের নামের সম্বন্ধে অনুরূপ উপাখ্যান আছে। মধ্য-আমেরিকার Guatemala "গুআতেমালা" বা "উআতেমালা" দেশের নামের সম্বন্ধে একটী ঐতিহ্য আছে যে, স্পেনীয়েরা যখন জাহাজে করিয়া গিয়া, ঐ দেশে প্রথম পদার্পণ করে, তখন ঐ দেশের কতকগুলি লোক সমুদ্রের তীরে অদ্ভুত আকারের ও অদ্ভুত বেশের এই বিদেশীদের আগমন ভীত-চকিত হইয়া দেখিতেছিল। স্পেনীয় নায়ক জাহাজ হইতে স্থলে নামিয়া, মাটির দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দেশের নাম কি ? স্থানীয় লোকেরা ভাবিল, সমুদ্রকূলে মাটির উপরে যে এক প্রকার মোটা-মোটা ঘাস জন্মিয়াছিল, বিদেশী বোধ হয়, সেই ঘাসকে তাহারা কি বলে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাই তাহারা নিজেদের ভাষায় ঐ ঘাসের নাম করিল "উআতে মালা" বা 'মোটা ঘাস'। স্পেনীয় নায়ক স্থানীয় ভাষা জানিতেন না, তিনি ভাবিলেন, উহাই বুঝি দেশের নাম,— স্পেনীয় বানানে লিখিলেন, Guatemala, এবং তাহাই দেশের নাম দাঁড়াইয়া গেল (এবং ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত ইহা অনুমান করিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন, Guatemala সংস্কৃত "গৌতমালয়" হইতে হইয়াছে, আমেরিকায় প্রাচীন কালে হিন্দু বা বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রচারের এক অকাট্য যুক্তি এই Guatemala বা "গৌতমালয়" নামের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে !) ।

[৩] সুখে কাল কাটানো যায় বলিয়া এই শহরের নাম "কালকাটা" Calcutta, পরে ইহার বাঙ্গালা বিকৃতি "কলিকাতা"। এই ব্যুৎপত্তিও ইস্কুলের ছেলেদের উপযোগী।

[৪] "কালীক্ষেত্র" হইতে "কলিকাতা"। "কলিকাতা" নামটী কখনও-কখনও সংস্কৃত পুস্তকাদিতে "কালীক্ষেত্র" রূপে রূপান্তরিত হয়, কেহ-কেহ তদ্দৃষ্টে মনে করেন, "কালীক্ষেত্র"-ই আদি নাম। বস্তুতঃ তাহা নহে।

[৫] "কিলকিলা" এই রূপে "কলিকাতা" নামের আর একটী সংস্কৃতীকরণ শুনিয়াছি—পশ্চিমের পণ্ডিতদের মুখে। ইহা একটী প্রাচীন রূপ বলিয়া কোনও বইয়েও ইহার উল্লেখ দেখিয়াছি। বলা বাহুল্য, এই নামের সহিত "কলিকাতা" নামের কোনও

[৬] Hobson-Jobson অভিধানে, Yule ইউল্ ও Burnell ব্যর্নেল্ সাহেবদ্বয় দেখাইয়াছেন, "কলিকাতা" নামের সহিত হুগলী Golgot বা Golghat "গোলঘাট"-এর গোলমাল ঘটায়, ফরাসী লেখকদের হাতে "কলিকাতা" Golgota, Golgouthe, Golgotha রূপে পরিবর্তিত হয়। Golgotha যীশু-খ্রীষ্টের জীবনীতে উল্লিখিত যেরূশালেমের নিকটবর্তী একটী স্থান, যেখানে যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়। Golgotha শব্দটী ইহুদী ভাষায় 'মাথার খুলি' অর্থে gulgoleth শব্দের গ্রীক রূপ, এই শব্দ লাটিনে Calvaria রূপে অনূদিত হয়, তাহা হইতে ইংরেজী Calvary. ইউরোপীয়দের পক্ষে কলিকাতার আবহাওয়া এক সময়ে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল বলিয়া, অনেক ইউরোপীয়ের মনে সপ্তদশ শতকের শেষে ও অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে এই নামের ('মাথার খুলির বা নরকপালের স্থান') একটা সার্থকতা ছিল।

কালীঘাটের বিকারে কলিকাতা—অথবা কালীঘাটের কালীর সঙ্গে যোগের দরুন কলিকাতা—এই মতটীই এতাবৎ বেশীর ভাগ লোকের মনঃপূত।

"কলিকাতা" নামটীর ইতিহাস, পুরাতন পুস্তক ও কাগজ-পত্রে ইহার অবস্থান লইয়া বিচার করা যাউক।

[১] কলিকাতার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়, বিপ্রদাস-কৃত মনসামঙ্গল কাব্যে। এই পুস্তক খ্রীষ্টীয় ১৪৯৫ সালে (১৪১৭ শাকে) রচিত হয়। (বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের প্রবন্ধ, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃষ্ঠ ৬৪-৭৩)। বিপ্রদাস সম্ভবতঃ কলিকাতার নিকটবর্তী বাদুড়িয়া-বটগ্রামে বাস করিতেন। চাঁদ সদাগরের সিংহল-যাত্রা প্রসঙ্গে কলিকাতার উল্লেখ আছে (সুকুমার সেনের প্রবন্ধ, পৃঃ ৭০)। কলিকাতার পাশ দিয়া গিয়া, হাওড়া-শিবপুরে বেতড় নামক স্থানে বেতাই-চণ্ডীর পূজা করিয়া, ধনও (?) বাহিয়া, চাঁদ সদাগর কালীঘাটে গিয়া কালিকার পূজা করেন।

১৪৯৫-এর লেখা বইয়ের প্রমাণে, কলিকাতা ও কালীঘাট দুইটী পৃথক্ স্থান। কালীঘাটের বিকারে কলিকাতা—আধুনিক বাঙ্গালায় এই রূপ ধ্বনি-পরিবর্তন, এবং প্রাচীন ও নবীন দুই রূপের এভাবে পাশাপাশি অবস্থান—ইহা অসম্ভব।

[২] কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে (খ্রীষ্টাব্দ ১৫৮০-১৫৮৫ ?) কলিকাতা ও কালীঘাটের পৃথক্-পৃথক্ উল্লেখ আছে। এই উল্লেখ সুপরিচিত।

[৩] ইহার পরে কলিকাতার উল্লেখ পাওয়া যায় আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে—আনুমানিক ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ। Hobson-Jobson-এ আইন-ই-আকবরীর প্রমাণ উদ্ধৃত আছে। Blochmann ব্লখ্মান্ সাহেবের সম্পাদিত মূল ফারসী আইন-ই-আকবরীতে Klkt' (Kalkatā, বা Kalikatā) রূপে নামটী পাওয়া যায়; আবার এই বইয়ের বিভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথিতে পাঠান্তর আছে—Kln'="কল্না", Klt'="কল্তা", Tlp' "তলপা"। "কলকতা" ও "তলপা" এই দুই পাঠভেদ, সর্বপ্রাচীন দুইখানি পুঁথিতে

মহাল সাতগাঁ সরকারের অধীনে ছিল। Bkw' "বকোয়া" এই নামটার আর তিনটা পাঠভেদ আছে—Mkwm' "মকোমা" বা "মকুমা", Pkwm' "পকোমা" বা "পকুমা", এবং Kw' "কুআ" বা "কোআ"। কোন্‌টা ঠিক পাঠ, তাহা জানা যায় না। তবে ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে আইন-ই-আকবরীর সময়ে কলিকাতা যে একটা লক্ষণীয় স্থান ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে—১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই ইহা ভাগীরথীর তীরে উল্লেখযোগ্য গ্রাম বা ব্যবসায়কেন্দ্র-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কলিকাতা-শহরের মধ্যে প্রাপ্ত প্রাচীনতম দলিল হইতেছে একখানি পাথুরে' দলিল। বহু কাল হইল, কলিকাতার অধিবাসী বিখ্যাত আরমানী ইতিহাসবিৎ শ্রীযুক্ত Mesrobv J. Seth মেস্‌রোভ সেথ্‌ মহাশয়, কলিকাতার আরমানী গির্জার সংযুক্ত গোরস্থানে প্রাচীন আরমানী সমাধিফলকগুলির মধ্যে একখানিতে নিম্নপ্রমাণে লিপি পাঠ করেন—'এই সমাধি-ফলক হইতেছে, দানশীল বণিক্ Sukias স্থকিয়াস্-এর পত্নী Rezabeebeh রেজা-বীবা-র।' ইহাতে আরমানী সন-তারিখ দেওয়া হইয়াছে, হিসাব করিয়া খ্রীষ্টান বা ইংরেজী শকের ১৬৩২ অব্দ হয়। বণিক্ স্থকিয়াস্ পারস্য-দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, ইস্‌পহান্-এর নিকটে Julfa জুলফা নগরে তাঁহার নিবাস ছিল। (জুলফা এখনও পারস্য-দেশে উপনিবিষ্ট আরমানীদের একটা প্রধান কেন্দ্র)। এই লেখ হইতে জানা যায় যে, ১৬৩০ সালের দিকে, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বশেষে ও শাহ্‌জাহানের রাজত্বের প্রারম্ভে, কলিকাতায় আরমানী বণিক্‌দের একটা কেন্দ্র ছিল, এবং এই কেন্দ্রে ইহারা স্ত্রী পুত্র পরিবার আনিয়া বাস করিতেন। ইংরেজ Job Charnock যোব চার্‌নক ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিবার প্রায় ৬০ বৎসর আগে—দুই পুরুষ আগে—আরমানীরা কলিকাতায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। আরমানীদের পরে আসে পোর্তুগীসেরা, ও তৎপরে ইংরেজেরা। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের দিকে, আরমানী, পোর্তুগীস ও ইংরেজ, এই তিন জাতীয় খ্রীষ্টান বণিক্‌গণ কলিকাতায় পাশাপাশি বাস করিয়া কলিকাতার বাণিজ্য-সম্পদে অংশীদার হইত। তখন অবশ্য কলিকাতা ইংরেজদের হাতে চলিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালা-দেশের অন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে ইংরেজেরা দিল্লী হইতে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি বিশেষ অধিকার লাভ করায়, এবং ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ইংরেজদের পূরা অধিকারে আসার ফলে, আরমানী ও পোর্তুগীসদের প্রতিপত্তি বাঙ্গালা-দেশের বাণিজ্যে ও কলিকাতায় ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজেরা বড়িষার সাবর্ণচৌধুরী-বংশীয় জমীদারগণের নিকট হইতে সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটী গ্রাম (ভাগীরথীর পূর্ব তীরে, উত্তর হইতে দক্ষিণে পাশাপাশি অবস্থিত) ক্রয় করে। এবং কলিকাতায় তাহাদের কুঠী নির্মাণ করে। ইহাই হইল কলিকাতার ভবিষ্যৎ গৌরবের সূত্রপাত।

"সুতানুটী" গ্রাম—এখনকার চিৎপুর অঞ্চল লইয়া—মোটামুটি ভাবে, উত্তরে কাশীপুর বাগবাজারের খাল হইতে দক্ষিণে নিমতলাঘাট, জোড়াবাগান, বীডন ষ্ট্রীট পর্যন্ত লইয়া "সুতানুটী" গ্রাম ছিল। সুতানুটীর দক্ষিণে কলিকাতা—মোটামুটি এখনকার ধর্মতলা ষ্ট্রীট

পর্যন্ত কলিকাতা গ্রাম ছিল, এখনকার বহুবাজার ষ্ট্রীট এই কলিকাতা-গ্রামের কেন্দ্রস্থল ছিল। গোবিন্দপুর গ্রাম আদিগঙ্গার ধারে, এখনকার গড়ের মাঠের ও ফোর্ট উইলিয়াম গড়ের কতক অংশ লইয়া ছিল।

"সুতানুটী" নাম সম্বন্ধে কোনও গোলমাল নাই। বেশ বুঝিতে পারা যায়, সুতানুটীতে সুতার হাট বা বাজার বসিত—সুতার নুটী, অর্থাৎ জড়াইয়া গোলাকার তাল বা পিণ্ড করিয়া রাখা সুতা, বহুল পরিমাণে বিক্রয় হইত বলিয়া ঐ নাম। হয়তো ঐ অঞ্চলের আদি নাম ছিল "চিৎপুর", পরে চিৎপুরের অন্তর্গত বা সন্নিকটে যে 'সুতার নুটীর হাট' বসিত, তাহাই "সুতানুটীর হাট" বা "সুতানুটী-হাট" রূপে পরিচিত হয়, ও শেষে সংক্ষেপে হাট ও হাটের সংশ্লিষ্ট স্থানেরই নাম দাঁড়ায় "সুতানুটী"। এই "সুতানুটী" নামেরই অনুরূপ "কলিকাতা" নাম।

"কলিকাতা"—একটী খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ। ইহার অর্থ, "কলি" বা কলিচুনের জন্য "কাতা" বা শামুক পোড়া। সুতার নুটী বা গোলার হাট বা আড়ত হইতে যেমন "সুতানুটী" নাম, তেমনি কলির বা চুনের ও কলিচুনের জন্য শামুকের আড়ত, এবং চুনের কারখানা হইতে "কলি-কাতা" নাম। পাথরিয়া চুন দক্ষিণ-বঙ্গে হয় না, এ অঞ্চলে শামুক ও ঝিনুক পোড়াইয়াই চুন প্রস্তুত হয়। এই চুন দেওয়ালে চুনকাম করিবার বা 'কলি ফিরাইবার' জন্যই প্রশস্ত, সেই জন্য ইহাকে কলিচুন বলে। শামুক-পোড়ানো চুন জৈব পদার্থের বিকার বলিয়া, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর অন্য ঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবারা ঐ চুন দিয়া পান খাইতেন না। পাথরিয়া চুন এ অঞ্চলে সুলভ হওয়ার পূর্বে, ঐ কারণে পান খাওয়াই সদাচার-পালনের বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইত।

"কলি"-শব্দ বাঙ্গালায় সুপরিচিত। "কাতা" শব্দ চুন অর্থে কলিকাতা অঞ্চলে ব্যবহৃত হইত, প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি। (এই শব্দ, খয়ের বা খদির অর্থে, "ক্বাথ"-শব্দ-জাত যে "কত্‌থা" বা "কাথা" শব্দ হিন্দুস্থানীতে ও অন্য পশ্চিমা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতে ভিন্ন)। উত্তর-বঙ্গে, রাজশাহী জিলায়, শামুক পোড়াইয়া, তাহাতে জল দিয়া চুনে রূপান্তরিত করিবার পূর্বে, পোড়ানো শামুক বা জোঙ্গড়াকে "কাতা" বলে। পোড়ানো শামুক বা জোঙ্গড়াকে বাঙ্গালা-দেশে কোনও-কোনও অঞ্চলে "বাখারী"ও বলে।

কলিকাতা-গ্রামে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চুন প্রস্তুত হইত, তাহার নিদর্শন আছে। এখনকার বহুবাজার ষ্ট্রীট (অষ্টাদশ শতকে এই রাস্তা 'বৈঠকখানা ষ্ট্রীট' নামেও পরিচিত ছিল) খাস কলিকাতা-গ্রাম বা নগরের একটী প্রধান রাস্তা—পূর্ব হইতে পশ্চিমে শহরের মেরুদণ্ড-স্বরূপ ছিল। এই রাস্তার উত্তর ধারে যে এক সময়ে চুনের কাজ হইত, কতকগুলি রাস্তা ও পল্লীর নামে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। বহুবাজার ষ্ট্রীটের উত্তরে "চুনাগলি" পল্লী, মেটে বা কালো ফিরাঙ্গীদের (অর্থাৎ পোর্তুগীস ও অন্য ইউরোপীয়দের সহিত মিশ্রিত দেশীয় খ্রীষ্টানদের) বাসস্থান বলিয়া এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখন যেখান দিয়া নূতন রাস্তা "চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ" গিয়াছে, বহুবাজারের উত্তরে

ষ্ট্রীট-এর পশ্চিমে মাঝামাঝি একটী স্থানে "চুনারীতলা" (Chunarytollah) নামে একটী পল্লীর উল্লেখ, অষ্টাদশ শতকের কলিকাতার পুরাতন নক্শা ও কাগজ-পত্রে পাওয়া যায়। এই "চুনারীতলা"-তে "চুনারী" যা চুনের কাজ করিত, এমন লোকেরা বাস করিত। এখন যেমন "শাঁখারীটোলা"-তে এক ঘরও শাঁখারী নাই, তেমনি "চুনারীতলা" হইতে চুনারীদের অস্তিত্ব অনেক কাল হইল লোপ পাইয়াছিল, কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগেও তাহাদের অধ্যুষিত পল্লীর নাম তাহাদের স্মৃতি বহন করিয়া বিদ্যমান ছিল, এবং "চুনাগলি"র রাস্তা ও পল্লীর নামে এখনও তাহাদের ব্যবসায়ের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। চুনারীতলার আরও একটু পূর্বে, এখনকার কলেজ ষ্ট্রীট ও আম্‌হার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মধ্যে, লেডি ডফরিন হাসপাতালের সন্নিকটে, বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে বাহির হইয়াছে "চুনাপুখুর লেন"। এই অঞ্চলও চুনের ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং, খাস কলিকাতা-গ্রামে, উত্তর হইতে দক্ষিণে মিলিত সুতানুটী ও কলিকাতা গ্রামদ্বয়ের মেরুদণ্ড-স্বরূপ চিৎপুর রোড ও কসাইটোলা রোডের (এখনকার বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের) পূর্বে, কলিকাতা গ্রামের পূর্ব সীমানায় বৈঠকখানা পর্যন্ত যে রাস্তা বিস্তৃত ছিল, তাহার উত্তরে অনেকখানি জুড়িয়া—"চুনাগলি, চুনারীতলা ও চুনারীপুখুর" অঞ্চলগুলিকে আশ্রয় করিয়া—চুনের কাজ হইত। সুতানুটী গ্রাম যদি সুতার ব্যবসায়ের জন্য, তাঁতের কাপড়ের জন্য (কলিকাতার আদি অধিবাসীদের মধ্যে তন্তুবায়-জাতীয় লোকেরা প্রধান ছিল, একথা স্মরণ করিতে হইবে) ক্রমে ঐ নাম পাইয়া থাকে, জোঙ্গড়া চুন, শামুক-পোড়া কলিচুনের ও অন্য চুনের কাজের জন্য "কলি-কাতা" বা কলিচুন এবং কাতা-চুনের বা শামুক-পোড়া কাতার আড়ত হিসাবে, এখন হইতে সাড়ে চারি শত পাঁচ শত বৎসর পূর্বে, দ্রব্যের নাম হইতে স্থানের নাম-স্বরূপ এই নাম গৃহীত হইয়া যাইতে কোনও বাধা নাই।

এইরূপ দ্রব্যের নামে স্থানের বা গ্রামের নাম এদেশে বা অন্যত্র বিরল নহে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কতকগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে : "কেন্দুবিল্ব"—জয়দেব গোস্বামীর বাসস্থান, এক প্রকার ফলের নাম হইতে ; "শশা, মুখী, সেহড়া (= শ্যাওড়া), বেত, পটল, কাঁঠাল (ময়মনসিংহ) ; জগডুম্বুর (বগুড়া) ; খাগড়া, বয়ড়া (বাঙ্গালার বহু স্থানে—"বহেড়া" ফল হইতে এই নাম হওয়া সম্ভব, যদিও প্রাচীন বাঙ্গালা তাম্রপট্টে এই নামের সংস্কৃতীকরণ পাওয়া যায় 'বখটক' রূপে) ; শ্রীফলা (যশোহর) ; বালি (হুগলী) ; কলাছড়া (হাওড়া) ; বাবলা, ডুমুর, আমড়া, পাণিফলা (বর্দ্ধমান)"—প্রভৃতি, গাছ বা ফলের নামে গ্রামের নাম, বাঙ্গালা দেশে খুবই সাধারণ। সেই হিসাবে কোনও বস্তুর জন্য বিখ্যাত বা লক্ষণীয়, কোনও স্থানের সহিত সেই বস্তুর নাম সহজেই জড়িত হইয়া যাইতে পারে—বিশেষতঃ যদি জিনিসের নামটী একটু বড় হয়, এবং তাহার সহিত "হাট, গোলা, গঞ্জ, পোতা, নগর, পুর, কাঁদী, পাশা, পাড়া" প্রভৃতি স্থান-বাচক শব্দ সংযুক্ত হইলে নামটী অত্যন্ত বড় হইয়া যায়।

"কলিকাতা" নামটী মাত্র কলিকাতা-মহানগরীতে নিবদ্ধ নহে—বাঙ্গালা-দেশের দুই

কৃষ্ণপদ গোস্বামী বাঙ্গালা দেশের গ্রামের নাম লইয়া কাজ করিতেছেন। তিনি এই গ্রাম দুইটীর সম্বন্ধে আমায় খবর দেন। ঢাকা জেলার লোহজঙ্গ থানার অধীনে, এবং হাওড়া জেলার আমতা থানার অধীনে এই দুই কলিকাতা গ্রাম। গত ১৯৩৭ সালের মে মাসে আমি ঐ দুই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের পত্র লিখিয়া গ্রাম দুইটীর সম্বন্ধে খবর আনাই। লোহজঙ্গ থানার শ্রীযুক্ত ক. মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানাইয়াছেন যে, উক্ত থানার প্রায় তিন মাইল উত্তরে "কলিকাতা-ভোগদিয়া" নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে; ইহার অধিবাসি-সংখ্যা মাত্র ৩।৪ শত, প্রায় সকলেই মুসলমান চাষী; ঐ গ্রামে চূনের কাজ হয় না। আমতা থানার সব্-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত অ. বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, আমতা থানার বায়ুকোণে প্রায় আড়াই মাইল দূরে "রসপুর-কলিকাতা" গ্রাম অবস্থিত। (এই গ্রামকে "ছোট-কলিকাতা" বলিতেও শোনা যায়)। সব্-ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের বিবরণ তুলিয়া দিতেছি: "The village is situated on the northern bank of the river Damodar. Its population is about 1000, mainly cultivators. Lime is manufactured in this village from snail-shells (শামুক চূন) on an extensive scale so as to meet the local demands." ঐ স্থানে তিন জন চূনারী মহাজন আছেন, তাঁহাদের নামও দিয়াছেন।

বাঙ্গালা-দেশের তিনটী কলিকাতার মধ্যে একটীতে এখনও শামুকের খোলা পুড়াইয়া চূন তৈয়ারী হইয়া থাকে; মহানগরী কলিকাতাতে এক সময়ে চূন প্রস্তুত হইত, এই নগরীর মুখপাত যে কলিকাতা-গ্রামকে অবলম্বন করিয়া, তাহার একটা বড় অংশেও চূনের কাজ হইত; সম্ভবতঃ প্রথমটায় এই গ্রামে শামুক-পোড়া ('কাতা') চূন বা কলিচূন প্রস্তুতই ইহার লক্ষণীয় ব্যবসায় ছিল।

'কলি' শব্দ (হিন্দুস্থানীতে 'কলী') দেওয়ালে লাগাইবার জন্য শামুক-পোড়া চূন অর্থে উত্তর-ভারতে সুপ্রচলিত। শব্দটীর বুৎপত্তি অজ্ঞাত। তামিলে Karcunnampu 'কর্-চুন্নাম্পু' বা 'কর্-শুণ্ণাম্বু' শব্দটী, গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত চূন অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই শব্দের প্রথম অংশ 'কর্' খাঁটী দ্রাবিড়ী শব্দ বলিয়া অনুমান হয়। এই শব্দে যে "র"-কার আছে, তাহার দ্বিত্ব হইলে "ত্ত"এর উচ্চারণ হয়। 'কলি' এবং 'কাতা'—উভয় শব্দই কি এই "কর্, কর্ৰ্, বা কত্ত্" শব্দের সহিত সম্পৃক্ত?

বাঙ্গালায় ও উড়িয়াতে "কাতা, কতা" শব্দ 'নারিকেল-দড়ী' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থেও 'কাতা' শব্দের বুৎপত্তি অজ্ঞাত। 'কলি ও কাতা' অর্থাৎ কলিচূন ও নারিকেল-দড়ী, এই দুই জিনিসের নাম হইতে 'কলিকাতা' নামের উদ্ভব, এরূপ ব্যাখ্যা যদি কেহ করেন, তাহার বিরুদ্ধে জোর করিয়া বলিবার কিছু নাই; তবে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, 'চূনের জন্য শামুক-পোড়া' এই অর্থে 'কাতা' শব্দ বাঙ্গালা-দেশের অন্ততঃ একটী প্রান্তে পাইতেছি, এবং প্রাচীন কালের কলিকাতা-গ্রামে চূন প্রস্তুত হওয়ার কিছু প্রমাণ, ও সঙ্গে-সঙ্গে হাওড়া জিলার কলিকাতা-গ্রামে এখনও চূনের কাজের অস্তিত্ব পাইতেছি। এই জন্য "কলিকাতা" শব্দের দ্বিতীয় অংশকে 'নারিকেল-দড়ী' অর্থে 'কাতা' বলিতে প্রবৃত্তি হয় না।

কিছু কাল পূর্বে আমি 'কাতা' শব্দকে চলিত বাঙ্গালা 'কাত' অর্থাৎ 'পার্শ্বদেশ' অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম ('কলির কাতা', 'কলিচূনের ...

কৃষ্ণকীর্তনের সুর ও তাল

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

কৃষ্ণকীর্তনের পুথি আবিষ্কৃত হইবার পরে ইহার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু আমি যত দূর জানি, ইহার সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনও আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই। এই পুথির সাঙ্গীতিক অংশে যে নূতনত্ব আছে, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আমাদের পরিচিত অন্য কোনও প্রাচীন বা অর্বাচীন পুথিতে রাগ রাগিণী ও তালের এরূপ বিস্তৃত সমাবেশ নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ-সংবলিত সঙ্গীতের সম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক। সঙ্গীতে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, আমি এই প্রবন্ধে কয়েকটি বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।

প্রথম ইহার অভিনবত্ব। কৃষ্ণকীর্তনের সকল কবিতাই গীত; এই সকল কবিতার উপরিভাগে বিস্তারিত ভাবে সুর ও তাল দেওয়া আছে। (কোনও কোনও গীতে শুধু সুর দেওয়া হইয়াছে, তালের উল্লেখ নাই।) কয়েকটি নমুনা দিলেই আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে :—

পাহাড়ীআ রাগঃ। ক্রীড়া॥

গুজ্জরী রাগঃ। কুড়ুক্কঃ।

কোড়া রাগঃ। অঢ়ুক্কঃ।

গুজ্জরী রাগঃ। রূপকং। লগনী। জয়জয়॥

মালব রাগঃ॥ প্রকীর্ণকঃ॥ চিত্রকঃ। লগনী॥ রূপকং। দণ্ডকঃ।

মালব রাগঃ। বিচিত্র লগনী॥ দণ্ডকঃ।

রামগিরী রাগঃ। প্রকীর্ণক। চিত্রকং। লগনী। একতালী॥ দণ্ডকঃ।

বিভাষ রাগঃ॥ দণ্ডকঃ। একতালী॥ রূপকথা॥

বিভাষ রাগঃ। একতালী। রূপকথা। দণ্ডকঃ।

পাহাড়ীআ রাগঃ। প্রকীর্ণক॥ লগনী॥ দণ্ডকঃ। ক্রীড়া॥

অনুস্বার বিসর্গ দেখিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে, সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থ হইতে এই সকল লওয়া হইয়াছে। কিন্তু যত দূর দেখা যায়, তাহাতে প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রে যে সকল রাগরাগিণী বা তালের উল্লেখ আছে, কৃষ্ণকীর্তনে তাহার অনেক ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়।

সঙ্গীতরত্নাকর একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই গ্রন্থ নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেব সংকলন করেন। শার্ঙ্গদেব দৌলতাবাদের যাদব-বংশীয় নরপতি সিংঘণের সমকালে বর্তমান ছিলেন। সিংঘণ নরপতি শকাব্দ ১১৩২ হইতে ১১৬৭ (১২১০-১২৪৫ খ্রীঃ অঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সঙ্গীতরত্নাকর সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি অতি

প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহার টীকাকারও এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতকে চতুর কল্লিনাথ ইহার টীকা প্রণয়ন করেন। কল্লিনাথ বিজয়নগরের অভ্যুদয়-কালে (১৪শ হইতে ১৬শ শতক) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে সঙ্গীত সম্বন্ধে বহু প্রামাণিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল : সঙ্গীতরত্নাকর, বৃহৎ সঙ্গীতরত্নাকর, সঙ্গীতপারিজাত, সঙ্গীতদামোদর, সঙ্গীতমুক্তাবলী, সঙ্গীতসার, সঙ্গীত-চন্দ্রিকা প্রভৃতি। এই সকল গ্রন্থে বহু রাগরাগিণীর নাম আছে এবং তালাধ্যায়ে তালের নাম আছে। সঙ্গীতরত্নাকরে এক শত বিশটি তালের নাম আছে। মতান্তরে তালের সংখ্যা দুই শত চব্বিশ (সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম)। রত্নাকরের টীকায় কল্লিনাথ 'দেশী' তালের কথাও বলিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞেরা দেশী তাল ও স্বরের সন্ধান রাখিতেন এবং সেগুলিকে তাঁহাদের গণনার মধ্যে আনিতেন। তাল সম্বন্ধে ভারতীয় সঙ্গীতের এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য দেশের স্বর এবং প্রণালী সম্বন্ধে যতই উৎকর্ষ স্বীকার করা যাউক না কেন, তালের অশেষ প্রকার ভেদ ও তাহার লক্ষণ-নির্দেশ ভারতবর্ষের এক অনন্যসাধারণ বৈলক্ষণ্য। প্রাচীন কালেও বিভিন্ন তালের বোল সঙ্গীতশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। (সঙ্গীতরত্নাকরের বাদ্যাধ্যায়ে মৃদঙ্গের বোল দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু সঙ্গীতের এইরূপ বিস্তৃত বর্ণনার মধ্যেও কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত সাঙ্গীতিক শব্দগুলির মধ্যে অনেকগুলির সন্ধান মিলে না। কতকগুলি হয়ত কিছু রূপান্তরিত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। যথা : কক্, কহু=ককুভ ; আহের=আভীর, আভীরী বা আহীর। রামগিরি= রামক্রী, রামকলি বা রামকেলি। ধানুষী=ধনাশ্রী। লগনী=লাউনী বা লগ্নী নামক গীত। দেশাগ=দেশাখ, দেশাখ্য।

'দণ্ডক' বলিতে একটি ছন্দ বুঝায়।* কিন্তু গীতের প্রসঙ্গে তাহার অবকাশ কোথায়, তাহা বুঝিতে পারা কঠিন। ক্রীড়া, কুড়ুক্ক প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ তালের উল্লেখ সঙ্গীত-রত্নাকরের এক শত একবিংশতি তালের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকীর্ণক কি বস্তু? প্রকীর্ণক অর্থে চামর জানি। চৈতন্যমঙ্গল গানে চামরের ব্যবহার দেখা যায়। গায়ক মধ্যে মধ্যে চামর হস্তে লইয়া নাচিয়া নাচিয়া গান করেন। রামায়ণ-গানেও কোথাও কোথাও এই প্রথা আছে।†

---

* পাদৈঃ স্বরৈর্দণ্ডকেন ছন্দসা দণ্ডকো মতঃ।—সঙ্গীতরত্নাকর।

দণ্ডকাশাবরীবৃত্ত দণ্ডকাশাবরী যথা।

তথা দণ্ডক-কোডায়ে স রাগঃ কিল জায়তে॥—রাগতরঙ্গিণী (৩০০ বৎসর পূর্বে রচিত)

† সঙ্গীতরত্নাকরে রাগরাগিণীর বর্ণনায় 'প্রকীর্ণক' নামে একটি অধ্যায় আছে। সেখানে এরূপ কতকগুলি স্বরের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, যাহা বিষয়-বিভাগের মধ্যে ধরা পড়ে নাই।

প্রকীর্ণকং চ গ্রন্থস্ত বিষয়বিভাগেন বিনা প্রবৃত্তত্বমুচ্যতে।

কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে স্বরের বিশেষ উল্লেখ থাকায় এ অর্থ প্রযোজ্য নহে বলিয়া মনে করি।

কিন্তু অঢ়ুক, জয়জয়, চিত্রক, রূপকথা, লগনী, বিচিত্র বা চিত্রক লগনীর অর্থ কি? 'রূপকথা' শব্দটি বেশী প্রাচীন বলিয়া জানা ছিল না। 'রূপকড়া' নামে একটি অল্পপরিচিত তাল আছে বটে, কিন্তু ইহাও আধুনিক। বিশেষজ্ঞেরা এ সম্বন্ধে হয়ত বলিতে পারিবেন।

আমরা জানি, রাগরাগিণী ও তাল অসংখ্য। সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা সঙ্গীতকে অনন্ত সমুদ্র বলিয়াছেন,—

নাদাব্ধেস্ত পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াৎ তুম্বং বহতি বক্ষসি॥

ভিন্ন ভিন্ন দেশে গানের ভিন্ন ভিন্ন গতি, ইহাও সঙ্গীতকারেরা লক্ষ্য করিয়াছেন :—

দেশে দেশে ভিন্ন নাম তদ্দেশীগানমুচ্যতে।

আমার মনে হয়, কৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গীত-প্রণালী কোনও দেশীয় বা স্থানীয় রীতির পরিচয় দিতেছে। এই রীতির সম্বন্ধে প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র হইতে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইহা সম্ভবতঃ বেশী প্রাচীন নহে। কারণ, চর্যাপদে আমরা যে প্রাচীন সরল রীতির পরিচয় পাই, তাহা কৃষ্ণকীর্তনে নাই। যথা : রাগ গবড়া, রাগ অরু, পটমঞ্জরী, রামক্রী, বলাড্ডি, মালসী ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই সঙ্গীতশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। চর্যাপদে তালের উল্লেখ নাই, কিন্তু সুরের সরল উল্লেখ আছে।

ইহার পরে জয়দেবে আমরা সঙ্গীতের যে ধারা পাইতেছি, তাহাও প্রাচীন রীতির অনুগামী। গীতগোবিন্দে যে সুর ও তালের উল্লেখ আছে, তাহা সরল। যথা—মালব রাগ রূপক তাল, গুজ্জরী রাগ নিঃসার তাল, বসন্ত রাগ যতি তাল, কর্ণাট রাগ, দেশাগ রাগ একতালী ইত্যাদি। এ সকল কোনও স্থানীয় বা দেশীয় রীতির অনুসরণ করে নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কৃষ্ণকীর্তন অনেক স্থলে জয়দেবের একান্ত অনুকরণ করিলেও সুর তাল সম্বন্ধে অনুকরণ করেন নাই। ইহার কারণ কি? তাহাও ভাবিবার বিষয় বটে।

চৈতন্য-পূর্ববর্তী মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা গোবিন্দবিজয়-গ্রন্থে সঙ্গীতের যে প্রণালী দেখা যায়, তাহা কৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ নহে। এই পুস্তকের প্রাচীনতম পুথি দেখিয়া কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে যে পুস্তক ছাপিয়াছিলেন, তাহাতে রাগরাগিণীর যে ক্রম দেখা যায়, তাহা সঙ্গীতশাস্ত্রসম্মত। তালের নির্দেশ নাই, কেবল সুর দেওয়া আছে ; যথা : শ্রীরাগ, সুহইরাগ, রামক্রী, পটমঞ্জরী, বসন্ত, মল্লার, ধানশ্রী ইত্যাদি। এই পুস্তকের ভূমিকায় ভক্তিবিনোদ মহাশয় বলিতেছেন যে, আদর্শ পুথিখানি চৈতন্য-জন্মের দুই বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল (১৪০৫ শক)। কৃষ্ণকীর্তন যদি ইহার ১০০ কি ১৫০ বৎসর পূর্বে (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) রচিত বা লিখিত হইয়া থাকে, তবে সে পদ্ধতি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কেন অনুসৃত হইল না, তাহাও বিবেচ্য।

আমার মনে হয়, কৃষ্ণকীর্তন চৈতন্য-পরবর্তী কালের কোন দেশীয় বা স্থানীয় সঙ্গীত-রীতি অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল। এই পুথিখানি বাঁকুড়া জেলায় প্রাপ্ত হওয়া

যায়। শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১৩১৮ সালে ইহা আবিষ্কার করেন বনবিষ্ণুপুরের সন্নিকটে। ঐ অঞ্চলের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সপ্তদশ শতকে বিষ্ণুপুরে দেশীয় রাজাদিগের প্রভাবে নানা বিষয়ে উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল।* সম্ভবতঃ বিষ্ণুপুর এই সময়ে সঙ্গীতচর্চার জন্যও প্রসিদ্ধি লাভ করে। বীরহাম্বির ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মোগল-পাঠান কলহে লিপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস হইতে জানা যায়। বৈঠকী সঙ্গীতের চর্চা বঙ্গদেশের মধ্যে এই মল্লরাজগণের প্রভাবে বনবিষ্ণুপুরেই বেশী পরিমাণে হইয়াছিল। সেই জন্য এখনও আমরা বিষ্ণুপুরী রীতি বলিয়া উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের একটি অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্র প্রণালীর সন্ধান পাই। প্রচলিত হিন্দুস্থানী রীতি হইতে ইহা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট, সে প্রশ্নের কোনও প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু জানিতে পারিতেছি যে, বিষ্ণুপুরই সঙ্গীতচর্চায় এক দিন বঙ্গদেশের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গীতেও যে সেই প্রভাবের ঢেউ পৌছিয়াছিল, এই অনুমানই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কারণ, এই সময়ে অর্থাৎ প্রায় তিন শত কিংবা সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে বঙ্গের সর্বত্র সঙ্গীতচর্চার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কীর্তনেরও প্রসার ঘটে। এই সময়ে শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর গরাণহাটী বা গড়েরহাটী কীর্তনের প্রবর্তন করেন। রাঢ়ে জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতি মনোহরসাহী সুরের সৃষ্টি করেন। সুতরাং এই যুগ হইতে সঙ্গীতের অনুশীলন বঙ্গদেশে প্রবলভাবে হইয়াছিল ধরা যায় এবং কৃষ্ণকীর্তনও সেই যুগে লিখিত বলিয়া অনুমান করিলে তাহা অসঙ্গত হয় না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ দুইখানি পুথি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার এই আবিষ্কার সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১৩৩৯ ও ৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুথি দুইখানিতে কৃষ্ণকীর্তনের কতকগুলি পদ পাওয়া যায়। এই পুথির সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত এক প্রবন্ধ (পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯) ব্যতীত বিশেষ কোন আলোচনা এ পর্যন্ত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। এই পুথি দুইখানি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাঁকুড়া অঞ্চলে সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে একটি বিশেষ সঙ্গীতরীতি প্রচলিত ছিল। বলা বাহুল্য, ঐ পুথি দুইখানিও বাঁকুড়া অঞ্চলে সংগৃহীত হইয়াছিল।

এই পুথিদ্বয়ের একখানি ১২৩৭ সালে লিখিত, অপরখানি তাহারও প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে লেখা। প্রথমতঃ এই পুথি দুইখানিই সঙ্গীতবিষয়ক। অর্থাৎ গীতবাদ্য

---

* The Rajas of Mallabhum seem now (from the time of Raghunath Singh—Seventeenth Century) to have entered on their palmiest days, if we may judge by the exquisite memorials left by him and his descendants.—

ব্যতীত ইহাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। কোন তালের কোন গান এবং তাহার কতগুলি কলা ইত্যাদি ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতর পুথিখানিতে আলোচিত হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনের অদ্ভুত সাঙ্গীতিক নির্দেশ ইহাতে অনুসৃত না হইলেও, যে সকল তালের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার অভিনবত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যথা: হরগৌরী, অপূর্বকলা, কুন্দশেখর (কুন্দুশেখর) আলুটী, বিষমসন্ধি, জদ্দ (বা জজ্জ ?) কাঠের (কাচের ?) তাল, চুটথিলা তাল ইত্যাদি। দ্বিতীয় পুথিখানিতে আরও সব নূতন তালের সন্ধান আছে : দশকোসি জন্ধতাল, অপূর্বকলিকা, বগুতাল, জলদকান্তি ইত্যাদি। এই সকল তালের বোলে দ্বিতীয় পুথিখানির কলেবর পূর্ণ; সেগুলি মণীন্দ্র বাবু ছাপান নাই। এ পুথিতেও কোন তালের কত কলা, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় আছে। এই কলার মধ্যে আবার লঘু, গুরু, সদ্‌গুরু, গুরুর গুরু পরম গুরু প্রভৃতি নানা বিধি-বিধান আছে।

একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কৃষ্ণকীর্তনের প্রকীর্ণক লগনী চিত্রক প্রভৃতির নামগন্ধ ইহাতে নাই। বরং পাহিড়া, গুজ্জরী প্রভৃতির সঙ্গে বহু পরিচিত সুরের উল্লেখ আছে, যথা: বাগেশ্রী, মঙ্গল, ভীমপলাশী (ডিম্পনাশী নহে—১৮৩ পৃঃ), মাউর, শ্রী ইত্যাদি। এই পুথি দুইখানিতে সুরের সরলতা থাকিলেও তালের অভিনবত্ব লক্ষিত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই পুথিদ্বয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য গীতবাদ্য। গীত অপেক্ষা বাদ্যই প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে। বাদ্য সম্বন্ধে ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের অনুকরণে বাদ্যের সংস্কৃত সংজ্ঞা দিবারও চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু তাহা অতি দীন অনুকরণ; না আছে তাহাতে ব্যাকরণ, না আছে কোনও অর্থ-সঙ্গতি। যথা—দ্রুতংদ্বয়ং লঘু দ্বয়ং [···] স তাল দশকুশীঞ্চ ভবেৎ। হয়ত ইহা অশিক্ষিত লোকের লেখা, সে জন্যও এরূপ বিকৃতি ঘটিতে পারে। যাহা হউক, তালগুলির উদাহরণস্বরূপেই গানগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা: হরগৌরী তালের পদাবলী, আলুটী তালের পদাবলী, জদ্দকাঠের তালের পদাবলী, ইত্যাদি। উদাহরণ ব্যতীত গীতের অন্য কোনও মূল্য এই দুই পুথিতে নাই।

সুতরাং তালের উদাহরণ হিসাবে নানা কবির গীত উদ্ধৃত হওয়া উচিত ছিল। ইহাই সাধারণতঃ প্রত্যাশা করা যায় যে, গায়ক বা বাদক বিভিন্ন তালের বিভিন্ন ছন্দ দেখাইবার জন্য চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি হইতে পদ বাছিয়া লইবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সে প্রণালী অনুসরণ করা হয় নাই। এক জন কবির পদই উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তিনি বড়ু (বোঁড়ু, বাঁড়ু বা বটু) চণ্ডীদাস। আর কোনও কবির পদের সঙ্গে যে সংগ্রহ-কার পরিচিত ছিলেন, এরূপ প্রমাণ একেবারেই পাওয়া যায় না। দুইখানি পুথিতে অনেক-গুলি পদ প্রায় সমান এবং প্রায়শঃ দানখণ্ড হইতেই সেই সকল পদ সংগৃহীত হইয়াছে। পদগুলির কবিত্ব বিশেষ কিছু থাকুক বা না-থাকুক, অশ্লীলতা অংশে কৃষ্ণকীর্তনের অনুসারী। যথা,

১ম পুথি (প্রাচীনতর)

মোরে শেহ [...] বড়াই কর কোন বুদ্ধি।
শুনিঞা বা কি বলিবে শ্বামি শুননিধি॥
অমূল্য রতন মানে (মাগে ?) ধরে মোর হাথে।
মাগএ যুরতি দান * * দেই হাথে।

(সাঃ পঃ পত্রিকা, ১৩৩৯ সাল ১৮৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

২য় পুথি

মোর সিশুমতি বড়াই করি কোন বুদ্ধি।
শুনিঞা বা কি বলিব স্বামি গুণনিধি।
য়মুল্য রতন মাগে ধরি মোর হাথে।
মাগএ শুরতি দান * * দেই হাথে।

(ঐ ১৩৪০ সাল ৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

কৃষ্ণকীর্তন :

মোএঁ শিশুমতী বড়ায়ি করোঁ কোণ বুধী।
শুণিআঁ বা কি বুলিবে সামী গুণনিধী।
অমূল রতন মানে ধরে মোর হাথে।
মাঙ্গে সুরতি দান সান দেই মাথে। (৮৭ পৃঃ)

'সান দেই মাথে' এই পাঠে কোন অর্থ হয় কি? বসন্ত বাবু জোর করিয়া অবশ্য একটি অর্থ করিয়াছেন : মস্তকসঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেত করিয়া, কিন্তু ঐ সময় মস্তক-সঞ্চালন-রূপ সঙ্কেতের কি অর্থ হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। পদাবলীতে 'সান দেও শিঙ্গায়' এরূপ প্রয়োগ পাই। কিন্তু মাথায় সান দেওয়া এই প্রথম দেখিতেছি।*

এই নবাবিষ্কৃত পুথি দুইখানির অনেকগুলি পদ কৃষ্ণকীর্তনে আছে। রুচি, গ্রাম্যতা-দোষ ও অভিনবত্ব হিসাবেও প্রাপ্ত পুথি এবং কৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে অসাধারণ সাম্য দেখা যায়। ভাষার বিচার করিলেও কৃষ্ণকীর্তন ও এই পুথি দুইখানির মধ্যে বড় বেশী কালের ব্যবধান অনুমিত হয় না। অশিক্ষিত লিপিকরের খামখেয়ালী বানান দেখিয়া প্রাচীনত্ব অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। এই খামখেয়ালীপনা কৃষ্ণকীর্তন ও এই পুথি দুইখানি তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়। যথা : অমুল [কৃঃ কীঃ], য়মুল (আধুনিক পুথি); আঙ্গুল (কৃঃ কীঃ), য়ঙ্গুলি [আঃ পুঃ], বেশ্যাক [কৃঃ কীঃ] বেউশ্যাক [আঃ পুঃ]।

এই দুইখানি পুথি দেখিলে এইরূপ অনুমান হয় যে, বাঁকুড়া জেলায় কৃষ্ণকীর্তন-লেখকের সম্প্রদায়ে তাঁহার পদগুলি গীত হইত এবং নূতন নূতন তাল সহযোগে সেগুলির

* সোন=অবগুণ্ঠন ; সান কাড়া বা দেওয়া=ঘোমটা দেওয়া। বীরভূম অঞ্চলে এই অর্থে 'সান' শব্দ বহুল প্রচলিত। উত্তমপুরুষে 'দেই' ক্রিয়ার প্রয়োগ সেকালের প্রাচীন সাহিত্যে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে 'সান দেই' কথাটির চমৎকার অর্থ-সঙ্গতি হয়।—সা. প. প.-সম্পাদক।

প্রচারের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু এই চেষ্টা যে বহুদূর বিস্তৃত হয় নাই, তাহার প্রমাণ—

১। কৃষ্ণকীর্তনের অন্য পুথি পাওয়া যায় না।

২। আধুনিক পুথিরও অন্য প্রতিলিপি পাওয়া যায় নাই।

এই গীতগুলির মধ্যে যে একটি সাম্প্রদায়িক ভাব আছে, তাহা এই নবাবিষ্কৃত পুথি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনতর পুথিখানির অনেকগুলি পদ দ্বিতীয় পুথিখানিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা ব্যতীত অপর একটি পদও বড়ু চণ্ডীদাসের নামে চালাইবার চেষ্টা দেখা যায়। পদটি দ্বিজ চণ্ডীদাসের একটি উৎকৃষ্ট পদ; ইহা পদকল্পতরুতে এবং নীলরতন বাবুর সংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়াছে। মণীন্দ্রবাবু এই পদটি তুলিতে ভুলিয়াছেন :

বযু তালের পদাবলি ॥ রাগিণি পটমঞ্জরি ॥

এক কাল হইল মোর জমুনার জল।
আর কাল হইল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হইল মোরে পাসে বৃন্দাবন।
আর কাল হইল মোর নহলি জৌবন।

লঘু দুবারে ১৪ চৌদ্দ্য কলা ॥ পরে গুরু ॥

আর কাল হইল মোরে ভ্রমরার বোল।
আর কাল হইল মোরে কানু মাগে কোল।
আর কাল হইল মোরে তরলিয়া বাঁসি।
আর কাল হইল মোরে কানু মুখের হাসি।
আর কাল হইল মোরে নয়ানের নির।
আর কাল হইল মোর চিত্ত নহে স্থির।
আর কাল হইল মোরে কোকিল্যার স্বর।
আর কাল হইল মোর নিজ পাপ ঘর।
আর কাল হইল মোরে বড়ায়ের সঙ্গ।
আর কাল হইল দানি করে কত রঙ্গ।
আর কাল হইল মোরে মোহনিঞা বাঁসি।
আর কাল হইল মোরে কাল মুখের হাসি।
আর কাল হইল মোরে নাহিক উপায়ে।
আর কাল হইল বটু চণ্ডিদাসে গায়ে।

এবং লঘু গুরু সকলে ৬৪ চৌসট্টি কলা।

এই পদটি কৃষ্ণকীর্তনে নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মণীন্দ্রবাবু এই সুন্দর পদটি তাঁহার বিবরণ হইতে বাদ দিয়াছেন। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলী ১৫৭ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত পাঠ ধৃত হইয়াছে :

পটমঞ্জরী।

একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাই সব এক জন॥

পদকল্পতরু (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ) ২য় খণ্ড ৯৪৫ পদ ইহারই প্রায় অনুরূপ, ভণিতাও প্রায় এক :

দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কারু কোন দোষ নাই সবে এক জন॥

এই পদটির ভাষা, ভাব, ব্যঞ্জনা কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রাপ্ত পুথির পদটিতে দ্বিরুক্তি-দোষ ঘটিয়াছে, ভণিতার কলিটি টানিয়া বুনিয়া মিলিত, এইরূপ মনে হয়। পদটিকে দানের পদের মধ্যে ফেলিবার চেষ্টাও দেখা যায় ; কারণ, ঐ পুথিতে উদ্ধৃত সবগুলি পদই দানখণ্ডের।

আর কাল হৈল মোরে বড়ায়ের সঙ্গ।
আর কাল হইল দানি করে কত রঙ্গ॥

এই কলিটি যেন গানের অপরাংশ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে।

এই সকল কারণে আমার মনে হয়, কৃষ্ণকীর্ত্তন এই দুইখানি পুথির সহিত মিলাইয়া পড়া উচিত। তাহা করিলে, যে ভাবধারার জন্য কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিখানিকে চতুর্দশ শতকের বলিয়া গণ্য করা হইতেছে, তাহার জের উনবিংশ শতকেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। সে যাহা হউক, সঙ্গীতের দিক্ দিয়া এই অপূর্ব পুথিত্রয়ের সম্যক্ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর নবজাগরণের ইতিহাস বড় বিচিত্র। পলাসীর যুদ্ধের পর হইতেই ক্লাইভ, ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রভৃতির নেতৃত্বে ইংরেজ সওদাগরেরা বাংলা দেশকেই ব্যবসায়ের কেন্দ্র করিয়া যে অর্থলোলুপতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার একমাত্র শুভফল—বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা যাহা সুরু করিয়াছিলেন, মিশনরীরা আসিয়া তাহারই বিস্তার সাধন করিলেন এবং ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যেই শিক্ষায় দীক্ষায়, সাহিত্যে সমাজে, এমন কি, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে দ্রুত উন্নতি করিয়া বাঙালী ভারতবর্ষের অপর সকল প্রদেশকে পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া চলিল; ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল; মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটিল এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের ভিত্তিও স্থাপিত হইল।

সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর এই নবজাগরণের ইতিহাস জানিবার জন্য এ যুগের বাঙালীর সহজ কৌতূহল আছে। কিন্তু এ যুগের কোন বিধিবদ্ধ প্রামাণিক ইতিহাস নাই। বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও শিক্ষা-সম্পর্কীয় আন্দোলনের মধ্যে, অধুনা-দুষ্প্রাপ্য সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় এবং কয়েক জন কৃতী পুরুষের ব্যক্তিগত জীবনী হইতে এই যুগের ইতিহাস আমাদিগকে কষ্ট করিয়া সংগ্রহ করিতে হইতেছে। একটা মোটামুটি কাহিনী পাইতেছি বটে কিন্তু যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, কৌতুক-কৌতূহলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এই সকল বিচ্ছিন্ন উপকরণের মধ্যে বড়-একটা মিলিতেছে না।

গত যুগের এক জন কৃতী পুরুষের ব্যক্তিগত জীবন ও স্মৃতিকথার সাহায্যে যুগের অন্তরতম রহস্যের খানিকটা সন্ধান আমরা জানিয়াছি, বর্ত্তমান প্রসঙ্গ তাঁহারই জীবনী ও কীর্ত্তির সামান্য পরিচয় দিবার জন্য লিখিত হইয়াছে। তিনি আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে জন্মগ্রহণ করিয়া বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৯২ বৎসর তিনি বাঙালীর জাতীয় মনের বহু ঘাত-প্রতিঘাত ও তজ্জনিত পরিবর্ত্তন স্বয়ং লক্ষ্য করিয়াছেন এবং আমাদের নিতান্ত সৌভাগ্য যে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নামক পুস্তকে গল্পচ্ছলে তাহার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এক হিসাবে, বিস্মৃত ও বর্ত্তমান যুগের মধ্যে যোগসূত্র রূপে তাঁহার এই কাহিনীগুলি অত্যন্ত মূল্যবান্ এবং তাঁহার বহুবিচিত্র কর্ম্মজীবনও আমাদের নিকট কম মূল্যবান্ নয়।

বংশ-পরিচয়

১৮৬৯ সনে কৃষ্ণকমল তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা "রামকমলের জীবনবৃত্ত" লিখিয়া 'বেকন'

পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা-স্বরূপ প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি তাঁহার পিতৃ-পিতামহ সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ দিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

১২৪০ শালের ১৬ই চৈত্র কলিকাতা শহরের সিমুলিয়া পল্লীর অন্তঃপাতী মালিরবাগান নামক স্থানে রামকমলের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামজয় তর্কালঙ্কার। ইনি জাতিতে বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত ও গৌড় দেশের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী মালদহ নগরের অধিবাসী ছিলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রাধাকৃষ্ণ বসাকের বিমাতার যত্নাতিশয়ে রামজয়ের পিতা আসিয়া পুত্র সমেত কলিকাতাবাসী হয়েন। ঐ বসাক গোষ্ঠী হইতেই একটী বাসবাটী, এক বিগ্রহ ঠাকুর এবং মাসিক কিঞ্চিৎ বৃত্তির বিধান করা হয়, রামজয়ের পিতা এবং তদীয় পরলোকের পর রামজয় নিজে, উভয়েই সেই বৃত্তি উপলক্ষ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। রামজয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্যবসায়ী ছিলেন ; সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তিও ছিল, বিশেষতঃ ভাগবত পুরাণ নামক দুরূহ দুরবগাহ পুরাণ গ্রন্থের রসজ্ঞ বলিয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠাও ছিল। কিন্তু এতদ্দেশীয় অধ্যাপকমণ্ডলী মধ্যে তাঁহার নামের সেরূপ প্রভা প্রকাশ পায় নাই।...তিনি পুত্রের শৈশবদশাতেই এতদ্দেশীয় রীতি অনুসারে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করান। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যেই উল্লিখিত সুকঠিন ব্যাকরণ সমগ্র, অমরকোষ অভিধান, এবং ভট্টিকাব্য ও শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণের কিয়দংশ পাঠ সাঙ্গ হইলে রামকমলের পিতৃবিয়োগ হয় ; তৎকালে রামজয়ের এক কন্যা ও রামকমল ব্যতীত আর এক পুত্র [কৃষ্ণকমল] বর্ত্তমান থাকে। তন্মধ্যে রামকমল ভগিনী অপেক্ষা বয়সে ছোট এবং সহোদর অপেক্ষা বড় ছিলেন।*

---

* রামকমল ১৮৫৭ সনে নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি তিন বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৬০ সনের ১১ই জুন তারিখে তিনি আত্মহত্যা করেন।

রামকমলের মৃত্যুর পর তাঁহার রচিত ও অপ্রকাশিত পুস্তকগুলির অধিকাংশই তদীয় ভ্রাতা কৃষ্ণকমল মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। আমি রামকমলের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সন্ধান পাইয়াছি :—

(১) Bacon's Essays | Selected and | renderod | with | sundry adaptations | By | Ramkamal Bhattacharya. | বেকন | অর্থাৎ | তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ। | রামকমল ভট্টাচার্য্য | সংকলিত। | কলিকাতা | মৃজাপুর, ফকিরচাঁদ মিত্রের লেন, ৯ নং ভবন। | গৌড়ীয় যন্ত্র। | ১৮৬১ | [পৃ. ৬৮+১ শুদ্ধিপত্র]

এই সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে আছে। ১৮৬৯ সনে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় (*The Calcutta Gazette* for 8 Decr. 1869) ; তাহার প্রথম ২৫ পৃষ্ঠায় "রামকমলের জীবনবৃত্ত" দেওয়া আছে। এই জীবনবৃত্ত কৃষ্ণকমলের রচনা। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের নিকট দ্বিতীয় সংস্করণের 'বেকন' এক খণ্ড আছে।

(২) ইংলণ্ডের ইতিহাস। পৃ. ১২৬। কলিকাতা ১৮৬১।

ইহাতে ৩য় জর্জ্জের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

(৩) Elements | of | GEOMETRY | By | Ramkamal Bhattacharya. | Published after his death | With an English Translation. | জ্যামিতি। | রামকমল ভট্টাচার্য্য প্রণীত। | Calcutta : | The Presidency Press, | 1862. | [পৃ. ৩২+28+xx]

ছাত্রজীবন

আনুমানিক ১৮৪০ সনে কৃষ্ণকমল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহের সমবয়স্ক ছিলেন। ছাত্রজীবন সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

তখন আমার বয়স আন্দাজ ৬।৭ বৎসর; বোধ হয় ইংরাজি ১৮৪৭ সাল হইবে। আমি আমার দাদার সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে যাইতাম। তিনি আমাকে একটা বেঞ্চে বসাইয়া রাখিতেন। এই রকম ২।৫ দিন যাইতে যাইতে একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে বলিলেন, 'আয় তোকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দি।' তখন কোনও ছাত্রের বেতন দিবার পদ্ধতি ছিল না; কাযেই ইস্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার প্রতিবন্ধক হইল না।...

ইস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই আমার 'মুগ্ধবোধ' পড়া আরম্ভ হইল। প্রথম দুই বৎসর ৺প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর* মহাশয়ের কাছে অধ্যয়ন করিলাম।...তৃতীয় বৎসর ৺গোবিন্দ শিরোমণি† মহাশয়ের ক্লাসে ও চতুর্থ বৎসর ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কাছে 'মুগ্ধবোধ' অধ্যয়ন করিলাম।... এই চারি বৎসরে 'মুগ্ধবোধ' পড়া শেষ হইল।...অঙ্কের অধ্যাপক...শ্রীনাথ দাস; ইংরাজির অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী। আমি তাঁহাদের উভয়ের কাছেই পড়িয়াছি। (পৃ. ৩৩-৩৬)

আসলে কৃষ্ণকমল আট বৎসর বয়সে ১৮৪৮ সনের প্রথম ভাগে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার্থী হিসাবে প্রবেশ করেন। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র হইতে এই সংবাদ পাওয়া

---

* প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের জ্যেষ্ঠভ্রাতা; তিনি ১৮৪৩-৪৫ সনে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপকের প্রতিনিধিরূপে প্রায় তিন বৎসর সংস্কৃত কলেজে কাজ করিয়াছিলেন। তৎপরে ২০ মে ১৮৪৬ তারিখ হইতে তিনি মাসিক ৪০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের চতুর্থ ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫৫ সনের ৭ই মে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রচনাবলী সম্বন্ধে আমি ১৩৪৪ সালের প্রথম সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (পৃ. ২৫-৩০) আলোচনা করিয়াছি।

† কৃষ্ণকমল স্মৃতিবিভ্রমের ফলে রামগোবিন্দ গোস্বামী (তর্করত্ন) মহাশয়ের নামের পরিবর্ত্তে গোবিন্দ শিরোমণির নাম করিয়াছেন।

১১ সেপ্টেম্বর ১৮৪০ তারিখে সংস্কৃত কলেজের ৩য় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হইলে রামগোবিন্দ তর্করত্ন মাসিক ৪০৲ বেতনে ১ ডিসেম্বর ১৮৪০ তারিখে তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হন; তৎপূর্ব্বে (জুলাই ১৮৩৭ হইতে) প্রুফ সংশোধনাদি কার্য্যের জন্য তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণকমল তাঁহারই শ্রেণীতে ১৮৫০ সনে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৫ জুন ১৮৫৬ তারিখে রাম-গোবিন্দ মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের ২য় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন। ২৮ মার্চ ১৮৬০ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে যে সংস্কৃত মহাভারত প্রকাশিত হয় তাহার ৪র্থ খণ্ডে (১৮৩৯) সম্পাদক হিসাবে নিমাইচন্দ্র শিরোমণি প্রভৃতির নামের সহিত তাঁহার নামও আছে।

গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন না। তিনি ১ জুন ১৮৩৯ হইতে ৩০ এপ্রিল ১৮৪৪ তারিখ পর্য্যন্ত হিন্দু ল কমীটির পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ অসুস্থ হইয়া পড়িলে (এবং অবশেষে ২ মার্চ ১৮৪৫ পরলোক গমন করিলে) শিরোমণি মহাশয় ১১ জুন ১৮৪৪ হইতে ২৫ জুন ১৮৪৫ তারিখ পর্য্যন্ত মাসিক ২৫৲ টাকা পারিশ্রমিকে অস্থায়ী ভাবে সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৬০-৬১ সনের ক্যালেণ্ডারে হুগলী কলেজের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে, তাহাতে কলেজ-বিভাগের হেডপণ্ডিত রূপে শিরোমণির নাম পাইতেছি।

যায়। সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সেক্রেটরী রসময় দত্ত ১৫ মে ১৮৪৮ তারিখে কাউন্সিল-অব-এডুকেশনের সেক্রেটরী জে.ময়েট (Mouat) সাহেবকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লেখেন :—

I have the honor to report that since my letter No. 373 dated 25th January 1848 the undermentioned Students have been admitted in the Sanscrit College.

Names	Age in year	Class
*	*	*
Krishnacomul	8	4th Grammar Class

কৃষ্ণকমল সংস্কৃত কলেজের এক জন কৃতী ছাত্র; তিনি জুনিয়র সিনিয়র বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃতে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল।

১৮৫৭ সনে এনট্রান্স পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। এই বৎসর এপ্রিল মাসে কৃষ্ণকমল সংস্কৃত কলেজ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ঐ বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-বিভাগ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পরীক্ষার পর ১৮৫৭ সনেই কৃষ্ণকমল প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে য়ুনিভার্সিটি স্থাপিত হইলে, ঐ বৎসরই এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিলেন যে, আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইতেছি। তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; আমাকে বলিলেন,—'তুমি ষোল টাকা বৃত্তি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে যা'চ্চ; আমি বলি, তুমি মেডিক্যাল কলেজে যাও, ডাক্তারি পড়, আমি তোমার আটাশ টাকা বৃত্তি ক'রে দেবো।' আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি, আমি তাঁহার কথা শুনিলাম না; প্রেসিডেন্সি কলেজেই ভর্ত্তি হইলাম।...আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কয়েক মাস ডভ্‌টন্ কলেজে পড়িয়াছিলাম।—'পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭, ১১৯।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণকমল প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৯ জুন ১৮৫৭ তারিখে ডিরেক্টর অব পাব্‌লিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শনকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন :—

I have the honor to state that the three students of the Sanscrit College who passed at the last Entrance Examination are anxious to enter the Presidency College, two (1. Ramakhoy Chatterjee, 2. Shomanath Mookerjee) into the Law Class and one (Krishnakamal Bhattacharjee) into the General Branch. I have therefore to request that you will be pleased to issue the necessary instructions for their admission into that Institution.

As all the three students hold Senior Scholarships* in the Sanscrit College I beg to recommend that they may be permitted to retain their in the Presidency College.

---

* কৃষ্ণকমলের বৃত্তি প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১ জুন ১৮৫৭ তারিখে ডি. পি. আই.-কে লিখিয়াছিলেন :—

Krishnacomal Bhattacharjee was on the receipt of 12 Rupees per month... during the last Session, but he has since become entitled to a higher scholarship

প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিবার কয়েক মাস পরে—১৮৫৮ সনের এপ্রিল মাসে কৃষ্ণকমল কিছু দিনের জন্য নিরুদ্দেশ হন। তাঁহার স্মৃতিকথায় প্রকাশ :—

> প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলাম।—এক বৎসর পরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পশ্চিমে যাইলাম।—'পুরাতন প্রসঙ্গ,' পৃ. ৪১।

সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকমলের একটি বিজ্ঞাপন হইতে কৃষ্ণকমলের নিরুদ্দেশের কথা জানিতে পারা যায়। বিজ্ঞাপনটি এই :—

> বিজ্ঞাপন।—আমার ভ্রাতা শ্রীমান কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য গত ৫ বৈশাখ শনিবার দিবস নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার বয়স ১৬।১৭ বৎসর কিন্তু খর্ব্বাকৃতি জন্য অল্প বোধ হয়, গৌরাঙ্গ, কৃশ, সংস্কৃত কালেজ হইতে প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল যে কেহ তাহার অনুসন্ধান করত ধৃত করিতে পারেন, প্রভাকর যন্ত্রালয় অথবা নরমেল স্কুলে আমার নিকট সংবাদ দিলে তাঁহার নিকট যথোচিত বাধিত ও উপকৃত হইব। শ্রীরামকমল ভট্টাচার্য্য। নরমেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক।—'সংবাদ প্রভাকর', ২০ এপ্রিল ১৮৫৮। ৮ বৈশাখ ১২৬৫।

১৮৬০ সনে কৃষ্ণকমল বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> কলেজে অধ্যয়ন না করিয়া আমি এন্‌ট্রান্স পাসের দুই আড়াই বৎসরের মধ্যে ঘরে পড়িয়া বি, এ, পাস দিয়াছিলাম,...। (পৃ. ১০৩)

এই পরীক্ষার ফল ২১ জুন ১৮৬০ তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেটে' বিজ্ঞাপিত হয়; তাহাতে প্রকাশ :

2nd Class.

4th—Kristocomul Bhuttacharyya. Ex-student Sanskrit College.

কর্ম্মজীবন

ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর-অব-স্কুলস্

খুব সম্ভব ১৮৬০ সনের শেষ দিকে, ইন্‌স্‌পেক্টর-অব-স্কুলস্ উড্‌রো সাহেবের চেষ্টায় কৃষ্ণকমল ২৪-পরগণার দক্ষিণাংশের ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর-অব-স্কুলসের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—

> ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আমার দাদা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। সুতরাং আমাকে চাকরি করিতে হইল। ইস্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর হইলাম। ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেব আমায় বড় ভাল বাসিতেন।

এই পদে তিনি অল্প দিনই নিযুক্ত ছিলেন। ১ জুন ১৮৬১ তারিখে ডি. পি. আই.-কে লিখিত ইন্‌স্‌পেক্টর-অব-স্কুলস্ উড্‌রো সাহেবের পত্রের সহিত কৃষ্ণকমলের একটি রিপোর্ট প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ রিপোর্টের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "...Whatever scheme of liberal education may be conceived for Bengal, it will be narrow and imperfect, unless it take in a thorough mastery over Bengali and Sanskrit, together with a critical, extensive,

of Baboo Krishna Comul Bhuttacharjee B. A., late Deputy Inspector of Schools, for the Southern part of the 24-Pergunnahs (Appendices to General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1860-61. App. A, pp. 58-60.)

খানাকুল কৃষ্ণনগরে শিক্ষকতা

কৃষ্ণকমল ১৮৬২ সনের প্রথম চারি মাস খানাকুল কৃষ্ণনগরের সংস্কৃত ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিকথায় ইহার উল্লেখ নাই। এই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণ-সভার যে বিবরণ ৭ জুলাই ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে কৃষ্ণকমলের খানাকুল কৃষ্ণনগরে শিক্ষকতার কথা জানা যাইবে :—

খানাকুল কৃষ্ণনগরের সংস্কৃত ইংরাজী বিদ্যালয়।—গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার [? ২৯ মে] খানাকুল কৃষ্ণনগরস্থ সংস্কৃত ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক পারিতোষিকী ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ তর্কালঙ্কার সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন পাঠ করেন।…

…এই চারি বৎসর কাল পাঠশালার সমুদায় কার্য্য আমার পিতৃঠাকুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে।… বিদ্যামন্দিরটী যে এরূপ সুগঠন ও সুশ্রী দেখিতেছেন তাহা কেবল তাঁহার অবিশ্রান্ত যত্ন, অক্লিষ্ট পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায় বলেই সম্পাদিত হইয়াছে।…

আপনারা ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ গত বৎসর এইরূপে সমবেত হইবার প্রায় দেড় মাস পরে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বি এ প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। … শ্যামাচরণ বাবু শ্রাবণ মাস অবধি পৌষ মাস পর্য্যন্ত প্রধান শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।…শ্যামাচরণ বাবুর গমনের পর কয়েক দিবস শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়…কর্ম্ম করিলে পরেই শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি এ প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া আমাদের এই বিদ্যালয়ের যৎপরোনাস্তি উপকার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী শাস্ত্রে যেরূপ ব্যুৎপন্ন শিক্ষাকার্য্যে যেরূপ আগ্রহযুক্ত ও পটু আমাদের এই বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার যেরূপ স্নেহ দৃষ্টি এখানকার ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত তিনি যেরূপ শান্তস্বভাব ও অমায়িক তাহাতে সমুদয় বিবেচনা করিলে আমাদের এই পাঠশালার পক্ষে তাঁহার মত অক্ষ শিক্ষক অতি বিরল অবশ্যই বলিতে হইবে। কিন্তু সুখ কি চিরস্থায়ী হয়? আমাদের এই বিদ্যালয়ের সৌভাগ্য কি চিরকালই অব্যাহত থাকিবে? কৃষ্ণকমল বাবু আর এখানে থাকিতে পারিবেন না, আগামি ২০এ জ্যৈষ্ঠ অবধি তাঁহাকে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে হইবে। শিক্ষাকার্য্যের গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মহোদয়ের অভ্যর্থনায় তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কালেজের অন্যতম সহকারী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার এখানকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বড় ইচ্ছা ছিল না আমি সবিশেষ অনুরোধ করিয়া ও পরামর্শ দিয়া তাঁহাকে কর্ম্মটী স্বীকার করাইলাম। বুঝিতেছি যে এরূপ করিয়া আমাদের এই বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ ক্ষতি করিলাম। কিন্তু বলিলে কি হয়, আমাদের এখানে

বাবুকে এ কর্ম্মটি গ্রহণ করিতে প্রবর্ত্তনা না দিলে, বন্ধুর মত কাজ না হইয়া নিতান্ত স্বার্থপর ব্যক্তির মত কাজ হইত। এক্ষণে ভরসা করি যে তিনি সচ্ছন্দ শরীরে ও সচ্ছন্দ মনে নূতন কর্ম্মটি করিতে থাকুন এবং ক্রমশঃ তাঁহার পদ বৃদ্ধি হইতে থাকুক।...

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা

ইহার পর ১৮৬২ সনের মে মাসের শেষাশেষি কৃষ্ণকমল মাসিক দুই শত টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলা ভাষার সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ৩০ মে ১৮৬২ তারিখে বাংলা-সরকারের জুনিয়র সেক্রেটরী তাঁহাকে যে নিয়োগ-পত্র পাঠান, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

I am directed to inform you that the Lieutenant Governor has been pleased to appoint you to be Assistant Professor of Vernacular Literature in the Presidency College on a salary of Rupees 200 Two hundred per mensem.

ইহার ছয় মাস পরে, ১৮৬২ সনের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণকমল প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ২২ ডিসেম্বর ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

বিবিধ সংবাদ। ৩রা পৌষ বুধবার।... পরিদর্শক সম্পাদক বলেন প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গালা ভাষার প্রথম অধ্যাপক পদে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, দ্বিতীয় পদে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়োজিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

ছয় মাস পরে রামচন্দ্র মিত্র অবসর গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোটলাট Sir Cecil Beadonকে বলিয়া আমাকে Senior Professorএর পদে নিযুক্ত করাইয়া দিলেন,...। আমি বাঙ্গালা পড়াইতাম। কাশীদাস ও কৃত্তিবাস লইয়া আরম্ভ করা হইল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য পুস্তক যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল, অমনি আমি কলেজে পড়াইতে লাগিলাম। কৃষ্ণ বন্দ্যোর 'ষড়দর্শন', হেম বন্দ্যোর 'চিন্তাতরঙ্গিণী', 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি ধরাইলাম।

কৃষ্ণকমল প্রেসিডেন্সী কলেজে ১০ বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ১৮৭২ সনের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা দেন; পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ওকালতি করিবার সঙ্কল্প করেন। ১৮৭৩ সনের ৮ই জানুয়ারি তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন। এই প্রসঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ জে. সাট্‌ক্লিফ্‌ সাহেব ৭ ডিসেম্বর ১৮৭২ তারিখে ডিরেক্টর অব্‌ পাব্‌লিক ইন্‌স্ট্রাকশনকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লেখেন :—

I have the honor to forward a letter from Baboo Krishna Komol

desires to resign his appointment from the 8th January with the intention of joining the Bar. The College is closed for the winter vacation from this date and will reopen on the 8th January. I therefore recommend that the Baboo be allowed to resign his appointment from that date. I have received several applications for the post about to be vacated which I forward for your consideration.···The salary of the Professorship is 300 Rupees and that of the assistant Professorship 200 Rupees a month.

তাঁহার পদত্যাগের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে ৩ জানুয়ারি ১৮৭৩ তারিখে 'এডুকেশন গেজেট' লেখেন :—

সাপ্তাহিক সংবাদ ।—প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কর্ম্মে জবাব দিয়াছেন। তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিবেন। প্রেসিডেন্সির ন্যায় সর্ব্বপ্রধান কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ শিক্ষা বিভাগের গ্রেডভুক্ত না হওয়া উক্ত বাবুর পদত্যাগের কারণ।

ওকালতি

প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকমল অল্প দিনের জন্য হাইকোর্টে, এবং তৎপরে হাবড়া-কোর্টে কয়েক বৎসর ওকালতি করেন। তাঁহার স্মৃতিকথায় প্রকাশ :—

আমি যখন হাইকোর্টে ওকালতি করি,···। (পৃ. ১২০)

[বঙ্কিম বাবু] যখন হাবড়ায় ছিলেন, আমি তাঁহার এজলাসে অনেক সময়ে ওকালতি করিয়াছি। (পৃ. ৭২)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষ্ণকমল ১৮৭৩ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য হন। ১৮৮৪ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' (Tagore Law Lecturer) পদে নিযুক্ত হইয়া হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহার পারিশ্রমিক-স্বরূপ তিনি প্রায় দশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। ১৯০৪ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অনরারী ফেলো' নির্ব্বাচিত হন।

রিপন কলেজের অধ্যক্ষ

কৃষ্ণকমল ১৮৯১ সনে রিপন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি

সাহিত্যালোচনা

বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে কৃষ্ণকমলের বিশেষ দখল ছিল। ফরাসী ভাষাও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

অল্প বয়স হইতেই তিনি বাংলা ভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভার তিনি এক জন সভ্য ছিলেন। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়।···তাঁহার বাড়ীর দোতালায় একটি Debating Club ছিল, আমি সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। সেই স্থানে ৺কৃষ্ণদাস পালের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এখনও আমার বেশ মনে আছে, যেদিন কৃষ্ণদাস পাল commerce সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন; ইংরাজিতে তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।···আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, কিন্তু বাঙ্গালায়। আমি ছেলে মানুষ বলিয়াই হৌক বা আর কোনও কারণেই হৌক, প্রবন্ধগুলির জন্য আমি প্রশংসা পাইতাম। একদিন আমার একটি প্রবন্ধের আলোচনা হইতেছিল—কি বিষয়ে সে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এখন আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় বিধবা-বিবাহের উপর,—এমন সময় একজন সভ্য বলিয়া উঠিলেন, 'ছেলে মানুষের প্রশংসা ক'রে ক'রে রাত কাটান যাবে নাকি ?' (পৃ. ৮৪-৮৫)

সাপ্তাহিক পত্র পরিচালন

১৮৫৮ সনের জানুয়ারি মাসে কৃষ্ণকমল 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এ-সম্বন্ধে তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> সে [সিপাহীবিদ্রোহের] সময়ে বাঙ্গালা রচনার দিকে আমার কিছু ঝোঁক ছিল। 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র তৎকালে আমি বাহির করিয়াছিলাম। ইহা অ্যাডিসনের Spectatorএর ধরণে গঠিত হইয়াছিল। একটি সন্দর্ভে সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইত। সর্ব্বোপরি একটি করিয়া সংস্কৃত motto থাকিত। কি কারণে, মনে নাই, পাঁচ ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াই উহা কিন্তু বন্ধ হইয়া যায়। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের জ্ঞাতিভ্রাতা তারাধন ভট্টাচার্য্য পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২০০-২০১।

'বিচারকে'র প্রথম তিন সংখ্যা হস্তগত হইবার পর ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য করেন :—

> 'বিচারক' নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক পত্রের ১ হইতে ৩ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, বিচারক তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই অনুষ্ঠানটি অতি সদনুষ্ঠান বটে।···সম্পাদক মহাশয় কি জন্য আপনার নামটি গোপন করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলাম না।

১৮৯১ সনে* সাপ্তাহিক পত্র 'হিতবাদী' প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ সাপ্তাহিক

পত্রের প্রথমাবস্থায় কৃষ্ণকমল কিছু দিন সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিতবাদী' নামটি দ্বিজেন্দ্র বাবুরই সৃষ্টি, এবং "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ" এই Mottoটিও তিনিই বলিয়া দেন। হিতবাদীর জন্মকালে পাঁচজন একত্র মিলিয়া এক বৈঠক বসিয়াছিল; তথায় আমিও ছিলাম, দ্বিজেন্দ্র বাবুও ছিলেন। সেই সময়েই ঐ নাম ও Motto পরিগৃহীত হয়। সুতরাং এক হিসাবে দ্বিজেন্দ্র বাবুই ঐ কাগজের জন্মদাতা বলিতে হইবে। সেই বৈঠকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে সম্পাদক হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সম্পাদক হইয়া কাগজের উন্নতিকল্পে আমি বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই, এবং ঐ পদও আমি অধিক দিন রাখিতে পারি নাই, কারণ তখন আমার অনেক ঝঞ্ঝাট ছিল।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬-৭৭।

রচনা—পুস্তক ও প্রবন্ধ

আচার্য্য কৃষ্ণকমল অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; অনুসন্ধানে যেগুলির সন্ধান আমরা পাইয়াছি, নিম্নে সেগুলির পরিচয় দেওয়া হইল।

১। **দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ**। পৃ. ৬২। ১৮৫৮ (?)

পুস্তকখানির আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ। | কলিকাতা। | ১৭৭৯ শকাব্দা | টামর্স লেনে বিশ্বপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। |

এই পুস্তকখানি ১৮৫৮ সনের গোড়ায় প্রকাশিত বলিয়া মনে হইতেছে। আষাঢ়, ১৭৮০ শকের 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত করেন। সমালোচনাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ কলিকাতা বিশ্ব প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।" এতদ্দেশীয় উপন্যাস সকলেরই এক ধারা; সকলেই "এক রাজা ছিলেন তাঁহার সো দো দুই রাণী" এই রূপ বান্ধা ধরণে আরম্ভ হইয়া থাকে; এই উপন্যাস তদ্রূপ নহে, এবং গল্পটীও তাদৃশ নিন্দনীয় বোধ হয় না।

পুস্তকখানির আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই। কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার···কাহার মুখে অবগত হইয়াছেন যে, উহা আমার জ্যেষ্ঠ রামকমলের রচনা। আমার এক্ষণে বলিতে বাধা নাই যে, বাস্তবিক তাহা নহে। উহা আমারই রচনা। কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব তাহা জানিতেন।···ঐ গ্রন্থ সিপাহীবিদ্রোহের সময় প্রকাশিত হইয়াছিল।—'পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০।

'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' যে কৃষ্ণকমলেরই রচনা, ৩০ জুন ১৮৬২ তারিখের

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি। কালেজ ষ্ট্রীট নং ৮৬

প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রচিত যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা প্রকাশিত হইবে সে সকলের মুদ্রাঙ্কন ও বিক্রয়ের সম্পূর্ণ ভার আমাদিগের উপর অর্পণ করিয়াছেন। অতএব উক্ত গ্রন্থ সকল প্রয়োজন হইলে আমাদিগের গ্রন্থালয়ে পাইবেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বেকনের সন্দর্ভ (৺ রামকমল ভট্টাচার্য্য কৃত)	...	।৵০
ইংলণ্ডের ইতিহাস (ঐ কৃত)	...	।৹
দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ (কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কৃত)	...	।৹
বিচিত্র বীর্য্য (ঐ কৃত)	...	।৹

গুপ্ত ব্রাদর্শ।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' পুস্তক সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমি যেন ভাষা রাজ্যের আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম। এ ত কাদম্বরী নয়, বেতাল পঁচিশ নয়, তারাশঙ্করও নয়। প্যারীচাঁদও নয়—এ যে এক নূতন সৃষ্টি। ইহাতে কাদম্বরীর আড়ম্বর নাই, বিদ্যাসাগরের সরসতা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাঁদের গ্রাম্য সরলতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে। এবং উহাদের ছাড়া, আরও যেন কিছু নূতন আছে। আমি বার বার তিনবার পাঠ করিলাম। কিন্তু কিছুতেই ভাষার বিশেষত্ব আয়ত্ত করিতে পারিলাম না।···বিশেষত্ব এই যে, সংজ্ঞাপদে এবং বিশেষণে, স্থলে স্থলে সংস্কৃতের মত। ক্রিয়া পদগুলি অনেক স্থলেই খাঁটি বাঙ্গালা।···আমার বিশ্বাস দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী।

আমি বালককালে এই গ্রন্থের ভাষায় যে কেবল মুগ্ধ হইলাম এমন নহে, ইহার ভাবেও আকৃষ্ট হইলাম।

আর উহার গল্প বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।···আমি চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত সুবোধিনী পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলাম। তাহাতে 'ভারতবর্ষীয় কুটীর' নাম দিয়া একটা গল্প খণ্ডশ বাহির হইত। সেই গল্পে ছিল, জগন্নাথ যাইবার পথে—পথের একটু তফাতে, জটাঘটাসজ্ঘটিত—এক মহাবটবৃক্ষ। তাহার তলদেশ নিতান্ত নিভৃত নিরালয়। সেখানে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ লাভ করিতে পায় না। ভীষণ বায়ু উপরে হু হু করিলেও তলদেশে মন্দ মন্দ বিচরণ করে। প্রচুর পত্রসন্নিবেশে সেখানে বৃষ্টিও পড়িতে পারে না। সেইখানে একটা ছোট খাট সামান্য কুটীর; বাস করেন এক পড়িয়া বা চণ্ডাল খৃষ্টান, তাহার সহধর্ম্মিণী ও একটি ছোট কন্যা। এ পুস্তকে পড়িলাম দুরাকাঙ্ক্ষ যখন মান্দ্রাজ, মহীশর, মালব উলট পালট করিয়া সেই বটতলে উপস্থিত হইলেন, তখন পড়িয়ার সহধর্ম্মিণী মরিয়াছে, কন্যা যুবতী হইয়াছে, দুইটা বিভিন্ন সময়ে,* বিভিন্নরূপে প্রকাশিত গল্পের এইরূপ অপূর্ব্ব মিল দেখিয়া, আমার বালক মনে বড়ই আনন্দ

---

* বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয় নাই; প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র দিক্ষিত-সম্পাদিত 'সুবোধিনী' পত্রিকা ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যা হইতেই 'ভারতবর্ষীয় কুটীর' খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমলের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'ও ১৮৫৮ সনের গোড়ার দিকে প্রকাশিত—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং উভয় রচনাই একই লেখনী-প্রসূত হওয়া বিচিত্র নহে।

হইল।...ভারতবর্ষীয় কুটীরে ও হুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণে, কেন যে মিল হইল, এখন তাহা জানি। দুই খানিই ইংরাজী রোমান্স অফ্ হিসটরি হইতে সঙ্কলিত।—'বঙ্গ-ভাষার লেখক', পৃ. ৫২৫-২৮।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে ও তদন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে এক এক খণ্ড 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' আছে।

২। **বিচিত্রবীর্য্য**। পৃ. সংখ্যা ৭৬। জানুয়ারি ১৮৬২।

ইহার আখ্যা-পত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

Bichitrabyrya | A | Heroic Tale | By | Krishnakamal Bhattacharya. | বিচিত্রবীর্য্য | নামক | বীররসাশ্রিত আখ্যান। | শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য | প্রণীত। | কলিকাতা | গৌড়ীয় যন্ত্রে মুদ্রিত | ইং ১৮৬২ সাল |

এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

পুস্তকখানি আমি সতের আঠার বৎসর বয়সে রচনা করি, কিন্তু পাঁচ সাত বৎসর ছাপান হয় হয় নাই ; পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়া আন্দাজ ইংরাজি ১৮৬৪ সালে উহা মুদ্রিত করিয়াছিলাম।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৩।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে (আখ্যাপত্রবিহীন), চৈতন্য লাইব্রেরিতে ও উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে 'বিচিত্রবীর্য্য' আছে।

৩। **নাগানন্দম্**। শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সহকৃতেন শ্রীমাধবচন্দ্র ঘোষেণ মুদ্রাঙ্কিতম্। পৃ. সংখ্যা ৭৪+১৯। সম্বৎ ১৯২১ (১৮৬৪)।

ইহার এক খণ্ড কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে আছে।

৪। **কুমার সম্ভব**। প্রথম সাত সর্গের বাঙ্গালা অনুবাদ। পৃ. সংখ্যা ১০৮। ১৮৭৫।

ইহার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

কুমার সম্ভব। | অর্থাৎ | মহাকবি কালিদাসের সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্যের | প্রথম সাত সর্গের | বাঙ্গালা অনুবাদ। | বিশ্ব বিদ্যালয়ের ফার্স্‌ট্ আর্ট্‌স্ পরীক্ষার্থীদিগের | উপকারার্থে | প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতপূর্ব্ব-সংস্কৃত অধ্যাপক | শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিদ্যাম্বুধি বি, এল কর্ত্তৃক | প্রণীত। | শ্রীহেমনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। | সন ১২৮২ সাল |

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এক খণ্ড 'কুমার সম্ভব' আছে।

৪। *On some unsettled questions of Succession under the Bengal School of Hindu Law.* Calcutta, 1877.

৫। *Tagore Law Lectures*—1884-85. The Law relating to the Joint Hindu Family. 1885.

৭। *The Institutes of Parasara.* Translated into English by Krishnakamal Bhattacharyya. (Bibliotheca Indica), pp. 82, Calcutta, 1887.

উপরের চারিখানি পুস্তক ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে।

৮। *The Bhattikavya* for the use of the Students preparing for the First Examination in Arts···Together with an elaborate Appendix by Umacharan Tarkaratna···pp. 226+48+xviii. 1891.

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে ইহার এক খণ্ড আছে।

৯। **কুমারসম্ভব।** পৃ. ৪৯৬। ১৮৯২।

ইহা ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃতে মুদ্রিত। 'ক্যালকাটা গেজেটে' মুদ্রিত পুস্তকের তালিকায় ইহার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

১০। *Raghuvansam* Canto VI With the commentary of Mallinatha and Translations of Krishnakamal Bhattacharya, Principal Ripon College···1895.

১৯০৩ সনে, মল্লিনাথের টীকা-সমেত রঘুবংশের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গের ইংরেজী-বাংলা অনুবাদ কৃষ্ণকমল প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১১। **পুরাতন প্রসঙ্গ।** প্রথম খণ্ড। ১৩২০।

অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত এই পুস্তকে কৃষ্ণকমলের স্মৃতিকথা নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা পাঠে কৃষ্ণকমলের সমকালিক ব্যক্তিগণ সম্বন্ধেও অনেক কাজের কথা জানা যায়।

এই স্মৃতিকথায় প্রকাশ (পৃ. ২০২), তিনি "একখানি ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের ইতিহাস" রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকমলের রচনা।

'পূর্ণিমা', 'অবোধবন্ধু', প্রভৃতি তৎকালীন মাসিকপত্রাদিতে কৃষ্ণকমল বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তখন প্রবন্ধের শেষে বড়-একটা লেখকের নাম থাকিত না। এই কারণে আজিকার দিনে তাঁহার রচনাগুলি নির্ণয় করা দুরূহ। কয়েকটি রচনা সম্বন্ধে তিনি নিজেই সন্ধান দিয়াছেন; তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> সুহৃদ্বর কবি বিহারীলাল 'পূর্ণিমা' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি তাহার অন্যতম লেখক হইলাম।···ঐ পত্রিকায় আমার দুইটি শ্লোকখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল,—'জুঁইফুলের গাছ'* ও 'তাঁতিয়া টোপি'। কবিতা দুইটি কোনও কোনও ব্যক্তির নিতান্ত মন্দ লাগে নাই। ৺কামাখ্যাচরণ ঘোষ, স্বপ্রণীত 'রত্নসার' নামক বাল্যপাঠ্য সংগ্রহগ্রন্থে ঐ দুইটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন; পরে কিন্তু 'তাঁতিয়া টোপি' কবিতাটি পাছে রাজভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, এই ভয়ে সেটিকে বাদ দিয়াছিলেন। 'পূর্ণিমাতে' আর কি কি লিখিয়াছিলাম, এক্ষণে মনে নাই।···
>
> কিছুদিন পরে বিহারীলাল ও যোগীন্দ্রচন্দ্র [যোগীন্দ্রনাথ ?] ঘোষ (ইনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক) প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু একত্র হইয়া 'অবোধবন্ধু' নামক একখানি মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠিত

* কবিতাটি "জুঁইফুল" নামে ৫ম সংখ্যা 'পূর্ণিমা'তে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্

করেন। এই পত্রিকাখানি বোধ হয়, ইংরাজি ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ইহাতে আমি অনেক বিষয়ে লিখিয়াছিলাম; সমগ্র 'পল-বর্জ্জিনিয়া'* গ্রন্থ ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল; নেপোলিয়নের একটি জীবনবৃত্তান্ত† বহুবিস্তারিতভাবে লোডির যুদ্ধ পর্য্যন্ত বাহির করা হইয়াছিল। অনেক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলাম। মনে পড়ে, একটি প্রবন্ধে য়ুরোপের duel (অর্থাৎ য়ুরোপীয়েরা অপমানিত হইলে পরস্পর প্রাণান্ত পর্য্যন্ত যে মারামারিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারই) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম।‡ ··· ইহার পর 'ভারতী' পত্রিকায় আমি কয়েকটি বড় বড় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম; সকলগুলিই আমার নামসম্বলিত বাহির হইয়াছিল।§

মৃত্যু

আনুমানিক ৯২ বৎসর বয়সে, ১৩ আগষ্ট ১৯৩২ (২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯) তারিখে কৃষ্ণকমল পরলোকগমন করেন।

কৃষ্ণকমল কোঁতের শিষ্য ছিলেন; তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, "আমি Positivist; আমি নাস্তিক।"

রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একখানি পত্রে ('সুপ্রভাত', আশ্বিন ১৩১৭) কৃষ্ণকমল সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম:—

> কৃষ্ণকমল is not যে সে লোক—he is a terrible fellow. He knows how to write and how to fight and how to slight all things divine.

[এই প্রবন্ধ সঙ্কলনকালে আমাকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র দেখিতে হইয়াছে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এই সকল নথিপত্র দেখিবার সুযোগ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসও প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাচীন নথিপত্র হইতে দুইখানি পত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।]

---

* "পৌল ভর্জ্জীনী"—'অবোধ-বন্ধু', পৌষ-চৈত্র ১২৭৫; পৌষ-চৈত্র ১২৭৬।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি' পুস্তকের ৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—"এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতী পৌলবর্জ্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বন! ছাগলচরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা সহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কি মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত! আর সেই মাথায় রঙীন রুমালপরা বর্জ্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জ্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালী বালকের কি প্রেমই জমিয়াছিল!"

† "নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত"—'অবোধ-বন্ধু', বৈশাখ-শ্রাবণ ও আশ্বিন ১২৭৬।

‡ "ডুয়েল"—'অবোধ-বন্ধু', অগ্রহায়ণ ১২৭৬।

§ "Positivism কাহাকে বলে?"—'ভারতী', শ্রাবণ, আশ্বিন ১২৯২।

"বিবাহের জন্য পূর্ব্বরাগ আবশ্যক কি না"—'ভারতী ও বালক', কার্ত্তিক ১২৯৪।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ভূমিকা

পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসেই দেখা যায় যে সূত্রপাত পদ্যে, গদ্যের আবির্ভাব পরে। ইহার অর্থ এই নয় যে, কোনও দেশ বা জাতির মৌখিক ভাষা পদ্য হইতে ক্রমশঃ গদ্যে রূপান্তরিত হয়; সর্ব্বত্র লোকে বরাবরই গদ্যেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে—ভাষা ও সাহিত্য লিখিতে গেলেই স্বভাবত প্রথমে ছন্দ ও মিল বাহন হইয়া বসে। লেখনীমুখে মানুষ গদ্যের সাহায্যে পরে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অভ্যস্ত হয়।

প্রাচীনতম বাংলা চর্য্যাপদকে যদি ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি রচিত বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে এখন পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি—সাহিত্যপদবাচ্য না হইলেও উল্লেখযোগ্য বাংলা গদ্য ইহার ঠিক ৮৫০ বৎসর পরে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বসু কর্ত্তৃক রচিত ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়। অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা গদ্যের যথার্থ সূত্রপাত। বাঙালী যে গীতিপ্রধান কবির জাতি, ইহা তাহার আর একটি প্রমাণ; অন্য কুত্রাপি গদ্যের প্রাদুর্ভাব এত দীর্ঘবিলম্বিত হয় নাই।

সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলা গদ্যের ইতিহাস নিতান্ত হাঁটি-হাঁটি-পা-পা অবস্থার ইতিহাস। বাংলা গদ্যের ভাষা তখন পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বাহন হইয়া উঠিবার মত সামর্থ্য অর্জ্জন করে নাই; যে অবসর এবং মনের উদ্বৃত্ত শক্তি মানুষের শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা দান করে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সামান্যতাকে অতিক্রম করিয়া অসামান্য কল্পনালোকে বিহার করিবার অবকাশ ও উপাদান জোগাইয়া তাহাকে মহত্তর জীবনের পথে লইয়া যায়, বাঙালী তখন মঙ্গলকাব্য, টপ্পা, পাঁচালী ও কবিগান রচনায় সেই অবসর ও শক্তি নিয়োগ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছিল। তাম্রশাসন, চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজে নিতান্ত মামুলি প্রয়োজনের খাতিরে বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হইতেছিল, এই পর্য্যন্ত।

রবীন্দ্রনাথ 'একটা আষাঢ়ে গল্পে' নিরুপদ্রব তাসের দেশে রাজপুত্রের হঠাৎ আগমনে যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। এই রূপক বাংলা গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে খাটে। সমুদ্রপারের সওদাগর ও পাদ্রিদের আগমনে কবিতাপ্রবণ বাংলা দেশে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহার ফলেই সত্যকার বাংলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ এবং বাঙালীর আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহার পরিণতি। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইহাই সংক্ষিপ্ততম ইতিহাস।

ইতিহাসের উপকরণ

বিচ্ছিন্ন এবং সংক্ষিপ্ত হইলেও রাজপুত্রের সোনার কাঠির স্পর্শের পূর্ব্বেকার একটা ইতিহাস আছে ; তাহা সমসাময়িক ও প্রামাণিক নয় ; পূর্ব্বগামীরা কল্পনা ও কিম্বদন্তীর সাহায্যে এই যুগের যতটুকু পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের উপজীব্য। যে যুগে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের খোলস সদ্য পরিত্যাগ করিয়া দুর্ব্বোধ্য সন্ধ্যাভাষায় বৌদ্ধচর্য্যাপদ রচিত হইয়াছিল, সে যুগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোন্ ভাষায় পরস্পর মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন, অনুমান করা ছাড়া তাহা জানিবার আজ উপায় নাই। ইতিহাসের উপকরণ যৎসামান্য। এখন পর্য্যন্ত ইতিহাস বলিয়া যাহা চলিতেছে তাহার অধিকাংশই প্রমাণসাপেক্ষ দলিলের উপর গঠিত নয় ; যে সকল উপকরণের উপর ইহার নির্ভর, সেগুলি প্রায়ই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গোপনে সুরক্ষিত অথবা একেবারেই অস্তিত্ববিহীন ; চেষ্টা করিলেও চোখে দেখিবার উপায় নাই। নকলের নকলে বহুলপ্রচারের ফলে এগুলিই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সত্যকার ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকের এইখানেই বিপদ। এই তমসাচ্ছন্ন যুগের ভাষার ও বাক্যগঠন-রীতির নমুনা হিসাবে যাহা সচরাচর দাখিল করা হইয়া থাকে, আধুনিক ইতিহাস-বিজ্ঞানের যুক্তিপ্রণালী অনুসরণ করিলে সেগুলি গ্রহণযোগ্য না হইবারই কথা। যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কাহিনী রচনা করিয়াছেন, ইতিহাস লেখেন নাই।

আসলে ইতিহাস বস্তুটা আমাদের ধাতস্থ নয়। যাহাদের জাতীয় ইতিহাস পুরাণ-কাহিনীতে পর্য্যবসিত, তাহাদের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস না থাকিবারই কথা। বিশেষ করিয়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দেশের পণ্ডিত-সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে বহু বিলম্বে। বৈদেশিক রাজকর্ম্মচারী ও ধর্ম্মপ্রচারক পাদ্রিগণই গোড়ার দিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা দিতে সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন কর্ত্তৃক পরিচালিত সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' ও মাসিক 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'তেই সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তক ও পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই দুই স্থলেই ইতিহাসের সূত্রপাত। 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র প্রথম বৎসরের তৃতীয় সংখ্যায় (জুলাই, ১৮১৮) ৫৯ হইতে ৬৪ পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষার ইতিহাসের গোড়াপত্তন দেখিতে পাই। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উক্ত পত্রিকার কোয়ার্টারলি সিরিজ প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮২১-এর ১ম সংখ্যায় ও ১৮২৫-এর ১ম সংখ্যায় "On the effect of the Native Press in India" ও "On the progress and present state of the Native Press in India" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলিতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের ও বাংলা হরফ প্রস্তুত করিয়া নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেডের ইংরেজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে সমাচার পত্রিকার সফল প্রকাশ পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মাসিক ও

বিষয়বস্তু রচনাভঙ্গী ও লেখক সম্বন্ধেও ঐতিহাসিক আলোচনা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ', 'সোমপ্রকাশ' ও 'রহস্য-সন্দর্ভ' পত্রিকায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের বহু উপকরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত 'দি ক্যালকাটা রিভিয়ু' ত্রৈমাসিকেও রেভারেণ্ড লং প্রমুখ বহু বৈদেশিক ও দেশীয় পণ্ডিত লিখিত প্রবন্ধে এবং পত্রিকাশেষে সন্নিবিষ্ট দেশীয় ভাষার পুস্তক-সমালোচনার মধ্যে যথেষ্ট উপকরণ আছে। রেভারেণ্ড লং, জে. ওয়েঙ্গার, জে. মার্ডক প্রভৃতিও অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় এবং বাংলা ভাষা সম্বন্ধে প্রকাশিত পুস্তকের কয়েকটি তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করিয়া ইতিহাস-রচনার বহু উপকরণ জোগাইয়া গিয়াছেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ চতুর্থাংশ হইতে 'ক্যালকাটা গেজেটে'র লিটারারি সাপ্লিমেণ্টে সেই বৎসর হইতে প্রকাশিত যাবতীয় বাংলা পুস্তকের তালিকা দেওয়া হইতেছে।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ও ৪ঠা মে তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পত্তন হইতে সুরু করিয়া ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে 'সমাচার দর্পণে'র প্রকাশকাল পর্য্যন্ত এই আঠার বৎসরের ইতিহাস অতিশয় মূল্যবান। ডক্টর সুশীলকুমার দে ও শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অশেষ অধ্যবসায়ের ফলে সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে এই যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে—ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর অনুসরণ করেন। এই উভয়ের, বিশেষ করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবুর যত্নলব্ধ গবেষণার উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমানে যে কেহ এই যুগের ইতিহাস রচনা করিতে পারেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী ও পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা গদ্যসাহিত্যের উপকরণ এখনও পর্য্যাপ্ত নয়।

মুদ্রিত ইতিহাস

সুশীলকুমার দে ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব্বে অনেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, পুস্তক ও পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কুমারটুলি ১৯ নং জয়মিত্র ঘাট লেনের মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। অনেকে ভুল করিয়া 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-রচয়িতা রামগতি ন্যায়রত্নকে প্রথম ইতিহাস রচনার সম্মান দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পুস্তকের প্রকাশকাল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। রমেশচন্দ্র দত্তের *The Literature of Bengal* পুস্তক ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। 'জাতীয় সভা'য় প্রদত্ত রাজনারায়ণ বসুর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, ঢাকার কলেজভবনে প্রদত্ত গঙ্গাচরণ সরকারের 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে বক্তৃতা' ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'সাবিত্রী লাইব্রেরি'র বাৎসরিক উপলক্ষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক পঠিত "বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য" ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। কৈলাসচন্দ্র ঘোষের 'বাঙ্গালা সাহিত্য' পুস্তক ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কুমিল্লা হইতে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র

সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তক প্রকাশ করেন। পদ্মনাভ ঘোষালের কোনও ইতিহাস আমরা দেখি নাই। কৈলাসচন্দ্র সিংহ ধারাবাহিকভাবে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (দশম কল্প, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ, ১৮৮১-৮২ খ্রীঃ) এবং বঙ্কিমচন্দ্র 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার ১০৪ সংখ্যায় (১৮৭১ খ্রীঃ) বেনামীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী* প্রকাশ করেন, তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'দি লাইফ এণ্ড টাইমস অব কেরী মার্শম্যান এণ্ড ওয়ার্ড' পুস্তকের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মার্শম্যানের বাংলার ইতিহাস-অবলম্বনে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রকাশ করেন (১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) তাহাতেও কিছু উপকরণ আছে।†

বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করিয়া বিগত দশ বৎসরের মধ্যে, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অনেকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সকলগুলির পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। ইহার মধ্যে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক', ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত', ১৯১৩ ও ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ১ম ও ২য় পর্য্যায়, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কেদারনাথ মজুমদারের 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' ১ম খণ্ড, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে প্রণীত *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, 1800—1825*, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *The Origin and Development of the Bengali Language* এবং ১৯৩২ হইতে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' তিন খণ্ড, 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ১-৯—এই কয়খানি পুস্তকই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা গদ্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও পরস্পরবিরোধী

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যে সকল পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ সম্পর্কে এমন পরস্পরবিরোধী সংবাদ পাওয়া যায় যে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস গড়িয়া তোলা কঠিন। অধ্যবসায় এবং

* "Bengali Literature", pp. 294-316.

† কালিদাস মৈত্র প্রণীত 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' (১৮৫৫ খ্রীঃ), হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কবিচরিত' (১৮৬৯ খ্রীঃ) এবং 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' প্রভৃতি পুস্তকে ইতিহাসের উপাদান

উপকরণের অভাবে ইঁহারা প্রত্যেকেই ভ্রান্ত এবং কল্পিত বিবরণী দিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীতে এই যুগের একটা সত্য ইতিহাস রচনার প্রয়াস আরম্ভ হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের *History of Bengali Language and Literature* পুস্তকের ৮২৮ হইতে ৮৪৪ পৃষ্ঠায় বাংলার প্রাচীনতম গদ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা মূলত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-সঙ্কলিত অষ্টাদশ ভাগ 'বিশ্বকোষে'র (১৯০৭ খ্রীঃ) "বাঙ্গালা সাহিত্য" বিষয়ক আলোচনা হইতে গৃহীত। বস্তুত পরবর্তী কালে এই 'বিশ্বকোষ'কেই কেন্দ্র করিয়া বাংলা গদ্যের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ২য় বৎসরে (১৮৯৫ খ্রীঃ) রজনীকান্ত গুপ্ত "বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য" (পৃ. ৩০-৫০) নাম দিয়া এক বিস্তৃত নিবন্ধ প্রকাশ করিয়া গদ্যসাহিত্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনায় সকলকে উৎসাহিত করেন। পরে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century* পুস্তকের Appendix I (পৃ. ৪৫৫-৮৬)-এ প্রথম যুগের বাংলা গদ্যের আর একটু সুষ্ঠু এবং ধারাবাহিক ইতিহাস দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে'র দ্বিতীয় খণ্ডে এবং শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র-সম্পাদিত *Types of Early Bengali Prose* (১৯২২ খ্রীঃ) পুস্তকে প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের অনেক নমুনাও উদ্ধৃত হইয়াছে। কেদারনাথ মজুমদার-প্রমুখ কয়েক জন কেবলমাত্র বাংলা গদ্যসাহিত্যের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' (১৯৩৪ খ্রীঃ) ও শ্রীযুক্ত জহরলাল বসুর 'বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৩৬ খ্রীঃ) অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা। কিন্তু উপকরণের অভাবে এ ইতিহাসগুলি সম্পূর্ণ নয়। বহু পরস্পরবিরোধী কথাও আছে।

এই বহুল পরিমাণে কল্পিত ও পরস্পরবিরোধী উপকরণের মধ্য হইতে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস গড়িয়া তোলা সহজ নয়। অধুনা-অজ্ঞাত উপাদানে ও পদ্ধতিতে নির্মিত কোনও প্রাচীন মন্দির ভাঙিয়া গেলে আমরা যেমন বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলিই দেখাইতে পারি, তদ্দ্বারা কিছু গড়িয়া তুলিতে পারি না, আজিকার দিনে বাংলা গদ্যের আদিম অবস্থা বুঝাইতে হইলে আমাদিগকে সেইরূপ বিচ্ছিন্ন উপাদানই দেখাইতে হইবে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গোড়ার কথা

প্রথমেই শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *Origin and Development* পুস্তকের ভূমিকায় "Oldest Remains of Bengali" শীর্ষক আলোচনা হইতে (পৃ. ১০৮-১৩৫) গোড়ার কয়েকটি কথা সঙ্কলন করিতেছি।

১। সংস্কৃত→প্রাকৃত→অপভ্রংশ হইতে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের কোনও সময়ে পুরাতন বাংলার জন্ম।

৩। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রাচীনতম বাংলার নমুনা—

(ক) কয়েকটি শিলা ও ধাতু লেখে এবং প্রাচীন পুস্তকে ব্যবহৃত স্থানের নাম। পঞ্চম শতাব্দী হইতেই এগুলির সূত্রপাত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পণ্ডিতেরা এই নামগুলিকে সংস্কৃতরূপ দিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

(খ) বন্দ্যঘাটীয় বাঙালী পণ্ডিত সর্ব্বানন্দ-কৃত (১১৫৯ খ্রীঃ) 'অমরকোষে'র টীকায় ('টীকাসর্ব্বস্ব') ত্রিশতাধিক বাংলা শব্দ। এই গ্রন্থ বাংলা দেশে লুপ্ত হইয়া মালাবার অঞ্চলে রক্ষিত ছিল। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় রায়-বাহাদুর যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি ("সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্ব্বের বাংলা শব্দ") ও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় ("দ্বাদশ শতকের বাংলা শব্দ") এই শব্দগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

(গ) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত ৪৭টি চর্য্যাপদ। এগুলি শাস্ত্রীমহাশয়-সম্পাদিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত—'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা', (১৯১৬ খ্রীঃ) পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

৪। ইহার পরেই বাংলা ভাষার নমুনা হিসাবে চণ্ডীদাস-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' ও রমাই (বা রামাই) পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' উল্লিখিত হইয়া থাকে। এগুলি খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে রচিত। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'প্রাকৃতপিঙ্গল' নামক অপভ্রংশ ভাষায় বিরচিত গ্রন্থের কয়েকটি গানকে বাংলা বলিয়াছেন; এগুলি ৯০০ হইতে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। শিখেদের 'আদিগ্রন্থে' দুইটি পদ জয়দেবের রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; কাহারও কাহারও মতে তাহাও প্রাচীন বাংলায় রচিত। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'কেও অনেকে প্রাচীন বাংলা হইতে পরে সংস্কৃতে রূপান্তরিত বলিয়া মনে করেন। জয়দেব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের কবি।

৫। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত।

৬। ১৫০০ খ্রীঃ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহার পূর্ণ বিকাশ।

বাংলা গদ্যের অন্ধকার-যুগ

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই নয় শত বৎসরের সাহিত্যের ইতিহাসে গদ্যের স্থান নাই। খ্রীষ্টীয় ১৭৪৩ অব্দে পোর্ত্তুগালের লিসবন নগরে প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' মুদ্রিত হয়। এই তারিখকে বাংলা গদ্যের প্রামাণিক যুগের সূত্রপাত ধরিয়া বাংলা ভাষার জন্ম হইতে (৯০০ খ্রীঃ) উক্ত ১৭৪৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ৮৪৩ বৎসর বাংলা গদ্যের অন্ধকার-যুগ।

কিছু শিলালেখ ও তাম্রশাসন, কিছু দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র, কয়েকটি গ্রন্থের

প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন,* তাঁহাদের সকলেরই মূল অবলম্বন 'বিশ্বকোষে'র "প্রাচীন গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস" প্রবন্ধ। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র নানা প্রবন্ধেও বহু নূতন উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল উপকরণের প্রামাণিকতা নির্ণয়ের উপায় নাই। এইগুলিকে বিশ্বাস করিলে এই যুগের বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিচ্ছিন্ন রূপ ধারাবাহিকভাবে এইরূপ দাঁড়ায়:

চণ্ডীদাসের 'চৈতন্যরূপপ্রাপ্তি' ও রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণান্তর্গত 'বারমাসি' প্রভৃতি গদ্যাংশ বাংলা গদ্যের আদিমতম নমুনা বলিয়া উল্লিখিত হয়। বর্ত্তমানে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, চণ্ডীদাস ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পাদের লোক; শূন্যপুরাণ (যাহা আমরা মুদ্রিত আকারে পাইতেছি) সপ্তদশ শতকের রচনা। তাহা হইলে প্রথম বাংলা গদ্যের নমুনা তারকেশ্বর মোহন্তের প্রসিদ্ধ মামলার আপীলের পেপার-বুক হইতে জহরলাল বসু কর্তৃক উদ্ধৃত (পৃ. ২৫) হইয়াছে। ইহা রাজা ভারামল্ল রায় প্রদত্ত একটি ছাড়পত্র, ৭৮৫ সালের ১০ই চৈত্র লিখিত; ইংরেজী ১৩৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। এই পত্রের একটি ফটো-প্রতিলিপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত হওয়া উচিত। পত্রটি এইরূপ—

৶শ্রীশ্রীরাম

স্বস্তি সকল মঙ্গলময় শ্রীশ্রী৶তারকেশ্বর ঠাকুর চরণযুগলেষু—

দেবত্তর জমি পত্রহ মিদং কার্য্যনঞ্চাগে পরগণে বালিগড়ি ও সেনাবাগ দীঃ গ্রাম জোতশমস, ভঞ্জপুর, নাগাদী শাহাপুর—এই সকল গ্রাম সেবার কারণ—জমি শালীগুনা হর্দ্দ মহদুদ ঘোড় দৌড় জত জোত করিতে পার তাহা জোত করিবে—সেবাত শ্রীযুক্ত মায়াগিরি ধূম্রপান মোহন্তীতে নিযুক্ত থাকিয়া [রা ?] জুতিয়া যোতায়া শ্রীশ্রী৶সেবা করহ এ সকল জমির রাজস্ব সহিত দায় নাস্তি ইতি সন ৭৮৫ সাল ১০ই চৈত্র।

শ্রীরাজা ভারামল্ল রায় [নাগরীতে]

রায়নার কৈলাসচন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্য' (১২৯২ বঙ্গাব্দ) পুস্তকে আদি-যুগের বাংলা গদ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

গোবিন্দ দাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস রচিত বহুল গদ্য রচনা পাঠ করিয়াছিলেন; সেই জন্যই তিনি বিদ্যাপতি প্রভৃতির বন্দনাস্থলে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন,...

কিয়ে কিয়ে করে চিত চমকয়ে ঐছন,
রসময় চম্পূ বিথারি ॥ ইত্যাদি।

চম্পূ শব্দের অর্থ গদ্য পদ্যময় কাব্য;...আরও দেখিতে পাই, বৈষ্ণব কবি বৈষ্ণবদাস [পদকল্পতরু-কার] কবিবন্দনাস্থলে...লিখিয়াছেন...

---

* বিশ্বকোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৮ ভাগ, পৃ. ১৮৮-১৯৬; দীনেশ সেন—Bengali Language and Literature, ১৯১১, পৃ. ৮২৮-৮৪৪; ঐ—'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫৬৫-৫৭০; ঐ—'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়', ২য় ভাগ, পৃ. ১৬৩০-৪৩, ১৬৫৫-৫৬, ১৬৭২-১৬৭৯; শিবরতন মিত্র—Types of Early Bengali Prose, ১৯২২; সুশীল দে—Bengali Literature in the Nineteenth Century, 1919

জয় জয় চণ্ডীদাস রস শেখর
অখিল ভুবনে অনুপম ।
যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
গদ্য পদ্যময় গীত । [পৃ. ৭২-৭৩]

সুতরাং চণ্ডীদাস যে গদ্য লিখিয়াছিলেন এই বিশ্বাস বহুদিন হইতেই চলিতেছে। 'বিশ্বকোষ'-কার চণ্ডীদাসকৃত 'চৈত্যরূপপ্রাপ্তি'র পরিচয় দিয়াছেন—"ইহার যে সকল পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা বাং ১০৮১ সালের লিখিত।" ভাষার নমুনা এইরূপ—

চৈতরূপের রা চ অধরূপ লাড়ি। রা অক্ষরে রাগ লাড়ি। চ অক্ষরে চেতন লাড়ি। র এতে চ মিশিল, রা এতে বসিল। ইবে এক অঙ্গা লাড়ি।...জিহু রজকিনী তিহু রাগমই। রাগ আত্মা শ্রীমতীর অঙ্গ এক হন। জিহু চেতনরূপ তিহু চণ্ডীদাস। কার দেহ। শ্রীমতীর অন্তরঙ্গা দেহ। রজকিনী কার দেহ। চণ্ডীদাসের অন্তরঙ্গা দেহ।

চৈতন্যদেবের পার্শ্বচর রূপগোস্বামী-কৃত 'কারিকা' গদ্যে লিখিত। কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভাষা এইরূপ—

প্রথম শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ রসগুণ স্পর্শগুণ এই পাঁচ গুণ। এই পঞ্চ গুণ শ্রীমতি রাধিকাতেও বসে।...পূর্ব্বরাগের মূল দুই হটাৎ শ্রবণ অকস্মাৎ শ্রবণ।

বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নমুনার অন্যতম, রূপগোস্বামী-কৃত 'কারিকা'টিও কোনও সাধারণ প্রতিষ্ঠানে সযত্নে রক্ষিত হওয়া উচিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে শূন্যপুরাণের যে সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, পুস্তকটি মূলত পদ্য হইলেও মধ্যে মধ্যে ভাঙা গদ্য-রচনা আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে পুথি হইতে ইহা সম্পাদনা করিয়াছেন তাহা সপ্তদশ শতকের লেখা বলিয়া অনুমান হয়। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মনে করেন—

......the so-called prose passages, if not the verse, reveal a much earlier and more antique form of diction. If the language of the recently published *Sri Krsna Kirtana* belongs to the early part of the 14th century, we can safely assume that the prose of *Sunya Puran* must have had its origin in a somewhat earlier age...... —*Bengali Literature in the Nineteenth Century*, p. 457.

এই উক্তি সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে শূন্যপুরাণের ভাঙা গদ্যকেই প্রথম বাংলা গদ্যের গৌরব দিতে হয়। ভাষার নমুনা এইরূপ—

কোন মাসে কোন রাসি। চৈত্র মাসে মীন রাসি। হে কালিন্দিজল বার ভাই বার আদিত্ত। হস্ত পাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি। সেবক হব সুখি আমনি ধামাৎ কল্লি। গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দানপতি। সাংসুর ভোক্তা আমনি।

এইগুলি ব্যতীত শ্রীনীলাচলদাস-কৃত 'দ্বাদশপাট নির্ণয়', কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত 'রাগময়ীকণা' ও 'আলম্বনচন্দ্রিকা' নরোত্তম দাসের 'রাগমালা' ও 'শিক্ষাপটল' এবং সহজিয়া সম্প্রদায়ের নিম্ননামাঙ্কিত পুথিগুলি 'বিশ্বকোষ' কর্ত্তৃক বাংলা গদ্যের এই অন্ধকার-

আশ্রয় নির্ণয়, আত্মজিজ্ঞাসা, দাস্যাদ্যষ্টভাবার্থ, উপাসনাতত্ত্ব, সিদ্ধতত্ত্ব, ত্রিগুণাত্মিকা, আত্মসাধন, ভোগপটল, দেহভেদতত্ত্বনিরূপণ, চন্দ্রচিন্তামণি, আত্মজিজ্ঞাসা-সারাৎসার, তিন মানুষের বিবরণ, সাধনাশ্রয়, সিদ্ধান্তটীকা, কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ, উপাসনানির্ণয়, স্বরূপবর্ণন, দেহকড়চ, চম্পককলিকা, আত্মতত্ত্ব, তত্ত্বকথা, পঞ্চাঙ্গনিগূঢ় তত্ত্ব, হরিনামের অর্থ, গোষ্ঠীকথা, সিদ্ধিপটল, জিজ্ঞাসাপ্রণালী, জবামঞ্জরী, ব্রজকারিকা, রসভজনতত্ত্ব ইত্যাদি।

এগুলির ভাষা প্রায় সর্ব্বত্রই এক, যে কোনও পুথির নমুনা দিলেই সাধারণভাবে ইহাদের ভাষা সম্বন্ধে ধারণা জন্মিবে। 'ব্রজকারিকা' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

এই পঞ্চগুণ হইতে প্রেমবৃক্ষ হৈল। সেই সে রাধিকার রূপ। সেই বৃক্ষে দুই শাখা নিকসিল। সে কে কে ? এক সখীভাব আর শাখাবিভাব। ক্রমে দক্ষিণ বাম জানিবেন। দর্শন আনন্দ মহাভাব দক্ষিণে। বিচ্ছেদ স্পর্শন বামশাখাতে নির্কসিল। এই দুই শাখাবৃক্ষ উজ্জ্বল হইল। তাহার ফল দক্ষিণ শাখার ফল তার নাম মিলন।

এই অন্ধকার-যুগের শেষের দিকে আরও কয়েকটি গ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাষা তখন রূপ লইয়াছে; নিতান্ত খাপছাড়া বা ভাঙা ভাঙা সন্ধ্যাভাষা নয়। গ্রন্থগুলির নাম ও সংক্ষেপ বিবরণ এইরূপ।

১। বৃন্দাবনপরিক্রমা। যে পুথি হইতে ইহা উদ্ধৃত হইয়া থাকে তাহা ১২১৮ সালে লিখিত। কেহ কেহ অনুমান করেন এই পুথি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল।

২। বৃন্দাবনলীলা। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। ভাষা প্রাঞ্জল।

৩। বেদাদিতত্ত্ব নির্ণয়।

৪। ভাষাপরিচ্ছেদ। যে পুথি হইতে ইহা উদ্ধৃত তাহার তারিখ বঙ্গাব্দ ১১৮১। সম্ভবত উহা ঐ নামীয় সংস্কৃত মূলের বঙ্গানুবাদ।

৫। জ্ঞানাদি সাধনা। পুথির তারিখ ১১৫৮ বঙ্গাব্দ। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৩৪১ পৃষ্ঠায় 'সাধনা কথা' নামে উল্লিখিত।

৬। ব্যবস্থাতত্ত্ব।

৭। স্মৃতিকল্পদ্রুম।

৮। বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রের অনুবাদ।

৯। দেব ডামর তন্ত্র।

১০। পাচনসংগ্রহ।

১১। কবিরাজী পাতড়া।

১২। কামিনীকুমার। দীনেশবাবুর বিবেচনায় ইহা ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত।

১৩। কুলজীপটী ব্যাখ্যা।

১৪। জয়নাথ ঘোষের রাজোপাখ্যান।

দৃষ্টান্ত হিসাবে 'ভাষাপরিচ্ছেদ' অংশত উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই অন্ধকার-যুগের কথা শেষ করিতেছি।

গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমারদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয় তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন পদার্থ কতো। তাহাতে গোতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্ত প্রকার। দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্ত বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার।

এই সকল পুথি ও পুস্তকের অস্তিত্ব মানিয়া লইলে বাংলা গদ্যের বয়স যথেষ্ট বাড়িয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রদর্শিত নমুনাগুলি যে সকল পুথি হইতে সংগৃহীত তাহাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। অনেকগুলি নমুনা হইতে সন্দেহ হয়, সেগুলি গদ্য নয়, গুহ্যসাধন-সম্পর্কিত (সন্ধ্যাভাষায়) কতকগুলি ইঙ্গিত মাত্র। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দের মতে, এগুলি বাংলা গদ্যের সূত্রপাতের যুগের নমুনা। আমাদের মনে হয়, তৎকাল-প্রচলিত কথ্য গদ্য ভাষার সহিত ইহাদের সম্পর্ক নাই। এগুলি সন্ধানী লোকের পরস্পর জানিত ইঙ্গিত—পরবর্ত্তী কালের বহু সহজিয়া পুথিতে এই ভাষারই ক্রমপরিণতি লক্ষিত হয়। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে পাশাপাশি বসানো এই সকল দুর্ব্বোধ্য শব্দ লইয়া আলোচনা সমীচীন হইবে না।

অন্ধকার-যুগের অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক পরিচয়

তারিখ-সম্বলিত চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজগুলিকে প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া লইলে ৭৮৫ বঙ্গাব্দের পূর্ব্বোদ্ধৃত ভারামল্ল রায়ের ছাড়পত্র হইতে সুরু করিয়া হালহেডের ব্যাকরণে মুদ্রিত (১৭৭৮ খ্রীঃ) ১১৮৫ বঙ্গাব্দের ১১ শ্রাবণ তারিখে লিখিত জগতধির রায়ের পত্র পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক যুগ। ভারামল্লের ছাড়পত্রের পরই প্রাচীনতম প্রামাণিক পত্রটি ১৪৭৭ শক অর্থাৎ ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহারেব মহারাজা নরনারায়ণ কর্ত্তৃক আহোম বা আসামরাজ চুকাম্‌ফা স্বর্গদেবকে (ওরফে খোঁড়া রাজা) লিখিত হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখের 'আসামবন্তি' পত্রিকায়* ইহা সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয়; পরে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের তৃতীয় (গৌরীপুর) অধিবেশনের সভাপতির (পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ) অভিভাষণে (কার্য্যবিবরণী, ৩৭ পৃ.) এই পত্র পুনর্মুদ্রিত হয়। পত্রটি এইরূপ—

স্বস্তি সকলদিগ দন্তিকর্ণতালাস্ফালসমীরণপ্রচলিতহিমকরহারহাসসকাশকৈলাসপাণ্ডবযশোরাশি-বিরাজিতত্রিপিষ্টপত্রিদশতরঙ্গিণীসলিলনির্ম্মলপবিত্রকলেবরধীবণপ্রচণ্ডধীরধৈর্য্যমর্য্যাদাপারাবারসকলাদিক্‌কামিনী-গীয়মানগুণসন্তানশ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণমহারাজপ্রচণ্ডপ্রতাপেষু।

লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে বার্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি।

তোমারো এগোট কর্ত্তব্য উচিত হয় - না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমা সর্দ্দার উত্তগু চাউনিয়া শ্যামরাই ইমরাক পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ি ২ ধনু ১ চেঙ্গর মৎস ১ জোর বালিচ ১ জকাই ১ সারি ৫ খান এই সকল দিয়া গৈছে। আর সমাচার বুজি কহি পাঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ সোমচেং ১ ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণচামর ২০ শুক্লচামর ১০। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়।

১৫৫৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে গৌহাটীর তদানীন্তন ফৌজদার নবাব আলেয়ার খাঁকে কোনও আসামী নৃপতি-লিখিত একখানি পত্রও ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখের 'আসামবন্তি'তে "ঐতিহাসিক চিঠি" শীর্ষক প্রবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে। এই পত্রের ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য।

স্বস্তি বিবিধ গুণগাম্ভীর্য্য পরমোদার শ্রীযুক্ত নবাব আলেয়ার খাঁ সদাশয়েষু।

সস্নেহ লিখনং কার্য্যঞ্চ। আগে এথা কুশল। তোমার কুশল সততে চাহি। পরং সমাচার পত্র এহি। এখন তোমার উকিল পত্র সহিত আসিয়া আমার স্থান পহুঁছিল। আমিও প্রীতিপ্রণয়পূর্ব্বক জ্ঞাত হইলাম। আর তুমি যে লিখিয়াছ তোমার উত্তম পত্র আসিতে আমার কিঞ্চিৎ মনস্বিতা না রহে এ যে তোমার ভালাই দৌলত। অতএব আমিও পরম আহ্লাদরূপে জানিতে আছো তোমার আমার অদ্বয়ভাব প্রীতি ঘটিলে মনমাফিক সন্তোষ কি কারণ না হইবেক।...

অষ্টাদশ শতকে বাংলা-গদ্যের ভাষা একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত পুরাতন পত্র ও দলিলাদি যাহা কিছু বাংলা-গদ্যের নমুনা হিসাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে উপরোক্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত বাদে তাহার অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা। 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে'র ১৬৭৩ পৃষ্ঠায় ১৬৮৯ ও ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের লিখিত দুইখানি পত্র মুদ্রিত আছে, কিন্তু এই পত্রগুলির মূল ও তাহাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোনও পরিচয় দীনেশবাবু দেন নাই। সপ্তদশ শতকের বাংলা-গদ্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক নমুনা ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাংলা কাগজপত্র হইতে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ফটোগ্রাফ করিয়া আনিয়া ১৩২৯ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র তৃতীয় সংখ্যায় (পৃষ্ঠা ১১২) প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা একখানি প্রাচীন চুক্তিপত্র। ১১০৩ সাল অর্থাৎ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচিত হইয়াছিল। চুক্তিপত্রটি এইরূপ—

শ্রীকৃষ্ণ | সাখি শ্রীধর্ম্ম

শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল মহাসহেযু

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস আগে আমারা দুই লুকে করার করিলাম জে কিছু বারে সুনারগায় ও গর থ রিকরি সকরাত ২ দু ই রূপাইয়া করিআ আরত দলালি লইব আর কুন দায়া নাই খুরাক সমেত এই নিঅমে করা পত্র দিলাম স ১১০৩ তে ১৪ আগ্রান

সুনীতিবাবু ব্রিটিশ মিউজিয়ম হইতে ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি পত্র এবং অষ্টাদশ শতকে রচিত '৺মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র' নামক গদ্যগল্পেরও নকল আনিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই গল্পটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

৺মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র।—

সাং অবন্তিকে—

মোং ভোজপূর শ্রীযুত ভোজরাজা তাহার কন্যা নাম শ্রীমতি মৌনাবতি সোডষ বরিস্যা বড় সুন্দরি মুখ চন্দ্রতুল্য কেষ মেঘের রঙ্গ চক্ষু আকর্ন্ন পর্য্যন্ত যুগ্য ভ্রূর ধনুকের নেয়ায় ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ন্ন হস্ত পদ্মের মৃণাল স্তন দাড়িম্ব ফল রূপলাবন্য বিদ্যুৎছটা তার তুলনা আর নাঞী এমন সুন্দরি সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞী। কন্যা পন করিয়াছে রাত্রের মধ্যে জে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব। একথা ভোজরাজা স্তনে বড় বড় রাজার পুত্রকে নিমন্ত্রন করিয়া আনিলেক এক২ রাজার পুত্রকে এক২ দীন রাত্রের মধ্যে এক২ জোন কে সয়ন ঘরে লইয়া সয়ন করায় সে ঘরে আর কেহো থাকে না কেবল কন্যা ঃ আর রাজপুত্র এক খাটে কন্যা সোয়ে ঃ এক খাটে রাজপুত্র সোয়ে। জে রাজপুত্র জেমন জ্ঞানবান হয়। সে ঃ সেইরূপ কথা সারারাত্র কহে। কন্যাকে কথা কহাইতে পারে না ঃ সকালে উঠে ঃ রাজপুত্র ঃ ঘরে জায়। এইরূপ প্রকারে কত ২ রাজপুত্র আইল কেহো কথা কহাইতে পারিলেক না ঃ কতমৎ প্রকার করিলেক তবু ঃ কন্যাকে ঃ কথা কহাইতে পারিলেক না।...

১১৭৮ সালের (ইংরেজী ১৭৭১) ২৯শে পৌষ তারিখে মহারাজ নন্দকুমার লিখিত একটি পত্র ইতিহাসের দিক্ দিয়া বাংলা গদ্যসাহিত্যের কাহিনীতে স্থান পাইবার যোগ্য। মহারাজ নন্দকুমার ইহা পুত্র গুরুদাসকে লিখিয়াছিলেন।

প্রাণপ্রতিমেষু পরম শুভাশীর্ব্বাদশিবঞ্চ বিশেষ ঃ—

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করনক অত্র কুশল পরন্ত ঃ ২৫ তারিখের পত্র ২৭ রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুত ফেতরত আলি খাঁ এর এখানে আইশনের সম্বাদ জে লিখিয়াছিলে এতক্ষণ তক পঁহুছেন নাই পঁহুছিলেই জানা জাইবেক শ্রীযুত রায় জগৎচন্দ্র বিবরোজের পর বাটী হইতে আসিয়াছেন যেমত২ কুচেষ্টা পাইতেছেন তাহা জানাই গেল তিনি যথা২ জাউন ফলত কার্য্যের দ্বারাতেই বুঝিবেন পষ্ট হইয়া আপনারি মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের ভাষার নমুনা-স্বরূপ আরও অনেকে অনেক চিঠিপত্র ও দলিল প্রকাশ করিয়াছেন। সবগুলি প্রায়ই একই রীতিতে লিখিত সুতরাং প্রত্যেকটির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাংলা হরফে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড প্রণীত ও ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলিতে মুদ্রিত *A Grammar of the Bengal Language* পুস্তকে এই জাতীয় একটি পত্র আছে। বাংলা হরফে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্যের নমুনা হিসাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা প্রয়োজন।

৭ শ্রীরাম—

গরিবনেওাজ শেলামত—

আমার জমিদারি পরগনে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম দরিয়াশীকিশ্‌তী হইয়াছে শেই দুই গ্রাম পয়শ্‌তী হইয়াছে চাকলে একবরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরি আজ রায় জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মালগুজারির শরবরাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিন ও এক চোপদার সর-জমিনেতে পহুচিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হকদারের হক দেলায়া দেন ইতি শন ১১৮৫ শাল তারিখ ১১ শ্রাবন

ফিদবি

এই নমুনাটুকু হইতেই প্রাক্-আধুনিক যুগের বাংলা গদ্যের রীতি ও প্রকৃতি সুস্পষ্ট ধরা পড়িবে। মূল কাঠামোটি বাংলা হইলেও আরবি ও পারসি শব্দের প্রয়োগবাহুল্যে ইহা প্রায় দুর্ব্বোধ্য ; অথচ আরবি ও পারসি শব্দে বাংলা প্রত্যয় নিরঙ্কুশভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বাংলা গদ্যের ইতিহাসে পোর্ত্তুগীস প্রভাব

চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত 'চৈতন্যরূপপ্রাপ্তি'র 'রা অক্ষরে রাগ লাড়ি' অথবা 'শূন্যপুরাণে'র 'হস্ত পাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি' হইতে আরম্ভ করিয়া উপরিউক্ত ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের 'তোরফেনকে তলব দিয়া' পর্য্যন্ত ভাষার একটা প্রগতি ও ধারাবাহিকতা প্রায় অব্যাহত আছে। বাংলা-গদ্যের উহাই মূল ধারা। এই ধারাই পরবর্ত্তী কালে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, ভবানীচরণ ও রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণমোহন ও রাজেন্দ্রলাল, ভূদেব ও বঙ্কিম কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান বাংলা গদ্য-সাহিত্যরূপ সুবিশাল নদীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মধ্যে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পের মত একটা আকস্মিক বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে ; অন্ততঃ আজিকার দিনে ধারাবাহিকতার দিক্ দিয়া বিচার করিতে বসিয়া ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাকে আকস্মিক বলিয়াই মনে হইতেছে। আকস্মিক না হউক মূল ধারার সহিত ইহার বিশেষ যোগ নাই।

সৌভাগ্যের বিষয়, এই ব্যাপারের মুদ্রিত দলিল আছে ; 'অন্ধকার যুগ' এবং 'চিঠিপত্র ও দলিলের যুগে'র মত আমাদিগকে সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয় না। এবং এই কারণেই আমরা ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দেই প্রাথমিক যুগের সূত্রপাত বলিয়াছি।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাসকে স্বতন্ত্র করিবার অথবা সাধারণ ধারার মধ্যে একটা বিপর্য্যয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার কারণ এই যে, এই ইতিহাস একটি বিশেষ প্রাদেশিক কথিত ভাষা সম্পর্কিত এবং এই আলোড়নের তরঙ্গ সীমাবদ্ধ কাল ও দেশে পরিসমাপ্ত। এই আলোড়নের ইতিহাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে আরম্ভ এবং ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত ; ইহা সম্পূর্ণ পোর্ত্তুগীস প্রভাবের ফল। ষোড়শ শতাব্দী হইতেই এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইহার ফলে বাংলা ভাষায় যে কিছু কাজ হইয়াছিল সমসাময়িক চিঠিপত্র ও বিবরণী হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা—

১। Father Marcos Antonio Santucci, S. J., the Superior of the Misson among these Bengali converts between 1679 and 1684, wrote from Nolua Cot to the Provincial of Goa on January 3, 1683 : "The Fathers [Ignatius Gomes, Manoel Sarayva and himself] have not failed in their duty : they have learned the language well, have composed vocabularies, a grammar, a confessionary and prayers ; they have translated the Christian Doctrine [*Doutrina Christa* or Catechism], etc., nothing of which existed until now." [*O Chronista de Tissuary*, Goa, vol. II., 1867, p. 12.)—Father Hosten in *Bengal : Past & Present*, Vol IX, Part I, p. 46.

২। "১৫৯৯ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে যেসুইট্-সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মপ্রচারক Francisco Fernandes ফ্রান্সিস্কো ফের্‌নান্দেস্ পূর্ব্ব-বঙ্গে সোনারগাঁর সন্নিকটস্থ শ্রীপুর হইতে গোয়ায় উক্ত সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ Nicolas Pimenta নিকোলাস পিমেন্তা-র নিকট একখানি পত্র লেখেন, তাহাতে এই কথার উল্লেখ আছে যে, ফের্‌নান্দেস্ খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মূল কথাগুলির ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে ছোট একখানি বই এবং একখানি প্রশ্নোত্তরমালা লেখেন, এবং ফের্‌নান্দেসের সহকর্ম্মী পাদ্রি Dominic de Souza দোমিনিক্-দে-সুজা বাঙ্গালাভাষা শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তিনি এই দুইখানি বই বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন।"—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', প্রবেশক, পৃ. ।/০

৩। "Father Barbier, as early as 1723, mentions that he prepared a little catechism in Bengali."—শ্রীসুশীলকুমার দে, *Bengali Literature*, p. 68.

৪। ১৫৯৯ সালে দোমিনিক সোসা নামক আর এক জন যীশুট যাজক বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রকারের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ("Sosa endeavoured to learn the Bengalan Language and translated into it a tracte of Christian Religion in which were confuted the Gentile and Mahumetan errours : to which was added a short Catechisme by way of Dialogue, which the children frequenting the schoole learned by heart." —*Purchas His Pilgrimes*, Vol. X. p. 205)···১৫৯৯ হইতে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একাধিক খ্রীষ্টান প্রচারক এই জাতীয় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ', প্রস্তাবনা, পৃঃ ২।/০-২।৵০

কিন্তু এই সকল রচনার অধিকাংশই আজও পর্য্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

তিনটি মাত্র গ্রন্থ আমাদের কাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। তন্মধ্যে আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য পুস্তক দুইখানি—

(ক) Crepar Xaxtrer Orth, Bhed | Xixio Gurur | Bichar | Fr Manoel | da Assumpcam | Liqhiassen, O buzhaiassen Bengallate | Baoal dexe ; Xonhazar Xat Xoho pointix bossor | Christor Zormo bade | Bhetton | corilo boro Tthacurque | D. Fr Miguel | de Tavora | Evorar Xohorer Arcebispo | + Lisboate | Francisco | da Sylvar Xaze | Patxaer quitaber Xap | corinia | Xpor Zormo bossore 1743 | Xocol Uchiter hucume.

এই পুস্তকের এক খণ্ড ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এভোরার লাইব্রেরিতে রক্ষিত ছিল, সম্প্রতি তাহা লিসবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। একটি খণ্ডিত পুস্তক কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে আছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃতভাবে জানিতে চান, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ পড়িতে হইবে।

১। "The Three First Type-Printed Bengali Books"—H Hosten, S. J.; *Bengal: Past & Present*, Vol IX. Part I, July-Sept, 1914, pp. 40-63.

২। "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক"—শ্রীসুশীলকুমার

৩। "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব"—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ; ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৯৭-২১৭।

৪। *Bengali Literature in the Nineteenth Century*—S. K. De, 1919, pp. 67-75.

৫। 'পাদ্রি মানোয়েল-দা-আস্-সুম্প্‌সাম্-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ'—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩১, 'প্রবেশক' ও 'প্রবেশকের পরিশিষ্ট'। পৃ. ⁄০-৩৵০

৬। 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ১৯৩৭, 'প্রস্তাবনা' পৃ. ১৶০-৩।৶০।

এই পুস্তক কলিকাতা রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রবন্ধ-লেখকের সম্পাদনায় বিস্তৃত ভূমিকা ও টীকা সহিত বাহির হইতেছে।

(খ) 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ,'—ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো প্রণীত।

এই পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় বাহির হইয়াছে। ফাদার হষ্টেনের নিকট লিখিত ফাদার লোপেসের পত্রে এটিও ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবনে ফ্রান্সিস্কো দা সিলভার ছাপাখানায় মুদ্রিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে ; শ্রীযুত সুরেন্দ্রবাবু তাহা বিশ্বাস করেন না। তিনি এভোরাতে ইহা পাণ্ডুলিপি আকারেই দেখিয়াছেন এবং মূল পুথির ১২০ পৃষ্ঠার মধ্যে ৮৫ পৃষ্ঠা নকল করিয়া আনিয়া ছাপাইয়াছেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে তিনি ছাড়া এখন পর্য্যন্ত অন্য কেহ বিশেষ আলোচনা করেন নাই। "প্রস্তাবনা" দ্রষ্টব্য।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্ত্তুগালের লিসবন শহরে সম্পূর্ণ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৯১ ; গ্রন্থের বাঁ-দিকের পৃষ্ঠায় বাংলা এবং ডান দিকের পৃষ্ঠায় পোর্ত্তুগীস ভাষায় গুরুশিষ্যে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে—সুতরাং বাংলা অংশের পরিমাণ ছাপার অক্ষরে প্রায় দুই শত পৃষ্ঠার মতন। টাইটেল পেজে গ্রন্থকর্ত্তা-হিসাবে পাদ্রী মানোএল দা আস্‌সুম্পসাঁউ-এর নাম আছে। ইনি পোর্ত্তুগালের এভোরা শহরের অধিবাসী এবং পূর্ব্বভারতের মণ্ডলীভুক্ত অগস্তিনীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। ইনি ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দেশে ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রচারে ব্যাপৃত থাকেন, তাহার প্রমাণ আছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, এই পুস্তক ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভাওয়াল পরগণার নাগরীতে লিখিত হয়।

অনুবাদ করাইয়া লইয়াছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরের ফরাসী পাদ্রী ফাদার গেরেঁ (Guerin) 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র একটি বিশুদ্ধীকৃত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণের লাতিন ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে, অনুবাদের কালে বৃদ্ধ ফাদার ম্যানোএল মাঝে মাঝে যখন ঝিমাইয়া পড়িতেন, তখন দেশীয় অনুবাদক তাঁহার অজ্ঞাতে খ্রীষ্টধর্ম্মবিরোধী নানা গালগল্প নিজেই জুড়িয়া দিত—অনেক ক্ষেত্রে মূল পোর্ত্তুগীসে ও অনূদিত বাংলায় মিল না থাকার ইহাই কারণ। পাদ্রী গেরেঁর উক্তি সত্য হইলে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম বাংলা গদ্য-পুস্তকের রচয়িতা কোনও অজ্ঞাতনামা দেশীয় রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান—ভাওয়ালের কোনও অধিবাসী। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ভাওয়ালে প্রচলিত মৌখিক ভাষায় লিখিত। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' পুস্তকের "প্রস্তাবনা" হইতে জানা যায়, "১৮৬৯ সালে গোয়ার সন্নিহিত মারগাঁও শহরে ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থভেদ তৃতীয় বার মুদ্রিত হয়। লিসবনের জাতীয় গ্রন্থালয়ে (*Bibliotheca Nacional*) প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের পুস্তক আছে।"

'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়োর রচিত। এ সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহা বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হইয়াছিল—অর্থাৎ ইহা 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের'ও পূর্ব্বের রচনা এবং ইহা নিঃসন্দেহে বাঙালীর রচনা। ভূষণার রাজপুত্র বাল্যকালে ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মগেদের দ্বারা অপহৃত হইয়া আরাকানে নীত হন। সেখানে ফাদার মানোএল দো রোজারিও নামক এক জন সেণ্ট অগস্তিন মণ্ডলীর ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কথিত আছে যে, পরবর্ত্তী কালে ইঁহার প্রচারে ও প্রভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদে' এক জন ব্রাহ্মণ ও এক জন ক্যাথলিকের মধ্যে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে খ্রীষ্ট-মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র ভাষার সহিত ইহার ভাষা খুব বেশী পৃথক্ নহে।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র ভাষার নমুনা—

গুরু। অপূর্ব্ব কথা কহিলা। কিন্তু কেহ কহিবেঃ আমি মালা জপি না; তথাচ আন ধরণ ভজনা করি; জপি খি্স্তর কাছে, আর আর সিদ্ধারে ভজনা করি, এহি ভজনার কারণ আশা রাখি স্বর্গের যাইবার, তাহান কৃপায়। তুমি কি বল।

শিষ্য। যে আমি কহি, তাহা তুমি শোন; সকল যত ভজনা ভালো, কিন্তু বিনে ঠাকুরাণীর ভজনায় কিছু নাহি, এবং ঠাকুরাণীর ভজনা বিনে আর যত ভজনায় বাছ মুক্তি পাইবার পাপ না করিলে। এবং ঠাকুরাণীর ধ্যান সকলের অতি উত্তম মালার ধ্যান। আশ্চর্য্য বুঝাই শোন।—পৃ. ৫৪

'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদে'র নমুনা—

ব্রা। যদি পরমার্থে জিগাসো, তবে যে বিচার তুমি কহো, এহাতে তো চিতে কদাচিতো লএনা যে পরমেশ্বর এমত করেন; কিন্তু শাস্ত্রে কহে যে এ কথা যেতো কালের পাপে করমাক্কিতে লওয়াএ।

১৭৪৩—১৭৭৮

ইহার পরেই বেণ্টো ডি সেলভেস্ত্রে বা ডিসুজা-রচিত দুইখানি পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়। বেণ্টো সম্ভবত ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে গোয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে কলিকাতা ও বাণ্ডেলে আসিয়া বাস করেন। কথিত আছে, তিনি প্রায় পনর বৎসর বঙ্গদেশে ছিলেন এবং এখানে অবস্থানকালে 'বুক অব কমন প্রেয়ার' ও 'ক্যাটিকিজম' পুস্তকের অনেক অংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। তাঁহার পুস্তক দুইটি 'প্রশ্নোত্তরমালা' ও 'প্রার্থনামালা' নামে রোমান্ অক্ষরে লণ্ডনে মুদ্রিত হয়। 'বিশ্বকোষে' শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'প্রশ্নোত্তরমালা'র প্রকাশ-তারিখ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়াছেন, কিন্তু শ্রীসুশীলকুমার দের মতে ইহার প্রকাশ-কাল আর কয়েক বৎসর পরে। এই দুইটি পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের কোনও প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। কুত্রাপি ইহার অস্তিত্ব আছে বলিয়াও আমরা জানি না। বেণ্টোর পুস্তকের সন্ধান এবং ভাষার নমুনাও কেহ দেন নাই।

বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপি

(১৬৯২-১৭৭৬)

এ পর্য্যন্ত বাংলা গদ্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল, 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ব্যতীত তাহার কোনটিরই মুদ্রিত প্রমাণ নাই ; 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'ও রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। বাংলা উপকরণস্বরূপ কতকগুলি হস্তলিখিত পুথি, চিঠিপত্র ও দলিল মাত্র সম্বল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলা-গদ্যের ইতিহাসের সহিত ছাপাখানা ও ছাপার অক্ষরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বাংলা-গদ্যের আলোচনা সম্পর্কে বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপি, মুদ্রাযন্ত্র ও ছাপার হরফের ইতিহাস আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে এখন পর্য্যন্ত আলোচনাই হয় নাই। ডক্টর জি. এ. গ্রিয়ারসন তাঁহার বিখ্যাত *Linguistic Survey of India*, 1903, পুস্তকের পঞ্চম খণ্ডে "Specimens of the Bengali and Assamese Languages" প্রসঙ্গে (পৃ. ২৩) বাংলা অক্ষর সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন। পরে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ('বাঙ্গালা ব্যাকরণ'—প্রবেশক) এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করেন।

বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপির আদিমতম নিদর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন ফাদার এইচ. হষ্টেন। ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত একটি পুস্তকে বাংলা অক্ষরের প্রতিলিপি সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয়।* মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রণের কথা বলিতেছি, কারণ শিলা ও তাম্রলিপিতে, তাল-

* "It was published with a Burmese alphabet in 1692 in a work containing observations by the Jesuit Fathers Jean de Fontenay, Guy Tachard, Etienue Noel and Claude de Beze. The title of the book is *Observations Physiques et Mathematiques pour servir a l'histoire naturelle, et a la perfection*

পাতায় এবং তুলোট কাগজে বাংলা অক্ষর বহুকালাবধি খোদিত বা লিখিত হইয়া আসিতেছে। ইহার ইতিহাস ১২০০ বৎসরের কম হইবে না। বাংলা অক্ষরের দ্বিতীয় নমুনা পাওয়া যায় ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মানীর লাইপ্‌ৎসিক নগরে মুদ্রিত Georg Jacob Kehr (গেওর্গ্‌ য়াকোব্‌ কের্‌) প্রণীত লাটিন ভাষায় *Aurenk Szeb* নামক পুস্তকে।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ
ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম য র ল ব
শ ষ স হ ক্ষ

ক কা কি কী কু কূ
কে কৈ কো কৌ কং কঃ

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত বাংলা বর্ণমালা

এই পুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠাতে ১ হইতে ১১ পর্য্যন্ত বাংলা সংখ্যা এবং ৫১ পৃষ্ঠার সম্মুখের প্লেটে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ ও একটি জার্ম্মান নাম "শ্রীসরজন্ত বলপকাং মাএর" (Sergeant Wolff-gang Meyer) বাংলা অক্ষরে ছাপা আছে। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের এই চিত্রটিই পরে (১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে) লাইপ্‌ৎসিক নগর হইতে মুদ্রিত যোহান ফ্রীদ্‌রিখ্‌ ফ্রিৎস্‌ (Johann Friedrich Fritz) লিখিত 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষা শিক্ষক' (*Orientalischer und*

---

de l'Astronomie et de la Geographie : Envoyees des Indes et de la Chine a l' Academie Royale des Sciences a Paris, per les Peres Jesuites. Avec les reflexions de Mrs. de l' Academie, et les Notes du P. Gouye, de la Compagnie de Jesus. A Paris, de l' Imprimerie Royale, M.DC.XCII ; 4°, pp. 113, 2 maps and 1 plate containing the characters of the people of Bengala and Baramas [Burma].—*Bengal : Past & Present*, vol. IX Part I, p. 40.

NUMERI MAURORUM INDIÆ Orientalis, Europæis MOHREN vel MOORES dictorum. Ex museo M. Georgii Jacobi Kehr, Lipsiæ anno 1725

ALPHABETUM BENGALICUM seu JENTIVICUM Indiæ Orientalis.

Koo. Gkoo. Goo. Gho. Ona. Sjo. (Scho) Sjoo (Schoo) Joo. Sjoo. (Schoo) Eio. Too. Tho. Doo. Dho. Anno.

To. Tho. Do. Dho. Noe. (Nu) Po. Pho. Boo. Bho. Moe. (Mu) Joo. Roo. Loo. Bo. Soo. Soo

Soo. Loo. Khieo.

Bengalenses legunt à sinistra versus dextram. Specimen lectionis Bengalicæ

Sergeant Wolffgang Meyer

Alphabeti et Syllabarii Mogolici, Mongalo Tatarici pars. Mongali singulas voces deorsum scribunt versus dextram

Mongolicæ scripturæ specimen a sinistra versus dextram legendum

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপি

â longum
a breve
i breve
y long
u brev
û long
ri
ry
li
ly

ma
ja
ra
la
oua
sa
sâ long
sha
ha
kha

tha
da
dha
ana
toa
thoa
doa
dhoa
na
pa
pha
oa
bha

ka
kha
ga
gha
oüa
sa
sha
ia
iha
ya
ta

Alphabetum Brahm. III B.

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপি

Occidentalischer Sprachmeister) নামক পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হয়। বাঙালী পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা বাংলা অক্ষরের এই আদি নমুনার প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

I. *Devanagaram*

a ā ĭ ī u ū ru rū lu lū ie ei o au am ahá ká kāgá gā

gna ʃchá ʃchā dsā dʃa gná ta ta tta thā na ta tá dā dá na pá pā bā ba

ma ja ra la wa schā schā sa ha la tra ra i tthi

II *Balabandu*

Wo na ma si dham A ā ī ī ū ū ri ri li li ie ei o au am

ahà ka kā ga gā nha tze tzé si se je tha thāda da na tu da da

da na pa ba ba ba ma ie r a la wa sa scha scha ha la itscha.

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রিত দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতিলিপি

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দের পরই ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হলাণ্ডের লাইডেন নগর হইতে ডেভিড্ মিল (Davidis Millius) *Dissertationes Selectae* নামক (লাটিন ভাষায়) একখানি বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ের শেষে Joannes Josua Ketelaer লিখিত 'Miscellanea Orientalia' নামক হিন্দুস্থানী ভাষার একটি ব্যাকরণ আছে। এই ব্যাকরণ-অংশে বাংলা ও দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতিলিপি দুইটি স্বতন্ত্র প্লেটে ছাপা আছে। এখানে তাহা পুনর্মুদ্রিত হইল।*

* ডেভিড, মিলের পুস্তকের এক খণ্ড ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহে আছে। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে পুস্তকটি ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। Georg Jacob Kehr প্রদত্ত নমুনা ব্রিটিশ

কেটেলের নিজে ওলন্দাজ ছিলেন এবং তিনি ওলন্দাজ ভাষাতেই তাঁহার ব্যাকরণ লেখেন। ডেভিড্ মিল লাতিন ভাষায় তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। কেটেলের প্রণীত মূল ব্যাকরণ পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই আছে, ছাপা হয় নাই।

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ

ऌ ॡ ए ऐ ओ औ अं अः

क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण त थ द ध न

प फ ब भ म य र ल व

श ष स ह क्षः

क का कि की कु कू

के कै को कौ कं कः

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দেবনাগরী বর্ণমালা

বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপি সম্বন্ধে ডেভিড্ মিল তাঁহার লাতিন ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা কৌতূহলোদ্দীপক।

"আমি আরও দুইটি বর্ণমালা তাম্রফলকে খোদাই করিয়াছি—ব্রাহ্মণদিগের বর্ণমালার পরিচয় হিসাবে এখানি মূল্যবান বিবেচিত হইবে।…টেবল্ III Bতে যে ব্রাহ্মণ বর্ণমালা [অর্থাৎ বাংলা] প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সমগ্র ভারতবর্ষে—বিশেষ করিয়া বাংলা, বেহার ও উড়িষ্যায় ব্যবহৃত হয়।"

বাংলা বর্ণমালা কোনও কালে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইত কি না ভাষাতত্ত্ববিদ্দের তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

মিল-প্রদত্ত দেবনাগর বর্ণমালা তেমন সুষ্ঠু নয়। সম্ভবতঃ লেখকের দোষে এইরূপ ঘটিয়াছে। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আম্স্টারডামে প্রকাশিত আতানাসিউস কির্খের (Athanasius Kircher) লিখিত *China Illustrata* পুস্তকে দেবনাগরী বর্ণমালার সর্ব্বপ্রথম প্রতিলিপি পাওয়া যায়।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড অনূদিত *A Code of Gentoo Laws* পুস্তকে দুইটি স্বতন্ত্র প্লেটে বাংলা ও হিন্দী বর্ণমালা মুদ্রিত আছে। তাহার প্রতিলিপিও এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল।

মুসলমান-যুগে ভারতের ঐতিহাসিকগণ

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, ডী-লিট

(প্রথম)

ছয় শত বৎসর ধরিয়া মুসলমানগণ ভারতে রাজত্ব করেন, এবং তাহার পরও কিছু দিন শাসনকার্য্যে মুসলমান-যুগের সরকারী ভাষা ও পদ্ধতি চলিতে থাকে। এই সুদীর্ঘ কালে মুসলমান রাজা ও সমাজ হইতে ভারতবর্ষ কতকগুলি দান পাইয়াছে যাহা আমাদের জাতীয় জীবনে নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এবং এখনও শেষ হয় নাই। বর্ত্তমান ভারতীয় সভ্যতা একটি মিশ্র পদার্থ, ইহার ক্রমবিকাশে মুসলমান-যুগের কৃতিত্ব কম আদরের নহে, কারণ ঐ ছয় শত বৎসরের শাসনের ফল ভারতবাসীদের দেহের, মনের অংশ হইয়া পড়িয়াছে। অনেক দিক্ দিয়া আমরা মুসলমান-যুগের আনীত পরিবর্ত্তনগুলি ভোগ করিতেছি ; কিন্তু আজ তাহার একটি মাত্র আলোচনা করিব।

আমার মনে হয়, মুসলমান জগৎ ভারতকে যে দানগুলি দিয়াছে তাহার মধ্যে ইতিহাস-সাহিত্য একটি প্রধান। এটি ভারতের পক্ষে অপূর্ব্ব। আমরা দম্ভ করিয়া বলি, হিন্দুযুগে কি ইতিহাস ছিল না? আমাদের পুরাণই ইতিহাস, রামায়ণ মহাভারতও ইতিহাস, হর্ষচরিত, বিক্রমাঙ্কচরিত, রামচরিত এই ত ইতিহাস। এই যুক্তির উত্তর আমাদের এক জন বিখ্যাত লেখক রহস্যের আকারে কিন্তু সত্যসত্যই দিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "হনুমানের লেজ দু-হাজার ফুট লম্বা যে গ্রন্থে লেখা তাহা পুরাণ, আর যদি ঐ লেজটা ঘর্ষণ কর্ত্তন করিয়া তিন ফুটে নামান যায় তবে তাহা ইতিহাস হইবে।" অর্থাৎ ইতিহাস সত্য প্রকৃত জগতের ছবি, ইহা প্রকৃতির সত্য অতিক্রম করিতে পারে না। এজন্য পুরাণকে ইতিহাস বলা যাইতে পারে না, কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া রচিত কাব্যকেও এই নাম দেওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাস সময় ও ব্যক্তিগণের ঠিক পরে পরে সাজান একটি অস্থিকঙ্কাল অবলম্বন করিয়া রচিত হইবে, শুধু ভাবের উচ্ছ্বাস বা কথার রঙ্গীন কুয়াশা দিয়া এই শ্রেণীর সাহিত্য গঠিত হইতে পারে না।

হিন্দুযুগে এরূপ ইতিহাস রচিত হয় নাই, যদি হইয়া থাকে তবে তাহা সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। চীন-পরিব্রাজক ইয়াং চুয়াং (৬৩০ খ্রীঃ) বলেন যে ভারতবর্ষের "মধ্যদেশে" প্রত্যেক প্রদেশের ঘটনার কাহিনী সত্ত সত্ত লিখিবার পদ্ধতি ছিল, এবং এই বিবরণগুলিকে "নীলপীট" নাম দেওয়া হইত। কিন্তু এরূপ রচনার এক পৃষ্ঠাও রক্ষা পায় নাই, এবং সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার উল্লেখ নাই।

সুতরাং মুসলমান-বিজেতাগণ যখন ইন্দ্রপ্রস্থে সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন, তখন

একটা নূতন ধারা আনিয়া দিল। পরে হিন্দুরা পারসিক ও অন্যান্য ভাষায় ইতিহাস লিখিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহা মুসলমান-লিখিত ইতিহাস অপেক্ষা অনেক অংশে নিরেশ হইল। মুসলমান-লেখকদের কয়েকটি মহা সুবিধা ছিল, যেমন—(প্রথম) এক সন ও তারিখ—হিন্দুদের অসংখ্য সন ও মাস-গণন পদ্ধতির মত নহে। (দ্বিতীয়) এক সাহিত্যিক ভাষা পারসিক। (তৃতীয়) একই সাহিত্যিক আদর্শ। (চতুর্থ) জাতিভেদ না থাকায় অনেক স্থলে মুসলমান অসিধারীরা কলম চালাইতেও দক্ষ ছিলেন—সাহিব-ই-সয়েফ্ ব কলম্; ইহার ফলে তাঁহাদের দৃষ্ট ঘটনার বর্ণনা অতিশয় সত্য ও উজ্জ্বল আকারে লিখিত হইত। এই সুবিধাগুলি হিন্দুদের ছিল না। তদ্ভিন্ন নানা দেশের নানা জাতি ইসলামের প্রভাবে ভারতে মিলিত হইয়া, অতি শীঘ্র প্রাদেশিক বা জাতিগত বৈষম্য ভুলিয়া গিয়া এক মিশ্রিত সাধারণ সমাজ গঠন করিয়া ফেলিত, এইরূপ লোকদের মধ্যে সাহিত্যের ছাঁচটা একই উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিত, এবং ইতিহাসগুলিও এলোমেলো হইতে পারিত না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হিন্দু ও মুসলমানের ইতিহাস পাশাপাশি রাখিয়া দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে হিন্দুরা ইহজগৎ অপেক্ষা পরলোকের কথাই বেশী ভাবে, তাহারা এই সব নশ্বর রাজরাষ্ট্র সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি পার্থিব জিনিষ মনোযোগ করিয়া দেখিয়া লিখিয়া তাহা হইতে স্থায়ী সাহিত্য রচনা করিতে স্বভাবতঃই অনিচ্ছুক, অপারক, এক্ষেত্রে তাহারা মুসলমানদের তুলনায় অনেক নীচে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি—সুবিখ্যাত নজীব্-উদ্দৌলার পারসিক জীবনী সৈয়দ নুরুদ্দীন হোসেন লেখেন, আর তাঁহারই সমসাময়িক এবং প্রতিদ্বন্দ্বী জাঠরাজা সুরজমলের জীবনী 'সুজনচরিত্র' নামে হিন্দী ভাষায় মিশ্রণ নামক এক হিন্দু রচনা করেন। দুই জনই শিক্ষিত পদস্থ লেখক, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ দুখানির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এমন কি হিন্দু মুন্শী বিহারীলাল কর্ত্তৃক পারসিক ভাষায় রচিত নজীব্-উদ্দৌলার জীবনী, নুরুদ্দীনের গ্রন্থের তুলনায় চাঁদের পাশে জোনাকির মত নিষ্প্রভ দেখা যায়।

ভারত-বিজয়ী মুসলমান রাজারা ভারতের বাহিরের মুসলমান জগৎ হইতে ইতিহাস-রচনার আদর্শ সঙ্গে করিয়া আনেন, আর যুগে যুগে ইসলামীয় সভ্যতার কেন্দ্র খোরাসান, বাঘদাদ, মিসর ও কর্ডোভা হইতে মুস্‌লিম পণ্ডিতগণ ভারতে আসিয়া এই সাহিত্যকে নূতন রসে সতেজ করিয়া তুলিতেন। আমাদের এই সব রাজাদের নিজ নিজ ইতিহাস—অন্ততঃ পূর্ব্বজগণের কাহিনী, রচনা করাইবার একটি স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল; অথবা তাঁহাদের সভায় প্রতিপালিত পণ্ডিতগণ নিজ নাম অমর করিবার জন্য উৎকৃষ্ট পারসিক ভাষায় সেই সেই যুগের ইতিহাস লিখিতেন। এইরূপে মহমুদ গজনবী হইতে দ্বিতীয় শাহ্ আলম পর্য্যন্ত আট শত বৎসর ধরিয়া ভারতের কোন-না-কোন অংশ লইয়া পারসিক ইতিহাস রচিত হওয়ায় এক মহাসমুদ্রের মত প্রকাণ্ড সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের মহা সৌভাগ্যের বিষয় যে, ইহার অতি অল্প অংশই লোপ পাইয়াছে।

আরও সৌভাগ্যের বিষয়, এই মহাসমুদ্রে আমরা এক জন প্রবলপ্রতাপান্বিত

কর্ণধার পাইয়াছি। তিনি লর্ড ডালহৌসীর ফরেন্ সেক্রেটারি সার্ হেনরি মায়ার্স এলিয়ট। তাঁহার আরব্ধ ও অধ্যাপক ডাউসন কর্তৃক সম্পূর্ণ-কৃত আট ভলুম *History of India as told by its own Historians* এই সব মুসলমান ঐতিহাসিকগণের জীবনী, গ্রন্থ-পরিচয়, সমালোচনা এবং অনেক স্থলে আংশিক অনুবাদ দিয়া এই ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ও মূল্য বুঝিবার, এই ক্ষেত্রের নিজ নিজ নির্ব্বাচিত কোণ-টুকুতে গবেষণা করিবার পথ অতি সুগম করিয়া দিয়াছেন। এলিয়টের আরও মহান্ কীর্ত্তি এই সব পারসিক ইতিহাসের হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ। ডালহৌসী অতি জবরদস্ত বড়লাট ছিলেন, আজ এই রাজার রাজ্য জপ্ত করেন, কাল উহাকে কিছু জমি দেন, অথবা তৃতীয় এক রাজার সর্ব্বস্ব নীলামে চড়ান (যেমন নাগপুরকর ভোঁসলাদের)। সমস্ত ভারতের রাজন্যবর্গ তাঁহার প্রতাপে কম্পমান। এহেন লাটের ফরেন্ সেক্রেটারি ছিলেন—রাজার উপর রাজা, নবাব মহারাজ-শ্রেণীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। এই সাহেবের সখ ছিল পুরাতন পুথি সংগ্রহ করা, অর্থাৎ ভারতীয় ইতিহাস বা ঐতিহাসিক জীবনী লইয়া লেখা ফারসী গ্রন্থ পাইলে তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন, ঐ বিষয়েই অনুসন্ধান আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। সুতরাং অতি দুষ্প্রাপ্য, অথবা সে পর্য্যন্ত জগতে অজ্ঞাত কোন ফারসী ঐতিহাসিক পুথি তাঁহাকে উপহার দিলে তাঁহার দরবারে অতি সহজে প্রবেশ করা যাইত, এমন কি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া ছোটখাট রাজ্যও রক্ষা করা যাইত, অথবা কোন নবাবের পেন্সন বাড়ান যাইত। এইরূপে দিল্লীর বাদশাহী প্রাসাদে রক্ষিত অথবা প্রাচীন ওমরাদের জন্য সুন্দর অক্ষরে লিখিত মহামূল্যবান্ ফারসী পুথি তাঁহাদের বর্ত্তমান হতভাগ্য বংশধরেরা এলিয়টের নিকট ভেট দিতেন। ইহার মধ্যে এমন এমন গ্রন্থও আছে জগতে যাহার আর কোন নকল নাই। ভারতের মুসলমান-যুগের সমস্ত ফারসী ইতিহাস সংগ্রহ এবং অনুবাদ করা এলিয়টের জীবনের ব্রত ছিল; এ কাজ তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র, কারণ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি বিলাত যাইবার পথে মারা গেলেন (১৮৫৩)। তখন এক ভলুম মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার আরব্ধ এই ঐতিহাসিক মহাকোষ তাঁহার মৃত্যুর অনেক বৎসর পরে ভারত-সচিবের খরচে অধ্যাপক ডাউসন্ শেষ করেন (১৮৭৭ খ্রীঃ, আট ভলুমে, এবং পরিশিষ্ট লইয়া নয় ভলুমে)।

আমাদের আরও একটি সৌভাগ্যের বিষয়, এলিয়ট্ এই সব ঐতিহাসিক পুথি কুড়াইয়া একত্র করিয়া বিলাতে পাঠান সিপাহী-বিদ্রোহের পাঁচ ছয় বৎসর আগে। তাহাতেই এগুলি রক্ষা পাইয়াছে, আমরা এখন এগুলি দেখিতে পাইতেছি। নচেৎ, যদি এগুলি দেশী মালিকদের বাড়ীতে থাকিত, তবে ঐ উত্তর-ভারতব্যাপী মহাবিপ্লবে একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইত। সিপাহী-বিদ্রোহের ফলে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশময় (অর্থাৎ এলাহাবাদ-আগ্রায়) অশান্তি ও দাঙ্গা চলিতে থাকে, অর্দ্ধেক জেলার সরকারী কাগজ-

যায়। এই সব স্থানের পুথি লোপ পাইয়াছে। ইহার চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই মত একটি অরাজকতার ফলে এলফিনষ্টোন্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত অসংখ্য দুর্ল্লভ ফারসী ঐতিহাসিক পুথি, মারাঠা সৈন্যদের দ্বারা তাঁহার পুণা রেসিডেন্সী-ভবন আক্রমণের সময় ধ্বংস হয় (১৮১৭ খ্রীঃ)। সুতরাং যে এলিয়ট-সংগ্রহ এখন ব্রিটিশ মিউজিয়মে এক পৃথক্ কক্ষে রক্ষা পাইতেছে তাহা জগতে অমূল্য, কারণ অনেক স্থলে অদ্বিতীয়।

ফারসী ভারত-ইতিহাস-মালার অনুবাদ সুদীর্ঘ আট ভলুমে প্রকাশ করিয়া এলিয়ট্-ডাউসন্ কত বড় উপকার করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় যদি আমরা ১৮৭৭ সালের আগে ও পরে লিখিত মুসলমান-ভারতের ইতিহাস দুখানি লইয়া তুলনা করিয়া দেখি। ঐ আট ভলুমের একটি সুফল ষ্টান্লি লেন্-পুল্-রচিত "মধ্যযুগীয় ভারত"। ইহাতে চারি শত পৃষ্ঠায় মুসলমান ভারত-ইতিহাস-রূপ মহানাটকের অঙ্কের পর অঙ্ক দৃশ্যপটের মত পাঠকের সম্মুখে খুলিয়া দিয়াছে; ইহার সমস্ত উপাদান এলিয়ট্ হইতে লওয়া। সব বর্ণনা নিখুঁত সত্য, সাক্ষীদ্বারা প্রমাণিত, অথচ বইখানি জীবন্ত মানুষে ভরা, আমরা সব বড় বড় ঐতিহাসিক পুরুষদের চরিত্র অতি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি; পাঠক যাহা পড়িবেন তাহা মনে বহুদিন স্মরণ থাকিবে। ফলতঃ মেকলে যেমন ইতিহাসকে সরস ও জীবন্ত করিয়া দিতেন, লেন্-পুল্‌ও তাহাই করিয়াছেন, এবং এলিয়টের গ্রন্থে অসংখ্য সমসাময়িক বিস্তৃত বিবরণ ও উক্তি পাইয়াছিলেন বলিয়াই এরূপ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার পর অনেকেই অংশতঃ বা ব্যাপকভাবে গবেষণা করিবার সুবিধা এই আট ভলুম হইতেই পাইয়াছেন।

কিন্তু এলিয়ট্ আমাদের প্রথম পথ-প্রদর্শক এবং নমুনা-দেখাইবার ব্যবসায়ী ছিলেন। এখন আর নমুনায় চলে না, আমরা প্রতি মূলগ্রন্থের অবিকল সম্পূর্ণ অনুবাদ চাই, এবং তাঁহার পর অনেক নূতন গ্রন্থও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১৫৫৬ সালে আকবর দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন, এবং ভারতে স্থায়ী মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল। তাঁহার রাজ্যকাল হইতে যে যুগ আরম্ভ হইল তাহার এবং মুঘলদের পূর্ব্বেকার যুগের ভারতের ফারসী ইতিহাসগুলির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ—শুধু সংখ্যাতে নহে, গুণেও। ইতিহাসের ক্ষেত্রে মুঘল-যুগের প্রধান কীর্ত্তি সরকারী ইতিহাস; অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তারিখ ও স্থানের লোকের নাম দিয়া, মাস ও বৎসর অনুসারে সাজাইয়া প্রত্যেক সম্রাটের রাজ্যকালের সুদীর্ঘ ইতিহাস লেখা হইয়াছে, এবং সেগুলির সেই সেই বাদশাহের নাম-অনুসারে নাম দেওয়া হইয়াছে, যেমন "আকবর-নামা" অর্থাৎ আকবরের গ্রন্থ (ফারসীতে নামাঃ শব্দের অর্থ গ্রন্থ, ইহা 'নাম' শব্দ হইতে ভিন্ন), পাদিশাহ-নামা (অর্থাৎ শাহজাহানের), আলমগীর-নামা ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, এগুলির উপাদান ইতিহাসের আদি ও অবিকৃত সমসাময়িক মশলা, অর্থাৎ নানা স্থান হইতে কর্ম্মচারিগণ বাদশাহ ও মন্ত্রীদের যে-সব পত্র, ডায়েরী, যুদ্ধের এবং শত্রুর দূতের সহিত আলোচনার রিপোর্ট, সন্ধির খসড়া, হিসাবের কাগজ প্রভৃতি লিখিয়া পাঠাইতেন তাহা বাদশাহী রেকর্ড অফিসে ("বস্তা-খানায়") জমা থাকিত; তাহা দেখিয়া এই শ্রেণীর বইগুলি রচিত।

মুঘল বাদশাহদের আগে এই শ্রেণীর ইতিহাস একখানিও ভারতে রচিত হয় নাই। তাহার

প্রথম কারণ সে সময় সভ্যতা তত অগ্রসর হয় নাই, আর দেশে শান্তিও কম ছিল। কোন রাজবংশই তখন দিল্লীতে তিন পুরুষের বেশী সিংহাসন রাখিতে পারেন নাই। আর এই সব রাজারা প্রায় যাযাবর ছিলেন ; সৈন্যসামন্ত লইয়া আজ এখানে, কাল ওখানে তাঁবু খাটাইয়া মাস ও বৎসর কাটাইতেন ; এক নির্দ্দিষ্ট রাজধানীতে স্থির হইয়া বসিয়া সভা করিতে পারিতেন অতি কম দিনই। যাঁহাদের অর্দ্ধেক জীবনের অধিক কাল বিদ্রোহদমনে বা রাজ্য-বিস্তারে কাটাইতে হইত, তাঁহারা সাহিত্য ইতিহাস সৃষ্টি করাইবার অবসর পাইতেন না। পুথি দলিল প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার পক্ষেও নানা বাধা ছিল। যদি বা কিছু সংগৃহীত হইত তাহাও অশান্তি এবং ঘন ঘন স্থান-পরিবর্ত্তনে শীঘ্রই নষ্ট হইত, অথবা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িত।

কিন্তু ঠিক মুঘল-যুগের "নামা"-গুলির মত বড় না হইলেও, কয়েক খানি মূল্যবান্ ইতিহাস আমরা তাহার পূর্ব্বের যুগে পাই। এগুলি একটানা ইতিহাস, অনেক সময়ে বাবা আদম্ হইতে আরম্ভ! কেবল মাত্র রাজার সমস্ত রাজত্বকাল বা কয়েক বৎসর লইয়া লিখিত নহে।

আরবী ভাষায় লিখিত ঘজ্‌নীর সুলতান মামুদের ইতিহাস "কিতাব্-ই-ইয়ামিনি" বড় কম সংবাদ প্রদান করে, ইহার ইংরাজী অনুবাদ (ফারসী অনুবাদের অনুবাদ) বিশুদ্ধ নহে। ঐ রাজবংশের বৈহাকী নামক এক জন কর্ম্মচারী একখানি সুদীর্ঘ ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের মামুদ-পুত্র মাসুদের কাহিনী—এই অংশটুকু মাত্র রক্ষা পাইয়াছে, যে খণ্ডে মামুদের কার্য্যকলাপ বর্ণিত ছিল তাহা লোপ পাইয়াছে, কোথাও মিলে না। সুতরাং ঐ রাজার ভারতে কীর্ত্তির জন্য এখন শিলালিপি প্রধান সম্বল।

তাহার পর ঘোরী-বংশ। ইঁহাদের জন্য "তাজ-উল্-মাসির" নামক গ্রন্থ আছে, কিন্তু ইহা নামতঃ ইতিহাস হইলেও কবিতা ও অলঙ্কারের ভারে ইতিহাস প্রায় দমবন্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। "তবকাৎ-ই-নাসিরী" (১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে) আমাদের ভারতীয় মুসলমানযুগীন প্রথম ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাভ্যার্টি সাহেব এখানির সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন (যদিও তাঁহার অনেক টীকা অতিপাণ্ডিত্য-দোষে দূষিত এবং ভুল)। খিলজী-বংশের জন্য আছে জিয়া বারণী-রচিত "তারিখ-ই ফিরোজশাহী", অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ (যদিও গ্রন্থকারের পক্ষপাতদোষ পরলোকগত অধ্যাপক গার্ডনার ব্রাউন প্রথমে দেখাইয়া দেন) ; এখানিতে প্রথম দুই তুঘলুক সুলতান, এবং ফিরোজ শার ১-৬ বৎসরের বিবরণও আছে। শেষোক্ত সুলতানের সম্পূর্ণ ইতিহাস শমস্-ই-আফিফ-রচিত "তারিখ-ই-ফিরোজশাহী" (এলিয়ট এই দুই গ্রন্থের দীর্ঘ অনুবাদ দিয়াছেন এবং প্রথমখানির অপর এক অনুবাদ *J. A. S. B.*তে অতি পূর্ব্বে ১৮৬৩-৬৪তে ছাপা হয়।) আফঘান অর্থাৎ লোদী এবং শূর-বংশের ইতিহাস তেমন ভাল নাই। এই সব ইতিহাস ভিন্ন আমির খসরুর কাব্য ও গদ্য রচনাগুলি, মহরুর চিঠিপত্র, ইবন্-বতুতার ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থ ঐ যুগের অনেক খবর দেয় এবং কোন ঐতিহাসিক এগুলিকে উপেক্ষা করিতে পারেন না।*

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রদত্ত 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালা'র প্রথম বক্তৃতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

চতুশ্চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

সদস্য

১৩৪৪ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা—

		বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	১০	...	৮
(খ)	আজীবন-সদস্য	১৪	...	১৪
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৯	...	৯
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	...	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৮৩৪	...	৮২৫
(চ)	সহায়ক-সদস্য	২১	...	১৬
		৮৮৮		৮৭২

(ক) আলোচ্য বর্ষে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় পরলোকগমন করায় বিশিষ্ট-সদস্য-সংখ্যা ১০ স্থানে ৮ হইয়াছে। বর্ষশেষে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ বিশিষ্ট-সদস্য আছেন—

১। স্তর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, ৪। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৫। স্তর জর্জ্জ এ. গ্রীয়ার্সন, ৬। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, ৭। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৮। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন।

আলোচ্য বর্ষে তিন জন বিশিষ্ট-সদস্য প্রস্তাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নির্ব্বাচন-ফল অদ্য বিজ্ঞাপিত হইবে।

(খ) আলোচ্য বর্ষে আজীবন-সদস্য-সংখ্যার কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় নাই। যাঁহারা আজীবন-সদস্য আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

১। রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, ৩। রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, ৪। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ৫। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, ৬। ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, ৮। ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, ৯। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ১০। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ১২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, ১৩। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, ১৪। শ্রীযুক্ত লালবিহারী দত্ত।

(গ) অধ্যাপক-সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন আলোচ্য বর্ষে হয় নাই। ইঁহারা অধ্যাপক-সদস্য আছেন—

১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ৫। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী, ৬। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, ৮। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, ৯। শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য।

(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৮৩৪ ছিল। বর্ষ মধ্যে ১৩ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং ৪১ সংখ্যক নিয়মানুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে ৯২ জন সাধারণ-সদস্যের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। বর্ষ মধ্যে ৯৬ জন ব্যক্তি সাধারণ-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৮২৫ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ২১ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। বর্ষশেষে এই বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৫ জনের স্থিতিকাল ফুরাইয়াছে। এই জন্য এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা এখন ১৬ জন।

পরলোকগত সদস্য

বিশিষ্ট-সদস্য—১। আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু, ২। ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সাধারণ-সদস্য—১। রায় অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর, ২। অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, ৩। রায় সাহেব অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪। রায় কৃষ্ণকালী মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, ৫। জ্ঞানদাপ্রসাদ চৌধুরী, ৬। রায় বিপিনবিহারী বসু, ৭। রায় বিহারীলাল সরকার বাহাদুর, ৮। ব্রজমোহন বর্ম্মণ, ৯। ভূতনাথ দাস, ১০। ডাক্তার মণিভূষণ ঘোষ, ১১। রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, ১২। ডাক্তার সুরেশচন্দ্র রায়, ১৩। কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র।

এই সকল পরলোকগত সদস্যের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছেন। তন্মধ্যে অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় পরিষদের প্রথম যুগে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বারাণসী শাখা-পরিষদের সভাপতিরূপে ও মূল পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে এবং কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র বাহাদুর রমেশ-ভবন সমিতির অন্যতম সম্পাদকরূপে এবং নানা অনুষ্ঠানে সাহায্য করিয়া পরিষদের সেবা করিয়াছিলেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ

বর্ষমধ্যে নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ পরলোকগমন করিয়াছেন—

১। কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন, ২। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। জে. সি. ব্যানার্জ্জি, ৪। বরদাদাস বসু, ৫। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, ৬। রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, ৭। শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৮। ডক্‌টর হেরম্বচন্দ্র মৈত্র।

ইঁহারা এক সময়ে সকলেই পরিষদের সদস্য ছিলেন। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নানা দ্রব্য উপহার দিয়া এবং পরিষদ্‌গ্রন্থ 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়া ও নানাভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া পরিষদের প্রথম যুগে বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। জে. সি. ব্যানার্জ্জি (যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) মহাশয় নিজব্যয়ে কয়েক জন সাহিত্যিকের তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ও চিত্রশালার জন্য দ্রব্যাদি দান করিয়াছিলেন। শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আলোচ্য বর্ষে তাঁহার পিতা ৺তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এক তৈলচিত্র দান করিয়াছিলেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল,—(ক) ত্রিচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন ১, (খ) মাসিক অধিবেশন ১০, (গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতি-সভা ৪, (ঘ) বিশেষ অধিবেশন ৭, মোট ২২।

(ক) **ত্রিচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন**—৮ই শ্রাবণ, শনিবার, অন্যতম সহকারী সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দার্জিলিঙ্ হইতে যে 'নিবেদন' লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পঠিত হইলে পর, মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর কর্ত্তৃপক্ষের প্রদত্ত ৺রাধানাথ সিকদার এবং ৺শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ৺তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা হয়। তৎপরে ত্রিচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচনের ফলাফল বিজ্ঞাপন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন হয়।

(খ) **মাসিক অধিবেশন**—প্রথম মাসিক অধিবেশন—১৩ই আষাঢ়, রবিবার, 'বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান,' শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—২৭এ আষাঢ়, রবিবার, 'দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার', শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন, ২৫এ ভাদ্র, শুক্রবার, (ক) 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য' ও (খ) 'পীতাম্বর মিত্র', শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন, ২২এ অগ্রহায়ণ, বুধবার, (ক) 'জেমস্ ষ্টুয়ার্ট', (খ) 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত', শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন, ৭ই পৌষ, বুধবার, 'বৌদ্ধ অপদান', ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন, ৫ই মাঘ, বুধবার, 'কালীপ্রসন্ন সিংহ', শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন, ৪ঠা ফাল্গুন, বুধবার। (কোন প্রবন্ধ পঠিত হয় নাই)

অষ্টম মাসিক অধিবেশন, ৯ই চৈত্র, বুধবার, 'দশাঙ্ক সংখ্যা প্রণালীর উদ্ভাবন', ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

নবম মাসিক অধিবেশন, ১৯এ চৈত্র, শনিবার, 'হিন্দু জ্যোতিষে শককাল,' ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

দশম মাসিক অধিবেশন, ২৯এ চৈত্র, মঙ্গলবার, 'বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের বয়স', ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

এই সকল মাসিক অধিবেশনে উক্ত প্রবন্ধপাঠ ব্যতীত পরিষদের কতিপয় সদস্য ও সাহিত্যিকের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হয়, কর্ম্মাধ্যক্ষ-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্ধারণ বিজ্ঞাপিত হয়, আলোচ্য বর্ষের সংশোধিত বাজেট বিজ্ঞাপিত হয় এবং একজন সাহিত্যিকের চিত্র-প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ-প্রার্থিগণের ভোট গণনার জন্য শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীযুক্ত বিনোদ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অমিয়লাল মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিশ্র ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হন।

(গ) **বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব**—(১) ২৩এ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সভাপতিত্বে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিপূজা হয়, (২) ১৫ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়—প্রাতে লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত গোরস্থানে কবির সমাধিক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রার্থনা, কবিতা ও বাণী পাঠ এবং বক্তৃতা হয়। অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু ও শ্রীযুক্ত দিলীপ দাশগুপ্তের কবিতা, ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীযুক্ত মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের বক্তৃতা ; শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়ের আবৃত্তি ও বঙ্গীয়-নাট্য পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক গান ও 'মেঘনাদবধ কাব্য' হইতে অংশবিশেষ অভিনীত হয়। (৩) ১৯এ চৈত্র, শনিবার, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় এবং (৪) ২৬এ চৈত্র, শনিবার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ও পাইকপাড়ার রাজবাটীর সম্মিলিত আয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে পাইকপাড়া রাজবাটীতে বঙ্কিম-উৎসব সম্পন্ন হয়। বাসন্তী বিদ্যাবীথির ছাত্রীগণ 'বন্দে মাতরম্' গান করিলে পর বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সভার উদ্বোধন করেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাণী পঠিত হয় এবং কুমার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ বাহাদুর স্বাগত সম্ভাষণ করেন। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠের পর স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের 'বঙ্কিম-প্রতিভার ক্রমবিকাশ,' শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের 'বঙ্কিম-সাহিত্যের রস-বিচার', শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র', শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা মহাশয়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র' এবং শ্রীযুক্তা সোফিয়া খাতুন মহাশয়ার 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসুর কবিতা পঠিত হয়। এই অধিবেশনের কার্য্যারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে পাইকপাড়া রাজবাটীতে বঙ্কিম-প্রদর্শনী হয়। স্যর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করেন।

(ঘ) **বিশেষ অধিবেশন**—(১) ২২এ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবারের অধিবেশনে মহারাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'ধ্রুপদ সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা' পাঠ করেন এবং সঙ্গীত আলাপ করেন। (২) ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগীর সভাপতিত্বে ২০এ আষাঢ়, রবিবারের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় "একই কথার বা একরূপ ধ্বন্যাত্মক কথার বিপরীতার্থ বিষয়ে মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া আলোচনা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (৩) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১৭ই আশ্বিন, রবিবারের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় "সিন্ধু-সভ্যতা" বিষয়ে 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালা'র অন্তর্গত প্রথম বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের সাহায্যে চিত্রপ্রদর্শন করিয়া বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন। (৪) ২১এ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন হয়। শোক-প্রস্তাব এবং স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্যর শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী বক্তৃতা করেন। (৫) মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে ৩রা পৌষ, শনিবার, স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহের চিত্র-প্রতিষ্ঠার্থ সভা হয়। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর বক্তৃতা করেন। (৬) ৮ই ফাল্গুন, রবিবার, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন হয়। শোকজ্ঞাপক প্রস্তাব এবং স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব ব্যতীত স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, ডক্টর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বক্তৃতা করেন এবং শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু একটি কবিতা পাঠ করেন। (৭) ২০এ চৈত্র, রবিবার, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় "বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগ" বিষয়ে 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালা'র অন্তর্গত প্রথম বক্তৃতা করেন।

উৎসবাদি

(ক) **পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসব**—প্রতিষ্ঠা-দিবস ৮ই শ্রাবণ, কিন্তু ঐ দিন বার্ষিক অধিবেশন হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশে ৯ই শ্রাবণ, রবিবার এই উৎসব হয়। সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া স্বর্গীয়া কামিনী রায় মহাশয়ার চিত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই উৎসব উপলক্ষে প্রাপ্ত পুস্তক (আধুনিক ও দুষ্প্রাপ্য), প্রাচীন পুথি, পুস্তকাধার প্রভৃতি উপহারগুলি প্রদর্শিত হয়। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আবৃত্তি, কুমারী দীপিকা দের মণিপুরী ও সাঁওতালী নৃত্য, বাসন্তী বিদ্যাবীথির ছাত্রীগণের গান, শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান এবং শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় ও কুমারী উমা বসুর গানের পর জলযোগান্তে উৎসব সমাপ্ত হয়। এই উৎসরের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা সঙ্গীতাদির দ্বারা সমবেত সজ্জনগণের মনোরঞ্জনে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে এবং উপহারদাতৃগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

(খ) ৯ই আশ্বিন, শনিবার সন্ধ্যায় বঙ্গীয় রাজসরকারের মন্ত্রিগণকে এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণকে এক প্রীতি-সম্মিলনে সংবর্দ্ধিত করা হয়। পরিষদের নানা বিষয়ের অভাবের বিষয় সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক বিবৃত হইলে মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় বলেন, বঙ্গীয় রাজসরকার হইতে পরিষৎ সর্ব্বতোভাবে সাহায্যের দাবী করিতে পারেন এবং তাহা ন্যায়সঙ্গত এবং এ বিষয়ে সমবেত চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই উপলক্ষে জলি গার্লস্ এসোসিয়েশনের বালিকাগণ সঙ্গীতাদি করেন। জলযোগান্তে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

(গ) পরিষদের রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া উক্ত কার্য্য সমাধা করায় ৩০এ ফাল্গুন সোমবার রমেশ-ভবন সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা লেডী প্রতিমা মিত্র মহাশয়াকে রমেশ-ভবন সমিতির সহিত একযোগে এক সান্ধ্য-সম্মিলনে সংবর্দ্ধনা করা হয়। পরিষদের পক্ষে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এবং রমেশ-ভবন সমিতির পক্ষে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় শ্রীযুক্তা লেডী প্রতিমা মিত্র মহাশয়াকে অভিনন্দিত করেন। এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এবং কার্য্য পরিদর্শনাদির জন্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার

মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই সান্ধ্য সম্মিলন উপলক্ষে ভারতী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের নৃত্য ও গীত হইয়াছিল এবং জলযোগের আয়োজন করা হইয়াছিল।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

ভারত-গৌরব আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বিয়োগ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসে আলোচ্য বর্ষে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি ১৩২৩।২৪।২৫ বঙ্গাব্দে পরিষদের সভাপতি ছিলেন, এবং ১৩০৭, ১৩২৬, ১৩২৮ বঙ্গাব্দে সহকারী সভাপতিরূপে তিনি পরিষদের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি যখন সভাপতি ছিলেন, সেই সময় পরিষদের নানা বিষয়ে উন্নতি সাধনের মধ্যে পরিষদে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা লোকশিক্ষার্থ বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার প্রবর্ত্তন করেন। পরিষৎকে তিনি কি ভাবে দেখিতেন, তাহা তিনি তাঁহার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে স্পষ্টতঃ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে সেই অভিভাষণের একাংশ উদ্ধৃত হইল।—

"সেই আমাদের সৃজনশক্তিরই একটি চেষ্টা বাঙ্গালা সাহিত্য-পরিষদে আজ সফল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষৎকে আমরা কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। অন্তর-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য-পরিষৎ সাধকদের সম্মুখে দেবমন্দিররূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাঙ্গালা দেশের মর্ম্মস্থলে স্থাপিত এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবনস্তর দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের সর্ব্বপ্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি এবং আমাদের হৃদয়-উদ্যানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহারস্বরূপে দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি।"

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র শেষ উইল করিবার সময়ে পরিষৎকে ভুলেন নাই। পরিষদের বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার সৌকর্য্যার্থে পরিভাষা প্রণয়নের জন্য তিনি পরিষৎকে তিন হাজার টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট বিশেষরূপ সাহায্য প্রাপ্তির ভরসা পাইয়াছেন। বহুদিন হইতে পরিষদ্ মন্দির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা, পুস্তকাদির সংরক্ষণের উপযুক্ত আধারাদির অভাবের কথা এবং রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ করিবার জন্য অর্থাভাবের কথা কার্য্যবিবরণে বর্ষের পর বর্ষে উল্লেখ করা হইয়াছে। বঙ্গীয় রাজসরকারকে আলোচ্য বর্ষে এই সকল অভাবের বিষয় জানাইয়া তাহার জন্য অর্থ সাহায্য চাওয়া হইয়াছিল। অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বঙ্গীয় রাজসরকার পরিষদের উক্ত আবেদনের ফলে (ক) রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ করিবার জন্য, (খ) পরিষদ্ মন্দির সংস্কার

করিবার জন্য, এবং (গ) আসবাব আদি প্রস্তুত করিবার জন্য ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা দানের ব্যবস্থা বাজেটভুক্ত করিয়াছেন। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষ মধ্যেই এই টাকা হস্তগত হইবে।

বঙ্গীয় রাজসরকার পরিষৎকে গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বহুদিন হইতে বার্ষিক ১২০০৲ টাকা দান করিয়া আসিতেছিলেন। সরকারের বিগত ব্যয়-সঙ্কোচ-নীতির ফলে গত বর্ষ পর্য্যন্ত পরিষৎকে ঐ টাকার শতকরা ১০৲ হারে বাদ দিয়া ১০৮০৲ দেওয়া হইত। আলোচ্য বর্ষ হইতে রাজসরকার পরিষদের পক্ষে উক্ত ব্যয়-সঙ্কোচ-নীতি প্রত্যাহার করিয়া বার্ষিক ১২০০৲ দানের আদেশ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আমাদের অন্যতম সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অনুরোধে বঙ্গীয় রাজসরকার গ্রন্থপ্রকাশের জন্য তিন বৎসর (১৯৩৭-৩৮, ১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৩৯-৪০) পরিষৎকে উক্ত ১২০০৲ টাকার সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবার আদেশ দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব স্থায়ী আদেশ, ১২০০৲ টাকার দ্বিগুণ ২৪০০৲ ব্যয় করিতে পরিষৎ বাধ্য।

পরিষৎ বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এবং সহৃদয় মন্ত্রিগণের নিকট এই সকল আদেশের জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র

১২৪৫ বঙ্গাব্দে আষাঢ় মাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হইল। এই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্গের নানা স্থানে ও বঙ্গের বাহিরে নানা স্থানে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণোৎসব করিবার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল—

(১) আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-বার্ষিক-উৎসব পাইকপাড়া রাজবাটীর সহযোগিতায় উক্ত রাজবাটীতে বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই উৎসবের জন্য যে বিপুল ব্যয় হইয়াছে, তাহা পাইকপাড়ার কুমার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ স্বয়ং বহন করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

(২) বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে এবং বঙ্গের বাহিরে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসবের জন্য পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদকের স্বাক্ষরে অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করা হয়। তাহার ফলে বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের যে বৈঠকখানাটি আছে—যেখানে বসিয়া তিনি তাঁহার যুগান্তরকারী সাহিত্যসাধনা করিতেন—তাহা অতি জীর্ণ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে। উহার ½ অংশের মালিক বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম দৌহিত্র এডভোকেট

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ¼ অংশের মালিক কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন। এই সম্মেলন বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত ত্রিচতুর্থাংশ, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য তিন জন দৌহিত্রের নিকট খরিদ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার অংশ সম্প্রতি পরিষদ্‌কে দান করিয়া দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন তাঁহাদের সকল স্বত্ব পরিষদ্‌কে দান করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্য অনুসারে দানপত্র রেজেষ্টারী করিয়া দিয়াছেন। এই বৈঠকখানাটির বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়। প্রচুর অর্থ ব্যয় না করিলে ইহার সংস্কারসাধন সম্ভব নহে। গত ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-বার্ষিক সভায় এই বিষয় উপলব্ধি করিয়া এডভোকেট শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় ১০০৲ টাকা সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন এবং পরিষদ্‌কে এই বৈঠকখানাটি সংরক্ষণের জন্য ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। এই দানের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয়ও ২০৲ সাহায্য পাঠাইয়াছেন। দেশবাসী বাঙ্গালীর পুণ্যতীর্থ সংস্কার করিবার জন্য মুক্তহস্ত হইবেন—ইহা আমরা সাগ্রহে আশা করি।

(৪) পরিষৎ বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিনের সময় বর্ত্তমান বর্ষের ১০।১১।১২ই আষাঢ় দিবসত্রয় বঙ্কিম উৎসব করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন এবং ঐ দিবসত্রয় সসমারোহে উক্ত উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবের বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

(৫) বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র গ্রন্থের জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। এই সঙ্কল্পের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এই সংস্করণে থাকিবে (১) বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত পুস্তকগুলি, (২) তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থ, এবং (৩) অপ্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধাদি ও চিঠিপত্র। গ্রন্থের সাধারণ ভূমিকা লিখিবেন—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা লিখিবেন—স্যর্ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এবং গ্রন্থ সম্পাদন করিবেন—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস। এই বিষয়ে বিস্তৃত অনুষ্ঠানপত্র সদস্যগণের নিকট পূর্ব্বেই বিতরিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই চারিখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, অন্য একখানি প্রায় শেষ হইয়া আসিল এবং এক মাসের মধ্যে আরও দুইখানি মুদ্রিত হইবে। অপর খণ্ডগুলি পর পর প্রকাশিত হইবে।

ঝাড়গ্রামরাজ

আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ প্রকাশ সম্পর্কে আর একটি আনন্দের সংবাদ জানাইতেছি। ঝাড়গ্রামরাজ কুমার শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর পরিষদ্ কর্ত্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশের সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া এবং পরিষৎ এ পর্য্যন্ত যে সকল মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ সম্যক্ আলোচনা করিয়া, উনবিংশ শতকের এবং

তৎপরবর্ত্তী যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশে পরিষদের হস্তে ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা দান করিয়া একটি ভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব করেন। আলোচ্য বর্ষে এই দান সম্পর্কে সর্ত্তাদির আলোচনার পর কুমার বাহাদুরের প্রস্তাব কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান বর্ষে গত ১১ই মে তারিখে এই দান পাওয়া গিয়াছে। কুমার বাহাদুরের অভিপ্রায় অনুসারে প্রথমেই এই ভাণ্ডারের অর্থ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ প্রকাশের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। পরে এই তহবিল হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হইবে, ঝাড়গ্রাম-রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বি. আর. সেনের প্রস্তাবে তাহাই স্থির হইয়াছে। কুমার বাহাদুরের উক্ত পত্রে পরিষদের এই গ্রন্থপ্রকাশের বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধার নিদর্শন পরিস্ফুট হইয়াছে। লালগোলার মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের পরে গ্রন্থপ্রকাশের জন্য পরিষৎকে এত টাকা কেহ দান করেন নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং বঙ্গ-সাহিত্যামোদিগণ কুমার বাহাদুরের নিকট এই জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় জ্ঞাপন করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। মেদিনীপুরবাসিগণ কর্ত্তৃক বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী প্রকাশের বিষয়ে শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন আই. সি. এস. মহাশয়ের উদ্যম ও চেষ্টার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী প্রকাশ বিষয়ে তিনি তদনুরূপ আগ্রহান্বিত হইয়া ঝাড়গ্রামরাজকে এই কার্য্যে উৎসাহিত করেন। সৎসাহিত্য-প্রকাশে শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের এই আগ্রহ ও চেষ্টা দেশবাসী সকলেই এবং পরিষৎ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। পরিষৎ তাঁহাকে এই সূত্রে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

১০০০০৲ দানের জন্য পরিষদের নিয়মানুসারে ঝাড়গ্রামরাজ পরিষদের "বান্ধব" শ্রেণী-ভুক্ত হইলেন। অদ্য তাহা বিজ্ঞাপিত হইল।

কার্য্যালয়

নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন—সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; সহকারী সভাপতিগণ—স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, ইনি সম্পাদক নির্ব্বাচিত হওয়ায় ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ; সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ইনি পদত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু; সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, ইনি বর্ষশেষে পদত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত

জিতেন্দ্রনাথ বসু; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী, ইনি বর্ষারম্ভেই পদত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন—

(ক) মূল পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

১। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ৩। শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়, ৪। ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, ৫। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, ৬। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ইনি বর্ষারম্ভে গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, ৮। শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন, ৯। রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত এ. দোঁতেন, ১০। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ, ১১। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ১২। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, ১৩। শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী, ১৪। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, ১৫। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, ১৬। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ১৭। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, ১৮। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, ১৯। শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত।

(খ) শাখা-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২২। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী,

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

২৬। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৭। ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বারোটি সাধারণ ও দুইটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং সার্কুলার দ্বারা একবার সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হইয়াছিল। সাধারণ কার্য্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল—

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী-পদক সমিতিতে শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

২। নিম্নলিখিত সদস্যগণকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পরিচালন-সমিতিতে সভ্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল,—(১) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, (২) শ্রীযুক্ত রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, (৩) শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, (৪) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, (৫) শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়।

৩। নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল,—(ক) দিল্লীর

সাহিত্য-সম্মিলন—কৃষ্ণনগরে ২১শ অধিবেশন, (ঘ) মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের রজতজয়ন্তী উৎসব, (ঙ) রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক উৎসব ও সাহিত্য-সম্মিলন এবং বঙ্কিম ও দিব্যস্মৃতি-উৎসব, (চ) কাঁথি বঙ্কিম-উৎসব ও শাখা-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা উৎসব।

৪। নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানের প্রদর্শনীতে পরিষদের দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল,—(ক) বীরসিংহে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-উৎসব সংক্রান্ত প্রদর্শনীতে, (খ) প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে, (গ) মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (ঘ) কাঁথিতে বঙ্কিম-উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (ঙ) বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন ছাত্রগণের সম্মিলনে, (চ) রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর বার্ষিক অধিবেশন সংক্রান্ত প্রদর্শনীতে, (ছ) চন্দননগর বঙ্কিম-উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে।

৫। নিম্নলিখিত শাখা ও সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল, (ক) সাহিত্য-শাখা, (খ) ইতিহাস-শাখা, (গ) দর্শন-শাখা, (ঘ) বিজ্ঞান-শাখা, (ঙ) আয়-ব্যয় সমিতি, (চ) পুস্তকালয়-সমিতি, (ছ) ছাপাখানা-সমিতি, (জ) চিত্রশালা-সমিতি, (ঝ) প্রচার-শাখা, (ঞ) পরিষদ্-মন্দির-সংরক্ষণ-সমিতি, (ট) নিয়মাবলী-সমিতি, (ঠ) বানান-সমিতি, (ড) হিসাব-পরিদর্শন-সমিতি, (ঢ) শাখা-পরিষৎ নির্ব্বাচন-সমিতি, (ণ) প্রাচীন মুদ্রা গণনা সমিতি, (ত) কর্ম্মচারিগণের ছুটী নির্দ্ধারণ সমিতি, (থ) পরিষদ্গ্রন্থাবলী বিক্রয় সমিতি, (দ) পাইকপাড়া রাজবাড়ী বঙ্কিম-উৎসব সমিতি, (ধ) বঙ্কিম-উৎসব সমিতি, (ন) বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিক জন্মোৎসব সমিতি, (প) বঙ্কিম শতবার্ষিক-সমিতি, (ফ) ঝাড়-গ্রামরাজ গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, (ব) পরিষৎ-সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ সমিতি, (ভ) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি।

৬। প্রতি বাংলা মাসের প্রথম বুধবারে পরিষদের মাসিক অধিবেশন হইবে।

৭। পরিষদের চিত্রশালা মিউজিয়াম এসোসিয়েশনের সভ্য হইবে।

৮। পরিষদের সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে ভার অর্পিত হইয়াছে।

৯। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শত-বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

১০। "কুরল" গ্রন্থ প্রকাশে শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয়ের যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, ঐ গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া অগ্রে তাঁহাকে উক্ত অর্থ দিতে হইবে।

১১। কলিকাতার ইটালি অঞ্চলের কোন এক অখ্যাত রাস্তার নাম বঙ্কিমচন্দ্রের নামে পরিবর্ত্তিত করিবার বিষয়ে কলিকাতা করপোরেশনের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা হয় এবং কলেজ ষ্ট্রীটের নাম 'বঙ্কিমচন্দ্র রোড' করিবার প্রস্তাব করা হয়।

১২। ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তৎস্থলে অন্য নাম প্রবর্ত্তনের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা হয়।

১৩। বঙ্গভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযুক্ত এবং এই ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের বিষয়ে মন্তব্য গৃহীত হয়।

রমেশ-ভবন

আনন্দের সহিত জানান যাইতেছে যে, আলোচ্য বর্ষে পরিষদের চিত্রশালা রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই দ্বিতল নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে উহার নিম্ন তলের আমূল সংস্কার সাধিত হইয়াছে। উহার দরজা জানালা লাগান এবং বৈদ্যুতিক আলো পাখার পয়েন্ট লাগান হইয়াছে এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ লওয়া হইয়াছে। প্রয়োজন মত সাময়িক ভাবে পাখা ও আলো ভাড়া করিয়া উহার দ্বিতলের হলে কয়েকটি উৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়াছে। কিন্তু এখনও কণ্ট্রাক্টারের দেনা মিটাইতে পারা যায় নাই। নিম্ন তলে চিত্রশালার দ্রব্যাদি সংরক্ষণের ও সাজাইবার জন্য উপযুক্ত আধারের ব্যবস্থা করিতে ও দ্বিতলের জন্য আসবাব প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে এবং পাখা ও আলো খরিদ করিতে কিঞ্চিদধিক ৫০০০৲ এখনও আবশ্যক। এই টাকার সম্বন্ধে 'বঙ্গীয় রাজ-সরকার' শিরোনামে অন্যত্র বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামানুসারে এই চিত্রশালার নামকরণ হয়। রমেশ-ভবন নির্ম্মিত হইবার পর অর্থাভাবে বহুদিন পর্য্যন্ত উহার দ্বিতল নির্ম্মাণের কোন আয়োজনই করিতে পারা যায় নাই। এই অবস্থায় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে পরিষদের প্রচার-শাখার কতিপয় সভ্যের অনুরোধে রমেশচন্দ্রের দৌহিত্রী শ্রীযুক্তা লেডী প্রতিমা মিত্র মহাশয়া নবগঠিত রমেশ-ভবন সমিতির সভানেত্রীরূপে উদ্যোগী হইয়া রমেশ-ভবনটি সম্পূর্ণ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া দ্বিতল নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। এই কার্য্যে সমিতির কোষাধ্যক্ষ মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় এবং ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার মহাশয় যথোচিত সাহায্য করেন। ইঁহারা সকলেই এবং রমেশ-ভবন সমিতি পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন।

রমেশ-ভবনে প্রদর্শনের ও সংরক্ষণের আধারগুলি প্রস্তুত হইলে সংগৃহীত দ্রব্যগুলি সাজাইতে পারা যাইবে। আলোচ্য বর্ষে নূতন দ্রব্য সংগ্রহের বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই; তথাপি নিম্নলিখিত শ্রেণীর দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে—প্রাচীন দেবমন্দিরের ইষ্টক, প্রাচীন স্থানের ফটো, সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি, প্রাচীন সাহিত্যিকের চিত্র এবং ব্যবহৃত দ্রব্যাদি। তন্মধ্যে স্বর্গীয়া কবি তরু দত্তের ব্যবহৃত দ্রব্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইগুলি বিলাত হইতে শ্রীযুক্ত হরিহর দাস বি. লিট., মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ পরিষদের পুথিশালায় নিম্নলিখিত পুথিগুলি উপহার দিয়াছেন,—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় ২ খানি, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বিশ্বাস ৪ খানি এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ ২ খানি। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত পুথির মধ্য হইতে বাছিয়া উদ্ধার করা হয় ৪১ খানি। মোট ৪৯ খানি পুথির মধ্যে ৩ খানি মুদ্রিত পুথি বাদে অবশিষ্ট ৪৬ খানির মধ্যে বাঙ্গালা ৯ খানি এবং সংস্কৃত ৩৭ খানি তালিকাভুক্ত করিয়া আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রকার পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে—

বাঙ্গালা	...	৩১৯০
সংস্কৃত	...	২১৬৬
তিব্বতী	...	২৪৪
ফার্সী	...	১৩
অসমীয়া	...	৩
ওড়িয়া	...	৪
হিন্দী	...	২
		৫৬২২

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত বাঙ্গালা পুথির তালিকার মুদ্রণ-কার্য্য কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে এবং ইহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

অর্থাভাববশতঃ আলোচ্য বর্ষেও পুথিগুলিতে পাটা ও খেরো লাগাইতে পারা যায় নাই। এ জন্য অনেক পুথির ক্ষতি হইবার আশঙ্কা ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

গ্রন্থাগার

বর্ষারম্ভে সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাগারে ৪০৮৬৪ খানি পুস্তক ও পত্রিকা ছিল। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৮৫৮ খানি নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পরিষদের হিতৈষিবর্গের নিকট হইতে ৬৪১ খানি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ২১৭ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। অতএব বর্ষশেষে পরিষদের পুস্তকসংখ্যা ৪১৭২২ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক ও পত্রিকাদি উপহার অথবা বিনিময়ে গ্রন্থাদি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য।—

১। Supdt., Government Printing, Bengal, ২। Manager of Publications, Delhi, ৩। Secretary, Simthsonian Institution, ৪। Registrar,

Calcutta University, ৫। Director, Geological Survey of India, ৬। Supdt., Government Museum, Egmore, Madras, ৭। Supdt., Central Museum, Lahore, ৮। Manager, Gita Press, Gorakhpur, ৯। Librarian, Bengal Library, ১০। Royal Asiatic Society, China Branch, ১১। Director of Industries, Bengal ১২। School of Oriental Studies, London, ১৩। Secy. Gaudiya Math.

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য।—

প্রদাতা	পুস্তকাদি
শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু	১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
" জয়দেব ঘোষ	১। Institute of Hindu Law, 1794
" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১। Dictionary in English and Bengali By Ramcomal Sen Vol I, 1834
" সজনীকান্ত দাস	১। শব্দকল্পদ্রুমঃ, ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ১৭৪৯ শকাব্দ
" নারায়ণচন্দ্র মৈত্র	১। Hitopadesa
" ভূপেন্দ্রকুমার বসু	১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১ম-৯ম অধ্যায়
	২। ঐ ১০ম-১৮শ অধ্যায়
	৩। Hitopadesa, 1847
	৪। Johnson's Dictionary, 1856
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১। কিঞ্চিৎ জলযোগ
	২। হিন্দু পেট্রিয়ট-সম্পাদক মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন।
	৩। ভারতবর্ষীয় সভা, ২৩শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, ১৮৭৫।
" রাজেন্দ্রনাথ রায়	১। History of Serampore Mission Vol I
	২। Do Vol II

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১১৮ খানি পুস্তক, ৺কামিনী রায়ের পুত্রগণ একটী আলমারী সমেত ১৩৭ খানি পুস্তক, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'মহাকোষ' প্রত্যেক খণ্ড, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ, ২য় সং' প্রত্যেক খণ্ড এবং রঞ্জন পাবলিশিং হাউস 'দুষ্প্রাপ্য

ক্রীত পুস্তকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতকগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

১। রামরসায়ন, ১ম—৫ম খণ্ড (রঘুনন্দন)

২। সংবাদ প্রভাকর—১৮৫৫

৩। History of Europe By Sir Archibald Alison in 12 vols (1840)

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে নিম্নোক্তসংখ্যক সাময়িক পত্রিকাগুলি পাওয়া গিয়াছিল,—১। দৈনিক—৬, ২। সাপ্তাহিক—২৮, ৩। পাক্ষিক—৩, ৪। মাসিক—৬৩, ৫। দ্বৈমাসিক—২৫, ৬। ত্রৈমাসিক—১০।

আলোচ্য বর্ষে তালিকা-মুদ্রণের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। সাধারণ গ্রন্থাগারের ও দুষ্প্রাপ্য বাঙ্গালা গ্রন্থের তালিকা একপ্রকার শেষ হইয়াছে। এই সকল তালিকা সত্বর প্রকাশ করা প্রয়োজন। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা সম্ভব হইতেছে না।

কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও পুস্তক ক্রয়ের জন্য ৬৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়া পরিষৎকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।

গ্রন্থপ্রকাশ

সঙ্কলিত গ্রন্থপ্রকাশের কার্য্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে :—

(ক) সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ। গ্রন্থসম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বর্ষে জানান হইয়াছিল যে, এই গ্রন্থের ১ম সংস্করণ চারি বৎসর মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায় এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে বহু নূতন তথ্য ও টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করিয়া সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছেন। পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও তিনি গ্রন্থের সর্ব্ব-স্বত্ব এবং সম্পাদকীয় পারিশ্রমিক হিসাবে তাঁহার প্রাপ্য ২৮৮৲ পরিষৎকে দান করিয়া পরিষৎকে উপকৃত করিয়াছেন। গ্রন্থের মুদ্রণব্যয় লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ ২৪০ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছিল, এই নব সংস্করণ ৫৮০ পৃষ্ঠায় শেষ হইল।

(খ) কবি রামদাস আদক-বিরচিত অনাদি-মঙ্গল বা শ্রীধর্ম্মপুরাণ। গ্রন্থসম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। মূল গ্রন্থ, ভূমিকা, শব্দসূচী ও সুভাষিতাবলী সমেত ৩০৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। এই গ্রন্থও লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে প্রকাশিত হইল।

এতদ্ব্যতীত (ক) ন্যায়দর্শন, ১ম খণ্ড নিঃশেষিত হওয়ায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ইহার ২৩২ পৃঃ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থসম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় গ্রন্থখানিকে অধিকতর উপযোগী করিবার জন্য বহু নূতন বিষয় সংযোজন করিয়াছেন।

(খ) বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ গ্রন্থের মুদ্রণ ধীরে ধীরে চলিতেছে। গ্রন্থসম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

(গ) রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান গ্রন্থ মুদ্রণের কার্য্য উহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে মহাশয়ের দীর্ঘকাল অসুস্থতার জন্য আলোচ্য বর্ষে অগ্রসর হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে 'বঙ্কিমজীবনীর খসড়া' নামক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের কর্ম্মময় এবং বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের মূল উপাদানগুলি সংগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস এই গ্রন্থ সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রন্থস্বত্ব সম্পাদকগণের থাকিবে। অতি সত্বর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

এতদ্ব্যতীত ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখকগণের গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে পরিষৎ হইতে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা 'বঙ্কিমচন্দ্র' এবং 'ঝাড়গ্রামরাজ' শিরোনামে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' প্রকাশ সম্বন্ধে সংবাদ "আচার্য্য জগদীশচন্দ্র" বসু শিরোনামে বিবৃত হইয়াছে।

গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট ১০৮০৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের সুদ ৪৫৫৲ ও ঐ তহবিলের অর্থে প্রকাশিত গ্রন্থ বিক্রয়দ্বারা ২১৫৲ মোট ৬৭০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ প্রকাশের সাহায্য এবং কিছু চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চারি সংখ্যা—১ম ও ২য় সংখ্যা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এবং ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির শ্রেণীভেদ এইরূপ—

(ক) প্রাচীন সাহিত্য—১। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলী, ২। কবি পীতাম্বর মিত্র ও জনমেজয় মিত্র, ৩। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ৪। ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ ষ্টুয়ার্ট, ৫। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য (প্রথম বাঙ্গালী সাংবাদিক), লেখক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। গৌড়েশ্বরের আদেশে রচিত বিদ্যাসুন্দর, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ৭। চণ্ডীদাস (আলোচনা), শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, ৮। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। বৌদ্ধ অপদান, ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, ১০। সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ১১। সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(খ) ইতিহাস—১। মল্লসারুলে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসন, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার, ২। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের বয়স, ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

(গ) বিজ্ঞান—১। হিন্দু জ্যোতিষে শককাল, ডাঃ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত, ২। হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল।

অর্থাভাবে পত্রিকার সহিত পরিষদের কোন কার্য্যবিবরণই প্রকাশ করিতে পারা যায় নাই। বর্ত্তমান বর্ষ হইতে সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা

আলোচ্য বর্ষে প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাহিত্য বিভাগের প্রবন্ধ-সংখ্যাই বেশী হইয়াছিল বলিয়া সাহিত্য-শাখার ৭টি অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস বিভাগে ১টি; দর্শন বিভাগে ১টি এবং বিজ্ঞান বিভাগে ৩টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে মাসিক অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকায় প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে ডক্টর শ্রীযুক্ত স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যতীর্থ এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন।

শাখা-পরিষৎ

পরিষদের মফস্বলের শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর-শাখার পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় রজত-জয়ন্তী উৎসবের যে বিপুল আয়োজন হইয়াছিল, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমগ্র মেদিনীপুরবাসী, কি সরকারী, কি বেসরকারী, সকল শ্রেণীর নগরবাসী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয় শাখার কর্ম্মিবৃন্দের সহিত একযোগে যেরূপ উদ্যমের সহিত এই অনুষ্ঠানের সফলতা সম্পাদনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। এই উৎসব সপ্তাহ কাল ধরিয়া চলিয়াছিল। বিরাট্ প্রদর্শনী, লোকশিক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা, নানা স্থান হইতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের সমাবেশ এবং তাঁহাদের বক্তৃতা ও প্রবন্ধপাঠের ব্যবস্থা এবং প্রচুর লোকরঞ্জক আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই জয়ন্তী উৎসবের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি-উৎসবও যথোচিত আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে মেদিনীপুরবাসিগণ যে স্থায়ী এবং মহান্ কার্য্যের সূচনা করিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। মেদিনীপুরের

গ্রন্থাবলীর একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের এবং মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণের ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এই সকল কার্য্যের উদ্দেশ্যে বহু সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীর এক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মূল পরিষৎ মেদিনীপুর-শাখার এই কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় বিশেষ গৌরব অনুভব করিতেছেন। এই সম্পর্কে আর একটি শুভ সংবাদ এই যে, মেদিনীপুরের কাঁথি শহরে পরিষদের একটি নূতন শাখা স্থাপিত হইয়াছে। সেখানেও কর্ম্মীর অভাব নাই। তাঁহারা শাখা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম-উৎসব সম্পন্ন করিবার যে বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূল পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় উক্ত উভয় ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সাহিত্য-সম্মিলনে এবং বঙ্কিম-উৎসবে মূল পরিষদের সভাপতি, সভাপতিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ত্রিপুরা-শাখা কুমিল্লায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। বিভিন্ন শাখার কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ হইল। আলোচ্য বর্ষে শিলং ও শিলচরে পরিষদের শাখা স্থাপনের প্রস্তাব আসিয়াছে। এই সকল প্রস্তাব এক্ষণে বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষের ২৯এ মাঘ, ১লা ও ২রা ফাল্গুন কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের একবিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণনগর রাজবাটীর নাট-মন্দিরে সম্মিলনের অধিবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বিংশ অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। মূল সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত সাহিত্য-শাখার, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী কথা-সাহিত্য-শাখার, শ্রীযুক্তা অর্পণা দেবী পদাবলী-শাখার, ডক্টর শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য দর্শন-শাখার, ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থনীতি-শাখার, ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ইতিহাস-শাখার, ডক্টর কুদরতি এ খোদা বিজ্ঞান-শাখার, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস কাব্য-সাহিত্য-শাখার, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সাংবাদিক-সাহিত্য-শাখার, এবং শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় চারু-কলা-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ ব্যতীত সম্মিলনের নিয়মাবলীর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। মূল পরিষদের সম্পাদক, সম্মিলনের অন্যতম সম্পাদক এবং পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৫ জন সভ্য সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ২০শ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ চন্দননগর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্মিলনের ২২শ অধিবেশন কুমিল্লায় আহূত হইয়াছে।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। পরিষৎ কলিকাতা করপোরেশনের নিকট এই জন্য বিশেষ ঋণী। গত পূর্ব্ব বৎসরে করপোরেশনের শাখা-সমিতি পরিষদের মন্দির নির্ম্মাণাদির জন্য ৬০০০৲ টাকা সাহায্য দানের বিষয় বজেটভুক্ত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ টাকা পাওয়া যায় নাই। পরিষৎ আশা করেন যে, বর্ত্তমান বর্ষে ঐ টাকা পুনরায় করপোরেশনের বজেটে যেন ধরা হয়।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম সর্ত্তানুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও পুস্তকালয় এবং চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল

এই অনুসন্ধান তহবিলের অর্থে গত বৎসরের বিজ্ঞাপন অনুসারে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় আলোচ্য বর্ষের ৯ই আশ্বিন 'সিন্ধুসভ্যতা' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার বক্তৃতার বিষয় পরিস্ফুট করেন। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় গত ২০এ চৈত্র তারিখে বঙ্গভাষার ঐতিহাসিকতা বিষয়ক 'বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগ' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। তিনি এই বিষয়ে আরও দুইটি বক্তৃতা দিবেন। শ্রীযুক্ত ননীগোপালবাবু এবং শ্রীযুক্ত সজনীবাবু তাঁহাদের প্রত্যেকের দক্ষিণার ২০০৲ পরিষদের সাধারণ তহবিলে দান করিয়া পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়াছেন।

স্মৃতিরক্ষা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে,—

১। রাধানাথ সিকদার—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহার তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া দান করিয়াছেন।

২। তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়—পুত্র ৺শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইঁহার এক তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া দান করিয়াছেন।

৩। ৺কামিনী রায়—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় তৈলচিত্র দান করিয়াছেন।

৪। ৺ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়—'জন্মভূমি'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ইঁহার একখানি ব্রোমাইড চিত্র দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এক তৈলচিত্র দান করিয়াছেন। এই চিত্র অদ্য বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইবে। মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর কর্ত্তৃপক্ষ ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এক চিত্র দান করিয়াছেন। এই চিত্রও অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই উভয় চিত্র ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের বিশেষ অনুরোধে ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের এক তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া দান করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সত্বরেই এই চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে।

(ক) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের এবং (খ) ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার সঙ্কল্প আলোচ্য বর্ষে গৃহীত হইয়াছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতি-সমিতির নিকট হইতে ঐ সমিতির সম্পূর্ণ হিসাব না পাওয়ায় স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্যকারিগণের নাম প্রভৃতি প্রকাশ করিতে পারা যাইতেছে না। এই বিষয়ে স্মৃতি-সমিতির সম্পাদকের সহিত পত্রব্যবহার চলিতেছে।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে যে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে মাসিক অর্থ সাহায্য করা হইত, তন্মধ্যে এক জনের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। তাঁহার চিকিৎসার জন্য অগ্রিম ৫ মাসের টাকা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে এক জন দুঃস্থ সাহিত্যিকের দুঃস্থা কন্যাকে মাসিক সাহায্য করা হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে মাত্র তিন জনকে এই ভাণ্ডার হইতে সাহায্য করা হয়। প্রধানতঃ ৺পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত টাকার সুদ হইতেই এই সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য অনেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং এই ভাণ্ডারের জন্য প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে।

পদক ও পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে ঢাকার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন অনুসারে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲) দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন

পরিষদ্ মন্দির

পরিষদ্ মন্দির সংস্কারের ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষে করিতে পারা যায় নাই, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে পরিষদের আবেদনের ফলে বঙ্গীয় রাজসরকার যে অর্থসাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। ১৩৪৫ সালে এ সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে—আশা করা যায়।

বিশেষ বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা, এবং পরিষৎ-পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল,—

১। গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান।

২। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য প্রাপ্তি।

৩। কলিকাতা করপোরেশনের দান—গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয়ের জন্য।

৪। সাধারণ তহবিলে দান।

৫। গ্রন্থপ্রকাশের জন্য দান।

৬। দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান।

৭। প্রতিষ্ঠা-উৎসবে ও সংবর্দ্ধনার জন্য দান।

৮। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে দান।

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত পরিষদের কার্য্যালয়-সংক্রান্ত কার্য্যের সাহায্যের জন্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু ও ৺ভূতনাথ দাস মহাশয়, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্যাদি দান করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষের উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) হইতে পরিষদের আর্থিক অবস্থার বিষয় সম্যক্ জানা যাইবে। বৎসরের পর বৎসর পরিষদের নানা অভাব জ্ঞাপন ও তাহার প্রতিকারের জন্য সদস্যগণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা জানান হইতেছে। কিন্তু আশানুরূপ এবং পরিষদের প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। তাহার ফলে পরিষদের অনেক অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন ও কোন নূতন প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হইতেছে না। সুখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে যে সকল অর্থপ্রাপ্তির ভরসা ও সূচনা হইয়াছে,

তাহা সফল হইলে পরিষৎ নূতন উদ্যমে কর্ত্তব্যপথে অধিকতর অগ্রসর হইবার অবকাশ পাইবে। বঙ্গীয় রাজসরকারের দান, ঝাড়গ্রাম রাজের দান *, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের দান, এবং 'চিত্রা' বায়স্কোপ কোম্পানীর প্রস্তাবিত সাহায্য-রজনী হইতে সাহায্য-প্রাপ্তি সত্বরই ঘটিবে, ইহা সাগ্রহে আশা করিতেছি। পরিষদের দেনা মিটাইবার উদ্দেশ্যে শেষোক্ত স্থানে সাহায্য রজনীর ব্যবস্থা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতেছেন এবং চিত্রার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বি. এন. সরকার এ বিষয়ে বিশেষ ভরসা দিয়াছেন। পরিষদের সভাপতি মহাশয়, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বে পরিষদের দেনা মিটাইতে যে অর্থ ধার দিয়াছিলেন, আলোচ্য বর্ষে তাঁহারা তাঁহাদের সেই দাবী ত্যাগ করিয়া পরিষৎকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়গণ নগদ টাকা দান করিয়াও পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। অন্যতম আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত হিসাব পরীক্ষা করিয়া উহা নির্ভুল বলিয়াছেন।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা পরিষদের প্রত্যেক সহৃদয় সদস্য, অনুগ্রাহক ও মঙ্গলকামীকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা পরিষদের প্রাণস্বরূপ—তাঁহাদের অনুকম্পাতেই পরিষৎ এতাবৎকাল যথাসম্ভব সুষ্ঠুরূপে নিজকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছে। পরিষৎ এ প্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান—দেশবাসীর সহানুভূতির উপর অন্য কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইহা অপেক্ষা অধিক দাবী করিতে পারে না। ইহার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিলে আমাদের জাতীয়তার মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বৎসরের পর বৎসর ইহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তারলাভ করিয়াছে এবং ইহার দায়িত্বও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তদনুপাতে ইহার আয় বৃদ্ধি হয় নাই—এমন কি, অনেক সদস্য সময়মত তাঁহাদের দেয় চাঁদা পর্য্যন্ত প্রদান করিতে কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ফলে ইহা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া যাঁহাদের উপর ইহার পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই ইহার উন্নতিকল্পে পরিশ্রম করিতে কাতর নহেন। কিন্তু দেশবাসীর সহানুভূতি ও সহায়তা ব্যতিরেকে তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা অল্প। সুখের বিষয়, কতিপয় দানশীল মহাত্মা এই সঙ্কটকালে ইহাকে অর্থাদি-দানে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের কথা কার্য্যবিবরণীমধ্যে যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

---

* কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, ঝাড়গ্রামরাজের দান বর্ত্তমান বর্ষে পাওয়া গিয়াছে।

ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্যেক দেশবাসীরই এ বিষয়ে যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এই বৎসর আমরা সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিক জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়াছি। স্মরণ রাখিতে হইবে, তাঁহারই 'বঙ্গদর্শনে' মহামতি বীম্‌স্ সাহেব কর্ত্তৃক এই পরিষদের প্রথম পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি সেই মহাপুরুষের স্মৃতি প্রকৃতরূপে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানকে সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিমান্ করিয়া তুলুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৭ই শ্রাবণ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীমন্মথমোহন বসু
সম্পাদক

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
১৩৪৫

মুঘল ভারতের ইতিহাস

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট্

উপাদানের শ্রেণী-বিভাগ

মুঘল সাম্রাজ্যের শিল্প-কলা ও ধন-দৌলতের কথা আমরা সকলেই জানি; সে যুগের অট্টালিকা ও চিত্র আজিও জগতের চিত্ত বিমোহিত করিতেছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, ঐ যুগের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গৌরবের, আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কাজের দান হইতেছে ঐতিহাসিক সাহিত্যের অজস্র ও বিচিত্র ধারা। এগুলির অনুগ্রহে মধ্যযুগের ভারতের অবস্থা, সমাজ ও সভ্যতা আমরা এখনও যেমন অতি সূক্ষ্ম, অতি স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাই, অন্য যুগের পক্ষে তেমন সম্ভব নহে। এই সব ঐতিহাসিক উপাদান বিভিন্ন শ্রেণীর এবং সেগুলি একই ঘটনা বা রাজত্বকালের উপর নানা দিক্ হইতে আলোকপাত করে, একটি অপরটিকে সমালোচনা ও সংশোধন করিবার উপকরণ-স্বরূপ।

প্রথম শ্রেণী—আকবর হইতে বাহাদুর শাহ্ (অর্থাৎ প্রথম শাহ্ আলম) পর্য্যন্ত, ১৫৫৬ হইতে ১৭১০ পর্য্যন্ত, প্রত্যেক বাদশাহ্‌র দীর্ঘ ধারাবাহিক সরকারী ইতিহাস লিখিত হয়, যেমন 'আকবরনামা', 'পাদিশাহ্‌নামা', 'আলমগীরনামা' এবং 'বাহাদুরশাহ্‌নামা'। এই সঙ্গে জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীকেও ধরিতে হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী—বে-সরকারী ইতিহাস; এগুলি সরকারী কর্ম্মচারীদের দ্বারা লিখিত হইলেও, অফিশিয়াল্ হিষ্ট্রি অর্থাৎ সরকারী আজ্ঞায় দরবারে লিখিত এবং বাদশাহ্ বা উজীরের দ্বারা অনুমোদিত ইতিহাস হইতে ভিন্ন। এগুলির রচনা-প্রণালী স্বতন্ত্র এবং ঘটনা ও তারিখ অনেক কম। বড় কর্ম্মচারীদের জীবনচরিতও এই শ্রেণীতে আসে।

তৃতীয় শ্রেণী—এগুলিকে রীতিমত ইতিহাস বলা চলে না, খণ্ড ইতিহাস অথবা ইতিহাসের উপকরণ বলিলে অধিক সত্য হয়, যেমন দিন-লিপি (ডায়েরী), কোন সমর-অভিযানের সম্পূর্ণ রিপোর্ট, ইত্যাদি।

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী—ইতিহাসের কাঁচা মসলা, অথচ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য অমূল্য আধার, যেমন সমসাময়িক চিঠি এবং হাতে-লেখা খবরের কাগজ।

ষষ্ঠ শ্রেণী—শাসন সম্বন্ধে কাগজপত্র, চিঠি, আজ্ঞা, আয়ব্যয়ের বিবরণ, হিসাব ইত্যাদি।

এখন এই বিভিন্ন ধরণের ইতিহাসগুলির স্বরূপ আলোচনা করা যাউক। আকবরের আজ্ঞায় শেখ আবুল্-ফজ্ল্ 'আকবরনামা' লিখিয়া যে একটি সাহিত্যিক নমুনা শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে দিয়া যান, তাহাই দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী বাদশাহ্‌দের চরিতকারেরা অনুকরণ করেন। এই সরকারী ইতিহাসের এমন কয়েকটি চিহ্ন আছে, যাহা অন্য ধরণের ইতিহাসে নাই। (ক) এগুলি ঠিক বর্ষ ও তারিখ অনুসারে ঘটনা সাজাইয়া লিখিত, (খ) তারিখ, লোকের নাম ও স্থানের নাম এত বেশী দেওয়া হইয়াছে যে, অনেক স্থলে ঠিক আজকালকার পূজার ছুটির পূর্ব্বে কর্ম্মচারী-বদলের গেজেটের মত অপাঠ্য। (গ) কিন্তু প্রত্যেক ঘটনা অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করায় আমরা অনেক বিষয়ে সংবাদ পাই, তাহা ইতিহাস ভিন্ন অন্য কাজেও লাগে, যেমন জাতিতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি। (ঘ) এই শ্রেণীর বইগুলির সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মূল্য এই কারণে যে, ইহাদের ঘটনাবর্ণন ও তারিখগুলি একেবারে সত্য, এবং মূল আধার হইতে অবিকল উদ্ধৃত করা, অর্থাৎ মৌলিক ও সংগৃহীত গ্রন্থের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে, তাহাই আমার বর্ণিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পারসিক ইতিহাসের মধ্যে বিদ্যমান। এটা সহজে বুঝাইবার জন্য এই সরকারী ইতিহাসগুলি কিরূপে রচিত হইত, তাহার বিবরণ দিতেছি—

বাদশাহ্ কোন এক জন পারসিক ভাষায় সুলেখক বিখ্যাত পণ্ডিতকে বাছিয়া লইয়া তাঁহাকে সরকারী ঐতিহাসিক বা Historiographer Royal নিযুক্ত করিয়া আজ্ঞা দিতেন যে, আমার রাজ্যকালের একখানা চিরস্থায়ী ইতিহাস লেখ। সমস্ত সরকারী বিভাগের —বিশেষতঃ দপ্তরখানার কাগজপত্র তাঁহাকে দেখাইবার ও নকল করিবার অনুমতি দেওয়া হইত। প্রদেশে প্রদেশে আজ্ঞা যাইত যে, সেখানকার পুরাতন ইতিহাস, আর্থিক অবস্থা, প্রধান ঘটনা ইত্যাদি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাজধানীতে এই লেখকের নিকট পাঠাইতে হইবে। ঠিক যেমন স্যর্ উইলিয়ম হাণ্টার কর্ত্তৃক *Imperial Gazetteer of India* রচনার সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বন্দোবস্ত করেন। এই নির্ব্বাচিত লেখক মহাশয়ের প্রধান সম্বল হইল সেনাপতি ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা (সুবাদার)-দের প্রেরিত রিপোর্ট এবং তাঁহাদের শিবির ও করদ রাজাদের দরবার হইতে প্রেরিত সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক সংবাদপত্র। এই শেষোক্ত কাগজগুলি প্রথমে 'ফর্দ্দ-এ-ওয়াকেয়া' এবং পরে 'পারচা-এ-আখ্‌বার' অথবা আখ্‌বারাৎ নামে পরিচিত। এগুলি বাদশাহী দপ্তরে (বস্তাখানা বা রেকর্ড অফিসে) যত্নে রক্ষিত হইত। এই মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া লেখক মহাশয় মনোরম অথবা কাজের সংবাদগুলি তারিখসহ নকল করিয়া লইতেন। পরে তাহা হইতে

বাদশাহ, নিজ কর্মচারীদের যে পত্র (ফর্মান্) পাঠাইতেন, বাদশাহের আজ্ঞায় উজীর অন্য লোককে যে সব হুকুম পাঠাইতেন (হস্ব্-উল্-হুকম্, অর্থাৎ ঠিক আমাদের গেজেটে By order ইস্তিহারের মত, কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের নামে প্রেরিত)—এগুলির নকল ঐ কেন্দ্রীয় রেকর্ড অফিসে থাকিত ; রাজ-ঐতিহাসিক এগুলির মধ্যে কোন কোন দলিল হুবহু নিজ গ্রন্থে বসাইয়া দিতেন। এটা আমাদের পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক হইয়াছে ; কারণ, আমরা ইতিহাসের প্রথম শ্রেণীর উপকরণ অর্থাৎ সরকারী দলিল বা document এইরূপে অবিকৃত আকারে পাইয়াছি, আসল দলিলখানা হয়ত অনেক দিন হইল লোপ পাইয়াছে, এই নকল মাত্র রক্ষা পাইয়াছে। রাজ্যশাসন-পদ্ধতি, টেক্স, বিচার প্রভৃতি বিভাগ সম্বন্ধে অতি অমূল্য ফর্মান্ এইরূপে বাদশাহী সরকারী ইতিহাসের—বিশেষতঃ গুজরাতের শেষ মুঘল দেওয়ান-রচিত 'মিরাৎ-ই-আহমদী' নামক গ্রন্থের, মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

আবুল্-ফজ্ল্ এবং বাদাউনীর তুলনা

এই শ্রেণীর গ্রন্থের প্রবর্ত্তক শেখ আবুল-ফজ্ল্, তাঁহাকে এক জন পাদ্রী "আকবরের দ্বিতীয় আত্মা" নাম দিয়াছেন। আমরা আবুল-ফজলের ধর্ম্মমত, রাজসরকারে প্রতিপত্তি প্রভৃতির আলোচনা না করিয়া তাঁহার ঐতিহাসিক কীর্ত্তি অকীর্ত্তি আজ বিচার করিব। তাঁহার গ্রন্থগুলির মূল্য সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু অনেক সাহেব তাঁহাকে মিথ্যাবাদী চাটুকার বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখা যাউক, আবুল-ফজল যে আকবরকে ভক্তি করিতেন, তাহা কি তাঁহার ভণ্ডামি, অথবা অযোগ্য রাজার প্রতি সম্মান দেখান? তাঁহার গ্রন্থগুলি ভাল করিয়া পড়িলে তিনি যে আকবরকে সত্য সত্যই মহাপুরুষ, দেবতুল্য সর্ব্বগুণে ভূষিত লোকপিতা বলিয়া ভক্তি করিতেন, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। আর যাঁহারা ভারত-ইতিহাস জানেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, আকবর দেবতুল্য রাজা ছিলেন, তিনি ভারতে এমন দুইটি জিনিষ দান করিয়াছিলেন, যাহা আর কোন মুসলমান রাজার সময়ে পাওয়া যাইত না এবং যাহা বর্ত্তমান সভ্য শাসন-প্রণালীর চিহ্ন। সে দুইটি হইতেছে, সর্ব্বধর্ম্মের নিরপেক্ষ প্রতিপালন (সুল্হ-ই-কুল্) এবং সরকারী কাজে জাতিনির্ব্বিশেষে গুণীর নিয়োগ,—অর্থাৎ ইংরাজীতে বলিতে গেলে universal toleration এবং career open to talent. তাহার উপর পাঠান-যুগের শত শত বর্ষব্যাপী মারামারি, বিদ্রোহ, খুন ও অরাজকতার পর আকবর উত্তর-ভারতময় যে শান্তি স্থাপন করিলেন, তাহা অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের পরবর্ত্তী হাজার বৎসরে দেখা যায় নাই। এই শান্তি ও সুশাসনের ফলে দেশময় ধন ও সুখ বাড়িতে লাগিল, সাহিত্য ও কলা, কি হিন্দুদের মধ্যে, কি মুসলমানদের সমাজে, দিন দিন বিকশিত হইতে থাকিল। যে রাজার এরূপ মহান্ কীর্ত্তি, তাঁহাকে 'নরদেব' বলিলে কি প্রাচ্য-দেশীয়

রাজস্তুতি হয়, না ইংরাজ জ্ঞানী কার্লাইলের প্রশংসিত হিরো-ওয়ার্শিপ হয়? আকবর কার্লাইলের বর্ণিত হিরোদের গুণে ভূষিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে ভক্তি করা স্বাভাবিক এবং উচিত। ইসলাম ধর্ম্ম অনুসারে পাদিশাহ একাধারে পোপ এবং সম্রাটের পদস্থ, তিনি জীবন্ত খলিফা অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের উত্তরাধিকারী, সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের পূজার যোগ্য। তাঁহার উপাধি কিব্‌লা ও কাবা, ঈশ্বরের ছায়া, পীর ও মুর্শিদ। তবে স্বীকার করি যে, অলঙ্কারের ছটায় এবং অত্যুক্তির ফলে স্থানে স্থানে আবুল-ফজলের লেখা পাঠকের বিতৃষ্ণা জন্মায়, এবং তিনি যে সব ভাল কাজই নিজ প্রভুর উপর আরোপ করিয়াছেন, তাহা কখন কখন অসত্য।

আবুল-ফজলের ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দোষ তাঁহার ভাষার ভঙ্গিমা। এক জন সাহেব রহস্য করিয়া বলিয়াছেন যে, মানবকে ভগবান্ ভাষা দিয়াছেন মনের ভাব গোপন করিবার জন্য। আবুল্-ফজল্ এমন রচনা-পদ্ধতি ও শব্দবিন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার লেখার অর্থ বুঝা বিশেষ কষ্টকর। একটি মাত্র উপমা লইয়া তাহার শত বিভিন্ন আংশিক আকার ধরিয়া লম্বা লম্বা পৃষ্ঠা ভরিয়া একটি মাত্র বাক্য (sentence)। এই মুদ্রাদোষটি তিনি আমির খসরুর রচনা হইতে পান; কিন্তু আমির খসরু কবি ছিলেন, তাঁহার পক্ষে এটা তত দোষাবহ ছিল না। কিন্তু যখন এই অদ্ভুত অস্বাভাবিক লেখার ভঙ্গিমা শিহাবুদ্দীন তালিশ মিরজুমলার কুচবিহার ও আসাম জয় নামক গ্রন্থে অনুকরণ করিলেন, তখন সেটা পাঠকের অসহ্য কষ্টকর হইল। যাহা হউক, আবুল-ফজলের গ্রন্থে আমরা অমূল্য ঐতিহাসিক তথ্য পাই, ইহার ঘটনাগুলি অতি সত্য ও বিচিত্র।

এই সংশ্রবে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী লেখক আবদুল কাদির বাদাউনীর আলোচনা করা আবশ্যক। সাহেবেরা এই ঐতিহাসিকের গ্রন্থকে অযথা মাথায় তুলিয়াছেন, বোধ হয় আবুল-ফজলের প্রতি বিরাগের ফলে। প্রথমতঃ ঐতিহাসিক তথ্যের দিক্ দিয়া দেখিলে, বাদাউনীর গ্রন্থে ঘটনা অনেক কম এবং তিনি সরকারী দপ্তরখানার সাহায্য না পাওয়াতে অনেক ঘটনার গুজব ও মিথ্যা বর্ণনা লিখিয়াছেন। তিনি রাজদরবারে বড় কম সময় ছিলেন, সুতরাং বড় বড় কর্ম্মচারীর মুখে তাহাদের দৃষ্ট ঘটনার কাহিনী শুনিবার সুবিধাও পান নাই। তাহার পর তাঁহার চরিত্র আলোচনা করা যাউক। তাঁহার গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে আবুল-ফজলের এবং আবুল-ফজলের পিতা (বাদাউনীর শিক্ষক !!!) শেখ মুবারকের প্রতি ঈর্ষা ও দ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে। উহারা এত টাকা ও উচ্চ পদ পাইল, আমি পাইলাম না, হা খোদা, এই তোমার ন্যায়বিচার? এইরূপ কাঁদুনি পড়িয়া হাসিও আসে, কান্নাও পায়। আবুল-ফজল-পরিবার এবং আকবর সম্বন্ধে যেখানে যত নিন্দার গল্প-গুজব শুনিয়াছেন, বাদাউনী তাহা নির্ব্বিচারে নিজ গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন। এইরূপ করিবার ফলে তাঁহার গ্রন্থ অনেক স্থলে আপনা হইতেই বিশ্বাসের অযোগ্য প্রতিপন্ন হয়। বইখানির উপর ধর্ম্মের নামাবলী চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করা

আমিই সাত্ত্বিক সুন্নী বলিয়া আস্ফালন, এই ভঙ্গিমাগুলি পড়িয়া বাদাউনীকে ধর্মধ্বজী ভণ্ড বলিতে হয়। আর তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মকনপুর গ্রামে শাহ্ মদার নামক পীরের পবিত্র সমাধি-মন্দিরে একটি স্ত্রীলোক-যাত্রীর ধর্মনাশ করিবার চেষ্টা করেন এবং তাহার ফলে প্রেয়সীর আত্মীয়গণ তাঁহাকে মারিয়া মাথা ফাটাইয়া দেয়! অথচ তখন তিনি সেই জেলার দেওয়ানী জজের পদে প্রতিষ্ঠিত।· (মূল, ২ ভা, ১৩৬-১৩৭ পৃষ্ঠা)। সুতরাং বাদাউনীর কথাগুলি চোখ বুজিয়া গ্রহণ করা যায় না; ইতিহাসের তত্ত্ব যে "নিহিতং গুহায়াং" এ ক্ষেত্রে সে কথা খাটে।

এই সরকারী ইতিহাসগুলি প্রায় আড়াই-শ বৎসরের ধারাবাহিক কাহিনী দেয়, কেহ কম, কেহ বেশী বিস্তৃত ভাবে। ইহার মধ্যে বাবর এবং জাহাঙ্গীর-লিখিত আত্মকাহিনী এবং হুমায়ুনের চাকর জৌহর-রচিত সেই বাদশাহের রাজত্ব-কাহিনীও ধরিতে হইবে। সুদীর্ঘ এবং রীতিমত সরকারী ইতিহাস আকবর হইতে আরম্ভ—

(১) 'আকবরনামা', ৩ খণ্ডে, আবুল-ফজল রচিত এবং তাঁহার খুনের পর সরহিন্দী কর্তৃক শেষ চারি বৎসরের বৃত্তান্ত লিখিয়া সম্পূর্ণ করা হয়। (২) জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী ও তাঁহার জীবনের শেষ দুই বৎসরের জন্য হাদি কর্তৃক রচিত পরিশিষ্ট। (৩) শাহজাহানের ৩১ বৎসর রাজত্ব লিখিয়া গিয়াছেন, আবদুল হামিদ লাহোরী ১-২০ বৎসর, ওয়ারিস্ ২১-৩০ বৎসর এবং সালিহ্ কাম্বু ৩১ বৎসর ও কয়েক মাস। আওরংজীবের প্রথম দশ বৎসরের অতি বিস্তৃত ইতিহাস তাঁহার আজ্ঞায় কাজিম্ কর্তৃক লিখিত, ১১০০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত; এবং সমস্ত ৫১ বৎসরব্যাপী রাজত্বের সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সরকারী কাগজ দেখিয়া লেখা 'মাসির-ই-আলমগীরী,' ৫৪১ পৃষ্ঠা (সাকী মুস্তাদ খাঁ-রচিত)। তাহার পর প্রথম-বাহাদুর শাহ্‌র অতি দীর্ঘ "নামা" দুই বৎসরের মাত্র (ন্যামৎ খাঁ আলীর রচনা)—ফরুকখসিয়রের অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—মুহম্মদ শাহের (রাজত্ব ১৭১৯-১৭৪৮) ঐতিহাসিক তাঁহার "দুধ-ভাই" অর্থাৎ ধাতৃপুত্র মুহম্মদ বখ্‌শ্ (ছদ্মনাম আশোব্), কিন্তু অনেক পরে, ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, এক জন সাহেবের জন্য রচিত। এই বাদশাহের ঠিক পরবর্তী দুই উত্তরাধিকারী আহমদ এবং দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৪৮-১৭৫৯) সম্বন্ধে মাস, তারিখ দেওয়া ধারাবাহিক দুখানি "নামা" স্যর হেনরি এলিয়ট সংগ্রহ করেন, তাহা এক্ষণে ব্রিটিশ মিউজিয়মে স্থান পাইয়াছে; আর কোথাও পাওয়া যায় না। তার পর, দ্বিতীয় শাহ্ আলম পুত্তলিকা মাত্র ছিলেন, তাঁহার সাম্রাজ্য লোপ পাইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার জন্য ঐরূপ ইতিহাস রচিত হয় নাই; তবে মুনালাল প্রভৃতি কেরাণীরা দুই তিনটি সংক্ষিপ্তসার লিখিয়া গিয়াছে, সেগুলি "নামা" নহে।

অপর সব শ্রেণীর ইতিহাস

দ্বিতীয় বিভাগের ইতিহাস। এই শ্রেণীতে তিন জন অতি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক আছেন, বখ্‌শী নিজামুদ্দীন আহমদ,[১] ফিরিশ্‌তা এবং খাফি খাঁ। ইহাদের যেমন বিষয়-বিন্যাসে দক্ষতা, সরল অথচ মনোরম ভাষা, অত্যুক্তি এবং বাজে কথা পরিত্যাগ, তেমনি নানা গ্রন্থ খুঁজিয়া এবং নানা কর্ম্মীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঘটনার সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করিবার অক্লান্ত চেষ্টা। আর এই তিনখানি গ্রন্থেই ভারতের মুসলমান-যুগের সমগ্র ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে, দিল্লীর সুলতান ও বাদশাহ্‌দের কাহিনীর সহিত প্রাদেশিক মুসলমান রাজ্যগুলির ইতিহাস (সংক্ষেপে) লিখিত আছে। নিজামুদ্দীন এই দৃষ্টান্তটি দিয়া যান; পরবর্ত্তী পারসিক লেখকেরা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র, এবং নেহাবন্দী, বাদাউনী ও ফিরিশ্‌তা স্বীকার করিয়া তাঁহার কাহিনী হুবহু চুরি করিয়াছেন। ফলতঃ এই গ্রন্থখানি অমূল্য। তেমনি দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি সম্বন্ধে ফিরিশ্‌তার ইতিহাস অমূল্য; কারণ, তিনি তথাকার লোক এবং নিজামুদ্দীনের বিশ বৎসর পরে লেখেন, তিনি অনেক দক্ষিণী ঐতিহাসিক উপকরণ পান, যাহা নিজামুদ্দীনের হাতে আসে নাই। ফিরিশ্‌তার ইতিহাস ১৬১৫ সালে শেষ হইয়াছে, খাফি খাঁর ১৭২৬ সালে (নামতঃ ১৭৩৪এ)। খাফি খাঁর দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে অংশটি (৩য় ভল্যুম) কোন কাজের নহে; তাঁহার গ্রন্থের ২য় ভল্যুম খুব মূল্যবান্; কারণ, ইহাতে আওরংজীব এবং তাঁহার বংশধরদের বিবরণ আছে, যাঁহারা খাফি খাঁর অনেকটা সমসাময়িক ছিলেন, অর্থাৎ ১৬৮০ হইতে ১৭২৬ পর্য্যন্ত প্রায় সব ঘটনাই এই লেখকের দৃষ্ট অথবা জ্ঞাত। তবে এখানে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত যে, এই শেষ অংশেও খাফি খাঁর কথা চোখ বুজিয়া বিশ্বাস করিলে চলিবে না; কারণ, তিনি সরকারী দলিল বা আখ্‌বারাৎ (সংবাদ-পত্র) একখানিও পান নাই, এমন কি, আওরংজীবের সরকারী সম্পূর্ণ ইতিহাস ('মাসির', ১৭১১তে লিখিত) পর্য্যন্ত দেখেন নাই। খাফি খাঁকে প্রায় সর্ব্বত্রই সংশোধন করাই ঐ যুগের বর্ত্তমান ঐতিহাসিক গবেষণার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই সংশোধনের জন্য অপর পারসিক ও মারাঠী ভাষার উপকরণও প্রচুর পাওয়া যাইতেছে। ছোট ছোট অথবা সংকলন মাত্র গ্রন্থের নাম করিব না।

তৃতীয় বিভাগ—কর্ম্মচারীদের জীবনীর অংশ অথবা দিন-লিপি (ডায়েরী)। এগুলি অমূল্য প্রাথমিক মসলা, যদিও ইহাদের দৌড় বড় কম। এই শ্রেণীতে নেহাবন্দী-রচিত খাঁ-খানান্ আবহুর রহিম্-এর (সেনাপতি ও হিন্দী-ফারসী কবির) জীবনী, মির্জা নাথনের কীর্ত্তি-কাহিনী 'বহারিস্তান্-ই-ঘাইবী', কার্য্যতঃ বাঙ্গলা প্রদেশের জাহাঙ্গীরের রাজ্যকাল ব্যাপিয়া অতি বিস্তৃত মৌলিক এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্ ইতিহাস, শিহাবুদ্দীন তালিশ-লিখিত মিরজুমলার কুচবিহার ও আসাম জয় এবং শায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক চাটগাঁ অধিকার প্রভৃতি। যাঁহারা এগুলির অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্তসার পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, তাঁহারাই ইহার মূল্য বুঝেন,

সমসাময়িক পারসিক চিঠি এবং সংবাদপত্র

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী—চিঠি এবং হস্তলিখিত সংবাদ-পত্র (আখ্‌বারাৎ)। এগুলি তৃতীয় বিভাগের গ্রন্থগুলি অপেক্ষাও অধিকতর মৌলিক ও মূল্যবান্ উপকরণ, ফলতঃ আমি সর্ব্বদাই এগুলিকে ভারত-ইতিহাসের আদি মসলা (raw materials of Indian history) বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি।

আকবরের রাজ্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রিটিশ অধিকার পর্য্যন্ত পারসিক ভাষায় অসংখ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের চিঠি—রাজপুতানায় অতি কম হিন্দী বা রাজস্থানী ভাষায় পত্র, এবং মহারাষ্ট্রে মারাঠী ভাষায় লিখিত হাজার হাজার চিঠি ও রিপোর্ট (অধিকাংশ ১৭১৫ সালের পরবর্ত্তী) রক্ষা পাইয়াছে, এবং বোধ হয় তাহার পাঁচ ছয় গুণ সামগ্রী কালের প্রকোপে ধ্বংস হইয়াছে। আজ শুধু মুঘল যুগের প্রথম দেড়-শ বৎসরের (অর্থাৎ আওরংজীবের মৃত্যু পর্য্যন্ত) রচিত পারসিক ভাষার পত্রগুলির কথা বলিব। প্রত্যেক বাদশাহ্ এবং ছোট বড় কর্ম্মচারী ও রাজা-নবাব-জমিদারের পত্র লিখিবার জন্ম মুন্‌শী অর্থাৎ সেক্রেটরী থাকিত। পত্রগুলি পারসিক ভাষায় রচিত হইত, এবং এই মুন্‌শীরা অধিকাংশই হিন্দু (কায়েৎ অথবা ক্ষেত্রী)। এমন কি, ডি বয়েঁ, পেরোঁ প্রভৃতি ফরাসী সেনাপতিও পারসিক মুন্‌শীর দ্বারা বাদশাহী দরবার ও দেশী রাজাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতেন। এই মুন্‌শীগুলি সযত্নে পারসিক রচনা শিখিয়া, যথাসাধ্য উৎকৃষ্ট, উপযুক্ত এবং 'ফুল্ল-কুসুমিত' শব্দ প্রয়োগ করিতেন, আর সেই সব পত্র-রচনার নকল রাখিতেন, যেমন আজকাল সব অফিসে ও জমিদারীতে লেটার-বুক থাকে। এই পত্রগুলি মুন্‌শী মহাশয়দের সাহিত্যিক রচনা হিসাবে গর্ব্বের বস্তু হইত; তাঁহারা (অথবা তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের পুত্রগণ) ঐ পত্রগুলি একত্র গুছাইয়া সাজাইয়া, ভূমিকা যোগ করিয়া দিয়া শিক্ষিত জগতে প্রচারিত করিতেন, ইহা তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন থাকিবে বলিয়া। এইরূপে অনেক সরকারী ও অন্য ঐতিহাসিক পত্র রক্ষা পাইয়াছে—নকলের দ্বারা; কারণ, আসল সীল-পাঞ্জা-মার্কা পত্রগুলি আলাহিদা থাকায় সব লোপ পাইয়াছে। পারসিক ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক চিঠির ভাণ্ডার যে কত বিচিত্র ও বিপুল, তাহা আমার লিখিত *Studies in Aurangzib's Reign* নামক গ্রন্থের এক অধ্যায়ে এবং *Cambridge History of India*, Vol. IV, Chapters 8 & 10এর গ্রন্থপঞ্জী পড়িলে বুঝিতে পারিবেন।

আর, রাজদরবার, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের কাছারি এবং সেনাপতিদের শিবির হইতে প্রতি সপ্তাহে বা মাসে হাতে-লেখা খবরের কাগজ প্রেরিত হইত; ইহার নাম ওয়াকেয়া, পরে আখ্‌বারাৎ। ১৬৫৮ সাল হইতে ইহার অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহার পূর্ব্বেকারগুলি সব ধ্বংস হইয়াছে। এগুলি অমূল্য এবং সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মৌলিক উপাদান। ইহার সাহায্যে বড় বড় এবং প্রসিদ্ধ ইতিহাসও সংশোধন করা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত আমার রচিত 'আওরংজীব', 'শিবাজী', 'মুঘল সাম্রাজ্যের পতন' প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন।

ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণ

এ-পর্য্যন্ত পারসিক ঐতিহাসিক গ্রন্থের ও মসলার কথা বলিলাম। এখন সপ্তম বিভাগ অর্থাৎ ইউরোপীয় ভাষায় রচিত তৎকালীন বিবরণ ও রিপোর্টের কথা বলিয়া শেষ করিব। এই শ্রেণীর উপাদানগুলিকে সাহেবেরা অযথা মূল্য দিয়া থাকেন। আমি স্বীকার করি যে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রজাদের সুখদুঃখ, রাস্তাঘাট, শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে এবং ভারতীয় শাসন-পদ্ধতি ও সমাজের সমালোচনায় এই বিদেশী সাক্ষী-গুলির কথা আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক মহা অভাব পূরণ করে। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা ধরিলে এই ভ্রমণ-কাহিনী ও রিপোর্ট অনেক সময় বিশ্বাসের অযোগ্য, গুজবের উপর নির্ম্মিত অথবা ভাসাভাসা মামুলী কথামাত্র। সে যুগে বিদেশী ভ্রমণকারী ও পাদ্রীগণ পারসিক ভাষায় লেখাপড়া করিতে জানিতেন না, কোন রকমে উর্দ্দুর সাহায্যে কথাবার্ত্তা চালাইতেন, সুতরাং তাঁহারা পারসিক ভাষায় লিখিত সরকারী কাগজ বা গ্রন্থ ও পত্রাদির জ্ঞান হইতে বঞ্চিত ছিলেন। এজন্য ফাদার্ মন্‌সেরাট্ এবং মানুচী পর্য্যন্ত হাস্যকর ভুল করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহাদের পারসিক ভাষার জ্ঞান কর্ণের দ্বারা প্রাপ্ত, চক্ষুর দ্বারা নহে। আবার এই সব সাহেবদের মধ্যে অনেকে ভারতে অতি অল্পদিন মাত্র কাটাইয়াছিলেন, আর কেহ কেহ ছোট নগণ্য মফস্বল শহরে বাস করিতেন; কাজে কাজেই সত্য সংবাদের মূল কেন্দ্র অর্থাৎ রাজসভা ও সেনাপতির শিবির হইতে দূরে থাকায় প্রকৃত তথ্য শুনিতে পান নাই।*

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রদত্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালার দ্বিতীয় বক্তৃতা।

গোপাল ভট্ট

শ্রীসুশীলকুমার দে, এম-এ, ডি-লিট্

কিংবদন্তী ছাড়িয়া দিলে, চৈতন্যদেবের পার্ষদ ও ষড়্গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের যে-পরিচয় বঙ্গীয় বৈষ্ণবসংপ্রদায়ের গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি বিক্ষিপ্ত, সামান্য ও অনিশ্চিত। কথিত আছে, চৈতন্যদেবের আজ্ঞায় গোপাল ভট্ট শেষ জীবন রূপ-সনাতন প্রভৃতির সাহচর্য্যে বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং সেইখানেই তাঁহার পুস্তকগুলির রচনা করিয়াছিলেন। এই সূত্রে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে নিশ্চয়ই তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন; কারণ, উক্ত গ্রন্থে (আদি, ১।৩৭) বৃন্দাবন-গোস্বামীদের উল্লেখ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাকে আপনার অন্যতম শিক্ষাগুরু বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন। কিন্তু আরও কয়েক বার (আদি, ৯।৪, ১০।১০৫; মধ্য, ১৮।৪৯) তাঁহার নাম গ্রহণ করিলেও কৃষ্ণদাস গোপাল ভট্ট সম্বন্ধে কিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। উক্ত আছে, বৈষ্ণবোচিত দৈন্যের বশবর্ত্তী হইয়া গোপাল ভট্ট নিজের সম্বন্ধে কোনও বিবরণ লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে, অর্থাৎ প্রায় দুই শতাব্দের অধিক কাল পরে, নরহরি চক্রবর্ত্তী এই প্রবাদের কথা বলিয়া[১], তাঁহার স্বরচিত 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে এই ত্রুটি-সংশোধন উপলক্ষ্যে মুখ্যতঃ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই আপাতত গোপাল ভট্টের পরিচয়ের প্রধান অবলম্বন। নরহরির বিবরণ হইতে জানা যায়, চৈতন্যদেবের সহিত গোপাল ভট্টের প্রথম সাক্ষাৎ ও তদনুগ্রহলাভ হইয়াছিল দাক্ষিণাত্যে। গোপাল ভট্টের পিতা বেঙ্কট ভট্ট ছিলেন দক্ষিণদেশের এক জন শাস্ত্রজ্ঞ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে কোথায় তাঁহার নিবাস ছিল, তাহা নরহরি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। ত্রিমল্ল, বেঙ্কট ও প্রবোধানন্দ, এই তিন ভ্রাতা ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ও শ্রীবৈষ্ণবসংপ্রদায়ভুক্ত, কিন্তু চৈতন্যদেবের কৃপায় তাঁহারা রাধাকৃষ্ণরসে মত্ত হইয়াছিলেন। এবং বেঙ্কটতনয় বালক গোপাল ভট্ট তাঁহার সেবক ও ভক্ত হইয়া, পরে রূপসনাতনের সহিত বৃন্দাবনে মিলিত হইবার স্বপ্নাদেশ সেই সময়ে লাভ করেন। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সময়ে চৈতন্যদেব ভট্টগৃহে চারি মাস বাস করিয়াছিলেন, এবং তাহার নাকি

চৈতন্যচরিতামৃতে বিশেষ বর্ণন।২

১। শ্রীগোপাল ভট্ট হৃষ্ট হৈয়া আজ্ঞা দিল। গ্রন্থে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল।
কেনে নিষেধিল ইহা কে বুঝিতে পারে। নিরন্তর অতিদীন মানে আপনারে।
কবিরাজ তার আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবার। নামমাত্র লিখে অন্য না করে প্রচার॥
('ভক্তিরত্নাকর', বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত, মুর্শিদাবাদ, সন ১৩৩২, পৃঃ ১৫)

২ 'ভক্তিরত্নাকর', পৃঃ ৭।

কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র উল্লেখ করিয়া নরহরি স্বীকার করিয়াছেন যে—

গোপাল ভট্টের নাম অব্যক্ত সেথায়।২

এবং স্বীয় উক্তির কৈফিয়ৎস্বরূপ পুনরায় বলিয়াছেন—

অন্যত্র ব্যক্ত গোপাল বেঙ্কটতনয়।২

'চৈতন্যচরিতামৃতে' এবং "অন্যত্র" এই প্রসঙ্গে যাহা পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ। কবিকর্ণপূর তাঁহার সংস্কৃত 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে[৩] লিখিয়াছেন, দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সময়ে চৈতন্যদেব শ্রীরঙ্গপুরীতে ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে চারি মাস অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সূত্রে বেঙ্কট ভট্টের বা তৎপুত্র গোপাল ভট্টের কোনও উল্লেখ নাই। কবি-কর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকেও এ ঘটনার কোন কথা পাওয়া যায় না। যে সংস্কৃত 'চৈতন্যচরিতামৃত'[৪] মুরারি গুপ্তের নামে প্রচলিত আছে, তাহাতে ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে চারি মাস আতিথ্য গ্রহণের কথা আছে; কিন্তু এখানে গোপাল ভট্ট বেঙ্কট ভট্টের পুত্র নহে, ত্রিমল্লের স্বল্পবয়স্ক বালক পুত্র বলিয়া বর্ণিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণে (মধ্য, ১।১০৮-১০ ও ৯।৮২-১৬৩) প্রকাশ পায় যে, চৈতন্যদেব ত্রিমল্ল ও বেঙ্কট ভট্টের গৃহে ক্রমান্বয়ে ছয় মাস ও চারি মাস বাস করিয়াছিলেন; উভয়েই শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীরঙ্গ-নিবাসী, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধের কোনও নির্দ্দেশ নাই, এবং গোপাল ভট্টের নামও অব্যক্ত! চৈতন্যদেবের অন্যান্য চরিতগ্রন্থে এ প্রসঙ্গ একেবারেই বর্ণিত হয় নাই।

তাহা হইলে, নরহরি চক্রবর্ত্তীর "অন্যত্র ব্যক্ত" এই কথার দ্বারা বোধ হয় বুঝিতে হইবে যে, এই সকল পূর্ব্ববর্ত্তী প্রামাণিক চরিতগ্রন্থে কোনও বিবরণ না থাকিলেও, তিনি ইহা অন্য কোনও অর্ব্বাচীন পুস্তকে পাইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ দাস-রচিত 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনা[৫] সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অনুরূপ। ইহাতে পাওয়া যায়, শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ত্রিমল্লের গৃহে চাতুর্ম্মাস্য করিবার সময় চৈতন্যদেব ত্রিমল্লের ভ্রাতা প্রবোধানন্দের উপর বালক গোপাল ভট্টের শাস্ত্রশিক্ষার ভার দেন, যাহাতে পরে গোপাল ভট্ট সর্ব্ব-শাস্ত্রবিৎ হইয়া পিতামাতার বিয়োগান্তে বৃন্দাবনে গমন করেন। এখানে বেঙ্কটের নাম উল্লিখিত হয় নাই; তাহাতে মনে হয়, নিত্যানন্দ দাসের মতে গোপাল ভট্ট ত্রিমল্লের পুত্র। মনোহর দাস-রচিত 'অনুরাগবল্লী'[৬] গ্রন্থেও যে-বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা নরহরির বর্ণনার

২ 'ভক্তিরত্নাকর', পৃঃ ৭।

৩ রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৩।৪।

৪ অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে মুদ্রিত (তৃতীয় মুদ্রাঙ্কণ, কলিকাতা, সন ১৩৩৭) ৩।১৫।১৪-১৬।

৫ রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ, সন ১৩১৮; অষ্টাদশ বিলাস দ্রষ্টব্য। ইহা ১৫২২ শকাব্দে রচিত বলিয়া কথিত আছে; কিন্তু এই তারিখ নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না।

৬ অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে মুদ্রিত (কলিকাতা, ১৮৯৮), পৃঃ ৮-১২। ইহা বৃন্দাবনে

সহিত প্রায় মিলিয়া যায়। মনোহর দাসের মতে ত্রিমল্ল জ্যেষ্ঠ, বেঙ্কট মধ্যম ও প্রবোধানন্দ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, এবং গোপাল ভট্ট বেঙ্কট ভট্টেরই পুত্র। যখন চৈতন্যদেব ইঁহাদের গৃহে চারি মাস অতিথি হইয়া ছিলেন, তখন গোপাল ভট্ট বালক নহেন, প্রাপ্তবয়স্ক। চৈতন্যদেবের আজ্ঞায় তিনি পরে বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ ও সনাতনের সঙ্গে মিলিত হন। উপরোক্ত বিবরণগুলির মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও যথেষ্ট অসংলগ্নতা ও অসঙ্গতি রহিয়াছে। নরহরিও যে এ-কথা জানিতেন না, তাহা নহে। তবে বিরোধ সত্ত্বেও মহাজনদিগের নিগূঢ় ও প্রাকৃত জনের দুর্বোধ্য বাক্যের উপর অশ্রদ্ধা করিতে নিষেধ করিয়াছেন (পৃঃ ১৪-১৫)—

শ্রীগোপাল ভট্টের এ সব বিবরণ। কেহ কিছু বর্ণে কেহ না করে বর্ণন॥
না বুঝিয়া মর্ম্ম ইথে কুতর্ক যে করে। অপরাধ-বীজ তার হৃদয়ে সঞ্চারে॥

তথাপি, ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চরিতাখ্যায়কগণের কেহ কেহ গোপাল ভট্টের দাক্ষিণাত্যে উৎপত্তি স্বীকার করিলেও, তাঁহার পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিতেন বলিয়া মনে হয় না; অন্তত এ-বিষয়ে তাঁহারা একমত নহেন। ইহা আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, গোপাল ভট্ট দাক্ষিণাত্যে যখন রূপ-সনাতনের সহিত মিলিত হইবার স্বপ্নাদেশ পান, তখনও কিন্তু চৈতন্যদেবের সহিত রূপ-সনাতনের সাক্ষাৎকার পর্য্যন্তও হয় নাই! এ-বিষয়ে নরহরির বিবরণের মধ্যেও সঙ্গতির অভাব রহিয়াছে। গোপাল ভট্টের সূচকে তিনি লিখিয়াছেন যে, রূপ-সনাতনের বৃন্দাবনে আগমনের পূর্ব্বেই গোপাল ভট্ট সেখানে পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—

লিখিলেন পত্রীতে শ্রীরূপ সনাতন। গোপাল ভট্টের বৃন্দাবন আগমন॥

'প্রেমবিলাসে'র মতে গোপাল ভট্ট পরে আসিয়া রূপ ও সনাতনের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-যাত্রার সময় কোনও বিশিষ্ট ভক্ত তাঁহার অনুগামী না হওয়ায়, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে যে, পরবর্ত্তী কালে যে সকল বর্ণনা লেখা হইয়াছিল, তাহা নানাবিধ কল্পনা ও জনশ্রুতির সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। এ-সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজও তাঁহার নিজের সম্পূর্ণ তথ্যজ্ঞানের অভাব স্বীকার করিয়াছেন, এবং নরহরিও এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাসের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন (পৃঃ ১৫)—

প্রাচীন বৈষ্ণবমুখে এ সব শুনিল।

বর্ত্তমান কালেও এই বিষয়ে নানারূপ মতবাদের অভাব নাই। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ও তাঁহার অনুবর্ত্তিতায় জগদ্বন্ধু ভদ্র ও দীনেশচন্দ্র সেন প্রচার করিয়াছেন যে, গোপাল ভট্টের তথাকথিত পিতা বেঙ্কট ভট্ট এবং বেদান্তপরিভাষার রচয়িতা ধর্ম্মরাজাধ্বরির গুরু বেলগুণ্ডি-নিবাসী বেঙ্কট ভট্ট বা বেঙ্কটনাথ একই ব্যক্তি। কিন্তু নামের সাদৃশ্য ভিন্ন ইহার সপক্ষে বিন্দুমাত্র প্রমাণ নাই। বেঙ্কট এই নামটি দাক্ষিণাত্যে অসাধারণ নহে, সুতরাং অভিন্নতা প্রমাণ করিতে হইলে অন্য প্রমাণের প্রয়োজন। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, গোপাল ভট্টের আদি-নিবাস ছিল ভট্টমারি নামক কোনও গ্রামে; কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে (মধ্য, ১।১১২; ৯।২২৪, ২৩১-২৩০ ইত্যাদি) ভট্টমারি (পাঠান্তর 'ভট্টথারি') কোনও স্থানের নাম নহে,

একদল ভণ্ড সাধুর নাম বলিয়া দেওয়া আছে, যাহাদের চৈতন্যদেব মল্লারদেশে (মালাবর ?) দেখিয়াছিলেন।

গোপাল ভট্টের পিতৃব্য বলিয়া প্রবোধানন্দের উল্লেখ আরও রহস্যজনক। ইহা কেবল মনোহর দাস ও নরহরির কল্পনা বা শোনা কথা বলিয়া মনে হয়। 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থের[৭] প্রথমেই গোপাল ভট্ট আপনাকে প্রবোধানন্দের শিষ্য বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন, কিন্তু নিজের বংশ-পরিচয় বা প্রবোধানন্দের সহিত আত্মীয়তার কোনও কথা বলেন নাই। তিনি প্রবোধানন্দকে 'ভগবৎপ্রিয়' এই বিশেষণের দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন ; টীকাকার এই সমস্ত পদটি বহুব্রীহি ও তৎপুরুষ, এই দুই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদি তৎপুরুষ হিসাবে লওয়া যায়, তাহা হইলে প্রবোধানন্দ চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন, এইরূপ অর্থ হয় ; এবং তাহা যদি হয়, তবে গোপাল ভট্টকে এই ভাবে চৈতন্যদেবের প্রশিষ্য বলিয়া গণনা করিতে হয়। কিন্তু ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, চৈতন্যদেবের কোনও চরিতগ্রন্থে বা মনোহর দাস ও নরহরির উল্লেখ ভিন্ন অন্য কোনও বৈষ্ণব-বিবরণে, গোপাল ভট্টের পিতৃব্য অথবা চৈতন্যদেবের ভক্ত হিসাবে প্রবোধানন্দের নাম পর্য্যন্তও পাওয়া যায় না। প্রবোধানন্দ বা প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নামে কতকগুলি সংস্কৃত স্তোত্রকাব্য রহিয়াছে ; তাহাতে তাঁহার বৈষ্ণবভাব ও চৈতন্যানুরক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' অন্যান্য গ্রন্থগুলির অপেক্ষা অধিকতর সুপরিচিত[৮] ; ইহাতে ১৪৩ শ্লোকে স্তুতি, প্রণাম, আশীর্ব্বাদ, অবতার প্রভৃতি দ্বাদশ বিভাগে চৈতন্যের বন্দনা ও গুণকীর্ত্তন রহিয়াছে। তাঁহার পঞ্চদশসর্গাত্মক 'সঙ্গীতমাধব'[৯] জয়দেবের অনুকরণে

---

৭ ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।

গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সংতোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ॥

(রাধারমণ প্রেসে মুদ্রিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, দিগ্‌দর্শনী টীকা সমেত, মুর্শিদাবাদ, সন ১২৯৬, ১২৯৮।)

৮ আনন্দীরচিত টীকা সহিত রাধারমণ প্রেসে মুদ্রিত (মুর্শিদাবাদ, সন ১৩৩৪)। ইণ্ডিয়া অফিস, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ভাণ্ডারকর ইন্সটিটিউট্ প্রভৃতি গ্রন্থাগারে রক্ষিত এই পুস্তকের শ্লোকসংখ্যার সহিত মুদ্রিত পুস্তকের শ্লোকসংখ্যার মিল নাই ; পাঠভেদও আছে। ৩৮ শ্লোকের বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায় যে স্তোত্রকার চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। ১৩২ শ্লোকে চৈতন্যদেবকে 'গৌরনাগরবর' বলা হইয়াছে। অনেকের মতে ইহা নরহরি সরকার ও লোচনদাসের বর্ণিত নাগরভাবের অনুরূপ এবং সকলের রুচিগ্রাহ্য হয় নাই ; সেই জন্য প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে প্রবোধানন্দের নাম বাদ পড়িয়াছে। তাহা যদি হয়, তবে ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্ট কিরূপে তাঁহাকে গুরু বলিয়া ব্যক্ত করিলেন ?

৯ ভক্তিপ্রভা-কার্য্যালয় হইতে মুদ্রিত (আলাটী, হুগলী, সন ১৩৪৩)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গ্রন্থের যে পুথি আছে (নং ১৪০২), তাহাতে ১৫টি সর্গ আছে ; মুদ্রিত পুস্তকের ষোড়শ সর্গের যে চারিটি অধিক শ্লোক আছে, তাহা পুথিতে পঞ্চদশ সর্গের পুষ্পিকার পরে পাওয়া যায় ; পৃথক সর্গে নিবদ্ধ নহে।

গীতিবহুল এবং রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনায় পর্য্যবসিত। 'বৃন্দাবনমহিমামৃত'[১০] নামক আর একটি শতক-কাব্য তাঁহার নামে প্রচলিত আছে; ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়—নানাবিধ ছন্দে কৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনের বর্ণনা। ইহা নাকি এক শত শতকে লিখিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ষোলটি মাত্র শতক পাওয়া গিয়াছে ও মুদ্রিত হইয়াছে; ইহাতেও প্রারম্ভে চৈতন্যদেবের নমস্ক্রিয়া রহিয়াছে।[১১] কিন্তু আত্মীয়তার কথা দূরে থাকুক, এই পরিব্রাজকাচার্য্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী যে গোপাল ভট্টের গুরু ছিলেন, মনোহর দাস ও নরহরির উক্তি ভিন্ন তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

দীনেশচন্দ্র সেন-প্রমুখ দু-এক জন লেখক গোপাল ভট্টের গুরু প্রবোধানন্দকে 'বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী'র রচয়িতা প্রকাশানন্দের সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, প্রবোধানন্দের সহিত কাশীতে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয় ও তাঁহার কৃপায় প্রবোধানন্দ এই নাম প্রকাশানন্দে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু এই উক্তির সপক্ষে কোনও প্রমাণ নাই। 'মুক্তাবলী'র প্রণেতা, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য জ্ঞানানন্দের শিষ্য; এবং তিনি যে চৈতন্যমতাবলম্বী ছিলেন, তাহার কোনও পরিচয় উক্ত গ্রন্থে নাই। কাশীতে কোনও প্রবোধানন্দের সহিত চৈতন্যদেবের মিলন হয় নাই। যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসপরিপন্থী নৃত্যগীতাদির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন, তিনি যে মুক্তাবলীকার প্রকাশানন্দ, তাহা কোনও চৈতন্যচরিতগ্রন্থে নাই। পরন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনা হইতে ইহাই অনুমান হয় যে, চৈতন্যদেবের ভক্তির উৎস

---

১০ হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী (হরিদাস বাবাজী), নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, দীনেশচরণ দাস প্রভৃতির সম্পাদনায় বৃন্দাবনে ১৩৪০-৪৫ সনে প্রকাশিত। শতকগুলি বাস্তবিক পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড, এবং অনেক শতকে শতাধিক শ্লোকও রহিয়াছে। হেবর্লিন প্রকাশিত কাব্যসংগ্রহে (খ্রীঃ অঃ ১৮৪৭, পৃঃ ৪৩০) মুদ্রিত এবং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক স্বীয় কাব্যসংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে (৩য় সং, কলিকাতা ১৮৪৪, পৃঃ ৩৩৩-৮৪) পুনর্মুদ্রিত ১২৬ শ্লোকাত্মক এবং একটি শতকে সমাপ্ত যে বৃন্দাবন-শতক পাওয়া যায়, তাহাতে প্রবোধানন্দের নাম নাই, কিন্তু চৈতন্য-বন্দনা আছে। উপরোক্ত অধুনাতন ষোলটি শতকসংগ্রহে এই শতকটি নাই। অনেকগুলি পুথির তালিকায় বৃন্দাবনশতকের উল্লেখ আছে, তাহা বোধ হয় একটি শতকে সমাপ্ত এই গ্রন্থ।

১১ আরও দুইটি গ্রন্থ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নামে পাওয়া যায়, যথা—'বিবেকশতক' (রাজেন্দ্রলাল মিত্র, *Notices*, vii, p. 261, no. 2510) ও 'গোপালতাপনী'র টীকা (কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথির তালিকা, vol. x, pp. 158-59)। হুগলী ভক্তিপ্রভা কার্য্যালয় হইতে দুই খণ্ডে (২য় সং ১৩৩১, ১৩৪২) 'রাধারসসুধানিধি' নামক যে-গ্রন্থ প্রবোধানন্দের নামে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা প্রবোধানন্দের রচিত নহে। ইণ্ডিয়া অফিস, বডলিয়ন্ ও কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে ইহার যে সকল পুথি আছে, তাহাতে ব্যাসপুত্র হিতহরিবংশ ইহার রচয়িতা বলিয়া বর্ণিত। হিতহরিবংশ রাধাবল্লভী সংপ্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুদ্রিত পুস্তকে যে প্রথম ও শেষ শ্লোকে চৈতন্যবন্দনা আছে, তাহা উক্ত

কাশীর মত জ্ঞানপ্রধান স্থানকে ভাসাইয়া লইতে পারে নাই। কারণ, চৈতন্যের মুখে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলাইয়াছেন (মধ্য, ২৫।১৬১-৬২)—

কাশীতে বেচিতে আমি আইলাম ভাবকালি। কাশীতে গ্রাহক নাই বস্তু না বিকায়।

বৃন্দাবন দাস এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই ; কিন্তু প্রকাশানন্দ যদি চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে প্রকাশানন্দের সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস যে রুক্ষ ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন (মধ্য, ৩ ও ২০), তাহা নিতান্ত অসমীচীন ও অবৈষ্ণবোচিত। মুরারি গুপ্ত বা কবিকর্ণপুর প্রকাশানন্দের নামও করেন নাই।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, গোপাল ভট্টের যে-ইতিহাস বাঙ্গালা বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা একেবারেই পরিষ্কার বা সুসঙ্গত নহে। কিন্তু এইখানেই সমস্যার শেষ নহে। 'হরিভক্তিবিলাস' যে গোপাল ভট্টের সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনা, তাহাতেও সন্দেহ রহিয়াছে ; কিন্তু সে-কথা পরে বলিতেছি। 'হরিভক্তিবিলাস' ভিন্ন আর একটি রচনা ষড়্গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের বলিয়া নরহরি চক্রবর্ত্তী ও মনোহর দাস কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার সম্বন্ধেও যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা বিপরীত। এই রচনাটি হইতেছে লীলাশুকরচিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' স্তোত্রকাব্যের কৃষ্ণবল্লভা নাম্নী টীকা। নরহরি চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন (পৃঃ ১৬)—

করিলেন কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী। বৈষ্ণবের পরমানন্দ যাহা শুনি।

ইহার পূর্ব্বে মনোহর দাস আরও বিস্তৃত করিয়া লিখিয়াছেন (পৃঃ ১১-১২)—

শ্রীভট্ট গোসাঞি কর্ণামৃতের টীকা কৈল। অশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা তাহাতে লিখিল।
যাহার দর্শনে ভক্ত পণ্ডিতে চমৎকার। রসপরিপাটী যাতে সিদ্ধান্তের সার।
সে টীকার মঙ্গলাচরণ দুই শ্লোক। লিখিয়াছে যাহা দেখি শুনি সর্ব্বলোক।
আপনা পাসরে রহে চকিত হইয়া। পুলকাদি অশ্রু বহে মুখ বুক বাঞা।

ইহার পরে, 'তথাহি শ্লোকৌ' বলিয়া তিনি উক্ত গ্রন্থের দুই আদিশ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই দুইটি শ্লোক গোপাল ভট্টের রচিত কৃষ্ণবল্লভা টীকার সমস্ত পুথিতে[১২] প্রারম্ভে অবিকল পাওয়া যায়। ইহার প্রথম শ্লোকটি কৃষ্ণবন্দনা; দ্বিতীয় শ্লোকটিতে গ্রন্থকার নিজেকে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন[১৩]; কিন্তু এই টীকায়

---

১২ কৃষ্ণকর্ণামৃতের মূল এবং চৈতন্যদাসের সুবোধনী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সারঙ্গরঙ্গদা টীকাদ্বয় সহিত কৃষ্ণবল্লভা টীকার একটি সংস্করণ বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক, পাঠভেদ, বিস্তৃত ভূমিকা, পরিশিষ্ট ও সূচী সমেত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইতেছে। কৃষ্ণবল্লভা টীকার জন্য কাশী সংস্কৃত গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৬৬২ সংবতে লিখিত প্রাচীন পুথি এবং কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির অন্য একখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুথি, এই দুইটি দেবনাগরাক্ষরে লিখিত সম্পূর্ণ পুথি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একখানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত খণ্ডিত পুথি, সর্ব্বসমেত তিনখানি পুথি অবলম্বিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে সকল সমস্যার সূচনা করা হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত আলোচনা এই সংস্করণের ভূমিকাদিতে দ্রষ্টব্য।

চৈতন্যদেবের নমস্ক্রিয়া নাই ; এবং টীকার শেষে টীকাকার যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত বঙ্গীয় বৈষ্ণবগ্রন্থোক্ত পরিচয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শ্লোকটি এইরূপ—

> শ্রীমদ্‌দ্রাবিড়নীবৃদ্‌দেবিধুঃ শ্রীমান্‌ নৃসিংহোদ্ভব-
> ভট্টঃ শ্রীহরিবংশ উত্তমগুণগ্রামৈকভূস্তৎসুতঃ।
> তৎপুত্রস্য কৃতির্ত্বিয়ং বিতনুতাং গোপালনাম্নো মুদং
> গোপীনাথপদারবিন্দমকরন্দানন্দিচেতোলিনঃ॥

ইহা হইতে জানা যায় যে, দ্রাবিড়বাসী হরিবংশ ভট্ট টীকাকার গোপাল ভট্টের পিতা এবং নৃসিংহ তাঁহার পিতামহ। টীকার পুষ্পিকার পাঠও তদনুরূপ, যথা : "ইতি শ্রীদ্রাবিড়-হরিবংশভট্টৈকচরণশরণগোপালভট্টবিরচিতা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতটীকা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা সমাপ্তা॥"—বলা বাহুল্য, এরূপ কোন শ্লোক বা পুষ্পিকা 'হরিভক্তিবিলাসে' নাই। মনোহর ও নরহরির মতে যদি এই দুই গোপাল ভট্ট একই ব্যক্তি হন, তাহা হইলে বেঙ্কট-ত্রিমল্ল-প্রবোধানন্দের গল্প একেবারেই উড়িয়া যায়। কিন্তু কৃষ্ণবল্লভা টীকার কথা অন্য কোনও বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থে নাই।

হরিবংশ ভট্টের পুত্র ও কৃষ্ণবল্লভার রচয়িতা গোপাল ভট্টের আরও দুইটি পুস্তকের পুথির সন্ধান আমরা পাইতেছি, যাহাতে উল্লিখিত শ্লোক বা অনুরূপ পুষ্পিকা রহিয়াছে। ইহার প্রথমটি হইতেছে, ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থের রসিকরঞ্জনী টীকা।[১৪] ইহারও দ্বিতীয় শ্লোকের পরিচয়ে[১৫] তিনি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ছিলেন এইরূপ উক্ত হইয়াছে ; এবং ইহার একটি সমাপ্তি-শ্লোক কৃষ্ণবল্লভার উপরোদ্ধৃত শ্লোকের (শ্রীমদ্‌দ্রাবিড়°) সহিত অভিন্ন বলিয়া ইনিও যে হরিবংশ ভট্টের পুত্র ও নৃসিংহের পৌত্র, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ইহার পুষ্পিকাও কৃষ্ণবল্লভার পুষ্পিকার অনুরূপ।[১৬] গ্রন্থকার আলঙ্কারিক ও রসশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণবল্লভাতে যেরূপ রূপগোস্বামি-বিরচিত চৈতন্যসংপ্রদায়ের রসশাস্ত্র উল্লিখিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহাতে তাহা নাই, এবং বৈষ্ণব ভাবের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। কৃষ্ণবল্লভার মত এ-টীকাতেও চৈতন্যবন্দনা নাই। ইহা আরও উল্লেখযোগ্য, এই টীকার বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত কোনও পুথি এ-পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই—সবই দেবনাগরাক্ষরে লিখিত।[১৭]

১৪　এই টীকা সম্বন্ধে মল্লিখিত *Sanskrit Poetics*, vol. i, p. 252 দ্রষ্টব্য।

১৫　শ্রীমদ্‌গোপালভট্টেন দ্রাবিড়ক্ষ্মাসুপর্বণা। ক্রিয়তে রসমঞ্জর্যাষ্টীকা রসিকরঞ্জনী॥

১৬　ইতি হরিবংশভট্টৈকচরণশরণগোপালভট্টকৃতা রসমঞ্জরী টীকা রসিকরঞ্জনী সমাপ্তা॥

১৭　যথা Mitra, *Notices*, iv, p. 294, no. 1712 ; Mitra, Catalogue of Skt. MSS. in the Library of the Maharaja of Bikaner (Calcutta 1880), p. 709, no. 1573 ; Eggeling, Descriptive Catalogue of Skt. MSS. in the India Office Library, iii, p. 357, no. 1228-29 ; Stein, Catalogue of Skt. MSS. in the Raghunath Temple Library of Jammu (Bombay 1894), p. 63, no. 748 ; Hultzsch, Report on the Search of Skt. MSS. in Southern India (Madras 1896), iii, p. 48, no. 1251 ; Peterson, Sixth Report, p. 92, no. 377 ; R. G. Bhandarkar, Report of

রাজেন্দ্রলাল মিত্র[১৮] এই গোপাল ভট্ট-রচিত 'সময়কৌমুদী' অথবা 'কালকৌমুদী' নামক এক স্মৃতিগ্রন্থের বিবরণ দিয়াছেন। ইহার একটি প্রারম্ভ-শ্লোকও[১৯] কৃষ্ণবল্লভা ও রসিকরঞ্জনীর দ্বিতীয় শ্লোকের অনুরূপ ; তাহাতে গোপাল ভট্ট গ্রন্থের রচয়িতা ও তিনি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ, এই কথা পাওয়া যায়। ইহার পুষ্পিকাও[২০] বিভিন্নরূপ নহে। সংস্কৃত গদ্যে ও পদ্যে লিখিত এই পুস্তকের উদ্দেশ্য হইতেছে নিত্যনৈমিত্তিক আচার, সংস্কার, দীক্ষা, ব্রত, উৎসব (যথা জন্মাষ্টমী), ভগবৎ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য উপযুক্ত শুভ মুহূর্ত্ত, দিন বা মাসের নির্দ্ধারণ। পুথিখানি ছাপা হয় নাই, কিন্তু বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ইহাতে ১২৪টি পত্র (folio) আছে, পৃষ্ঠায় ৯ লাইন। সুতরাং বইটি খুব ছোট বা সামান্য ছিল না, এরূপ অনুমান অন্যায় হইবে না।

এই গোপাল ভট্ট যে চৈতন্যসংপ্রদায়ের গোপাল ভট্ট হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি, এরূপ সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। মনোহর দাস কৃষ্ণবল্লভার প্রথম দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু যে-অন্তিমশ্লোক ও পুষ্পিকায় টীকাকারের বংশপরিচয় রহিয়াছে, তাহার কথা বোধ হয় জানিতেন না। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোপাল ভট্টকে স্বীয় শিক্ষাগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যদি 'কৃষ্ণবল্লভা' তাঁহার শিক্ষাগুরু গোপাল ভট্টের রচিত হয়, তবে ইহা বিস্ময়ের কথা যে, কৃষ্ণদাস স্বয়ং কৃষ্ণকর্ণামৃতের সারঙ্গরঙ্গদা নামক যে-টীকা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই কৃষ্ণবল্লভা টীকা অভিহিত বা অনুসৃত হয় নাই ; বরং কৃষ্ণদাস চৈতন্যদাসের প্রায় সমসাময়িক টীকাকে আত্মসাৎ করিয়া বিশদ ও বিস্তৃত ভাবে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু এই কৃষ্ণবল্লভা টীকা যে চৈতন্যসংপ্রদায়ের কোনও বৈষ্ণব কর্ত্তৃক লিখিত, তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব মত বা মূলের দাক্ষিণাত্য পাঠ ইহাতে গৃহীত হয় নাই, বরং বঙ্গীয় পাঠ ও বঙ্গীয় বৈষ্ণব মত স্পষ্ট অনুসৃত হইয়াছে। কৃষ্ণ অবতার নহেন, অবতারী স্বয়ং ভগবান্, চৈতন্যসংপ্রদায়ের এই যে বিশিষ্ট মতবাদ, তাহা টীকায় উক্ত হইয়াছে। দ্বিভুজ নরাকৃতি, কিশোরমূর্ত্তি, বৃন্দাবনকেলিকার কৃষ্ণের উপাসনাতেও টীকাকার ভক্তিমান্। চৈতন্য-নমস্ক্রিয়ার অভাব সন্দেহজনক হইলেও,

---

1891-95, p. 46, no. 705. শেষোক্ত তালিকাদ্বয়ের দুইটি পুথি (no. 453 of 1887-91 and no. 705 of 1891-95) এবং স্বতন্ত্র সংগৃহীত আরও দুইটি পুথি (no. 244 of Visrambag i, and no. 207 of Visrambag i) পুনা ভাণ্ডারকর ইন্সটিটিউটে আমরা দেখিয়াছি।—বোম্বাই নির্ণয়সাগর মুদ্রাযন্ত্রের কাব্যমালা পর্য্যায়ে রুদ্রভট্টের শৃঙ্গারতিলকের যে সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার পাদটীকায় (গুচ্ছক ৩, পৃঃ ১১১) গ্রন্থের সম্পাদক শৃঙ্গারতিলকের গোপাল ভট্ট-রচিত রসতরঙ্গিণী নামক একটি টীকার নাম করিয়াছেন ; কিন্তু ইহার অন্য কোনও বিবরণ বা পুথির সংবাদ পাওয়া যায় না।

১৮ *Notices,* vii, p. 254, no. 2501. পুথিখানি খুব প্রাচীন নহে, কিন্তু বঙ্গাক্ষরে লিখিত।

১৯ শ্রীমদ্‌গোপালভট্টেন দ্রাবিড়ক্ষ্মাসুপর্বণা। ক্রিয়তে বিদুষাং প্রীত্যৈ রম্যা সময়কৌমুদী॥

নিশ্চিত প্রমাণ নহে ; কারণ, রূপগোস্বামীর দুইটি দূতকাব্য ও 'দানকেলিকৌমুদী' নাটকেও এইরূপ নমস্ক্রিয়া নাই। টীকাকার যে বঙ্গীয় বৈষ্ণবমতের সহিত পরিচিত, তাহার আর একটি নিদর্শন এই যে, রূপগোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' এই দুইটি চৈতন্যসংপ্রদায়ের প্রামাণিক রসগ্রন্থ এই টীকাতে নামোল্লেখপূর্ব্বক উদ্ধৃত হইয়াছে। 'ভক্তিরসামৃতে'র রচনার তারিখ ১৪৬৩ শকাব্দ ; সুতরাং ইহার পূর্ব্বে এই টীকা লিখিত হয় নাই। যদি ত্রিমল্ল-বেঙ্কট-প্রবোধানন্দের উপাখ্যান বাদ দেওয়া যায়, তবে দুই গোপাল ভট্টের একাত্মতা স্বীকারে বিশেষ বাধা থাকে না।

অন্য দিকে ষড়্গোস্বামীর অন্যতম চৈতন্যসংপ্রদায়ের গোপাল ভট্টের নামে প্রচলিত 'হরি-ভক্তিবিলাসে', রচয়িতা তাঁহার পিতৃপিতামহের নাম উল্লেখ করেন নাই ; কেবল চৈতন্যনম-স্ক্রিয়াপূর্ব্বক আপনাকে প্রবোধানন্দের শিষ্য এবং রূপ-সনাতন-রঘুনাথদাসের প্রীতিকামী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহার রচনাভঙ্গীও স্বতন্ত্র। ইহা বিশটি বিলাসে বিভক্ত সুবৃহৎ বৈষ্ণবস্মৃতির সংগ্রহ-গ্রন্থ। ইহাতে যুক্তিতর্ক নাই ; বৈধী ভক্তির অঙ্গস্বরূপ প্রায় সমস্ত বৈষ্ণবোচিত সদাচার, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, পূজাপদ্ধতি, মন্দিরসংস্কার, মূর্ত্তিগঠন ও মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা, ব্রতপার্ব্বণ প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মের বিধিনিষেধ নির্দ্ধারিত ও সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ; এবং প্রত্যেক বিধিনিষেধের প্রমাণস্বরূপ বহুসংখ্যক স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা ইত্যাদি হইতে বচন সঙ্গে সঙ্গে সংকলিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইহাতে এমন কতকগুলি মত ব্যক্ত হইয়াছে, যাহা ঠিক চৈতন্যসংপ্রদায়ের অনুমোদিত বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ইহাতে চতুর্ভুজ বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীনারায়ণের বীজমন্ত্র, জপ ও উপাসনার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। শূদ্রের শালগ্রামশিলা উপাসনা নিষিদ্ধ হইয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণ, কৃষ্ণ-রুক্মিণীর মূর্ত্তিগঠনের ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণের কথা নাই। এই কৃষ্ণ চক্রধররূপে বর্ণিত, দ্বিভুজ মুরলীধর নহেন। এমন কি, কৃষ্ণের ধ্যানে রাধার উল্লেখ নাই! বৈষ্ণব স্মৃতির নিবন্ধ হইলেও, ইহাতে বিবাহ প্রভৃতি সংস্কারাদির কথা নাই, যদিও প্রথমেই বৈষ্ণব দীক্ষার কথা আছে। গ্রন্থের উপর তন্ত্রের প্রভাব প্রচুর ও স্পষ্ট। উৎসব ও পার্ব্বণের মধ্যে, বৈষ্ণবগ্রাহ্য শিবরাত্রি উক্ত হইয়াছে, কিন্তু (রঘুনন্দনের যাত্রাতত্ত্বেও অনুক্ত) রাসযাত্রা বর্জ্জিত হইয়াছে।[২১]

২১ 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা' ও 'সংস্কারদীপিকা' নামক আরও দুইটি স্বল্পায়তন বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ বর্ত্তমান কালে গোপাল ভট্টের নামে গৌড়ীয় মাধ্ব মঠ হইতে ছাপা হইয়াছে ; কিন্তু এগুলি উক্ত দুই গোপাল ভট্টের কাহারও রচিত বলিয়া মনে হয় না। প্রথমটিতে 'হরিভক্তিবিলাসে' অনুক্ত বিবাহাদি চতুর্দ্দশ সংস্কারের বিবরণ আছে ; দ্বিতীয়টিতে বেশাশ্রয়বিধি অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমের পালনীয় ধর্ম্মাদির কথা আছে। মনে হয়, 'হরিভক্তিবিলাসে' যে-যে বিষয় বিবৃত হয় নাই, তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য পরবর্ত্তী কালে এই দুইটি স্মৃতিসংগ্রহ সংকলিত হইয়া গোপাল ভট্টের নামে প্রচলিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম পুস্তকের পুথির সন্ধান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সংকলিত *Notices*, 2nd Series, i, p. 397, no. 395 ; ii, p. 209-10, no.

'হরিভক্তিবিলাস' যে চৈতন্যসংপ্রদায়ের গোপাল ভট্টের রচনা, তাহা গ্রন্থের আদিতে পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত আছে, এবং তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। রূপ গোস্বামী তাঁহার 'ভক্তিরসামৃতে' ইহার নামোল্লেখপূর্ব্বক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; সুতরাং ইহা ভক্তিরসামৃতের রচনাকালের (শকাব্দ ১৪৬৩) পূর্ব্বেই সংকলিত হইয়াছে। 'হরিভক্তি-বিলাসে'র 'দিগ্‌দর্শনী' নামক একটি সংক্ষিপ্ত টীকাও আছে; তাহা সনাতন গোস্বামীর লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু টীকাতে টীকাকারের নাম নাই। তথাপি মনোহর দাস ও নরহরি চক্রবর্ত্তীর মতে শুধু টীকা নহে, মূলগ্রন্থও গোপাল ভট্টের ব্যপদেশে মুখ্যত সনাতনের রচনা।[২২] নরহরি বলিতেছেন—

করিতে বৈষ্ণবস্মৃতি হইল ভট্টমনে। সনাতন গোস্বামী জানিলা সেই ক্ষণে॥

গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন। করিলা শ্রীহরিভক্তিবিলাস বর্ণন॥

মনোহর দাস আরও বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন যে, মূল গ্রন্থটি সনাতনের লেখা, কিন্তু গোপাল ভট্ট পুরাণের বাক্য সংকলন করিয়া ইহার বিস্তার রচনা করিয়াছিলেন—

শ্রীসনাতন গোসাঞি গ্রন্থ করিল। সর্ব্বত্র আভোগ ভট্ট গোসাঞির দিল॥···

শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ দাস। ইহা সবায় সুখ দিতে হরিভক্তির বিলাস॥

সংগ্রহ করিল শ্রীভাগবত প্রধান। সর্ব্ব পুরাণের বাক্য করিয়া সন্ধান॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজও (মধ্য, ১।৩৫; অন্ত্য, ৪।২২১) 'হরিভক্তিবিলাস' সনাতনের লেখা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এবং মধ্যলীলার চতুর্বিংশ অধ্যায়ে ইহার সমগ্র মর্ম্মার্থ সনাতনের শিক্ষাচ্ছলে চৈতন্যের মুখে বলাইয়াছেন। ইহা ছাড়া, ভাগবতের লঘু বৈষ্ণবতোষিণী টীকার অন্তে জীব গোস্বামী সনাতনের রচিত গ্রন্থগুলির যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতেও 'হরিভক্তিবিলাস' ও তাহার টীকা সনাতনের রচনা বলিয়া ধৃত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস ও জীব গোস্বামীর সাক্ষ্য সহজে অগ্রাহ্য করা যায় না; কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে কুত্রাপি সনাতনকে গ্রন্থকার বলা হয় নাই; বরং গোড়াতেই গোপাল ভট্ট স্বীয় নাম গ্রহণপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, তিনি এই গ্রন্থ রূপ, সনাতন ও রঘুনাথ দাসের সন্তোষার্থে লিখিতেছেন। এই বিরোধ পরিহারের কোনও উপায় নাই। ইহা সম্ভব যে, স্বসংপ্রদায়ের অগ্রণী সনাতন স্বীয় সহকর্ম্মী ও সুহৃৎ গোপাল ভট্টকে এই গ্রন্থরচনায় (টীকা লেখা ছাড়া অন্যরূপেও) বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার উল্লেখ ইহাতে কোথাও নাই; এরূপ সহায়তা যে গোপাল ভট্ট অনুক্ত রাখিয়া যাইবেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অবশ্য, এই সকল সংসারত্যাগী ভক্ত বৈষ্ণবগণ নিজ নাম প্রচারে উৎসাহী ছিলেন না; কিন্তু জীব গোস্বামী স্বীয় 'ষট্‌সন্দর্ভ', ভট্টলিখিত সংক্ষেপের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন

দীপিকা' প্রথমে 'সজ্জনতোষিণী' পত্রিকায় (১৫-১৭ খণ্ডে) কেদারনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল; পরে, সংস্কারদীপিকা সমেত, দ্বিতীয় সংস্করণ গৌড়ীয় মাধ্ব মঠ কর্ত্তৃক সম্প্রতি (কলিকাতা, ১৯৩৫) মুদ্রিত হইয়াছে।

২২ নিত্যানন্দের মত পরিষ্কার নয়, তবে তাঁহার কথা হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, রূপ ও সনাতনের

বলিয়া ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। অথচ সনাতনের ঋণ গোপাল ভট্ট স্বীকার না করিয়া আত্মনাম খ্যাপন করিলেন, ইহা আশ্চর্য্যের কথা বলিয়া মনে হয়। এই সম্পর্কে দীনেশ-চন্দ্র সেন লিখিয়াছেন,[২৩] সনাতনের নাম 'হরিভক্তিবিলাসে'র রচনার সঙ্গে স্পষ্টভাবে জড়িত করা হয় নাই। তাহার কারণ, তিনি যবনসংসর্গে আসিয়া জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন এবং হয়ত সেই জন্য সনাতনের নামে বৈষ্ণব সদাচারের গ্রন্থ প্রচার করিলে ইহার প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় গোপাল ভট্টের নামই গ্রন্থকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এরূপ কল্পনায় সর্ব্বপূজ্য বৈষ্ণব গোস্বামীদের উপর যে হীন চক্রান্ত বা বঞ্চনার অভিপ্রায় আরোপ করা হয়, তাহা ছাড়িয়া দিলেও, এই কল্পনার মূলে কোনও সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। সনাতনের নাম যদি এরূপ বর্জ্জনীয় ছিল, তাহা হইলে তাঁহার ভাগবতের টীকা ও 'বৃহদ্‌ভাগবতামৃত' কিরূপে অশেষ শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্ববৈষ্ণবগ্রাহ্য হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায় না; এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ নাম রূপ, জীব, কৃষ্ণদাস প্রভৃতির গ্রন্থের সহিত জড়িত হইয়া তাহাদের দূষিত করে নাই, বরং ভূষিত করিয়াছে। সনাতন ও রূপ যে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বধর্ম্ম ও স্বজাতিচ্যুত হইয়াছিলেন, এই গল্পের কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নাই। ইহা সত্য যে, তাঁহারা মুসলমান দরবারে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে মুসলমানী নাম বা খেতাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ইহা হইতে ইহার অধিক কোনও অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। জীব গোস্বামী রূপ-সনাতনের বংশ-পরিচয়ে তাঁহাদের কর্ণাট ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত বলিয়াছেন। 'ভক্তিরত্নাকরে'র বাক্য (পৃঃ ৪২-৪৩) যদি সত্য হয়, তবে তাঁহারা মুসলমান দরবারে চাকুরী করিলেও, পরম্পরাগত পিতৃপিতামহের ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য রক্ষা বা শাস্ত্রালোচনায় পরাঙ্মুখ ছিলেন না, এবং সামাজিক সম্বন্ধ ও আচার-ব্যবহারের জন্য রামকেলির নিকট বহু কর্ণাট-দেশীয় ব্রাহ্মণ আনাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়িয়া দিলেও, চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ-কারের পূর্ব্বেও তাঁহারা যে নবদ্বীপের বিদ্যাবাচস্পতির শিষ্য, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলিয়াছেন—

ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লইয়া। ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিয়া।

পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণলীলা ও বৈষ্ণব মতের প্রতি প্রবণতা ছিল বলিয়াই চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁহাদের যে আগ্রহ ও ব্যাকুলতা, তাহা বুঝা যায়। এবং তাঁহাদের গ্রন্থাবলীতে যে অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্ম্মনিষ্ঠতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় রহিয়াছে, তাহা দু-চারি দিনের শিক্ষায় আয়ত্ত হয় নাই, আজীবনের ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসের ফল বলিয়াই মনে হয়।

---

২৩ *Vaisnava Literature,* Calcutta University 1917, pp. 37-38 ; *Chaitanya and his Age,* Calcutta University 1922, p. 290. Kennedy, *Chaitanya Movement,* Oxford Univ. Press, 1925, p. 137-এ ইহার পুনরুক্তি করিয়াছেন।

উল্লিখিত সমালোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে, চৈতন্যসংপ্রদায়ের গোপাল ভট্টের সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ ও মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহা তথ্যদর্শী ঐতিহাসিককে সাবধানতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে ও অন্যান্য স্থান হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতে এইরূপ দাঁড়ায়—

(১) 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র 'কৃষ্ণবল্লভা' টীকা, 'কালকৌমুদী' এবং 'রসমঞ্জরী'র 'রসিকরঞ্জনী' টীকা যে গোপাল ভট্ট লিখিয়াছেন, আত্মপরিচয় অনুসারে তিনি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ, হরিবংশ ভট্টের পুত্র ও নৃসিংহ ভট্টের পৌত্র। চৈতন্যসংপ্রদায়ের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই; তবে তিনি তাঁহার গ্রন্থগুলিতে এই সংপ্রদায়ের মতবাদ বা উহার রসশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কোন কথা বলেন নাই। বরং তাহা স্বীকার করিয়াছেন, এবং 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র দাক্ষিণাত্য পাঠ নহে, বঙ্গীয় পাঠই তাঁহার টীকায় গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং যদি নরহরি প্রভৃতি-কথিত বংশপরিচয় বর্জ্জন করা যায়, তবে ইঁহার সহিত পরবর্ত্তী গোপাল ভট্টের ঐক্য স্বীকার কঠিন নয়।

(২) তবে ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম যে গোপাল ভট্টের নামে 'হরিভক্তিবিলাস' প্রচলিত, তিনি উপরোক্ত গোপাল ভট্টের সহিত অভিন্ন, তাহারও কোন স্পষ্ট প্রমাণ নাই। তাঁহার পরিচয় অস্পষ্ট ও ইতিহাস জনশ্রুতিমূলক, এবং বিভিন্ন জনশ্রুতির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব রহিয়াছে। তিনি দাক্ষিণাত্যোদ্ভব ছিলেন কি না, তাহাও অনিশ্চিত, এবং তাঁহার যে বংশপরিচয় ও বৃত্তান্ত বাঙ্গালা বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহাতে যথেষ্ট অসঙ্গতি ও বিরোধ রহিয়াছে। 'হরিভক্তিবিলাসে' তিনি নিজেকে প্রবোধানন্দের শিষ্য বলিয়াছেন, কিন্তু বংশ-পরিচয় দেন নাই। এই প্রবোধানন্দের ইতিবৃত্ত অতি সামান্য এবং ইনি স্তোত্রকাব্য-লেখক পরিব্রাজকাচার্য্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী কি না, তাহার নিশ্চয়তা নাই। ইনি গোপাল ভট্টের পিতৃব্য ছিলেন কি না, তাহাও নিশ্চিত নহে; এবং ত্রিমল্ল-বেঙ্কট-প্রবোধানন্দের যে উপাখ্যান নিত্যানন্দ দাস, মনোহর দাস ও নরহরি চক্রবর্ত্তী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অন্যত্র তাহারও সন্তোষজনক প্রমাণ নাই।

সম্প্রতি আরও দুই-একটি, খুব সম্ভব চৈতন্যসংপ্রদায়ভুক্ত, গোপাল ভট্টের আবিষ্কারে এই সমস্যা জটিলতর হইয়াছে।[২৪] পুণা ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যামন্দিরে রক্ষিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র আর একখানি টীকার পুথি[২৫] পাওয়া গিয়াছে, তাহাও গোপাল ভট্টের

---

২৪ সংস্কৃত সাহিত্যের বৃত্তান্তে আরও গোপাল ভট্ট আছেন। কিন্তু তাঁহাদের এখানে ধরা নিষ্প্রয়োজন। Aufrecht-এর *Catalogus Catalogorum*-এ (কেবল গোপাল নাম ছাড়া) অন্ততঃ বার জন গোপাল ভট্টের নাম পাওয়া যায়।

২৫ MS. no. 178 of 1879-80. এই পুথি শ্রীধর ভাণ্ডারকরের সংকলিত *Catalogue of the Collections of MSS. deposited in the Deccan College*, 1888, p. 135-এ তালিকাভুক্ত হইয়াছে; Deccan College-এর সমস্ত পুথি-সংগ্রহ এখন ভাণ্ডারকর ইন্সটিটিউটে রক্ষিত।

রচিত। কিন্তু এই টীকা স্বতন্ত্র গ্রন্থ ; এবং এই গোপাল ভট্ট গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইতে পারেন, কিন্তু উপরোক্ত দুই গোপাল ভট্ট হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পুথিখানি ১৪৫ পত্রে (folio) সমাপ্ত ; অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পৃষ্ঠামাত্রাযুক্ত দেবনাগর অক্ষরে লিখিত ; মূল ও টীকা দুই পুথিতে রহিয়াছে। টীকার নাম 'শ্রবণাহ্লাদিনী'। শেষের যে শ্লোকে টীকাকারের পিতার নাম লিখিত আছে, তাহা অশুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, যথা—

শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দভজনত্যক্তাখিলার্থব্রাহঃ (? ত্রয়ঃ ?)
শ্রীমদ্ভাগবতার্থবিৎ সমভবদ্ ভদ্দন্ফণা (? উদ্যৎফণো ?) বিশ্রুতঃ।
শ্রীরাধারমণাঙ্ঘ্রিসক্তমনসা গোপালভট্টেন তৎ-
পুত্রেণ শ্রবণামৃতস্য রচিতা টীকাস্য সংপ্রীতয়ে ॥

ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে টীকাকার বলিতেছেন যে, তিনি নিজের ও আত্মসুহৃৎ বনমালী দাসের কর্ণদ্বয়ের এবং অনুজ লক্ষ্মীনারায়ণের কণ্ঠের ভূষণস্বরূপ তাঁহার টীকা রচনা করিয়াছেন—

তৈরর্থরত্নৈর্বনমালিদাসমিত্রস্য কর্ণদ্বয়মাত্মনশ্চ।
বিভূষয়ামীহ তথৈব লক্ষ্মীনারায়ণস্যাপ্যনুজস্য কণ্ঠম্ ॥

টীকাকারের গুরুর নাম নারায়ণ। ইহা বঙ্গীয় পাঠ অনুসরণে লিখিত ; ইহাতে গীতগোবিন্দ (fol. 22b) এবং 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র (fol. 16a, 19a) নামোল্লেখপূর্ব্বক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং চৈতন্যসংপ্রদায়ের মতবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইনি অপর গোপাল ভট্টের কৃষ্ণবল্লভা দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

আরও একটি গোপাল ভট্টের নামোল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী-সম্পাদিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংস্কৃত পুথির তালিকার ভূমিকায় (p. xvii) রাধারমণ দাস-রচিত শ্রীধর স্বামীর 'ভাগবত-ভাবার্থ-দীপিকা' টীকার 'দীপিকা-দীপন' নামক একটি অনুটীকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে রাধারমণ দাস আত্মপরিচয়ে বলিয়াছেন যে, তিনি শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্টের দাস্যে সংসক্তমানস, রাধারমণ-(বিগ্রহ-)সেবী, এবং কৃষ্ণগোবিন্দের মিত্র। এই গোপাল ভট্ট কি 'হরিভক্তিবিলাস'-কার গোপাল ভট্ট হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি ?

পরমানন্দমতসংগ্রহ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম-এ

তান্ত্রিক উপাসনার বিভিন্ন প্রস্থানের মধ্যে পরমানন্দমত বা পারানন্দমতের সন্ধান পাওয়া যায়। অপরিচিত অথচ কৌতুককর এই প্রস্থান সম্বন্ধে এ পর্যন্ত বোধ হয় একখানি মাত্র গ্রন্থ পণ্ডিতসমাজে প্রচার লাভ করিয়াছে। এই গ্রন্থখানির নাম পারানন্দসূত্র।[১] কিছু দিন পূর্ব্বে ইহা বরোদা হইতে প্রচারিত গায়কোয়াড় ওরিয়েণ্টল সিরিজ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে। এশিয়াটিক সোসাইটীর পুথিশালায় লোকলোচনের অন্তরালে এই মত-বিষয়ক আর একখানি সংক্ষিপ্ত অথচ মনোরম গ্রন্থের এক খণ্ডিত পুথি বর্ত্তমান রহিয়াছে। পুথিখানিতে কোনও পুষ্পিকা নাই এবং পুথিমধ্যে ইহার কোনও নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। পুথির প্রথম পত্রের এক পৃষ্ঠে পুথির মালিক কাশীধামের রঘুনাথ মালবীয়ের নাম ও গ্রন্থের নাম অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন হস্তাক্ষরে নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, গ্রন্থের নাম 'পরমানন্দমতসংগ্রহ'। এই গ্রন্থের ও প্রসঙ্গক্রমে পারানন্দমতের পরিচয়-প্রদানই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শ্রেষ্ঠ আনন্দ বা মহাসুখের দিকে লক্ষ্য স্থির থাকার জন্যই এই মতবাদ পরমানন্দ বা পরমানন্দমত নামে পরিচিত হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। বস্তুতঃ এই মতবাদের প্রচারক আচার্য পরমানন্দের নামানুসারেই ইহার নামকরণ হইয়াছে।

পরমানন্দের সময় ও পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। আলোচ্য গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ ইঁহার এক মুখ্য (?) শিষ্য ও ভ্রাতার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই শিষ্যের নাম দেবানন্দ ও ভ্রাতার নাম নিত্যানন্দ।[২] গ্রন্থারম্ভে ইঁহাদিগকে প্রণাম করা হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে কিন্তু পরমানন্দ শিবের নামান্তররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বশিষ্ঠাদির সহিত কথোপকথনের প্রারম্ভে পরমানন্দের নাম পাওয়া যায়, তৎপরে সর্বত্র শিবের নাম। উপাস্য ও উপাসকের অভেদ সূচনার জন্যই এইরূপ করা হইয়াছে কি না, বলা যায় না। এই মতবাদে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে—হিংসানিষেধ।[৩] পশুবলি তান্ত্রিক

---

১ পরানন্দপুরাণ বা পরমানন্দতন্ত্র নামক গ্রন্থের যে পুথি এশিয়াটিক সোসাইটী বা মান্দ্রাজ ওরিয়েণ্টল লাইব্রেরীতে আছে, তাহাতে এই মতের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরানন্দপুরাণে শিবের মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক উপাখ্যান এবং পরমানন্দতন্ত্রে শ্রীবিদ্যার উপাসনাপদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে।

২ দেবানন্দং চ তচ্ছিষ্যং নিত্যানন্দং চ ভ্রাতরম্। (পত্র ১ক)

৩ ইয়ানেব বিশেষোঽস্তি মন্মতে মুনিসত্তমাঃ।
ন ন্যাসো ন চ হিংসাস্তি জঙ্গমস্য জড়স্য বা॥ (৬ক)
হিংসাং কুর্যাত্তু বিহিতাং জড়স্যৈব ন চান্যতঃ।
আলভেত ছাগবরং যত্র সাত্ত্বিকং পৈষ্টকম্ ।(৭খ)

উপাসনার—বিশেষতঃ শক্তিপূজার এক অপরিহার্য অঙ্গ। সেই বলি এই মতে নিষিদ্ধ। অথচ এই মতে তান্ত্রিক বিধিগুলি উপেক্ষিত হয় নাই। তন্ত্রমতে যেখানে ছাগবলি বিহিত হইয়াছে, এই মতে সেখানে পিষ্টক-নির্মিত ছাগের বলির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে রাজাদের সম্বন্ধে এ বিষয়ে অন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে—তাহা গ্রন্থশেষে উল্লেখ করা হইয়াছে। পারানন্দমতে ন্যাস প্রভৃতি পূজার খুঁটিনাটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। অথচ কোনও সঙ্কীর্ণতা এই মতে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মতের যাঁহারা অনুবর্তী হইবেন, ন্যাস ও বলি ব্যতীত শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্ত কোনও অনুষ্ঠানই তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে।[৪] বস্তুতঃ অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি এই উদারতা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। পারানন্দমতে তিনটী আচার বা মার্গ স্বীকৃত হইয়াছে—বামাচার, দক্ষিণাচার ও উত্তরাচার। বামাচার আবার উত্তম ও মধ্যম, এই দুই প্রকারের। উত্তম বামাচারে পঞ্চ মকারের তিন মকার মাত্র সমাদৃত হইয়াছে—মৎস্য ও মাংস, এই দুই মকার বর্জিত হইয়াছে।[৫] সুতরাং ইহাদের মতে মৎস্যমাংস, মদ্যমৈথুন হইতেও নিকৃষ্ট। বামাচারী উপাসকের নামের শেষে "নাথ" শব্দ থাকিবে। উত্তরাচারের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই যে, ইহাতে ভিক্ষা ও সেবা নিষিদ্ধ হইয়াছে। উত্তরাচারী উপাসকের নামের অন্তে "আনন্দ" শব্দ থাকিবে। নরপতি পারানন্দমত অবলম্বন করিলেও যুদ্ধাদি করিতে পারেন; দণ্ডনীয়কে দণ্ড দিতে পারেন—মুনিঋষিদের তপোবিঘ্নকারী হিংস্র ব্যাঘ্রাদিকে বধ করিতে পারেন—কালীর সম্মুখে বলি দিতে পারেন।[৬]

পারানন্দমতের প্রাচীনতা প্রতিপাদনের জন্য প্রাচীন মুনিঋষিদের সহিত এই মতবাদের ঘনিষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে। পারানন্দমতানুবর্তীদিগের মতে বশিষ্ঠ, নারদ, অগস্ত্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তিগণ এই মতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্ত্রের অন্যান্য সম্প্রদায়ও এইরূপ চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। বশিষ্ঠ কৌলাচার অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এ কথা তন্ত্রগ্রন্থে সুপরিচিত। লোপামুদ্রা, অগস্ত্য প্রভৃতির নামের সহিত কোন কোন তান্ত্রিক মন্ত্র জড়িত দেখিতে পাওয়া যায়।

ইতঃপূর্বে উল্লিখিত ও প্রকাশিত পারানন্দসূত্র সূত্রাকারে রচিত বিস্তৃত গ্রন্থ, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট এবং অংশতঃ বিশৃঙ্খল। আলোচ্য গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত হইলেও স্পষ্ট। ইহা হইতে পারানন্দমতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সুন্দর ধারণা জন্মে। মুদ্রিত গ্রন্থ ও পুথিখানি

---

৪ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্তান্ ধর্মান্ কুরু বতানঘাঃ।
ন্যাসং সন্ত্যজ্য পূজাদি কার্যং বৈ মন্মতস্থিতৈঃ॥
পরানন্দমতপ্রাপ্তির্যাবন্নৈবোপজায়তে।
তাবন্ন্যাসো যজ্ঞবিধৌ জঙ্গমস্য চ হিংসনম্॥৬২
পরানন্দমতে প্রাপ্তে ন [হি] কুর্য্যাদ্বিদং স্বয়ম্।

৫ বামাচারো দ্বিপ্রকারো মধ্যমোত্তমভেদতঃ।
উত্তমস্ত্রিপ্রকারো বৈ মধ্যমঃ পঞ্চভির্যুতঃ। (১২খ)

৬ বানপ্রস্থোপদ্রবকর্তৄন্ বন্যান্ হিংস্রান্ জন্তূন্ ব্যাঘ্রাদীন্ হন্যাদেব রাজা। (১৮খ)

মিলাইয়া পড়িলে অনেক সন্দেহ দূরীভূত হয়। গ্রন্থখানি প্রধানতঃ ছন্দোবদ্ধ—মাঝে মাঝে গদ্য আছে। ইহার আয়তন প্রায় শতাধিক শ্লোক। তবে দুঃখের বিষয়, পুঁথিতে ইহার সকল অংশ রক্ষিত হয় নাই। ইহা মাঝে মাঝে খণ্ডিত। গ্রন্থের অধিকাংশ শিব (পরমানন্দ) ও অগস্ত্যাদির কথোপকথনরূপে নিবদ্ধ।

আলোচ্য গ্রন্থের সহিত মুদ্রিত গ্রন্থের ভাষাগত সাদৃশ্য অনেক স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহা ছাড়া, উভয় গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোকের হুবহু মিল আছে। এই প্রসঙ্গে পারানন্দসূত্রের কতকগুলি অংশের (৮।৭৪-৫, ৮।৭৯-৮০, ১৩।৮৯-৯০, ১৩।৯৬, ১৯।৩৯-৪০) সহিত আলোচ্য গ্রন্থের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মনে হয়, এগুলি উভয়ত্র প্রাচীনতর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

গ্রন্থপ্রারম্ভে গণেশ, ভৈরব, শক্তি, বিষ্ণু, সূর্য ও মহেশ্বর, এই ছয় দেবতা এবং মত-প্রবর্তক পরমানন্দ, তদীয় শিষ্য দেবানন্দ ও ভ্রাতা নিত্যানন্দ, এবং পারানন্দমতদীক্ষিত অগস্ত্য, নারদ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিবর্গকে প্রণাম করা হইয়াছে। উপোদ্‌ঘাত প্রকরণে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। তৎপরে পারানন্দমতানুমোদিত পদার্থত্রয়ের নাম (পরমাত্মা, ঈশ্বর ও জীব) এবং লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বরগণও জীবের ন্যায় পরমাত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। পরমাত্মলোকই ইহাদের সকলের জীবনের চরম লক্ষ্য। প্রলয়কালে কিন্তু জীবগণ সানন্দলোকে নীত ও রক্ষিত হন।[৭] সৃষ্টি-প্রকরণে পরমাত্মকর্তৃক জগৎসৃষ্টির পৌর্বাপর্য সূচিত হইয়াছে। ব্রহ্ম-প্রভৃতি দেবগণ পরমাত্মকর্তৃক সৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মলোক প্রভৃতি বিভিন্ন লোক সৃষ্টি করিতে আদিষ্ট হইলেন এবং একে একে স্বতন্ত্র অধিকারে নিযুক্ত হইলেন। নারদ, অগস্ত্য, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ কিরূপে শিবের নিকট সমাগত হইয়া দক্ষিণ, উত্তর ও বামাচারে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, অতঃপর তাহার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বশিষ্ঠ প্রভৃতি দক্ষিণাচারে, নারদ ও অগস্ত্য প্রভৃতি বামাচারে এবং দেব ও দেবদেব নামক দুই ঋষি উত্তরাচারে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি শিষ্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শিব তাঁহাদিগের নিকট নিজ মতের বৈশিষ্ট্য বিবৃত করেন এবং দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করেন। বিনা দীক্ষায় শিষ্য হইবার অধিকার জন্মে না, এ কথা তাঁহাদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দেওয়া হয়।[৮] তাঁহারা যথানিয়মে দীক্ষিত হন এবং কয়েক দিন দীক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়া সংযতভাবে যাপন করেন। পরে তাঁহারা প্রার্থিত মন্ত্র প্রাপ্ত হন। সাদি সান্ত, সাদ্যনন্ত, অনাদ্যনন্ত—পদার্থের এই বিভাগত্রয় তাঁহাদিগকে এই

---

৭ তত্র লোকো মহান্ দিব্যঃ পরমানন্দসংজ্ঞকঃ। যত্র গত্বা ন যাত্যত্র পুনঃ সংসারমণ্ডলে।
মুক্তাশ্চ চেশ্বরা যত্র রমন্তে চ যথাসুখম্। যত্র ধ্যানাসক্তচিত্তা হ্যনির্দেশ্যপ্রিয়া যুতাঃ॥
পরানন্দৈকদেশস্তু সানন্দশ্চেত্যুদাহৃতঃ। কৃতপাপান্ দুরাচারান্ কৃতপুণ্যাংস্তথৈব চ।
আগতে প্রলয়ে হ্যেতান্ সানন্দে স্থাপয়ত্যসৌ॥

৮ ন দীক্ষয়া বিনা মার্গং দদ্যাৎ কশ্চিৎ কচিচ্ছুভম্ ॥৫৬॥

প্রসঙ্গেবুঝাইয়া দেওয়া হয়। এই জগৎ সাদি সান্ত; পরমাত্মা, জীব, ঈশ্বর, পরমানন্দলোক সেই স্থানের গাছপালা ও জল—এই সমস্ত অনাদ্যনন্ত; দিব্য দেহ সাদ্যনন্ত। আকাশ পরিচ্ছিন্ন, অপর ভূতগণের (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ) প্রতি অণু পরস্পর ভিন্ন।

নারদ অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণ বামাচারে দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাদিগকে যথানিয়মে দীক্ষা দেওয়া হয় এবং বামাচারের প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়।

দেব ও দেবদেব নামক ঋষিদ্বয় উত্তরমার্গে দীক্ষিত হইবার জন্ম প্রার্থনা করিলে তাঁহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করা হয়। এই মার্গের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ প্রসঙ্গে বলা হয়[৯]—এই মার্গ অবলম্বন করিলে মানুষের নিকট অর্থের আকাঙ্ক্ষা করিবে না—সেবাবৃত্তি আচরণ করিবে না—দুষ্কর্মকারী ব্যক্তির নিকট হইতেও অযাচিত দ্রব্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। উত্তরমার্গে দীক্ষিত ব্যক্তির নাম আনন্দান্ত করিতে হইবে।

পারানন্দমতাবলম্বী রাজা দণ্ডনীয়কে দণ্ড দিবেন—যথানিয়মে প্রজাপালন করিবেন—স্বরাষ্ট্র রক্ষা ও পররাষ্ট্র বশীভূত করিবেন এবং প্রয়োজনানুসারে যুদ্ধাদি করিবেন—আশ্রমের বিঘ্নকারী হিংস্র পশুদিগকে বধ করিবেন—কালীর সম্মুখে বলি দিবেন। ইহাতে তাঁহার পাপ হওয়া দূরে থাকুক, পুণ্য বৃদ্ধি হইবে।[১০] হিংসাবিরোধী পারানন্দমতে এ বিধান আপাততঃ বিসদৃশ বলিয়া মনে হইতে পারে। তাই এ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মুদ্রিত 'পারানন্দসূত্রে' (পৃঃ ৯২।৩১-২) এই প্রসঙ্গে একটী সুন্দর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। অযোধ্যারাজ সুদর্শন বশিষ্ঠ কর্তৃক শাক্ত পারানন্দমতে দীক্ষিত হইলে সমীপবর্তী প্রদেশের রাজবর্গ তাঁহাকে অহিংসক মনে করিয়া আক্রমণ করিলেন—সুদর্শনও যুদ্ধ করা উচিত কি না, বুঝিতে না পারিয়া বশিষ্ঠের নিকট সংশয় নিরাসার্থ উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ তাঁহাকে লইয়া পরমানন্দের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া বলিলেন,—"ন্যায়যুদ্ধ পরমানন্দমতাবলম্বীর পরম ধর্ম।" আলোচ্য পুথিতে এই উপাখ্যানের প্রথমাংশ খণ্ডিত—তাই বুঝিতে একটু অসুবিধা হয়। "বশিষ্ঠ ও সুদর্শন প্রণাম করিলে শিব অন্তর্হিত হইলেন" যুদ্ধাদিবিধানের পর এই কথা এ পুথিতে রহিয়াছে। এই জন্য মনে হয়, খণ্ডিত অংশে উপাখ্যানের পূর্বভাগ ছিল।

অদীক্ষিতায় যো দদ্যান্মন্ত্রং বা মার্গমুত্তমম্।
স পতেন্নরকে ঘোরে বর্ষাণামযুতং সমাঃ ॥৫৭॥
যথা হ্যনুপনীতায় কন্যাং দদ্যাদ্ বিমূঢ়ধীঃ।
তথা হ্যদীক্ষিতায়ৈনং দদন্মার্গং পতেদ্ গুরুঃ ॥৫৮॥

৯ নেচ্ছেদ্ধনং মনুষ্যেভ্যঃ সেবাবৃত্তিং চরেন্ন চ।
অযাচিতাহৃতং গ্রাহ্যমপি দুষ্কৃতকর্মণঃ ॥৮৩॥

মুদ্রিত গ্রন্থে "অযাচিতাহৃতং" স্থলে "অযাচিতাদ্ব্রতং" এই পাঠ আছে। তাহা শোভন বলিয়া মনে হয় না।

১০ যো দণ্ড্যান্ দণ্ডয়েদ্ রাজা সম্যগ্ বধ্যাংশ্চ ঘাতয়েৎ।
ইষ্টং স্যাৎ ক্রতুভিস্তেন সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের 'ঐকান্তী' ভক্ত ছিলেন—ভক্তেষৈকান্তিনো মুখ্যাঃ। তিনি 'ধর্মতত্ত্বে'র চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিতেছেন :—

যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্কাম হইয়া এই সকল মনুষ্যের দুষ্কর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্যস্থাপনের কর্ত্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া, ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তার পর কেবল দণ্ডপ্রণেতৃত্বপ্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন,—"বেদে ধর্ম নহে—ধর্ম লোকহিতে"—তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র; যিনি সর্ববলাধার, সর্বগুণাধার, সর্বধর্মবেত্তা, সর্বত্র প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।

এই মহনীয় কৃষ্ণস্তুতিতে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর হউন বা না হউন" কিন্তু তিনি নিজে বিশ্বাস করিতেন—শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র দ্বিতীয় বারের "বিজ্ঞাপনে" তিনি লিখিতেছেন, "আমি নিজে তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করি;—সে বিশ্বাস আমি লুকাই নাই।" পুনশ্চ—"আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে"* ('কৃষ্ণচরিত্র'—উপক্রমণিকা)। এমন কি, বঙ্কিমচন্দ্র অকুণ্ঠ ভাবে বলিয়াছেন, "প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।" ('কৃষ্ণচরিত্র'—প্রথম খণ্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)।

'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র বেশ নিপুণভাবে বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি—কবি-ভক্ত-ভাবুকের কল্পনাপ্রসূত রূপক মাত্র নহেন।† তিনি গৌরদাস বাবাজির মুখে ('প্রচার' ১২৯২, আষাঢ়) বলিতেছেন :—"আমার

* অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—"মহাভারতের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণু, ঈশ্বরের অবতার—এ কথা বলা হইয়াছে সত্য বটে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, মহাভারতের সকল অংশ এক সময়ের নহে এবং যে সকল অংশে কৃষ্ণে অবতারত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।" —গীতাভাষ্য, পৃ. ২২৩।

† ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় "প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে [illegible] আলোচনা করিয়াছি। কৌতূহলী পাঠক তাহা পাঠ করিতে পারেন।

দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগদীশ্বর সশরীরে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ধর্মস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রূপক নহেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' খাণ্ডবদাহের পর যুধিষ্ঠিরের সভানির্মাণ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ স্বজীবনে তুইটি কার্য্য উদ্দিষ্ট করিয়াছিলেন—ধর্মপ্রচার এবং ধর্মরাজ্য সংস্থাপন। ধর্ম-প্রচারের কথা এখনও বড় উঠে নাই। এই সভা নির্মাণ ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের প্রথম সূত্র। এইখানেই তাঁহার এই অভিসন্ধির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের সভানির্মাণ হইতে যে সকল ঘটনাবলী হইল, শেষে তাহা ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে পরিণত হইল।* ধর্মরাজ্য সংস্থাপন জগতের কাজ; কিন্তু যখন তাহা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য, তখন এ সভা সংস্থাপন তাঁহার নিজের কাজ।

বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মনুষ্যত্বই মনুষ্যের ধর্ম। মনুষ্যত্বের উপাদান আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি বা বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতা। ঐ বৃত্তিগুলিকে বঙ্কিমচন্দ্র চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্য্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী। মনুষ্যত্বের জন্য ঐ বৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত করিতে হইবে, কিন্তু তৎসঙ্গে তাহারা সমঞ্জস হওয়া চাই। তিনি 'কৃষ্ণচরিত্রে' বলিতেছেন :—

সকল বৃত্তির সর্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা-সাধন অতি তুরূহ। যাহা তুরূহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না—আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। কেন না, তিনি প্রথমতঃ অশরীরী; আমরা শরীরী। দ্বিতীয়তঃ তিনি অনন্ত; আমরা সান্ত, অতি ক্ষুদ্র। অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন।—১ম খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ।

এই সম্পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন জন্যই ঈশ্বরের শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতার গ্রহণ। আমি কৃষ্ণচরিত্র-বিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ বুঝাইয়াছি যে, মনুষ্যত্বের আদর্শ-প্রচারের জন্য ভগবানের মানবদেহ ধারণ। অন্য উদ্দেশ্য সম্ভবে না। আদর্শ মনুষ্য আদর্শকর্মী।—গীতাভাষ্য, পৃ. ২২৭।

'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—

কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে মানবরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথা বটে। যিনি অনন্ত শক্তিমান্, তাঁহার কাছে কংস-শিশুপালও যে, এক ক্ষুদ্র পতঙ্গও সে। বাস্তবিক যাহারা হিন্দু ধর্মের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য বা তুরাত্মাবিশেষের নিধন। আসল কথা, 'ধর্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'।

এই ধর্মসংরক্ষণ কেবল সম্পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন দ্বারাই হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ, ইহা ভাবিলে তাঁহার সকল কার্য্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্র-স্বরূপ রত্ন-ভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শ পুরুষতত্ত্ব।—'কৃষ্ণচরিত্র', ৪র্থ খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ।

---

* যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্রস্থিত করিয়া ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করা কৃষ্ণের একণে জীবনের উদ্দেশ্য। অতএব

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শ্রীকৃষ্ণই আদর্শ মানব। কারণ, সমস্ত মানবিক বৃত্তি তাঁহাতে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত অথচ সমঞ্জস।* 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশের পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'নবজীবনে' অনুশীলন ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছিলেন। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র প্রথম বারের "বিজ্ঞাপনে" তিনি লিখিতেছেন :—

অনুশীলন ধর্ম্মে যাহা তত্ত্বমাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্ম্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণ দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।

অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র এই আদর্শ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

মনুষ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাই, এ জন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি। আমরা ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়।

এই জন্য ধর্ম্মেতিহাসের প্রয়োজন। ধর্ম্মেতিহাসে (Religious History-তে) প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগের চরিত্র ব্যাখ্যাত থাকে। অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য; কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ, যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্য যিশুখৃষ্ট খৃষ্টিয়ানের আদর্শ এক কালে ছিলেন শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ ছিলেন। কিন্তু এরূপ ধর্ম্মপরিবর্দ্ধক আদর্শ যেমন হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্ম্মপুস্তকেই নাই, কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ আরও সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত আদর্শ। খৃষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্ম্মম ধর্ম্মবেত্তা। কিন্তু ইঁহারা তা নয়। ইঁহারা সর্বগুণবিশিষ্ট—ইঁহাদিগেতেই সর্ব্ববৃত্তি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্ম্মুকহস্তেও ধর্ম্মবেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান্ হইয়াও সর্ব্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছেন, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম্মশিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জ্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশ মাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখনও মনুষ্য-ভাষায় কীর্ত্তিত হয় নাই। আইস, আজ তোমাকে কৃষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করি।...

তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) শারীরিক বৃত্তিসকল সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দর্য্যে এবং অপরিমেয় বলে পরিণত; তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল সেইরূপ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য এবং জ্ঞানে পরিণত এবং প্রীতিবৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্ব্বলোকের সর্ব্বহিতে রত। —'ধর্ম্মতত্ত্ব', চতুর্থ অধ্যায়।

---

* কৃষ্ণ যখন আদর্শ মনুষ্য, তখন তাঁহার কোন বৃত্তিই অননুশীলিত বা স্ফূর্ত্তিহীন থাকিবার সম্ভাবনা নাই (কি শারীরিকী, কি জ্ঞানার্জ্জনী, কি কার্য্যকারিণী, কি চিত্তরঞ্জিনী)।...এই রাসলীলা কৃষ্ণ ও গোপীগণকৃত সেই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি অনুশীলনের উদাহরণ। কৃষ্ণপক্ষে ইহা উপভোগ মাত্র, কিন্তু গোপীপক্ষে

কংসবধের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—

এই কংসবধেই দেখি—কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্য্যদক্ষ, পরম ন্যায়পর, পরম ধর্মাত্মা, পরহিতে রত এবং পরের জন্য কাতর। এইখান হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি আদর্শ মনুষ্য।—'কৃষ্ণচরিত্র', তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ।

…যিশু বা শাক্যসিংহ যদি গৃহী হইয়া জগতের ধর্ম-প্রবর্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ধার্মিকতা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত সন্দেহ নাই। আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী। যিশু বা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী—আদর্শ পুরুষ নহেন।

পুনশ্চ—যিশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রবিৎ। অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও ঐরূপ। উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধার্মিক ও ধর্মজ্ঞ। অতএব কৃষ্ণই আদর্শ মনুষ্য।—'কৃষ্ণচরিত্র', ৪র্থ খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণ যে আদর্শ মানব, বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' এ কথা ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী এবং ধর্মপ্রচারক। সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বীদিগের, ধর্মবেত্তাদিগের এবং একাধারে সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের আদর্শ।…যিনি এইরূপে পরাক্রমে ও পাণ্ডিত্যে, বীর্যে ও শিক্ষায়, কর্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও ধর্মে, দয়ায় ও ক্ষমায়, তুল্যরূপেই সর্বশ্রেষ্ঠ—তিনিই আদর্শ পুরুষ।

'কৃষ্ণচরিত্রে'র উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—

বাল্যে কৃষ্ণ শারীরিক বলে আদর্শ-বলবান্। তাঁহার অশিক্ষিত বলপ্রভাবে বৃন্দাবন সুরক্ষিত… কংসের মল্ল প্রভৃতি নিহত হইয়াছিল। এই বল শিক্ষিত হইলে, তিনি সে সময়ের ক্ষত্রিয়সমাজে সর্বপ্রধান অস্ত্রবিৎ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কেহ কখনও তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই… সৈনাপত্যই যোদ্ধার প্রকৃত গুণ। সৈনাপত্যে সে সময়ের যোদ্ধাগণ পটু ছিলেন না … কৃষ্ণের সৈনাপত্যের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়—জরাসন্ধ-যুদ্ধে এবং রৈবতক পর্বতমালায় দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী-নির্মাণে। সেরূপ পরিচয় পুরাণেতিহাসে কোন ক্ষত্রিয়েরই পাওয়া যায় না…

শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তিসকল যে চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত, কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম (বিশেষতঃ ভগবদ্গীতায়) ইহার তীব্রোজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ … রাজধর্মে বা রাজনীতি সম্বন্ধেও দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তিসকল চরম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত … তাঁহার বুদ্ধি সর্বব্যাপিনী, সর্বদর্শিনী, সকল প্রকার উপায়ের উদ্ভাবিনী। মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া যতদূর সর্বজ্ঞ হওয়া যায়, কৃষ্ণ ততদূর সর্বজ্ঞ …

কৃষ্ণের কার্য্যকারিণী বৃত্তিসকলও চরম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত। তাঁহার সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা এবং সর্ব কর্মে তৎপরতার অনেক পরিচয় দিয়াছি। তাঁহার ধর্ম ও সত্য যে অবিচলিত, এ গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পরিপূর্ণ। সর্বজনে দয়া ও প্রীতিও এই ইতিহাসে পরিস্ফুট হইয়াছে। …

এই সকল শ্রেষ্ঠ বৃত্তি কৃষ্ণে চরম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনে তিনি পরাঙমুখ ছিলেন না—কেন না, তিনি আদর্শ মনুষ্য …

উপসংহারে বক্তব্য, কৃষ্ণ সর্বত্র সর্বসময়ে সর্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্মে অপরাঙ্মুখ,—ধর্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, লোক-হিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্তা, নির্মম, নিরহংকার, যোগযুক্ত, তপস্বী। …

and greatest of the Hindus"—আর যিনি বুঝিবেন যে, এই কৃষ্ণচরিত্রে ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যুক্তকরে বিনীত ভাবে আমার সঙ্গে বলুন—

নাকারণাৎ কারণাদ্ বা কারণাকারণাৎ ন চ।
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্মত্রাণায় তে পরম্।

এ সকল কথার সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। আমার বিশ্বাস, যিনিই নিবিষ্ট ভাবে 'কৃষ্ণচরিত্র' অধ্যয়ন করিবেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সুর মিলাইয়া বলিবেন—কৃষ্ণচরিত্র আদর্শ চরিত্র বটে, শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মানব—সর্বগুণাধার, সর্বজ্ঞানাধার, সর্ববলাধার, সর্বরসাধার—তাঁহাতে সমস্ত বৃত্তি ও শক্তি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত অথচ সু-সমঞ্জস। কিন্তু তাহাতে কি সিদ্ধ হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার? সত্য বটে, বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই।" এবং "মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার জন্য তিনি অবতীর্ণ হন"—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে যখন সম্পূর্ণ আদর্শ মূর্তিবিশিষ্ট, তখন শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা লক্ষ্য করেন নাই যে, যাঁহারা ঈশ্বরের সারূপ্য-প্রাপ্ত—গীতায় ভগবান্ যাঁহাদের 'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ' বলিয়াছেন, তাঁহারাও প্রয়োজনবশে উর্দ্ধলোক হইতে পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হইতে পারেন। বলা বাহুল্য, যাঁরা 'মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ,' তাঁরা ঈশ্বর না হইলেও আদর্শ পুরুষ—কারণ, তাঁহারা 'পূর্ণম্ অদঃ পূর্ণম্ ইদং'—তাঁহারা যিশু-খৃষ্টের ভাষায় "are perfect as our Father in Heaven is perfect"—পরব্যোমে পরমপিতা যেমন পূর্ণ, তেমনি সম্পূর্ণ।

পরব্যোমে পরমপিতা—সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সম্পূর্ণ—পূর্ণম্ অদঃ! এ কথার অর্থ কি? অর্থ এই যে, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম একাধারে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির উচ্ছল প্রস্রবণ—যুগপৎ অখণ্ড প্রতাপ, অতর্ক্য প্রজ্ঞা ও অজস্র প্রেমের অফুরন্ত উৎস—"is the glorious Trinity of Power, Wisdom and Bliss."

জীব যখন ব্রহ্মখণ্ড—মমৈবাংশঃ, "made in the image of God," ব্রহ্ম-অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ, ব্রহ্মসিন্ধুর বিন্দু—তখন জীবে নিশ্চয়ই "অস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্"। কিন্তু ব্রহ্মে যাহা প্রকট, জীবে তাহা প্রচ্ছন্ন,—ব্রহ্মে যাহা বিকশিত, জীবে তাহা বীজাবস্থ। এ ভাবে ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক—অধিকন্তু ভেদ-নির্দেশাৎ (ব্রহ্মসূত্র, ২।১।২২)। কিন্তু জীবের নিয়তি এই যে, কালক্রমে ঐ বীজ বৃক্ষে পরিণত হইবে—ঐ সকল অব্যক্ত শক্তি ও সম্ভাবনা সুব্যক্ত হইবে—ঐ সুপ্ত সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব প্রবুদ্ধ হইয়া জীব শিব হইবে। ইহারই নাম ব্রহ্মসারূপ্য—খৃষ্টানী ভাষায় Deification ("The wonder of wonders is the human made Divine.")। ইহাই গীতার "মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ"। তখন স্ফুলিঙ্গ সমিদ্ধ হইয়া অগ্নি হয়, বিন্দু সম্প্রসারিত হইয়া সিন্ধু হয়। যাঁহাদের আমরা অবতার বলি—তাঁহারা কেহ কেহ ঈশ্বরের অবতার বটেন, কিন্তু অপরে এইরূপ আদর্শ পুরুষ—Deified Men—ব্রহ্মের সারূপ্যপ্রাপ্ত মুক্তাত্মা।

শ্রীকৃষ্ণ কি ঈশ্বরের অবতার অথবা ঐরূপ সারূপ্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের অবতার? আমরা

(বঙ্কিমচন্দ্রের মতে) "মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না এবং মানুষী শক্তির দ্বারাই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।"* 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র ইহাই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অতিপ্রাকৃত কার্য্য দ্বারা বা নৈসর্গিক নিয়মের বিলঙ্ঘন দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন করেন নাই। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বিষ্ণুপুরাণ হইতে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

মনুষ্যধর্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ।
…মনসৈব জগৎসৃষ্টিং সংহারঞ্চ করোতি যঃ।
তস্যারিপক্ষক্ষপণে কোঽয়ম্ উদ্যমবিস্তরঃ॥
মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টাম্ ইত্যেবম্ অনুবর্ত্ততঃ॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ৫।২২।১৪-৭

"জগদীশ্বর হইলেও শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যধর্মশীল বলিয়া তাঁহার এইরূপ লীলা। যিনি সংকল্পমাত্রে জগতের সৃষ্টি সংহার সম্পন্ন করেন, অরি-ক্ষয় তাঁহার তুচ্ছ কার্য্য। তথাপি লীলাবশে মনুষ্যদেহধারীর অনুরূপ তাঁহার ক্রিয়া।"

এবং সমাদরের সহিত অধ্যাপক ল্যাসেনের ও উইল্‌সনের মত উপন্যস্ত করিয়াছেন :—

It is true that in the epic poems, both Rama and Krisna appear as incarnations of Visnu but they at the same time come before us as human heroes … acting according to human motives and taking no advantage of their divine superiority.—Lassen.

He [Krisna] exercises no superhuman faculties in defence of himself or his friends or in the defeat and destruction of his foes.—Wilson.

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—

ভরসা করি, ইহার পর কোন পাঠক বিশ্বাস করিবেন না যে, কৃষ্ণ মনুষ্যদেহে অতিমানুষ শক্তিদ্বারা কোন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

আমি বঙ্কিমচন্দ্রের এক জন নিবিষ্ট পাঠক। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য যে, আমার বিশ্বাস, মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ প্রয়োজন হইলে অতিমানুষ শক্তির প্রয়োগ করিতেন এবং তথাকথিত প্রাকৃতিক নিয়ম বিলঙ্ঘন করিতেন। গীতায় উল্লিখিত বিশ্বরূপ-প্রদর্শন ইহার জাজ্বল্য উদাহরণ। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনের কশ্মল অপনোদন জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজ শরীরে বিশ্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন—ইহাকে আমি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি—

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

---

* "প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত" প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র ঐ কথাই বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ জগদীশ্বরের আংশিক বা সম্পূর্ণ অবতাররূপে কল্পিত হইলেও মানুষের ন্যায় মানবধর্মাবলম্বী। মানবচরিত্রগত এমন একটি

'যোগেশ্বর' কৃষ্ণের ইহা অতিমানুষ কার্য্য নহে কি ? কথাটা একটু বুঝাইয়া বলি। ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে যে বিরাট্ ব্যবধান, ঐ ব্যবধান বিবিধ দৈবশক্তির দ্বারা অধিষ্ঠিত।* ঐ দৈবশক্তি পরস্পর বিবদমান। ঐ বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়কে আমরা এ দেশে দেবাসুর বলি—খৃষ্টানের Good and Evil Angels। সয়তান বা Ahriman কবিকল্পনা নহে—বস্তুতঃ ঈশ্বরের অভিপ্রেত বিবর্ত্তনের ঋতমার্গের পরিপন্থী নিঋতি বা Dark Powers আছে। পুরাণ-ইতিহাসে দেখিতে পাই, যখন ঐ বামমার্গী অসুরশক্তি অবতীর্ণ হইয়া বিবর্তনের গতিরোধ করিয়া ধরাকে ভারাক্রান্ত করে, তখন ধরিত্রীর আকুল আহ্বানে ভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন—

ভূমেঃ সুরেতরবরূথ-বিমর্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।

—ভাগবত, ২।৭।২৬

ইহাই গীতার "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্"। কৃষ্ণ অবতারের পূর্বেও ঠিক ঐরূপ ঘটিয়াছিল। কয়েক জন প্রবলপরাক্রান্ত অসুর কংস, জরাসন্ধ, শিশুপালরূপে অবতীর্ণ হইয়া উন্নতির পথ অর্গল-বদ্ধ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বিরোধিতা করিতে তাহারা যে মনুষ্যশক্তির অতিরিক্ত কিছু করে নাই—ইহা সম্ভব নহে। তাহাদের কৃত বাধা অপনোদন করিয়া ধরার ভার লাঘব করিতে যদি শ্রীকৃষ্ণ সময়ে সময়ে দৈবশক্তির প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাতে অবিশ্বাসের কি আছে ? বিশেষতঃ যখন বঙ্কিমচন্দ্র অতিপ্রকৃতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁহার রচনার নানা স্থানে তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত পাঠককে শুনাইলাম। এইবার আমার বক্তব্য বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ধর্মজগতের প্রধান প্রহেলিকা—greatest mystery, অত্যদ্ভুত রহস্য। বঙ্কিমচন্দ্র যে এই জটিল সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করিয়াছেন, এমন আমার বোধ হয় না। কথাটার একটু বিস্তার করি।

হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ঋষিরা বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই Triple Logos-এর প্রকাশগত প্রভেদের উপদেশ করিয়াছেন। বিষ্ণু কে ? বিষ্ণু "ক্ষৌণীভর্তা"—অর্থাৎ আমাদের ভূমণ্ডলের অধিদেবতা (Planetary Logos),—বৈষ্ণব পরিভাষায় ক্ষীরোদশায়ী বা শ্বেতদ্বীপপতি। আমাদের পৃথিবীর যেমন ভর্তা (Planetary Logos) আছেন, সৌরমণ্ডলভুক্ত মঙ্গল বুধ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রহেরও সেইরূপ অধিপতি আছেন। তাঁহারা সেই সেই গ্রহের অধিদেবতা (Planetary Logos)।

তাঁহাদের সকলের উপরে সৌরমণ্ডলের অধিপতি মহাবিষ্ণু বা সূর্য্যনারায়ণ—যোঽসৌ আদিত্যে পুরুষঃ (উপনিষদ্)—Solar Logos—যিনি

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।

বৈষ্ণব পরিভাষায় ইনি গর্ভোদশায়ী বা চতুর্ভুজ নারায়ণ।

কিন্তু সৌরমণ্ডল (Solar system) ত' একটি নয়—অগণ্য। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের মত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আকাশে বিলম্বিত রহিয়াছে—কারণ, প্রত্যেক তারা এক একটি সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র—"Each star is a sun and as such the centre of a solar system."

কোটিকোট্যযুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি বৈ।

বরং সমুদ্রসৈকতের বালুকণা গণিয়া শেষ করা যায়—কিন্তু অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের গণনার শেষ হয় না—

সংখ্যা চেৎ রজসাম্ অস্তি বিশ্বেষাং ন কদাচন।

ঋষিরা বলেন, প্রত্যেক সৌরমণ্ডলের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঈশ্বর বা Solar Logos আছেন—ইঁহারা প্রত্যেকে ত্রিমূর্তি বা Trinity—তিনেই এক, একেই তিন।

প্রতিবিশ্বেষু সন্ত্যেব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।

কিন্তু এই সমস্ত ঈশ্বরের উপর এক জন মহেশ্বর পরমেশ্বর আছেন—তিনিই Central বা Supreme Logos—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর—জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ—তিনি অগণ্য ঈশ্বরের একমাত্র ঈশ্বর—এক এব মহেশ্বরঃ।

তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্—শ্বেতাশ্বতর

ইনিই বেদান্তের পরব্রহ্ম—একমেবাদ্বিতীয়ম্—বৈষ্ণব পরিভাষায় কারণার্ণবশায়ী বা গোলোকপতি।

এখন প্রশ্ন এই—শ্রীকৃষ্ণ যদি অবতার, তবে কাঁহার অবতার—বিষ্ণুর, মহাবিষ্ণুর, না মহেশ্বরের? এ সম্পর্কে শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিভ্রান্ত হইতে হয়।

আমরা দেখি, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরিচয় দিতে বলিয়াছেন :—

মত্তঃ পরতরং নান্যং কিঞ্চিদ্ অস্তি ধনঞ্জয়!
ময়ি সর্বম্ ইদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ।—৭।৭
"আমা হতে পরতর নাহি কিছু ধনঞ্জয়!
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব সূত্রে যথা মণিচয়।"

সভাপর্বে ভীষ্মদেবের মুখে শুনি—

কৃষ্ণ এব হি লোকানাম্ উৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বম্ ইদং ভূতং চরাচরম্ ।—২৮।২৩

"শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত লোকের অব্যয় উৎস—তাঁহা হইতেই এই চরাচর বিশ্ব।"

ভীষ্মপর্বে ব্রহ্মার উক্তি এই :—

এতৎ পরমকং ব্রহ্ম এতৎ পরমকং যশঃ।
এতদ্ অক্ষরম্ অব্যক্তম্ এতদ্ বৈ শাশ্বতং মহঃ ।—৬৬।৩

এক কথায়, শ্রীকৃষ্ণ মহেশ্বর, পরমেশ্বর—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

আবার দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য-নারায়ণ বা Solar Logos-এর সহিত অভিন্ন বলা হইতেছে—

যস্তু নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো মানুষেষ্বাসীৎ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥
—মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৬৭।৭১

—'যিনি দেবদেব সনাতন নারায়ণ, তাঁহারই অংশ নরলোকে প্রতাপশালী বাসুদেব হইলেন।'

অর্থাৎ এ মতে শ্রীকৃষ্ণ মহাবিষ্ণু—সূর্য-নারায়ণ (Solar Logos)।

অন্যত্র দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণু বা Planetary Logos বলা হইতেছে—

তথৈব ভৃগুশাপাদ্ বৈ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
অংশেন ভবিতা তত্র বসুদেবসুতো হরিঃ॥—দেবীভাগবত।

—'ভগবান্ অব্যয় বিষ্ণু ভৃগুশাপে অংশের দ্বারা বসুদেবপুত্র হইবেন।'

সে জন্যই প্রশ্ন করিতেছিলাম—শ্রীকৃষ্ণ কাঁহার অবতার—বিষ্ণুর, মহাবিষ্ণুর, না মহেশ্বরের?

সমস্যা আরও ঘনীভূত হয়—যখন শাস্ত্রগ্রন্থের অনেক স্থলে দেখি, শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ-ঋষির সহিত অভিন্ন বলা হইতেছে—সেই নারায়ণ-ঋষি, যিনি সত্য যুগে সখা নর-ঋষির সহিত বদরিকাশ্রমে দশ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

নরস্ত্বং পূর্বদেহে বৈ নারায়ণসহায়বান্।
বদর্য্যাং তপ্তবান্ উগ্রং তপো বর্ষাযুতান্ বহূন্॥
—মহাভারত, বনপর্ব, ৪০।১

বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয় লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু পাঠককে লক্ষ্য করিতে বলি।

ভীষ্মপর্বে দেখা যায়, ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

নরনারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণৌ পুরুষোত্তমৌ।
সহিতৌ মানুষে লোকে সংভূতাবমিতদ্যুতী॥—ভীষ্মপর্ব্ব, ৬৬।১১

—'সেই পুরাতন অমিততেজাঃ ঋষিশ্রেষ্ঠ নরনারায়ণ সম্প্রতি (দুষ্ট বধের জন্য) মনুষ্যলোকে (কৃষ্ণার্জুন-রূপে) আবির্ভূত হইয়াছেন।'

উদ্যোগপর্বেও এই কথার উল্লেখ আছে—

বাসুদেবার্জুনৌ বীরৌ সমবেতৌ মহারথৌ।
নরনারায়ণৌ দেবৌ পূর্বদেবাবিতি শ্রুতিঃ॥
অজেয়ৌ মানুষে লোকে সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ।

—'মহারথ বীর কৃষ্ণার্জুন সেই পূর্ব-দেব নরনারায়ণ। তাঁহারা সংযুক্ত হইলে ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবাসুরেরও অজেয়। সেই নারায়ণ ঋষি শ্রীকৃষ্ণ এবং নরঋষি অর্জুন।'

নরনারায়ণৌ যৌ তৌ তাবেবার্জুনকেশবৌ।
বিজানীহি মহারাজ! প্রবীরৌ পুরুষর্ষভৌ।—উদ্‌যোগ পর্ব্ব, ৯৬।৪৬

—'এই যে বীরোত্তম পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ, ইহাঁরা সেই নর ও নারায়ণ ঋষি।'

ঐ উদ্‌যোগ পর্ব্বের অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

নরস্ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষো হরির্নারায়ণো হ্যহম্।
কালে লোকমিমং প্রাপ্তৌ নরনারায়ণাবৃষী॥

—'হে অর্জুন! তুমি দুর্দ্ধর্ষ নর, আমি নারায়ণ হরি। আমরা সেই নারায়ণ ঋষি, কালক্রমে এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছি।'

এই সকল উক্তি হইতে জানা যায় যে, যুগ-প্রয়োজনে নর-ঋষি অর্জুনের দেহে আবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং নারায়ণ-ঋষি শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাই যদি হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইলেন কিরূপে?

এ সকল আপাত-বিরোধী মতের সমন্বয় কি? শ্রীকৃষ্ণকে একই নিশ্বাসে যে বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু ও মহেশ্বর বলা হইল, তাহারই বা সমাধান কি? এ প্রশ্নের আমি আমার 'অবতারতত্ত্ব' গ্রন্থে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি এবং আদরের সহিত, বৈকুণ্ঠগত পূর্ণেন্দু-নারায়ণ সিংহের 'চৈতন্যকথা' হইতে ঐ ভক্তপ্রবরের মত উদ্ধৃত করিয়াছি :—

কোথায় গোলোকপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, আর কোথায় আমাদের এই মর্ত্ত্যলোক। এই মর্ত্ত্যলোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ কি সহজ কথা?…তাই ঋষির মধ্যে মহাঋষি, জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী, ত্রিজগতের গুরু অর্দ্ধ-মনুষ্য, অর্দ্ধ-দেবতা নারায়ণ ঋষির অপেক্ষা। শ্রীকৃষ্ণের অন্নময় কোষ (physical vehicle) নারায়ণ-ঋষি। জন্মের সময়েও তিনি নারায়ণ-ঋষি এবং অন্তর্ধানের সময়েও তিনি নারায়ণ-ঋষি। বৃন্দাবনলীলায় তিনি গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ। মথুরালীলায় তিনি শ্বেতদ্বীপপতি বিষ্ণু এবং দ্বারকালীলায় তিনি শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ।

পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহের এই কথাগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণরূপধারী নারায়ণ-ঋষির শরীরে যে ঐশ তেজের আবেশ হইত, তাহারও তারতম্য ছিল। মোটামুটি, মথুরালীলায় তিনি যে তেজঃ ধারণ করিতেন, তাহা বিষ্ণুর তেজঃ; দ্বারকালীলায় তিনি যে তেজঃ ধারণ করিতেন, তাহা মহাবিষ্ণুর তেজঃ, এবং বৃন্দাবনলীলায় তিনি যে তেজঃ ধারণ করিতেন, তাহা মহেশ্বরের তেজঃ। অধিকন্তু ঐ তেজেরও আবির্ভাব তিরোভাব ঘটিত—'যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ।'

এই যে আবেশ—ইহার পাশ্চাত্য নাম control বা possession।*

বলা বাহুল্য, নারায়ণ ঋষি—যিনি শ্রীকৃষ্ণ অবতারের পার্থিব উপাধি—তিনি ভগবানের 'সাধর্ম্যম্ আগতঃ' সিদ্ধ পুরুষ—"Perfect as our Father in Heaven is perfect" :—

তাঁহাতে ভগবানের সৎ-ভাব, চিৎভাব ও আনন্দ ভাব, তাঁহার সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-শক্তি, তাঁহার প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তাঁহার সমস্ত মানবিক বৃত্তি—কি শারীরিকী, কি জ্ঞানার্জনী, কি কার্য্যকারিণী, কি চিত্তরঞ্জিনী—সম্পূর্ণ স্ফূর্ত অথচ সমঞ্জস—এক কথায় তিনি আদর্শ মানব—শুদ্ধ, পূত, অপাপবিদ্ধ। সে জন্যই তিনি কৃষ্ণাবতারে ঐশ তেজের বাহন হইতে পারিয়াছিলেন। অন্যথা শৌণ্ডিকের ভাণ্ড কি স্বর্গসুধার ভাজন হইতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব এই ভাবে বুঝিলে সকল দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায় এবং আমরা বুঝিতে পারি, কেন ভীষ্মপর্বে ব্রহ্মা কৃষ্ণ সম্পর্কে বলিতেছেন—

তং যোগিনং মহাত্মানং প্রবিষ্টং মানুষীং তনুম্।*
অবমন্যেৎ বাসুদেবং তম্ আহুঃ তামসং জনাঃ। —৬৬।২০

আরও বুঝিতে পারি, কেন শাস্ত্রগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে এক নিশ্বাসে নারায়ণ-ঋষি এবং বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু ও মহেশ্বর বলা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন, সাধারণতঃ (ordinarily) শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য বটেন, তবে আদর্শ মানব—কারণ, সচরাচর তিনি নারায়ণ ঋষি এবং মনুষ্যভাবে কার্য্য করেন—কিন্তু সময় সময় যখন ঐ 'মানুষী তনু'তে বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু বা মহেশ্বরের তেজঃ প্রবিষ্ট হয়—যেমন গীতায় বিশ্বরূপ প্রদর্শনের সময় কিংবা ভাগবতে ব্রহ্মমোহনের সময়—তখন তিনি ভগবান্—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য অবতারতত্ত্ব বোঝা প্রয়োজন। অতএব আগামী বারে অবতারতত্ত্বের আলোচনা করিব।

---

* রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের প্রসঙ্গেও আমরা শুনিতে পাই :—

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্যাতনামা স্মার্ত্ত, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য্য, এবং বাঙালীদের মধ্যে প্রথম বাংলা অভিধানকার হিসাবে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নাম আমাদের নিকট স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এখনও কেহ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। সেকালের সাময়িক-পত্রাদি ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র হইতে তাঁহার কথা যেটুকু জানিতে পারিয়াছি, এখানে তাহারই আলোচনা করিব।

বাল্য ও ছাত্রজীবন

বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে—১৮৪৫ সনের এপ্রিল মাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। তাহাতে তাঁহার বাল্য ও ছাত্রজীবন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাওয়া যায় :—

> মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৭০৭ শকের ২৯ মাঘ বুধবারে পালপাড়া* নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণের চারি পুত্র ; জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার, তিনি গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধৌত নামে খ্যাত ছিলেন ; মধ্যম পুত্রের নাম রামধন বিদ্যালঙ্কার, তিনি স্মৃতি শাস্ত্রে উৎকৃষ্ট রূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং আপন গৃহেতেই অধ্যাপনা করিতেন ; তৃতীয় পুত্রের নাম রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ; এবং শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন।
>
> বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্যাকরণাদি ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র স্বীয় গ্রামেই অধ্যয়ন পূর্ব্বক কাশী প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। পরন্তু প্রত্যাগমনানন্তর প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে শান্তিপুরস্থ রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামি ভট্টাচার্য্যের নিকটে স্মৃত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।
>
> পরন্তু হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী দেশ পর্য্যটন করত রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ কালেক্টরির দেওয়ান রাজা রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা তাঁহার শাস্ত্র চর্চ্চা বিষয়ে অত্যন্ত আমোদ প্রযুক্ত তীর্থস্বামিকে মহা সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন।···রামমোহন রায়··· তীর্থস্বামিকে সমভিব্যাহারি করিয়া ১৭৩৪ শকে [১৮১৪ ?] কলিকাতা নগরে আগমন করিলেন। এই কালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অন্য অন্য ভ্রাতারা তাঁহার প্রতি অনেক প্রকার বিরাগ প্রকাশ করাতে, এবং তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দেওয়াতে, তিনি অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েন, এ প্রযুক্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত তীর্থস্বামী রাজার নিকটে তাঁহাকে আনয়ন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন।

---

* শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ভুলক্রমে "মালপাড়া" লিখিয়াছেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অতিশয় বুদ্ধিমান, এবং সংস্কৃত ভাষাতে শব্দালঙ্কারাদি ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রে ও ধর্ম্ম শাস্ত্রে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন প্রযুক্ত রাজা তাঁহাকে মহা সম্ভ্রম পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ রাজার ইচ্ছানুসারে তাঁহার সমভিব্যাহারি শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক এক জন ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতের নিকটে উপনিষৎ ও বেদান্ত দর্শনাদি মোক্ষ প্রয়োজক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার স্বাভাবিক উজ্জ্বল মেধা বশতঃ অত্যল্প কাল মধ্যে উক্ত শাস্ত্রে অসাধারণ সংস্কারাপন্ন হইলেন। প্রথমতঃ তিনি বঙ্গভাষাতে এক অভিধান* ও জ্যোতিঃ শাস্ত্রের একখণ্ড প্রকাশ করেন, এবং তাহা বিক্রয় দ্বারা কিঞ্চিৎ ধন সংগ্রহ পূর্ব্বক পরিবারের বাসের জন্য শিমুলিয়াস্থ হেদুয়া পুষ্করিণীর উত্তরে এক বাটী ক্রয় করেন। পরন্ত তিনি রাজার নিকটে ক্রমশঃ অতিশয় প্রতিপন্ন হইয়া তাঁহার বিশেষ আনুকূল্য দ্বারা হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণে এক চতুষ্পাঠী সংস্থাপন পূর্ব্বক কয়েক জন ছাত্রকে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান এপ্রকার উজ্জ্বল হইল, যে সাকার উপাসকদিগের সহিত রাজার যে সকল শাস্ত্রীয় বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনিই প্রধান সহযোগী ছিলেন—রাজা তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেন না। এবম্প্রকার ধর্ম্ম চর্চ্চা জন্য তিনি ক্রমশঃ অত্যন্ত মান্য ও বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন।—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক।

ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাওয়া যায় :—

রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ যত্ন দ্বারা মাণিকতলাতে ব্রহ্মোপাসনা জন্য ক্ষুদ্র আকারে আত্মীয় সভা নাম্নী এক সভা সংস্থাপিতা হয়, তাহাতে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্রহ্ম জ্ঞান বিষয়ক ব্যাখ্যান করিতেন। পরে যখন ১৭৫১ শকের ১১ মাঘ দিবসে ব্রাহ্মসমাজ যোড়াসাঁকোস্থ বর্ত্তমান গৃহে স্থাপিত হইল, তখন তিনি তাহার এক জন অধ্যক্ষ হইলেন, এবং তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ক ব্যাখ্যান দ্বারা স্বদেশস্থ লোকদিগকে ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ প্রদান করিতে নিযুক্ত হইলেন।†…বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যদিও তাঁহার তাবৎ জীবন পর্য্যন্ত সাধারণ রূপে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য যত্নশীল ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তে ইহা সর্ব্বদা জাগ্রৎ ছিল, যে বিধিবৎ প্রতিজ্ঞার সহিত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে সে ধর্ম্মের স্থৈর্য্য হইতে পারে না, এবং তদনুসারে পূর্ব্বে একবার রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগী হইয়া এই রূপ বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসনা লোকদিগকে উপদেশ করিবার জন্য উদ্যোগ

---

* ১৮২০ সনে 'বঙ্গভাষাভিধান' নামে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অভিধান বর্দ্ধিত আকারে দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের স্বত্ব তিনি কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটিকে তিন শত টাকায় বিক্রয় করিয়াছিলেন। সোসাইটির চতুর্থ বর্ষের (১৮২০-২১) কার্য্যবিবরণের শেষে মুদ্রিত আয়ব্যয়ের হিসাবে ব্যয়-বিভাগের একটি দফা এই :—

Ram Chundro's Remuneration,
(including 120 Copies of his Obhidhan) … 300 0 0

এই অভিধান-প্রসঙ্গে পাদরী লং তাঁহার বাংলা পুস্তকের তালিকায় লিখিয়াছেন, "The author was a Pandit connected with the Calcutta School Book Society."

† আত্মীয় সভা ও ব্রহ্মসভা সম্বন্ধে যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ১৯৩৫ সনের 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে প্রকাশিত আমার "Societies founded by Rammohun Roy for Religious Reform"

করিয়াছিলেন ; কিন্তু তৎকালে অজ্ঞানের প্রাবল্য ও দ্বেষের আধিক্য প্রযুক্ত কেহ তদ্বিষয়ে সাহসী হইলেন না। সম্প্রতি যখন জ্ঞান বলে লোকের মন সত্য ধর্ম্ম গ্রহণের উপযুক্ত হইতেছে, তখন তিনি তাঁহার মানস সফল হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আচার্য্য রূপে বেদান্ত শাস্ত্রের সারার্থানুসারে বিধি পূর্ব্বক এই ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে প্রচার করিবার জন্য ১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময়ে প্রথমতঃ একবিংশতি ব্যক্তিকে উক্ত ধর্ম্মে প্রবিষ্ট করিলেন, এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মদিগের সম্মুখে যে মহানন্দ ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা অনেক ব্রাহ্মেরই হৃদয়ঙ্গম আছে।— 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় উদারমতাবলম্বী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বেই তিনি বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর পর এক জন পত্রলেখক ১১ মার্চ ১৮৪৫ তারিখের *Bengal Harkaru and India Gazette* পত্রে লেখেন :—

> The liberal *viavustha* which he recently gave regarding the re-marriage of Hindoo widows, on the application of the Bengal British India Society, should rank him at the head of Hindoo reformers.

কিন্তু বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সহমরণ-প্রথাকে শাস্ত্রীয় বলিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন। ১৮২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে গবর্ণর-জেনারেল বেণ্টিঙ্ক সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে আইন জারি করিলে ঐ আইন রহিত করিবার জন্য যে আবেদনপত্র রাজদরবারে প্রেরিত হয়, তাহাতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ লোকভয়প্রযুক্ত তিনি এরূপ করিয়া থাকিবেন ;—বিশেষতঃ এই সময় তিনি সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক, তাঁহার সহকর্ম্মী অধ্যাপকদের অনেকেই সহমরণ-প্রথার অনুকূলে ছিলেন। ইহার ফলে তাঁহাকে রামমোহনের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল।

কর্ম্মজীবন

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ

১৮২৭ সনের এপ্রিল মাসে পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ২৪-পরগণা জিলা-আদালতের জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হওয়ায়, কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। এই পদে এক জন যোগ্য অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার জন্য কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই পদের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। পনর জন প্রার্থীর মধ্যে তিনিই পরীক্ষায় সর্ব্বাংশে উপযুক্ত বিবেচিত হন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ১৪ মে ১৮২৭* তারিখ হইতে মাসিক ৮০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগ-সম্পর্কে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সেক্রেটরী উইলিয়ম প্রাইসের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিবার যোগ্য :—

---

*Abstract of Salaries and Establishment of the Calcutta Government Sanscrit College on 1st May 1835 ইহাতে "Date of Appointment" ...

...a public notification was issued, inviting the attendance of candidates at the Sanscrit College, for the purpose of undergoing an examination as to their respective qualifications for the office, as well as for obtaining certificates of proficiency as Pundit of the Court, the examination to be conducted by the Commitee appointed by Government to determine the fitness of candidates for public appointment. Fifteen individuals accordingly came forward on the occasion and they were duly examined by Mr. Wilson and myself orally and wrote written answers to Law questions in our presence. These exercises having been circulated to the other members of the Commitee, and compared with the result of the oral examination, the Members concur in considering Ramchandra Vidyavageesha as eminently qualified for the situation and the Secretary begs therefore to recommend him as a fit person to succeed to the appointment of Smriti Professor in the Sanscrit College, vacated by the resignation of Kasinatha. 16th May 1827.

বিদ্যাবাগীশের পদচ্যুতি

রামচন্দ্র দশ বৎসর সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাহার পর একটি অভাবনীয় ব্যাপারে তিনি পদচ্যুত হন। ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই :—

কাশীর বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের জমিদারী-সংক্রান্ত একটি মামলায়, গবর্মেণ্ট ১৮৩৬ সনের ১লা আগষ্ট দুইটি প্রশ্ন পাঠাইয়া তৎসম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের অভিমত বা ব্যবস্থাপত্র চাহিয়া পাঠান। পরবর্ত্তী ১৫ই আগষ্ট তারিখে রামচন্দ্র যথারীতি ব্যবস্থাপত্র দেন ; এই ব্যবস্থাপত্রে সংস্কৃত কলেজের অন্যান্য পণ্ডিতবর্গেরও স্বাক্ষর ছিল।

এই ব্যবস্থাপত্র সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেলের নিকট ভ্রমাত্মক বিবেচিত হওয়ায়, বিদ্যাবাগীশকে স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ হইতে অপসারিত করাই সাব্যস্ত হয়। তদনুসারে ১৩ মার্চ ১৮৩৭ তারিখে ভারত-গবর্মেণ্টের সেক্রেটরী ম্যাকনটেন (W. H.Macnaghten) বাংলা-সরকারের সেক্রেটরীকে যাহা লিখিয়া পাঠান, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

In the opinion of the Governor General of India in Council the whole of the Pundits of the Sanscrit College who had signed the Vyavastah deserved to be removed from the College, but as they are not professors of the science of Law and as their offence may have amounted to nothing more than carelessness in testifying the accuracy of the opinion which has since been proved to be erroneous, it may be sufficient as an example that the professor of Law, Ramchandar Surmona be expelled, and that the rest be admonished as to the impropriety of their conduct.

কর্ত্তৃপক্ষের এই আদেশ যথাসময়ে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে বিজ্ঞাপিত করিয়া তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত করা হয়। সংস্কৃত কলেজের কর্ম্মচারীদের মাহিনার খাতায়

১৮ মে ১৮৩৭ তারিখে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইংরেজীতে একখানি সুদীর্ঘ আবেদনপত্র গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলে পেশ করিয়াছিলেন; ইহাতে তিনি নিজের ব্যবস্থাপত্র যে নির্ভুল, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য পূর্ব্বগামী বহু পণ্ডিতের—এমন কি, উইলসন সাহেবের নজীরের উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানাইয়াছিলেন :—

> That this order in Council was carried into effect on the 1st instant, and copies of the correspondence forwarded to your memorialist on the 12th instant by the College Secretary, and that your memorialist was thus expelled from the Institution, thrown out of employ, and degraded in the estimation of Society, without the erroneousness of his opinion having been pointed out to him or an opportunity afforded for his conviction, or for enabling him to justify himself before the Supreme authority by furnishing such explanations as might have been required.

এই আবেদনপত্রে কোন ফল হয় নাই। এ-সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিতেছি :—

> READ an extract from the General Dept. No. 74 dated the 21 June last transferring for consideration Petitions of the Dismissed Pundits of the Benares and Sanscrit Colleges praying restoration to office.
>
> RESOLUTION : On a full and careful reconsideration of all the opinions which have been delivered in this case the Right Honble the Governor General of India in Council is of opinion that they afford a strong preponderating evidence, amounting to presumptive proof that the dismissed Pundits were actuated by corrupt motives in the exposition of the Law on the point submitted for their opinion. His Lordship in Council accordingly resolves that their petitions be rejected.—Extract from the Proceedings of the Rt. Honble the Governor General in Council in the Revenue Dept. under date the 25 Septr. 1837.

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পদচ্যুতির কারণ সম্বন্ধে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বলেন :—

> রাজা রামমোহন রায়ের সহিত কোন কোন ইংরাজের অপ্রণয় থাকাতে তিনি এক ব্যবস্থা উপলক্ষে রাজার সহযোগি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রতি অনর্থক অপবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করাইলেন।—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক।

দুইটি কারণে এই মন্তব্য ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়। প্রথমতঃ, রামচন্দ্রের পদ-চ্যুতির সাত বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন এবং তথায় ১৮৩৩ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়তঃ, পণ্ডিতদের ব্যবস্থাপত্র-সম্পর্কে কেবলমাত্র রামচন্দ্রই পদচ্যুত হন নাই—পরন্তু কাশী সংস্কৃত কলেজের কয়েক জন পণ্ডিতেরও চাকরি গিয়াছিল।

এই সংক্রান্ত নথিপত্র পড়িয়া আমার ধারণা হইয়াছে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রতি গবর্মেণ্ট সুবিচার করেন নাই। তাঁহার অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহার ব্যবস্থাপত্রের ত্রুটি তাঁহাকে দেখাইয়া দেওয়া হয় নাই;—তাঁহাকে আত্মপক্ষ-সমর্থনের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।

রামচন্দ্র শেষ-পর্য্যন্ত সুবিচার লাভের আশায় বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের নিকট

আবেদন করিয়াছিলেন। বিলাতের কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তিনি নিরপরাধী সাব্যস্ত হন। কিন্তু পূর্ব্বপদ* আর তিনি ফিরিয়া পান নাই; তাঁহাকে জানান হইয়াছিল যে, ভবিষ্যতে কোন পদ শূন্য হইলে অগ্রে তাঁহার বিষয় বিবেচনা করা হইবে।†

যে-ব্যবস্থাপত্র লইয়া এত কাণ্ড, তাহা পাঠ করিবার জন্য অনেক পণ্ডিতের কৌতূহল হইতে পারে। এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টে প্রশ্ন দুইটি-সমেত ব্যবস্থাপত্রখানি মুদ্রিত হইল।

হিন্দুকলেজ পাঠশালা

১৮৩৯ সনের জুন মাসে হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন বাংলা পাঠশালার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়। হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষগণ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে এই পাঠশালার প্রধান অধ্যাপকের পদে নির্ব্বাচিত করেন। ১৮ জানুয়ারি ১৮৪০ তারিখে এই পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বাংলায় একটি বক্তৃতা করেন। ইহা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু এদেশে কুত্রাপি ইহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ইহার একটি খণ্ড রক্ষিত আছে। তাহার সম্পূর্ণ ফোটো-প্রতিলিপি সম্প্রতি আনাইয়াছি; স্থানাভাবে বক্তৃতাটির কিয়দংশ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> সভাস্থ মহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে উপস্থিত দেখিতেছি তাঁহারা অনেকে পাঠশালার শিলারোপণের দিবস উপস্থিত ছিলেন, অদ্য পাঠারম্ভকালেও তাঁহারা এবং অন্যান্য মান্য বিজ্ঞ ধনাঢ্য বহুতর মহাশয়রা অধিষ্ঠিত আছেন এবং অস্মদ্দেশাধিপতি ইংলণ্ডীয় রাজকর্ম্মকারকেরা ও অন্যান্য ইংলণ্ডীয় মহানুভব মহাশয়রা এই সভাতে উপস্থিত থাকাতে অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের বিশেষ আহ্লাদ জন্মিতেছে, যেহেতু ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষীয় লোকদিগের মধ্যে কতিপয় লোকের এরূপ সংস্কার ছিল, যে রাজ্যাধিপতির স্বজাতীয় ভাষা প্রচারে যাদৃশ উদ্যোগ অনুরাগ এবং রাজস্বব্যয়, গৌড়ীয়-ভাষার প্রতি তাদৃশ নাই কিন্তু এইক্ষণে হিন্দুকালেজের অন্তঃপাতি এতৎ পাঠশালাসংস্থাপনে তাঁহাদিগের উৎসাহ এবং সাহায্য প্রদান দর্শনে ঐ ব্যক্তিদিগের পূর্ব্বসংস্কারের নিবৃত্তির সম্ভাবনা, যেহেতু তাহারদিগের এইক্ষণে অবশ্যই প্রতীতি হইবেক যে মহানুভব ইংলণ্ডীয় মহাশয়দিগের কদাচ এমত অভিপ্রায় নহে যে লোকোপকারিবিদ্যা কেবল তাঁহাদিগের স্বদেশীয় ভাষার অধীনে রাখেন, কারণ বিদ্যা এবং তৎসম্বন্ধি সংস্কার অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, ভাষা সেই বিদ্যার বাহকস্বরূপ হইয়া মনেতে সংস্কার জন্মাইবার সাধন মাত্র, অতএব যে কোন ভাষা উক্ত সংস্কারজননে সক্ষম অথচ

---

* রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ পদচ্যুত হইলে তাঁহার স্থলে সংস্কৃত কলেজের প্রথম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণ ১৮৪০ সনের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত অস্থায়ী ভাবে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাস হইতে ভরতচন্দ্র শিরোমণি মাসিক ৮০৲ বেতনে স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক নিযুক্ত হন। ভরতচন্দ্র ১৮৩০-৩৭ সন পর্য্যন্ত হিন্দু আইন পরীক্ষা কমীটির পণ্ডিত, ১১ ডিসেম্বর ১৮৩৭ হইতে ২ নবেম্বর ১৮৩৯ পর্য্যন্ত সারণ জিলা-কোর্টের জজপণ্ডিত, এবং তৎপরে বর্দ্ধমান জিলা-কোর্টের জজপণ্ডিত ছিলেন।

† রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পদচ্যুতি সম্পর্কে সমস্ত নথিপত্র কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আছে। এ-সম্বন্ধে বিলাতের কর্তৃপক্ষের আদেশাদি ভারত-গবর্মেণ্টের দপ্তরে দেখিয়াছি (Public Dept. Procdgs.

অনায়াসলভ্য তাহাই লোকের বিদ্যাৰ্জ্জনের কারণ হইতে পারে, বিশেষত প্রাচীন ইতিহাস ও লৌকিকপ্রত্যক্ষ যুক্তি সাহায্যে বিবেচনা করিলে এমৎ কদাচ সম্ভব হয় না যে ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষ যাহার পরিমাণ প্রায় দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার চতুরস্রক্রোশ, এবং যাহাতে প্রায় দশকোটি মনুষ্য বাস করিতেছে, এবং যদ্দেশীয়ব্যক্তিরা স্ব২ ভাষাতে লৌকিককর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে, এতাদৃশ প্রশস্ত রাজ্যের উক্তসংখ্যক লোকেরা কেবল ইংলণ্ডীয়ভাষাবলম্বনে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া সভ্যতা প্রাপ্তি পূর্ব্বক কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবেক।

* * *

সংস্কৃতভাষাবলম্বন না করিয়া গৌড়ীয়ভাষাতে বিদ্যা এবং দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দেওনের প্রয়োজন এই যে সংস্কৃত প্রচলিত লৌকিকভাষা নহে, কিন্তু শাস্ত্রীয়ভাষা এবং অতিশয় কঠিন, ও তদুপার্জ্জন বহুকাল ও বহুপরিশ্রমসাধ্য, অতএব দেশান্তরীয়ভাষাতে সাধারণের বিদ্যা উপার্জ্জনে যেরূপ ব্যাঘাত এবং তজ্জন্য দোষ, তাহা সকল সংস্কৃতভাষার অবলম্বনে বৰ্ত্তিবার সম্ভাবনা, একারণ দেশস্থ-সাধারণের বিজ্ঞতাকাঙ্ক্ষী হইলে প্রচলিত ভাষার অবলম্বন ব্যতিরেকে অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না, এইহেতু এতৎপাঠশালাস্থ ছাত্রদিগকে গৌড়ীয়ভাষাদ্বারা বিদ্যোপার্জ্জন করান যাইবেক, অর্থাৎ যে ভাষা তাহারা মাতৃক্রোড়াবধি লালন পালনদ্বারা অভ্যাস করিয়া তদ্দ্বারা জ্ঞাত পদার্থে সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, অতএব ইহাতে তাহাদিগের অপ্রাপ্ত সংস্কার যে ভাষান্তর তদভ্যাসের শ্রমনিবৃত্তি হওয়াতে অনায়াসে প্রয়োজনোপযোগি বিদ্যা অভ্যাস করিবেক।

* * *

এতৎ পাঠশালাতে যে২ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যাইবেক তাহা কথিত হইল, এবং বালকেরা ঐ সকল বিদ্যাতে পারগ হইলে যেরূপ বিদ্বান্ হইতে পারিবেক তাহা সভাস্থ মহাশয়দিগের অবশ্য অনুভূত হইতেছে। এই গুরুতর প্রার্থনীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্তে যেসকল শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন তন্মধ্যে প্রধানকর্ম্মের ভার হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন এবং উপযুক্ত সহকারীও দিয়াছেন আমিও আহ্লাদ পূর্ব্বক এই মহোপকারি বিষয়ের ভারগ্রহণ করিয়াছি···।

এক্ষণে আমি আশ্বাস করি যে আমার অধ্যাপকতাবস্থায় এতন্মহোপকারি আদি পাঠশালাস্থ কতিপয় ছাত্র শৈশবাবস্থায় মাতৃক্রোড়রূপ সুখশয্যাতে উপদেশব্যতিরেকে শ্রবণানুসারে যে ভাষা অভ্যাস করিয়াছে সেই ভাষাদ্বারা উৎকৃষ্ট বিজ্ঞ হয় এবং অস্মৎ শুভাদৃষ্ট বশত এই আকাঙ্ক্ষিত বিষয় সুসম্পন্ন হইলে এমত প্রত্যাশা করি যে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসবেত্তারা স্বস্ব গ্রন্থে উক্ত বৃত্তান্ত-সম্বলিত মদীয় নাম সংকলন করিবেন।

অপর, বোধ হয় যে এতন্মহোপকারি কর্ম্ম সমাধার ভার পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অস্মৎপ্রতি নির্দ্ধারিত ছিল এবং ইহাও তাঁহার মানস ছিল যে এতদ্দেশের পুনঃসভ্যাবস্থা মহাশয়দিগের দৃষ্টিগোচর হইবেক।

এই অভীষ্ট বিষয়ের সিদ্ধি তৎকালে হইবেক যৎকালে এতৎপ্রধান পাঠশালাহইতে সুশিক্ষিত ছাত্র ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষের দেশে, নগরে, গ্রামে, এবং কুটীরদ্বারে শিক্ষকরূপে প্রেরিত হইতে পারিবেক, সম্প্রতি এই সকল বাক্য মনঃকল্পিত প্রায় বোধ হইলেও ভবিষ্যদ্বাক্য যদি বিশ্বাস যোগ্য

এবং তৎকালে ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষস্থ ব্যক্তিদিগের লৌকিক ও পারমার্থিক স্বাধীনতা স্বয়ং দেদীপ্যমানা হইবেক।

এক্ষণে দেশনিয়মানুসারে প্রসিদ্ধ শ্লোকের আবৃত্তি পূর্ব্বক জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি।

যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
যস্মাদ্ধিয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি।

যাঁহার নিয়মে বায়ু সর্ব্বদা বহিতেছেন ও যাঁহার ভয়ে সূর্য্য যথাযোগ্যকালে উত্তাপ দিতেছেন, এবং যিনি অন্তর্যামী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করেন, তিনি তাবতের প্রতিপালক হউন।

কলিকাতা।
৬ মাঘ সন ১২৪৬ সাল।

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণঃ।
সংস্কৃত এবং গৌড়ীয়ভাষাধ্যাপকস্য
হিন্দুকালেজ পাঠশালা।

সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক

১৮৪১ সনের শেষাশেষি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী মধুসূদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হয়। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই শূন্য পদের জন্য আবেদন করিলে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত করেন।

বিদ্যাবাগীশ ১ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখ হইতে মাসিক ৫০্ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদকের কর্ম্মে যোগদান করেন। এই পদে তিনি মৃত্যুকাল (২ মার্চ ১৮৪৫) পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

মৃত্যু

কিছু দিন সংস্কৃত কলেজে কার্য্য করিবার পর বিদ্যাবাগীশ পীড়াগ্রস্ত হন এবং দীর্ঘকাল রোগভোগের পর তাঁহার মৃত্যু হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ :—

তিনি ১৭৬৫ শকের মাঘ মাসে পক্ষাঘাত রোগে পীড়িত হইলেন। তদবধি ইংরাজ ও বাঙ্গালি চিকিৎসক দ্বারা অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উপশম না হইয়া শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে লাগিল। ইহাতে তিনি অনুভব করিলেন, যে কাশী অঞ্চলের জল বায়ু সুস্থতাদায়ক, এবং তথায় উত্তম উত্তম মোসলমান চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা হইবারও সম্ভাবনা, অতএব তিনি ১৭৬৬ শকের ৯ ফাল্গুণ বুধবার দিবা নয় ঘণ্টার সময়ে কাশী যাত্রা করিলেন। কিন্তু তথায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে পরমেশ্বর তাঁহাকে পীড়ার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলেন, এবং তিনি ছয় কন্যা মাত্র বর্ত্তমান রাখিয়া গত ২০ ফাল্গুণ রবিবার [২ মার্চ ১৮৪৫] দিবা অষ্ট ঘণ্টার সময়ে মুরশিদাবাদে ৫৯ বৎসর ২১ দিন বয়ঃক্রমে ইহ লোক হইতে অবসৃত হইলেন।

হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ছয় মাস বিদ্যাবাগীশ ছুটি লইয়াছিলেন এবং তাঁহার স্থলে কুমারহট্ট-নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশের পুত্র গোবিন্দ শিরোমণি অস্থায়ী ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজকে পাঁচ শত টাকা দান করিয়া যান। ১ বৈশাখ ১৭৬৮ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র গোড়ায় নিম্নোদ্ধৃত অংশটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> বিজ্ঞাপন।—ব্রাহ্মসমাজের গত আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় পরলোক গমন কালে ব্রাহ্মসমাজের জন্য যে ৫০০ পঞ্চ শত টাকা দান করিয়াছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা। প্রধান উপাচার্য্য।

বিদ্যাবাগীশের মৃত্যু-তারিখ লইয়া বিতর্ক

বিদ্যাবাগীশের মৃত্যু-তারিখ লইয়া সম্প্রতি রায়-বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ ('প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩৪৩, পৃ. ৫৮৬) বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রচারিত বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর তারিখ ২ মার্চ ১৮৪৫ "ঠিক নহে"—উহা ২৩ ফেব্রুয়ারি হইবে ; কারণ, ১১ মার্চ ১৮৪৫ তারিখের 'বেঙ্গল হারকরা'য় এক জন পত্রলেখক এই তারিখের উল্লেখ করিয়াছেন।* বিদ্যাবাগীশ তত্ত্ববোধিনী সভার প্রাণস্বরূপ ছিলেন ; সেই সভার মুখপত্রে প্রচারিত তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ভুল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে চন্দ-মহাশয়ের উচিত ছিল—পূর্ব্বে এ-বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করা। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রচারিত বিদ্যাবাগীশের মৃত্যু-তারিখ যে নির্ভুল, তাহার প্রমাণ দিতেছি।

বিদ্যাবাগীশ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজের সহিত সহ-সম্পাদক রূপে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটরী রসময় দত্ত ৫ এপ্রিল ১৮৪৫ তারিখে কাউন্সিল অব এডুকেশনকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর সঠিক তারিখ দেওয়া আছে। পত্রখানি এইরূপ :—

> With reference to my letter dated 26th February last submitting for sanction a Bill for a moiety of salary of Ramchandar Bidyabageesha Assistant Secretary to this Institution retrenched by the Civil Auditor for the month of January last and order of Government dated 26th ultimo I have the honor to submit for sanction the enclosed Bill for a similiar retrenchment for February last.
>
> 2. Ramchandar Bidyabageesha died on the 2nd March last.

ইহা ছাড়া কলেজের কর্ম্মচারিবর্গের বেতনের হিসাবেও দেখিতেছি, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি (১৮৪৫) মাসের পুরা মাহিনা তাঁহার হইয়া "শ্রীমতি পূণ্য দেব্যাঃ" সহি করিয়া লইয়াছেন। মার্চ মাস হইতে বিদ্যাবাগীশের স্থলে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত গোবিন্দ শিরোমণি পুরা মাহিনা ৫০৲ টাকা লইয়াছেন।

---

* 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'ও ১৩ মার্চ ১৮৪৫ তারিখে এই পত্রলেখকের প্রদত্ত তারিখের পুনরাবৃত্তি

গ্রন্থাবলী

পণ্ডিত ও সুবক্তা হিসাবে বিদ্যাবাগীশের খ্যাতি ছিল। গ্রন্থরচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য কম ছিল না। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। **জ্যোতিষসংগ্রহসার**। ১০ মাঘ ১২২৩ সাল=১৮১৭, জানুয়ারি। পৃ. ১৫৫।

গ্রন্থের প্রারম্ভে মুদ্রিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে গ্রন্থকারের নাম ও নিবাস পাওয়া যায় :—

সেই সত্য পরাৎপরে বাক্যমন অগোচরে বিশ্বব্যাপি বিশ্বের কারণে।
দ্বিজরামচন্দ্র নাম বাস পালপাড়া গ্রাম নতিস্তুতি করি কায়মনে॥
বারতিথিরাশিলগ্ন শুনিতে সকলে মগ্ন গৃহস্থের সদা প্রয়োজন।
সবিশেষ জানিবারে জ্যোতিষ অপেক্ষা করে এইহেতু করিয়া যতন॥
শকে সপ্তদশশতে আটত্রিশ দিয়া তাতে সাধারণ বোধের কারণ।
জ্যোতিষসংগ্রহসার যথাশক্তি আপনার করিলাম ভাষাবিবরণ॥
প্রথম সংগ্রহ এই মনে বড় ভয় সেই যদি ত্রুটি থাকে কোনস্থানে।
শুধিবেন সাধুজনে কৃপা করি নিজগুণে দোষনাশে সাধু সন্নিধানে॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে ও রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে 'জ্যোতিষ-সংগ্রহসার' আছে।

২। **অভিধান**। মূল্য ১৲। ১৮১৮ (?)

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির প্রথম বার্ষিক বিবরণের (১৮১৭-১৮) ৮ম পৃষ্ঠায় এই অভিধান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায় :—

> A small volume has recently appeared, the design and contents of which are stated in an English and Bengalee advertisement prefixed. The author, Ramchundur Surma, there remarks that he has constantly had occasion to observe in private correspondence and public documents written in Bengalee the deficiency of his countrymen (Pundits only excepted) in orthography ; which has induced him to collect as many Bengalee words as are derived from the Sunscrit, and are in most common use, and to publish them, with their definitions or synonymous words,.in the form of a pocket volume. This little work therefore, under the name of *Obhidhan,* (vocabulary) is intended to instruct the natives both in the spelling and the meaning of terms.

ইহাই বাঙালী-রচিত প্রথম বাংলা অভিধান। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে এই অভিধানের এক খণ্ড আছে, কিন্তু তাহার আখ্যাপত্র নাই।

এই অভিধানের বর্দ্ধিত সংস্করণ ১৮২০ সনে প্রকাশিত হয়। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে ; তালিকায় এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :—

"বঙ্গভাষাভিধান pp. iv. 516. Cal. 1820. 12°"

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রহীন এক এক খণ্ড 'বঙ্গভাষাভিধান' আছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা

(৩) **পরমেশ্বরের | উপাসনা বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যান** | শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা কর্তৃক | ব্রাহ্ম সমাজ | কলিকাতা | বুধবার ৬ ভাদ্র | শকাব্দা | ১৭৫০ | [পৃ. ৭]

২য় ব্যাখ্যান (১৩ ভাদ্র), ৩য় (২০ ভাদ্র), ৪র্থ ('শনিবার ৩০ ভাদ্র") ৫ম (৭ আশ্বিন), ৬ষ্ঠ (১৩ আশ্বিন), ৭ম (২০ আশ্বিন), ৮ম (২৭ আশ্বিন), ৯ম (১০ কার্ত্তিক), ১০ম (১৭ কার্ত্তিক), ১২শ (১লা অগ্রহায়ণ), উনসপ্ততি (১১ মাঘ শনিবার শকাব্দা ১৭৫১)।

এই ব্যাখ্যানগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে 'পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথমাবধি সপ্তদশ ব্যাখ্যান', ২য় সংস্করণ, পৃ. ৬৩, কলিকাতা ১৭৫৮, আছে।

(৪) **বিবাদচিন্তামণিঃ।** ১৮৩৭। পৃ. ১৭৩।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বাচস্পতিমিশ্রের 'বিবাদচিন্তামণি'র একটি "শোধিত" সংস্করণ দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে ও কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে এই পুস্তক আছে।

(৫) **হিন্দুকালেজ পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বক্তৃতা।** ৬ মাঘ ১২৪৬ (=১৮ জানুয়ারি ১৮৪০)। পৃ. ১৬।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের এই বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র মিত্র-কৃত ইহার ইংরেজী অনুবাদও এই পুস্তিকার সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল। এই অনুবাদে প্রকাশ, বিদ্যাবাগীশ ইংরেজী জানিতেন না।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তিকা আছে।

(৬) **নীতিদর্শন।** ১৮৪১।

(ক) নীতিদর্শন | উপদেশ | ১ সংখ্যা | হিন্দুকালেজান্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রদিগের হিতার্থে অধ্যাপক শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক বিবৃত। ২১ মাঘ ১২৪৭ সাল। হিন্দু কালেজ মৃজাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে মুদ্রিত। [পৃ. ৯]

(খ) নীতিদর্শন | পিতাপুত্রের পরস্পর কর্ত্তব্য | উপদেশ | ২ সংখ্যা | হিন্দু কালেজান্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রদিগের হিতার্থে অধ্যাপক শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক বিবৃত। ২৯ ফাল্গুণ ১২৪৭ সাল। হিন্দুকালেজ মৃজাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে মুদ্রিত। [পৃ. ১১]

'নীতিদর্শন' পুস্তিকার এই দুইটি সংখ্যা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে 'নীতিদর্শনে'র ৩য়-৫ম সংখ্যা (একত্রে মুদ্রিত) আছে।

পরিশিষ্ট

কোন ব্যক্তির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র আপন শ্রমের দ্বারা কএক গ্রাম লাভ করিল তাহার পর দ্বিতীয় পুত্র নিঃসন্তান এক স্ত্রী রাখিয়া মরিল তৃতীয় পুত্রের পুত্রও নিঃসন্তান এক স্ত্রী রাখিয়া মরিল এবং ঐ স্ত্রী এখন পর্য্যন্ত নিঃসন্তানা বর্ত্তমানা আছে ইহাতে জিজ্ঞাসা করা যায় ১ প্রথম সওয়াল এই যে ঐ দ্বিতীয় পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং তৃতীয় পুত্রের পুত্রবধূর

২ দ্বিতীয় সওয়াল এই যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের ভগিনী পৌত্রের ঐ কএক গ্রামে অধিকার থাকে কি না ॥—

এই ব্যবস্থা বারাণস দেশের চলিত শাস্ত্রানুসারে দেওয়া যায় ইতি ॥—

১। কুরচীনামা ॥

পুত্র নং ১	পুত্র নং ২	স্ত্রী	পুত্র নং ৩	স্বামী নং ৪	কন্যা নং ৪
নিঃসন্তান মৃত	নিঃসন্তান মৃত স্ত্রী রাখিয়া	বর্ত্তমানা	মৃত	মৃত	মৃতা
	স্ত্রী বর্ত্তমানা		৩ পুত্রের পুত্র নিঃসন্তান মৃত		৪ কন্যার পুত্র মৃত
					কন্যার পৌত্র বর্ত্তমান

এতৎপ্রশ্নদর্শনেন যাদৃশবোধো জাতস্তদনুসারেণোত্তরং লিখ্যতে ।

প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরং ।

তৃতীয়ভ্রাতৃতৎপুত্রমরণসময়ে দ্বিতীয়ভ্রাতা জীবতি বা দ্বিতীয়ভ্রাতুরুপরমকালে তৃতীয়ভ্রাতৃতৎপুত্রৌ জীবত ইতি বিশেষঃ প্রশ্নদর্শনেন ন জ্ঞায়তে। তথাপ্যাদ্যকল্পে জীবতো দ্বিতীয়ভ্রাতুরবিভক্তগ্রামেষ্বধিকার ইত্যতস্তন্মরণানন্তরং বিভাগার্হসম্বন্ধিবিরহাৎ ভ্রাত্রাদিরহিতপতিধনে দ্বিতীয়ভ্রাতৃপত্ন্যা এব তত্রাধিকারস্তয়া তৃতীয়ভ্রাতৃস্নুষায়ৈ গ্রাসাচ্ছাদনং দেয়ং। দ্বিতীয়কল্পেপি অবিভক্তেষু তেষু গ্রামেষু তৃতীয়ভ্রাতৃতৎপুত্রয়োঃ ক্রমেণাধিকারস্ততস্তৃতীয়ভ্রাতৃমরণানন্তরং তৎপুত্রে মৃতে সম্বন্ধ্যন্তরাভাবাৎ তৎপত্ন্যা এব তত্রাধিকারঃ। দ্বিতীয়ভ্রাতৃপত্ন্যৈ তৃতীয়ভ্রাতৃস্নুষা ভক্তাচ্ছাদনং দদ্যাৎ ইতি পরন্ত স্ত্রীণামস্বাতন্ত্র্যাৎ যাবজ্জীবং তদ্ধনমুপভোক্তব্যং আবশ্যকপত্যৌর্দ্ধদেহিকক্রিয়াদ্যর্থং দানাদিকঞ্চ কর্ত্তব্যং নতু নটনর্ত্তকাদিদানবিক্রয়াদিকমিতি বারাণস্যাদিদেশপ্রচলিতমিতাক্ষরাবীরমিত্রোদয়বিবাদচিন্তামণিপ্রভৃতিগ্রন্থসম্মতা ব্যবস্থেতি ।

অত্র প্রমাণং ।

অপুত্রধনাধিকারে, পত্নীদুহিতরশ্চেতি, পত্ন্যেব দদ্যাৎ তৎপিণ্ডং কৃৎস্নমংশং লভেতেচেতি, অপুত্রধনং পত্ন্যভিগামীতি পত্নী ভর্ত্তুর্ধনহরীতি, অপুত্রস্য প্রমীতস্য পত্নী তদ্ভাগহারিণীতি, যাজ্ঞবল্ক্যবৃদ্ধমনুবৃদ্ধবিষ্ণুকাত্যায়নবৃহস্পতিবচনেষু প্রথমং পত্ন্যা ধনগ্রহণমুক্তং। ভ্রাতৃণামপ্রজাঃ প্রেয়াদিতি, পিতা হরেদপুত্রস্যেতি অনপত্যস্য পুত্রস্যেতি স্বর্যাতস্য হ্যপুত্রস্য ভ্রাতৃগামি দ্রব্যমিতি বিভক্তে সংস্থিতে দ্রব্যমিতি নারদমনুশঙ্খকাত্যানবচনেষু প্রথমং ভ্রাতৃপিতৃমাতৃপিতামহীপত্নীনামন্যতমস্য ধনসম্বন্ধো দর্শিতঃ। তত্র বচনানাং বিরোধপরিহারায় বিভক্তাসংসৃষ্টিন্যপুত্রে স্বর্যাতে পত্নী প্রথমং ধনং গৃহ্ণতীত্যয়মর্থসিদ্ধো ভবতীতি তথা তস্মাদপুত্রস্য স্বর্যাতস্য বিভক্তাসংসৃষ্টিনঃ পরিণীতা স্ত্রী সংযতা সকলমেব ধনং গৃহ্ণতীতি স্থিতং। ইতি মিতাক্ষরালিখনাৎ ভ্রাতৃপিতৃমাতৃপিতামহীনামভাবে বিভাগানর্হমৃতপতিধনে পত্ন্যা অধিকারঃ প্রতীয়তে ইতি। পিতৃব্যগুরুদৌহিত্রান্ ভর্ত্তুঃ স্বস্রীয়মাতুলান্। পূজয়েৎ কব্যপূর্ত্তাভ্যাং বৃদ্ধানাথাতিথীংস্ত্রিয় ইতি বীরমিত্রোদয়ধৃতপ্রজাপতিবচনং। ভরণঞ্চাস্য কুর্ব্বীরন্ স্ত্রীণামাজীবনক্ষয়াদিতি নারদবচনঞ্চ। যত্তু পারতন্ত্র্যবচনং ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতীত্যাদি তদস্ত পারতন্ত্র্যং ধনগ্রহণে তু কো বিরোধ ইতি মিতাক্ষরালিখনেন ধনগ্রহণেঽধিকারো বোধ্যতে ন তু দানবিক্রয়াদাবিতি। যত্তু গৃহীতধনায়াঃ পত্ন্যাস্তদ্ধনেন জীবনমাত্রং দানাধীকরণবিক্রয়েষু তু নাধিকার ইতি। মৃতে ভর্ত্তরি ভর্ত্রংশং লভেত কুলপালিকা। যাবজ্জীবং নহি স্বাম্যং দানাধমনবিক্রয়ে ইতি কাত্যায়নবচনাৎ প্রতীয়ত ইতি তদপি দৃষ্টার্থনটনর্ত্তকাদিদানাস্বাতন্ত্র্যপরং অদৃষ্টার্থদানে তদুপযোগিনো রাধীকরণবিক্রয়োশ্চ তেনৈবাধিকারাভিধানাদিতি বীরমিত্রোদয়লিখনমিতি মহাভারতে স্ত্রীণাং স্বপতিদায়স্তু উপভোগফলঃ স্মৃতঃ। নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ পতিদায়াৎ কথঞ্চন। অপহারং ঐচ্ছিকদানবিক্রয়াদিকমিতি বিবাদচিন্তামণিলিখনঞ্চেতি ।

প্রথমপ্রশ্নোত্তরলিখিতেদৃশস্ত্রীসংক্রান্তধনস্য স্ত্রীধনত্বাত্তয়োরন্তরাধিকারিণ্যাঃ স্ত্রিয়া উপরমে ব্রাহ্মাদি-বিবাহেন পত্নীত্বং প্রাপ্তায়াস্তদ্ধনে ভর্তৃসন্নিহিততরসপিণ্ডাভাবে ভর্তৃভগিনীপৌত্রত্বেন পতিপিতৃস্বস্রীয়পুত্রত্বেন বা ভর্তৃসন্নিহিতসপিণ্ডস্য প্রশ্নলিখিতদ্বিতীয়তৃতীয়ভ্রাতৃভগিনীপৌত্রস্যাধিকারঃ। আসুরাদিবিবাহেষু ভার্য্যাত্বং প্রাপ্তায়াস্ত যদ্যপি মাতৃপিতৃতৎসপিণ্ডানামধিকারস্তথাপ্যত্র তেষামভাবাৎ ভর্তৃসন্নিহিতসপিণ্ডস্য সপিণ্ডী-করণান্তশ্রাদ্ধকর্তুস্তস্যৈবাধিকার ইতি বারাণস্যাদিদেশপ্রচলিতমিতাক্ষরাবীরমিত্রোদয়নির্ণয়সিন্ধুপ্রভৃতিগ্রন্থ-সম্মতা ব্যবস্থা॥

অত্র প্রমাণং॥

আধিবেদনিকাদ্যঞ্চ স্ত্রীধনং পরিকীর্ত্তিতমিতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনব্যাখ্যায়াং আদ্যশব্দেন রিকৃথক্রয়সংবিভাগ-পরিগ্রহাধিগমপ্রাপ্তমেতৎ স্ত্রীধনং মন্বাদিভিরুক্তং। স্ত্রীধনশব্দশ্চ যৌগিকো ন পারিভাষিকঃ যোগসম্ভবে পরিভাষায়া অযুক্তত্বাদিতি মিতাক্ষরালিখনেন সংবিভাগপদবাচ্যসংক্রান্তধনস্যাপি স্ত্রীধনত্বমুপপাদ্য অপ্রজঃ স্ত্রীধনং ভর্ত্তুঃ ব্রাহ্মাদিষু চতুর্ষপীতি যোগীশ্বরবচনবিবরণে অপ্রজসঃ স্ত্রিয়াঃ পূর্ব্বোক্তায়াঃ ব্রাহ্মদৈবার্ষপ্রাজাপত্যেষু চতুর্ষু বিবাহেষু ভার্য্যাত্বং প্রাপ্তায়া অতীতায়াঃ পূর্ব্বোক্তং ধনং প্রথমং ভর্ত্তুর্ভবতি তদভাবে তৎপ্রত্যাসন্নানাং সপিণ্ডানাং ভবতি শেষেষু আসুরগান্ধর্ব্বরাক্ষসপৈশাচেষু তদপ্রজঃ স্ত্রীধনং পিতৃগামীতি মিতাক্ষরালিখনং। সপিণ্ডতা চৈকশরীরাবয়বান্বয়েন ভবতি। তথাহি পুত্রস্য পিতৃশরীরাবয়বান্বয়েন পিত্রা সহৈকপিণ্ডতা এবং পিতামহাদিভিরপি পিতৃদ্বারেণ তচ্ছরীরাবয়বান্বয়াৎ। এবং মাতৃশরীরাবয়বান্বয়েন মাত্রা তথা মাতামহাদিভিরপি মাতৃদ্বারেণ ইত্যাদ্যাচারাধ্যায়ে মিতাক্ষরালিখনেন মাতাপিতৃদ্বারেণ একশরীরাবয়বান্বয়ো ভগিনীপৌত্রেণ পিতৃস্বস্রীয়পুত্রেণ বা সহাস্তীতি। সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে ইতি মিতাক্ষরাধৃতবৃহন্মনুবচনেন তস্যাপি সপ্তমান্তর্গতত্বাৎ সপিণ্ডত্বসিদ্ধিরিতি। পিতামহ্যাশ্চাভাবে সমানগোত্রজাঃ সপিণ্ডাঃ পিতামহাদয়ো ধনভাজঃ ভিন্নগোত্রাণাং সপিণ্ডানাং বন্ধুশব্দেনোপাত্তত্বাদিতি মিতাক্ষরালিখনে ভিন্নগোত্রাণাং সপিণ্ডানামিতি সামান্যনির্দ্দেশাৎ বন্ধুপদস্যোপলক্ষণতয়া সর্ব্বেষাং ভিন্নগোত্রসপিণ্ডানাং গ্রহণমবশ্যং বক্তব্যং বক্ষ্যমাণ-মাতৃস্বস্রীয়াদিমাত্রপরত্বে তদেব নির্দ্দিশেৎ ব্যবহিতসপিণ্ডমাতামহীভগিনীপুত্রাণামধিকারঃ সন্নিহিততরস্ব-ভাগিনেয়স্য চানধিকার আপদ্যেত অতএব সন্তুয়সমুত্থানে বিজ্ঞানেশ্বরেণৈব "দেশান্তরে গতে প্রেতে দ্রব্যং দায়াদবান্ধবাঃ।" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনব্যাখ্যানে বান্ধবা মাতৃপক্ষীয়া মাতুলাদ্যা ইত্যনেন ভিন্নগোত্রসপিণ্ডানাং মাতুলাদীনামধিকারঃ স্বহস্তিতঃ। ন চ সন্তুয়সমুত্থান এব বান্ধবপদবাচ্যমাতুলাদীনামধিকারো বাচনিক ইতি বাচ্যং। পৌর্ব্বাপর্য্যনিয়মশ্চ পত্নীদুহিতর ইত্যাদিপ্রতিপাদিত এবাত্রাপি জ্ঞেয়ঃ। শিষ্যসব্রহ্মচারিব্রাহ্মণনিষেধো বণিক্‌প্রাপ্তিশ্চ বচনপ্রয়োজনং ইতি তত্রত্যলিখনাসঙ্গতেরিতি যোগীশ্বরবচনেঽপি বন্ধুপদেন মাতুলাদ্যুপলক্ষণ-মন্যথা মাতুলাদীনামগ্রহণমেব প্রসজ্যেতেতি তৎপুত্রাণাং ধনাধিকারস্ততঃ প্রত্যাসন্নানাং তেষামেব স নেতি মহদনৌচিত্যমাপদ্যেত। ইতি বীরমিত্রোদয়ঃ স্নুষা স্বস্রীয়তৎপুত্রা জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবাঃ। পুত্রাভাবে তু কুর্ব্বীরন্ সপিণ্ডাস্তং যথাবিধি ইতি নির্ণয়সিন্ধুধৃতবৃহদ্‌যমবচনং। পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রো বা ভ্রাতা বা ভ্রাতৃসন্ততিঃ। সপিণ্ডসন্ততির্ব্বাপি ক্রিয়ার্হো নৃপ জায়তে ইতি চ তদ্ধৃতবিষ্ণুপুরাণবচনং উপকারকত্বেন ধনসম্বন্ধস্তু পুত্রাদীনাং ত্রয়াণাং পিত্রাদিত্রিকমহোপকারকারিত্বাৎ পুত্রাদিভিগৃহীতং ধনং স্বামিন এবোপকারকং উপকারপ্রত্যাসত্ত্যা তদীয়মেবোপকারপ্রত্যাসত্তিশ্চাভ্যর্হিতা ইত্যাদি বীরমিত্রোদয়ে প্রসিদ্ধতর ইত্যলং প্রপঞ্চেন॥

বিদ্যামন্দিরস্থপণ্ডিতানাং সম্মতেয়ং ব্যবস্থা।

ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকশ্রীরামচন্দ্রশর্ম্মণাং শ্রীশম্ভুচন্দ্রশর্ম্মণাং শ্রীহরনাথশর্ম্মণাং শ্রীগঙ্গাধরশর্ম্মণাং শ্রীপ্রেমচন্দ্রশর্ম্মণাং শ্রীনিমাইচন্দ্রশর্ম্মণাং শ্রীজয়গোপালশর্ম্মণাং শ্রীহরি-প্রসাদশর্ম্মণাং শ্রীযোগধ্যানশর্ম্মণাং॥

[এই ব্যবস্থাপত্র-সম্পর্কে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ছাড়া আরও দুই জন পণ্ডিতের কর্ম্মচ্যুতি ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের এক জন ঈশ্বর দত্ত পাণ্ডে; অপর জন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত হীরানন্দ মিশ্র। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী, এই সকল পণ্ডিত পুনরায় সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত

মাণিক দত্ত ও মুকুন্দরাম

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার কবিকঙ্কণ চণ্ডীর বন্দনা অংশে মাণিক দত্ত নামক এক ব্যক্তির প্রতি বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, মাণিক দত্তের নিকট হইতে তিনি "গীত-পথের পরিচয়" লাভ করেন।[১] মালদহ-জাতীয় শিক্ষা সমিতিতে মাণিক দত্ত-রচিত একখানি চণ্ডীমঙ্গলের পুথি সংগৃহীত আছে। উক্ত সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় এই পুথির একটি পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন।[২] কিন্তু তন্মধ্যে মাণিক দত্তের সহিত মুকুন্দ চক্রবর্ত্তীর পরিচয় বা সাক্ষাৎকার সূচক কোন কথা পাওয়া যায় না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় সংপ্রতি মাণিক দত্ত-কৃত একখানি চণ্ডীমঙ্গলের খণ্ডিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে।[৩] ইহার মধ্যে এমন একটি অংশ পাওয়া যাইতেছে, যাহা দেখিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আলোচ্য মাণিক দত্তের প্রতিই মুকুন্দরাম বিনয় প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। এমন কি, হয়ত বা মাণিক দত্ত-রচিত চণ্ডীমঙ্গল দেখিয়া ও পাঠ করিয়াই মুকুন্দরাম তাঁহার বিখ্যাত কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই বর্ণনাটি যথার্থ হইলে বলিতে হয় যে, মাণিক দত্ত মুকুন্দের পূর্ব্বে চণ্ডীর গান রচনা করেন এবং তাহা দেখিয়া মুকুন্দ স্বীয় গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্তি লাভ করেন বলিয়া মাণিক দত্তের প্রতি তাঁহার বিনয় প্রকাশ স্বাভাবিক। উক্ত অংশটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

গীতের পুথি নিল দুর্গা বগলে দাবিআ।
মাণিক দত্তের শিয়রে দুর্গা বসিল চাপিআ॥

মাণিক দত্তের শিয়রে মারে নাথিকের ঘা।
তার কালা ছানি দূরে গেল দিব্য হৈল গা॥
চিআও বাছা মাণিক দত্ত গায়ে কর বল।
তোর ঘরে আইলাঙ দুর্গা সর্ব্বমঙ্গল॥
হের দেখ গীতের পুথি দিলাঙ তোমার তরে।
তুমি জাঞা গান কর কলিঙ্গ নগরে॥

জেখানে জাইআ ঘট করিবে স্থাপন।
সেই ঘটে আমি থাকিব সর্ব্বক্ষণ॥
রজনী প্রভাতে দত্ত…গ্য পাইল।
ভবানীর মঙ্গল পোথা পড়িতে লাগিল॥
বিস্তর পুথি দেখি দত্ত ভাবিল বিশেষে।
কেমতে গাইব এত গীত অষ্ট দিবসে॥
বিস্তর পুথি দেখি দত্ত অন্তরে ডরিল।
তিন শত বত্তিশ লাচাড়ি ভাবিআ রচিল॥
তিন শত বত্তিশ লাচাড়ি করিলেন গান।
দিশা পাঁচালি কৈল পদ মূর্ত্তিমান॥
রঘু রাঘব আর মুকুন্দ ব্রাহ্মণ।

মাণিক দত্তের সঙ্গে হইল দরশন।
মাণিক দত্ত কহিল পুথির বিবরণ।
শুনিঞা চমৎকার হইল তিন জন॥
রঘুয়ে রচিআ পুথি অদভুত করিল।
রাঘবে রচিআ পুথি বিদেশি করিল।
মুকুন্দে রচিআ পুথি কবিকঙ্কণ কৈল।

আপনি মাণিক দত্ত মাণিকদত্তি কৈল॥
মধ্যে চারি পদে দুর্গার গান হইল।
সংপ্রদা কারণে দত্ত ভাবিতে লাগিল॥
সংপ্রদা করিল দত্ত আপনার মনে।
প্রথমে আরম্ভ গীত কলিঙ্গ ভুবনে।
কার না লয় অর্থ বিত্ত কার না লয় ধন।
ঘরে ঘরে পূজিছে মঙ্গলচণ্ডী গান॥ ইত্যাদি

—২২ পত্র।

---

১ মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়॥—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৬ পৃঃ।

২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৭, ৪র্থ সংখ্যা, ২৪৭ পৃঃ।

৩ দিনাজপুর, বালুরঘাটনিবাসী স্কুল সাব ইনস্পেকটর শ্রীযুক্ত বনমালী ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (২)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র

এখন পর্য্যন্ত যত দূর জানা যায়, ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম ছাপাখানার প্রবর্ত্তন করেন পোর্ত্তুগীসেরা। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে তাঁহারা প্রথম আসেন এবং দক্ষিণ-ভারতের গোয়া অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহার অত্যল্প কাল মধ্যেই তাঁহারা ইউরোপ হইতে দুইটি মুদ্রাযন্ত্র আনাইয়া সেখানে স্থাপন করেন। ইহারই একটিতে ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক একটি গ্রন্থ পোর্ত্তুগীস ভাষায় রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। ইহাই ভারতবর্ষে মুদ্রিত সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ।

ভারতীয় ভাষা প্রথম ছাপার হরফে উঠে কোচীনে। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ গোন্‌সালভেস্ নামক এক জন স্পেনদেশীয় পাদ্‌রি মালায়ালাম-তামিল অক্ষর প্রস্তুত করিয়া সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার-প্রণীত 'ক্রিশ্চিয়ান ডক্‌ট্রিন' নামক পুস্তকের অনুবাদ 'ক্রীষ্ট্য বয়কনম্' মুদ্রিত করেন। ইহাই ভারতীয় ভাষায় সর্ব্বপ্রথম ছাপা বই। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যা 'দি নিউ রিভিউ' পত্রিকায় লিও প্রসারপিও-লিখিত "The First Printing Presses in India" প্রবন্ধে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্ত্তনের বিশদ ইতিহাস দেওয়া আছে।

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে বাংলা দেশের হুগলি শহরে ছেনি-কাটা বাংলা হরফে মুদ্রণ আরম্ভ হয়। অর্থাৎ এই বৎসর হইতে বাংলা অক্ষরে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে মুদ্রিত প্রমাণ বর্ত্তমান; কেবল সন্দেহজনক ব্যক্তিগত পুথি, নথি ও দলিলের উপর আমাদের নির্ভর নয়। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত চারিটি (কাহারও কাহারও মতে পাঁচটি) গ্রন্থ প্রাচীন বাংলা-গদ্যের নমুনা হিসাবে বর্ত্তমান থাকার প্রসিদ্ধি থাকিলেও আমরা এখন পর্য্যন্ত একটি ধর্ম্মগ্রন্থ ও একটি সম্মিলিত ব্যাকরণ-অভিধানেরই সন্ধান পাইয়াছি। এই দুইটিও একটি বিশেষ প্রাদেশিক কথিত ভাষা সম্পর্কিত—সমগ্র বাংলা দেশের লিখিত ভাষার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ অল্প। সুতরাং ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দকেই আমরা বাংলা-গদ্যের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ বৎসর বলিব। এই বৎসরেই হুগলি শহরে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড প্রণীত *A Grammar of the Bengal Language* পুস্তক ছাপা হয় এবং ইংরেজীতে লিখিত এই ব্যাকরণখানিতে দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের

কিছু বলিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয়গণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া প্রয়োজন।

ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যচর্চ্চায় ইংরেজ

মুর্শিদাবাদ জিলায় কাশিমবাজারের কুঠীতে জে. মার্শাল (J. Marshall) নামক এক জন ইংরেজ নিযুক্ত ছিলেন। ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা শুরু করেন ও শ্রীমদ্ভাগবতের ইংরেজী অনুবাদ করেন।* পরবর্ত্তী প্রায় শতাব্দী কাল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোনও কর্ম্মচারী আর এ বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। ইহার পরেই গবর্মেণ্টের অপ্রকাশিত রেকর্ডে (No. 355—Consultations, July 3) দেখা যায় যে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় ভাষা না জানার দরুন কটকের তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট মিঃ ব্রিষ্টোকে (Mr. Bristow) অপসারিত করা হইয়াছিল।† সুতরাং বুঝা যাইতেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতেই কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি কর্ম্মচারীদিগের দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতেই শহরের বাজারে বাজারে বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় লিখিত ঘোষণাপত্র লটকাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ক্লাইব কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকট একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

Mr. Watts still accompanies me in this campaign, and I cannot omit the opportunity of remarking of what great service he is to your affairs by his thorough knowledge of the language and people of this country.

অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম দশক হইতে ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন, হালহেড, চার্লস উইলকিন্স, জোন্‌স প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে পণ্ডিত-জনোচিত উৎসাহ ও কৌতূহল লইয়া গবেষণা শুরু করেন। ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন ইহাদের অগ্রণী। ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহাকে প্রাচ্য ভাষাতত্ত্বালোচনায় যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম এলাকা হইতে গ্ল্যাডউইন হেষ্টিংসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসের কিছু উপকরণ আছে। গ্ল্যাডউইন তৎপূর্ব্বেই *A Compendious Vocabulary, English and Persian, Compiled for the East India Company* নামক শব্দসংগ্রহ রচনা শেষ করিয়াছিলেন। গ্ল্যাডউইন লিখিয়াছিলেন,

…I have placed the Languages in the Order you see them, Gentlemen, to shew in what Manner the Arabic is incorporated with the Persic, and to exhibit how the Persic is inflicted in the Hindouse, as well as to endeavour to discover some Traces of the Shanskerit Language in the Bengal Dialect.………

---

* "He made a translation of the *Sanskrit Book entitled Serebaugabut Pooran* in the English language which was transmitted to England and was deposited in the British Museum." (B. M. Harl. MS. 4253-55).—*The Calcutta Review*, No. CCLXX, p. 397.

† *Selections from Unpublished Records of Government*, Vol. I, p. 146

ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিল মহেশ ।
বিভূতি ভুসন অঙ্গ জটা তার কেশ ॥

আনন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া চান্দরে ।
বিবিধ প্রকারে রাজা স্তুতি স্তুতি করে ॥

সোমদত্ত বলে যদি হইলা কৃপাবান ।
এক নিবেদন আমি করি তোর স্থান ॥

সভা মধ্যে সেনী মোরে অপমান কৈল ।
জতেক ভূপতি গন বসিয়া দেখিল ॥

অগ্নিবত অঙ্গে দহে সেই অপমান ।
এই নিবেদন আমি করি তোর স্থান ॥

যদি মোরে বর দিবা দেব পসুপতি ।
মহা ধনুর্দ্ধর হউক আমার সন্ততি ॥

তার পুত্রে মোর পুত্র জিনুক সমরে ।
রাজা গন মধ্যে জেন অপমান করে ॥

ইহা বিনু অন্য বর নাহি চাহি আমি ।
এই বর মোরে দেব আজ্ঞা কর তুমি ॥

নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড রচিত *A Grammar of the Bengal Language* (১৭৭৮ খ্রীঃ) পুস্তকের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। এই পুস্তকে বাংলা ছাপার অক্ষর সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার হয়

ৰাস্তাবন্দীৰ কমিস্যন সাহেবেৰা
সকল লোককে জ্ঞাতো কাৰণ খবৰ
দেন জদী কেহ টেক্সেৰ কোন বাবুদীৰ
বেয়াত কাৰণ আৰজী দেন তাহাৰ
যে কাৰণেৰ নিমিত্তে আৰজী দিবেন
সেই কাৰণেৰ তিন মাসেৰ মধ্যে
আৰজী দেন এবং টেক্সেৰ কমিটেৰ
সাহেবেৰ ৰসিদ দেখাবেন যে তাহাৰ
উপৰ টেক্সেৰ বাবদী দাওয়ানাই
তবে সাহেবেৰা আৰজী লইবেন
এবং আৰজী বিমজীম তজবিজ
কৰিয়া জদি টেক্সেৰ টাকা ফিৰিয়া
দিতে হয়ে তাহা ফিৰিয়া দেয়াবেন
কিম্বা যে বিহিত হয়ে তাহা কৰিবেণ

২রা সেপ্টেম্বর ১৭৮৪ তারিখের *Calcutta Gazette* পত্রে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি

গ্ল্যাডউইনের শব্দকোষ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ হইতে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এই সর্ব্বপ্রথম এক জন ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড এদেশীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার হিন্দু আইনের বিখ্যাত অনুবাদ-পুস্তক *A Code of Gentoo Laws* লণ্ডন হইতে ঐ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের একটি অধ্যায়ে শব্দসংগ্রহের তালিকায় অনেকগুলি বাংলা শব্দ স্থান পাইয়াছে ; বেনা, বেত, বহেড়া, ব্যাপারী, ভেড়ুয়া, ভাণ্ডারা, বাঁধ, কাহন, চণ্ডাল, চৈত, চৌকী, কুলী, কোল, পছাড়ি, ডাল, ঘি, ঘড়ি, গোমস্তা, গণ্ডা, হাট, হরকরা, হাওলা, কাঁসা, নালা, পান, পিপুল, ফটিক, পেয়াদা, পুঁথি, সাধ, শাক, ঠাকুর, তরকারী, টুকরি, তোলা, উকীল প্রভৃতি শব্দ তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্র ও বাংলা ছাপার হরফ

A Code of Gentoo Laws পুস্তকে যাহার সূত্রপাত, *A Grammar of the Bengal Language* পুস্তকে তাহারই পরিণতি দেখিতে পাই। কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ করিয়া তুলিবার জন্য হালহেড সাহেব উক্ত ব্যাকরণ রচনা করিয়া তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসকে উহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। হালহেডের ব্যাকরণ মুদ্রণের কাজে বাংলা হরফ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। তখন পর্য্যন্ত বাংলা হরফ প্রস্তুতের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। বোল্টস নামক কোম্পানীর এক জন ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী লণ্ডনে বসিয়া একবার এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। ওয়ারেন হেষ্টিংস বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত (এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার সুবিখ্যাত অনুবাদক) চার্লস উইলকিন্সকে স্মরণ করিলেন। হেষ্টিংস জানিতেন উইলকিন্স একবার নিতান্ত অবসরবিনোদনের জন্য ছেনি কাটিয়া দুই একটি বাংলা হরফ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বন্ধু হালহেডের পুস্তক-মুদ্রণে সহায়তা করিবার জন্য উইলকিন্স উৎসাহিত হইয়া কাজে লাগিলেন। হালহেড ও উইলকিন্স উভয়েই তখন হুগলীর কুঠীতে কর্ম্মচারী। উইলকিন্স হরফ-প্রস্তুতের কাজে পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক স্থানীয় এক জন কামারের সাহায্য গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তী কালে পঞ্চানন এই কাজে দক্ষ হইয়াছিলেন এবং এই পঞ্চানন ও তাঁহার জামাতা মনোহর শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের সাহায্যে এদেশীয় বহু ভাষার অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিলেন ; এখন পর্য্যন্ত বাংলা দেশে যে অক্ষর প্রচলিত আছে তাহা পঞ্চানন ও মনোহর নির্ম্মিত অক্ষরের আদর্শেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "বাংলা ছাপার হরফের জন্মকথা" প্রবন্ধ পড়িতে বলি।

বাংলা ছাপার হরফ সম্বন্ধে এখানে একটি কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যেদিন হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সূত্রপাত (১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে) হইয়াছে, সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এক দল পণ্ডিত একটা মোটা ভুল করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের

অমূলক। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা মুদ্রিত পুস্তক ও সেই সম্পর্কে ইতিহাসাদি আলোচনা করিয়া আমরা নিঃসংশয় হইয়াছি যে, সেকালে বাংলা ভাষার একটি পুস্তকও কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই। প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ *A Grammar of the Bengal Language* হইতে সুরু করিয়া যাবতীয় বাংলা অক্ষর সম্বলিত পুস্তক ছেনি-কাটা ছাঁচে ধাতুদ্রব্যে ঢালাই-করা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। কাটা হরফগুলি সমান ও সুদৃশ্য না হওয়াতেই ঐরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা আজও পর্য্যন্ত গল্পপ্রবণ গবেষকদের দ্বারা প্রচারিত হয়। আমাদের উক্তির প্রমাণ নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধে মিলিবে :—

১। *A Grammar of the Bengal Language*—N. B. Halhed, 1778, Preface pp. xxii—xxiv.

২। *The Friend of India*, July 1818, pp. 61-62, 64; "Progress of Indian Literature."

৩। *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward* by John Clark Marshman, 1859; Vol. I, p. 70; "First Printing in Bengalee."

উইলকিন্স-কৃত হরফে হালহেডের ব্যাকরণ হুগলির যে ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল সেই ছাপাখানার বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। নিম্নলিখিত দরখাস্তটি হইতে বুঝা যায় যে, ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্সের তত্ত্বাবধানে গবর্ণর-জেনারেল ও কাউনসিল কলিকাতাতে একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

To J. P. Auriol, Esq., Secretary to the General Department.

Sir,—The Hon'ble the Governor-General and Council having thought proper to establish a Printing Office under the Superintendence of Mr. Charles Wilkins, I am directed to transmit you the enclosed Copy of the Rates of Printing and to desire that you will prepare and furnish Mr. Wilkins with Copies of all such papers in your office as will admit of being printed, whether in the Persian, Bengal or Roman Character, leaving Blanks for Names, Dates and other occurrences as are liable to alter, and specifying the Number of each Form usually issued in the course of a year.

Revenue Department,
Fort William, *the 8th January 1779.*

I am, Sir,
Your most obedient Servant,

(Sd.) Geo. Hodgson,
Secretary.

Copy.
Rates of Printing.
For English Impressions.

For every Quire of Folio Post, Paper included.
If Printed on One Side... ... ... Sa. Rs. 3
If Printed on both sides ... ... " 5

For Persian and Bengali
For every Quire of Folio Post Printed on one side ... " 5
Do Do " 7

Revenue Dept. (Sd.) W. Webber,

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জেমস অগাষ্টাস হিকী তাঁহার 'বেঙ্গল গেজেট' মুদ্রণের জন্য কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন 'দি ক্যালকাটা গেজেট' প্রেস স্থাপন কারন। গবর্মেণ্টের যাবতীয় ছাপার কাজ এই ছাপাখানায় হইত।

মুদ্রাযন্ত্র-প্রতিষ্ঠার যুগে বাংলা গদ্য

সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা-গদ্যের যে নমুনাটুকু ইতিপূর্ব্বে (জগতধির রায়ের দরখাস্ত) উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই বাংলা-গদ্যের তৎকালীন প্রকৃতি ধরা পড়িবে; সেই গদ্যই কি ভাবে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্জ্জিত ও রূপান্তরিত হইতে হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় পৌছিল, তাহার ইতিহাস আজও পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে লিখিত হয় নাই। এক হিসাবে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যে ভাষার প্রামাণিক আত্মপ্রকাশ দেখিতেছি, তাহা বাংলা দেশে মুসলমান-প্রভাবের ফল। ধর্ম্ম ও সমাজ জীবনে দীর্ঘ ছয় শত বৎসরের বৈদেশিক শাসন নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সেই চাপে বাংলা ভাষার অন্তঃ ও বহিঃ প্রকৃতিও অব্যাহত থাকে নাই। কবিতায় ইহা তেমন প্রকট হয় নাই। একমাত্র ভারতচন্দ্র 'যাবনীমিশাল' ভাষা ইচ্ছা করিয়া প্রয়োগ করিয়াছিলেন; এমন কি, মুসলমান কবি আলাওলের ভাষাও সংস্কৃত-ঘেঁষা। কিন্তু ব্যাবহারিক জীবনে প্রাত্যহিক প্রয়োজন সাধনে গদ্যের প্রয়োগ; সুতরাং আরবী ও পারসী শব্দকোষের দ্বারা বাংলা দেশের মৌখিক ও বৈষয়িক ভাষা প্রবলভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত সে যুগের ভাষার নমুনা হিসাবে যত চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি দাখিল করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই এই আক্রমণের আঘাত সুস্পষ্ট। বাংলা দেশে যদি ইংরেজের আগমন না ঘটিত তাহা হইলে আজিও আমাদিগকে বাংলা ভাষা লিখিতে বসিয়া "গরিবনেওাজ শেলামত" বলিয়া সুরু করিয়া "ফিদবি" বলিয়া শেষ করিতে হইত। তাহা মঙ্গলের হইত কি অমঙ্গলের হইত, আজ সে বিচার করিয়া লাভ নাই।

সংস্কৃতীকরণ

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্ত্তী কালে হেন্‌রি পিট্‌স ফরষ্টার ও উইলিয়ম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতজননীর সন্তান ধরিয়া আরবী পারসীর অনধিকারপ্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই আরবী-পারসী-নিসূদন-যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালতসমূহে আরবী পারসীর পরিবর্ত্তে বাংলা ও ইংরেজী প্রবর্ত্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মও এই বৎসরে। এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক; আরবী পারসীকে অশুদ্ধ ধরিয়া শুদ্ধ পদ প্রচারের জন্য সেকালে কয়েকটি ব্যাকরণ-অভিধানও রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল; সাহেবেরা সুবিধা পাইলেই আরবী-পারসীর বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন; ফলে দশ পনর বৎসরের মধ্যেই বাংলা-

গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে স্বয়ং হালহেড এবং বাংলার ক্যাক্স্‌টন অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভগবদ্‌গীতার অনুবাদক চার্লস উইলকিন্স সংস্কৃত ও বাংলা শব্দসংগ্রহে* মনোনিবেশ করিয়া সংস্কৃত রীতিতে বাংলার শব্দকোষ সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ সালে লিখিত হালহেড সাহেবের মন্তব্যপাঠে এই সকল বৈদেশিক পণ্ডিতের মনোভাব সুস্পষ্ট ধরা পড়িবে। তিনি লিখিয়াছিলেন—

Hitherto we have seen the formation and construction of the Bengal language in all its genuine simplicity; when it could borrow Shanscrit terms for every circumstance without the danger of becoming unintelligble, and when tyranny had not yet attempted to impose its fetters on the freedom of composition·········how far the Modern Bengalese have been forced to debase the purity of their native dialect, by the necessity of addressing themselves to their Mahommedan Rulers······[who] obliged the natives to procure a Persian translation to all the papers which they might have occasion to present. This practice familiarised to their ears such of the Persian terms as more immediately concerned their several affairs; and by long habit they learnt to assimilate them to their own language, by applying the Bengal inflexions and terminations. †

অর্থাৎ, বাংলা-গদ্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলা লিখিত ভাষা প্রয়োজনমত সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার হইতে শব্দসম্ভার আহরণ করিত বলিয়াই ভাষার রীতি ও প্রকৃতি অকৃত্রিম ও সরল ছিল। কিন্তু মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদের অত্যাচারে সকল ব্যাপারে পারসী-ব্যবহার বাধ্যতামূলক হওয়াতে চলিত ভাষার শুদ্ধতা নষ্ট হইয়াছে এবং কেবল মাত্র অভ্যাসের দোষে বহু পারসী শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।

হালহেড তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় আরও বলিয়াছেন যে, খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ দ্বারা অধুনা বাংলা দেশে ব্যবহৃত ভাষার সম্যক্ হালচাল উপলব্ধি সম্ভব নয়। যে বহুসংখ্যক রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা বাংলা দেশ পীড়িত হইয়াছে সেগুলি দেশের ভাষার সারল্যও নষ্ট করিয়াছে এবং ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্নদেশবাসী ও পৃথক্ রীতিনীতিসম্পন্ন লোকদের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী লেনদেনের ফলে বাঙালীর কানে বৈদেশিক শব্দ আর অপরিচিত ঠেকে না। মুসলমান, পোর্ত্তুগীজ ও ইংরেজ পর-পর সকলেই ধর্ম্ম, আইন, কারুশিল্প ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত বহু শব্দসম্ভার বাংলা ভাষার কাঁধে চাপাইয়া দিয়াছে।‡

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হেন্‌রি পিট্‌স্ ফরষ্টার তাঁহার সুবিখ্যাত ইংরেজী-বাংলা অভিধান সঙ্কলন করিতে গিয়া বাংলা ভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

it [তাঁহার শব্দসংগ্রহ] will nevertheless assist in forming an idea of the richness of the language, and tend to show its capability of being applied

---

* N. B. Halhed প্রণীত *A Code of Gentoo Laws* (১৭৭৬ খ্রীঃ) ও হটন সাহেবের বাংলা-ইংরেজী অভিধানের (লণ্ডন ১৮৩৩) ভূমিকায় স্যর চার্লস উইলকিন্সের শব্দসংগ্রহের উল্লেখ দ্রষ্টব্য।

† N. B. Halhed : *A Grammar of the Bengal Language*, pp. 207-8.

to every species of composition, and of expressing every idea of the mind, without the use of Persian or Arabick pedantisms:—which, as far as my limited knowledge has enabled me, I have studiously endeavoured to avoid, while I have been solicitous to restore to their proper rank, the pure Bongalee terms, whose places they had usurped.……—Introduction, i.

……Exclusive of a stock of original words, more copious than the Greek itself, the polite Bongalee possesses a very great variety of modifying particles, which add much to the beauty and energy of the Tongue—*Ibid*, ii.

It must surely then appear a glaring inconsistency, that we should continue to use the Persian, with which the natives are as little acquainted as ourselves, as the official language; and daily experience proves the disadvantages of our not being able to hold a general personal intercourse, with the people committed to our superintendence, except through the medium of a third person, too frequently interested in imposing on both parties —*Ibid*, iv.

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝাইবার জন্ত ফরষ্টার সাহেব আদালতের একটি বিচারের দৃষ্টান্ত দ্বারা এই ভাষা-বিভ্রাট প্রকট করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ বর্ণজ্ঞানহীন সর্ব্বনিম্ন ডোম-শ্রেণীর এক জন ফরিয়াদী প্রথমতঃ থানার দারোগার নিকট কাহারও বিরুদ্ধে সামান্ত নালিশ জানাইল। পারসী ভাষায় তোতাকাহিনী পর্য্যন্ত দারোগা সাহেবের বিদ্যা। ডোমের আরজি দারোগা সাহেব পারসী অথবা বাংলাতে লিখিয়া লইলেন; যদি পারসীতে লেখেন তাহা হইলে এই পারসীবিশারদ পারসী হরফে কুৎসিত বাংলা লিখিবেন, মধ্যে মধ্যে পারসী বাক্যবিন্তাস থাকিবে; আর যদি বাংলায় লেখেন তাহা হইলে ফরিয়াদীর নালিশ তিনি এই শ্রেণীর পারসীতেই অনুবাদ করিয়া লইবেন!—সাক্ষীদের বক্তব্যও এই সঙ্গে এই পদ্ধতিতে লিখিয়া লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান হইল; সেখানেও আর এক দফা পারসীতে বাংলাতে তালগোল পাকাইল এবং শেষ পর্য্যন্ত নিজামৎ আদালতের নিকট ঘটনার বিবরণ বিচারার্থ প্রেরিত হইল। সেখানে এই অদ্ভুত বিবরণের ইংরেজী অনুবাদ যাহা দাঁড়াইল তাহাতে আসামীর দীর্ঘ কারাবাস, দ্বীপান্তর অথবা ফাঁসি পর্য্যন্ত হওয়া বিচিত্র নয়।

উইলিয়ম কেরীরও বিশ্বাস ছিল—

The Bengalee language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India and in point of real utility yields to none.

এই আন্দোলনের ফলে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বাংলা ভাষা যে রূপ লইয়াছিল W. S. Seton-Karr সে সম্বন্ধে ঐ সালে লিখিয়াছিলেন—

Closely dependant on the parent Sanskrit, it possesses many of the advantages, and few of the blemishes, which characterize that first of Indo-Germanic tongues. Though not without a few dialectical variations, it preserves mainly an unbroken regularity, from the banks of the Subhanrika [সুবর্ণরেখা], to the frontiers of Assam. It is simple in its structure, lucid

separably connected in our mind with those pleasing recollections, which the progress of education, and the first dawning of enlightened opinions in the Lower Provinces, cannot fail to excite···It has frequently been remarked that Bengali more closely resembles Sanskrit than Italian does Latin. We might go further, and almost say that it has altered very little more from the original, than modern Greek has from the language of Thucydides and Plato. Bengali has experienced but a moderate change from the vicissitudes of conquest, and the successive sway of Mussulman or Affghan dynasties. It is true that the influx of Persian and Arabic substantives, into the spoken and even the written dialect, has been very considerable : but the great landmarks of the language have remained fixed and unalterable.

এরূপ বিস্তৃতভাবে বাংলা ভাষা সম্পর্কে তৎকালীন ইংরেজ পণ্ডিতদের মতামত উদ্ধৃত করিবার কারণ এই যে, বর্ত্তমানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বলিয়া যাহা খ্যাত, অষ্টাদশ শতাব্দীর নীহারিকা-অবস্থা হইতে তাঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টাতেই তাহা প্রথম নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। এ বিষয়ে বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতি সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের কাছেই ঋণী ; অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙালীর দান নাই বলিলেই হয়। যে এক জন মাত্র বাঙালীর নাম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে পাই, তিনিও ইঁহাদের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত, ইঁহাদের উৎসাহ ও অন্নে প্রতিপালিত; স্বাধীনভাবে বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে ইঁহার কোনও কীর্ত্তিই নাই। এই একক বাঙালীর নাম রামরাম বসু। জন টমাস ও উইলিয়ম কেরী প্রবর্ত্তিত শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন সম্পর্কে ইঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যাহার সূত্রপাত, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহার একুশ বৎসরের ইতিহাস খুব বিরাট ও বিচিত্র হইবার কথা নয়, কিন্তু তথাপি সেগুলিই গোড়ার কথা এবং সত্য ও কৃতজ্ঞতার খাতিরে এই ইতিহাস আমাদিগকে জানিতেই হইবে। সত্য বটে কোনও মৌলিক রচনা এই কালে রচিত হয় নাই, সত্য বটে লেখক ও সংগ্রাহক মাত্রেই বৈদেশিক, তথাপি একথা আমাদের আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ইঁহাদের সমবেত চেষ্টাতেই বাংলা লিখিত-গদ্য একটা রূপ ধারণ করিতেছিল—যাহা বাঙালী-লেখকের লেখনীমুখে সর্ব্বপ্রথম 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

১৭৭৮—১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ

এই একুশ বৎসরের ইতিহাসে আমরা মাত্র ছয় জন বৈদেশিক কর্ম্মীর নাম পাইতেছি ; ইঁহাদের কীর্ত্তি ব্যাকরণ, অভিধান ও শব্দশিক্ষা প্রণয়নে এবং কয়েকটি আইনের বহির অনুবাদ রচনায় মাত্র পর্য্যবসিত। কিন্তু এই সকল মহানুভব ব্যক্তির অমানুষিক অধ্যবসায় ব্যতিরেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দুর্গম পথ দুর্গমই থাকিয়া যাইত ; আয়াসপ্রিয় ও

চালাইয়া একটা পথ গড়িয়া তোলা কঠিন হইত। এই বৈদেশিক ছয় জনের নাম আমরা শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিতেছি।

প্রথম—নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ *A Grammar of the Bengal Language* রচনা করিয়া চার্লস উইলকিন্স-নির্ম্মিত সীসার বাংলা হরফ ব্যবহার করিয়া তাহা মুদ্রিত করেন। মুদ্রণস্থল হুগলী।

দ্বিতীয়—জোনাথান ডানকান, ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে *Regulations for the Administration of Justice, in the Courts of Dewannee Adaulut* অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, The Honorable Company's Press.

তৃতীয়—এন. বি. এডমন্‌ষ্টোন ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে *Bengal Translation of Regulations for the Administration of Justice, in the Fouzdarry, or Criminal Courts ; in Bengal, Behar and Orissa* অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, The Honorable Company's Press.

ইনি ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে *Bengal Translation of Regulations for the guidance of the Magistrates. Passed by the Governor General in Council in the Revenue Department, on the 18th of May, 1792* [with some snpplementary enactments] অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, The Honorable Company's Press.

চতুর্থ—হেন্‌রি পিট্‌স্ ফরষ্টার "১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নবাব গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের হজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন। তাহা নবাব গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের হজুর কৌনসেলের আজ্ঞাতে মুদ্রাঙ্কিত" করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা।

এই হেন্‌রি ফরষ্টারই ছয় বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার সুবিখ্যাত *A Vocabulary in two parts, English and Bongalee, and vice versa* পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস।

পঞ্চম—এ. আপজন্, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি' প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, দি ক্রনিকল প্রেস।

এবং ষষ্ঠ—জন্ মিলার ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে *The Tutor* বা 'সিক্ষ্যা গুরু' পুস্তক প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল অনির্দ্দিষ্ট, সম্ভবতঃ কলিকাতা।

বাংলা-গদ্যের ভিত্তিপত্তনে এই ছয় জন ইংরেজের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও অধ্যবসায় সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের কালে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত বিশৃঙ্খল বাংলা ভাষাকে তাঁহারাই ব্যাকরণ-অভিধানের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। বাংলা ভাষা ও তাহার উন্নতিসাধনে হালহেড ও

ফরষ্টারের দান সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যভাষাবিৎ এইচ. টি. কোলব্রুক ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

Gaura, or, as it is commonly called, *Bengalah* or Bengali is the language spoken in the provinces, of which the ancient city of *Gaur* was once the capital. It still prevails in all the provinces of Bengal, excepting perhaps some frontier districts ; but is said to be spoken in its greatest purity in the eastern parts only ; and, as there spoken, contains few words which are not evidently derived from *Sanscrit*. This dialect has not been neglected by learned men. Many *Sanscrit* poems have been translated, and some original poems have been composed in it. Learned *Hindus* in Bengal speak it almost exclusively : verbal instruction in sciences is communicated through this medium, and even publick disputations are conducted in this dialect. Instead of writing it in the *Devanagari*, as the *Pracrit* and *Hindevi* are written, the inhabitants of Bengal have adopted a peculiar character, which is nothing else but *Deva-nagari* difformed for the sake of expeditious writing. Even the learned amongst them employ this character for the *Sanscrit* language, the pronunciation of which too they in like manner degrade to the Bengali standard. The labours of Mr. Halhed and Mr. Forster have already rendered a knowledge of the *Bengali* dialect accessible ; and Mr. Forster's further exertions will still more facilitate the acquisition of a language, which cannot but be deemed greatly useful, since it prevails throughout the richest and most valuable portion of the British possessions in India. —Vol. VII, pp. 223-4.

হালহেড ও তাঁহার ব্যাকরণ, ফরষ্টার ও তাঁহার অভিধান সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে অনেকে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন ; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের আলোচনা উল্লেখযোগ্য। আপজনের অভিধান সম্পর্কে আমি ৪৩শ ভাগ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৪র্থ সংখ্যায় যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছি। বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে এগুলির বিস্তৃততর পরিচয় অনাবশ্যক।

জোনাথান ডান্‌কান

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত জোনাথান ডানকান সাহেবের আইন-বহির অনুবাদটি বাংলা ভাষার ইতিহাসে একখানি মহামূল্য গ্রন্থ। বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত ইহাই সর্ব্বপ্রথম সম্পূর্ণ গদ্যগ্রন্থ। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২১৫+৩১। যে-সকল আইন নন্দকুমার-মামলার বিচারপতি বিখ্যাত স্যর ইলাইজা ইম্পে কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া 'ইম্পে কোড' নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এই গ্রন্থ তাহারই অনুবাদ। এদেশের কুত্রাপি এই পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই ; লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীতে ইহার এক খণ্ড আছে।

জোনাথান ডানকান ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিবিলিয়ান রূপে কলিকাতায় পদার্পণ করেন এবং ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। তৎকালীন বাংলা ভাষায় ইহার অসাধারণ দখল দেখিয়া

মপস্বল দেওয়ানি আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানি আদালতের
বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম ———

শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌসলের সাহেবলোক বিচারের যে নিয়ম ও ধারা
ইঙ্গরেজি ১৭৭২ সনের ২১ আগস্ত মাসে বাঙ্গালা ১১৭৯ সনের ৮
ভাদ্রে নিরুপণ করিয়াছিলেন তাহাতে পাটনা ও মুরশিদাবাদ ও ঢাকা ও
দিনাজপুর কিম্বা পুরনিয়া ও বর্দ্ধমান ও কলিকাতা এই সকল স্থানেতে
মপস্বলের দেওয়ানি আদালতের ও সহর কলিকাতায় সদর দেওয়ানি
আদালত আপিলের কচহরি স্থৈর্য্য হইয়াছিল তাহার পর ইস্তক ১৭৭৪
সন লাগায়দ ১৭৭৯ সন ইঙ্গরেজি সেই সদর আদালত স্থগিত ছিল
পরে ১৭৮০ সনে শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌসলি সাহেব লোকের
আজ্ঞামতে পুনশ্চ স্থৈর্য্য হইল কিন্তু শ্রীযুত বড় সাহেব ও কৌসলি
সাহেব লোক অনবকাস জন্যে কখন সেই সদর আদালতে বসিতে
পারেন নাই একারণ সেই সনের অক্টোবর মাসের ২৪ বাঙ্গালা সন
১১৮৭। ১১ কার্ত্তিক তারিখে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে সদর আদালতে

এক জন

জোনাথান ডানকান্-অনূদিত ও ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত *Regulations for the Administration of Justice in the Courts of Dewannee Adaulut* পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা

ওয়ারহ দুষ্টলোক দিগেকে গেরেপ্তার করিয়া নিচের লিখা হুকুম মাফিক
মোকদ্দমা তজবিজ করিয়া আদালতে দায়ের ও সায়েরের নিরিস্তায় রহিয়াথাকিবার
জন্যে ঐ সকল দুষ্টলোকের হাজির জামিন লইবেন ——

৪ ধারা ——

জখন নালিসী আরজি কাহারনামে খুনি ও ডাকাতি ও দিগর তক্সীর হায়ের
তহমতে ফৌজদারির সাহেবের নিকট পঁউছে সাহেব মজকুর ফৈরাদির প্রকৃত
নালিসের উপর সুকৃতি লওনের পর আসামী ধরিবা আনার জন্যে একওয়ারিন
ফৈরাদির ও মুক্তের তক্সীর তাহাতে লিখিয়া আপন মোহর ও দস্তখতে জারি
করিবেন আর জখন সাহেব মজকুরের সাক্ষাতে আসামী পঁউছে তাহার তহমত
তক্সীর তজবিজ তনকি করিয়া জবানবন্দি কিম্বা সুকৃতি লেখাইয়া লইবেন এবং
ফৈরাদী ও মোকর্দ্দমার ওাকিপকার লোক দিগের জবানবন্দি সুকৃতি করাইয়া
লেখাইবেন যে সুরতে এইমত তহকিক ও তজবিজের পর সাহেব মজকুরকে
নিশ্চিত হয় যে তক্সীর মজকুর প্রকৃত হয়নাঞি কিম্বা সে তহমত আসামীর
উপর নিতান্ত মিথ্যা সেইদণ্ডে আসামী মজকুরকে খালাষ দিবেন কিন্তু যে সুরতে
এমত নিশ্চিত হয় যে তক্সীর মজকুর প্রকৃত বটে ও ঐ তক্সীর আসামী মজকুর
করিয়াছে সাহেব মজকুর তক্সীরের উপজুক্ত মাফিক কিম্বা তাহাকে কএদ করিবেন
কিম্বা আদালতে দায়ের ও সায়েরে সে মোকর্দ্দমার তজবিজের জন্যে তাহার
হাজীর জামিন লইবেন ও ফৈরাদী ও ইস্সাদ লোক দিগরের জামিন লইবেন
মোকর্দ্দমার তজবিজ কালে বরওক্ত হাজির থাকেন ——

৫ ধারা

এন. বি. এডমনষ্টোন-অনূদিত ও ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত *Eengal Translation of Regulations for the Administration of Justice in the Fouzdarry, or Criminal Courts in Bengal, Eehar and Orissa* পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা

বারাণসীর রেসিডেন্ট সুপারিণ্টেনডেণ্ট হইয়া যান। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ আগষ্ট তারিখে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি বোম্বাইয়ের গবর্ণর ছিলেন। টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ ও মারাঠা-যুদ্ধ তাঁহার সময়েই সংঘটিত হয়।

জোনাথান ডানকানের ভাষার কিছু নমুনা দিতেছি—

মপস্বল দেওয়ানি আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানি আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম—

শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌসলের সাহেবলোক বিচারের যে নিয়ম ও ধারা ইঙ্গরেজি ১৭৭২ সনের ২১ আগস্ত মাসে বাঙ্গলা ১১৭৯ সনের ৮ ভাদ্রে নিরূপণ করিয়াছিলেন তাহাতে পাটনা ও মুরসিদাবাদ ও ঢাকা ও দিনাজপুর কিম্বা পূরনিয়া ও বর্দ্ধমান ও কলিকাতা এই সকল স্থানেতে মপস্বলের দেওয়ানি আদালতের ও সহর কলিকাতায় সদর দেওয়ানি আদালত আপিলের কচহরি স্থৈর্য্য হইয়াছিল তাহার পর ইস্তক ১৭৭৪ সন লাগায়দ ১৭৭৯ সন ইঙ্গরেজি সেই সদর আদালত স্থগিত ছিল পরে ১৭৮০ সনে শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌসলি সাহেব লোকের আজ্ঞামতে পুনশ্চ স্থৈর্য্য হইল কিন্তু শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌসলি সাহেব লোক অনবকাশ জন্যে কখন সেই সদর আদালতে বসিতে পারেন নাই একারণ সেই সনের অক্তোবর মাসের ২৪ বাঙ্গলা সন ১১৮৭।১১ কার্ত্তিক তারিখে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে সদর আদালতে এক জন হাকিম তাঁহারদিগের অভিপ্রায় মতে নিযুক্ত হবেন তিনি সেই আদালতে বসিয়া বিচার করিবেণ সংপতি তাহা অন্যথা হইয়া এই স্থির হইল যে সাহেবেরা আপনা হইতে অথবা আপনারদিগের প্রস্থে যাহারদিগকে নিযুক্ত করেণ তাঁহারা সেই কার্য্য করিবেণ আর মপস্বল দেওয়ানি আদালতের জিলাসকল বিস্তীর্ণ জন্যে লোকের ব্যামোহ হইত ইহা জানিয়া ও বিচার শীঘ্র ও ভাল মতে হয় একারণ ১৭৮১ সনের ৬ ছয়ঞি আপরিল বাঙ্গলা ১১৮৭ সনের ২৭ চৈত্রমাসে মপস্বলে আর কয়েক স্থানে নূতন দেওয়ানি আদালতের কচহরি মেদিনীপুর ও রঘুনাথপুর ও রঙ্গপুর ও চাতরা ও লোয়া ও দরভাঙ্গা ও ভাগলপুর ও নাটোর ও আজমিরিগঞ্জ ও বাকরগঞ্জ ও ইসলামাবাদ ও মুড়লিতে নিরুপিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বে লোকের আয়াস ও ব্যামোহ না হয় এ জন্যে পুরনিয়ার আদালত তাজপুরে নিরুপিত হইয়াছিল এখনও সেই হেতু লোয়ার আদালত মিছইতে ও রঘুনাথপুরের আদালত রাজহাট ও আজমিরিগঞ্জের আদালত সুলতান্সইতে স্থৈর্য্য হইল আর ইহার পূর্ব্বে কোন ২ সময় কোন ২ কার্য্যের নিমিত্তে মপস্বলের সকল আদালত ও সদর আদালতের বিচারের কারণ অনেক প্রকার আজ্ঞা হইয়াছে কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক কথা এমত আছে যে নূতন আদালত সকলের কার্য্যে আইসে না…

১৭৭৮ সনে মুদ্রিত যে পত্র পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, এই গ্রন্থের ভাষা তাহা অপেক্ষা কতখানি সংস্কৃত হইয়াছে তুলনা করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

এন. বি. এডমনষ্টোন

নীল বেঞ্জামিন এডমনষ্টোনও সিবিলিয়ান ছিলেন। পার্লামেণ্টের সদস্য স্যর আর্চিবল্ড এডমনষ্টোনের এই পুত্র ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিবিলিয়ান

হইয়া কলিকাতায় আসেন ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে; সেক্রেটারিয়েট হইতে তিনি গবর্মেণ্টের পার্সী-অনুবাদক পদে উন্নীত হন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গবর্ণর-জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটরী নিযুক্ত হন। তিনি ১৮১২ সাল হইতে ১৮১৮ সাল পর্য্যন্ত সুপ্রীম কাউন্সিলের মেম্বর ছিলেন ও ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক জন ডিরেক্টর হইয়াছিলেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এডমনষ্টোনের ভাষা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও পার্সীঘেঁষা। দৃষ্টান্ত দিতেছি—

সেওয়ায় মহালাত মুতালুকে সহর মুরসিদাবাদ ও আজিমাবাদ ও জাহাঁগির নগর জে এই তিন মোকামে আদালতের সিরিস্তা আলাহিদা মোকরর হইল আর এই তিন আদালতের এলাকার সরঈ সাহেব জিলাদিগের তজবিজমতে হইবে মঞ্জুর হইল এবং সেওায় সহর কলিকাতা জেবড় আদালতের তাবে আছে জারি থাকিবেক—

[অন্যত্র]—সকল ফেরকার লোককে রক্ষা করা হাকিমের কত্তর্ব্ব কর্ম্ম বিশেসত তাহাদিগে জাহারা সহজেই অত্যন্ত দুস্থ পেটার তালুকদারান ও রায়ত লোক ও আর খেত আবাদ করণওালা দিগের ভালর নিমিথ্যে ও রক্ষা করিবার নিমিথ্যে নবাব গবনর জানরেল বাহাদুর জখন মনাছেব বুঝেন আইন করিবেন…

হেন্‌রি পিট্‌স্ ফরষ্টার

হেন্‌রি পিট্‌স্ ফরষ্টারের জীবনী অনেকে আলোচনা করিয়াছেন।* তাঁহার বাংলা ও সংস্কৃত জ্ঞান ছিল অসাধারণ এবং প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলা ভাষা কিঞ্চিৎ মর্য্যাদা অর্জ্জন করিয়াছিল। সি. ই. বাক্‌ল্যাণ্ড তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

…largely through his efforts, Bengali became the official as well as the literary language of Bengal....

তাঁহার বিখ্যাত কর্ণওয়ালিস কোডের অনুবাদের একটু পরিচয় দিতেছি—

হাকীমের উচিত জে ছোট বড় সকল লোকের বিশেষতো দুস্থ ও গরিবদিগের রক্ষা নিয়ত করেণ অতয়েব ঐ শ্রীযুত সকল মফস্বলী তলুকদার ও প্রজা প্রভৃতি চাসী লোকদিগের কল্যাণ ও কুশলের নিমিত্ত যে কালে যে আইন করণ উচিত জানেন সেকালে তাহাই নির্দ্দিষ্ট করেণ কিন্তু এমত সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইবাতে কোনো প্রকারে জমীদার ও হজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারীদিগের শিরে যে মোকররী জমার ধার্য্য রহে তাহা দিবার বিষয়ে তাহারদিগের কিছু আপত্য ও ওজর হইবেক না।

জন্ মিলার

এখন পর্য্যন্ত মিলারের নাম বাংলা-ইংরেজী অভিধান সম্পর্কে লণ্ডের ক্যাটালগে, ‘বিশ্বকোষে’ ও ডক্টর সুশীলকুমার দের *History of Bengali Literature* পুস্তকে উল্লিখিত

দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার অভিধান কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রহীন যে পুস্তকখানিকে মিলারের অভিধান বলিয়া সুশীলবাবু উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পরে আপ্‌জনের 'বোকেবুলরি' বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং এত দিন মিলারের নামটাই ছিল—তাঁহার কীর্ত্তির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। রামকমল সেনের *A Dictionary in English and Bengalee* (1834) পুস্তকের ভূমিকায় লিখিত আছে—

> In 1801 a *Mr. Miller* compiled a work in English and Bengalee, containing in a thin folio volume about a hundred and forty pages, in which were given the alphabet, a few syllables, the names of a few of the productions, some elementary rules of Grammar and some stories not equal however to forty pages of the English Reader lately published by the School Book Society. He printed no fewer than 4000 copies of this work and the whole impression was subscribed for at 32 Rupees the copy, before the work issued from the press.—Pp. 17-18.

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকগণ সম্ভবতঃ রামকমলের এই বিবৃতিটুকু ভাল করিয়া দেখেন নাই, দেখিলে মিলারের ওয়ার্ডবুকটি 'অভিধান'-খ্যাতি লাভ করিত না। আমরা সম্প্রতি এই পুস্তকের একটি খণ্ডের সন্ধান পাইয়াছি ও পুস্তকের কয়েক পৃষ্ঠার ফোটোগ্রাফ আনাইয়াছি। জন মিলারের গ্রন্থের নাম—

> The Tutor or a New English and Bengalee Work, well adapted to teach the Natives English in three parts.
>
> শিক্ষ্যাগুরু কিম্বা এক নৈতন ইংরাজি আর বাঙ্গালা বহি ভালো উপযুক্ত আছে বাঙ্গালি দিগেরকে ইংরাজি শিক্ষা করাইতে তিন খণ্ডে Compiled Translated and Printed By John Miller 1797.

যে ক্যাটালগে এই পুস্তকের উল্লেখ দেখি তাহাতে ইহা 'শ্রীরামপুরে' মুদ্রিত বলিয়া উল্লেখ আছে। পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬+১৬৪। কিন্তু শ্রীরামপুরে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কোনও মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। সেখানে উইলিয়ম কেরীর যত্নে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া আমরা জানি। সুতরাং সম্ভবতঃ পুস্তকটি কলিকাতার কোনও ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

জন মিলারের কোনও পরিচয় সংগ্রহ করা দুরূহ। সেই সময় একাধিক 'জন মিলার' কোম্পানীর রাইটার রূপে নিযুক্ত ছিলেন; অন্য কোনও জন মিলারের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এই পুস্তকের ভূমিকার ভাষা এত অদ্ভুত যে তাহা পড়িলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, জন্ মিলার বাংলা ভাষা সম্পর্কে নিরঙ্কুশ ছিলেন। ভূমিকাটি অংশতঃ এইরূপ—

বাঙ্গালিদিগেরকে

আমি এই অবধি বুঝিয়াছি বিশয়ের সহিত। জে কোনো কেতাব না অদ্যাবধি প্রকাশ পাইয়াছে সিখাইতে তোমাদিগেরকে ইঙ্গরাজি কথা সহজে আর অনাআসে। তাহাতে লউয়েছে আমারে সাংগ্রহ করিয়া তরজমা করিতে এই কেতাব। এই উমেদ কর‍্যে জে এ তোমাদিগের সাহেবের দ্বারায় মঞ্জুর হয়।

আমার মনস্ত ছিলো সঁপরোধ করিতে এই কেতাব সমস্কৃততে। কিন্তু আমি এক্ষেনে দেখিলাম জে অতি অল্প লোক আছে জে আমার এ বিশয় বুঝে। অতয়েব আমি বিবেচনা করিয়া এ তরজমা করিয়াছি চলতি কথার দ্বারায়।

বাংলা-গদ্যের সহিত এই পুস্তকের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ না হইলেও বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম ইংরেজী ব্যাকরণ হিসাবে এই পুস্তক ইতিহাসে অতিশয় মূল্যবান্। প্লেটে মুদ্রিত সূচীপত্র হইতে এই পুস্তকের বিষয়বস্তুর ধারণা পাওয়া যাইবে। মিলার সাহেব ইংরেজী হইতে বাংলা অনুবাদের যে সহজ পদ্ধতি সেই যুগে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক তাহা কিছুকাল অনুসৃত হইয়াছিল বলিয়া ফিরিঙ্গি বাংলার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

ইহার পরেই আমরা শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত বাংলা-গদ্যের সম্পর্কের কথা বলিব।

---

৭ শ্রীশ্রীরাম—

সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার জমিদারান ও হুজুরি তালুকদারান আর [illegible] জমিনের মালিক সদরে মালগুজারিকরে তাহার দিগকে এস্তেহার দেওয়া জাইতেছে—

প্রথম দফা—

সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার সদর খাজানার দষ সালা বন্দবস্তের জে সকল আইন ইংরেজী সন ১৭৮৯ সালের মাহ সেপ্তম্বরের ১৮ তারিখে মুতাবিক ২৭ জেলহেজ সন ১২০৩ হিজরি মুতাবেক ৫ মাহ আশ্বিন সন ১১৯৬ বাঙ্গালা ও ইংরেজী সন ১৭৮৯ সালের মাহ নবম্বরের ২৫ তারিখে মুতাবেক ৭ রবিওল আওল সন ১২০৪ হিজরি মুতাবিক ১২ মাহ অগ্রহায়ন সন ১১৯৬ বাঙ্গালা ও ইংরেজী সন ১৭৯০ সালের মাহ ফেবরবেলের ১০ তারিখে মুতাবিক ২৪ মাহ জমাদিওল আওল সন ১২০৪ হিজরি মুতাবেকে ১ মাহ ফাল্গুন সন ১১৯৬ বাঙ্গালায় হইয়াছে তাহাতে জমির মালিকের দিগে খবর দেয়াগিয়াছে জাহাঁরা সরকারের সহিত বন্দবস্ত করিবেন তাহাঁ দিগের জমির জমা ঐ আইন মাফিক জাহাধার্য্য হবেক তাহা দষ বৎসারের পরেয় বরকরার ওহামেসা কায়েম থাকিবেক জদ্যপী শ্রীহুৎ ইংরেজ কম্পানির তরফ বিলাতের কার্য্যের মুক্তিয়ার কারেরা মঞ্জুর করেন নতুবা কায়েম থাকিবেক না—

দ্বিতিয় দফা—

সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার জমিদারান ও হুজুরি তালুকদারান ও আর জেকেহ জমিনের মালিক সদরে মালগুজারিকরে তাহার দিগকে [illegible] নবাব গবনর জেনরেল বাহাদুর খবর দিতেছেন জে শ্রীহুৎ ইংরেজ

এইচ. পি. ফরষ্টার-অনূদিত ও ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'কর্ণওয়ালিস কোড' পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা

ক		
কাঁটালিকলা	a plantain of an angular kind	କାଁଠାଲି କଦଳି
কাটাইতে	to cauſe to cut	କଟାଇବାକୁ
কাটাৰ	a poignard, dagger	କଟାରି
কাটাৰি	a crooked broad knife	କଟାରି
কাটিতে	to cut, to hew	କାଟିବାକୁ
কাটিতে আঁখর	to blot a letter	କାଟିବାକୁ ଅକ୍ଷର
কাটনাকাটিতে	to ſpin	କାଟନା କାଟିବାକୁ
কাটৰা	a fence of boards	କାଠରା
কাঠুর‍্যা	a wood-cleaver	କାଠୁରିଆ
কাঁটা	a thorn, a fork, a fiſh-bone	କଣ୍ଟା
কাঠ	wood	କାଠ
কাঠ বেৰাল্	a ſquirrel	କାଠ ବିଲାଈ
কাঠেৰ	wooden, of wood	କାଠର
কাঠখড়	fire-wood	କାଠଖଡି
কাঠেরমাড়	a float of timber	କାଠରଗାଡି
কাঠা	a meaſure, a cotta or piece of ground [4 ells ſquare	କାଠା
কাড়াকাড়ি	force, violence	କଡାକଡି
কাড়িয়া আনিতে	to get by force	କାଢିଆଣିବାକୁ

১৭৯৩ সনে কলিকাতা ক্রনিকল প্রেসে মুদ্রিত সর্ব্বপ্রথম বাংলা-ইংরেজী অভিধানের (আপজন্) একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

THE

TUTOR,

OR A

New English & Bengalee Work,

WELL ADAPTED TO TEACH

THE NATIVES ENGLISH.

IN THREE PARTS.

সিক্ষ্যা গুরু

কিম্বা এক নৈতন ইংরাজি আর বাঙ্গালাবহি

ভালোউপযুক্ত আছে বাঙ্গালি দিগেরকে ইংরা

সিক্ষাকরাইতে তিনখণ্ডে

COMPILED, TRANSLATED, AND PRINTED,

By JOHN MILLER

1797.

জন্ মিলার-লিখিত ও ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'সিক্ষ্যা গুরু' পুস্তকের আখ্যাপত্র

বেওরা

প্রথমখণ্ড

দ্বিতিযখণ্ড

ত্রিতিয়খণ্ড

ভুল

Page—17—Line—13 পি জবারবদলেপঠ্যপ্রষ্ঠবগর্ত্ত
Page—42—Line—15 জুক্তকারকেরবদলেপঠ্যকর্ফ্যর গুন

'সিক্ষ্যা গুরু' পুস্তকের সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
১৩৪৫

বাংলা 'ভাষাপরিচয়ে'র ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাষার আশ্চর্য রহস্য চিন্তা ক'রে বিস্মিত হই। আজ যে বাংলা ভাষা বহু লক্ষ মানুষের মন-চলাচলের হাজার হাজার রাস্তায় গলিতে আলো ফেলে' সহজ করেছে পরস্পরের প্রতি-মুহূর্তের বোঝা পড়া, আলাপ পরিচয়, এর দীপ্তির পথরেখা অনুসরণ ক'রে চ'ললে কালের কোন্ দুর্গম দিগন্তে গিয়ে পৌঁছব। তারা কোন্ যাযাবর মানুষ, যারা অজানা অভিজ্ঞতার তীর্থযাত্রায় দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ের পথিক ছিল, যারা এই ভাষার প্রথম কম্পমান অস্পষ্ট শিখার প্রদীপ হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল অখ্যাত জন্মভূমি থেকে সুদীর্ঘ বন্ধুর বাধাজটিল পথে। সেই আদিম দীপালোক এক যুগের থেকে আর এক যুগের বাতির মুখে জ্ব'লতে জ্ব'লতে আজ আমার এই কলমের আগায় আপন আত্মীয়তার পরিচয় নিয়ে এল। ইতিহাসের যে বিপুল পরিবর্তনের শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে আদি যাত্রীরা চ'লে এসেছে তারি প্রভাবে সেই শ্বেতকায় পিঙ্গলকেশ বিপুলশক্তি আরণ্যকদের সঙ্গে এই শ্যামলবর্ণ ক্ষীণ আয়ু শহরবাসী ইংরেজ রাজত্বের প্রজার সাদৃশ্য ধূসর হয়েছে কালের ধূলিক্ষেপে। কেবল মিল চ'লে এসেছে একটি নিরবচ্ছিন্ন ভাষার প্রাচীন সূত্রে। সে ভাষায় মাঝে মাঝে নতুন সূত্রের জোড় লেগেছে, কোথাও কোথাও ছিন্ন হ'য়ে তাতে বেঁধেছে পরবর্তী কালের গ্রন্থি, কোথাও কোথাও অনার্য হাতের ব্যবহারে তার সাদা রং মলিন হয়েছে, কিন্তু তার ধারায় ছেদ পড়ে নি। এই ভাষা আজো আপন অঙ্গুলি নির্দেশ করছে বহুদূর পশ্চিমের সেই এক আদি জন্মভূমির দিকে যার নিশ্চিত ঠিকানা কেউ জানে না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে অস্পষ্ট ইতিবৃত্তের প্রাকৃত লোকেরা যে ভাষায় কথা কইত, দুই প্রধান শাখায় তা বিভক্ত ছিল—শৌরসেনী ও মাগধী। শৌরসেনী ছিল পাশ্চাত্য হিন্দির মূলে, মাগধী অথবা প্রাচ্য ছিল প্রাচ্য হিন্দির আদিতে। আর ছিল ওড্রী, উড়িয়া, গৌড়ী, বাংলা। আসামীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু অনতিপ্রাচীন যুগে আসামীতে গদ্য ভাষার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এত বাংলায় পাই নে। সেই সব দৃষ্টান্তে যে ভাষার পরিচয় পাই তার সঙ্গে বাংলার প্রভেদ নেই ব'ললেই হয়।

মাগধী এবং শৌরসেনীর মধ্যে মাগধীই প্রাচীনতর। হর্ন্‌লে সাহেবের মতে এক সময়ে ভারতবর্ষে মাগধীই একমাত্র প্রাকৃত ভাষা ছিল। এই ভাষা পশ্চিম থেকে ক্রমে

পূর্বের দিকে এসেছে। আর দ্বিতীয় ভাষা প্রবাহ শৌরসেনী ভারতবর্ষে প্রবেশ ক'রে পশ্চিম দেশ অধিকার করেছিল। হর্নলের মতে আর্যরা ভারতবর্ষে এসেছিল দুইবার পরে পরে। উভয়ের ভাষায় মূলগত ঐক্য থাকলেও কিছু কিছু প্রভেদ আছে।

নদী যেমন অতি দূর পর্বতের শিখর থেকে ঝরনায় ঝরনায় ঝ'রে ঝ'রে নানা দেশের ভিতর দিয়ে নানা শাখায় বিভক্ত হ'য়ে সমুদ্রে গিয়ে পৌছয় তেমনি এই দূর কালের মাগধী ভাষা আর্য জনসাধারণের বাণীধারায় ব'য়ে এসে সুদূর যুগান্তরে ভারতের সুদূর প্রান্তে বাংলা-দেশের হৃদয়কে আজ ধ্বনিত করেছে, উর্বরা করেছে তার চিত্তভূমিকে। আজও শেষ হ'ল না তার প্রকাশ লীলা। সমুদ্রের কাছাকাছি এসে সে বিস্তৃত হয়েছে, মিশ্রিত হয়েছে, গভীর হয়েছে তার প্রবাহ, দেশের সীমা ছাড়িয়ে সর্বদেশের আবেষ্টনের সঙ্গে এসে মিলেছে। সেই দূর কালের সঙ্গে আর আমাদের এই বর্তমান কালের, বহু দেশের অজানা চিত্তের সঙ্গে আর বাংলাদেশের নবজাগ্রত চিত্তের মিলনের দৌত্য নিয়ে চলেছে এই অতি পুরাতন এবং এই অতি আধুনিক বাক্যস্রোত এই কথা ভেবে এর রহস্যে বিস্মিত হ'য়ে আছি। সেই বিস্ময়ের প্রকাশ আমার এই বইটিতে।

ভাষা জিনিসটা আমরা অত্যন্ত সহজে ব্যবহার করি, কিন্তু তার নাড়ীনক্ষত্রের খবর রাখা একটুও সহজ নয়। যে নিয়মের ঐক্য ধ'রে পরিচয় সহজ হয় ভাষার ইতিহাসে একটা তার অবিচ্ছিন্ন সূত্রও থাকে আবার তার বদলও চলে পদে পদে। কেন বদল হয় তার কৈফিয়ৎ সব সময়ে পাওয়া যায় না। সে সমস্ত কঠিন সমস্যার বিচার নিয়ে এ বই লিখছি নে। ভাষার ক্ষেত্রে চ'লতে চ'লতে যাতে আমাকে খুশি করেছে, ভাবিয়েছে, আশ্চর্য করেছে তারই কৌতুকের ভাগ সকলকে দেব ব'লেই লেখবার ইচ্ছে হ'ল। বিষয়টাকে যাঁরা ফলাও ক'রে দেখছেন ও তলিয়ে বুঝেছেন, এ লেখায় তাঁদের কাছে দুটো চারটে খুঁত বেরবেই। কিন্তু তা নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

আমাকে কোনো ভাষাতাত্ত্বিক অনুরোধ করেছিলেন আমার এই প্রকাশোন্মুখ বইখানিতে আমি যেন ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা ক'রে কাজ আরম্ভ করি। তার যে উত্তর দিয়েছিলুম নিয়ে তা উদ্ধৃত ক'রে দিই। সেটা পড়লে পাঠকেরা বুঝবেন আমার এ বইখানি তত্ত্বের পরিচয় নিয়ে নয় রূপের পরিচয় নিয়ে।—

> আমার পক্ষে যা সব চেয়ে দুঃসাধ্য তাই তুমি আমাকে ফরমাস করেছ। অর্থাৎ মানুষের মূর্তির ব্যাখ্যা করবার ভার যে নিয়েছে তাকে তুমি মানুষের শারীর বিজ্ঞানের উপদেষ্টার মঞ্চে চড়াতে চাও। অহংকারে মানুষকে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে অন্ধ করে—মধুসূদনের কাছে আমার প্রার্থনা এই যে দর্পহরণ করবার প্রয়োজন ঘটাবার পূর্বেই তিনি আমাকে যেন কৃপা করেন। আমার এ গ্রন্থে ব্যাকরণের বন্ধুর পথ একেবারেই এড়াতে পারি নি—প্রতি মুহূর্তে পদস্খলনের আশঙ্কায় কম্পান্বিত আছি—ভয় আছে পাছে আমার স্পর্ধা দেখে তাত্ত্বিকেরা "হায় কৃষ্টি," "হায় কৃষ্টি" ব'লে বক্ষে করাঘাত করতে থাকেন। কোনো কোনো বিখ্যাত রূপশিল্পী

শরীর তত্ত্বের যাথাতথ্যে ভুল ক'রেও চিত্রকলায় প্রশংসিত হয়েছেন, আমার বইখানি যদি সেই সৌভাগ্য লাভ করে তাহলেই ধন্য হব। ইতি ১৬৷১১৷৩৮

ভাষাতত্ত্বে প্রবীণ সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার তফাৎ এই,—তিনি যেন ভাষা সম্বন্ধে ভূগোল-বিজ্ঞানী আর আমি যেন পায়ে চলা পথের ভ্রমণকারী। নানা দেশের শব্দমহলের এমন কি তার প্রেতলোকের হাট হদ্দ জানেন তিনি, প্রমাণে অনুমানে মিলিয়ে তার খবর দিতে পারেন সুসম্বদ্ধ প্রণালীতে। চ'লতে চ'লতে যা আমার চোখে পড়েছে এবং যে ভাবনা উঠেছে আমার মনে, সেই খাপছাড়া দৃষ্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন যা মনে এসেছে আমি লিখেছি। তাতে ক'রে পাঠকেরাও সেই চ'লে বেড়াবার স্বাদটা পাবে। তারও দাম আছে। বিশ্বপরিচয় বইখানা লিখেছিলুম এই ভাবেই। বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মতো সঞ্চয় জমা হয় নি ভাণ্ডারে, রাস্তায় বাউলদের মতো খুশি হ'য়ে ফিরেছি, খবরের ঝুলিটাতে দিন ভিক্ষে যা জুটেছে তার সঙ্গে দিয়েছি আমার খুশির ভাষা মিলিয়ে। ছোটোখাটো অপরাধ যদি ঘ'টে থাকে সেই খুশির ভোগে অনেকটা তার খণ্ডন হ'তে পারে। জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শখ ছিল ব'লেই বেঁচে গেছি, বিশেষ সাধনা না থাকলেও। সেই শখটা পাঠকদের মনে যদি জাগাতে পারি তাহ'লে আমার যতটুকু শক্তি সেই অনুসারে ফল পাওয়া গেল মনে ক'রে আশ্বস্ত হব।

মানুষের মনোভব ভাষাজগতের যে অদ্ভুত রহস্য আমার মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তারি ব্যাখ্যা ক'রে এই বইটি আরম্ভ করেছি। তারপরে, এই বইয়ে যে ভাষার রূপ আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি, তাকে বলে বাংলার চলিত ভাষা। আমি তাকে বলি প্রাকৃত বাংলা। সংস্কৃতের যুগে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, তেমনি প্রাকৃত বাংলারও নানা রূপ আছে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে। এদেরই মধ্যে একটা বিশেষ প্রাকৃত চলেছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে। এই প্রাকৃতেরই স্বভাব বিচার করেছি এই বইয়ে। লেখকের পক্ষে একটা মুশকিল আছে। চলতি বাংলা চলতি ব'লেই সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা নয়। হয়তো উচ্চারণে এবং বাক্য-ব্যবহারে একজনের সঙ্গে আরএকজনের সকল বিষয়ে মিল এখনো পাকা হ'তে পারে নি। কিন্তু যে ভাষা সাহিত্যে আশ্রয় নিয়েছে তাকে নিয়ে এলোমেলো ব্যবহারে ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে। এখন থেকে বিক্ষিপ্ত পথগুলিকে একটি পথে মিলিয়ে নেবার কাজ শুরু করা চাই। এই গ্রন্থে রইল তার প্রথম চেষ্টা। ক্রমে ক্রমে নানা লোকের অধ্যবসায়ে এই ভাষার দ্বিধাগ্রস্ত প্রথাগুলি বিধিবদ্ধ হ'তে পারবে।*

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, ইহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন।—সম্পাদক।

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

ঋগ্‌বেদ এবং উহাতে বর্ণিত কৃষ্টির বয়স কত? ভারতের ঐতিহ্য অনুসারে উহা এত পুরাতন যে কেহ বলিতে পারে না। উহা স্বতঃ উদ্ভুত। অন্যান্য প্রাকৃতিক ব্যাপারের ন্যায় উহারও আদি নাই বলা যাইতে পারে। বেদ অর্থে জ্ঞান—ইহার সৃষ্টি বা আরম্ভের শক আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত। প্রতিভাবান্ কবি যাহা দেখিয়াছিলেন এবং অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা স্তোত্র আকারে গান করিয়াছিলেন। তাঁহারা দ্রষ্টা, তাঁহারা ঋষি নামে পরিচিত।

স্তোত্রগুলি ঋষিদের নানা বংশে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত ছিল। কালে অনেক লোপ পাইয়াছিল। বায়ু এবং মৎস্য পুরাণের মতে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে, অর্থাৎ ন্যূন গণনায় খ্রিষ্টজন্মের সাড়ে তিন সহস্র বৎসর পূর্বে তৎকালে প্রাপ্ত স্তোত্রগুলি প্রথম সংগৃহীত হইয়াছিল।

বেদের অতিপ্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এই মত যে ভ্রান্ত নহে, তাহা নিম্নলিখিত তথ্যগুলি হইতে অনুমিত হয়। এইরূপ তথ্য আরও আছে।

(১) বেদচর্চা কখনও বন্ধ হয় নাই; তথাপি যে সকল দেবতার উপাসনা করা হইত, কালে তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহারা খ্রিষ্টের বহু শতাব্দী পূর্বেই বিতর্কের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বৈদিক নিঘণ্টুতে মেঘের মতন সামান্য ও সকলের পরিচিত বস্তুর ত্রিশটি নাম পাওয়া যায়। এত অধিক নামের হেতু কি? সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য নামটি, বৃত্র। অহি বা সর্পের নাম বৃত্র ঋগ্‌বেদেই আছে। কিন্তু মানুষের উদ্দাম কল্পনাতেও আকাশের মেঘকে কখনও দীর্ঘ সর্প মনে হয় না। ইন্দ্র প্রথমে জীবন্ত দেবতা ছিলেন, পরবর্তী কালে ঋগ্‌বেদে কেহ কেহ তাঁহার অস্তিত্বে সন্দেহ করেন, ক্রমে তিনি অরূপ পরম দেবতা পরিগণিত হইলেন। এই সকল উদাহরণ হইতে বুঝা যায়, ঋগ্‌বেদ অল্পকালে গড়িয়া উঠে নাই, ইহার নির্মাণে বহুকাল লাগিয়াছিল। ভারতীয় ভাষ্যকার প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারায় পুষ্ট ছিলেন, তথাপি তাঁহারা বেদের নিঃসন্দিগ্ধ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। এক এক দেবের বহুবিধ ব্যাখ্যা কল্পিত হইয়াছিল। ইহার দুই কারণ ছিল। এক, বহু কালান্তরে বহু দেবের স্বরূপের ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছিল। দুই, বেদের কাল হইতে ভাষ্যকার বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

(২) ভাষাতত্ত্ব এবং অলৌকিকতত্ত্বে ব্যুৎপন্ন হইয়াও পাশ্চাত্য বেদপাঠী পণ্ডিতগণের যত্নও বিফল হইয়াছে। পাশ্চাত্য মতের আধুনিক ব্যাখ্যাতা প্রোফেসার

উইন্‌টারনিৎস্ তাঁহার ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস পুস্তকের প্রথম খণ্ডে (৭৬-৭৮ পৃঃ) স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "কোনও অন্বেষকের নিকট ইন্দ্র ঝড়ের দেব, অন্যের নিকট পুরাতন সূর্যদেব। মরুদ্‌গণের জনক বলিয়া রুদ্রকে সাধারণতঃ ঝড়ের দেবতা বলা হয়, কিন্তু হিল্লেব্রাণ্টের মতে তিনি "গ্রীষ্মদেশের আবহের ভীমমূর্তির দেবতা।" কাহারও মতে অদিতি বিস্তীর্ণ আকাশ, কাহারও মতে অদিতি অনন্ত সুবিস্তীর্ণ ভূমি। যাস্কের পূর্বে প্রাচীন ভারতের টীকাকারেরা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে লইয়া ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। কেহ কেহ ভাবিতেন, তাঁহারা আকাশ ও ধরণী, কেহ বা দিবা ও রাত্রি। অদ্যাপি কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন, তাঁহারা প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যা। কাহারও মতে তাঁহারা চন্দ্র ও সূর্য। কেহ বা মনে করেন প্রভাতী ও সন্ধ্যাতারা, কেহ বা মিথুন নক্ষত্র।" এই প্রসঙ্গে আরও বলা যাইতে পারে, অল্পদিন পূর্বেও পণ্ডিতেরা সোম বলিতে ঐ নামের বৃক্ষ বুঝিতেন, আকাশে সোম দেখিতে পান নাই, আর্যগণের মাস-গণনার চন্দ্রও পান নাই। মিত্র ও বরুণ, সবিতা ও বিষ্ণু, এই সব প্রধান প্রধান দেব সম্বন্ধে বিতর্কের শেষ নাই। কিন্তু যদি বেদের দেবতা অজ্ঞাত রহিয়া গেলেন, দুইটা শব্দের অর্থ জানিয়া বেদবিদ্যার্জনের সার্থকতা কি ?

(৩) বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে আরও অনেক তথ্য ভাবিবার আছে। ঋগ্‌বেদে ইক্ষুর উল্লেখ আছে (৯।৮৬।১৮)। প্রসঙ্গ হইতে বুঝা যায়, তখন উহার চাষ হইত। সম্ভবতঃ তখন শুধু চিবাইয়া রস পান করা হইত। ইক্ষুদণ্ড পেষণ করিয়া রস বাহির করিয়া শুথাইয়া পিণ্ড করিয়া মধুর পরিবর্তে ভোজনের কথা আর্যদের মনে হয় নাই। আমাদের পূজা-অর্চনার কাজে আখের রসে প্রস্তুত দ্রব্যের পরিবর্তে কেবল মধুর ব্যবস্থা দেখিয়া এই অনুমানই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে চরকে উল্লিখিত দুই জাতের ইক্ষু এবং ইক্ষুরসের উৎপন্ন পাঁচ প্রকার দ্রব্যের কথা তুলনা করিয়া দেখুন। চরক পঞ্জাবের লোক ছিলেন, চরকসংহিতার বর্তমান সংস্করণ খ্রিষ্টের দুই শত বৎসরের মধ্যের। পঞ্জাব আখের চাষের অনুকূল নহে, আখের চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু আবশ্যক। সুশ্রুত বিহারের অধিবাসী ছিলেন, পাঁচ শত খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে। তিনি চরকে বর্ণিত দুই জাত ব্যতীত আরও দশ জাতের ইক্ষুর উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একটি বন্য। ইক্ষুর দ্বাদশ জাত উৎপন্ন হইতে কত কাল লাগিয়াছিল ?

অথবা, গোধূম ধরুন। গোধূম ঋগ্‌বেদের আর্যদের অজ্ঞাত ছিল। বেদে ইহার উল্লেখ নাই বলিয়া একথা বলিতেছি না, পূজার নৈবেদ্যে পিতৃপুরুষের তর্পণে গোধূমের বিধান নাই। আর্যেরা যে ভোজ্য গ্রহণ করিতেন, আমরা সেই ভোজ্য তর্পণে উৎসর্গ করি। যেমন যব ও তিল। কিন্তু শুক্ল যজুর্বেদে (৬।৩) গোধূম ও মসূর এই দুইটি বিদেশাগত শস্য সাধারণ খাদ্যদ্রব্য গণ্য হইয়াছে। সিন্ধুদেশে মহেঞ্জোদারোর

গোধূম পাওয়া গিয়াছে—ইহা বিবেচনা করিবার বিষয়। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ নিজেদের দেশ এবং সমুদ্র দেখিয়াছিলেন। সরস্বতী সমুদ্রে পড়িত, সরস্বতীর মোহানা হইতে মহেঞ্জোদারো অধিক দূরে ছিল না। সম্ভবতঃ তাঁহারা গোধূম জানিতেন না; জানিলে তাঁহাদের স্বল্পসংখ্যক আহার্যদ্রব্যের মধ্যে উহাও স্থান পাইত। অতএব বলিতে পারা যায়, ঋগ্‌বেদ এবং যজুর্বেদ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কালে সিন্ধুর আবিষ্কৃত কৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছিল। যজুর্বেদ খ্রিষ্টের প্রায় ২,৫০০ বৎসর পূর্বের। ইহার দৃঢ় জ্যোতিষিক প্রমাণ আছে। যজুর্বেদে বৈদিক আচার-পদ্ধতির জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অলৌকিকত্বের বিকাশ এবং জ্যোতিষ জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, ঋগ্‌বেদ এবং যজুর্বেদের কালের মধ্যে শত শত বর্ষ কালগর্ভে লীন হইয়াছিল।

পুরাণে ও মহাকাব্যে প্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকু বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইক্ষ্বাকুর ও তাঁহার বংশের কয়েক জনের নাম ঋগ্‌বেদে (১০।৬০।৪) পাওয়া যায়। বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণে দেখা যায়, ইক্ষ্বাকু হইতে বৃহদ্‌বল পর্যন্ত এই বংশের ৯৫ জন রাজা পরে পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অধিকাংশের মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ ছিল। বৃহদ্‌বল কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধে নিহত হন। খ্রিঃ পূঃ ১৪৫০ অব্দের নিকটবর্তী কালে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। যদি এক শতাব্দে পাঁচ জন রাজা ধরা যায়, তাহা হইলে এই ৯৫ জন রাজার রাজত্বকাল ১৯০০ বৎসর ধরা যাইতে পারে। তাহার সহিত ১৪৫০ বৎসর যোগ করিলে ইক্ষ্বাকুকে খ্রিষ্টের ৩৩৫০ বৎসর পূর্বে লইতে হয়। অবশ্য ইহা স্থূল অনুমান। ইক্ষ্বাকুর পিতা নামে পরিচিত বৈবস্বত মনুর কাল সম্ভবতঃ খ্রিঃ পূঃ ৩,৫০০ অব্দের নিকটবর্তী, ইহা উপরের অনুমানের সমর্থক। খ্রিঃ পূঃ ৩,৫০০ হইতে ৩২৫০ অব্দের মধ্যে নক্ষত্র-বিদ্যার আরম্ভ হইয়াছিল। চন্দ্রের গতিপথ সাতাইশ নক্ষত্র দ্বারা বিভক্ত হইয়াছিল।

আরও দেখি, ঋগ্‌বেদে (১০।৯৮।১) কুরু-বংশীয় ভীষ্মের পিতা শান্তনুর উল্লেখ আছে। পরাশর-পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সর্বশেষে বেদের স্তোত্রগুলি সাজাইয়াছিলেন, তিনি শেষ ব্যাস। তিনি কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধের সময় বর্তমান ছিলেন। সুতরাং বেদের শেষ সংস্কার খ্রিঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে হইতে পারে নাই।

ঋগ্‌বেদ ইতিহাস নহে, ইহাতে ঘটনাপরম্পরা লিপিবদ্ধ নাই। স্তোত্রগুলি এক স্থানে বা একই কালে রচিত হয় নাই। ইহাতে সমসাময়িক ঘটনার উল্লেখ আছে, অতীত কাহিনীরও আছে। কতকগুলি স্তোত্র অন্যগুলির বহু পরে রচিত হইয়াছিল।

কোনও সাহিত্যরচনার বয়স নির্ধারণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। তাঁহারা ব্যাকরণের নূতনতম বিভক্তির প্রয়োগ, সংস্কৃতির নূতনতম রূপ দ্বারা উহার বয়স নির্ধারণ করেন। তাঁহারা মন্দিরের শেষ স্থাপিত ইষ্টক দ্বারা, সর্বশেষে নির্মিত পুত্তলিকা দ্বারা মন্দিরের কাল নির্ণয় করেন। ভারতের সনাতন রীতি অন্যবিধ। অনিবার্য, আগন্তুক, বহিঃপৃষ্ঠের উপাদান উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় পণ্ডিত

মন্দিরটিকে সমগ্রভাবে দেখিয়া তাহার ভিত্তিস্থাপনের কাল নিরূপণে যত্নবান হন। সেই জন্ম তাঁহাদের মত, বেদের কাল কেহ ঠিক বলিতে পারে না,—ইহা এতই পুরাতন।

আধুনিক কালের লোক আমরা এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি না। ঋষিরা বেদগান করিবার পর কত কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহার আভাস পাইতে চাই; মন্দিরের বয়স নহে, মন্দিরের দেবতার প্রতিষ্ঠাকাল। বর্ত্তমান বেদগ্রন্থ খ্রিঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দের হউক,—আমাদের সে প্রশ্ন নয়। আমরা জানিতে চাই, ইহার প্রধান প্রধান দেবতা কতকাল পূর্বে প্রথম স্তুত হইয়াছিলেন।

বেদ কখনও প্রস্তর বা ধাতুপাত্রে উৎকীর্ণ হয় নাই। সুতরাং ভাষাবিচারের সার্থকতা নাই। বেদের স্তোত্র পুরুষপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে। আর, যে গান এত মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে তাহার মূল ভাষা একেবারে পরিবর্তিত না হইলেই আশ্চর্যের কথা। বেদেই আছে, কোন কোন পুরাতন স্তোত্র মার্জিত হইয়াছে। তথাপি ভাষা আলোচনার প্রয়োজন আছে। বেদবিদ্যায় প্রবেশের প্রথম সোপান এই। কিন্তু ইহার প্রয়োজন-সীমা ভুলিয়া গেলে দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। ফলে অন্য উপায়ে যে সকল বিশ্বাস-যোগ্য তথ্য পাওয়া গিয়াছে সে সকলকে ঐ সঙ্কীর্ণ স্থানে বসাইতে গেলে বিমূঢ় হইতে হয়। দূরবর্তী বনানীর বৃক্ষসমূহের মত বেদের সকল বিষয়বস্তু তখন গবেষকের চক্ষে ঘনসন্নিবিষ্ট দেখায়, তাহাদের মধ্যে যে অবকাশ ও অন্তরাল আছে, পটভূমির অভাবে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অপিচ, ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা সহজ, কিন্তু এক একটি স্তর নির্মাণে কত সহস্র বৎসর লাগিয়াছে তাহা বলা সহজ নহে। সেইরূপ, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, সূত্র—ইহাদের পারম্পর্য হইতে বৈদিক সাহিত্যের তিন শাখার কোনটির কাল অভ্রান্ত ভাবে নিরূপণ আমাদের সাধ্যাতীত। প্রাচীন কালে উন্নতির গতি মৃদু ছিল, এক পদ অগ্রসর হইতে বহু শতাব্দ কাটিয়া যাইত। বৈদিক সাহিত্য পবিত্র ও গুহ্য; আর এরূপ শাস্ত্রের পরিবর্তন আদৌ হয় না বলিলে চলে। যে কালে ও কারণে ধর্মবিধির প্রচলন হয়, সেই কাল ও কারণ লোপ পাওয়ার পরও বহুদিন ধরিয়া সে বিধান বলবৎ থাকে। অনুরূপ ঘটনার সুপরিজ্ঞাত সময়পঞ্জীর সঙ্গে না মিলাইয়া বয়স সম্বন্ধে মোটামুটি অনুমানেরও কোনও অর্থ থাকে না। পার্শ্ব, মহাবীর, বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ভূত কাল পরিমাণের চেষ্টা হইয়াছে। এ যেন পথের প্রান্তে দাঁড়াইয়া উহার আরম্ভ ও দৈর্ঘ্য অনুমান! এবম্বিধ উৎপ্রেক্ষা মাত্রই কাল্পনিক, এই হেতু কল্পকের স্বভাব, শিক্ষা ও মতি অনুযায়ী বিভিন্ন রূপের হইয়া থাকে।

প্রোফেসার কীথ লিখিতেছেন, "সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের বিকাশ, মোটামুটি ইহাই শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি। ব্রাহ্মণ রচনার যুগ খ্রিঃ পূঃ ৮০০ অব্দের পরে হওয়া সম্ভব নহে, এবং উষার বন্দনার তুল্য সুপ্রাচীন স্তোত্র খ্রিঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর হইতে পারে"।[১] অর্থাৎ ইহাই ঋগ্বেদের প্রাচীনত্বের সীমা। ইঁহার মতে যজুর্বেদের বয়স খ্রিঃ পূঃ ৮০০—৬০০ অব্দ। ইহা ভারতের ইতিহাস নামক এক বৃহৎ গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

---

১ A. B. Keith, The Cambridge History of India, Vol. I, Ch. IV, 1922

এই উৎপ্রেক্ষায় প্রোফেসার উইন্টারনিৎস সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি বলেন, "খ্রিঃ পূঃ ১২০০ কিম্বা ১৫০০ অব্দ আরম্ভ ধরিলে এই সুবৃহৎ সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশ কি করিয়া হইল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বোধ হয়, এই বিশাল সাহিত্যের আরম্ভ খ্রিঃ পূঃ ২,০০০ বা ২,৫০০ অব্দ এবং শেষ খ্রিঃ পূঃ ৭৫০-৫০০ অব্দ ধরিতে হইবে।[২] কিন্তু বোধ হওয়ার হেতু সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিতে না পারিলে এবং পরীক্ষিত না হইলে তাহা জনে জনের 'বোধ' হইয়া দাঁড়ায়। আর্য সংস্কৃতির ও সাহিত্যের অনুরূপ আর কোথাও পাওয়া যায় নাই, তুলনা দ্বারা কালনির্দেশের সুযোগও নাই।

জ্যোতিষের সাক্ষ্যই পুরাকাল-নির্ণয়ে একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ। ইহা দেশ, জাতি, সংস্কৃতি, কিসেরও অপেক্ষা রাখে না। ইহার পক্ষপাত নাই, মতপরিবর্তন নাই। ইহাই প্রাচীন জাতিসমূহের ইতিহাসের কাল সংশোধন করিবার সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত উপায়। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বেদের মধ্যে কালসমুদ্রে দিগ্‌দর্শন-স্বরূপ দ্বীপ আছে। পঞ্জিকা না থাকিলে হিন্দুর চলে না, কেন চলে না তাহা হিন্দুমাত্রেই জানেন। আমাদের যাবতীয় ধর্ম-কৃত্যের দিন নির্দিষ্ট আছে। এই লক্ষণ ঋগ্‌বেদের যুগেও দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের আর্য পূর্বপুরুষগণ যে সকল যাগযজ্ঞ করিতেন তাহাদের দিন নির্দিষ্ট থাকিত। সংহিতা এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে ঐ সকল দিনের কিছু কিছু উল্লেখ আছে। পঞ্জিকার প্রাচীন নাম কালজ্ঞান। বেদের কালের কালজ্ঞান যতই সংক্ষিপ্ত, অশুদ্ধ বা অপরিণত হউক, ধর্মানুষ্ঠানে তাহা মানিয়া চলিতে হইত।

পঞ্জিকার কয়েকটি পৃথক্ পৃথক্ বিষয় বহু পূর্বেই পণ্ডিতদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। যেমন, তৈত্তিরীয় সংহিতায় কৃত্তিকাপ্রমুখ সাতাইশটি নক্ষত্রের নাম আছে। কৃত্তিকা নামটি বহুবচনে আছে, সুতরাং তারাপুঞ্জ কৃত্তিকাকেই বুঝাইতেছে। এখন এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ উঠে, যে,—প্রথম স্থান কৃত্তিকাকে কেন দেওয়া হইল, অশ্বিনী বা অন্য নক্ষত্রকে কেন দেওয়া হইল না? এখন যে পর্যায় প্রচলিত আছে, তাহাতে অশ্বিনীর নাম সর্বপ্রথমে, কারণ অশ্বিনীতে বিষুবপাত হইত। ইহা দেখিয়া আমরা বলি যে উক্ত সংহিতার সময় কৃত্তিকায় বিষুবপাত হইয়াছিল। ইহা খ্রিঃ পূঃ ২২০০ অব্দের ঘটনা।

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার *Orion* নামক গ্রন্থে আরও কতকগুলি জ্যোতিষিক প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তিনি কৃত্তিকায় বিষুবপাত কালের পূর্ববর্তী ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ও চিত্রা পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ আরম্ভ নির্দেশ করেন। প্রথমটি আমাদিগকে খ্রিঃ পূঃ চারি সহস্র অব্দে লইয়া যায়, দ্বিতীয়টি খ্রিঃ পূঃ ছয় সহস্র অব্দে।

তিলক যখন তাঁহার বই লেখেন তখন প্রোফেসার জাকোবি বেদের প্রাচীনত্বের অনুরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করেন।[৩] উভয়ে স্বতন্ত্রভাবে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

---

২ M. Winternitz : A History of Indian Lit. Vol. I. p. 309. 1927.

৩ H. Jacobi. "On the date of the Rigveda." English Translation. *Indian Antiquary*, Vol. 23. June, 1894. Also, "On the Antiquity of Vedic Literature," *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1909.

প্রোফেসার জাকোবি ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ভর দিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে ঋগ্‌বেদের সংস্কৃতির কাল খ্রিঃ পূঃ ৪৫০০ হইতে খ্রিঃ পূঃ ২,৫০০ অব্দ পর্যন্ত। তিনি তিলকের মতন অধিক দূর যান নাই।

বলা বাহুল্য, যে সকল পণ্ডিত ভাষার চর্চা করিয়া বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন। তিলক ও জাকোবির সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রোফেসার হুইট্‌নি, থিব. ও ওল্ডেন্‌বার্গ লেখনী সঞ্চালন করিলেন।৪ প্রমাণগুলি উড়াইয়া দিবার জন্য তাঁহারা অলীক কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, কোনও কোনও স্থানে প্রসঙ্গ এড়াইয়া গিয়াছেন। কোথাও বা বিভিন্ন গ্রন্থের কাল-ব্যবধান অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই চারি পণ্ডিতের মধ্যে প্রোফেসার হুইট্‌নি কালনির্ণয়ে যোগ্যতম ছিলেন। তিনি বেদে প্রবীণ ছিলেন, জ্যোতির্বিদ্যাতেও ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতীয়দের ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ বিদ্বেষ ছিল। তিনি ধীরভাবে এ সকল বিষয় আলোচনা করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণেরা যে নক্ষত্রচক্র নির্মাণ করিতে বা কোনও জ্যোতিষিক ঘটনা নির্ভুলভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার মতে, নক্ষত্রমালা কোনও উন্নত জাতির নিকট হইতে নিশ্চয় ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রোফেসার কীথের মতন যাঁহারা প্রাচীন বেবিলনের ধ্বংস হইতে কৃত্তিকাশ্রেণী ভবিষ্যৎ কালে বহিষ্কৃত হইবে, এই আশা পোষণ করিতেছেন, তাঁহারা হুইট্‌নির এই মত পড়িয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। অবশ্য এ পর্য্যন্ত সেদিক্ হইতে তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় নাই।

গ্রীকদের সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে হিন্দুদের নিকট বিষুবদিনের প্রয়োজন ছিল না। এই অলীক যুক্তি দিয়া ডক্টর থিব. কৃত্তিকার প্রমাণ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার নিজের মতের সমর্থনে তিনি বলেন যে, "বৈদিক সাহিত্যে মুখ্য বা গৌণভাবে বিষুবদিনের বা তৎসম্পর্কিত ব্যাপারের কোনও উল্লেখ নাই।" কিন্তু এই যে দেখা যাইতেছে, তৈত্তিরীয় সংহিতায় কৃত্তিকায় বিষুবসংক্রান্তির উল্লেখ রহিয়াছে। এই তর্ক তিনি এই বলিয়া খণ্ডন করিলেন যে, কৃত্তিকার উল্লেখ বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের ভ্রান্ত পাঠ! অর্থাৎ তৈত্তিরীয় সংহিতা ও উক্ত জ্যোতিষ একই কালের রচনা। তিনি একটু গণনা করিলেই দেখিতে পাইতেন যে, সংহিতায় কৃত্তিকা 0° অংশে, আর বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে ১২° অংশ দূরে। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে আট শত বৎসর কালেরও অধিক ব্যবধান। তাঁহার আলোচনায় তিনি আরও আশ্চর্য আশ্চর্য যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তথাপি প্রোফেসার কীথ মন্তব্য করিয়াছেন, "হুইট্‌নি, থিব. এবং

৪ W. D. Whitney. "On a recent attempt by Jacobi & Tilak to determine on astronomical evidence the date of the earliest Vedic period as 4,000 B. C." *Indian Antiquary,* Vol. 24, April 1895.

G. Thibaut. "On some recent attempts to determine the antiquity of Vedic Civilisation." *Indian Antiquary,* Vol. 24, April 1895. ওল্ডেনবার্গের সমালোচনাটি আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। Vedic Indexএ উদ্ধৃত অংশ হইতে মনে হইতেছে উহা থিবর মতেরই প্রতিধ্বনি।

ওল্ডেন্‌বার্গের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে জাকোবির কালমূলক সিদ্ধান্ত টিকিতে পারে না।" তিনি ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া গিয়াছেন, ব্যুলার, বার্থ ও উইন্‌টারনিৎস্‌ এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলেন নাই। জাকোবি স্বয়ং ইহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

ঋগ্‌বেদে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সময় খ্রিঃ পূঃ নয় সহস্র বৎসর পাই। তখন অঙ্গিরস্‌, অর্থবন্‌, ভৃগু প্রভৃতি পরবর্তী কালে পিতৃনামধেয় পূর্বপুরুষগণ পঞ্চনদের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে প্রথম যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত করেন। তখন হইতেই পর পর জ্যোতিষিক প্রমাণ ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া আসিয়াছে। খ্রিঃ পূঃ সাড়ে ছয় সহস্র হইতে আরম্ভ করিয়া খিঃ পূঃ সাড়ে চারি সহস্র অব্দ উত্তীর্ণ হইয়া শেষে খ্রিঃ পূঃ সাড়ে তিন সহস্র অব্দ পর্যন্ত আসিয়া থামিয়াছে। এইখানেই ঋগ্‌বেদের যুগ শেষ বলিতে পারা যায়। বসিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্ম এবং অন্য দুই একটি ছোটখাট ঘটনা ভিন্ন জ্যোতিষ বিষয়ে কোনও প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ আর তেমন পাওয়া যায় না। নূতন কোনও দেবতার আবির্ভাব হয় নাই, পরন্তু পুরাতন দেবতাগণ পুরাতন বৈদিক স্বরূপ বর্জিত হইয়া এখন ভাবময় বিগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইতিহাসের দৃষ্টিতে ঋগ্‌বেদ খণ্ডিত। ইহাতে কোন বিশেষ যুগের আর্য কৃষ্টির রূপ পাওয়া যায় না। তথাপি মহেঞ্জোদারোর অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশিত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া স্যর জন মার্শেল যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহার কয়েকটির উত্তর দিতে পারা যায়। তিনি আবিষ্কৃত সিন্ধুর কৃষ্টিকে খ্রিঃ পূঃ সাড়ে বত্রিশ শত ও সাড়ে সাতাশ শত অব্দের মধ্যবর্তী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ভারতের মাটিতেই এই কৃষ্টির বহুদিনের পূর্ব ইতিহাস নিশ্চয়ই আছে। তাঁহার মতে ইহা দ্রাবিড় কিম্বা সুমেরীয় জাতির কীর্তি নহে। সিন্ধুরা শিব, লিঙ্গ ও মাতৃদেবীর উপাসক ছিলেন। আমরা ঋগ্‌বেদ হইতে জানি যে ভগবান্ রুদ্র খ্রিঃ পূঃ সাড়ে চারি সহস্র অব্দের কালে প্রাধান্য লাভ করিয়া ঋগ্‌বেদের দেবমণ্ডলীতে স্থান পাইয়াছিলেন। যজুর্বেদে (খ্রিঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে) তাঁহার উপাসনার সুস্পষ্ট বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রিঃ পূঃ ৪,০০০ অব্দে বিষ্ণু ও ইন্দ্র অভিন্ন হইয়াছিলেন। বিষ্ণু শিব ও মাতৃদেবী শিবাণী অদ্যাপি গ্রামে গ্রামে প্রধান দেবতারূপে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, সিন্ধুরা বিদেশী ছিলেন না; তাঁহাদের বংশধরেরা ভারত ত্যাগ করেন নাই। প্রাচীনপন্থী ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে আর্যেরা খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে ভারতে প্রবেশ করেন। স্যর জন মার্শেল এই মতে চালিত হইয়া বিভ্রান্ত হইয়াছেন। সিন্ধুরাও যে আর্য, তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। বোধ হয় এইটুকু বলিতে পারা যায়, তাঁহারা ঋগ্‌বেদীয় আর্য ছিলেন না। পরে কিন্তু উভয় সম্প্রদায় অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই হেতু সিন্ধুদের আর পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের ভাষাবিদ্‌গণ না বুঝিয়া ভারত ইতিহাসের প্রাচীনতা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের ব্যাঘাত জন্মাইয়া কি ক্ষতি করিয়াছেন, ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্ত। সকলেই জানেন, ভাষাবিদ্‌গণ নানা কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু একটিও প্রমাণ করিতে পারেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারতত্ত্ব

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন

আমরা পূর্বপ্রবন্ধে দেখিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। এমন কি, বঙ্কিমচন্দ্র অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ধর্ম ও দর্শনের এক প্রধান সমস্যা এই অবতারবাদ।

অশরীরী পরমেশ্বরের মনুষ্যশরীর ধারণ সম্ভব কি না? 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। উত্তরে তিনি প্রতিপ্রশ্ন করিতেছেন—

> 'যিনি ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলে নিরাকার হইলেও আকার ধারণ করিতে পারেন না কেন? * তাঁহার সর্বশক্তিমত্তার এ সীমা নির্দেশ কর কেন?' ঈশ্বর ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান্— 'তিনি অবতীর্ণ হইতে পারেন না' এমন কথা বলিলে তাঁহার শক্তির সীমানির্দেশ করা হয় (গীতাভাষ্য)। অবশ্য যাঁহার কটাক্ষমাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় সাধিত হয়, কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে তাঁহাকে ভূতলে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথা বটে।

তবে অবতার কেন? ঈশ্বরের অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি?

পূর্ণ আদর্শ ভিন্ন প্রকৃত ধর্মসংস্থাপন সম্পন্ন করা অসম্ভব। জীবের সমক্ষে এই পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শনের জন্যই অবতার স্বীকার করিয়া ভগবানের সান্ত ও সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথায় বলি—

> 'সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। ··· অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। ··· এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি? (কৃষ্ণচরিত্র)

পুনশ্চ—

> 'শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ ইহা ভাবিলে, তাঁহার সকল কার্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্ররূপ রত্নভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শ-পুরুষতত্ত্ব।'

---

* নিপট অদ্বৈতী শ্রীশঙ্করাচার্য ও বলিয়াছেন—স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপি ইচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্—১।১।২০ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য।

অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বরের অবতার গ্রহণের প্রয়োজন সম্পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম-সংস্থাপন। বৈজ্ঞানিকপ্রবর স্তর অলিভার লজ্ ভগবানের অবতার-স্বীকারের প্রয়োজন অন্য ভাবে সিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবানের ঐশ্বর্য এতই বিরাট্, তাঁহার প্রভাব এতই প্রচণ্ড যে, তিনি যদি অবতাররূপে নিজেকে সঙ্কুচিত ও সঙ্কীর্ণ না করেন, তবে কেহই তাঁহার অনাবৃত মুখ দর্শন করিতে পারে না। এই জন্যই খ্রীষ্টানেরা বলেন, "No man can see My face and live." দৃষ্টান্তস্বরূপ স্তর অলিভার লজ্ রবি ও রশ্মির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সূর্য সমস্ত পৃথিবীর প্রাণ—সূর্যরশ্মি দ্বারাই পৃথিবী পুষ্ট, বর্ধিত ও সঞ্জীবিত আছে; কিন্তু কোন দিন যদি সূর্য নিজের প্রচণ্ড মার্তণ্ড মূর্তিতে প্রকটিত হয়েন, তাহার ফলে কি হয়? সমস্ত পৃথিবী মুহূর্তমধ্যে ভস্মীভূত হইয়া পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হয়। সাগর, নদী, পর্বত, প্রস্তর, প্রান্তর, তরু, লতা, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ—কেহই ক্ষণার্ধ তিষ্ঠিতে পারে না। সেই জন্য সূর্যের তেজঃ বায়ুস্তরের দ্বারা প্রশমিত হইয়া সংবৃত মূর্তিতে রশ্মিরূপে আমাদের গোচর হয়। এই সংবৃতির ফলেই সূর্যের উপকারিতা। ভগবানের সম্বন্ধেও ঠিক্ ঐ কথা। সাধারণ মানুষের ত কথাই নাই, বোধ হয় অত্যুত্তম সাধকেরাও তাঁহার অনাবৃত ঐশ্বর্য, তাঁহার প্রকটিত মহিমা ধারণ করিতে পারেন না। সেই জন্যই তিনি অবতারের রূপে নিজেকে সংবৃত করিয়া, সেই আবরণের মধ্যে নিজের তেজঃ প্রশমিত করিয়া, জীবের নিকট প্রকাশিত হয়েন।

স্তর অলিভার লজের কথাগুলি বেশ সঙ্গত। আমাদের দেশে গঙ্গাবতরণের যে কাহিনী পুরাণের মধ্যে রক্ষিত আছে, তদ্দ্বারা ঐ কথার সমর্থন হয়। গঙ্গাকে বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা বলে। এক দিন সাধকপ্রবর ভগীরথের আবাহনে ভগবানের আধ্যাত্মিক শক্তি ভূমণ্ডলে গঙ্গারূপে অবতরণ করিয়াছিল। কিন্তু সেই শক্তিকে মনুষ্যের ধারণ-উপযোগী করিবার জন্য প্রথমতঃ মহাদেবকে জটার মধ্যে সংবৃত করিতে হইয়াছিল এবং পরে জহ্নুমুনির শরীরের মধ্যে সংগোপিত করিতে হইয়াছিল। সেই জন্য গঙ্গার নাম জাহ্নবী। এইরূপে দ্বিধা-শিথিলিত বিষ্ণুতেজঃ ধরাধামে অবতীর্ণ হইলে, তবে গঙ্গা আমাদের ধারণ-উপযোগী হইয়া পতিতপাবনী হইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রও 'ধর্মতত্ত্বে' এ বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়াছেন—

"ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি—আমরা ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়? অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য; কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন।"

'দেবী চৌধুরাণী'তে একথা আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে—

"ঈশ্বর অনন্ত—কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না—সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর—হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ।"

ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে অবতারের প্রয়োজন যে ভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তৎপ্রতি লক্ষ্য দেওয়া আবশ্যক। তিনি বলিতেছেন, শ্রবণ ও স্মরণযোগ্য লীলাপ্রকাশ দ্বারা বদ্ধ জীবকে আকর্ষণ ও ভবকূপ হইতে উত্তোলনই অবতারের মুখ্য প্রয়োজন।

ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানাম্ অবিদ্যাকামকর্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্ ইতি কেচন ॥—১.৮।৩৫

—'অজ্ঞান, কাম ও কর্ম দ্বারা নিপীড়িত নরনারীকে শ্রবণ ও স্মরণযোগ্য লীলা-প্রকাশ দ্বারা এই ভবকূপ হইতে উদ্ধরণই—হে কৃষ্ণ! তোমার অবতারগ্রহণের উদ্দেশ্য।'

ভাগবতের অন্যত্রও এ কথা আছে—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥—১০।৩৩।৬৫

এ সম্পর্কে অ্যানি বেসাণ্ট্ অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন—

When, He Who is beauty and love and bliss, shews a little portion of Himself on earth, enclosed in human form, the weary eyes of men light up, the tired hearts of men expand with a new hope and a new vigour. They are irresistably attracted to Him. Devotion spontaneously springs up.

ভগবান্ কিরূপে অবতীর্ণ হন, তাঁহার অবতার-গ্রহণের প্রণালী (*modus operandi*) কি? বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গের বিশেষ আলোচনা করেন নাই। তবে গীতার প্রখ্যাত শ্লোক—

অজোপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরোপি সন্।
প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥—৪।৬

—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শঙ্করও শ্রীধরের ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

'সম্ভবামি আত্মমায়য়া'—শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে বলেন,—

স চ ভগবান্‌জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদাসম্পন্নঃ ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং প্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়ো ভূতানাম্ ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবান্ ইব জাত ইব।

—অর্থাৎ, সেই ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান্ নিজের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে স্ববশে আনিয়া—অজ অব্যয় মহেশ্বর শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব হইলেও নিজ মায়া দ্বারা যেন দেহী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীধর স্বামী এ সম্পর্কে কিছু ভিন্ন-মত। তিনি বলেন—

ঈশ্বরোঽপি কর্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি সন্ স্বমায়য়া সম্ভবামি * * স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়া অবতরামি।

—অর্থাৎ, ভগবান্ কর্মরহিত; তিনি কর্মের অধীন নহেন। তথাপি নিজ মায়া দ্বারা উৎপন্ন হন। তিনি আপনার শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া বিশুদ্ধ উর্জ্জিত সত্ত্বমূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন।

অতএব, শ্রীধর স্বামীর মতে অবতারকালে ভগবান্ মূর্তি পরিগ্রহ করেন, কিন্তু সে মূর্তি শুদ্ধসত্ত্বনির্মিত। গীতার অন্যতর টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী এ সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, "কেহ কেহ নিত্য নিরবয়ব নির্বিকার পরমানন্দময় ভগবানের অবতারকালে বাস্তব দেহসম্বন্ধ মনে করেন ; তাহা সঙ্গত নহে। ভগবান্ নিত্য বিভু সচ্চিদানন্দঘন নির্গুণ পরমাত্মা—তাঁহার কি ভৌতিক, কি মায়িক, কোনরূপ দেহই সম্ভবে না। তবে যে অবতারকালে তাঁহার দেহিত্ব প্রতীত হয়, তাঁহাকে মূর্তিধারী বলিয়া মনে হয়—তাহা মায়া মাত্র।" অর্থাৎ, সচ্চিদানন্দের সে মূর্তি—পারমার্থিক ত নহেই, প্রাকৃতিকও নহে—তাহা প্রাতিভাসিক মাত্র।

এইরূপ কোন কোন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, যিশুর যে অবতার-শরীর, তাহা অপ্রাকৃত শরীর—তাহা শরীরই নয়—একটা প্রতিভাস (appearance or simulacrum) মাত্র। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, যিশুখ্রীষ্ট বা শ্রীচৈতন্যের শরীরের যে পরিচয় আমরা প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে পাই, তাহাতে দেখি, তাঁহাদের অধিষ্ঠিত দেহও আমাদেরই দেহের মত—হ্রাসবৃদ্ধির অধীন, জন্মমৃত্যুর অধিকৃত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের দেহত্যাগের পর সেই সেই দেহের সংকার করা হইয়াছিল। যিশুখ্রীষ্টের দেহ ক্রুশে শলাকাবিদ্ধ হইলে তাঁহার সেই ক্ষত হইতে রক্তপাত হইয়াছিল। পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য গয়া গমনকালে চৈতন্যদেবের দেহ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিল। অতএব এই সকল অবতারের দেহকে প্রতিভাস বা simulacrum মনে করা কোন মতেই সঙ্গত নয়।

এখন প্রশ্ন উঠিবে, অবতারের দেহ যদি আমাদেরই মত রক্তমাংসের দেহ হয়, তবে অবতার-গ্রহণের প্রণালী কি? বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা করেন নাই। আমার 'অবতারতত্ত্ব' গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আমি যথাসাধ্য এ প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছি। অতএব এস্থলে বিস্তার না করিয়া সংক্ষেপে আমার সিদ্ধান্তের বিবৃতি করিব।

বাদ দ্বিবিধ—দ্বৈত ও অদ্বৈত। দ্বৈত-দৃষ্টিতে অবতার গ্রহণের প্রণালী একরূপ—অদ্বৈত-দৃষ্টিতে অন্যরূপ। প্রথম অদ্বৈত-দৃষ্টি বুঝিবার চেষ্টা করি।

এ দেশে আমরা যাহাকে সংবিৎ বলি—পাশ্চাত্য দর্শনে তাহার নাম consciousness. এই সংবিৎ সাধারণতঃ আমাদের মস্তিষ্ক-দ্বার দিয়াই প্রকাশিত হয়। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সংবিৎ একটা ব্যাপক বস্তু—মস্তিষ্ক-দ্বারে তাহার ভগ্নাংশ মাত্র ব্যক্ত হয়—অধিকাংশই অব্যক্ত বা subliminal থাকে। সংবিতের এই তথ্য বুঝাইতে তত্ত্বদর্শী মায়ার সাহেব ব্যক্ত সংবিৎকে সাগরে ভাসমান তুষার-স্তূপের সহিত তুলিত করিয়াছেন। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, জলপূর্ণ কাচের গেলাসে এক টুকরা বরফ ছাড়িয়া দিলে ঐ বরফের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র (বোধ হয়, সাত ভাগের এক ভাগ) জলের উপরে ভাসে—বাকি অংশ জলের নীচে ডুবিয়া থাকে। তুষারস্তূপের সম্বন্ধেও ঐরূপই দেখা যায়। শীতপ্রধান উত্তর-সমুদ্রে গ্রীষ্মঋতুর আরম্ভে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের পাহাড় ভাসিয়া

আসে। ঐ সকল পাহাড়ের দশ হাত যদি জলের উপরে ভাসে, তবে অন্ততঃ ৭০ হাত জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদেরা এখন বলিতেছেন, জীব-সংবিৎও ঐরূপ। ইহা একটা প্রকাণ্ড বস্তু, কিয়দংশ মাত্র মস্তিষ্কের দ্বারা প্রকাশিত হয়—যাহাকে brain consciousness বলে। ইহাই যেন বরফস্তূপের জলের উপরিভাগে ভাসমান ভগ্নাংশ; কিন্তু ইহার অধিকাংশ subliminal অর্থাৎ, জাগ্রৎ অবস্থায় অব্যক্ত থাকে—ইহাই যেন বরফস্তূপের জলমগ্ন অবশিষ্টাংশ। দিব্যদৃষ্টি, প্রাগ্‌দৃষ্টি, সাইকোমেটরি, সফল স্বপ্ন, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি ব্যাপারে ঐ subliminal সংবিৎ (যাহা জাগ্রদ্দশায় অব্যক্ত বা subliminal ছিল) সেই সংবিৎ উপরে কতকটা ভাসিয়া উঠে এবং আমরা ঐ ব্যাপকতর সংবিতের (larger consciousness-এর) ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হই। এই Subliminal consciousness সম্বন্ধে স্যর অলিভার লজ লিখিয়াছেন—

> The doctrine is roughly that we are each of us larger than we know; that each of us is only a partial incarnation of a larger self. The individual, as we know him, is an incomplete fraction. ··· The incarnate fraction varies in different individuals, from something almost insignificant to something rather magnificent and striking, but in no case is the whole self manifested in any given individual.—*Making of Man.*

অর্থাৎ মস্তিষ্কের দ্বার দিয়া আমাদের যেটুকু প্রকাশিত হয়, আমরা প্রত্যেকে তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। এই ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দ্বারা আমাদের ব্যাপকতর সংবিতের পরিমাণ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র; কারণ, brain consciousness (যাহাকে এদেশের ভাষায় জাগ্রৎ-সংবিৎ বলা হয়) সমস্ত জীবের কতটুকু?

সেই জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা জাগ্রৎ-সংবিতের উপর স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এবং যোগসিদ্ধের পক্ষে তুরীয় ও নির্বাণ সংবিতের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, নির্বাণ অবস্থাতেই সংবিতের সম্পূর্ণ সম্প্রসারণ হয়। স্যর অলিভার লজও বলিতেছেন, সংবিতের ব্যাপকতার ইয়ত্তা করা যায় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে 'শারীর' সংবিৎ এত বৃহৎ ভাবে ব্যক্ত হয় যে, আমরা তাহার মহীয়সী প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া সমাদর করি।*

এই যে ব্যাপক সম্বিৎ, অদ্বৈতবাদীর মতে উহাই ব্রহ্ম—উহার উদয়াস্ত নাই, অপচয়-উপচয় নাই, উহা অখণ্ড অব্যয় অদ্বয়। কেবল উপাধির ভেদে ঐ ব্রহ্ম-জ্যোতির

---

* How large a subliminal self may be, one does not know. ··· In some cases it may happen that the portion incarnate is so great that the embodied personality exhibits the phenomenon of transcendent genius and is by universal consent accounted 'a great man.'—*Making of Man.* Ch. ix.

প্রকাশের তারতম্য—বস্তুতঃ তাহার প্রভেদ বা পরিচ্ছেদ নাই—উপাধির্ভিদ্যতে ন তদ্বান্
এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—

যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্
আপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্

—'এক সূর্য যেমন বিভিন্ন জলাধারে বহুরূপে প্রতীয়মান হন—ইহাও তদ্রূপ।'

একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি বিশদ হইতে পারে। ধরুন, একটা প্রকাণ্ড ডোমের মধ্যে একটি মহোজ্জ্বল তাড়িতবর্তি রাখা গেল। ডোমটি কতকগুলি পরকলা দ্বারা গঠিত—কেহ অস্বচ্ছ, কেহ অর্দ্ধ-স্বচ্ছ, কেহ স্বচ্ছ—কয়েকটি পরকলা রঙীন, দুই একটি শ্বেত-শুভ্র। এরূপ স্থলে ডোমের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতির প্রকাশে তারতম্য ঘটিবে না কি?

যে পরকলাগুলি অস্বচ্ছ (opaque)—তাহাদের মধ্য দিয়া ঐ জ্যোতিঃ প্রায় অপ্রকাশই থাকিবে। যে পরকলাগুলি অর্দ্ধ-স্বচ্ছ, তাহাদের মধ্য দিয়া জ্যোতির আংশিক প্রকাশ হইবে মাত্র। আর যেগুলি প্রায় স্বচ্ছ, যদি মাজিয়া ঘষিয়া তাহাদিগকে বেশ স্বচ্ছ করা যায়—তবে তন্মধ্য দিয়া জ্যোতির পূর্ণ প্রকাশ হইবে। এইরূপ রঙীন পরকলাগুলি জ্যোতির সহজ শুভ্রতাকে রঞ্জিত করিবে। কিন্তু যে পরকলা শ্বেতশুভ্র, তাহার মধ্য দিয়া যে জ্যোতিঃ বহির্গত হইবে, তাহার প্রকাশ অবিকৃত থাকিবে।

অদ্বৈতবাদী বলেন, আমরা প্রত্যেকে ঐরূপ এক একটি পরকলা। যে অখণ্ড ব্রহ্মজ্যোতিঃ অপ্রাকৃত ধামে চির জ্যোতিষ্মান্—সেই জ্যোতিঃ প্রপঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন জীব-পরকলার উপাধিযোগে বিচিত্র আকারে ও বিবিধ বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু যদি কোন উপাধি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয়, যদি কোন পরকলার সমস্ত মলা মলিনতা বিধৌত হইয়া সে একেবারে অনাবিল, একান্ত শ্বেতশুভ্র হয়—তবে সেই দ্বার দিয়া ব্রহ্ম-জ্যোতির যে অবাধ মহিমা ও অপার ঐশ্বর্য প্রকটিত হইবে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? আমরা যাঁহাদের অবতার বলি, তাঁহারা ঐরূপ একান্ত অনাবিল শ্বেতস্বচ্ছ পরকলা—সে জন্য তাঁহাদের মধ্য দিয়া ব্রহ্মজ্যোতির যে প্রকাশ হয়, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া লোক আনন্দে উৎফুল্ল ও ভক্তিতে উদ্বেল হইয়া উঠে। অদ্বৈত-দৃষ্টিতে ইহাই অবতার-তত্ত্ব।

এইবার দ্বৈত-দৃষ্টির কথা বলি। অদ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন—অদ্বৈতবাদের মহাবাক্য—সোঽহং, তত্ত্বমসি।

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ—উপনিষদ্

দ্বৈতবাদে কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের নিত্যভেদ স্বীকৃত—

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ ঈশানীশৌ—শ্বেতাশ্বতর

'জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন—জীব অজ্ঞ অনীশ্বর, ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ঈশ্বর।' কেবল তাহাই নয়—বিভিন্ন শরীরের অধিষ্ঠাতা বা চালক জীব ভিন্ন ভিন্ন। আমার দেহপুরীর স্বামী আমি—আপনার দেহপুরীর স্বামী আপনি। আপনি ও আমি স্বতন্ত্র।

কিন্তু তাহা হইলেও এরূপ ঘটনা বিরল নয় যে, কখন কখনও এক জীব অন্য জীবের

দেহে অনধিকার প্রবেশ করিয়া প্রকৃত মালিককে স্থানচ্যুত বা বেদখল করে। এ ব্যাপারকে আমরা এদেশে 'আবেশ' বলি—পশ্চিমে ইহার নাম Control বা Possession.

> What is meant is that the human body may become separate from its ordinary tenant and another tenant may step into it.—Annie Beasant.

এই আবেশ সম্পর্কে মায়ার সাহেব তাঁহার *Human Personality* গ্রন্থে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন—কৌতূহলী পাঠক তাহা পাঠ করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত এই :—

> If we analyse our observations of possession, we find two main factors—the central operation, which is the control by a spirit of the sensitive's organism and the indispensable pre-requisite which is the partial and temporary desertion of that organism by the percipient's own spirit.

অর্থাৎ, আবেশস্থলে পর পর দুইটি ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায় :—প্রথমতঃ যিনি আবেশের পাত্র হইবেন, তাঁহার সংবিৎ বা আত্মা স্বীয় দেহ ছাড়িয়া সাময়িক ভাবে বাহিরে অবস্থান করে এবং সেই সুযোগে আগন্তুক আবেশকারীর সংবিৎ বা আত্মা (spirit) সেই শূন্য পুরীতে প্রবেশ করিয়া ঐ আবিষ্টের শরীর দখল করিয়া বসে। ভূতাবেশস্থলে আরও দেখা যায় যে, কখন কখন দুষ্ট ভূত বা প্রেত বলপূর্ব্বক মালিককে বেদখল করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে এবং মালিক নিজের দখল বজায় রাখিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। তখন উভয়ের মধ্যে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহারই ফলে আবিষ্টের দেহে হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ-সকল ফুটিয়া উঠে।

প্রেততত্ত্ববাদী বা স্পিরিচুয়ালিষ্টদিগের বৈঠকে (seanceএ) 'মিডিয়মে'র দেহে আগন্তুক প্রেতের আবেশ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ঐ অবস্থায় প্রায়ই মিডিয়ম অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং তাহার মধ্যে ঐ আগন্তুক প্রেত আংশিক বা পূর্ণ ভাবে প্রবেশ করে। কেহ কেহ আবেষ্টা যে আবিষ্ট হইতে ভিন্ন ব্যক্তি—এ কথা স্বীকার করিতে চান না--তাঁহারা বলেন, ঐ ঐ স্থলে আবিষ্টের Personalityর একাংশই আবেষ্টারূপে প্রতীয়মান হয়। মায়ার্স এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন—আবেশস্থলে আবিষ্টের আত্মা অন্ততঃ আংশিক ভাবে তাহার স্থূল শরীর ত্যাগ করিলে কোন আগন্তুক আত্মা তাহার দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ শরীরের চালনা করে।

> The automatist (আবিষ্ট), in the first place, falls into a trance, in which his spirit partially quits his body ··· so as to leave room for an invading spirit to use it in somewhat the same fashion as its owner is accustomed to use it.

এ কথার প্রমাণে মায়ার্স বলেন—আবেশকারী যে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহার লেখার ছাঁদে,

কথার স্বরে, বাক্যের ভঙ্গিতে তাহা প্রমাণিত হয়। কখনও বা আবিষ্টের সম্পূর্ণ অজানা সংবাদ তাহার বচনে বা লিখনে প্রকাশিত হয়।

> The controlling spirit proves his identity mainly by reproducing in speech or writing, facts which belong to his memory and not to the automatist's memory. He may also give evidence of supernormal perceptions of other kinds.

পাশ্চাত্ত্য প্রেততাত্ত্বিকেরা প্রেতের সমস্যা লইয়া এতই ব্যস্ত যে, প্রেত ভিন্ন অন্য জীবের যে আবিষ্টের দেহে আবেশ ঘটিতে পারে, একথা তাঁহারা আলোচনা করিবার বা লক্ষ্য করিবার অবসর পান না। কিন্তু ভূতাবেশ যেমন প্রমাণসিদ্ধ, দেবাবেশও সেইরূপ প্রমাণসিদ্ধ। অনেক স্থলে উন্নত পুরুষ, কখনও বা মুক্ত পুরুষ—কোন কোন শুদ্ধ আধারে আবিষ্ট হয়েন। এ সম্বন্ধে এদেশের ও বিদেশের ধর্ম-সাহিত্য বহু প্রামাণিক কাহিনীতে পরিপূর্ণ।

'শঙ্কর-দিগ্বিজয়ে' দেখা যায়, শঙ্করাচার্য্য কামকলা শিক্ষার জন্য অমরু রাজার দেহে প্রবেশ করিয়া কয়েক মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতে তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপ সম্বন্ধে এই ধরণের ঘটনার উল্লেখ আছে। বিশ্বরূপ বেশ উন্নত সাধক ছিলেন।

প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান্।
আজন্ম বিরক্ত সর্ব্ব গুণের নিদান॥
নিরবধি থাকে সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণকথা রঙ্গে।—চৈতন্যভাগবত

এই বিশ্বরূপ যৌবনে বিরাগী হইয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ করেন এবং কয়েক বৎসর মধ্যে পুণার সন্নিহিত পান্ঢারপুরে দেহরক্ষা করেন। বৈষ্ণবগ্রন্থের বর্ণনায় জানা যায়, বিশ্বরূপের তিরোধানের পর যখন শ্রীনিত্যানন্দ আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন, তখন তাঁহার লীলার সহায়তা করিবার জন্য বিশ্বরূপ নিত্যানন্দের শরীরে প্রবেশ করিলেন।

মূর্ত্তিভেদে জন্মিলা আপনি নিত্যানন্দ।—চৈতন্যভাগবত

এই আবেশের ফলে নিত্যানন্দের আকৃতি এমনভাবে পরিবর্ত্তিত হইত যে, শচীমাতা অনেক সময় নিত্যানন্দকে বিশ্বরূপ বলিয়া ভ্রম করিতেন।

হেনমতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
নিত্যানন্দ স্বরূপের অভেদ শরীর।—চৈতন্যভাগবত

যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর নীলাচলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং নিত্যানন্দকে বাংলা দেশে প্রচারকার্য্যে নিয়োজিত করিলেন, তখন দুই জনের মধ্যে বিচ্ছেদ হইল। তখন বিশ্বরূপ কি করিলেন? তিনি নিত্যানন্দের শরীর ছাড়িয়া পরমানন্দপুরীর দেহে আবিষ্ট হইলেন। সেই জন্য দেখিতে পাই, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে মহাপ্রভু বলিতেছেন :—

অহো পরমানন্দপুরীশ্বরঃ তাবন্মুনীন্দ্রমাধবপুরীশ্বরস্য শিষ্যঃ, যত্র খলু অগ্রজস্য বিশ্বরূপস্য [illegible] ঐশ্বং তেজঃ প্রবিষ্টম্।

খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে যে নষ্টিক্ (gnostic) সম্প্রদায় আছে, সেই সম্প্রদায়ের লোক-দিগের পূর্বাপর বিশ্বাস যে, যিশু ও খ্রীষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি এবং মেরীর পুত্র যিশুর প্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃত তত্ত্ব ক্রাইষ্টের আবির্ভাব হইয়াছিল। ক্রাইষ্ট যিশুর দেহে তিন বৎসর মাত্র বসতি করিয়া লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। ম্যাথু ও জনের কাহিনীতে দেখা যায়, যিশু যখন যৌবনের মধ্যসীমায় উপনীত, তখন জন্ দি ব্যাপটিষ্ট তাঁহাকে দীক্ষিত করেন। জন্ যিশুকে দীক্ষাদান করিলে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া ঐশ তেজঃ (Spirit of God) সুপর্ণের রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতরণ করিল এবং যিশুর উপর আপতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী হইল, "এই আমার প্রিয় পুত্র, আমার অশেষ প্রীতিভাজন।"

> Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptised of him. ··· And Jesus, when he was baptised, went up straitway out of the water : and, lo, the heavens were opened unto him and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him.
>
> And lo ! a voice from heaven saying, 'This is my beloved Son, in whom I am well pleased.'—Matthew, Ch. III, 14, 16-7.

যাহাকে আমরা অবতার বলি, সেও এইরূপ আবেশের ব্যাপার। যিনি অবতীর্ণ হন—তা তিনি পুরুষোত্তম ভগবান্ই হউন অথবা ভগবানের সাধর্ম্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষই হউন—তিনি ব্যক্তিবিশেষের দেহে আবিষ্ট হন। অর্থাৎ, ঐ দেহ তাঁহার সাময়িক বাহন বা উপাধি হয়। অবশ্য ঐ দেহ শুদ্ধ, পূত, অপাপবিদ্ধ হওয়া চাই। ভূতাবেশ স্থলে আগন্তুকের অনধিকার প্রবেশ, কিন্তু অবতার স্থলে নির্বাচিত বাহন স্বেচ্ছায় স্বদেহ সাময়িক ভাবে নিবেদন করেন এবং অবতার সেই দেহে আংশিক বা পূর্ণরূপে প্রবেশ করিয়া নিজের মহিমা ও মাধুর্য প্রকাশিত করেন। দ্বৈতদৃষ্টিতে ইহাই অবতারগ্রহণের প্রণালী।

আমার 'অবতার-তত্ত্বে' আমি যিশুখ্রীষ্ট, চৈতন্যদেব, পরশুরাম, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কিত প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই আবেশতত্ত্ব বিশদিত ও প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব না।

অবতার সম্পর্কে আরও অনেক বক্তব্য আছে, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তাহা আলোচ্য নয়।

ভারতচন্দ্রের একখানি পুঁথি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট্, এফ্-আর্-এ-এস্-বি

কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি প্রধান কাব্যগ্রন্থ, এবং ইহার রচনার কাল হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিম মধুসূদন রঙ্গলাল প্রমুখ সাহিত্যিক ও কবিগণের রচনায় বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত, এক শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া 'অন্নদামঙ্গল'-কে বাঙ্গালা ভাষার সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ বলিয়া ধরিতে পারা যায়। অবশ্য, রামায়ণ মহাভারত চণ্ডীকাব্য প্রভৃতি বাঙ্গালার জনসমাজে আদৃত হইত, কিন্তু মুখ্যতঃ পৌরাণিক আখ্যান হিসাবে লোকের কাছে ঐ পুস্তকগুলির আদর ছিল—কাব্যরসের আস্বাদনের জন্য, সুকুমার সাহিত্য হিসাবে, 'অন্নদামঙ্গল'-ই প্রথম ও প্রধান কাব্যগ্রন্থ ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীর সাহিত্যসৌন্দর্য সম্বন্ধে আমরা, অর্থাৎ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বহির্ভূত সাধারণ বাঙ্গালী, অতি অল্পকাল হইল, মাত্র উপস্থিত দুই এক পুরুষের মধ্যে, সচেতন হইতে আরম্ভ করিয়াছি। কোনও লেখকের লোকপ্রিয়তার একটী বড় প্রমাণ এই যে, তাঁহার রচনা হইতে বহু বচন বা ভাব সাধারণ্যে প্রচার লাভ করিয়া থাকে, অনেক সময়ে তাঁহার রচিত বচন ভাষায় প্রবাদের মতন সকলের মুখে মুখে ফিরে। আমরা এখন বৈষ্ণব পদকার "চণ্ডীদাস"-কে শত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পুনরাবিষ্কার করিয়াছি—চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদের সংগ্রহের প্রকাশ দ্বারা, সাহিত্যিক আলোচনা দ্বারা, শিক্ষিত সমাজে কীর্তন-সঙ্গীতের পুনঃপ্রচারের দ্বারা, বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্মমত শ্রদ্ধার সহিত বাঙ্গালী শিক্ষিতজন কর্তৃক আলোচনার ফলে, এবং ইহাও উল্লেখ করিতে হইবে, নাটক ও চলচ্চিত্রের সহায়তায়, "চণ্ডীদাস" এখন বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়াছেন, তাঁহার রচনা বলিয়া "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ," "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই" প্রভৃতি বহু পদাংশ আমরা সকলেই আওড়াইতেছি, আলাপে ও রচনায় উদ্ধার করিতেছি। আমার মনে হয়, বাঙ্গালার পুরাতন (অর্থাৎ ইংরেজী সভ্যতার ও মনোভাবের প্রচারের পূর্বেকার) যুগের বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ হইতে যত পয়ার বা ত্রিপদী বা পদাংশ অথবা বাক্য বাঙ্গালা ভাষায় প্রবচন বা প্রবাদ রূপে আপনা হইতেই গৃহীত হইয়াছে, এমন আর কোনও কবির লেখা হইতে হয় নাই।

ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছিল, আনুমানিক ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে। তাঁহার জীবৎকালে 'অন্নদামঙ্গল' রচনার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রথম তাঁহার গ্রন্থ মুদ্রণের সময় পর্যন্ত, হাতে লেখা পুঁথিতে তাঁহার রচনা
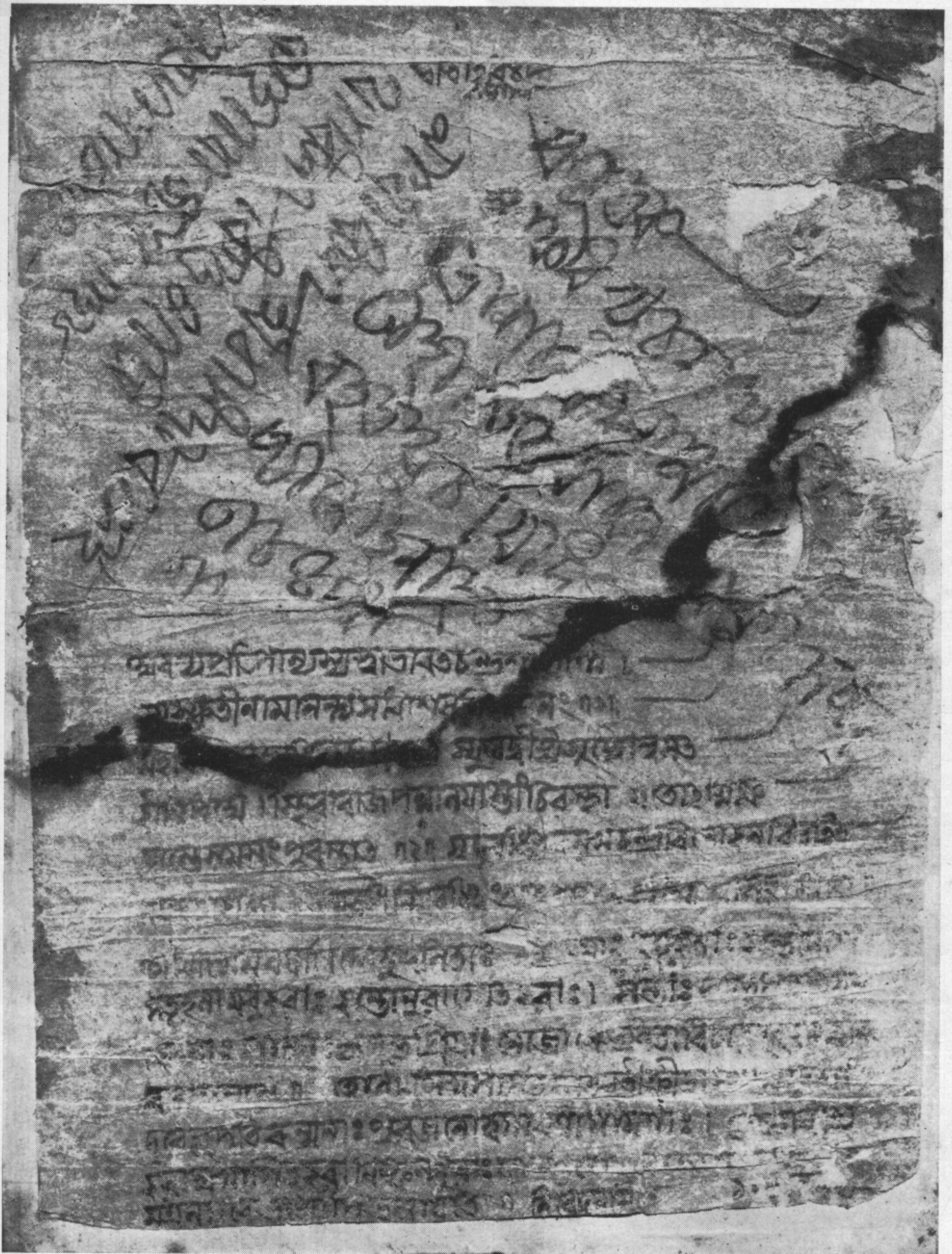
কবি ভারতচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত আবেদন পত্র, তদুপরি
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত আদেশ

[বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালা হইতে]

লোকসমাজে প্রচারিত হইত। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সংস্করণের পরে ১২৩৫ সালে (১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে) কলিকাতা সিমুলিয়ার "পীতাম্বর সেন দিগরের" (and Company-র খাসা বাঙ্গালা তরজমা—"দিগরের") ছাপাখানায় "অন্নদামঙ্গল—বিদ্যাসুন্দর" মুদ্রিত হয়। তাহার পরে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একখানি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করেন। কবির মৃত্যুর পরে ষাট বৎসরের মধ্যে তাঁহার রচিত কাব্য সমগ্রভাবে মুদ্রিত হওয়ায়, উক্ত গ্রন্থে বিশেষ পাঠবিকৃতি ঘটিতে পারে নাই। গঙ্গাকিশোর-প্রমুখ প্রথম সংস্কর্তা ও প্রকাশকগণ যে পুঁথি বা পুঁথিসমূহ অবলম্বন করিয়া বই ছাপান, সে সমস্ত পুঁথি ভারতচন্দ্রের সময়ের কত কাছাকাছি লিখিত হইয়াছিল তাহা আমরা জানি না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালায় ভারতচন্দ্রের কাব্যের তারিখ দেওয়া ছয়খানি পুঁথি আছে; এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনটীর তারিখ হইতেছে ১২০৪ সাল (=১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ), তাহার পরে আছে ১২০৯ সাল (=১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ), ১২২৮ সাল (=১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ), ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ, ১৭৫১ শক (=১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ), ১২৩৯ সাল (=১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ)। খণ্ডিত তারিখ-বিহীন পুঁথিও কতকগুলি আছে। বাঙ্গালা দেশে বা অন্যত্র বাঙ্গালা-পুঁথি-সংগ্রহ-সমূহে ভারতের এইরূপ পুঁথি আরও মিলিতে পারে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের একটী যুগোপযোগী প্রামাণিক এবং সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালার ব্রিটিশ-পূর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যশিল্পী হিসাবে এরূপ একটী সংস্করণ না থাকা বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির পক্ষে লজ্জার কথা। আমাদের সাহিত্যিকগণের মধ্যে ভারতচন্দ্রের গুণগ্রাহী সমালোচকের অভাব নাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম;—তাঁহার সম্পাদনায় ভারতচন্দ্রের কাব্যটী প্রকাশ করার কথা এক সময়ে আমাদের অনেকেরই মনে হইয়াছিল। সম্প্রতি সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত, বাঙ্গালার সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যালোচক সমাজে সুপরিচিত "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"-তে, ভারতচন্দ্রের একটী প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা ভারতচন্দ্রের পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণের সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন।

পারিসের 'বিব্লিওতেক নাসিওনাল' বা ফরাসী জাতীয় গ্রন্থাগারের ভারতীয় পুঁথির সংগ্রহের মধ্যে একখানি বিদ্যাসুন্দরের পুঁথি আছে; A. Cabaton আ. কাবাতঁ-সংকলিত উক্ত পুঁথিসংগ্রহের তালিকায় এই সংবাদ পাইয়া, ব্রজেন্দ্র-বাবু ও সজনী-বাবু, এইবার যখন আমি ইউরোপে যাই তখন আমায় অনুরোধ করেন, সম্ভব হইলে পারিসে ঐ পুঁথিটী যেন আমি দেখিয়া আসি। তদনুসারে আমি এই বৎসরের (১৯৩৮ সালের) জুলাই মাসে ও সেপ্টেম্বর মাসে পুঁথিখানি দেখি। সুখের বিষয়, পুঁথিতে লিখনের তারিখ দেওয়া আছে; সন ১১৯১ সাল ১৪ কার্তিক তারিখে ইহার লিখন সমাপ্ত হয়; ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা এই পুঁথি; উপস্থিত আমাদের গোচর-মত ইহাই হইতেছে ভারতচন্দ্রের কাব্যের সবচেয়ে প্রাচীন পুঁথি।

Augustin Aussant ওগুস্তঁ্যা ওসঁা নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক চন্দননগরে অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে ছিলেন, ইনি ফরাসী সরকারের বাঙ্গালা দোভাষীর কাজ করিতেন। ইঁহার সংকলিত ফরাসী-বাঙ্গালা অভিধান অমুদ্রিত অবস্থায় পারিসের বিব্লিওতেক্ নাসিওনাল-এ রক্ষিত আছে—এই অভিধানে বাঙ্গালা শব্দগুলি ফরাসী বানানে রোমান অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে (এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, 'ভারতী,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, পৃঃ ১৩৬-১৩৭)। পুঁথিখানি ইনিই ভারতবর্ষ হইতে পারিসে লইয়া যান।

পুঁথিখানি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ২৫ বৎসরের মধ্যে লিখিত। সাধারণ অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালা পুঁথি, একটু বড় আকারের লম্বা চওড়া পুঁথি। পত্র-সংখ্যা ৫০। পুঁথির আরম্ভে ফরাসী ভাষায় টানা হাতের লেখায় মন্তব্য লেখা আছে—Calikkya Mongol ou Biddya Choundour Oupoyekhyana—Mariage de Biddya et Choundour sous l'aprobation de Calikkya femme de la Divinite´ Chib, tire´ de l' Histoire de la ditte Divinite´—coppie´ en 1784 ; তদনন্তর, অন্য হাতে লেখা, Poème Bengali modern intitule´ Vidyasundara ou les Amours de Vidya´ et de Sundara. MS. Bengaly d 'Aussaint. অর্থাৎ, 'কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান—শিব দেবতার স্ত্রী কালিকার অনুমোদন অনুসারে বিদ্যা ও সুন্দরের বিবাহ, উক্ত দেবতার ইতিহাস (বা পুরাণ) হইতে উদ্ধৃত, ১৭৮৪ সালে অনুলিখিত ; বিদ্যাসুন্দর অর্থাৎ বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেম নামক আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য,—
—ওসঁ্যার ('আনীত) বাঙ্গালা পুঁথি'।

এই পুঁথির লেখা সর্বত্র গোটাগোটা ও সহজপাঠ্য। ইহার আরম্ভ এই রূপ—
"৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ। অথ অন্নপূর্ণা ঠাকুরানির পুস্তক লিক্ষতে। কবি সর্ব্বী শ্রী ভারথচরণ রায়। আজ্ঞা শ্রীযুক্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়।" ইত্যাদি।

তদনন্তর, "আল আমার প্রাণ কেমন লো করে না দেখি তাহারে ॥" এই ছত্রশীর্ষক গান দিয়া পালা আরম্ভ হইয়াছে।

ইহার সমাপ্তি এই রূপ—"বিদ্যাসুন্দরে লইয়া কালিকা কৌতুকী হয়্যা কৈলাসেতে করিলা প্রবেস। কালিকা-মঙ্গল সায় : ভারথ ব্রাহ্মণে গায় : রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেস ॥ ইতি কালিকামঙ্গল সমাপ্ত। সন ১১৯১ সাল তারিখ ১৪ কার্তিক।'

এই পুঁথিখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছি, কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে পারিসে বিশেষ উদ্বেগের সময় গিয়াছিল, আর নানা কাজে নকল করিবার সময় হয় নাই, সমস্তটার ফোটোগ্রাফ আনাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। প্রামাণিক সংস্করণের জন্য এই পুঁথি প্রাচীনতম বিধায় আমাদের মিলাইয়া দেখা দরকার। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের সর্বপ্রাচীন পুঁথিখানির তুলনায় বোধ হয় পারিসের এই পুঁথি খুব বেশী বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইবে না।

ভারতচন্দ্রের পুঁথিগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহার কাব্যের একটা ন্যায়

স্থির-নির্ধারিত হয় নাই। 'কালিকামঙ্গল,' 'অন্নদামঙ্গল,' 'বিদ্যাসুন্দর,' 'কালিকাপুরাণ' এই রূপ বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। তবে 'অন্নদামঙ্গল' নামটীই সমধিক প্রচলিত ছিল। প্রথম মুদ্রিত সংস্করণে এই নামই পাই।

আধুনিক সংস্করণে ভাষা অল্পবিস্তর আধুনিক রূপ পাইয়া বসিয়াছে, ১৭৮৪-র পুঁথি সে বিষয়ে আমাদিগকে অনেকটা সংশোধন করিয়া দিবে। পুঁথির পাঠে দেখা যায়, এখনকার "মাথা খেতে এলি মোর" অষ্টাদশ শতকে ছিল "মাথা খাত্যি আল্যি মোর"। পুঁথির পাঠে দুই পাঁচটী শব্দও প্রাচীন রূপেই মিলিতেছে—ফরাসী Hollandaise 'ওলাঁদেজ্' হইতে বাঙ্গালা 'ওলন্দাজ', এই পুঁথিতে 'ওলন্দেজ' রূপে পাই। পুঁথিতে—এমন কি, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার পরও যে সব পুঁথি লিখিত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে কোনও-কোনওটীতে—'ভারতচন্দ্র' এই নামটী বহুশঃ 'ভারথচন্দ্র' রূপে পাই। সংস্কৃতে ত-কার যুক্ত 'ভারত' রূপই প্রচলিত; কিন্তু থ-কার যুক্ত 'ভারথ'-রূপও প্রাচীন ভারতে কথ্য ভাষায়—যে ভাষার আধারে সাহিত্যিক সংস্কৃত গঠিত হইয়াছিল তাহাতে—বিদ্যমান ছিল; এই 'ভারথ' শব্দ, প্রাকৃতে 'ভারধ' ও 'ভারহ' রূপ গ্রহণ করে, এবং ইহা মধ্য-যুগে হিন্দী বাঙ্গালা প্রভৃতিতে 'ভারথ' রূপেই গৃহীত হয়। প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রায় সর্বত্র 'ভারত' অপেক্ষা 'ভারথ' শব্দই অধিকতর ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—'মহাভারথ, ভারথ-পুরাণ' প্রভৃতি শব্দে। ভারতচন্দ্রের নামেও এই অসংস্কৃত রূপ হাতের লেখা পুঁথিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে—কেবল ছাপার সময়ে সংস্কৃত শুদ্ধ রূপই গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ভাষায় 'ভারত—ভারথ' এই দুই রূপের পাশাপাশি অবস্থান, একক বা বিশিষ্ট ব্যাপার নহে; চীনা ভাষায় রামায়ণের আখ্যানের তিনটি অনুবাদ হয়, তাহার দুইটীতে রাজা দশরথের নাম 'দশ-রথ' রূপেই আছে, অন্যটীতে 'দশ-রত' রূপে পাওয়া যাইতেছে; চীনারা সাধারণতঃ বড়-বড় সংস্কৃত নাম চীনা অক্ষরে প্রতিবর্ণীকরণ দ্বারা জানাইত না, অনুবাদ করিয়া লইত; Ten-Chariots ('দশ-রথ'), এই রূপ অনুবাদের পার্শ্বে আবার Ten-Pleasures ('দশ-রত') অনুবাদ হইতে, 'দশ-রত' শব্দের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়। ভারতবর্ষে আর্য ভাষার আদি-যুগে 'ত' ও 'থ' প্রত্যয়দ্বয়ের পারস্পরিক প্রভাবের ফলে এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে।

ভারতচন্দ্রের শব্দসম্পদ্ বিশেষ লক্ষণীয়। বোধ হয়, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এবং রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র শব্দসংখ্যায় তুল্যমূল্য হইবেন। ভারতচন্দ্রের ব্যবহৃত বহু শব্দ মুদ্রিত পুস্তকে বিকৃত রূপে পাওয়া যায়, এগুলির পুরাতন বা যথাযথ রূপ পুঁথি দৃষ্টে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইলে, শব্দগুলির ব্যাখ্যাও সহজ হইবে। অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালা দেশের গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে, এই দেশের নাগরিকতার একমাত্র প্রকাশক ছিলেন কবি ভারতচন্দ্র। অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালার সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল সাহিত্যিক নিদর্শন হিসাবে আশা করি মৌজুদ পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তক অবলম্বন করিয়া শীঘ্রই ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা হইবে।

রামনারায়ণ তর্করত্ন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র পূর্ব্বে দুই এক জন বাঙালী কবি ইংরেজী কাব্যের প্রভাবে পড়িয়া সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে কাব্যরচনার সূত্রপাত করিয়া থাকিলেও আমরা যেমন আজও পর্য্যন্ত তাঁহাকেই আধুনিক পদ্ধতির সর্ব্বপ্রথম কবি হিসাবে সম্মান করিয়া থাকি, রামনারায়ণ তর্করত্ন—বা নাটুকে রামনারাণকেও তেমনি দুই চারি জন পূর্ব্বগামী নাট্যকারের নাট্যপ্রচেষ্টা সত্ত্বেও সর্ব্বপ্রথম আধুনিক নাট্যশিল্পীর সম্মান দিয়া থাকি। ইহার কারণ এই যে, মাইকেলের মত তিনিও অসাধারণ শিল্পপ্রতিভাবলে মৃত ও প্রণালীবদ্ধ গতানুগতিকতার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন; ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে বাংলা দেশে যে রঙ্গমঞ্চের উদ্ভব হইয়াছিল, তাঁহারই কবিকীর্ত্তির দ্বারা তাহা সর্ব্বপ্রথম সার্থকতা লাভ করে। ইহা এক হিসাবে অধিকতর বিস্ময়কর এই কারণে যে, বহুভাষাবিৎ মাইকেল ইউরোপীয় জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন দীর্ঘকাল কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ব্যাকরণ অলঙ্কারের অধ্যাপকমাত্র ছিলেন, ইউরোপীয় বা আধুনিক পদ্ধতির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ কোনই পরিচয় ছিল না। সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কারে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল, তিনি অধ্যাপক হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন—তাঁহার এই সকল পরিচয় আজিকার দিনে প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ীভূত হইয়াছে, কিন্তু বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ নাট্যকার হিসাবে তিনি আজিও সগৌরবে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার জীবনী ও কীর্ত্তির পুনরালোচনা সহৃদয় বাঙালী পাঠকের নিকট অনাবশ্যক বিবেচিত না হইতেও পারে।

বাল্য ও ছাত্র-জীবন

২৬ ডিসেম্বর ১৮২২ তারিখে চব্বিশ-পরগণার অন্তঃপাতী হরিনাভি গ্রামে রামনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামধন শিরোমণি। রামনারায়ণ "বাল্যাবস্থাতে দেশে ও বিদেশে চৌবাড়িতে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ এবং ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ড প্রায় অধ্যয়ন" করেন।

রামনারায়ণ শৈশবেই পিতামাতাকে হারাইয়াছিলেন। তাঁহার কোন পরিচিত বন্ধু লিখিয়াছেন, "তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর* ও তৎপত্নী কর্তৃক

---

* প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ১৩৪৪ সালের প্রথম সংখ্যা (পৃ. ২৫-৩০) ও ১৩৪৫ সালের প্রথম সংখ্যা (পৃ. ২৭) 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় আমি আলোচনা করিয়াছি।
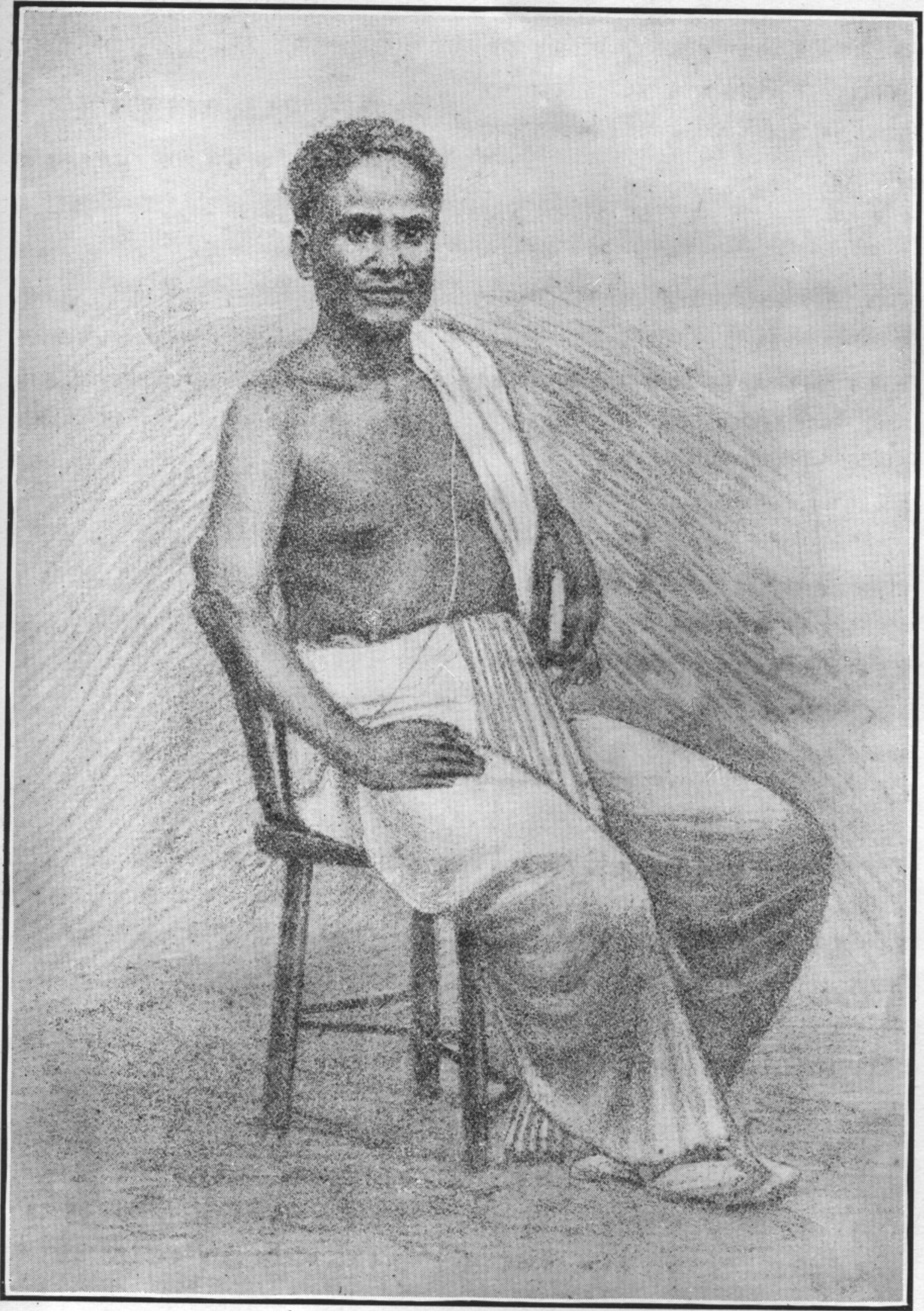
পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন

লালিত হইয়া পিতৃ মাতৃ বিয়োগ কষ্ট অনুভব করিতে পারেন নাই। আমরা তর্করত্ন মহাশয়কে স্বীয় ভ্রাতৃজায়ার গুণোদ্‌ঘোষণ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি যে, 'তিনি শৈশবে আমায় মাতৃস্নেহে পালন না করিলে বোধ হয় শৈশবেই আমার সত্তা লোপ হইত'।*

১৮৪৩ সনের আগষ্ট মাসে প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর অস্থায়ী ভাবে কিছু দিনের জন্য গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক হন। এই সময় রামনারায়ণ ভ্রাতার নিকট থাকিয়া, সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৪৩ হইতে ১৮৫৩ সনের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত—দশ বৎসর তিনি গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্র হিসাবে কলেজে তাঁহার সুনাম ছিল।

কর্ম্মজীবন

হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া রামনারায়ণ হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। রাজেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কয়েক জন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায় সিঁদুরিয়াপটীর ৺রামগোপাল মল্লিকের বৃহৎ বাটীতে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সহিত শীল্‌স কলেজ ও ডেবিড হেয়ার অ্যাকাডেমিও সংযুক্ত হইয়াছিল। এই কলেজের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত রাণী রাসমণি দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।† কলেজের কার্য্য আরম্ভ হয় "১৮৫৩ সালের ২রা মে সোমবার"।‡ রামনারায়ণের অধ্যাপনা বিষয়ে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

> শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় হিন্দু মিট্রোপলিটন কালেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত হওয়াতে ছাত্রদিগের বাঙ্গালা শিক্ষা অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, ইনি অতি সুপণ্ডিত, ও সংস্কৃত কালেজের একজন বৃত্তিধারি ছাত্র ছিলেন.।.. বঙ্গভাষা লেখন পঠনেও বিশেষ পারদর্শী, পতিব্রতোপাখ্যান নামক পুস্তক লিখিয়া রঙ্গপুরের কুণ্ডি পরগণার বিখ্যাত ভূম্যধিকারি শ্রীযুত কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত প্রাইজ গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব এতাদৃশ সুযোগ্য মহাশয়ের সংযোগ দ্বারা অভিনব কালেজ বিদ্যালোকে পরিদীপ্ত হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।—
> 'সংবাদ প্রভাকর,' ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩।

২২ অক্টোবর ১৮৫৩ তারিখে রামনারায়ণ হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্রদিগের উপদেশার্থ বিদ্যা-বিষয়ক প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি মাতৃভাষা শিক্ষার

---

* "কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন"—'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি,' ১২৯২ সাল, পৃ. ১৫৬।

† 'সংবাদ প্রভাকর,' ১৩ মে ১৮৫৩। ‡ ঐ ৩০ এপ্রিল ১৮৫৩।

প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, আজিকার দিনেও তাহার মূল্য আছে। তিনি বলেন :—

> তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্ব্বক ইংরাজী শিখিবে বাঙ্গলাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাঙ্গলার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না ; বাঙ্গলা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, স্নতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। দেখ বর্ত্তমান কালে যে সকল প্রদেশ দৃষ্টি ও শ্রুতি গোচর হইতেছে সে সমস্ত দেশীয় লোকেরা সকলি স্ব স্ব দেশীয় ভাষাকে উত্তম ভাষা জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকেন এবং সাধারণের এই এক প্রসিদ্ধ প্রথা আছে যে আপন২ দেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না হইলে কেহই অন্য ভাষা প্রতি ধাবমান হয়েন না অতএব তোমাদিগের দেশ ভাষার প্রতি বিমুখ হওয়া কদাচ উচিত নহে ॥

রামনারায়ণ দুই বৎসর অতীব যোগ্যতার সহিত হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন।

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ

১৫ই জুন ১৮৫৫ হইতে ৩১এ ডিসেম্বর ১৮৮২ সন পর্য্যন্ত—অন্যূন সাড়ে সাতাশ বৎসর রামনারায়ণ সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে তিনি কখন কি পদে কত বেতনে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার সঠিক সংবাদ সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্রের সাহায্যে দিতেছি :—

পদ	বেতন	কার্য্যকাল
অধ্যাপক, ৫ম ব্যাকরণ-শ্রেণী	৪০৲	১৫ জুন ১৮৫৫ হইতে ৩১ মার্চ ১৮৬০
ঐ ৪র্থ ঐ	৪০৲	১ এপ্রিল ১৮৬০ হইতে ১১ জুন ১৮৬৩
	৪৫৲	১২ জুন ১৮৬৩ হইতে ২৩ মার্চ ১৮৬৪
ঐ ৩য় ঐ	৫০৲	২৪ মার্চ ১৮৬৪ হইতে ৩০ জুন ১৮৭৩
দ্বিতীয় ব্যাকরণ-পণ্ডিত, সংস্কৃত কলিজিয়েট স্কুল	৬০৲	১ জুলাই ১৮৭৩ হইতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪
প্রথম ব্যাকরণ-পণ্ডিত ঐ ঐ	৬০৲	১ মার্চ ১৮৭৪ হইতে ৭ জুন ১৮৭৪
সহকারী অধ্যাপক—সংস্কৃত, অলঙ্কার প্রভৃতি, সংস্কৃত কলেজ	৮০৲	৮ জুন ১৮৭৪ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৭৯
	৮৫৲	১ আগষ্ট ১৮৭৯ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৮০
	৯০৲	১ আগষ্ট ১৮৮০ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৮১
	৯৫৲	১ আগষ্ট ১৮৮১ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৮২
	১০০৲	১ আগষ্ট ১৮৮২ হইতে ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২

৩০ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখে রামনারায়ণ পেন্‌সনের জন্য যথারীতি আবেদন

করেন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অস্থায়ী অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ৬ জানুয়ারি ১৮৮৩ তারিখে এই আবেদনপত্র সুপারিশ করিয়া শিক্ষা-বিভাগের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ১ জানুয়ারি ১৮৮৩ তারিখ হইতে রামনারায়ণের পেন্‌সন মঞ্জুর হইয়াছিল।* সংস্কৃত কলেজে রামনারায়ণের শূন্য পদে নিযুক্ত হন—পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

মৃত্যু

সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর রামনারায়ণের শেষ দিনগুলি কি ভাবে কাটিয়াছিল, তাহার বিবরণ তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রকাশ :—

> কার্য্যময় জীবন কোন কালে স্থির থাকিবার নয়, তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ শিক্ষাদানে অতিবাহিত হইয়াছিল, শেষাংশও সেই কার্য্য ত্যাগ করিতে পারে নাই। তিনি পেন্সন গ্রহণ করিয়াও বাটীতে দেশস্থ ব্রাহ্মণ বালকদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ কার্য্যের সুবিধার জন্য খ্রীঃ ১৮৮৪ অব্দের ৩০শে নবেম্বর রবিবার স্বীয় জন্মগ্রামে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দেশস্থ লোকেরা উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি, চতুষ্পাঠীতে বিদেশীয় ছাত্রগণের অবস্থান ব্যয়ের সাহায্য জন্য মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, দূরদেশ হইতে ছাত্র আসিয়া চতুষ্পাঠীতে অবস্থান করিয়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার জন্মগ্রামের—অভিশপ্ত হরিনাভি গ্রামের—সৌভাগ্য সুখ সুদূরস্থ—এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই তর্করত্ন মহাশয় সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। প্রায় ৬ মাস কাল উদরী রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া ১২৯২ সালের ৭ই মাঘ গত ১৯এ জানুয়ারিতে তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা রাখিয়া ৬৩ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।†

১৯ জানুয়ারি ১৮৮৬ তারিখে রামনারায়ণের মৃত্যু হইলে 'সোমপ্রকাশ' যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

> পণ্ডিত ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন।—আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন গত ৭ই মাঘ মঙ্গলবার মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি প্রায় ৬ মাস কাল উদরীরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন

---

* সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শিক্ষা-বিভাগকে রামনারায়ণের পেনসন-সংক্রান্ত যে-সকল কাগজপত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা হইতে রামনারায়ণের জন্মতারিখ ও সংস্কৃত কলেজে চাকরির ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। পেন্‌সন-সংক্রান্ত কাগজপত্রে রামনারায়ণের আকৃতির এইরূপ বর্ণনা আছে :—"Height—5 feet 6 inches. Marks—Perpendicular wrinkle between the eye-brows leaning on the right side etc."

† "স্বর্গীয় কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন"—'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি,' ১২৯২ সাল, পৃ. ১৫৭।

তর্করত্ন নানাগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। যাঁহারা ইহাঁর সহিত অল্প সময়ের জন্যও আলাপ করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার রসপূর্ণ মিষ্টালাপ কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। বাঙ্গালা নাটকের ইনি এক প্রকার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে হইবে। এইজন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের প্রসিদ্ধ দেশীয় নাটক অভিনয়ের সময়ে ইনি একমাত্র সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রণীত "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নাটক বাঙ্গালা ভাষার প্রথম নাটক এবং এই নাটক হইতে প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত অনেক নাটক আছে। "নবনাটক" "ধর্ম্মবিজয়" "বেণীসংহার" "চক্ষুদান" প্রভৃতি প্রত্যেক নাটকেই তাঁহার নাম এবং মাহাত্ম্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় তিনি কাব্য ও অলঙ্কার বিষয়ে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার ন্যায় সংস্কৃত কবি আর কেহ ছিল না। তাঁহার প্রণীত "আর্য্যাশতক" ও "দক্ষযজ্ঞ" সর্ব্বত্র বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছে। দক্ষযজ্ঞ প্রণয়ন করাতে ইংলণ্ডীয় মহাত্মা ই, বি, কাউয়েল ইহাকে "কবিকেশরী" উপাধি পাঠাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কবিত্বশক্তি এতদূর মধুর এবং গাঢ় ছিল যে তাঁহার নাম না থাকিলে কেহ তাঁহার প্রণীত কাব্যগুলি আধুনিক কবির রচিত বলিয়া অনুমান করিতে পারেন না। তাঁহার সংস্কৃত রচনা এতদূর প্রাঞ্জল এবং অলঙ্কারপূর্ণ, যে তাঁহার আর্য্যাশতক এবং দক্ষযজ্ঞ সহসা কবিচূড়ামণি কালিদাসের রচিত বলিয়া ভ্রম হয়। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে অলঙ্কারের পণ্ডিতরূপে বহুবার অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইনি ছাত্রদিগের নিরতিশয় শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য ইহাঁর এতদূর যত্ন ছিল যে সঞ্চিত অর্থ তিনি ক্রিয়াকলাপে ব্যয় করিতেন। তিনি নিজ বাটীতে একটী হরিসভা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতি রবিবার বক্তৃতা ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠাদি দ্বারা সভ্যদিগকে উপদেশ দান করিতেন। তাঁহারই যত্নে তাঁহার জন্মভূমি হরিনাভিগ্রামে সংস্কৃত শিক্ষার নিমিত্ত একটী চতুষ্পাঠী খোলা হইয়াছিল। নিজে অধ্যাপকতা করিয়া অনেক দিন উক্ত চতুষ্পাঠীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন তাদৃশ সুবক্তাও ছিলেন। যে সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন তাঁহার মধুর বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভাস্থ সকলেই ব্যগ্র হইতেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে রসগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা মুগ্ধ করিতেন। ইহাঁর অভাবে আপামর সাধারণ এবং বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য বৈদিক সমাজ যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা আর বলিবার অপেক্ষা নাই।

পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শৈশবাবস্থায় তাঁহার মাতা পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর দুরবস্থাপন্ন হইয়াও তাঁহার লালনপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় তিনি হরিনাভিস্থ প্রসিদ্ধ মধুসূদন বাচস্পতির নিকট প্রথমতঃ ব্যাকরণ, স্মৃতি ও কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য অধ্যয়ন করেন। পরে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য পূর্ব্বদেশস্থ পোড়া [পুঁড়া ?] নামক গ্রামে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে তিনি তাঁহারই নিকট অবস্থান করিয়া উক্ত কালেজে অনেক দিন পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুর পর তিনিও সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক হয়েন। অধ্যাপকতা বিষয়ে উক্ত কালেজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অবশেষে প্রায় দুই বৎসর হইল পেন্সন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দুই বৎসর

কাল পেন্সনভোগ করিয়া প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে ৩টী পুত্র ও ২টী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।—'সোমপ্রকাশ,' ১৩ মাঘ ১২৯২।*

রামনারায়ণের রচনাবলী

রামনারায়ণের রচনাবলীর মধ্যে নাটক ও প্রহসনের সংখ্যাই বেশী। নাটক-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'নাটুকে রামনারায়ণ' বলিত। সেকালে তাঁহার নাটক ও প্রহসনগুলি সখের নাট্যশালায় ও সাধারণ রঙ্গালয়ে সমারোহের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। এই সকল অভিনয়ের বিবরণ আমার 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' পাওয়া যাইবে।

১৮৫৪ সনে প্রকাশিত রামনারায়ণের প্রথম নাটক 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'কে অনেকে বাংলার আদি নাটক বলিয়াছেন। কিন্তু 'কুলীন কুলসর্ব্বস্বে'র পূর্ব্বেও আরও কয়েকখানি বাংলা নাটক রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; দৃষ্টান্তস্বরূপ ১২৫৮ সালে (১৮৫২ সনে?) প্রকাশিত যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাস' ও ১৮৫২ সনে তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন,' এবং ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু নাটকে'র নাম করা যাইতে পারে। তবে সামাজিক নাটকের মধ্যে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' সর্ব্বপ্রথম বলিয়া মনে হয়।

নাটক-রচনায় নৈপুণ্যের জন্য এবং বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম বিধিবদ্ধ ভাবে ("systematic form"-এ) নাটক রচনার জন্য দি বেঙ্গল ফিল্‌হার্ম্মোনিক অ্যাকাডেমি ৯ মার্চ ১৮৮২ তারিখের অধিবেশনে রামনারায়ণকে 'কাব্যোপাধ্যায়' উপাধি ও তাহার চিহ্নস্বরূপ 'হরকুমার ঠাকুর কনক কেয়ূর' প্রদান করিয়াছিলেন। এই অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং ডিরেক্টর ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। রামনারায়ণকে প্রদত্ত মানপত্রখানি (ডিপ্লোমা অব অনার) হরিনাভি রামনারায়ণ লাইব্রেরির একটি কক্ষে টাঙানো আছে।†

রামনারায়ণের সংস্কৃত রচনাও প্রসাদগুণবিশিষ্ট ছিল। 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার সংস্কৃত রচনা এতদূর প্রাঞ্জল এবং অলঙ্কারপূর্ণ, যে তাঁহার আর্য্যাশতক এবং দক্ষযজ্ঞ সহসা কবিচূড়ামণি কালিদাসের রচিত বলিয়া ভ্রম হয়।" 'দক্ষযজ্ঞ' পাঠ করিয়া সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত ই. বি. কাউয়েল বিলাত হইতে তাঁহাকে 'কবিকেশরী' উপাধি দিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

---

* শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী আমার জন্য 'সোমপ্রকাশ' হইতে এই অংশ নকল করিয়া পাঠাইয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

† শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই মানপত্রের প্রতিলিপি ১৩২৩ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' (পৃ. ৭১১-১২) প্রকাশ করিয়াছেন।

রামনারায়ণের রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) পতিব্রতোপাখ্যান।...কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে শিক্ষিত সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য রচিত।...১২৫৯ শাল ১১ মাঘ। পৃ. ৯৪।

এই পুস্তক রচনায় একটি ইতিহাস আছে। রংপুর কুণ্ডী পরগণার জমীদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী 'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' পত্রে একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে' প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

বিজ্ঞাপন।

৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক।

এই বিজ্ঞপ্তি পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি 'পতিব্রতোপাখ্যান' ইত্যভিধেয় এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে সঙ্কল্পিত ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক। স্ত্রীজাতি স্বপতির মতাবলম্বিনী হইয়া, দেহযাত্রা নির্ব্বাহকরণে, দম্পতী প্রীতিবর্দ্ধন হওত: সৃষ্টিপ্রবাহের প্রতি প্রতিবন্ধকতা ছেদনপূর্ব্বক কি নিগূঢ় ইষ্টফলোৎপত্তি হইতে পারে? তদন্যথাতেই বা কি অনিষ্টতা অথবা শান্তির ব্যাঘাত জন্মে? বিবিধ প্রমাণ ও বিবিধ সদ্‌যুক্তির দ্বারা প্রবন্ধ মধ্যে ইহাই প্রতিপন্ন করা প্রশ্নকর্ত্তার মূলাভিপ্রেত। রচক মহাশয়েরা আগত আষাঢ় মাসের শেষ হইতে না হইতে স্ব স্ব রচিত প্রবন্ধ রীতিমত প্রেরণ করিবেন।

রঙ্গপুর

বঙ্গাব্দা ১২৫৮ সাল তারিখ ৬ কার্ত্তিক। কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী।

কুণ্ডী পং জমীদার।

'পতিব্রতোপাখ্যান' পুস্তকের "ভূমিকা"য় প্রকাশ :—

অনেকে পতিব্রতোপাখ্যান লিখিয়া বাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন তাঁহার সভা পণ্ডিত মহাশয়েরা সমস্ত পরীক্ষা করিয়া সংস্কৃত কালেজীয় সুপরীক্ষিত সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যের লিখিত এই গ্রন্থ মনোনীত করেন। পরে বাবুর অনুজ্ঞায় আদর্শ পুস্তক ভাস্কর যন্ত্রাগারে আসিয়াছিল, শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরি মহাশয় ন্যূনাধিক ১৫০ দেড় শত টাকা ব্যয়ে ইহা মুদ্রাঙ্কিত করাইলেন।

(২) প্রকাশ্য বক্তৃতা অর্থাৎ কলিকাতাস্থ হিন্দু মেট্রপোলিটন নামক বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগের উপদেশার্থে তত্রস্থ প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত দ্বারা বিদ্যা বিষয়ক বক্তৃতা। ৭ কার্ত্তিক, সন ১২৬০ সাল। পৃ. ২০।

পুস্তিকাখানি দুষ্প্রাপ্য। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ইহার এক খণ্ড আছে। আমি তাহার ফোটো প্রতিলিপি আনাইয়াছি। এই পুস্তিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্ব্বক ইংরাজী শিখিবে বাঙ্গলাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাঙ্গলার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না; বাঙ্গলা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। দেখ বর্ত্তমান কালে যে সকল প্রদেশ দৃষ্টি ও শ্রুতি গোচর হইতেছে

সে সমস্ত দেশীয় লোকেরা সকলি স্ব স্ব দেশীয় ভাষাকে উত্তম ভাষা জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকেন এবং সাধারণের এই এক প্রসিদ্ধ প্রথা আছে যে আপন২ দেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না হইলে কেহই অন্য ভাষা প্রতি ধাবমান হয়েন না অতএব তোমাদিগের দেশভাষার প্রতি বিমুখ হওয়া কদাচ উচিত নহে।... ... ...

এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় বিবিধ প্রকার পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, দণ্ডনীতি, ও চিকিৎসা বিষয়ক উত্তমোত্তম প্রবন্ধ সকল দৃষ্ট হইতেছে যদি তোমরা স্বদেশীয় ভাষায় স্বরূপ যোগ্য হও তাহা হইলে ঐ সমস্ত উৎকৃষ্ট২ গ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিতে পারিবে তাহাতে দেশীয় ব্যক্তিদিগের যে কত উপকার হইবে তাহা কথনাতীত। দেশীয় লোকেরাও তাদৃশ অসামান্য উপকারে উপকৃত হইয়া ঐ অনুবাদকর্ত্তাকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া চিরকাল স্ব স্ব স্মৃতিপথে আরূঢ় রাখিবেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যোপার্জ্জন সার্থক হইবে।

বর্ত্তমান কালে এই বিষয়ের দৃষ্টান্তপথে পতাকা স্বরূপ কতিপয় সুবিজ্ঞ মহোদয়েরা সাতিশয় যত্নপূর্ব্বক নানা সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন, এক্ষণেও করিতেছেন, তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা দেশীয়দিগের কত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা একবার বিবেচনা করিলেই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারা যায়ঃ ফলতঃ ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ করা আবশ্যক বোধ করিয়াও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ রাখা নিতান্ত উচিত।

এই সুকুমার দেশীয় ভাষা ইহা শিক্ষা করিতে তোমাদিগকে নিতান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে না, যেহেতু ইহা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা। মাতৃ জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেই ঐ ভাষা কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে, এবং স্তন্যপান সমকালেও অনেক কণ্ঠস্থ হয়, পরে মাতা পিতা প্রভৃতি স্বপর সাধারণ সকলেরি নিকট সর্ব্বদা তাহা শ্রবণ করাতে বাল্যাবস্থাতেই প্রায় অর্দ্ধেক অভ্যস্ত হইয়া থাকে, অনন্তর কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যথা নিয়মে শিক্ষা করিলেই সম্পূর্ণরূপে তাহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মে, ফলতঃ অনায়াসলভ্য এতাদৃশ উত্তম বস্তুতে কাহার্ না অভিলাষ হয়? যদি পথিমধ্যে এক অমূল্য রত্ন পতিত হইয়া থাকে এবং তাহা গ্রহণ করিতে কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তাহা হইতে চক্ষুষ্মান্ পথিক কি তাহা পরিহার করে? কদাচ করে না; কিন্তু যদি পথিক নয়ন বিহীন হয় তবেই সেই বস্তু সুতরাং পরিহৃত হয় তাহার ন্যায় যদি তোমাদিগের বিবেক নয়ন থাকে তবে কদাচ এই অযত্নলভ্য স্বদেশীয় বিদ্যারত্নকে অশ্রদ্ধ করো না।

বর্ত্তমানাবস্থায় যে সমস্ত গ্রন্থ প্রচলিত আছে যদি ঐ সকল গ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হয় তাহা হইলে এতদ্দেশের কত মঙ্গলোন্নিতি হইবে তাহা পূর্ব্বে কহিয়াছি, অতএব যাঁহারা দেশানুরাগি তাঁহারা স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি বিষয়ে একান্ত সচেষ্ট থাকেন। ইতিপোর্ব্বীয় যবন জাতীয় রাজারা আপনাদিগের ভাষার প্রতি নিতান্ত দৃঢ়ভক্তি রাখিয়াছিলেন ইহাঁদিগের মধ্যে কাহার২ নিজ ভাষার প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ ছিল যে তাঁহারা তদ্ভাষার সম্যক্ প্রচার করিবার নিমিত্ত অন্যান্য ভাষার সমূলোৎপাটনেও চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরা যত দূর পর্য্যন্ত ক্ষমতা স্বদেশীয় ভাষা প্রতি অনুরাগ রাখিয়া ইহার দৃষ্টান্ত পথে দণ্ডায়মান আছেন্, কিন্তু এতদ্দেশের দৌর্ভাগ্য প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় লোকেরা প্রায় অনেকেই দেশীয় ভাষার প্রতি দ্বেষ করেন্, বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা বিদ্যা শিক্ষা ছাত্র দিগের অভিলাষানুসারেই চলিয়া থাকে, অর্থাৎ যে দিবস ইংরাজী শিক্ষা করিয়া অবসর সময় থাকে ও আলস্য দোষ উপস্থিত না হয় সেই দিনই একবার দেশীয় ভাষার পুস্তক অনাস্থা

বুদ্ধিতে গৃহীত হয়, নতুবা হয় না, ইহাতে যে কেবল ঐ সকল ছাত্র গণেরই দোষ এমত নহে, তাহাদিগের মাতা পিতাও তদ্বিষয়ে দোষাক্রান্ত হইতেছেন, যেহেতু ইহাঁরা স্বস্ব সন্তান দিগের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা হইতেছে কি না ইহা একবারও দেখেন না, বালকেরা ইংরাজী পাঠাভ্যাস করিলেই প্রশংসা করেন, এবং যদি ঐ বালক ইংরাজী কোন পুস্তক ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকটে দশ বা দ্বাদশ মুদ্রা প্রার্থনা করে তবে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা দেন কিন্তু বাঙ্গলা পুস্তক ক্রয় করিতে অর্দ্ধমুদ্রা যাচ্ঞা করিলেও কহেন অর্থের বড় অনটন, কিছুদিন যাউক, এক্ষণ হইবে না, ইত্যাদি বিবিধ বাগাড়ম্বর করিয়া বালক দিগকে দেশ ভাষা শিখিতে অনুৎসাহ দেন, এই সমস্ত ব্যবহার কি দেশ ভাষা নির্ম্মূল করার কারণ নহে ? হায় কি আশ্চর্য্য দেশ ভাষার প্রতি ইহাঁদিগের এত অরুচি কেন ? কেহবা আপনি দেশানুরাগী ইহা জানাইবার নিমিত্ত মুখে মাত্র কহিয়া থাকেন যে 'আমাদিগের দেশ ভাষার উন্নতি করা নিতান্ত আবশ্যক' কিন্তু তাহা ইহাঁদিগের হৃদয়ঙ্গম নহে ; যদি এমত অভিলষিত হইত তাহা হইলে কি তাঁহারা দেশীয় সভায় বিদেশীয় ভাষায় বক্তৃতা করিতেন, কি দেশীয় ভাষায় আলাপ করিতে হইলে ইংরাজী ভাষা মিশ্রিত করিতেন ? কখনই করিতেন না ।

বঙ্গ ভাষার আলাপ মধ্যে ইংরাজী দুই এক শব্দ প্রয়োগ করা আর বাঙ্গালি পরিচ্ছদ অর্থাৎ ধুতি চাদর পরিধান করিয়া একটি উত্তম ইংরাজী টুপি ধারণ করা তুল্য হাস্যাস্পদ, সত্য মিথ্যা তোমরা বিবেচনা কর। যাহা হউক দেশীয় ভাষার আলাপ মধ্যে অন্য ভাষা সংশ্লিষ্ট করার কারণ দেশ ভাষার অনভিজ্ঞতা ব্যতীত আর কি বোধ হয় ? বর্ত্তমান কালে ইংরাজ রাজপুরুষ গণের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গলা ভাষা বিলক্ষণ জানেন্ কিন্তু ইহাঁরা কি ইংরাজী কহিতে২ দুই এক বাঙ্গলা ভাষা কহিয়া থাকেন ? যদি বল এতদ্দেশীয়েরা যে বাঙ্গলা কথার মধ্যে ইংরাজীর দুই এক শব্দ কহেন তাহাতে ইহাঁদিগের ইংরাজী ভাষার অনুরাগই প্রকাশ পায়, কিন্তু ইহা আমাদিগের কদাচ অনুভবে আইসে না। ইংরাজ মহোদয় দিগের কি বাঙ্গলা ভাষায় অনুরাগ নাই, এমত নহে, অনেকানেক ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরা এতদ্দেশীয় ভাষার প্রশংসা করিয়া থাকেন, তবে এই বরং কহা যায় যে এতদ্দেশীয়দিগের দেশ ভাষায় অনুরাগ নাই, ইহাঁরা দেশভাষা ক্রমশঃ নির্ম্মূলিত করিবার মানসেই তাদৃশ ব্যবহার করেন কিন্তু ইহা নিতান্ত অনুচিত কর্ম্ম ।

ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন২ ব্যক্তি কহেন যদি কোন লোক জ্ঞানোপার্জ্জনে অভিলাষী হয়, তবে কেবল ইংরাজী শিক্ষা করিলেই অভীষ্টসিদ্ধ করিতে পারিবে, স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষার অপেক্ষা কি, এতৎপ্রদেশীয় সকল লোকের যদি জ্ঞানোপার্জ্জন কর্ত্তব্য হয় সকলেই ইংরাজী শিক্ষা করুন, কিন্তু আমি ইহাঁদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আত্মভাষায় বিদ্যা শিক্ষা ও পরভাষায় বিদ্যা শিক্ষা ইহার মধ্যে সুলভ কি, বোধ হয় ইহা বিবেচনা করিলে তাঁহারা আর এমত কথা কহিবেন না। অতএব ইহাঁরা স্বদেশের প্রতি প্রীতি রাখিয়া যাহাতে আত্মভাষার উচ্ছেদ না হয় এমত চেষ্টা করুন।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা জন্মভূমিকে জননীর তুল্য বলিয়াছেন, সুতরাং সেই জন্মভূমিকে দুরবস্থা হইলে মোচন না করা আর ব্যাধি পীড়িতা জননীকে ঔষধ প্রদান ও শুশ্রূষা বিধানাদি দ্বারা সুস্থা না করা তুল্য কথা ।

যে স্থানে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়া শৈশবলীলায় লালিত হইয়াছি, যে স্থানে যৌবন যাপন কালে ধন, জন, বিদ্যা, বুদ্ধি, সুনীতি, সচ্চরিত্রতা, যশঃ, সম্পত্তি প্রভৃতি সকল উপার্জ্জন করিয়া সুখী

হইতেছি এবং যে স্থানের স্মরণে মাতা, পিতা, দয়িতা, পরিণেতা, পুত্র, মিত্রাদির নির্ম্মল বদন কমল সহসাই স্মৃতি পথে পতিত হয় এতাদৃশ অস্মাদৃশ প্রেমাস্পদ জন্মভূমির প্রতি অশ্রদ্ধা করা কি আমাদিগের উচিত কর্ম্ম ? যে ব্যক্তি দেশান্তরে অবস্থান করে সেই ব্যক্তিই জন্মভূমির মর্ম্মস্নেহ অবগত থাকে, জন্মভূমি তাহারি আনন্দভূমি বোধ হয়, অতএব এই আনন্দভূমির প্রতি যাহার স্নেহ নাই সে কি মনুষ্য ?

দেশীয় ভাষায় যাঁহাদিগের নিতান্ত দ্বেষ তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যায় আপনাদিগের গাঢ়তর ব্যুৎপত্তি জ্ঞাপন করাইবার নিমিত্ত স্বদেশীয় স্বজনগণের সহিতও ইংরাজী ভাষায় আলাপ করেন ; কিন্তু নিজ২ বাটীর পরিজনের সহিত আলাপ করিতে হইলে অবশ্যই ইহাঁদিগের দেশীয় ভাষা অবলম্বিতা হয় তাহার সন্দেহ নাই ; সুতরাং যে ভাষা ব্যতীত সাংসারিক ব্যাপার সমাধা হয় না, তৎপ্রতি অনাস্থা বোধ বৈধ নহে, স্বদেশীয় ভাষা ব্যতীত মনোগত অভিপ্রায় প্রায় প্রকাশ পায় না। প্রসূতির স্তনক্ষীর যে প্রকার শরীরের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা সম্পাদক, স্বদেশীয় ভাষাও তদ্রূপ মানসিক শক্তিদায়ক সন্দেহ কি ? ভাল স্বদেশীয় ভাষা প্রতি অশ্রদ্ধাকারীকে আরো জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা সেক্‌সপীয়্যার প্রভৃতি গ্রন্থ যখন পাঠ করেন তখন কি স্বদেশীয় ভাষায় ভাব উদয় করেন না ? অগ্রে দেশ ভাষায় ভাব গ্রহণ না করিলে কখনই ভিন্নভাষায় ভাবোদয় হয় না।

অতএব হে ছাত্রগণ তোমরা বাঙ্গলা সাধুভাষা প্রতি কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ কর, ঐ ভাষা এতদ্দেশের দেশীয় ভাষা, যত দিন পর্য্যন্ত এতৎপ্রদেশে উহার শ্রীবৃদ্ধি না হইবে, তত দিন নানা ইংরাজী গ্রন্থ প্রচার হউক, উত্তমোত্তম শিক্ষক থাকুন, কিছুতেই এতদ্দেশীয় সাধারণের জ্ঞানরসাস্বাদন হইবে না।

(৩) কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক। শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্ম প্রণীত। সম্বৎ ১৯১১। পৃ. ১২৭।

১৮৫৪ সনের শেষভাগে এই নাটক প্রকাশিত হয়। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (৩৫ খণ্ড) ইহার সমালোচনা কালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন :—

> …এইক্ষণে…সহৃদয় ব্যক্তিগণ রঙ্গভূমিতে কবিতাসুধাকরের উদয় করণার্থে যত্নবান্ হইয়াছেন। যে গ্রন্থের প্রসঙ্গে এই প্রস্তাব আরব্ধ হইয়াছে তাহা এই নির্ম্মল চন্দ্রোদয়ের আদিকিরণ বলিলে বলা যায়।
>
> পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় কয়েক খানি নাটক প্রকটিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা যথার্থ নাটক নহে। তাহাতে অনেক পদ্যাদি আছে, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ সমীচীন ও সুসম্পন্ন এবং সুপাঠ্য বটে ; কিন্তু সাহিত্যকারেরা যাদৃশ গুণপ্রযুক্ত নাটককে "দৃশ্য কাব্য" বলিয়া বর্ণন করেন, তাহার অত্যল্পমাত্রই তাহাতে বর্ত্তমান দেখা যায়।
>
> প্রস্তাবিত নাটক খানিতে রূপকের অনেক ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়াছে ; তাহার আখ্যায়িকা একানুগামিনী বটে, ইহার অভিপ্রায় উত্তম, ও ভাবও পরিশুদ্ধ। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত সাহিত্যালঙ্কার-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং কাব্যরচনায় তৎপর। তিনি সমীচীন-যত্নে এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন ; এবং সহৃদয় পাঠকগণ যে কেহ ইহা পাঠ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যে তাঁহার প্রযত্ন ব্যর্থ হয় নাই। (পৃ. ২৫৫-৫৬)

'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' সম্বন্ধে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, "বোধ হয় ইংরাজি খুব ভাল ভাল comedy অপেক্ষা কোনও অংশে ইহা মন্দ নহে।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৯৫)

'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'-রচনার ইতিহাস এইরূপ। রংপুর কুণ্ডী-পরগণার বিদ্যোৎসাহী জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী 'সম্বাদ ভাস্কর'-আদি পত্রে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। ৮ নবেম্বর ১৮৫৩ তারিখের 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' পত্রেও বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছিল; বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

বিজ্ঞাপন।

৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি সুললিত গৌড়ীয় ভাষায় ছয় মাস মধ্যে "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নামক একখানি মনোহর নাটক রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে সঙ্কল্পিত ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।

রঙ্গপুর পং কুণ্ডী শ্রীকালীচন্দ্র রায় চৌধুরী
কুণ্ডী পং জমীদার।

এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া রামনারায়ণ 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' রচনা করেন এবং ১০ মার্চ ১৮৫৪ তারিখে নিম্নোদ্ধৃত পত্রের সহিত রচনার পাণ্ডুলিপি রংপুরে পাঠাইয়া দেন :—

বিবিধ বিদ্যোৎসাহী গুণগ্রাহী মান্যবর
শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ
মহাশয় সর্ব্বোপকারকেষু—

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদনমিদং

আমি ভাস্কর পত্রস্থ মহাশয়ের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহার কারণ আপনি অদ্বিতীয় বিদ্যোৎসাহী ও আপনার প্রস্তাবিত বিষয় অতি উপাদেয়। কিন্তু রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই সাতিশয় শিরোবেদনা প্রভৃতি বিবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কিছুদিন ক্ষান্ত হইতে হইয়াছিল তাহাতে পুস্তক প্রস্তুতপূর্ব্বক প্রেরণ করিতে শীঘ্র পারি নাই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এক্ষণে দৈবানুগ্রহে শারীরিক সুস্থ হওয়ায় অত্যন্ত যত্ন ও অজস্র পরিশ্রম সহকারে উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া আপনকার নিকটে পাঠাইলাম পুরস্কার প্রদানে পরিশ্রম সার্থক করিবেন।…২৮ ফাল্গুনস্য।

শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মণঃ।
কলিকাতা হিন্দু মিট্রোপলিটান বিদ্যালয়স্থ
প্রধানাধ্যাপকস্য।

বলা বাহুল্য, রামনারায়ণ বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ৫০৲ টাকা যথাসময়ে পাইয়াছিলেন।

(৪) বেণীসংহার নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক গৌড়ীয় চলিত ভাষায় অনুবাদিত। সংবৎ ১৯১৩। পৃ. ৯৬।

'বেণীসংহার নাটক' ১৮৫৬ সনের মধ্যভাগে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের "বিজ্ঞাপন"-এর তারিখ "২৮ জ্যৈষ্ঠ, সংবৎ ১৯১৩"। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (৪১ খণ্ড, পৃ. ১০৭) সমালোচনাকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন :—

> কবি না হইলে কাব্যের অনুবাদ করা অতিশয় দুরূহ। কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটককারের সে গুণের অভাব নাই; তিনি সর্ব্বত্র কাব্যরস রক্ষা করিয়া অভিনয়োপযুক্ত চলিত ভাষায় পরিপাটী-রূপে বেণীসংহার অনুবাদিত করিয়াছেন।…

(৫) **রত্নাবলী নাটক।** শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক চলিত ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা সম্বৎ ১৯১৪। পৃ. ৯২।

'রত্নাবলী' ১৮৫৮ সনের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার "ভূমিকা"র তারিখ "২৮ ফাল্গুন, সম্বৎ ১৯১৪"।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (৪৯ খণ্ড, পৃ. ১৮) সমালোচনাকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন :—

> …অবিশ্রান্ত পীযূষপানের ন্যায় গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হইয়াছি।…তাঁহাকর্তৃক রত্নাবলীর সৌন্দর্য্য যাদৃশ পরিপাটীরূপে বঙ্গভাষায় প্রকটিত হইয়াছে; বোধ হয় অতি অল্প লোকে তাদৃশরূপে সংস্কৃতের চাতুর্য্য বাঙ্গালীতে রক্ষা করিতে পারিতেন।

(৬) **অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক।** শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক চলিত গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত। সম্বৎ ১৯১৭।

ইহা কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের অনুবাদ, "অধুনাতন নিয়মানুসারে নাটক অভিনয়োপযোগি করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে রসভাবাদি পরিবর্ত্তিত পরিত্যক্ত ও সন্নিবেশিত"। পুস্তকের "মঙ্গলাচরণ"-এর তারিখ "১০ আশ্বিন ১২৬৭"।

(৭) **যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।** প্রহসন। [১৮৬৫ ?]

(৮) **বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক।** শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। শকাব্দাঃ ১৭৮৮। পৃ. ১৫৮।

'নব-নাটক' ১৮৬৬ সনের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার রচনার একটি ইতিহাস আছে।

প্রধানতঃ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি অক্ষয় চৌধুরী প্রভৃতির চেষ্টায় জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে একটি নাট্যশালা গঠিত হয়। ইহার নাম জোড়াসাঁকো নাট্যশালা। অভিনয়োপযোগী অথচ লোকশিক্ষার অনুকূল উৎকৃষ্ট নাটকের অভাব অনুভব করিয়া, জোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষ ১৮৬৫ সনের ২২ জুন তারিখে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' পত্রে প্রথমে বহুবিবাহ-বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই সংবাদপত্র হইতে বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করিয়া, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর এই নাটক-রচনার ভার অর্পিত হয়। ইহার অল্প দিন পরেই রামনারায়ণ 'নব-নাটক' রচনা করিয়া, জোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষের

নিকট হইতে দুই শত টাকা পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে ইহাই 'নব-নাটক'-রচনার ইতিহাস।*

(৯) **মালতীমাধব নাটক**। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। বাং ১২৭৪। ইং ১৮৬৭। পৃ. ১৭৯।

পুস্তকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ, "নাটকের সঙ্গীত কয়েকটী শ্রীযুত বাবু বনয়ারীলাল রায় মহাশয় রচনা করিয়া দিয়াছেন"।

(১০) **উভয় সঙ্কট**। প্রহসন। বন্ধুদিগের বিতরণার্থে। ১২৭৬ সাল। পৃ. ২৭

(১১) **চক্ষুদান**। প্রহসন। বন্ধুদিগের বিতরণার্থে। সন ১২৭৬ সাল। পৃ. ২৬।

(১২) **মহাবিদ্যারাধন**।

ইহা দশমহাবিদ্যার স্তোত্র ও গীতিকা এবং ১২৭৮ সালে রচিত বলিয়া রামনারায়ণের আত্মকথায় প্রকাশ, কিন্তু তারিখটি ঠিকমত মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। ১২৭৮ সালের পূর্ব্বে—সম্ভবতঃ ১৮৭০ সনে ইহা রচিত। এই পুস্তিকাখানি আমি এখনও কোথাও দেখি নাই।

(১৩) **রুক্মিণীহরণ নাটক**। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন। সন ১২৭৮ সাল। পৃ. ১৯।
ইহার "উপহার"-পৃষ্ঠার তারিখ—"কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ, ১২৭৮। ভাদ্র"।

(১৪) **আর্য্যাশতকম্**। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্নেন বিরচিতম্। ইং ১৮৭২। ফেব্রুয়ারি। পৃ. ১০।

পুস্তকখানি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত। রচনার নিদর্শনস্বরূপ ইহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

এষা মুধৈব বার্ত্তা ন সুধা বসুধাতলে সুলভ্যেতি।
নবরসরসিকজনাস্যোদ্ভূতভারতী যদত্রাস্তে ॥৭
লেখনি খনিরসি লোকে কবিকরকলিতা সুবর্ণরত্নানাম্।
সা ত্বং পরার্থসিদ্ধেঃ কর্ত্রী চাধোমুখীভূয় ॥৮
কোমলমিহ নবনীতং সমধিককোমলতরং সতাং চেতঃ।
আদ্যং স্বস্মিংস্তাপাদ্ দ্রবতি তু পরতাপতোঽপ্যন্যম্ ॥৯
ধরণী ধরতি সমস্তং ধরণিমনন্তঃ শিরোভিরপি ধত্তে।
যো হি বহতি পরভারং তস্য তু পতনং ন সম্ভাব্যম্ ॥১০
কস্তাং শিরসি নিদধ্যাৎ কো বা নিত্যং তবাদরং ধত্তে।
ছত্র স্বয়মপি তপ্তং পরতাপং চেন্ন বারয়সি ॥১১

(১৫) **স্বপ্নধন নাটক**। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। সম্বৎ ১৯৩০। পৃ. ৮৩
নাটকখানি সিমুলিয়া বঙ্গ রঙ্গভূমি (বেঙ্গল থিয়েটার) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রামনারায়ণ

* যাঁহারা জোড়াসাঁকো নাট্যশালা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে আমার 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ইহার স্বত্বাধিকার বঙ্গ রঙ্গভূমির কর্তৃপক্ষকে বিক্রয় করেন। 'স্বপ্নধন নাটক' বঙ্গ রঙ্গভূমিতে অভিনীত হয়। পুস্তকের বিজ্ঞাপনের তারিখ "সিমুলিয়া কার্ত্তিক,—১২৮০"।

(১৬) ধর্ম্ম-বিজয় নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। ১২৮২ সাল।

'ধর্ম্ম-বিজয় নাটক' হরিশ্চন্দ্রের আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। ১০ই ভাদ্র ১২৮২ তারিখে রামনারায়ণ এই নাটকখানি "সভ্যগণের আকিঞ্চনে" হরিনাভি বঙ্গ নাট্যসমাজের সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যকে বিক্রয় করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই নাটকখানি প্রকাশ করেন; তাঁহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "শেষ ভাগে যে সকল সংগীত সন্নিবেশিত হইল, তজ্জন্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ সান্যাল মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।...হরিনাভি ২০এ ভাদ্র ১২৮২।"

(১৭) কংসবধ নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন-প্রণীত ও প্রকাশিত। সন ১২৮২ সাল [=ইং ১৮৭৫ ?]। পৃ. ৭২।

(১৮) দক্ষযজ্ঞম্ (পূর্ব্বার্দ্ধম্), সর্গ ১-৫। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্নেন বিরচিতম্। শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নেন সংশোধিতম্। ১৮৮১। পৃ. ৪৩।

(১৯) দক্ষযজ্ঞম্ (উত্তরার্দ্ধম্), সর্গ ৬-১০। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্নেন বিরচিতম্। শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নেন সংশোধিতম্। ১৮৮২। পৃ. ৪১।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত এই সংস্কৃত খণ্ডকাব্য হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল:—

হরো ব্রহ্মচারী কলঙ্কাপহারী
শশাঙ্কার্দ্ধধারী শ্মশানপ্রচারী।
বিপৎপাতবারী সদন্তর্ব্বিহারী
ভবত্রাণকারী স্মৃতো মেঽস্তু নিত্যম্ ॥৩৩
ভবানীশমীশং সুরেশং গিরীশং
জনেশং মহেশং শিবং ব্যোমকেশং।
মহাভীমবেশং সুবেশৈকবাসং
সতাং সুপ্রকাশং স্মরামি স্মরামি ॥৩৪
ত্বয়া যদ্‌বিধেয়ং তথা তদ্‌বিধেয়ং
বিধের্নাস্তি শক্তিস্তদন্তদ্‌বিধাতুম্।
অতঃ প্রার্থয়েঽহং ভবাম্ভোধিমগ্নঃ
ত্বয়া রক্ষণীয়ঃ শরণ্যাগ্রগণ্যঃ ॥৩৫
নমো বিশ্বকর্ত্রে নমো বিশ্বধর্ত্রে
নমো বিশ্বভর্ত্রে নমো বিশ্বহর্ত্রে।
নমো বিশ্ববীজস্বরূপায় নিত্যং
ত্রিনেত্রায় তুভ্যং নমঃ শঙ্করায় ॥৩৬
ত্বদন্যন্ন চাস্তে ভবে বস্তু কিঞ্চিৎ
ত্বমেবাদিমশ্চান্তিমো মধ্যমশ্চ।
বিধাতুং স্তবং তে বিধাতুর্ন শক্তিঃ
কথং বক্তুমীশো ভবেয়ং ভবেশ ॥৩৭

—পূর্ব্বার্দ্ধ, ৪র্থ সর্গ, পৃ. ২৮-২৯

ইহা ছাড়া রামনারায়ণ আরও দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া সমসাময়িক কোন কোন ব্যক্তি উল্লেখ করিয়াছেন। পুস্তক দুইখানি অন্যের নামে প্রচারিত, কিন্তু এগুলির রচনায় যে তাঁহার যথেষ্ট হাত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।—

(ক) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কালিদাস-প্রণীত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের মর্ম্মানুবাদ করেন। নাটকখানি পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠীর

আদি বাড়ীতে একাধিক বার অভিনীত হইয়াছিল। এই অভিনয়ে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

রামনারায়ণ পণ্ডিত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে…বলিলেন—'আমি আপনাকে ঠিক 'রত্নাবলী'র মত একখানা নাটক লিখিয়া দিব।' তাঁহার রচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক আমরা প্রথম অভিনয় করিয়াছিলাম। ছোটরাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই একবার মাত্র stageএ অভিনয় করিয়াছিলেন; বড় রাজার অনুরোধে তিনি 'কঞ্চুকী' সাজিয়াছিলেন…। ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ১৫৫)

মহেন্দ্রনাথের উক্তি একেবারে অমূলক বলিয়া মনে হয় না। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের প্রথম সংস্করণে (১২৬৬ সাল) অনুবাদকের নাম ছিল না; দ্বিতীয় সংস্করণে (১২৮৪ সাল) শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম থাকিলেও, এই নাটক-রচনায় রামনারায়ণের যথেষ্ট হাত ছিল। ৭ জুলাই ১৮৬০ তারিখে এই নাটকের দ্বিতীয় বার অভিনয় হয়।* এই অভিনয়-প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' (১৬ জুলাই ১৮৬০) লিখিয়াছিলেন :—

আমরা পূর্ব্বে [২ জুলাই ১৮৬০] মহাকবি কালিদাস প্রণীত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের বাঙ্গলানুবাদ সমাচার পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। গ্রন্থ মধ্যে অনুবাদকের নাম ছিল না, সুতরাং তাহা পাঠকগণকে জানাইতে পারি নাই। এক্ষণে জানিতে পারিলাম, পাথুরিয়া ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু সৌরেন্দ্র মোহন ঠাকুরের যত্নে অনুবাদ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পশ্চাৎ শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত বেশ ভূষা পরাইয়া দেন। সম্প্রতি উহার অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে।…†

(খ) পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, 'পৌরাণিক ইতিবৃত্ত' (১২৭৭ সাল) পুস্তকখানি রামনারায়ণের রচনা। দত্ত-মহাশয় রামনারায়ণের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার কথাও অমূলক না হইতে পারে; কারণ, পুস্তকে গ্রন্থকার-হিসাবে "ডব্ল্যু অব্রাএন স্মিথ" নাম থাকিলেও ইহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :—

…ইহাও বক্তব্য, পুস্তক প্রণয়নে শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্করত্নেরও সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

---

* "বিগত ২৫এ আষাঢ় [৭ জুলাই] শনিবার রজনীযোগে এই নাটকের দ্বিতীয় বার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের বিশেষ প্রযত্নে অভিনয় ক্রিয়া সুসম্পাদিত হইয়াছে।" ('সোমপ্রকাশ,' ২৩ জুলাই ১৮৬০)

† 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক ১৮৬০ সনের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়। ১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইহার শেষ দুই অঙ্কের পাণ্ডুলিপি মাইকেলকে পাঠাইয়া তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ('মধুস্মৃতি,' পৃ. ১২৩); সুতরাং ইহার পরে যে নাটকখানি প্রকাশিত ও অভিনীত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন, ১৮৫৯ সনে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। আমার মনে হয়, ১৮৬০ সনের প্রথম ভাগে ইহা প্রথম অভিনীত হয়। কিশোরীচাঁদ ঘটনার বহু পরে—১৮৭৩ সনে এই অভিনয়ের কথা বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ক্ষেত্রে সন-তারিখের এক-আধটু গোল হওয়া বিচিত্র নয়।

কেহ কেহ লিখিয়াছেন, রামনারায়ণ 'ধনুর্ভঙ্গ' নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা মুদ্রিত হয় নাই।*

রামনারায়ণের আত্মকথা

১৮৭২ সনে রামনারায়ণ সংক্ষেপে আত্মকথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই আত্মকথা শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৩২৩ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তারিখগুলি সর্ব্বত্র নির্ভুলভাবে মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। রামনারায়ণের আত্মকথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সন ১২২৯ সালে আমার জন্ম। আমার পিতৃঠাকুরের নাম ৺রামধন শিরোমণি মহাশয়। ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি হরিনাভি নামক গ্রামে আমার বাস। আমি বাল্যাবস্থাতে দেশে ও বিদেশে চৌবাড়িতে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ এবং ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ড প্রায় অধ্যয়ন করি। পরিশেষে ইং ১৮৪৩ অর্থাৎ ১২৫০ সালে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠার্থ প্রবিষ্ট হই। ইং ১৮৫৩ বাঙ্গলা ১২৬০ সালে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ হিন্দু মিট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পাণ্ডিত্যপদে নিযুক্ত হই। দুই বৎসর তথায় কর্ম্ম করিয়া ১৮৫৫ সালের ১৬ই জুনা† তারিখে (বাঙ্গলা ১২৬২ সালে) সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অদ্যাপি সেই কর্ম্মই করিতেছি।

১২৫৯ সালে পতিব্রতোপাখ্যান প্রস্তুত করি। রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারী বাবু কালীচন্দ্র রায় উক্ত পুস্তকে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেন।

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক ১২৬১ সালে রচিত হয়, উহাতেও রঙ্গপুরের উক্ত ভূম্যধিকারী বাবু কালীচন্দ্র রায় ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেন; এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সাহায্যে আরো ৫০৲ টাকা দান করেন। এই নাটক কলিকাতা নূতনবাজারে বাঁশতলার গলিতে ও চুচুড়াতে অভিনীত হয়।

বেণী-সংহার নাটক। ১২৬৩ সালে প্রস্তুত হয়। এই নাটক কলিকাতা জোড়াশাঁকোস্থ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে ও নূতনবাজারে বাবু জয়রাম বশাকের বাটীতে অভিনীত হয়।

রত্নাবলী। ১২৬৪ সালে প্রস্তুত হয়। ইহাতে কান্দিনিবাসী রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। উক্ত রাজার কলিকাতার সন্নিকট বেলগেছিয়ার বাটীতে ৬।৭ বার ঐ নাটক অভিনীত হয়। তদ্ভিন্ন গীতাভিনয় প্রস্তুত হইয়া এক্ষণেও নানাস্থানে অভিনীত হইতেছে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক। ১২৬৯ [১২৬৭ ?] সালে প্রস্তুত হয়। এই নাটক কলিকাতা শাঁকারিটোলার বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষের বাটীতে ৫ বার অভিনীত হয়।

* "কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন"—'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি,' ১২৯২ সাল, পৃ.১৫৭।

† তারিখটি "১৫ই জুন" হইবে। সংস্কৃত কলেজে রক্ষিত অধ্যাপকদের মাহিনার রসিদ-বইয়ে প্রকাশ, রামনারায়ণ ১৮৫৫ সনের জুন মাসের বেতন বাবদ ২১।/৪ পাইয়াছিলেন।

নবনাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয়। ইহাতে কলিকাতা জোড়াশাঁকোবাসি বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। এই নাটক তাঁহার বাটীতে ৯ বার অভিনয় হয়।

মালতীমাধব নাটক ১২৭৪ সালে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরকে প্রদান করি। তিনি উহাতে ১০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। তাঁহার বাড়ীতে ঐ নাটক ১০।১১ বার অভিনীত হয়।

সুনীতিসন্তাপ নাটক ১২৭৫ সালে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা কাঁশারীটোলানিবাসি বাবু কালীকৃষ্ণ প্রামাণিককে প্রদান করি। তিনি আমাকে ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। ঐ নাটক কোন কারণে মুদ্রিত হয় নাই।

১২৭৮ সালে রুক্মিণীহরণ প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের নিকটে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক পাই। ঐ নাটক তাঁহার বাটীতে ১০।১১ বার অভিনীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, উভয় সঙ্কট এবং চক্ষুর্দ্দান নামে আরো ৩ খানি প্রহসন* অর্থাৎ হাস্যরসব্যঞ্জক ক্ষুদ্র নাটক প্রস্তুত করিয়া উক্ত রাজা বাহাদুরের নিকট যথাযোগ্য পুরস্কৃত হইয়াছি, সে সকল নাটকও প্রত্যেকে ৭।৮ বার করিয়া তাঁহারই বাটীতে অভিনীত হইয়াছে।

মধ্যে মধ্যে কল্কিপুরাণ, সমুদয় উত্তররামচরিত নাটক ও যোগবাশিষ্ঠের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া সর্ব্বার্থপূর্ণ···দয়···[সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র] নামক পত্রিকাতে ক্রমশঃ প্রকাশ করা হইয়াছে।

কেরলীকুসুমা নামে একখানি নাটক প্রস্তুত করা গিয়াছে ; অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

সংস্কৃত গ্রন্থ

১২৭৮ সালে মহাবিদ্যারাধন নামে দশমহাবিদ্যার স্তোত্র ও গীতিকা এবং বর্ত্তমান বর্ষে আর্য্যাশতক প্রস্তুত করিয়াছি।"

"বর্ত্তমান বর্ষে আর্য্যশতক প্রস্তুত করিয়াছি"—আত্মকথার এই কথাগুলি হইতে কাহারও বুঝিতে অসুবিধা হইবে না যে, যে-বৎসর 'আর্য্যাশতক' প্রস্তুত হয়, সেই বৎসরই আত্মকথা লিখিত হইয়াছিল। 'আর্য্যাশতকম্'-এর প্রকাশকাল "ইং ১৮৭২। ফেব্রুয়ারি," সুতরাং রামনারায়ণের আত্মকথা যে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বা ১২৭৮ সালে রচিত, তাহা নিঃসন্দেহ।

এই আত্মকথা রচনার পরও রামনারায়ণ আরও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার সম্পূর্ণ তালিকা অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে।

---

* এই প্রহসন তিনখানি অনেকে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচনা বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

† ইহাই 'স্বপ্নধন' নামে পর বৎসর ১২৮০ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সড়ইকলা-রাজ্যে তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্র

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

ভূমিকা

উড়িষ্যায় যে-সকল ছোট ছোট সামন্ত-রাজ্য আছে তাহার মধ্যে সড়ইকলা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তর দিকে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বে সিংহভূম জেলার ধলভূম পরগণা, সেখানকার অধিবাসিগণ বাংলাভাষী। পশ্চিমে সিংহভূমের সদর মহকুমা, সেখানে হিন্দী, উড়িয়া এবং কোল ভাষা প্রচলিত। দক্ষিণে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ-রাজ্য। সড়ইকলার চলিত ভাষা উড়িয়াপ্রধান, কিন্তু শব্দ এবং বাক্যরীতিতে হিন্দী ও বাংলা উভয় ভাষারই প্রভাব লক্ষিত হয়। রাজদরবারে উড়িয়া ভাষা লিখিত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে আমরা ভাষার দিক্ দিয়া সড়ইকলা-রাজ্যকে উড়িয়া, বাংলা এবং হিন্দীর মিলনভূমি বলিয়া ধরিতে পারি, তাহার মধ্যে উড়িয়াই প্রধান।
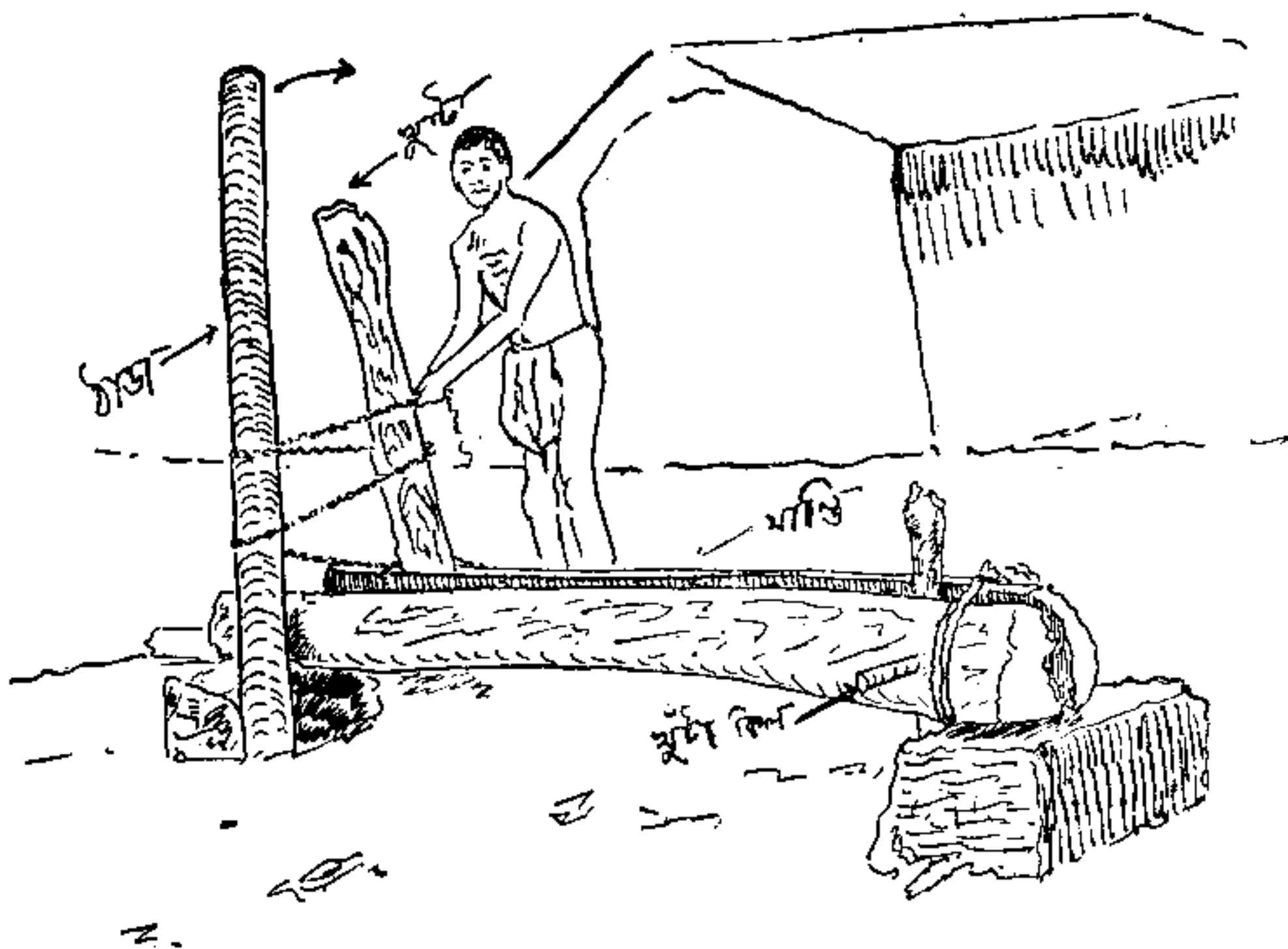
থাড়া ভাবে অবস্থিত দুইটি কাঠের পাটায় নির্ম্মিত যন্ত্র

শুধু ভাষার দিক্ দিয়া নহে, শিল্পকলা, দেশাচার এবং লোকাচার পর্য্যবেক্ষণ করিলেও উপরোক্ত বিষয়টি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সড়ইকলায় প্রচলিত কয়েক প্রকার তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্রের পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এই বিষয়টি আরও দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিব।

পাঁচ প্রকার তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্র

যত দূর দেখিয়াছি সড়ইকলা-রাজ্যে সর্ব্বসমেত পাঁচ প্রকার তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(ক) খাড়াভাবে অবস্থিত দুইটি কাঠের পাটায় নির্ম্মিত যন্ত্র,

(খ) চিৎ করিয়া শোয়ানো দুইটি কাঠের পাটায় নির্ম্মিত যন্ত্র,

(গ) দুইটি বলদে টানা, নালিবিহীন কাঠের ঘানি,

(ঘ) এক বলদে টানা, নালিযুক্ত, একখণ্ড কাঠে নির্ম্মিত ঘানি,

(ঙ) এক বলদে টানা, নালিযুক্ত, কিন্তু দুই খণ্ড কাঠে নির্ম্মিত 'পিড়ি'-বিশিষ্ট ঘানি।

ইহার মধ্যে (ক) ও (খ) এক শ্রেণীর বলিয়া ধরা যাইতে পারে, (গ) দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং (ঘ) ও (ঙ) তৃতীয় শ্রেণীর। এরূপ শ্রেণী-বিভাগের সঙ্গত কারণ আছে। প্রথম শ্রেণীর যন্ত্রে সাধারণতঃ রেড়ী, করঞ্জ, মহুয়াফলের বীচি বা কুসুম নিষ্পেষিত হয়। তিল ও সরিষাও পেষা যায়, তবে সচরাচর হয় না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীতে সচরাচর তিল, সুরগুজা ও সরিষা পিষ্ট হয়, কিন্তু অপরগুলিও হইতে পারে।
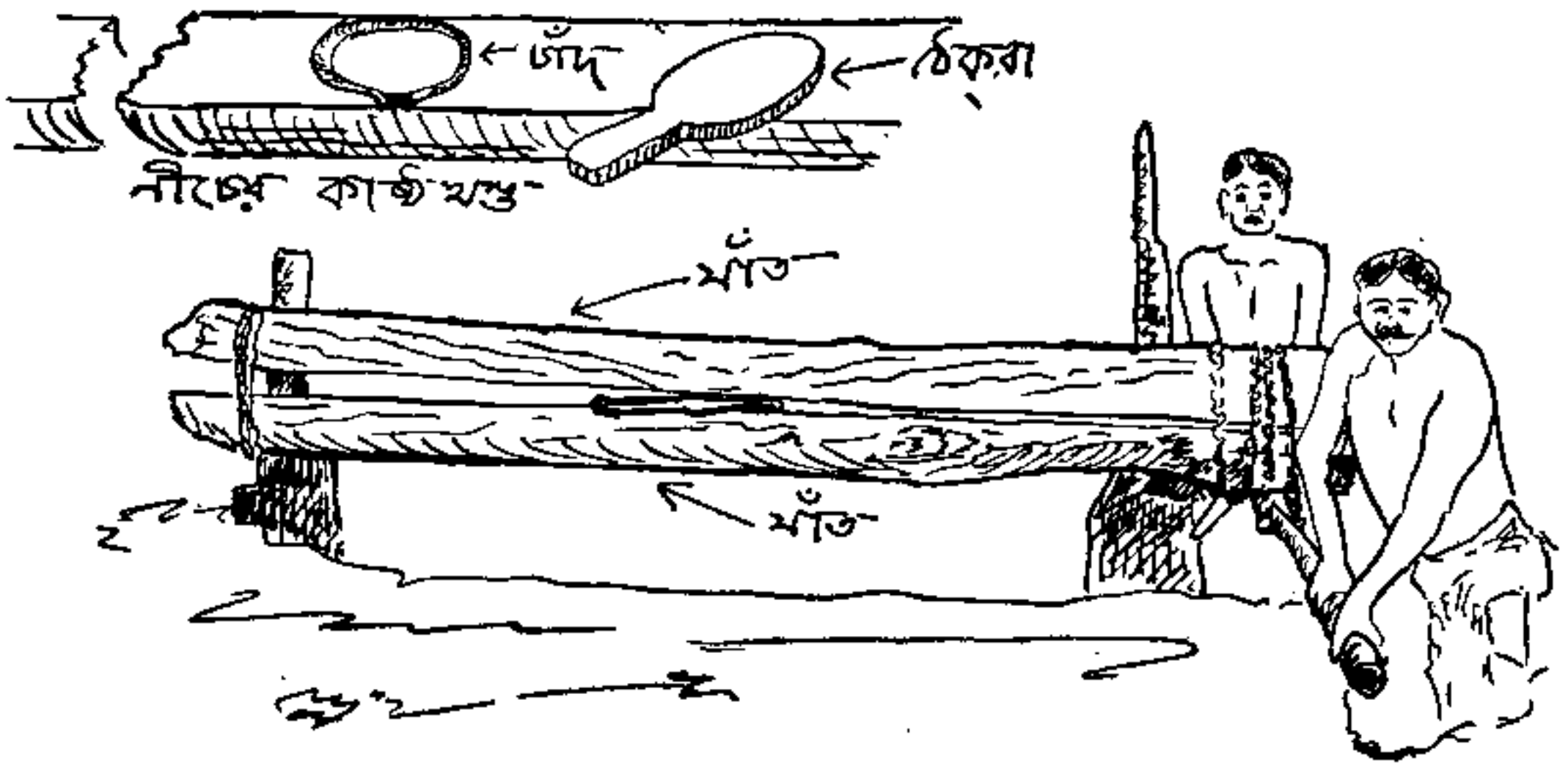
চিৎ করিয়া শোয়ানো দুইটি কাঠের পাটায় নির্ম্মিত যন্ত্র

প্রথম শ্রেণীর যন্ত্রে পিষিবার জন্য বীজগুলিকে আগে মিহি করিয়া ঢেঁকিতে কুটিতে হয়। তাহার পর উনানে এক হাঁড়ি জল চাপাইয়া তাহার উপরে আর একটি হাঁড়িতে কোটা বীজগুলি চাপাইতে হয়। দুই হাঁড়ির সঙ্গমস্থল মাটির প্রলেপ দিয়া বুজানো থাকে এবং উপরের হাঁড়ির নীচে কয়েকটি ছিদ্রও থাকে। নীচের পাত্রে জল ফুটিলে উপরের পাত্রে অবস্থিত গুঁড়ার ভিতর দিয়া ভাপ বাহির হইবার চেষ্টা করে। তখন গুঁড়াগুলিকে বেশ করিয়া নাড়িতে হয়। গুঁড়া ভাল করিয়া ভাপানো হইলে অল্প অল্প লইয়া চটের টুকরায় মুড়িয়া অথবা বন্য লতায় প্রস্তুত এক প্রকার ছোট্ট চুপড়িতে ভরিয়া কাঠের দুইখানি পাটার মধ্যে রাখিয়া চাপ দিতে হয়। তখন তৈল বাহির হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর যন্ত্রে কিন্তু এই ভাপানোর পর্ব্বটি নাই। বীজকে কাঁচা অবস্থাতেই অল্পাধিক জল মাখাইয়া ঘানিতে দিতে হয়। তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর যন্ত্রে পেষাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও জল মিশাইতে হয়, তখন তেল উপরে ভাসিয়া উঠে। তৈলকার একখণ্ড কাঠিতে ন্যাকড়া বাঁধিয়া সেই ন্যাকড়ার সাহায্যে ভাসমান তেল শুষিয়া লয়। তৃতীয় শ্রেণীতে জল অতি সামান্য লাগে, বীজগুলিকে শুধু জলে মাখোমাখো করিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়। তেল পেষা হইলে তাহা নীচের নালিপথে বিন্দু বিন্দু ঝরিয়া পড়ে। বীজের সহিত জল মিশাইলে তাহা ত আর নীচের দিকে নামিবে না।

দুই বলদে টানা, নালিবিহীন কাঠের ঘানি

ইহাই তিন শ্রেণীর যন্ত্রের মধ্যে প্রধান প্রভেদ। এইবার প্রত্যেকটির পৃথক্ বর্ণনা করা যাউক।

(ক) সড়ইকলা শহরের পশ্চিম দিকে প্রায় চার মাইল দূরে জিলিংবুরু নামে একটি গ্রাম আছে। ইহাতে শুধু কোল জাতির বাস। গ্রামের মধ্যে তৈলনিষ্কাশনের জন্য একটি যন্ত্র আছে, যাহার যখন দরকার তখন ইহাতে তৈল পিষিয়া লয়। ১৯২৬ সালে এই যন্ত্রটি প্রথম দেখিয়াছিলাম, ১৯৩৮ সালেও দেখিলাম তাহা যথাস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে।*

একটি শালের গুঁড়ি মাঝামাঝি চিরিয়া দুই খণ্ড করা হইয়াছে। তাহার এক দিকে একটি খিল দিয়া বাঁধা, অপর দিক উন্মুক্ত। এই মুক্ত প্রান্তের এক পাশে একটি খুঁটি শক্ত করিয়া পোঁতা আছে। অপর পাশে একটি আলগা খুঁটি, ঠেলিলে দুই খণ্ড কাঠ

* এই যন্ত্রের একখানি চিত্র ১৯৩১ সালের মে সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রের ৫৭৪ পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

চাপিয়া ধরা যায়। সমস্ত যন্ত্রটি দুই খণ্ড পাথরের উপর বসানো আছে। কাঠের চেরা ও সমান পার্শ্ব দুইটি পরস্পরের প্রতি মুখোমুখি খাড়াভাবে অবস্থিত। তেল পিষিবার সময়ে সেই জন্য তেল সোজা নীচে ঝরিয়া পড়ে। তখন নীচে একখানি থালা পাতিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়।

প্রথম চিত্রে এক জন বৃদ্ধ কোল যন্ত্রটির ব্যবহার-কৌশল দেখাইতেছে। ঐ সময়ে অপর দিকের খোলা খুঁটিটি, দুই এক জন বেশ জোরে চাপিয়া ধরে এবং চাপা থাকিতে থাকিতে দড়ি দিয়া আঁটিয়া বাঁধিয়া দেয়। যন্ত্রের মধ্যে বন্য লতায় নির্ম্মিত চুবড়ি ৩।৪।৫টি একত্র দেওয়া হয়।

কোল জাতির মধ্যে প্রধানতঃ খাড়া পাটার ব্যবহার দেখিয়াছি। ইটাকুদরের নিকটে নতুনডি বস্তিতেও এক জন কোলের বাড়িতে দুইখানি পাটা দেখিয়াছিলাম, তাহা জিলিংবুরুর মত তৈলনিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক ব্যবহারের ফলে দুইটি পাটার মধ্যভাগ তেলে কুচকুচে কাল হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন হাওমোওা গ্রামে ভূমিজ জাতির মধ্যেও এইরূপ একটি যন্ত্র ২৪।২।১৯২৬ সালে দেখিয়াছিলাম। তবে সেক্ষেত্রে জিলিংবুরুর মত শালের গুঁড়িটি কাটিয়া আগাগোড়া ফাঁক করিয়া দেওয়া হয় নাই, খানিক চিরিয়া বাকী পূর্ব্বাবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এই যন্ত্রটির সম্বন্ধে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল এই যে, যদিও কোলজাতির মধ্যে ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবু যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের নাম কোল ভাষায় নাই। প্রায় সবই সংস্কৃতমূলক শব্দ। হয়ত ইহারা নিজেরা এ যন্ত্র উদ্ভাবন করে নাই। যন্ত্রের নাম যান্ত্রি বা সুসুম লেস্তেএ যান্ত্রি (=তেলের জন্য যান্ত্রি ?)। দুইটিকে এক প্রান্তে যথাস্থানে রাখিবার জন্য খুঁটা কিল। অপর প্রান্তের এক পাশে খুণ্টা, অপর পাশে চলিষ্ণু ঠাডা। মধ্যে যে বন্য লতায় নির্ম্মিত চুপড়ি দেওয়া হয় তাহার নাম কুলি টোপা।

(খ) দ্বিতীয় যন্ত্রটি মূলতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী যন্ত্রের অনুরূপ। আমি মানিকবাজার গ্রামে ১১।১০।১৯৩৮ তারিখে দুর্য্যোধন মাহাতোর বাড়ীতে ইহা দেখি ও ইহার ছবি লই।

এ ক্ষেত্রে পাটা দুইটি খাড়া ও পাশাপাশি থাকে না, ভূমিজক্ষেত্রে একটি অপরের উপরে শোয়ানো থাকে। নীচের পাটার মধ্যস্থলে একটি বৃত্তাকার নালি থাকে, ইহার ব্যাস আনুমানিক আধ হাত হইবে। নালির একটি মুখ পাশের দিকে কাটা থাকে। তৈলবীজ-নিষ্পেষণের জন্য বৃত্তের মধ্যভাগে বসানো হয়। চাপ দিলে তেল নালিপথে গড়াইয়া পাশের মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়। কি ভাবে দড়ি বাঁধিয়া দুইখানি লাঠির সাহায্যে দুই দিক্ হইতে চাপ দেওয়া হয় তাহা চিত্রে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এই যন্ত্রে সচরাচর দুইটি লতার চুপড়ি অথবা চটের তৈয়ারী একটি মাত্র পুঁটুলি দেওয়া হয়, জিলিংবুরুর খাড়া যন্ত্রের মত একসঙ্গে তিন-চারটি নহে। কিছু চাপিবার পর পুঁটুলি চাপে পাতলা হইয়া যায়। তখন দুই খণ্ড পাটার মধ্যে পিংপং খেলিবার ব্যাটের মত এক খণ্ড কাঠ

গুঁজিয়া দেওয়া হয়। পুনরায় চাপিলে পুঁটুলির উপরে আবার জোর পড়ে, অবশিষ্ট তেল নিষ্কাশিত হইয়া যায়।

যন্ত্রের নাম ঘাঁত। বৃত্তাকার নালির নাম চাঁদ, ব্যবধান কমাইবার কাষ্ঠখণ্ডের নাম ঠেক্‌রা। যে ক্ষুদ্র চুপড়িতে তৈল-নিষ্কাশনের জন্য বীজগুলিকে পুরিয়া চাপানো হয় তাহার নাম পোটোম।

কেন্দুপুসির নিকট মুকুন্দপুর গ্রামে ৯।১০।১৯৩৮ তারিখে একটি ঘাঁত দেখিয়াছিলাম, তাহার চাঁদ অন্য রকমের, চাঁদের মুখ পাশে কাটিয়া দেওয়া হয় নাই। ইহাকে ভিতরে কিছু দূর বিস্তৃত করিয়া তাহার পর নিম্নস্থ কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যভাগে ছেদ করিয়া নীচে মধ্যস্থলে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে।
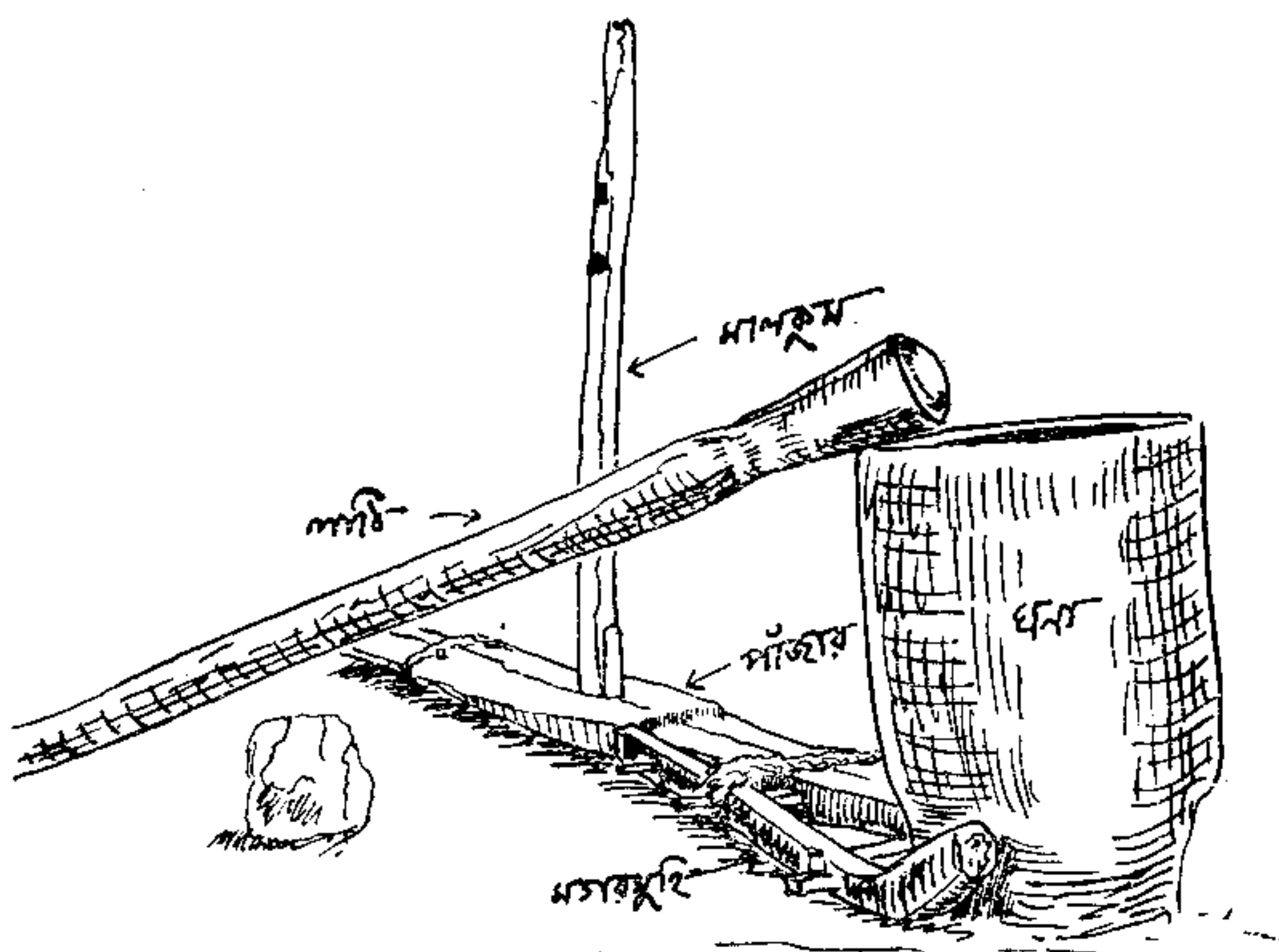
নালিবিহীন ঘানির বিভিন্ন অংশ

ভূমিজক্ষেত্রে অবস্থিত পাটার ঘাঁত মানিকবাজারে মাহাতো বা কুর্মিজাতির দ্বারা ব্যবহৃত হয়। ছোট লুপুং গ্রামে সাঁওতালদের মধ্যে ইহার একটি বিকল্প দেখিয়াছি। ধানকোটার ঢেঁকির উপরে ভাপানো বীজ বসাইয়া দেওয়া হয়, আর একটি ঢেঁকি তাহার উপর উল্টাইয়া শোয়াইয়া চাপ দেওয়া হয়, নয়ত একখণ্ড কাঠ তাহার বদলে উপরে দেওয়া হয়। তবে সাঁওতালদের মধ্যে জিলিংবুরুর মত খাড়া ঘাঁত দেখি নাই। ২৭।১২।১৯২৬ তারিখে পালামৌ জেলায় গারু থানার অন্তর্গত গোইন্দি গ্রামে খেরওয়ারদের মধ্যে এইরূপ যন্ত্রের ব্যবহারের বিষয় শুনিয়াছিলাম, তবে কাহারও বাড়িতে ইহা চাক্ষুষ দেখিবার সুযোগ হয় নাই। ১৮।৯।১৯২৬ তারিখে রাঁচি জার্মান মিশনের জনৈক খ্রীষ্টান কোল শ্রীযুক্ত ইলায়াস তপন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের গ্রামে রাঁচি জেলায় খুঁটি থানার পশ্চিমে অবস্থিত

সোনপুর এলাকায় এইরূপ যন্ত্রের ব্যবহার আছে। তবে সেখানে নাকি সরিষার তৈলও এই উপায়ে নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। সাঁওতাল-পরগণা এবং আসাম হইতে আনীত দুইটি অনুরূপ যন্ত্রের নমুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগে রক্ষিত আছে। নিকোবর-দ্বীপ হইতে আনীত আর একটি যাঁত কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

(গ) তেলের ঘানিগাছটি এক খণ্ড শালকাঠে তৈয়ারি। ইহা ভূমির উপরে প্রায় দেড় হাত ও নীচে তিন চার বা আরও বেশী হাত পোঁতা আছে। ঘানিগাছের মাথায় যে খোলটি কাটা আছে তাহা কতকটা কলসীর আকারে কাটা। ইহা তেলিরা নিজে কাটিয়া লয়, ছুতারের সাহায্য গ্রহণ করে না। অনেক দিন কাজ হইলে উপরের অংশ ক্ষইয়া যায়, তখন একটু কাটিয়া ফেলিয়া আবার নূতন খোল নির্ম্মাণ করিয়া লইতে হয়।

যন্ত্রের নাম ঘনা। যে দণ্ডের দ্বারা নিষ্পেষণ হয় তাহার নাম লাঠি। যে পাটায় বলদ জোতা থাকে তাহাকে পাঁজরি বলে। পাঁজরির সহিত বাঁশপাতি নামক আর এক খণ্ড কাঠ জোড়া থাকে, তাহার বাঁকা মুখের নাম মগরমুহি। পাঁজরিতে ইসের সাহায্যে জোয়াল বাঁধা থাকে। পাঁজরির উপরে খাড়া মালকুম দণ্ড, তাহাতে দুই তিনটি ছিদ্র থাকে। মালকুমের উপরিভাগের সহিত বাঁকিয়া নামে একটি বাঁকা কাঠ থাকে, তাহার মধ্যে একটি খোপে লাঠির উপর অংশ বসিয়া থাকে। আলগা যন্ত্রপাতির মধ্যে শাবল, ইহার মুখ ঈষৎ বাঁকা। তাই খইল কুরিয়া কুরিয়া তুলিতে সুবিধা হয়। আর কাঠি নামে এক খণ্ড কাঠে কিছু ময়লা ন্যাকড়া বাঁধা থাকে। তাহার সাহায্যে জলে ভাসা তেল শুষিয়া লওয়া হয়।

বীজগুলিকে প্রথমে জলে মাখিয়া ঘানির মধ্যে দেওয়া হয়। পাঁজরির উপরে পাথরের ভার চাপানো হয়, যে চালায় সেও ইহার উপরে দাঁড়াইয়া বলদকে হাঁকায়। তেল যেমন বাহির হইতে থাকে, জলের পরিমাণও বাড়ানো হয়। তখন তেল ভাসিয়া উঠে এবং কাঠির সাহায্যে তাহা তুলিয়া ফেলা হয়। এইরূপ প্রক্রিয়ার ফলেই বোধ হয় খইলে চিট হয় এবং তাহা খইলের পার্শ্বদেশে লাগিয়া যায়। তখন চারটি খড় কুচাইয়া ঘানির মধ্যে ফেলিয়া পুনরায় ঘানি চালানো হয়। কুচা খড়ের ঘর্ষণেই বোধ হয় খইল পাশ হইতে ছাড়িয়া যায়।

যে-তেলিরা দুই বলদের ঘানি চালায় তাহাদের জল ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে গ্রহণ করে। ইহাদের জাতি তেলি, পদবী পড়িহারি। যেমন ক্ষেত্রমোহন পড়িহারি। ইহারা ঘানিতে কখনও এক বলদ জোতে না, ঘানির মধ্যে তৈল-নিষ্কাশনের ছিদ্র করে না।

(ঘ) কিন্তু মানিকবাজারের উত্তরে সুরতাড়ি গ্রামে যে শালকাঠের ঘানি দেখিয়াছি তাহা এক বলদে টানে।

ঘানিগাছ মাটির উপরে দেড় হাত বাহির হইয়া থাকে, নীচে দুই হাত পোঁতা। উপরে (গ) এর মত খোল কাটা থাকে, তাহার নীচের দিকে কিন্তু একটি গর্ত। সুরতাড়ির খদু গোরাঁইয়ের ঘানির ছবি লইয়াছিলাম।

ঘানির নাম ঘানা। যে ছিদ্র দিয়া তেল বাহির হয় তাহা নেরিও। নীচে গাড়ু থাকে। পেষণদণ্ডের নাম লাঠিম। কাঠের পাটাটি মাটি হইতে উপরে থাকে, ইহাকে কাতের বলে। কাতেরে সংলগ্ন খাড়া কাষ্ঠখণ্ডের নাম লইতে ভুল হইয়াছিল, তাহাতে বাঁধা বাঁকা কাঠের নাম ঢেঁকা। ইহাতে দুই তিনটি খাট কাটা আছে, তাহাতে লাঠিমের উপরাংশ প্রবিষ্ট থাকে। লাঠিমের সহিত আলগা ভাবে যুক্ত জোয়াল। ইহার সহিত আড়াআড়ি একটি কাঠি কাতেরের শেষ ভাগের সহিত দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে। এই কাঠির নাম গলি। কাতেরে চালক পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকে, ওজনের জন্য পাথরও চাপানো হয়।

এক-বলদে টানা, নালিযুক্ত একখণ্ড কাঠের ঘানি

সুরতাডির বন্ধু গোরাঁইয়ের বাড়িতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তাহাদের সহিত মানিকবাজারের বড় ঘানি ব্যবহারকারী তেলিদের প্রভেদ কি। উত্তরে এক বৃদ্ধা বলিল, "উয়ারা দো-বলদিয়া, আমরা এক-বলদিয়া।" আরও শিখিলাম :

(১) দো-বলদিয়াদের লাঠি লম্বা, এক-বলদিয়াদের ছোট, মাত্র দুই হাত। তাই ইহারা ঘরের মধ্যে ঘানি চালাইতে পারে, দো-বলদিয়ারা পারে না।

(২) যে-পাটায় চালক চাপিয়া বলদ হাঁকায় তাহা দো-বলদিয়াদের ক্ষেত্রে মাটিতে ঠেকে, এক-বলদিয়াদের ঠেকিতে পারে না। ঠেকিলে গাড়ু ভাঙিয়া যাইবে।

(৩) দো-বলদিয়ারা ঘানিতে জল দেয়, ইহারা তেল পেষার সময়ে দেয় না, আগে যা সামান্য মাখাইয়া লয়। ইহাদের তেল বর্ষাকালেও ভাল থাকে, উহাদের নষ্ট হইয়া যায়, বেশী দিন থাকে না। ইহাদের খইল ছাড়াইতে কষ্ট নাই, উহাদের বিলক্ষণ বেগ পাইতে হয়।

(৪) ইহাদের ও উহাদের মধ্যেও সাগা বা বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে।

ধনু গোরাঁইয়ের আত্মীয়স্বজন পাতকুম (মানভূম) রাইরঙ্গডি (ময়ূরভঞ্জ), ঝালদা (মানভূম), গোলা (হাজারিবাগ) অঞ্চলে থাকে। এই স্থানগুলি মানিকবাজার হইতে দক্ষিণে এবং উত্তরে, ঈষৎ উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

(ঘ) শেষের যন্ত্রটিও এক বলদে টানে। আমি নারাণপুর গ্রামে ঘাসিরাম গরাঁইয়ের বাড়ীতে ইহা দেখিয়াছি।

যন্ত্রের নাম ঘানা। উপরে আলাদা কাঠে তৈয়ারি জামবাটির মত অংশের নাম পিঁড়ি। পেষণদণ্ডের নাম জাঠ। জাঠের উপর অংশে একটি বাঁকা সুদৃশ্য কাষ্ঠখণ্ড আটকানো থাকে, তাহার নাম মাকড়ি। মাকড়ির পশ্চাদ্ভাগে একটি ছিদ্র, তাহার সহিত দড়ি দিয়া মথমখুঁটা বাঁধা। মথমখুঁটা পাটার উপরে দাঁড়াইয়া থাকে। পাটার যে-প্রান্ত ঘানার গায়ে ঘষিয়া যায় সেখানে গোলোই নামে আর একটি কাঠের টুকরা জোড়া থাকে। ঘানার নীচে যে-স্থান দিয়া তেল বাহির হয় তাহার নাম পাৎনালি। নীচে ভাঁড়ে তেল পড়ে। ঘানির মধ্যে বীজকে নাড়িয়া দিবার জন্য একটি কাঠি আটকানো থাকে, তাহাও ঘোরে। ইহার নাম সাঁকনি। গরুর চোখে চামড়ার ঠুলি থাকে। গরুকে জুতিবার জন্য জোয়াল। জোয়াল পাটার সঙ্গে একটি আড়াআড়ি ভাবে বাঁধা কাঠি দিয়া আটকানো থাকে, তাহা কাইলুড়ি।

একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল এই যে, নারাণপুরের কলুরা শালের পরিবর্ত্তে অশ্বত্থ, বট ও নিম কাঠের ঘানি করা ভাল মনে করে। হয়ত তাহারা যে-দেশ হইতে আসিয়াছিল, সেখানে শালকাঠের অভাব আছে।

নারাণপুর গ্রামের ঘাসিরাম গরাঁই এবং মহেশ্বর গরাঁই নামে দুই জন কলুর কাছে সুরতাডির গোরাঁইদের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় নিম্নোক্ত সংবাদ পাওয়া গেল।

(১) "আমরা একাদশ তেলির অন্তর্গত। জাতি, কলু। এই গ্রামে দ্বাদশ তেলির অন্তর্গত লোকও আছে, তবে তাহারা তেল পেষে না, ব্যবসা-বাণিজ্য করে। আমরা রাঢ়ী কলু অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর, কেননা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দ্বিতীয় বিবাহের (=বিধবাবিবাহ) চলন করিয়া গিয়াছিলেন।

(২) "মানিকবাজারের দুই-বলদওয়ালা তেলি এবং সুরতাডির এক-বলদওয়ালা

তেলিদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। উহারা উভয়েই উড়িষ্যা-বিভাগের লোক। আমরা পূর্ব্ব-বঙ্গের লোক (=পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত বঙ্গদেশের, বাংলার পূর্ব্বাঞ্চলের নহে)। এখানে তিন চার পুরুষ বাস করিতেছি। শিখরভূম হইতে আসিয়াছিলাম।" শিখরভূম মানভূমের বরাহভূমের পূর্ব্বে অবস্থিত।

(৩) "সুরতাডির উহাদের সহিত আমাদের জল চলে না। উহারা কুঁকুড়া ও মদ খায়। উহারা বোধ হয় মগহিয়া (=মগধ বা বিহার প্রান্তের লোক)।"

১৬।১০।১৯৩৮ তারিখে আমি পুনরায় সুরতাডির ধনু গোরাইয়ের বাড়ী যাই; সেখানে সকলকে নারাণপুরের কলুদের বিষয় প্রশ্ন করায় সেই বৃদ্ধা উত্তর করিল,

এক-বলদে টানা, নালিযুক্ত, পিঁড়ি-বিশিষ্ট ঘানি

(১) "নারাণপুরের বাঙালীশাহীর (=বাঙালী-পাড়ার) উয়ারা শিখ্‌রিয়া (=শিখরভূমের অধিবাসী) বটে।"

(২) "উয়াদের ঘানিতে পিঁড়ি আছে, আমাদের নাই।"

সেই দিন ধনুর বাড়ীতে পোষা মুরগী দেখি এবং পূজা-বিশেষে তাহারা মুরগী বলি দেয় ইহাও শুনি। ইহাদের মধ্যেই যে সাঙ্গা বা বিধবাবিবাহ আছে তাহা নহে। ধনু

এবং অপরেও বলিল যে ব্রাহ্মণাদি দু-এক বর্ণ বাদে সকলের মধ্যেই এদেশে সাপা প্রচলিত আছে। দো-বলদিয়া তেলিদেরও নাকি সাপা হয়। আর মুরগী বলি দেওয়ার কথা, তাহা দেবতা-বিশেষে ব্রাহ্মণাদি সকলেই নাকি করিয়া থাকে। ক্ষেত্রে চাষের সময়ে গোবর দিয়া লেপিয়া সিঁদুর দিয়া স্থানটি চিহ্নিত করিয়া আতপচাল নৈবেদ্য দেয়, মুরগীরও বলি হয়। তবে এ সকল সংবাদ অন্য কোথাও যাচাই করিবার অবসর পাই নাই।

কয়েকটি সাধারণ তথ্য

তৈল-নিষ্কাশনের জন্য দো-বলদিয়া অথবা এক-বলদিয়া তেলি ও কলুদের মধ্যে বাণী বা মজুরি লইবার নিম্নলিখিত রীতি প্রচলিত আছে। যত সের সরিষা, তিল বা গুজা পেষা হয় তৈলকার তত সের চাল পায়। উপরন্তু খইল তৈলকারের লভ্য হয়। ঘানিতে চার মণ সরিষায় এক মণ তেল হয়। কিন্তু আজকাল কলের ঘানিতে তিন মণে নাকি এক মণ তেল হয়। তাই তেলিরা বাজারে কলের তেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, তাহাদের পড়্‌তায় পোষায় না।

পূর্ব্বে সড়াইকলায় কেবল তিল, গুজা, রেড়ী ও মহুয়া-বিচির তেলই চলিত। কোলেরা রেড়ী ও মহুয়া-বিচি বা কড়চার তেল ব্যবহার করিত। ইদানীং, বিশ পঁচিশ বৎসর হইতে সরিষা চলিতেছে। ইহাকে "ভাল তেলও" বলে, কেননা ভাল লোকেরা ইহা খায়। নারাণপুরের বাঙালী কলুরা আজকাল ছয় সাত ক্রোশ দূরে অবস্থিত জমসেদপুরের মাদ্রাজী অধিবাসিগণের নিকট তিল-তেল বিক্রয় করিয়া দু-পয়সা রোজগার করিতেছে।

ঐতিহাসিক আলোচনা

পূর্ব্বে যে-পাঁচটি যন্ত্রের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর যন্ত্র জাতিনির্ব্বিশেষে লোকে নির্ম্মাণ করিতে পারে। তবে খাড়া পাটা কোলেদের ও ভূমিজদের মধ্যে দেখিয়াছি, অন্যটি নানা জাতির মধ্যে। দুই যন্ত্রের অংশের নাম আলাদা, অতএব দুই স্থান হইতে হয়ত দুইটি যন্ত্র সড়াইকলায় পৌছিয়াছিল। বলদ জুতিয়া ঘানি চালানো কেবল তেলি ও কলুদের কাজ। রাঁচি জেলায় দেখিয়াছি তেলি ভিন্ন অপর জাতির লোকেও ঘানিতে তেল পেষে, তবে জাত-হারাইবার ভয়ে বলদ জোতে না, মানুষেই ঠেলিয়া চালায়। নারাণপুরে সংবাদ পাইলাম যে সিংহভূমের জয়ন্তগড় এলাকায়, অর্থাৎ কেঁওঝর-রাজ্যের সীমানায় অনুরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

এইবার বলদে চালানো তিনটি ঘানি সড়াইকলায় কোথা হইতে আসিল তাহার সন্ধান লওয়া যাক। দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘানি অর্থাৎ "দো-বলদিয়া" জলচল জাতির দ্বারা চালিত হয়। তৃতীয় বা "এক-বলদিয়া" ঘানি জল-অচল জাতিতে চালায়। তাহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। যাহারা এক-কাঠের ঘানি করে তাহারা আবার মদ ও মুরগী খায়, পিঁড়িবিশিষ্ট ঘানিকরেরা অনাচরণীয় হইলেও মদ বা মুরগী খায় না।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে প্রচলিত ঘানির বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে গ্রিয়ার্সন সাহেব *Bihar Peasant Life* গ্রন্থে বিহারের ঘানির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার সহিত সুরতাডির এক-কাঠের ঘানি অনেকটা মিলিয়া যায়। এখানে যাহা ঘানা সেখানে তাহা কোলুহু। বিহারে ঘানী বা ঘান বলিতে ততখানি তৈলবীজকে বুঝায় যাহা একবারে কোলুহুর মধ্যে পেষার জন্ত দেওয়া চলে।* সুরতাডির নেরিও বিহারে নিরোহ্ বা নারাহ্। কাতের বিহারে কৎরী নামে পরিচিত। লাঠিম কিন্তু জাঠ নাম ধরিয়াছে। সুরতাডির ঢেঁকা বিহারের ঢেকা বা ঢেকুআ। গাড়ু কিন্তু ছনা। অর্থাৎ বিহারের সহিত সুরতাডির কিছু নাম মেলে, কিছু মেলে না।

এইরূপ এক-কাঠে-তৈয়ারি ঘানি পূর্ব্ববঙ্গে সিলেট, নোয়াখালি প্রভৃতি জেলাতেও প্রচলিত আছে, তবে সেখান হইতে বিভিন্ন অংশের নাম এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

মানিকবাজারের দো-বলদিয়াদের কথা বিশেষ জানি না। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বিগত সায়েন্স কংগ্রেসে (জানুয়ারি ১৯৩৮) তৈলকার এবং বিভিন্ন প্রকারের ঘানির সম্বন্ধে এক বিস্তৃত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে এবং মহাত্মা গান্ধীর 'হরিজন' পত্রিকাতেও† সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, দাক্ষিণাত্যে দো-বলদিয়া ছিদ্রবিহীন এবং গুজরাত-প্রান্তেও ছিদ্রবিহীন ঘানির প্রচলন আছে। সম্প্রতি গুজরাতে ছিদ্রযুক্ত ঘানির ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। সেখানকার নাম ও পুরা বর্ণনা পাইলে মাণিকবাজারের ঘানির ইতিহাস মিলিতে পারে। উড়িষ্যায় প্রচলিত ঘানির বর্ণনাও এই প্রসঙ্গে সংগ্রহের আবশ্যকতা আছে।

নারাণপুরের কলুরা নিজেদের স্পষ্টই বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিল। নদীয়া জেলা এবং চব্বিশ-পরগণায় পিঁড়িবিশিষ্ট ঘানির চলন আছে। অন্যত্রও থাকিতে পারে, তবে সে সংবাদ সংগৃহীত হয় নাই। সেগুলি পাইলে কলুরা কোথা হইতে সড়াইকলা এবং শিখরভূমে পৌঁছিয়াছিল তাহার একটা হদিস্ মিলিতে পারে।

যাহাই হউক, সড়াইকলায় তেলের ঘানি হইতেই আমরা দেখিতে পাই বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এখানে বিভিন্ন শিল্পধারা আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। ভাষাও আমাদের সেই তত্ত্বে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু সভ্যতা-বিস্তারের ইতিহাসটি পুরাপুরি উদ্ধার করিতে হইলে বাংলা দেশের এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রান্তের শিল্পকলা, আচার-ব্যবহার, যন্ত্রপাতির খুঁটিনাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণ ও বর্ণনের আবশ্যকতা আছে। গ্রিয়ার্সন বিহারের সম্বন্ধে যে-কাজ করিয়া গিয়াছেন, বাংলা দেশে তাহার আশু প্রয়োজন আছে।

---

* ঘান বলিতে হিন্দীতে একসঙ্গে উদূখলে বা যাঁতায় যতখানি শস্য ধরে, একবারে কড়ায় যতখানি জিনিষ ধরে তাহাকেও বুঝায়।

† *Harijan*, Vol. V. 1937-38, Nos. 16, 17, 19, 20, 21. ক্ষিতীশবাবুর প্রবন্ধটি *Journal of the Anthropological Institute of India*, Vol. I. No. 1-এ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বগুড়ার কবি গোবিন্দচন্দ্র

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

বিগত শতাব্দীতে বগুড়া জেলার সেরপুর নামক গ্রামে কবি গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের সন তারিখ জানা যায় না। ১৩০৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। গোবিন্দচন্দ্রের শিক্ষা বোধ হয় সেকালে ছাত্রবৃত্তি অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু তাঁহার কবিতায় যেরূপ শাস্ত্রজ্ঞান ও ভাষার কারুকার্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এই গ্রাম্য কবির প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সাধনার সুখ্যাতি না করিয়া পারা যায় না। ইঁহার গানে এমনই একটি সরল সহজ স্বচ্ছ ভাব আছে, যাহা অনায়াসে হৃদয় স্পর্শ করে। বহু লোকের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্রের গান এখনও প্রচলিত আছে। রামপ্রসাদের গানে যেরূপ সরল প্রাণের স্পর্শ আছে, এই কবির গানেও তাহা পাওয়া যায়। এই অনন্যসুলভ মর্মস্পর্শী বৈরাগ্যমিশ্রিত ভক্তিভাব তিনি কেমন করিয়া লাভ করিলেন, ইহা লইয়া কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে বলেন তিনি গ্রামের শ্মশানে বসিয়া সাধনা করিতেন। নিশীথ রাত্রিতে নৌকার মাঝিরা নদীতীরের এই শ্মশান-ঘাটে লোক বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ভীতিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—ওখানে কে? গোবিন্দচন্দ্র প্রত্যুত্তর দিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্র প্রকাশ্যভাবে সংসারে বাস করিতেন বটে, কিন্তু সংসারের সুখদুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিত না। মনে মনে তিনি বিষয় হইতে নির্লিপ্ত ভাবেই সাধনা করিতেন। এই বৈরাগ্যের সুর তাঁহার কবিতায় বিশেষ ভাবে বাজিয়াছে:

সংসারী বলিয়ে শ্যামা
  ঘৃণা আমায় কর মিছে।
দেহ আমার গেহবাসী
  মন যে সন্ন্যাসী হয়েছে।
  দুর্নিবার বিষয়-দায়
  দেহ আমার গেহ চায়

মন কিন্তু আগে হতেই
  শ্মশান-আশ্রম সার করেছে।
দেহ দিব্য বসন ধরা
মন যে আমার কৌপীন পরা
দেহ চায় মোর গন্ধ তৈল মা!
  মন যে চিতা ছাই মেখেছে।

—সদ্‌ভাব পুষ্পাঞ্জলি

গোবিন্দচন্দ্র শ্মশানের বর্ণনায় শতমুখ। তাঁহার এই শ্মশান-প্রীতির তুলনা বঙ্গ-ভাষায় নাই।

আমার শ্মশান ব'লে কিবা ভয়।
শ্মশান রঙ্গিণী শ্যামা মোর জননী
শ্মশানবাসী আমার পিতা মৃত্যুঞ্জয়।

বিভীষিকা আমায় দিবে কি রে সাজা ;
পিতা ঈশান আমার শ্মশানভূমির রাজা
প্রেত পিশাচ কবন্ধ বিত্তভোগী প্রজা
ভূত ভৈরবাদি ভৃত্য বইত নয়।

শ্মশানে শুধু যে ভয় নাই, তাহা নহে। কবি উহাকে পরম পবিত্র স্থান রূপে বর্ণনা করিয়া মৃত্যুর করাল বিভীষিকাকে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন।

ভবে কে বলে কদর্য শ্মশান !
পরম পবিত্র চরম যোগের স্থান,
পাপী পুণ্যবান মূর্খ কি বিদ্বান,
সমান ভাবে হেথা সকলে শয়ান।

* * *

জাতিভেদ হেথা নাই রে কোন কালে
এক শয্যায় শয়ান ব্রাহ্মণে চণ্ডালে
সমান কুশ-পাত্র প্রেতান্ন আর জলে
সমান তৃপ্ত সবার প্রাণ—

* * *

জিতেন্দ্রিয় জীব আসা মাত্র হেথা
মহামৌনী দগ্ধ হ'লেও কয় না কথা
ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় উপাধি লোপ পায়
সমাধির অধীন হয় প্রাণ,—
জন্মের মত ঘুচে যায় রে শোক রোগ
স্বপ্ন শূন্য নিদ্রা হয় রে উপভোগ
শ্মশান মাত্র নাম, কিন্তু শান্তিধাম
(হেথা) সুখদুঃখ শ্রান্তি চির অবসান।

উপরের গান দুইটিতে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করিবার যে ভাবটি পাওয়া যায়, তাহা আমরা সাধক কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের মধ্যেও দেখিতে পাই। কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় গোবিন্দচন্দ্রের খ্যাতিও বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়ে। গোবিন্দচন্দ্রের উপরিলিখিত গান ও অন্য অনেকগুলি গান এখনও লোকের মুখে মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ কীর্তন-গায়ক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য এরূপ ভাবের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের গীত গান করেন যে, তাহাতে সহস্র সহস্র নরনারী মুগ্ধ হয়। কবি যে সঙ্গীত সম্বন্ধেও পারদর্শী ছিলেন, তাহা তাঁহার একটি রূপকে বুঝিতে পারা যায়:

মনের বাসনা যদি গাবে গান।
যদি থাকে উদ্ভব লয়ের স্থান,
তবে ত্রাণ কর মা বলে' একবার তারা নামে ছাড় তান।
বসন্তের হৈও না বশ বাহার বিষম বিরস,
নটখটে ক'র না রে যোগদান ;—
অহং রাগ পরিহর, গৌরী আলাপন কর,
জয়জয়ন্তি বল একবার জুড়াই কান ;—
ক্রমে শ্রীরাগ জন্মিবে হবে বাগীশ্বরীর অধিষ্ঠান।

* * * *

ছায়া নটের সভায় এসে, আদর কেন মালকোষে
কর সদা পরজে আপন জ্ঞান ;
এবার সিন্ধুতে ত্রাণ পেলে তবে বাঁচে রে গোবিন্দের মান।

দুস্তর ভবসিন্ধু হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য গোবিন্দচন্দ্রের আর্তির সীমা নাই। এই ভাবধারা তাঁহাকে বৈরাগ্যে দীক্ষিত করিয়াছিল। তাঁহার সাধনার মূলমন্ত্র :

*   *   *   *

কেবল বায়ু বইত নয়, প্রাণের ভরসা কি মন।
নিমিষে মিশে যায় জল-বুদ্‌বুদের মতন॥
অধোমুখে কুশাগ্রে শিশির বিন্দু যতক্ষণ,
ভগ্ন ঘটের বারি যেমন টুটে প্রতিক্ষণ,
উৎপলের দলে জল চঞ্চল যেমন,
তেমনই পলে পলে টলে এ জীবন॥

এইরূপ দার্শনিকতা বা আধ্যাত্মিকতা তাঁহার কবিতার মেরু মজ্জা জোগাইয়াছে। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের যুগে এবং তাহার পূর্বেও আমাদের দেশের নরনারীর পক্ষে ইহা একেবারেই দুর্বোধ্য ছিল না। এখনও বাংলার এই অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য একেবারে লোপ পায় নাই। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিতে পাশ্চাত্ত্য পাঠক বিস্মিত হইলেও আমাদের দেশে ইহার ছন্দ, ইহার ব্যঞ্জনা চিরপুরাতন এবং চিরনূতন। সেই জন্য গোবিন্দচন্দ্রের কবিতা দার্শনিকতা সত্ত্বেও জনপ্রিয় হইতে পারিয়াছিল। রংপুরের খ্যাতনামা জমিদার গোবিন্দলালের অর্থব্যয়ে ১২৯১ সালে তাঁহার 'সদ্‌ভাব সঙ্গীত' প্রকাশিত হইয়াছিল। গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র নিরঞ্জন চৌধুরী কর্ত্তৃক এই গ্রন্থের আরও কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার 'সঙ্গীতপুষ্পাঞ্জলি' নামক আর একখানি কবিতা-গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বোধ হয় সন্দিগ্ধ হৃদয়ে লিখিয়াছিলেন,

দেখিতে গেলে অলসের অদৃষ্টবাদ, চেষ্টাশূন্যের আত্মসমর্পণ, অক্ষমের কর্মপ্রতীক্ষা, পাপীর অযোগ্য প্রার্থনা, নিরুপায়ের অলীক সরলতা, ভীরুর অস্ফুট বলগর্ব, দরিদ্রের অসার বৈরাগ্য—ইহাই কেবল লক্ষিত হইবে। এরূপ দুঃসাহস লোকে ক্ষিপ্ত হৃদয়ের অবৈধ উচ্ছ্বাস বলিয়াই অভিহিত করিবে, তবে ভরসা এই স্থানে স্থানে অমৃত পুরুষের নামামৃত-প্রক্ষেপ আছে; তাই ধৃষ্টতা ও লজ্জার ভ্রূকুটীতে ভীত না হইয়া নিতান্ত আগ্রহের সহিত সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি প্রকাশ করিলাম।

গোবিন্দ যে কর্মচেষ্টারহিত অলসপ্রকৃতির লোক ছিলেন তাহা বোধ হয় না। তিনি স্থানীয় (শেরপুর) জমিদার মুন্‌সী-বাবুদের অধীনে কার্য করিতেন। মুন্‌সী-বাবুরা তাঁহাকে কবিত্ব ও সাধুতার জন্য অত্যন্ত খাতির করিতেন। কিন্তু রামপ্রসাদের মত, গোবিন্দের মনও বিষয়কর্মে আবদ্ধ করিতে পারিল না। জগন্মাতার তবিলদারীর জন্য তাঁহারও প্রাণ ব্যগ্র হইয়া উঠিল। মুন্‌সী-বাবুরা তথাপি তাঁহার ভরণপোষণের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন নাই, এইরূপ শুনিয়াছি। তাঁহার চরিত্রে অসাধারণ তেজ ছিল। এ সম্বন্ধে একটি গল্প যাহা শুনিয়াছি, তাহা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। এক জন ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ ধনশালী ব্যক্তি প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পরে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। তখন তাঁহার ২৫।২৬ বৎসরের পুত্রটি বর্তমান। পুত্রের বিবাহের চেষ্টা না করিয়া তিনি

নিজে বিবাহ করিলেন, এই লজ্জায় পুত্রটি আত্মহত্যা করিল। এই আত্মঘাত গোপন করিয়া পিতা সমারোহে পুত্রের শ্রাদ্ধ করিলেন। সেই সভায় গোবিন্দচন্দ্র সকলকে সম্বোধন করিয়া এই গল্পটি বলেন : এক দিন কামদেব ও যমরাজ শিকারের সন্ধানে পৃথিবী পরিক্রমণ করিতে করিতে এক সরোবর-তীরে মিলিত হইলেন। তখন তাঁহারা আপন আপন পরিচ্ছদ ও তীর-ধনুক তীরে রাখিয়া স্নানার্থ সরোবরে নামিলেন। পরে উঠিয়া নিজ নিজ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আপন গন্তব্য পথের অনুসরণ করিলেন। কিন্তু ভ্রমক্রমে তাঁহাদের তূণের বদল হইল। শেষে যমরাজ এই বৃদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িলেন এবং কামদেব বৃদ্ধের অনিন্দ্যসুন্দরকান্তি যুবাপুত্রকে লক্ষ্য করিলেন। যমের বাণে এই বৃদ্ধ কামমোহিত হইয়া বিবাহ করিয়া বসিলেন এবং কামের বাণে তাহার পুত্র স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিল।

শুনিয়াছি, এই গল্প শুনিয়া সকলেই সে কলুষিত ভবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গল্পটি সত্য হউক বা না-হউক, ইহা হইতে বুঝা যায় যে গোবিন্দচন্দ্রের চরিত্রে দৃঢ়তা ও সত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল।

গোবিন্দচন্দ্রের কবিতায় যথেষ্ট উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কোনও কোনও সঙ্গীত ব্রহ্মসঙ্গীতের মত শোনায়।

ভাব মন তাঁরে যে জন
　　এ ভব কেলিকুঞ্জের কারুকর।
যাঁর নিরমিত গরল অমৃত
　　মৃত জীবিত চরাচর।
যাঁর সৃজন সিন্দূরারুণ
　　সান্ধ্য বিমল দিনকর,
নীরদমুক্ত শরদ চন্দ্রের
　　ক্ষীরোদ ধবল বিনোদকর,
যাঁর সৃজন দামিনী-
　　দামজড়িত শ্যাম জলধর।

গোবিন্দের বীণা কিন্তু মায়ের নামেই সাধা। মায়ের নামে কবি আত্মহারা। কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি তাঁহার মনে তিলমাত্র বিদ্বেষ নাই। গোবিন্দচন্দ্র বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়াছেন :—

ঘাটে হেরিনু নব কৈশোর
　　কে সে শ্যামল লাবণি।

*　　*　　*

ইন্দ্রধনুকতুচ্ছকারী কুসুমগুচ্ছ গাঁথনি
ময়ূরপুচ্ছ খচিত সইরে উচ্চ চূড়ার টালনি।
বিনোদ ভালে নিবিড় অলকা
　　বলাকা মদ বিড়ম্বিনী,
নধর বক্ষে ভৃগু পদাঙ্ক
　　মণি কৌস্তুভ সাজনি। ইত্যাদি

তাঁহার একটি অপ্রকাশিত পদে রাধামাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এ পদটি আমি

পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্যের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। ভাবে ও ভাষায় এই গানটি কবির রচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে :—

অল্পভাগ্যে অবৈরাগ্যে চিনবে কি মন শ্রীরাধায়।
সে নয় সামান্যা রমণী রমণীর শিরোমণি
সুষুম্না চিত্রাণীর মূলে
সুষুপ্তা সাপিণীর প্রায়।
সার্ধ ত্রিবলয়াকারে মূলাধারে পাড়ে ঘুম
যোগে যাগে জাগাইয়ে দেখবে তার লীলার ধূম
কথায় বল্‌লে বুঝ্‌বে কি তা
যা বুঝে না গণেশের পিতা—
তন্ত্র পুরাণ গীতা
যার গুণ বর্ণনায়।
সে যে পরম ব্রহ্মের পরাশক্তি
ধরে রে হ্লাদিনী নাম
ভক্ত চিত্ত বিনোদিনী
অভক্তের প্রতি বাম
সে বিনা আর অন্য জনা
জানে কি কৃষ্ণ ভজনা
জনার্দন জড়িত শুধু তার মায়ায়—
কৃপা করি চিদাগারে কচিৎ প্রকাশ হয় যদি
মানস সরঃ উদ্বেলিয়া বয়ে' যায় অমৃতের নদী
শ্রীমূর্ত্তি-ছটায় তার দীপ্ত করে ত্রিসংসার
যার ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গ ভোলে
অনঙ্গ মুরছা যায়।
সে যে সদ্‌ভাব সখীমণ্ডলে
ঘেরা থাকে অষ্টযাম
কামগন্ধবিহীনা সে
নাশে মায়া মোহদাম
গোপনে গোপ সমাজে জন্ম লয়ে মাঝে মাঝে
রসরাজে মাধুর্য রস বিলায়—
করুণায় গড়া তার সুচির তনুর তনু
কিবা সে রুচির রুচি সুস্থিরা বিজুরি জনু
সে কনক কোকনদ সদা প্রেমে গদগদ
ঢলে পড়ে বিদগধ বিনোদ শ্যামের গায়।

গোবিন্দ বর্ণিতে নারে　　কিঞ্চিৎ স্বরূপ তা:
ব্রহ্মা আদির অগোচর　　শ্রীমূর্ত্তি সে শ্রীরাধার
জটিলা কুটিলা তারে　　চিনিবে রে কি প্রকারে
কেবলি আয়ানের নারী ভাবে তায়—
তেমনি জটিলা প্রকৃতি যত　　অভক্ত আর অসাধকে
সাজায়ে মানসী তমু　　গোপী ভাবে শ্রীরাধাকে
আর রসিক কোকিল যত　　তারা স্বরসালে রত
রসহীন বায়স যত　　নিম্বের আস্বাদ পায় ।

গোবিন্দচন্দ্রের অপ্রকাশিত পদ এখনও হয়ত অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। রংপুর সাহিত্য-পরিষদ্-শাখা এ বিষয়ে একবার যত্নবান্ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়ে। তখন গোবিন্দচন্দ্রের গান অনেক স্থলে প্রচলিত ছিল। যাঁহারা এই গানগুলি মুখে মুখে শিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমেই বিরল হইয়া পড়িতেছে। তাঁহার আর একটি অপ্রকাশিত পদ আমি পাইয়াছি। তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। গানটি সাধন-পথের পথিকদের জন্যই অভিপ্রেত :

পিতার কোনো গুণ পেলাম না আমি।
পিতা পরম যোগী　　নির্বিকার নিরাগী
আমি ঘোর সম্ভোগী　　বিকারগ্রস্ত রোগী
পিতা মোর ত্যাগী　　আমি অনুরাগী
পিতা নিষ্কাম আমি কামী ।
পিতার ভালে চাঁদ　　মোর ভালে কলঙ্ক
পিতা কালের কাল　　কালেই মোর আতঙ্ক
আমার নিজের যে বিত্ত　　তাতেই নাই কর্তৃত্ব
পিতা আমার ভবস্বামী ।
বিশ্বদাহন বহ্নি　　পিতার ভালে জ্বলে
আমার পোড়া কপাল　　স্বীয় কর্মানলে
আমি আত্মবিস্মরিত　　আত্মকর্মফলে
পিতা আমার অন্তর্যামী
কেবল একটি গুণ　　পেয়েছি পিতার
ক্ষুধা পেলে সদা　　করি বিষ আহার
তার ভোগ্য বিষয়　　পিতা মৃত্যুঞ্জয়
আমি মৃত্যুর অনুগামী ।
গোবিন্দ কয় মন　　কেন রে বিবাদ
পিতার গুণ পেতে　　কর যদি সাধ
তেজে বিষয় সাধ　　পিতায় গিয়ে সাধ
দেহপ্রাণ দিয়ে প্রণামী ।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৩)*

শ্রীসজনীকান্ত দাস

চার্ল্স উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্ম্মকার

বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্র ও হরফ-নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে চার্লস উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্ম্মকারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ছাপার হরফের সহিত বাংলা-গদ্যের ক্রমোন্নতির কাহিনী ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, সুতরাং উইলকিন্স-পঞ্চানন প্রসঙ্গ একটু বিস্তৃত করিলে দোষ হইবে না।

পঞ্চাননের জীবন-কাহিনী আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে খুব বেশী নয়। শ্রীরামপুরের মিশনরীদের বিবরণী হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায়, হুগলির নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে তাহার নিবাস ছিল। 'বেঙ্গল পাষ্ট এণ্ড প্রেজেণ্টে' (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯১৬, পৃ. ১৪০)

---

* বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের ইতিহাস রচনা করিতে বসিয়া আমি এখন পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছি, তাহার তিনটি স্থল সম্বন্ধে আরও কিছু বক্তব্য আছে।

১। "মুদ্রিত ইতিহাস" শিরোনামায় (৪৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৪২) লিখিয়াছিলাম, "পদ্মনাভ ঘোষালের কোনও ইতিহাস আমরা দেখি নাই।" 'গৌড়ীয় ভাষা-তত্ত্ব, প্রথম খণ্ড' নামক একখানি পুস্তক সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গ্রন্থকার দুই জন—শ্রীপদ্মনাভ ঘোষাল ও শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পুস্তকটি কলিকাতা পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ১৭৯৭ শকে (১৮৭৫ খ্রীঃ) প্রকাশিত হইয়াছিল। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ।৶+১১৬। এই পুস্তকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ সামান্যই আছে।

২। "বাংলা গদ্যের অন্ধকার যুগ" শিরোনামায় (পৃ. ৪৫) শ্রীজহরলাল বসুর 'বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে'র ২৫ পৃষ্ঠা হইতে প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের নিদর্শন হিসাবে শ্রীরাজা ভারামল্ল রায়ের যে ছাড়পত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা প্রামাণিক নহে। "সন ৭৮৫ সাল" খাঁটি হইতে পারে না, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই মত প্রকাশ করেন। পরে জানিতে পারিয়াছি, তারকেশ্বরের মোহন্তের মামলার আপীলের পেপার-বুকে যে সকল প্রাচীন দলিল উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলি ঐতিহাসিকের নির্ভরযোগ্য নয়।

৩। "১৭৭৮-১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ" শিরোনামায় যে সকল পুস্তকের তালিকা দিয়াছি, কেহ কেহ বলিয়াছেন তাহাতে দুইটি নাম বাদ গিয়াছে। তাঁহারা স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, প্রথম খণ্ডে'র ২১ পৃষ্ঠায় ১৭৯৬ অব্দে প্রকাশিত রামতারক রায় সঙ্কলিত 'সদর দেওয়ানী আইন বিধি' ও রাধারমণ বসু সঙ্কলিত 'নিজামৎ আইন বিধি'র প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কেদারবাবুর এই তালিকা আমি পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলাম। লঙের তালিকায় পুস্তক দুইটির প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৪৬ ও ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ দেওয়া আছে। মজুমদার মহাশয় কোনও ভুলের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার তালিকায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে এই দুইটিকে স্থান দিয়াছেন। রাধারমণ বসু ও রামতারক রায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। প্রথমটিতে ১৭৯৩ হইতে ১৮৪৬ এবং দ্বিতীয়টিতে ১৭৯৫ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আইন মুদ্রিত আছে। সুতরাং ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থ এ দুইটি হইতে পারে না।

উদ্ধৃত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নোট-বইয়ে তাহাকে ত্রিবেণীর লোক বলা হইয়াছে। ১৭৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উইলকিন্স যখন হালহেডের ব্যাকরণের জন্য হুগলিতে ছেনি কাটিয়া বাংলা হরফ প্রস্তুত করিতেছিলেন, তখন পঞ্চানন কর্ম্মকারের সাহায্য গ্রহণ করেন; তাঁহার শিক্ষকতায় পঞ্চানন ছেনিকাটা ও হরফ-ঢালাইয়ের কাজে দক্ষতা লাভ করে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফর্‌ষ্টার-অনূদিত কর্ণওয়ালিস কোড পুস্তক মুদ্রণে যে হরফ ব্যবহৃত হয়, তাহা পঞ্চাননের কৃত এবং উইলকিন্সের হরফ হইতে অনেক বেশী সুন্দর। পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত এই হরফের ব্যবহার ছিল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশনের পত্তন হয়; মুদ্রাযন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারই দুই তিন মাসের মধ্যে দেখি, পঞ্চানন মিশনের ছাপাখানায় অক্ষর-নির্ম্মাণের কাজে নিযুক্ত। ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু পর্য্যন্ত পঞ্চানন মিশনরীদের আশ্রয়ে থাকিয়া একটি নাগরী সাট (ফাউণ্ট) ও অপেক্ষাকৃত ছোট হরফের একটি বাংলা সাট তৈয়ারী করে। ত্রিবেণী-নিবাসী (শম্ভুচন্দ্রের মতে) যুবক মনোহর এই সময়ে প্রথমে পঞ্চাননের সহকারী, পরে জামাতা হইয়াছিল। মনোহর দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া (১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) ভারতবর্ষের প্রায় পনরটি প্রাদেশিক ভাষার এবং চীনা ভাষার হরফ প্রস্তুত করিয়া যশস্বী হইয়াছিল। তাহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রীও এই কার্য্যে খ্যাতিলাভ করে। বস্তুতঃ পঞ্চাননকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীরামপুরে একটি হরফ-কারখানা (টাইপ-ফাউণ্ড্রি) গড়িয়া উঠে। কেরীর জীবনীকার জর্জ স্মিথ লিখিয়াছেন, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রাচ্য ভূখণ্ডে এমন কারখানা আর দ্বিতীয় ছিল না। শম্ভুচন্দ্র তাঁহার নোট-বইয়ে পঞ্চাননের দখল লইয়া কেরী ও কোলব্রুকের মধ্যে বিবাদের এক কৌতুককর বিবরণ দিয়াছেন।

চার্লস উইলকিন্স ১৭৫০ (১৭৪৯?) খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সমারসেটশায়ারের ফ্রোম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা বিখ্যাত এনগ্রেভার রবার্ট বেটম্যান রে (Robert Bateman Wray)র সহিত সম্পর্কিতা (niece) ছিলেন। পিতা ওয়াল্টার উইলকিন্স। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিবিল সার্বিসে প্রবেশ করিয়া রাইটার রূপে বাংলা দেশে আগমন করেন। কলিকাতায় সেক্রেটরির আফিসে দুই বৎসর কাজ করিয়া তিনি মালদহে কোম্পানীর কুঠিতে সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে প্রেরিত হন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা তখন পর্য্যন্ত এদেশের ভাষা ও সাহিত্য শিখিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন না; দোভাষীর সাহায্যে ব্যবসায়ের কাজ চলিত; রীতিমত রাজ্যশাসনের দায়িত্বও তখন পর্য্যন্ত কোম্পানী গ্রহণ করেন নাই। দূরদর্শী উইলকিন্সই সর্ব্বপ্রথম এ-দেশের সহিত ভাষা-ও-সাহিত্যগত আত্মীয়তা গড়িয়া তোলার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে বাংলা ও ফার্সী শিখিতে আরম্ভ করেন। অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশক্তি বলে এই দুইটি ভাষা আয়ত্ত করিতে তাঁহার বেশী দিন লাগে নাই। তিনি অবিলম্বে বুঝিতে পারিলেন, ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য ও ঐতিহ্য এই সকল সাধারণ-ব্যবহৃত অপরিপুষ্ট প্রাকৃত ভাষার মধ্যে নয়, সুতরাং ভাষা ও সাহিত্যের আকর সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়া ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষার একটি ছোট ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। সত্য বটে, জেণ্টু কোড ও বাংলা ব্যাকরণ প্রণেতা নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড উইলকিন্সের পূর্ব্বেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং উইলকিন্স একথা তাঁহার ব্যাকরণের ভূমিকায় স্বীকারও করিয়াছেন। কিন্তু হালহেডের সংস্কৃতজ্ঞান মোটেই গভীর ছিল না। উইলকিন্স সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত মহাভারতের অপূর্ব্ব অনুবাদ এই জ্ঞানের ফল।

ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল বহুনিন্দিত ওয়ারেন হেষ্টিংসের কথা এখানে কিছু বলা আবশ্যক। তাঁহার রাষ্ট্র-জীবন যাহাই হউক, এ-দেশের ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষার উন্নতি কল্পে তিনি যে পরিমাণ উদার ও সহৃদয় দৃষ্টি দিয়াছিলেন, নিতান্ত অকৃতজ্ঞ না হইলে আমরা চিরদিন তাহা স্মরণ করিব। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারের দিকে আকর্ষণ করেন। নিজের শিক্ষাদীক্ষা যাহাই হউক, তাঁহার দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। জয়গর্ব্বিত ইংরেজকে বিজিত জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তিনিই সর্ব্বপ্রথম শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়া তোলেন। তাঁহারই চেষ্টায় এ-দেশের সংস্কৃত ব্যবহার-শাস্ত্র ও রাষ্ট্রনীতি বিখ্যাত পণ্ডিতদের দ্বারা সঙ্কলিত হইয়া ফার্সী অনুবাদের মধ্য দিয়া হালহেড কর্তৃক 'জেণ্টু কোডে' রক্ষিত হয়। তিনিই উইলকিন্সকে দিয়া বাংলা হরফ প্রস্তুত করাইয়া হালহেডের বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত করান ; * কলিকাতা মাদ্রাসা তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্ত্তী কালে সার্ উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক, অধ্যাপক উইলসন প্রভৃতি ব্যক্তিগত চেষ্টা ও এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্যে এ দেশের সংস্কৃতি-বিস্তারে যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার অনেকখানি কৃতিত্ব ওয়ারেন হেষ্টিংসের।

উইলকিন্সের মহাভারত-অনুবাদও হেষ্টিংসের উৎসাহের ফল। হেষ্টিংস স্বয়ং এই অনুবাদের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-অংশ ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে বারাণসী হইতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তদানীন্তন চেয়ারম্যান নাথানিয়েল স্মিথের নিকট প্রেরণ করিয়া কোম্পানীর ব্যয়ে তাহা মুদ্রণ ও বিতরণ করিতে অনুরোধ করেন। বাংলা-গদ্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত না হইলেও হেষ্টিংস ও চার্লস উইলকিন্সকে বুঝিবার জন্য এই প্রসঙ্গে লিখিত হেষ্টিংসের ঐতিহাসিক পত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। মনে রাখিতে হইবে, ইউরোপে ভারতীয় জ্ঞানবিস্তারের ইহাই সূত্রপাত। হেষ্টিংস লিখিতেছেন—

Might I, an unlettered man, venture to prescribe bounds to the latitude of criticism, I should exclude, in estimating the merit of such a production, all rules drawn from the ancient or modern literature of Europe, all references to such sentiments or manners as are become the standards of propriety for opinion and action in our own modes of life, and equally all appeals to our revealed tenets of religion, and moral duty. I should exclude them, as by no means applicable to the language, sentiments, manners, or morality appertaining to a system of society with which we have been for ages unconnected, and

---

* "১৭৭৮ খ্রীঃ মিঃ এণ্ড্রুস নামক জনৈক ইংরেজ, হুগলী সহরে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।...মিঃ হলহেড সাহেব সর্ব্বপ্রথমে 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া সেই

জন টমাস

(এস, মেড্‌লী-অঙ্কিত চিত্র হইতে
এন, ব্র্যানহোয়াইট-কৃত ষ্টিল এন্‌গ্রেভিং)
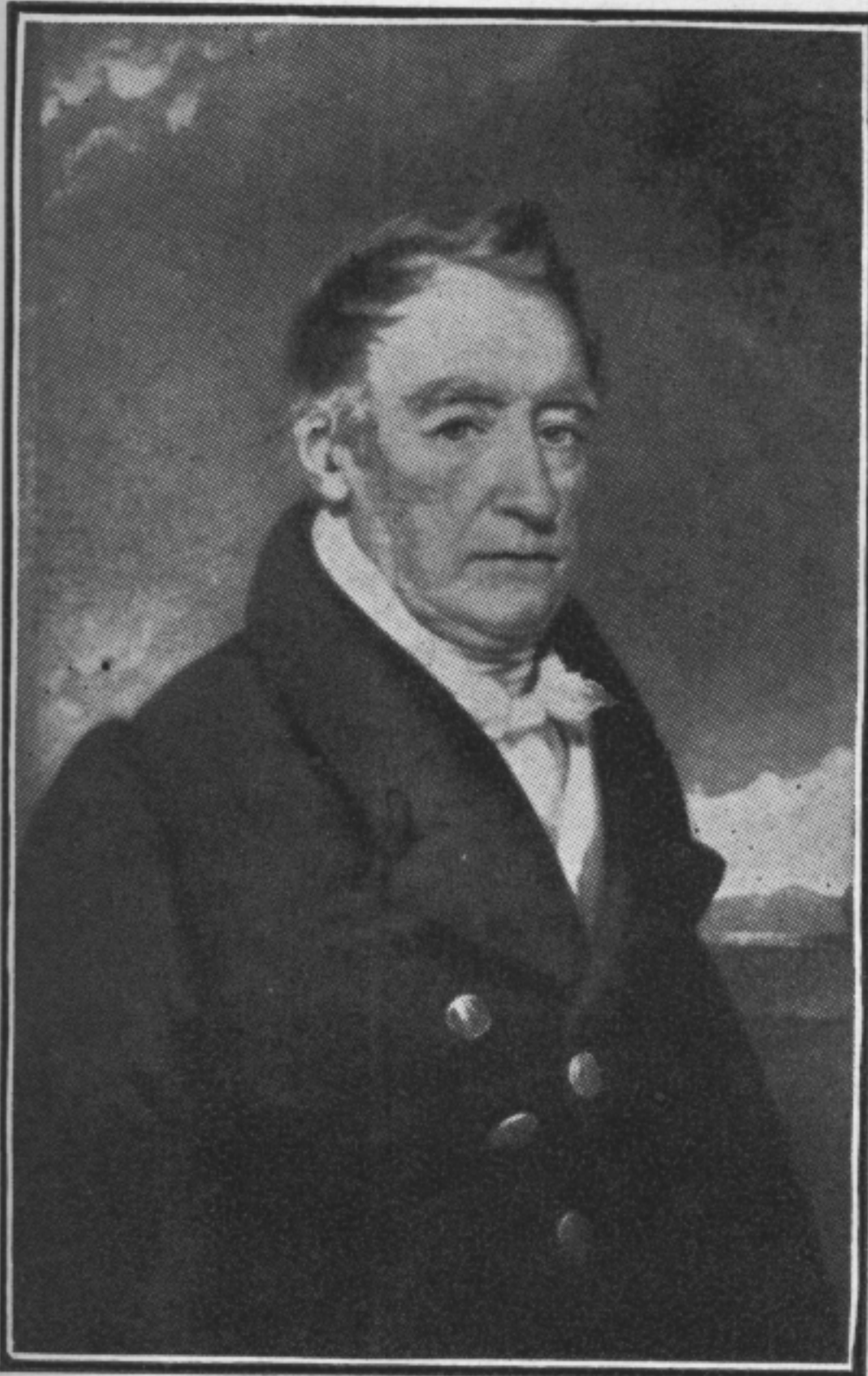
চার্লস উইলকিন্স

(জে, জি, মিড্‌লটন-অঙ্কিত
চিত্র হইতে জে, সার্টেন-কৃত এনগ্রেভিং)

উইলিয়ম ওয়ার্ড

of an antiquity preceding even the first efforts of civilization in our own quarter of the globe, which, in respect to the general diffusion and common participation of arts and sciences, may be now considered as one community . . . . .

Many passages will be found obscure, many will seem reduntant; others will be found clothed with ornaments of fancy unsuited to our taste, and some elevated to a track of sublimity into which our habits of judgment will find it difficult to pursue them; but few which will shock either our religious faith or moral sentiments . . . . the last sentence with which Kreeshna closes his instruction to Arjoon, and which is properly the conclusion of the Geeta: "Hath what I have been speaking, O Arjoon, been heard *with thy mind fixed to one point?* Is the *distraction* of thought, which arose from thy ignorance, removed?"

To those who have never been accustomed to this separation of the mind from the notices of the senses, it may not be easy to conceive by what means such a power is to be attained; since even the most studious men of our hemisphere will find it difficult so to restrain their attention but that it will wander to some object of present sense or recollection; and even the buzzing of a fly will sometimes have the power to disturb it. But if we are told that there have been men who were successively, for ages past, in the daily habit of abstracted contemplation, begun in the earliest period of youth, and continued in many to the maturity of age, each adding some portion of knowledge to the store accumulated by his predecessors; it is not assuming too much to conclude, that, as the mind ever gathers strength, like the body, by exercise, so in such an exercise it may in each have acquired the faculty to which they aspired, and that their collective studies may have led them to the discovery of new tracks and combinations of sentiment, totally different from the doctrines with which the learned of other nations are acquainted: doctrines, which however speculative and subtle, still, as they possess the advantage of being derived from a source so free from every adventitious mixture, may be equally founded in truth with the most simple of our own . . . . . I hesitate not to pronounce the Geeta a performance of great originality; of a sublimity of conception, reasoning, and diction, almost unequalled . . . . .

It now remains to say something of the Translator, Mr. Charles Wilkins. This Gentleman, to whose ingenuity, unaided by models for imitation, and by artists for his direction, your government is indebted for its printing-office, and for many official purposes to which it has been profitably applied, with an extent unknown in Europe, has united to an early and successful attainment of the Persian and Bengal languages, the study of the Sanskreet. To this he devoted himself with a perseverance of which there are few examples, and with a success which encouraged him to undertake the translation of the Mahabharat . . . . . he has at this time translated more than a third; . . . . . he has rendered it with great accuracy and fidelity . . . . . .

I have always regarded the encouragement of every species of useful diligence, in the servants of the Company, as a duty appertaining to my office; and have severely regretted that I have possessed such scanty means of exercising it . . . . .

Nor is the cultivation of language and science, for such are the studies to which I allude, useful only in forming the moral character and habits of the service. *Every accumulation of knowledge, and especially such as is obtained by social communication with people over whom we exercise a dominion founded on the right of conquest, is useful to the state*: *it is the gain of humanity*: in the specific instance which I have stated, it attracts and conciliates distant affections; it lessens the weight of the chain by which the natives are held in subjection; and it imprints on the hearts of our own

is greatly wanting. It is not very long since the inhabitants of India were considered by many, as creatures scarce elevated above the degree of savage life; nor, I fear, is that prejudice yet wholly eradicated, though surely abated. Every instance which brings their real character home to observation will impress us with a more generous sense of feeling for their natural rights, and teach us to estimate them by the measure of our own. But such instances can only be obtained in their writings : *and these will survive when the British dominion in India shall have long ceased to exist,* and when the sources which it once yielded of wealth and power are lost to remembrance . . . . .

I have seen an extract from a foreign work of great literary credit, in which my name is mentioned, with very undeserved applause, for an attempt to introduce the knowledge of Hindoo literature into the European world, by forcing or corrupting the religious consciences of the Pundits, or professors of their sacred doctrines. This reflexion was produced by the publication of Mr. Halhed's translation of the Poottee, or code of Hindoo laws; and is totally devoid of foundation. . . . . . It was contributed both cheerfully and gratuitously, by men of the most respectable characters for sanctity and learning in Bengal, who refused to accept more than the moderate daily subsistence of one rupee each, during the term that they were employed on the compilation; nor will it much redound to my credit, when I add, that they have yet received no other reward for their meritorious labors. Very natural causes may be ascribed for their reluctance to communicate the mysteries of their learning to strangers, as those to whom they have been for some centuries in subjection, never enquired into them, but to turn their religion into derision, or deduce from them arguments to support the intolerant principles of their own . . . . .

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির মধ্যে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রথম গবেষণার প্ররোচনা লুকায়িত আছে। এ বিষয়ে ওয়ারেন হেষ্টিংসের কীর্ত্তি কাহারও অপেক্ষা কম নয়।

হেষ্টিংসের সুপারিশে উইলকিন্স-অনূদিত *The Bhagvat-Geeta, or Dialogues of Kreeshna and Arjoon* কোম্পানীর ব্যয়ে বিলাতে মুদ্রিত হইয়া ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মে প্রকাশিত হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের নামে উৎসর্গপত্রে উইলকিন্স বলেন,

The world, Sir, is so well acquainted with your boundless patronage in general, and of the personal encouragement you have constantly given to my fell-servants in particular, to render themselves more capable of performing their duty in the various branches of commerce, revenue, and policy, by the study of the languages, with the laws and customs of the natives, that it must deem the first fruit of every genius you have raised a tribute justly due to the source from which it sprang.

এই গীতাই ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক ভারতীয় কাব্যগ্রন্থের সর্ব্বপ্রথম অনুবাদ।

"The effect which this little work, of only 156 pages, including notes, produced upon the literary public in England and throughout Europe, was electrical. All hailed its appearance as the dawn of that brilliant light, which has subsequently shone with so much lustre in the productions of Sir William Jones, Mr. Colebrooke, Professor Wilson, etc., and which has dispelled the darkness in which the pedantry of Greek and Hebrew Scholars had involved the etymology of the languages of Europe and Asia." *The Asiatic Journal,* July 1836, p. 166.

এই অধ্যায় এমন বিস্তৃতভাবে লিখিবার কারণ এই যে, হেষ্টিংস-হালহেড-উইলকিন্স-

জোন্স-সম্প্রদায় ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের সংস্কৃতিগত ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত করিলেও নিজেরা শুধু দিতে ও শিখাইতে আসেন নাই; শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে ও শিখিতে আসিয়াছিলেন। একটা বর্ব্বর অসভ্য জাতিকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইবার দম্ভ তাঁহাদের ছিল না; তাঁহারা সশ্রদ্ধ অন্তঃকরণে বিনীতভাবে আত্মীয় হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে যে মিশনরী সম্প্রদায়ের কল্যাণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাঁহারা বিপরীত মনোভাব লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন; ধর্ম্মহীনকে ধর্ম্ম শিখাইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ-প্রচারের প্রয়োজন আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রয়োজন সাধন করিয়াছে, শাপে বর হইয়াছে। ইঁহাদের নামও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবার কালে আমরা যেন তাঁহাদের পূর্ব্বগামীদের অপরূপ সহৃদয়তা ও মহাপ্রাণতার কথা বিস্মৃত না হই।

বঙ্গদেশে অবস্থানকালে উইলকিন্স প্রাচ্য ভাষায় গ্রন্থমুদ্রণ-সমস্যা দূর করিতে চেষ্টিত হন, ফলে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলা হরফ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য নাগরী হরফও প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এই সময়ে তিনি যে ফার্সী হরফ তৈয়ারী করেন, তাহা অনেক পরে ছাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উইলকিন্সকে ভারতের ক্যাক্সটন বলিলে অন্যায় হইবে না।

সার্ উইলিয়ম জোন্স সুপ্রীম কোর্টের বিচারকরূপে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আসেন। উইলকিন্সের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি দীর্ঘকাল পরে আবার প্রাচ্য ভাষার চর্চ্চা সুরু করেন। উইলকিন্স এই সময়ে মনুস্মৃতির দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম চার অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। জোন্স উৎসাহিত হইয়া মনু-অনুবাদের ভার নিজে লইতে চাহেন, উইলকিন্স আশ্চর্য্য উদারতার সহিত স্বকৃত অনুবাদ সহ অনুবাদের দায়িত্ব জোন্সকে অর্পণ করেন। ইহার ফলেই জোন্সের *Institutes of Hindu Law*। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহারা উভয়ে মিলিয়া এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করেন।

দীর্ঘ ১৬ বৎসর কাল এদেশে থাকিয়া উইলকিন্সের স্বাস্থ্যহানি ঘটে; তিনি স্বাস্থ্য-কামনায় ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও বাথে (Bath) অবস্থান করেন। এখান হইতেই ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Fables of Pilpay বা সংস্কৃত হিতোপদেশের অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরে তিনি কেন্টে একটি বাড়ী খরিদ করিয়া সেখানেই বসবাস করিতে থাকেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অগ্নিদাহে এই গৃহ ভস্মীভূত হয়। ইহাতে তাঁহার পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের আংশিক ক্ষতি হয়, কিন্তু স্বহস্তনির্ম্মিত হরফ, পাঞ্চ ও ম্যাট্রিক্স্গুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে উইলকিন্স ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি এই কাজেই নিয়োজিত ছিলেন। ১৮০৫ সালে ভারতীয় সিভিলিয়ানদের জন্য হেলিবেরিতে

কলেজ স্থাপিত হইলে উইলকিন্স তাহার প্রাচ্য বিভাগের দর্শক নিযুক্ত হন। এই সময়ের মধ্যে (১৮০০-৩৬) তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সঙ্কলন বা সম্পাদন করিয়াছিলেন—

Richardson's *Persian, Arabic and English Dictionary*, new edition Vol. I, 1806.
Richardson's *Persian, Arabic and English Dictionary*, new edition Vol. II, 1810.
Sanskrit Grammar, 1808.
Radicals of the Sanskrit Language,* 1815.
Dushmanta and *Sakoontala* (Dalrymple's Oriental Repertory).
Translation of the *Mahabharata* (A portion, in the Annals of Oriental Literature).

এতদ্ব্যতীত *Asiatick Researches*-এর কয়েক সংখ্যায় তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল।

উইলকিন্স রয়াল সোসাইটির ফেলো হইয়াছিলেন। ইনষ্টিটিউট অব ফ্রান্সও তাঁহাকে এক জন "ফরেন অ্যাসোসিয়েট" নির্ব্বাচিত করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নাইটহুড প্রাপ্ত হন।

চার্লস উইলকিন্স সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃততর বিবরণ চান, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ পড়িতে বলি—

(1) *The Library of the India Office* by A. J. Arberry (1938), pp. 13-56
(2) *The Asiatic Journal* for July, 1836, pp. 165-70. "Sir Charles Wilkins."

এই প্রবন্ধে রচয়িতার নাম না থাকিলেও ইহা বিখ্যাত প্রাচ্য-ভাষাবিৎ সার্ গ্রেভস চামনি হটনের রচনা বলিয়া জানা যায়।

জন টমাস

"খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করা যদিও ঐ সাহেবদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের দ্বারা বাঙ্গালাভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যেরূপ চৈতন্যসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বাঙ্গালাপদ্যরচনার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইরূপ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাদরী সাহেবদিগের দ্বারাই বাঙ্গালাগদ্যরচনা সমধিক অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।"—রামগতি ন্যায়রত্ন, 'বাঙ্গালাভাষা ও বাংলাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব,' ১ম সংস্করণ, সংবৎ ১৯৩০, পৃ. ২০২।

এই সাহেবদিগের অগ্রণী ছিলেন জন টমাস। ইনিই বঙ্গদেশে প্রথম ব্যাপটিষ্ট পাদরি। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পোর্ত্তুগীজ রোমান কাথলিকদের ধর্ম্ম-প্রচারের উৎসাহে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছিল, পূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। পলাশী-যুদ্ধের পূর্ব্বেই পোর্ত্তুগীজ প্রভাব সম্পূর্ণ হ্রাস পাইয়াছিল, বর্ব্বর 'নেটিব'-দিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য নূতন কোন পাদরি-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে নাই। পলাশী-যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ ট্রাঙ্কেবার মিশনের ডেনিশ পাদরি

---

* A fragment of a Sanskrit vocabulary by Wilkins is preserved in MSS. Eur. D. 130 (India office).

কিয়ারনাণ্ডারকে বাংলা দেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য আনাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কিয়ারনাণ্ডারের সহিত দেশীয় সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিশেষ যোগ ছিল না, তিনি মূলতঃ পোর্ত্তুগীজ, আর্মেনিয়ান ও ফিরিঙ্গিদের মধ্যে ধর্ম্ম ও শিক্ষা বিতরণ করিতেন। কলিকাতা মিশন স্কুল ও মিশন চার্চের প্রতিষ্ঠাতা কিয়ারনাণ্ডার যদিও ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, ধর্মযাজক হিসাবে জীবনের শেষ কুড়ি বৎসর তাঁহার প্রতিষ্ঠা প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল, তিনি ব্যক্তিগত নানা দৌর্ব্বল্যদোষে চরম দারিদ্র্যদশায় পতিত হন ও নানা লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া কলিকাতা হইতে ব্যাণ্ডেলে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন।

এই সময়ে কলিকাতায় চার্লস গ্রান্টের বিশেষ প্রতিপত্তি। তিনি ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক বিভাগে চাকুরি লইয়া সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে আগমন করেন, কিন্তু শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। পুনরায় ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেঙ্গল এষ্টাব্লিশমেণ্টের এক জন রাইটাররূপে বাংলা দেশে আসেন এবং ধীরে ধীরে উন্নতি করিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের চেয়ারম্যান হন। পর পর কয়েকটি পারিবারিক দুর্ঘটনায় এই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির শোকার্ত্ত মন ধর্ম্মের আশ্রয়ের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে, কলিকাতায় ইংরেজ-সমাজে খ্রীষ্টমহিমা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি চেষ্টিত হন। দেনার দায়ে যখন কিয়ারনাণ্ডারের সম্পত্তি নিলামে উঠে, চার্লস গ্রান্ট দশ হাজার টাকা দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। গ্রান্টের সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী, শাশুড়ী মিসেস্ ফ্রেজার ও ভগিনী থাকিতেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে তখন চেম্বার্স ভ্রাতৃদ্বয়ের (উইলিয়ম ও রবার্ট) বিশেষ প্রতিপত্তি। উইলিয়ম চেম্বার্স গ্রান্টের ভগিনীকে বিবাহ করেন। ডেবিড ব্রাউন ও জর্জ উড্‌নি প্রভৃতিও এই গ্রান্ট-গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রান্ট কোম্পানীর মালদহের কুঠির কমার্সিয়াল-রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। গ্রান্ট যখন মালদহ হইতে পুনরায় কলিকাতায় আসেন তখন জর্জ উড্‌নিকে তাঁহার পদে বাহাল করা হয়। এই জর্জ উড্‌নির সহিত বাংলা সাহিত্যের পরোক্ষ যোগ আছে। তাঁহারই চেষ্টায় জন টমাস ও উইলিয়ম কেরী পরে যথাক্রমে মহীপালদীঘি ও মদনাবতীর কুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

গ্রান্টের ভগিনীপতি উইলিয়ম চেম্বার্স সুপ্রীম কোর্টের ফার্সী ইণ্টারপ্রিটার বা দোভাষী ছিলেন, ফার্সী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্যলেখক রামরাম বসু উইলিয়ম চেম্বার্সের মুন্‌শী ছিলেন। চেম্বার্স নিউ টেষ্টামেণ্টের ফার্সী অনুবাদ করিতে মনস্থ করেন। কথা ছিল, রামরাম বসু ফার্সী হইতে বাংলায় অনুবাদ করিবেন। চেম্বার্সের মতলব কিন্তু কার্য্যে পরিণত হয় নাই। দীর্ঘ সাত বৎসরের চেষ্টায় সেণ্ট ম্যাথুর ১৩ অধ্যায় মাত্র অনূদিত হইয়াছিল। এই অনুবাদের কিয়দংশ গ্যাডউইনের 'পার্সিয়ান মুন্‌শী' পুস্তকের শেষে মুদ্রিত হইয়াছিল।

জন টমাস ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে পদার্পণ করেন। ইংলণ্ডের গ্রন্থারশায়ারের

ফেয়ারফোর্ডে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার আত্মজীবনীতে আছে—

My father is deacon of a Baptist Church at *Fairford*, in *Gloucestershire.* He trained me up in the nurture and admonition of the Lord; but I proved for a long time a hopeless child. Very sharp convictions were often felt and repeatedly stifled, till it pleased God to make my sins a heavy burden to me, in the year 1781. I had lately married and my nights and days were dreadful both to me and my wife......At the time mentioned I was settled in Great Newport-street, in the practice of Surgery and Midwifery: but finding the world more ready to receive credit than give it, I was obliged to sell all, and wait in lodgings, till an offer was made me of going to sea: and in the year 1783, I sailed in capacity of *Surgeon* of the *Oxford* Indiaman to Bengal. On my arrival at Calcutta, I sought for religious people, but found none.

ধর্ম্ম ও নীতি-বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া কলিকাতার ইংরেজ সমাজ তখন সাতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত; স্ত্রীলোক, ডুয়েল, মদ ও জুয়ার মোহে তাঁহারা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য; দেনার দায়ে দেশীয় পোদ্দার ও ধনীদের নিকট তাঁহাদের টিকি বাঁধা। ফলে তাঁহারা কালীঘাটে পূজা দিতেছেন ও হিন্দু পূজাপার্ব্বণে অবাধে যোগদান করিতেছেন। ভগবান ও ডেভিলের নাম একই নিশ্বাসে উচ্চারণ করিয়া কথায় কথায় বাজি রাখিতে ও কটূক্তি করিতে তাঁহারা দ্বিধা করেন না। মর্ম্মাহত টমাস ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করিলেন—

RELIGIOUS SOCIETY.

"A plan is now forming for the more effectually spreading the knowledge of Jesus Christ, and His glorious Gospel, in and about *Bengal*: any serious persons of any denomination, rich or poor, high or low, who would heartily approve of, join in, or gladly forward such an undertaking, are hereby invited to give a small testimony of their inclination, that they may enjoy the satisfaction of forming a communion, the most useful, the most comfortable, and the most exalted, in the world. Direct for A. B. C. to be left with the Editor."

পরদিন টমাস এই বিজ্ঞাপনের দুইটি জবাব পান। একটির লেখক কলিকাতা প্রেসিডেন্সী চার্চের তৎকালীন চ্যাপলেন রেভারেণ্ড ডব্লিউ. জনসন, অপরটি বেনামী। পরে জানা যায় উইলিয়াম চেম্বার্স ইহা লিখিয়াছিলেন। চেম্বার্সের জবাবটি এইরূপ—

"If A. B. C. will open a subscription for a translation of the New Testament into the *Persian* and *Moorish languages* (under the direction of proper persons), he will meet with every assistance he can desire, and a competent number of subscribers to defray the expense."

প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশে ব্যাপটিষ্ট মিশনের বীজ তখনই উপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু অঙ্কুরোদ্গম হয় নাই। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ তারিখে আর্ল অব অক্সফোর্ড জাহাজ-যোগেই টমাস স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তিনি মালদহের রেসিডেন্ট চার্লস গ্রাণ্টের অসাধারণ ধর্ম্মপ্রীতির কথা শুনিয়া যান। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ আর্ল অব অক্সফোর্ড জাহাজ পুনরায় ভারতবর্ষের দিকে রওয়ানা হয়, টমাস সেই জাহাজেই ফিরিয়া আসেন ও ১৪ই জুলাই

তারিখে বাংলা দেশে পৌঁছান। অক্সফোর্ড জাহাজের চাকুরি তিনি তখনও ছাড়েন নাই। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি 'A Word of Comfort and Encouragement to the Poor Afflicted People of God' নামক একটি পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। সেই বৎসরেই কিয়ারনাণ্ডারের সম্পূর্ণ পতন হইয়াছে, রেভারেণ্ড ডেবিড ব্রাউন কলিকাতা অরফ্যান স্কুলের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। টমাস এই সময়েই জর্জ উড্নি, উইলিয়াম চেম্বার্স প্রভৃতি গ্রাণ্টের ধর্ম্মপ্রাণ আত্মীয়দের সহিত পরিচিত হন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া ডেবিড ব্রাউনের যাজকতা শুনিতে যাইতেন এবং মাঝে মাঝে নিজেরাও উপাসনা করিতে বসিতেন। ঠিক এই সময়ে চার্লস গ্রাণ্ট মালদহ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসাতে ইঁহাদের শক্তি ও দল বৃদ্ধি হয়। গ্রাণ্টের বাড়ীতেই প্রত্যহ সন্ধ্যায় ইঁহারা মিলিত হইতেন। চার্লস গ্রাণ্ট টমাসকে জাহাজের চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া এদেশে বসবাস করিতে এবং বাংলা ভাষা শিখিয়া হিন্দুদের মধ্যে 'গসপেল' প্রচার করিতে অনুরোধ করিলেন। এ-দেশের জলবায়ু টমাসের মোটেই সহ্য হইত না, তাছাড়া জাহাজের কাজ পরিত্যাগ করারও বাধা ছিল। তথাপি তিনি কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের চিন্তায় তিন চার সপ্তাহ নিদারুণ উদ্বেগের মধ্যে কাটাইয়া শেষ পর্য্যন্ত ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অক্সফোর্ড জাহাজের চিকিৎসকের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে ভগবানের কাজে আত্মসমর্পণ করিলেন।* ডাক্তার জন টমাস পাদ্রি টমাস হইলেন।

টমাস ও রামরাম বসু

নূতন কাজের গোড়াতেই টমাস বাংলা ভাষা এবং দেশীয় লোকের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। সাধারণ লোকের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার শেখাও আবশ্যক হইল। কিন্তু ভাষার বাধাই প্রধান। চার্লস গ্রাণ্ট ঠিক করিলেন, কিছু পরিমাণ ভাষা শিখিয়াই টমাস মালদহে কালা আদ্‌মিদের মধ্যে প্রচার-কার্য্য চালাইবেন।† হালহেডের বাংলা ব্যাকরণ এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া টমাস শিক্ষা সুরু করিলেন। কিন্তু কাজ কিছুই অগ্রসর হইল না। টমাস বুঝিতে পারিলেন, গুরু ছাড়া ভাষা শিক্ষা অসম্ভব। তিনি চার্লস গ্রাণ্টকে জানাইলেন। গ্রাণ্ট ভগিনীপতি উইলিয়ম

---

* "....after a few weeks I became greatly concerned at heart for the condition of these perishing multitude of Pagans, in the darkness; and was inflamed with fervent desires to go and declare the glory of Christ among them. Waters enough have risen since to damp, but will never utterly extinguish what was lighted up at that time. After much prayer and many tears, I gave myself up to this work, and the Lord removed difficulties out of the way......" *Periodical Accounts Relative to the Baptist Missionary Society*, Vol. I. p. 18.

† ". . . to teach to the black fellows at Malda." *The Life of John Thomas* by C. B. Lewis. p. 64.

চেম্বার্সের শরণাপন্ন হইলেন। চেম্বার্সের কাছে থাকিয়া তাঁহার মুন্‌শী রামরাম বসু তত দিনে ইংরেজী বলিতে কহিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু লিখিতে পড়িতে শিখেন নাই। মহত্তর উদ্দেশ্যে চেম্বার্স নিজের মুন্‌শীকেই দান করিলেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ তারিখে জন টমাস ও রামরাম বসুর যোগাযোগ ঘটিল। আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভিত্তিপত্তন হইল।†

কলিকাতায় তিন মাস মুন্‌শী রামরাম বসুর নিকট বাংলা ভাষা ও হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে গুরুশিষ্য উভয়েই মালদহ পৌঁছিলেন। চার্লস গ্রান্টের স্থলে জর্জ উড্‌নি তখন মালদহ কুঠির কমার্সিয়াল-রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। টমাস ও মুন্‌শী উড্‌নির আশ্রয়ে মালদহে বসবাস করিতে লাগিলেন। বৎসর কালের মধ্যে টমাস বাংলা যাহা শিখিলেন, তাহার একটিমাত্র পংক্তির নমুনা আমরা পাইয়াছি—

> সোনার মাহিনা মির্ত্তু কিন্তু খোদার দিয়া চির প্রমাই জিজস্ ক্রাইষ্ট হইতে। এই মির্ত্তু এখন অবশ্, তখন [এপ্রিল, ১৭৮৮]†

টমাস অবশ্য এই কালের মধ্যে রামরাম বসুর সাহায্যে ম্যাথু, মার্ক, জেম্‌স প্রভৃতির গস্‌পেল বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন; পরবর্ত্তী কালের কেরীর অনুবাদের মধ্যে সেগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, এখন চিনিয়া বাহির করিবার উপায় নাই।

এ দেশের শাস্ত্র ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে টমাস যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের ভাষাতেই উদ্ধৃত করিতেছি—

"There are four *Shusters*, or laws, among the Hindus, which they call the Vedas; these they hold in the highest esteem, and say it is unlawful for any man to read or hear them read, except he is a *Bramin*. The Vedas are said to have been written many millions of years ago, which however, is easily disproved by other books and writings in use among themselves. These Vedas are written in *Sanscrit*, which may be called the Latin of the East, and they are the fountain of all their books of theology, as the Koran among the Moors, and the Bible among us. There are eighteen sacred books called *Poorans*, which are all commentaries on the Vedas: and it is the custom of all the *Bramins* to learn a great part of these by heart, and they are very apt and clever in quoting portions of them in conversation: this they find the more easy to them, as all their books are written in verse.....Some of these books hold up for their veneration characters which are very profligate, and contain dreadful doctrines, evidently of an infernal origin, which have a strange effect on their minds and manners....But I can truly say, whenever I have been conversing or preaching among them, I have invariably found them willing to hear, and that they always behave with great decency and respect. I trust also that the door of faith is opened to the Hindoos......"

—Rippon's Baptist Register, No. V.

বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং হিন্দুজাতি সম্পর্কে অন্যত্র টমাস বলিতেছেন—

"As to the learning of the language, it is a work attended with difficulties, but when the wholetime is devoted to it, three or four months will bring a man through the
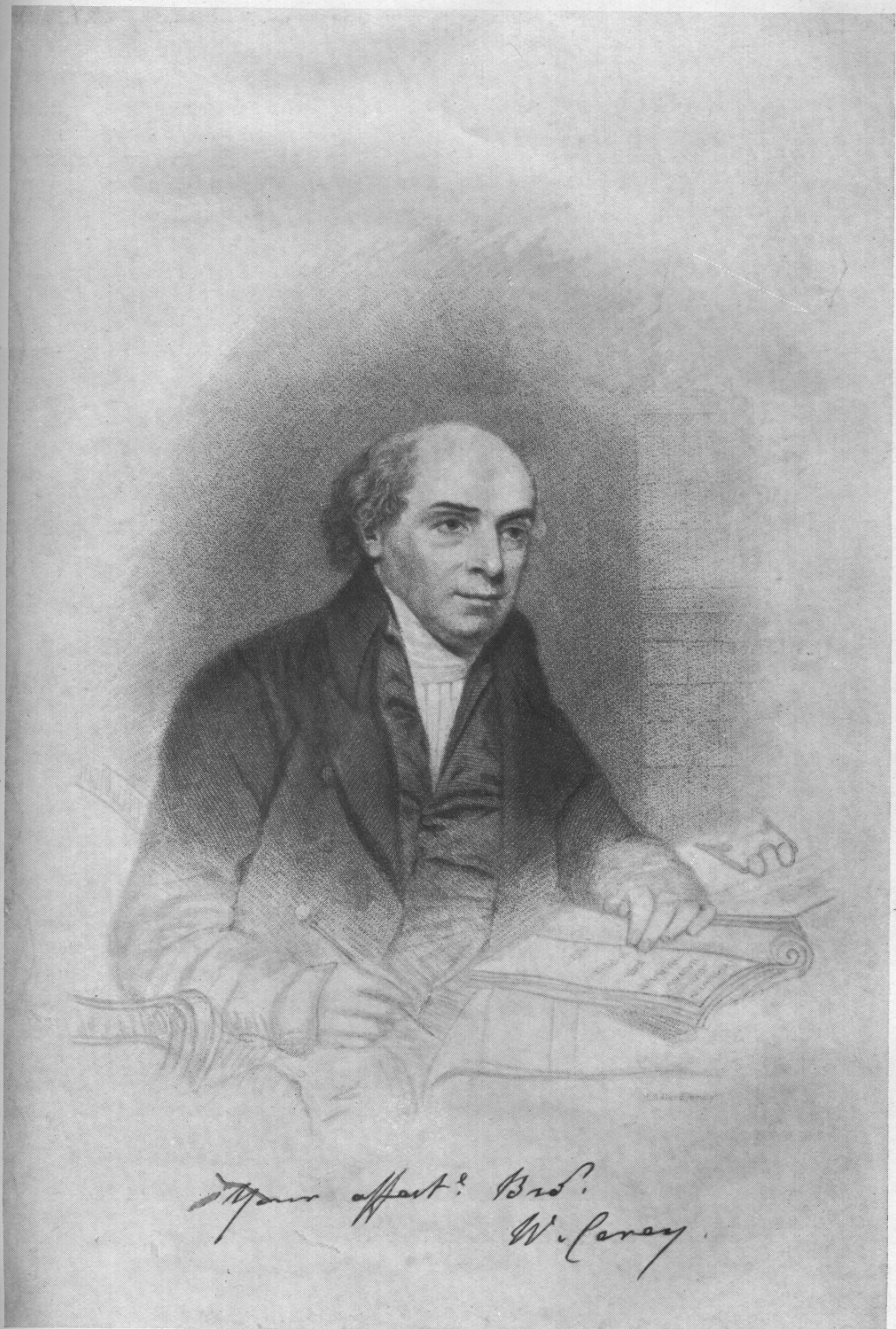
উইলিয়ম কেরী

greatest of them; and he will begin to converse with the natives, with great amusement and pleasure to himself, and profit to them. And as to the barbarity of these people, it is not with them as it is with other Pagans, of whom we have read and heard: for the Hindoos are certainly distinguished from all people on the face of the earth, for their harmless and inoffensive behaviour; and the province of *Bengal*, and its inhabitants, are proverbially distinguished from all other parts of *India*, for their gentleness of manners, and harmless behaviour to their enemies, as well as their friends. I have known among them, men of considerable power and authority, who were highly offended with me, because they imagined my work affected their interests: but I lived within a mile of them, in a lonely house, with my windows and doors wide open all night, without a sword or fire-arms, and free from the smallest apprehension of danger."

—Periodical Accounts, Vol. I. p. 31.

কিন্তু টমাসের মনে ধর্ম্মপ্রচারের উৎসাহ ও উত্তেজনা যতখানিই থাকুক, কাজে তিনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার মুন্‌শী রামরাম বসু ও পার্ব্বতী নামীয় এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহার ধর্ম্মোন্মাদনার সুযোগ লইয়া তাঁহাকে নানা মিথ্যা আশ্বাস দিয়া দোহন করিতে থাকেন; দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তিনি এক জন হিন্দুকেও ধর্ম্ম বা জাতিচ্যুত করিতে সক্ষম হন নাই। এই পাঁচ বৎসরে রামরাম বসুর সহিত তাঁহার সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র (দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—৩) ভূমিকায় দেওয়া আছে। ভগ্নহৃদয় টমাস ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মালদহ পরিত্যাগ করিয়া "হিন্দু অক্সফোর্ড" নবদ্বীপ হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

টমাসের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন

এই দীর্ঘকাল চার্লস গ্রাণ্ট তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতেছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম কত দূর বিস্তৃত হইল ইহা জানিতে চাহিয়া গ্রাণ্ট মাঝে মাঝে তাঁহাকে তাগাদা করিতেন; টমাস নানা স্তোকবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার নিজের মনেও বরাবর বিশ্বাস ছিল তিনি অন্ততঃ রামরাম বসু ও পার্ব্বতীকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিতে পারিবেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার এই বিশ্বাস ভাঙিয়া যায়। তা ছাড়া ধর্ম্মভাব তাঁহার যতই থাকুক তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল চরিত্রের লোক ছিলেন; আয়ের অধিক ব্যয় করিতেন, এবং মাঝে মাঝে প্রলোভনে পড়িয়া জুয়া খেলিতেন। তাহাতে তিনি বারম্বার ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। উড্‌নি সাহেব কয়েক বার তাঁহাকে রক্ষা করেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চার্লস গ্রাণ্ট টমাস-চরিত্রের এই দুর্ব্বলতার কথা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। উড্‌নি টমাসকে চাপ দিতে থাকেন। ঋণগ্রস্ত এবং লাঞ্ছিত টমাস অক্টোবর হইতে ১০ই ডিসেম্বর (১৭৯১) পর্য্যন্ত নবদ্বীপে থাকিয়া পদ্মলোচন পণ্ডিতের নিকট মুগ্ধবোধের পাঠ অসমাপ্ত রাখিয়াই কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে টমাস তাঁহার পিতার নিকট এক পত্রে লেখেন "ম্যাথু এবং মার্কের বাংলা অনুবাদ শেষ করিয়াছি।" ঐ বৎসরের

সেপ্টেম্বর মাসে টমাস তাঁহার অনুবাদ সহ কৃষ্ণনগরে সার্ উইলিয়ম জোন্সের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে রামরাম বসু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। জোন্স টমাসকে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং অনুবাদ মুদ্রিত হইলে ৪৮০ টাকায় ত্রিশ কপির গ্রাহক হইতে রাজী হইয়াছিলেন। টমাস সার্ উইলিয়মকে তাঁহার অনুবাদের পাণ্ডুলিপি দিয়া এই অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, তিনি যেন লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট অনুবাদের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে একটু সুপারিশ করেন। সার্ উইলিয়ম তখন বাংলা ভাষায় তাঁহার অজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলেন। টমাস ইহাতে না দমিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদের এক অনুষ্ঠানপত্র ছাপাইয়া বিলি করেন। টমাসের জর্ণাল হইতে জানা যায়—

The projected work was "to consist of seven parts. (1) Promises and Prophecies, (2) Matthew, (3) Mark, (4) Texts and Precepts of the New Testament, for Newness of Life, (5) The Ten Commandments, and a dissertation on Scripture in general, (6) An explanation of the three first chapters of Matthew, (7) A Glossary." The Price of the book was to be a gold mohur, or Rs. 16, per copy, to Europeans; and the natives were to receive it gratis.

টমাসের এই স্বপ্ন এই যাত্রায় সফল হয় নাই। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

THE PARTICULAR BAPTIST SOCIETY FOR PROPAGATING THE GOSPEL AMONGST THE HEATHEN.

উপরি-উক্ত সমিতির সম্ভাবনার কথা উইলিয়ম কেরী নামক এক জন তন্তুবায়-পুত্রের মনে সর্ব্বপ্রথম উদিত হয়। তাঁহার বিরাট্ জীবন ও কীর্ত্তি আমাদের স্বতন্ত্র অধ্যায়ের বিষয় হইলেও টমাসের কাহিনী অনুসরণ করিয়া এখানেই তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হইতেছে। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মুলটনে আসিয়া বসবাস করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মনে হিদেনদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের বাসনা জাগে। এখানেই তিনি "An Enquiry into the Obligations of Christians to use means for the conversion of the Heathen" নামক বিখ্যাত পুস্তক রচনা করেন—এই পুস্তক ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়। এই উদ্দেশ্য মনে মনে পোষণ করিয়া তিনি বহুকাল যাবৎ নানা ভৌগোলিক জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছিলেন। তাঁহার বাসনা উত্তরোত্তর প্রবল হইতে থাকে এবং ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে নরদাম্‌টনশায়ারের ক্লিপষ্টোনে অনুষ্ঠিত একটি সভায় সাট্‌ক্লিফ ও ফুলারের উপস্থিতিতে কেরী প্রশ্ন করেন, "হিদেন-জগতে গসপেল প্রচার সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হইলে তাহা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কিনা।" ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ মে তারিখে নটিংহামে এ-বিষয়ে আলোচনার জন্য পুনরায় সভা আহূত হয়। কেরী বক্তৃতা করেন; দুটি বিষয়ের তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করেন

(১) That we should expect great things ও (২) that we should *attempt* great things. বক্তৃতার শেষে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—"That a plan be prepared against the next ministers' meeting at *Kettering* for forming a society among the Baptists for propagating the Gospel among the

Heathen"। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর কেটারিঙের এই ঐতিহাসিক সভা বসে। সভায় সমিতি-গঠনের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন—John Ryland, Reynold Hogg, John Sutcliffe, A. Fuller, W. Carey, Abraham Greenwood, Edward Sharman, Joshua Burton, Samuel Pearce, Thomas Blundell, Wm. Heighton, John Eayres, ও Joseph Timms। রাইলাণ্ড, হগ, কেরী, সাটক্লিফ ও ফুলারের উপর সমিতি এই উদ্দেশ্যে যাবতীয় কর্ত্তব্য সাধনের অনুমতি দিয়া রাখেন। এই সভাই ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সমিতির প্রথম সভা। দ্বিতীয় সভা বসে ১৭৯২, ৩১শে অক্টোবর। ১৩ই নবেম্বর নরদামটনের প্রাইমারি সমিতির সভায় কেরী উপস্থিত হইতে পারেন নাই। একটি পত্রে তিনি সমিতিকে বঙ্গদেশীয় মিশনরী জন টমাসের কথা জানান। টমাসের সহিত তাঁহার ইতিমধ্যেই পরিচয় হইয়াছিল এবং টমাস তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম বাংলা দেশে তাঁহাদের প্রচারকার্য্য চালাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। টমাস বলেন, তিনি নিজেও বাংলা দেশে প্রচার-কার্য্যের সুবিধার জন্য লণ্ডনে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন; এক জন সঙ্গী পাইলে তিনি বাংলা দেশে প্রচারের ভার লইতে রাজি আছেন। কেরীর পত্রের শেষে ছিল—

"The reason for my writing is a thought, that his fund for *Bengal* may interfere with our larger plan; and whether it would not be worthy of the Society, to try to make that and ours unite into one fund, for the purpose of sending the Gospel to the Heathen indefinitely."

কেরীর পত্র পঠিত হইলে সমিতি জন টমাস সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে মনস্থ করেন। সমিতির সম্পাদকের উপর এই বিষয়ের ভার অর্পিত হয়। টমাসকে তাঁহার নিজের জীবন ও বাংলা দেশে তাঁহার কীর্ত্তি সম্পর্কে একটি বিবরণী দাখিল করিতে বলা হয়। তাহাতে সমস্ত ব্যাপার বিশদ ভাবে বিবৃত করিয়া সর্ব্বশেষে টমাস লেখেন—

"In the year 1787, I began to learn to speak and write the *Bengalee*. Till the month of June or July of this year, I was engaged at Calcutta, and preached to a few Europeans there. In 1788, I could *converse* freely with the natives, especially with those I was well acquainted with. In 1789, I began to find that my pronunciation was generally very defective, and consequently my preaching, for the most part, could not be understood: I had also begun to translate. I remained there the second time, from the middle of 1786, till the end of 1791; but had no thoughts of staying there till about the beginning of 1787, nor did I sit down to the work till about the middle of that year: so all the time spent among them was five years and a half;....Considering this, and the difficulties that must necessarily occur to the first adventurer, (for they have no dictionary, vocabulary, nor printed books to assist one, as in European countries); I say, considering these things, the time may be reckoned but two or three years; and I doubt not but a person of a moderate capacity may attain, in that time, as much knowledge of the language as I have; and I can now express myself in *prayer*, *preaching* and conversation, comfortably to myself, and so as to be understood by others."

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি কেটারিঙে সমিতির অধিবেশনে 'টমাস-অনুসন্ধানে'র ফল বিবৃত হইল: সমিতি ইহা সন্তোষজনক বিবেচনা করাতে মিঃ টমাসকে সমিতির পক্ষ

বাংলা দেশে প্রচারকার্য্য পরিচালনের অনুরোধ জ্ঞাপন করার প্রস্তাব হইল। টমাস যদি রাজি থাকেন তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গী কে হইবেন, পূর্ব্বাহ্লেই তাহা স্থির করিবার কথা উঠিল। উইলিয়ম কেরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জন টমাসের সহকর্ম্মীরূপে নিজের নাম প্রস্তাব করিলেন। সেই দিন অপরাহ্নে টমাস স্বয়ং কেটারিঙে উপস্থিত হইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। রামরাম বসু ও পার্ব্বতী ব্রাহ্মণ টমাসের হাতে রেভারেণ্ড 'এস'-এর নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন সমিতি হইতে এই মর্ম্মে তাহার জবাব লেখা হইল যে, ভগবান্ হিন্দুদের উপর প্রসন্ন হইয়াছেন; তাঁহার দুই জন সেবক সেই দেশে তাঁহার বাণী প্রচারার্থ যাইতেছেন। রামরাম বসু, পার্ব্বতী ও তাঁহাদের বন্ধুগণ যেন অবিলম্বে ব্যাপটাইজড হইয়া খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হন।

এই পত্র এবং প্রভূত আশা লইয়া উইলিয়ম কেরী সপরিবারে এবং টমাস একাকী ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে ক্যাপ্টেন ক্রিসমাসের অধীনে পরিচালিত ডেনিশ ইণ্ডিয়াম্যান 'প্রিন্সেস মারিয়া'-(Kron Princesse Marie) যোগে বঙ্গদেশ যাত্রা করিলেন।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর তারিখে কেরী ও টমাস কলিকাতায় পৌছিলেন; রামরাম বসু তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। টমাসের আরব্ধ কার্য্য কেরী নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। এখন হইতে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর তারিখে দিনাজপুরে মৃত্যু পর্য্যন্ত জন টমাস কেরীর ছায়া-স্বরূপ জীবিত ছিলেন; কেরীর প্রসঙ্গে তাঁহারও অবশিষ্ট জীবন আলোচিত হইবে। টমাস শেষ-জীবনে উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলেন। তবে তিনি অসুস্থতা ও অশান্তির মধ্যে এইটুকু সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন যে, বাংলা দেশে ব্যাপটিষ্ট মিশনের পক্ষে প্রথম বাঙালী ধর্ম্মান্তরগ্রহণকারী কৃষ্ণ পাল তাঁহারই প্ররোচনায় খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন এবং ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম ওয়ার্ড, জোশুয়া মার্শম্যান, ব্রান্সডন ও গ্রাণ্টের আগমন ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা তিনি দেখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
১৩৪৫

ভেল-সংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, এম-এ, ডি-লিট্

অগদ-তন্ত্র ও শল্যতন্ত্র, প্রধানতঃ এই দুই ধারায় আয়ুর্ব্বেদ বা ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ হইয়াছে। এই দ্বিবিধ ধারায় যে সকল সংহিতা প্রণীত হইয়াছে, উহাদের অবদানে দুইজন প্রাচীন ঋষি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, যথা—অগদ-তন্ত্রের অবদানে পুনর্বসু আত্রেয় এবং শল্য-তন্ত্রের অবদানে ধন্বন্তরি। অগ্নিবেশ, ভেল বা ভেড়, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি, ভগবান্ পুনর্বসু আত্রেয়ের এই ছয় জন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শিষ্যের প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া লোক-প্রসিদ্ধি আছে। এই ছয় প্রাচীন সংহিতার কোনটিই সম্পূর্ণ এবং অবিকলভাবে এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। দৃঢ়বল-সংশোধিত চরক-সংহিতার মধ্যে অগ্নিবেশ-সংহিতা লীন হইয়াছে অথবা আত্মগোপন করিয়া আছে। অগ্নিবেশ-সংহিতার পৃথক্ অস্তিত্ব কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই সংহিতা আবিষ্কৃত হইলে আমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারিতাম, ঠিক কোন্ ভিত্তির উপর চরকের প্রতিসংস্কর্ত্তা দৃঢ়বল তাঁহার সংহিতা-সৌধ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জতুকর্ণাদি চারি সংহিতা সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে বলিলেও চলে। ছয় সংহিতার মধ্যে মাত্র ভেল-সংহিতারই এক পুথি তাঞ্জোর প্যালেস লাইব্রেরীতে সংগৃহীত ছিল (বর্ণেল, ক্যাটালগ, নং ১০৭৭৩), এবং উহারই সাহায্যে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইং ১৯২১ সালে পরলোক-গত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় উক্ত সংহিতার এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। উক্ত ছয় সংহিতাই যে প্রচলিত চরক ও সুশ্রুতসংহিতার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রামাণিক গ্রন্থ, তাহা বাগ্‌ভটের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে প্রমাণ করা চলে :—

> "ঋষি-প্রণীতে প্রীতিশ্চেন্মুক্ত্বা চরক-সুশ্রুতম্।
> ভেড়াদ্যাঃ কিং ন পঠ্যন্তে, তস্মাদ্ গ্রাহ্যং সুভাষিতম্॥
>
> [অষ্টাঙ্গ-হৃদয়, উত্তরস্থান, অঃ ৪০, শ্লোঃ ২৫]

ভেল-সংহিতার মুদ্রিত সংস্করণ পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, উহার সূত্রস্থানের প্রথম তিন অধ্যায় এবং সিদ্ধিস্থানের কতিপয় অংশ বাদে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ আকারেই আছে। আউফ্রেক্টকৃত ক্যাটালোগাস্ ক্যাটালোগোরামে উল্লিখিত ৪১৬ নম্বরভুক্ত অপর পুথিখানির

উপায়ে সংহিতার সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ করিতে পারিলেও, সর্ব্বাংশে ইহার মূল পাঠোদ্ধার করা দুঃসাধ্য। মুদ্রিত সংস্করণে আমরা যে আকারে সংহিতাটি পাইতেছি, উহাতে মাত্র শরীর-স্থানেরই ৪র্থ হইতে ৮ম, এই পাঁচ অধ্যায় মধ্যে মধ্যে পদ্য-সন্নিবিষ্ট গদ্যে, এবং অবশিষ্ট অংশ সর্ব্বত্রই পদ্যে। গদ্যাংশ পদ্যে পরিণত হওয়ায় সংহিতা, বহু অংশে ইহার মূল পাঠ ও ঐতিহাসিক বিশেষত্ব হারাইয়াছে। অদ্যাপি যে কয়টি অধ্যায় গদ্যে আত্মরক্ষা করিয়া আছে, উহারা পদ্য-নদীতে দ্বীপের ন্যায় বিরাজমান। বস্তুতঃ এই গদ্যাংশগুলিই সংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব প্রমাণ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। শঙ্খ-লিখিতাদি কতিপয় স্মৃতিসংহিতার মধ্যেও পদ্য-রাক্ষসী গদ্য মূল হজম করিয়া গ্রন্থগুলির প্রাচীনত্বের নিদর্শন লুপ্ত করিয়াছে। প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ে অধুনা ভেল-সংহিতার তেমন কোন বিশেষত্ব বা প্রয়োজন নাই। চরক-সংহিতা, সুশ্রুত-সংহিতা অথবা অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ের তুলনায় ভেল-সংহিতা যেন সূর্য্য অথবা চন্দ্রের নিকট সামান্য খদ্যোত; অথচ ইহার ঐতিহাসিক বিশেষত্ব যথেষ্ট। ভেল-সংহিতা, বিশেষতঃ ইহার গদ্যাংশ হইতে সহজে অনুমান করা যায়, পুরাতন কোন্ স্তর হইতে আয়ুর্ব্বেদ চরক ও সুশ্রুতসংহিতায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারিয়াছে।

চরকের অন্তর্গত অগ্নিবেশ-সংহিতার ন্যায় ভেল-সংহিতাও যে পুনর্বসু অথবা ভগবান্ আত্রেয়-সম্প্রদায়ের অন্যতম আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ, তাহা সংহিতাই নিজে প্রমাণ করে। কারণ, এই সংহিতায় আত্রেয়-বচনই বেদবাক্য, আত্রেয়-মতই প্রতিপাদ্য বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। "ইত্যাহ ভগবান্ আত্রেয়ঃ", "নেত্যাহ ভগবান্ পুনর্বসুরাত্রেয়ঃ", ইত্যাকার উক্তি হইতে উক্ত বিষয়ে অপর সিদ্ধান্ত কি হইতে পারে?

এখন প্রশ্ন হইতেছে—গদ্য অথবা পদ্য-সন্নিবিষ্ট গদ্য ভেল-সংহিতার রচনাকাল কত প্রাচীন হইতে পারে এবং তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায়ও বা কি আছে? প্রথমতঃ, ইহার গদ্যাংশের রচনারীতি অনেকাংশে অর্থশাস্ত্র, কামসূত্র, প্রাচীন ধর্ম্মসূত্র ও পালি অভিধর্ম্ম পিটকের অনুরূপ। উপমাস্থলে:

"তত্রাহ কথং গর্ভো মাতুরুদরে তিষ্ঠতীতি? ঊর্দ্ধমিতি শৌনকঃ। অবাক্‌শিরা ইতি ভরদ্বাজঃ। নেত্যাহ ভগবান্ পুনর্বসুরাত্রেয়ঃ। যদ্যূর্দ্ধং তিষ্ঠেৎ তর্হি মাতৃমা(রঃ) স্যাৎ। যদ্যবাক্‌শিরাঃ তদা স্বমা(রঃ) স্যাৎ" (ভেঃ-সং, পৃঃ ৮৫)।

দ্বিতীয়তঃ, আত্মার দেহান্তর-উপক্রম বিষয়ে দেখিতে পাই, ভেল-সংহিতা বৃহদারণ্যক-উপনিষদুক্ত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতই খণ্ডন করিতে গিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে,

"যেমন তৃণ-জলৌকা তৃণান্তে গিয়া অপর এক তৃণের প্রতি অগ্রসর হইয়া নিজেকে গুটাইয়া পূর্ব্বতৃণ হইতে পরতৃণে গমন করে, তেমন আত্মাও এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া, অবিদ্যা দূর করিয়া, অপর দেহের প্রতি অগ্রসর হইয়া দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে।"

"তদ্‌যথা তৃণ-জলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বাঽন্যমাক্রমং আক্রম্যাত্মানং উপসংহরত্যেবমেবায়ম্ আত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বান্যাম্ আক্রমম্ আক্রম্যাত্মানম্ উপসংহরতি।"

উক্ত উপমার সাহায্যে অপর কোথাও আত্মার সংক্রমণ বা দেহান্তর-গমন বর্ণিত হয় নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপমা হইতেছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
　　নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
　　ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

[ভগবদ্গীতা, ২-২২]

"যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করে।"

এই শেষোক্ত জাতীয় একাধিক উপমা পালি জাতক, পেতবত্থু, দীঘ-নিকায় ও মজ্ঝিম-নিকায়ে দৃষ্ট হয়, যথা :—

(১) উরগ-জাতক ও উরগ-পেতবত্থুতে—

"উরগো ব তচং জিন্নং হিত্বা গণ্হাতি সন্তনুং।
এবং শরীরে নিব্ভোগে পেতে কালকতে সতি॥"

"উরগ যেমন জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগ করিয়া নব রূপ গ্রহণ করে, তেমন দেহ-বিনাশে, মৃত্যু হইলে পর (সত্ত্ব নব দেহ গ্রহণ করে)।"

(২) নন্দিকাপেতবত্থুতে, দীঘ-নিকায়ের সামঞ্ঞফল এবং মজ্ঝিম-নিকায়ের মহা-অস্সপুরসুত্তে :—

"যথা গামতো নিক্খম্ম অঞ্ঞং গামং পবিসতি।
এবমেবম্পি সো জীবো অঞ্ঞং কায়ং পবিসতি॥
যথা গামতো নিক্খম্ম অঞ্ঞং গেহং পবিসতি।
এবমেবম্পি সো জীবো অঞ্ঞং বোন্দিং পবিসতি॥"

"যেমন কেহ গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্য গ্রামে অথবা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্য গৃহে প্রবেশ করে, তেমন জীব (দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া) অন্য দেহে প্রবিষ্ট হয়।"১

এই সকল উপমা হইতে বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপমা প্রাচীনতর, এবং উপনিষদের উপমারই যুক্তি-খণ্ডন ভেল-সংহিতার গদ্যাংশে আছে :

"অথ প্রশ্নো ভবতি : কথময়ং দেহো দেহান্তরম্ উপক্রমত ইতি ? অত্রোবাচ ভগবান্ আত্রেয়ঃ : জলুকায়া ইবাস্য কেচিদ্ গতিং ব্রুবতে। তন্ন যুক্তম্ ইহানীতিন্যত্যন্তামূর্তত্বং যুগপৎ স্যাদেব" (ভেঃ সং, পৃ. ৯৩)।

"অনন্তর প্রশ্ন হইতেছে : কিরূপে এই দেহী দেহান্তর গমন করে ? এ বিষয়ে ভগবান্ আত্রেয় বলিতেছেন : কেহ কেহ বলেন যে, (তৃণ)জলৌকার তৃণ হইতে তৃণান্তরে গমনের ন্যায়ই দেহীর দেহান্তর-গমন হইয়া থাকে। দেহীর ইহ হইতে পরলোক-গমনবিষয়ক এই উপমা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু অত্যন্ত অমূর্ত্ত হওয়ায় আত্মার পক্ষে যুগপৎ দেহ পরিত্যাগ ও দেহান্তর-গ্রহণ হইতে পারে।"

১। শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা-প্রণীত *The Buddhist Conception of Spirits* পৃ. ৩ দ্রঃ। দীঘ ও মজ্ঝিম-নিকায়ের উপমা : "সেয্যথা পুরিসো সকম্হা গামা অঞ্ঞং গামং গচ্ছেয্য,

তৃতীয়তঃ, কতিপয় পরিভাষা ও দার্শনিক মতের সৌসাদৃশ্য হইতে বিচার করিলে ভেল-সংহিতা ও পালি পঞ্চনিকায় একই সময়ের রচনা বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

(১) পরিভাষার সৌসাদৃশ্য পালি নিকায় ও জৈন আগমের প্রমাণে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের উদ্ভবকালে নিকায়, জাতি বা বর্ণ অর্থে কায় শব্দের প্রচলন হয়। ভেল-সংহিতায় পৃথিবী-কায়, অপ্‌কায়,জল-কায়, বায়ু-কায়, তেজঃকায়, এই পাঁচ সংজ্ঞার ব্যবহার আছে। পালি নিকায়োক্ত বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক এবং সামান্য পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থিক পকুধ কচ্চায়নের (ককুদ কাত্যায়নের) দার্শনিক উক্তিতে অবিকল এই সকল পরিভাষা দৃষ্ট হয় :

"পঠবি-কায়ে, আপোকায়ে, তেজো কায়ে, বায়োকায়ে, সুখে দুক্‌খে, জীবে সত্তমে" (দীঃ নিঃ, সামঞ্‌ঞফলসুত্ত, মঃ নিঃ, সন্দক-সুত্ত, জৈন সূয়গডঙ্গ, ইত্যাদি)।

পালি নিকায়ে প্রযুক্ত ব্রহ্ম-কায়, দেব-কায়, গন্ধব্ব-কায়, অসুর-কায় ইত্যাদির অনুরূপ পরিভাষা ভেল-সংহিতার ব্রহ্ম-কায়ং, দেব-কায়ং, বরুণ-কায়ং, গন্ধর্ব-কায়ং, পিশাচ-কায়ং, অসুর-কায়ং ও মহারাজ-কায়ং শব্দে পরিলক্ষিত হয়।

(২) দার্শনিক মতের ও উক্তির সৌসাদৃশ্য :

(ক) ভেল-সংহিতা, পৃ. ৮৯ :

"স যদা ভেদং গচ্ছতি তদাপঃ অপ্‌কায়মেব যান্তি, বায়ুর্বায়ুকায়ং, তেজঃ তেজঃকায়ং পৃথিবী পৃথিবী-কায়ং, আকাশং আকাশ-কায়মিতি। তদা রসো রস-কায়ম্ ইন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়-কায়ং ভজতে। ভবতি চাত্র : ভিদ্যমানে শরীরে বৈ ধাতুর্ধাতুং নিযচ্ছতি।"

(খ) পালি নিকায়োক্ত বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক ও সামান্য পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থিক অজিত কেশকম্বলীর দার্শনিক মত ও উক্তি :

অয়ং পুরিসো যদা কালং করোতি পঠবী পঠবি-কায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, আপো আপোকায়ং, তেজো তেজোকায়ং, বায়ো বায়োকায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, আকাসং ইন্দ্রিয়ানি সঙ্কমন্তি।"

(দীঃ নিঃ, সামঞ্‌ঞফল-সুত্ত)

ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাবকালে অথবা পালি পঞ্চনিকায়ের যুগে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা বারান্তরে আলোচনা করিব। উপসংহারে অগদ-তন্ত্র, শল্য-তন্ত্র, শালাক্য ও কৌমারভৃত্য বিষয়ে দীঘ-নিকায়ের ব্রহ্মজালাদি প্রথম তের সুত্রের অন্তর্গত সীলকৃখন্ধ হইতে বুদ্ধবচন উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে মনে করি। ভগবান্ বুদ্ধ বলিতেছেন :

"একে সমণ-ব্রাহ্মণা...এবরূপে তিরচ্ছান-বিজ্জায় মিচ্ছাজীবেন জীবিকং কপ্পেন্তি, সেয্যথীদং :... বমনং বিরেচনং [উদ্ধ-বিরেচনং অধোবিরেচনং সীস-বিরেচনং] কণ্ণতেলং নেত্তঞ্জনং নত্থুকম্মং অঞ্জনং পচ্চঞ্জনং সালাকিয়ং সল্লকত্তিয়ং দারক-চিকিচ্ছা মূলভেসজ্জানং অনুপ্পদানং ওষধীনং পটিমোক্‌খো ইতি।"

"কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই প্রকার তিরশ্চীন বিদ্যা দ্বারা, মিথ্যাজীব দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, যথা : বমন, বিরেচন, উর্দ্ধবিরেচন, অধঃ বিরেচন, শিরঃ বিরেচন, কর্ণতৈল, নেত্রাঞ্জন, নস্যকর্ম্ম, অঞ্জন, প্রত্যঞ্জন, শালাক্য, শল্যকর্ম্ম, শিশু-চিকিৎসা (কৌমারভৃত্য), মূল ভৈষজ্য উৎপাদন, ঔষধের

মদনমোহনজীর মন্দির—বৃন্দাবন

বৃন্দাবনের কয়েকটি মন্দিরের ঐতিহাসিক পরিচয়

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ

যাঁহারা এ পর্য্যন্ত বৃন্দাবনের পুরাতন ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন মধ্যযুগের মন্দিরগুলি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহারা মন্দিরের স্থাপত্য-সৌষ্ঠব, ভাস্কর্য্য ও অন্যবিধ শিল্পকলা সম্বন্ধেই বেশী আলোচনা করিয়াছেন; বিশদভাবে ঐগুলির ঐতিহাসিক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেন নাই। বৃন্দাবনের অধিকাংশ মন্দির সম্রাট্ আকবরের রাজত্বে রাজপুত সামন্তরাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। জনশ্রুতি কিংবা শিলালিপি হইতে ইঁহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারি, তাহার ঐতিহাসিক বিচার এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

মদনমোহনজীর মন্দিরের নির্ম্মাতা কে?

এই মন্দির কচ্ছবাহ্-রাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া বর্ত্তমানে জনশ্রুতি প্রচলিত। মদনমোহনজী জয়পুর রাজ্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ বিগ্রহ। জয়পুরের লোক উপহাসচ্ছলে বলে,—"লড়্নে ভড়্নেমে সীতারামজী; লাড্ডু খানেমে মদনমোহন!" অর্থাৎ লড়াই ঝগড়ায় সীতারামজী, আর লাড্ডু খাওয়ার বেলা মদনমোহন! পূর্ব্বে আম্বরের যুদ্ধপতাকার সঙ্গে সঙ্গে সীতারামজীও লড়াই করিতে যাইতেন। কথিত আছে, আওরঙ্গজেবের দৌরাত্ম্যে ৺বিশ্বেশ্বর যখন বেগতিক দেখিয়া জ্ঞানবাপীতে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, সে সময় মদনমোহনজীও আম্বরে পলায়ন করিয়াছিলেন। ইহা সম্ভবতঃ সত্য। কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হয় না যে, মানসিংহ এ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাউস্ (Growse) সাহেব মথুরা গেজেটিয়ার লিখিয়াছিলেন। ঐ সময় পর্য্যন্ত মানসিংহ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এ জনশ্রুতির আভাস পাওয়া যায় না। লোকে বলে, রামদাস নামক জনৈক মুলতানী শেঠ এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।*

মদনমোহনজীর মন্দির কখন্ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে কোন তারিখযুক্ত শিলালিপি প্রভৃতি পাওয়া যায় নাই। ভক্তমাল গ্রন্থে কবি সুরদাসের নাম মদনমোহনজীর সহিত সংশ্লিষ্ট দেখা যায়:—

"শ্রীমদনমোহন সূরদাস্কী নাম-শৃঙ্খলা জোরী অটল।"

উক্ত গ্রন্থে কথিত আছে, সূরদাসজী সাণ্ডিলা পরগণার বাদশাহী খাজনা তছরূপ করিয়াছিলেন; এই অপরাধে দেওয়ান টোডরমল তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। পরে আকবরের কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়া তিনি বৃন্দাবনে আসেন এবং ইষ্টদেব মদনমোহনজীর প্রসাদে অপূর্ব্ব

কবিত্বশক্তি লাভ করিয়া কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্য রচনা করেন। বর্ত্তমানে সূরদাসজীর কাল ১৫৪০—১৬২০ সংবৎ বলিয়া ধরা হয়। সুতরাং ১৪৮৪ হইতে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে মদনমোহনজীর মন্দির সুপরিচিত ছিল, আমরা জনশ্রুতি হইতে ইহাই শুধু অনুমান করিতে পারি। আকবর-টোডরমল এবং সূরদাসজী-বিষয়ক গল্পের মূলে কোন সত্য নাই। রাজা টোডরমল আকবরের রাজত্বের দ্বাবিংশ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বার দেওয়ান-পদ পাইয়াছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে গ্রাউস্ সাহেব এই মন্দিরের বিগ্রহকক্ষের পূর্ব্বভাগে একমাত্র প্রবেশ-দ্বারের উপর একখানি লুপ্তপ্রায় শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। উক্ত লিপিতে কোন তারিখ নাই এবং ইহার ভাষা সংস্কৃত; কিন্তু প্রশস্তিটি **প্রথমে** বাংলা অক্ষরে এবং **নীচে** দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত। যিনি বাংলা ও নাগরী, দুই রকম অক্ষরে নিজের কীর্ত্তি অক্ষয় করিবার প্রয়াসী ছিলেন, তিনি বাঙালী ছাড়া অন্য দেশবাসী হইতেই পারেন না। তিনি নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন, তাঁহার স্বদেশবাসী যাত্রীরা সকলেই দেবনাগরী অক্ষর পড়িতে অভ্যস্ত নয়। সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালীর মধ্যে আজকালও শতকরা প্রায় ৮০ জন নাগরী অক্ষর লিখন-পঠনে সক্ষম নহে। যিনি মদনমোহনজীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি বঙ্গজননীর সন্তান না হইলে বাংলা অক্ষরের সহিত তাঁহার নাড়ীর এ টান থাকিত না। শিলালিপিতে প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় এইরূপ দেওয়া হইয়াছে ঃ—

হর ইব গুরুবংশো যৎপিতা রামচন্দ্রো
গুণিমণিরিব পুত্রো যস্য রাধাবসন্তঃ।
সকৃতস্কৃতরাশিঃ শ্রীগুণানন্দনামা
ব্যধিত বিধিবদেতন্মন্দিরং নন্দসূনোঃ ॥

এই শিলালিপি পাঠে আমরা জানিতে পারি, মদনমোহনজীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা গুণানন্দের পিতার নাম রামচন্দ্র, পুত্রের নাম রাধাবসন্ত, তিনি কোন উচ্চবংশ-সম্ভূত ব্যক্তি। গুণানন্দ ও রাধাবসন্ত বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বাংলার ইতিহাসে অপরিচিত। তবে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলা দেশে সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌র (১৪৯৩—১৫১৮ খ্রীঃ) রাজত্বের শেষভাগে রামচন্দ্র খাঁ নামক এক পরাক্রান্ত হিন্দু জমিদারের উল্লেখ পাওয়া যায়। চৈতন্যভাগবত অনুসারে ছত্রভোগের গ্রামপতি রামচন্দ্র খাঁ মহাপ্রভুকে নীলাচল গমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কেন না, তখন বাংলা ও উড়িষ্যার রাজার মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল এবং পথিকেরা "যাশু" (আরবী জাসুস্) বা গুপ্তচর সন্দেহে ধৃত হইয়া যুধ্যমান পক্ষদ্বয় কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছিল। তথাপি এই রামচন্দ্র খাঁ মহাপ্রভুকে উৎকলযাত্রায় সাহায্য করিয়াছিলেন। মাদ্‌লাপঞ্জী অনুসারে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ীয় সেনা কর্ত্তৃক উড়িষ্যা আক্রান্ত হইয়াছিল। সুতরাং এই রামচন্দ্র খাঁর প্রাদুর্ভাবকাল ঐ সময়ের কাছাকাছি হইবে।

ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসেন, তখন যশোহর-বনগাঁ প্রদেশের দুর্দ্দান্ত জমিদার মহাশাক্ত রামচন্দ্র খাঁ নিত্যানন্দকে অপমানিত করিয়াছিলেন; এই পাপের ফল হাতে হাতে ফলিয়াছিল—গৌড়েশ্বরের জনৈক মুসলমান কর্ম্মচারী তাঁহার জাতি নাশ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে গোহত্যা করিয়াছিল।* এই রামচন্দ্র খাঁর দুই পুত্র কৃষ্ণানন্দ ও ভুবনানন্দের উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। ভুবনানন্দ গৌড়াধিপের প্রিয়পাত্র হইয়া অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণদিগকে দেশে বৃত্তি দান করাইয়াছিলেন।† পূর্ব্বোক্ত শিলালিপি-কথিত গুণানন্দ যশোহর-বনগাঁর জমিদার প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র খাঁর অন্যতম পুত্র বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণানন্দ, ভুবনানন্দ ও গুণানন্দের "আনন্দ" উপাধি দেখিয়া মনে হয়, রাজরোষে পতিত ও সর্ব্বস্বহারা হইয়া রামচন্দ্র খাঁর পুত্রগণ হয়ত গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন; পৌত্র রাধাবসন্ত সম্ভবতঃ তৎকালীন গৌড়াধিপের কৃপায় নিজ বংশের জমিদারি ও লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের পুত্র গুণানন্দ কোন্ সময় মদনমোহনজীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহার মোটামুটি কাল অনুমানসাপেক্ষ। সুলতান সিকেন্দর লোদীর রাজত্বকালে (১৪৮৮-১৫১৭) মহাপ্রভু বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। তখন ব্রজমণ্ডলে কোন প্রসিদ্ধ মন্দির তিনি দেখেন নাই এবং কোন মন্দির থাকাও সম্ভবপর নহে। কারণ, মুসলমান-ইতিহাস অনুসারে সিকেন্দর লোদী মথুরার মন্দির ভগ্ন করিয়া দেবমূর্ত্তিসমূহ চূর্ণ করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিচূর্ণ পানের চূণের সহিত মিলাইয়া হিন্দুদিগকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল; এমন কি, নাপিতের উপর হুকুম হইয়াছিল, তাহারা হিন্দুদের দাড়ি কামাইতে পারিবে না। লোদী-রাজত্বে বাঙালীদের পক্ষে বৃন্দাবনে মন্দির-প্রতিষ্ঠার কথা দূরে থাকুক, তীর্থভ্রমণও বিপদ্‌সঙ্কুল ছিল। যে "গৌড়াধিপে"র কৃপায় রামচন্দ্র খাঁর অন্যতম পুত্র ভুবনানন্দ অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করাইয়াছিলেন, সেই গৌড়েশ্বর শের শাহ্ ব্যতীত আর কেহ হইতে পারেন না। কারণ, শের শাহ্ই একমাত্র গৌড়াধিপ, যিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিবার ক্ষমতা ও সৎসাহস অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মুসলমান-ইতিহাসেও শের শাহ্‌কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করার কথা লিখিত আছে। শের শাহ্‌র অপক্ষপাত শাসন ও দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত, চোর-ডাকাত সওদাগরের মাল ও পথিকের পুঁটুলি পাহারা দিত। নিজে খাঁটি মুসলমান হইলেও হিন্দুর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষবশে মন্দির ও দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া তাঁহার শাসননীতিবিরুদ্ধ ছিল। মোট কথা, ইংরেজ-রাজত্বে লালাবাবু বৃন্দাবনে যাহা করিতে পারিয়াছেন, আকবর-রাজত্বের পূর্ব্বে একমাত্র শের শাহ্ কিংবা ইস্‌লাম শাহ্‌র শাসনকালে বাঙালী গুণানন্দের পক্ষেও সেইরূপ মদনমোহনজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর ছিল। শের শাহ্ হোসেন-

---

* রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তি-প্রণীত 'গৌড়ের ইতিহাস,' দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ১৩৬।

শাহী বংশকে ধ্বংস করিয়া ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশ অধিকার করেন; সুতরাং হোসেনশাহী বংশের প্রতি জাতবিদ্বেষ রামচন্দ্র খাঁর পুত্রগণের পক্ষে শের শাহ্‌র পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠাপন্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে বাংলা অক্ষরে কোন সংস্কৃত শিলালিপি-প্রশস্তি বাংলা দেশের বাহিরে কোথাও আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না, আমার সঠিক জানা নাই। তবে মুঙ্গেরের দক্ষিণে বর্ত্তমান লক্ষ্মীসরাইয়ের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন জয়নগর বিহারে ১১৯৭ হইতে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গয়াকর কায়স্থ কয়েকখানি তন্ত্রগ্রন্থ বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত মূল গ্রন্থ হইতে নকল করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ আছে। মদনমোহনজীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটি বিষয় গ্রাউস সাহেব লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

> That [the tower] surmounting the sacrarium is a lofty octagon of curvilinear outline tapering toward the summit; and attached to its south side is a tower-crowned chapel of similar elevation…(*Mathura Gazetteer*, Pt. I, p. 127-128.)

অষ্টকোণ আকৃতি শূর-বংশীয় স্থাপত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ—পুরাণা কিল্লার (দিল্লী) হামাম ও শেরমঞ্জিল এবং মসজিদের কূপ ও ফোয়ারা ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এ কথা সকলেই জানেন, বঙ্কিম রেখায় গঠিত (*curvilinear*) ছাদ ও গম্বুজ বাংলার মুসলমান-স্থাপত্যেরই একটা বিশেষত্ব। বাংলা দেশের দো-চালা বাংলা-ঘরের ইহা অনুকরণ মাত্র। মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বযুগের এবং পরবর্ত্তী কালের হিন্দু মন্দিরাদির উহা একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। স্থাপত্য শিল্পে আমরা একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া থাকি, মন্দির বা মসজিদের কোন একটি বৈশিষ্ট্য যাহা গঠনকার্য্যে ব্যবহৃত হয়, উহাই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর ভাবে অনুকরণ করিয়া অলঙ্করণ-কার্য্যে ব্যবহার করা হয়; যথা, বাংলা দেশের প্রাচীন মন্দিরাদির বঙ্কিম রেখায় গঠিত ছাদ এবং শের শাহ্‌র সাসেরামস্থ সমাধিমন্দিরের সূক্ষ্মচূড় খিলান-বিশিষ্ট দরজার অনুকরণে গম্বুজের ভিতরকার "খোল" হইতে ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত সমাধি-প্রকোষ্ঠের চারি কোণায় নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্মচূড় খিলানের সারি, মূল গম্বুজের ভার বহন করিবার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। যদি মদনমোহনজীর মন্দির অটুট থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গ-স্থাপত্যের এই বৈশিষ্ট্য হয়ত মন্দিরের অন্যান্য অংশেও আমরা দেখিতে পাইতাম। সুতরাং আমার মনে হয়, মদনমোহনজীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা গুণানন্দ নিশ্চয় বাঙালী ছিলেন এবং এই মন্দির বঙ্গস্থাপত্যের ধারা অনেক পরিমাণে বজায় রাখিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ইহাও হয়ত অনেকে জানেন, রাধাকুণ্ড ও মদনমোহনজীর মন্দির একই দেবোত্তর সম্পত্তি। রাধাকুণ্ড এখনও বাঙালীদের অধিকারে আছে। আমার সন্দেহ হয়, মদনমোহনজীর প্রতিষ্ঠাতা গুণানন্দের পুত্র শিলালিপি-কথিত রাধাবসন্ত নিজনামে এই রাধাকুণ্ড নির্ম্মিত করিয়া উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মদনমোহনজী মানসিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইলে ইহাঁর সেবার
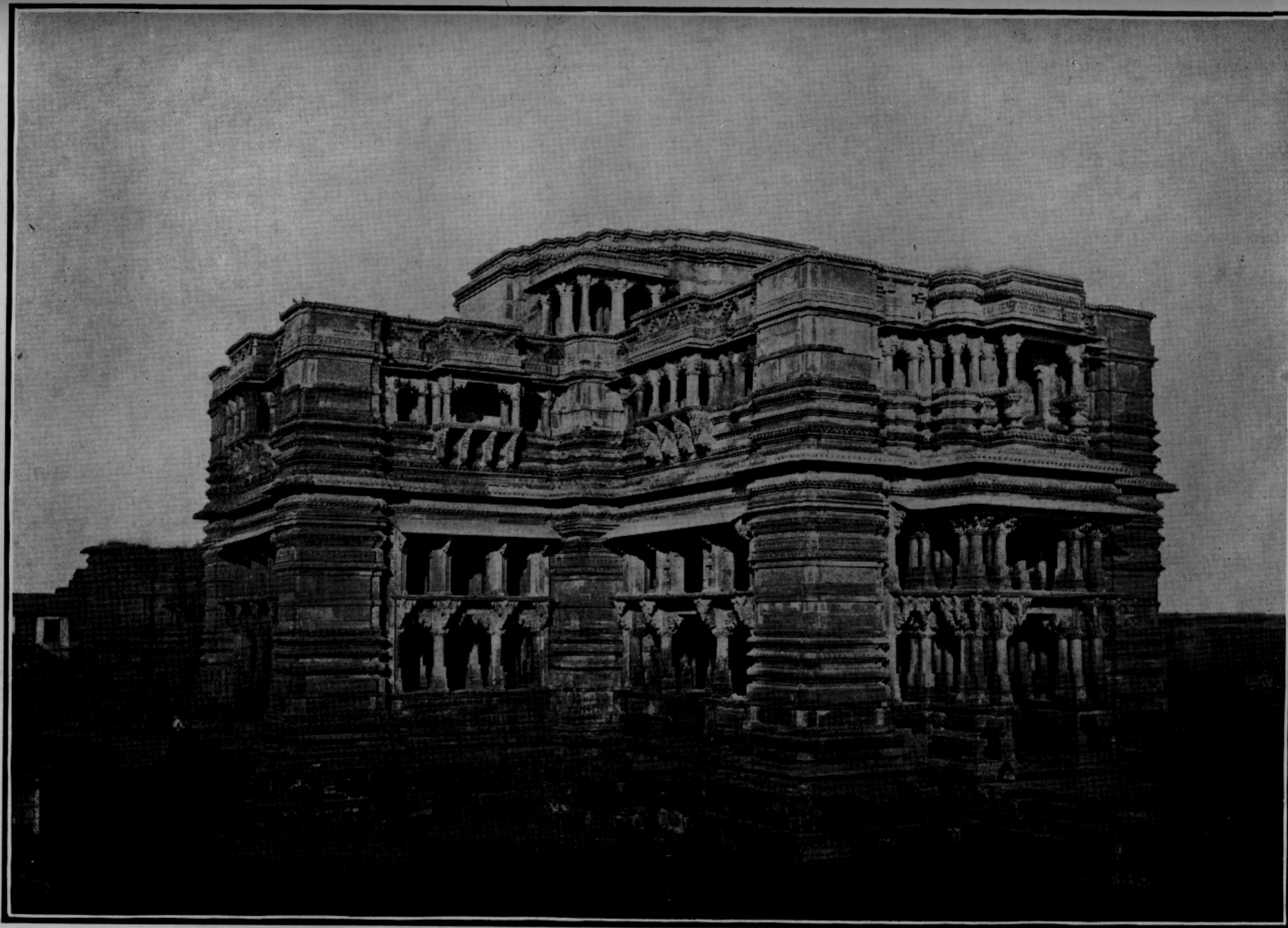
গোবিন্দজীর মন্দির—বৃন্দাবন

জন্য জয়পুর-দরবারের দেবোত্তর অবশ্যই থাকিত—যেমন গোবিন্দজীর মন্দিরের জন্য এখনও আছে।

গোবিন্দজীর মন্দির

গোবিন্দদেবের মন্দির মধ্যযুগে উত্তর-ভারতের হিন্দুস্থাপত্যের অনুপম কীর্ত্তি। বিক্রমাদিত্য-প্রতিম সম্রাট্ আকবরের নব-রত্ন সভার অন্যতম রত্ন সুপ্রসিদ্ধ রাজা মানসিংহ অজস্র অর্থব্যয়ে এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে, সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের রাজত্বে সাম্রাজ্যব্যাপী হিন্দু-মন্দিরধ্বংসলীলার সময় গোবিন্দজীর মন্দিরের এই দুর্দ্দশা হইয়াছিল। হিন্দু মন্দিরের আকাশচুম্বী শিখরসমূহ ধূলিসাৎ করিয়া পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণু সম্রাট্ হিন্দুধর্ম্মের চিহ্ন ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বুন্দেলখণ্ডের লাল কবি তাঁহার 'ছত্র-প্রকাশ' কাব্যে সম্রাটের এই মনোভাবের চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন :—

বুন্দেলখণ্ডের ফৌজদার ফিদাই খাঁর কাছে বাদশাহী ফরমান্ আসিল—

"নগর ঔড়্ছা মেঁ সুনৈ,
হিন্দু ধরৈ গুমান।
তে নিত পথর পূজিকৈ,
ফৈলাবত কুফরান্॥
উঁচী ধুজা দেবালন রাজৈ।
ঘণ্টা শংখ ঝালরৈ বাজৈ॥
ছাপৈ দেত তিলক ঠাঢ়ে।
মালা ধরে রহত মন বাঢ়ে॥
এসা হুকুম সরে' কা নাহী।
ক্যোঁ এ করত চিত কী চাহী॥
জো কঁহ কান শংখধুনি আবৈ।
মুসলমান তো ভিস্ত ন পাবৈ॥
সিসৌ ঔঁটি কান জো নাবৈ।
তো দোজখ্ তে খুদা বচাবৈ॥
তাতৈ ঢাহি দেবালৈ দীজৈ।
তিনকে ঠোর মসীদৈঁ দীজৈ॥
মুলনা তঁহা নিবাজ গুদারৈ।
বাঁগ দেহি নিত সাংঝ সকারৈ।
ন্যাউ চুকাবৈ ফাজিলকাজী।
জাত রহে গুসাই রাজী॥

অর্থাৎ "শুনিলাম, ঔড়্ছা শহরে হিন্দুর বড়ই গুমর। সেখানে নিত্য পাথর পূজা করিয়া তাহারা বে-ইমানী জাহির করিতেছে; উচ্চধ্বজা-বিরাজিত দেবালয়ে শঙ্খ, ঘণ্টা ও ঝাঁজ (cymbals) বাদ্য হইতেছে। হিন্দুরা ঠাট করিয়া তিলক কাটে, বুক ফুলাইয়া মালা জপে। শরিয়তের এ প্রকার হুকুম নাই; কেন ইহারা যা ইচ্ছা তাই করে? কানে যদি কখনও শঙ্খধ্বনি আসে, তাহা হইলে মুসলমান ত বেহেশ্তে (স্বর্গে) যাইতে পারিবে না! একমাত্র কানে ফুটন্ত গরম সীসা ঢালিয়া দিলে দোজখ হইতে খোদা তাহাদিগকে রেহাই দিতে পারেন। ওখানকার মন্দিরগুলি ভাঙিয়া মসজিদ করিয়া দাও। মৌলানারা ওখানে নমাজ পড়িবে, সকাল সন্ধ্যা আজান দিবে; এলেমদার কাজীরা* মামলা বিচার করিবে—যাহাতে খোদা আমাদের উপর রাজী থাকেন।"

* মস্জিদে বসিয়া কাজীদের মোকদ্দমা বিচার করিবার প্রথা বহুদিন হইতে মুসলমান রাজ্যে প্রচলিত ছিল।

যাহা হউক, সম্রাট্ আওরঙ্গজেব বুন্দেলখণ্ডের ফৌজদারকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, মথুরার ফৌজদারের উপরও বোধ হয়, সে রকম আদেশ হইয়াছিল। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বাদশাহী ফরমান্ জারি হইল,—সুবাদারেরা যেন নিজ নিজ এলাকায় হিন্দুদের মন্দির ও টোলগুলি ধ্বংস করিয়া, হিন্দুর শিক্ষা ও ধর্ম্মচর্চ্চা কঠোর ভাবে দমন করেন। তাঁহার রাজত্বের শেষ কাল পর্য্যন্ত এ আদেশ বলবৎ ছিল। জুলফিকর খাঁ ও মোগল খাঁ নামক কর্ম্মচারিদ্বয় ইহাতে একটু শৈথিল্য প্রকাশ করায় তাঁহারা বাদশাহ্‌র কাছে ধমক খাইয়াছিলেন—"হিন্দুর মন্দিরের ত পা নাই যে, ঐগুলি হাঁটিয়া চলিয়া যাইবে ?"

১৬৬০ হইতে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শেখ আবদুন্নবী ছিলেন মথুরার ফৌজদার। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়া উহার ভিত্তির উপর মথুরার বর্ত্তমান সুবৃহৎ জুম্মা মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। রাজা বীরসিংহ দেব বুন্দেলা ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কেশবজীর [কেশব-রায়] যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহার একটি ভগ্ন রেলিং বা আবেষ্টনী শাহজাদা দারা শুকো পুনর্নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের আদেশে আবদুন্নবী উহা ধ্বংস করেন। জাঠদের হাতে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আবদুন্নবীর জীবনলীলা সাঙ্গ হওয়াতে মথুরাবাসীরা একটি গান বাঁধিয়াছিল ; উহার ভণিতা—"নবীজী, তু বিনা সুন্ন মথুরা"—নবীজী, তোমা বিনা মথুরা আজ শূন্যপুরী। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে রমজান মাসের রোজার সময় ধর্ম্মপ্রাণ সম্রাট্ কেশবজীর মন্দির ধ্বংস করিতে জরুরি আদেশ দিয়াছিলেন ; অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার কর্ম্মচারীরা এ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ছোট বড় মূর্ত্তিগুলি আগ্রায় পাঠাইয়াছিল। এগুলি এখন আগ্রার জাহানারা-মসজিদের সিঁড়ির নীচে প্রোথিত আছে।

বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির কোন্ বৎসর ধ্বংস করা হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ নাই। কেশবজীর মন্দির ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা অল্পকাল পরে বৃন্দাবনের মন্দিরগুলি ধ্বংস করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গোবিন্দজীর মন্দিরের গর্ভগৃহ—যেখানে বিগ্রহ স্থাপিত ছিল, সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হইয়াছিল ; অন্যান্য অংশ মণ্ডপের ছাদের বরাবর করিয়া ভাঙা হইয়াছে। মুসলমানেরা বোধ হয়, মন্দিরের বর্ত্তমান অংশকে উচ্চ মঞ্চে পরিবর্ত্তিত করিয়া উহার উপর মথুরার মসজিদের মত একটি মসজিদ তৈয়ার করিবার অভিপ্রায়ে ইহা প্রায় অটুট রাখিয়াছিল। মধ্যচূড়ার ভগ্ন অংশের চারি দিকে একটা সামান্য ইটের দেওয়াল গাঁথা ছিল। বর্ত্তমানে ঐ কদর্য্য অংশ স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কথিত আছে, এই ভাবে ইহাকে একটা মসজিদের মত করা হইয়াছিল ; আওরঙ্গজেব উহাতে নমাজ পড়িয়াছিলেন। গোবিন্দজীর বিগ্রহ মন্দির-ধ্বংসের পূর্ব্বেই গোপনে আম্বরে নীত হইয়াছিল ; এখন তিনি সেখানে পূজা পাইতেছেন। গোবিন্দজীর ভগ্ন গর্ভগৃহ পরবর্ত্তী কালে ইট-সুরকী দিয়া কোন প্রকারে দেবস্থানের উপযোগী করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বিগ্রহ গিরিগোবর্দ্ধনধারীর মূর্ত্তি ; দুই পাশে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ।

মণ্ডপের পশ্চিম ভাগে একটি সংস্কৃত-প্রশস্তি লেখা ছিল। উহার ভগ্ন অংশটুকু গ্রাউস সাহেবের সময়ও পাঠোদ্ধারের প্রায় অযোগ্য ছিল। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি, ১৬৪৭ বিক্রমাব্দে (১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে) কচ্ছবাহ-রাজ মানসিংহ রূপ-সনাতন গুরুদ্বয়ের নির্দ্দেশানুসারে এ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। গোঁসাই রূপ ও সনাতন হোসেন-শাহী আমলের লোক। গ্রাউস সাহেব লিখিয়াছেন, ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল এবং নিধুবনে তাঁহাদের কৃপায় বাদশাহ্ লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সনাতন গোস্বামীর মৃত্যু ১৫৫৮ এবং রূপ-গোস্বামীর মৃত্যু ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।* সুতরাং ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ তাঁহাদের প্রতি ভক্তিবশতঃ এ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন—এ কথা বলা যায় না। গোস্বামীরা বৃন্দাবনে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে বৃন্দা দেবীর এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কেহ কেহ বলেন, ঐ মন্দির "সেবাকুঞ্জে"র মধ্যে অবস্থিত ছিল; বৃন্দা দেবীর মন্দিরের কোন নিদর্শন নাই। অন্য প্রবাদ, গোবিন্দজীর মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম মণ্ডপের বহিঃপ্রাঙ্গণের মধ্যে "পাতালদেবী" নামক যে ভূগর্ভস্থ গুম্ফা আছে, উহাই গোঁসাইগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বৃন্দা দেবীর আদি মন্দির।

উক্ত শিলালিপি মানসিংহ কর্ত্তৃক খোদিত আদি প্রশস্তি কি না বিশেষ সন্দেহ আছে। আমার মনে হয়, পরবর্ত্তী কালে বাঙালী গোস্বামিগণ এই ভগ্ন মন্দিরে বর্ত্তমান বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া মন্দিরের উপর নিজেদের দাবী দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই প্রশস্তি পরে যোজনা করিয়াছেন। গোবিন্দজীর পূজারী পাণ্ডারা এখনও জয়পুরে আছেন। তাঁহাদের আদিপুরুষ এই গোস্বামিদ্বয়ের কোন বাঙালী সেবক ছিলেন, ইহা প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত গোবিন্দজীর মন্দির-নির্ম্মাণে বাঙালী গোস্বামীদের কোন সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যাহা হউক, ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দজীর মন্দির যে রাজা মানসিংহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, মন্দির-গাত্রে খোদিত মন্দির-নির্ম্মাতা শিল্পীদের নামযুক্ত একখানি হিন্দী শিলালিপি দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয়। গ্রাউস্ সাহেব ইহার নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করিয়াছেন:—

"সংবত্ ৩৪ শ্রী শকবন্ধ অকবর শাহ রাজ শ্রীকর্মকুল শ্রী পৃথিরাজাধিরাজ বশ মহারাজ শ্রীভগবন্তদাসসুত শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রী মানসিংহদেব শ্রী বৃন্দাবন জোগপীঠস্থান মন্দির করাজৌ শ্রীগোবিন্দদেব কো কাম উপরি শ্রী কল্যাণ দাস আজ্ঞাকারী মাণিকচন্দ চোপাড়ু শিল্পকারি গোবিন্দদাস দীলবলি কারিগরুঃ দঃ। গোরযদস্থবোংভবল্ ॥"†

---

* বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১০।

† এই শিলালিপির কোন শুদ্ধ পাঠ কোথাও ছাপা হইয়াছে কি না, আমার জানা নাই। দঃ শব্দটির কোন অর্থ গ্রাউস্ সাহেব দেন নাই। মুসলমানেরা "Peace be on him" অর্থদ্যোতক আরবী কথা কয়েকটির পরিবর্ত্তে সংক্ষেপতঃ "দঃ" ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং "দীলবলি কারিগরু" সম্ভবতঃ কোন মুসলমান কারিগরের নাম—যাহার জন্য "দঃ" "Peace be on him"—প্রার্থনাবাণী যোজনা করা হইয়াছে।

শ্রীবিক্রমাদিত্য আকবর শাহ্ রাজ-সংবৎ (regnal year) চতুস্ত্রিংশ বর্ষে কূর্ম্মকুলোদ্ভব [কচ্ছবাহ = কচ্ছপঘাত] রাজাধিরাজ শ্রীপৃথ্বীরাজবংশজাত মহারাজ শ্রীভগবন্ত দাস-সুত মহারাজাধিরাজ শ্রীমানসিংহ দেব কর্ত্তৃক যোগ-পীঠস্থান শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের এই মন্দির নির্ম্মিত হইল। [ইহার] কাম-উপরি [সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ?] শ্রীকল্যাণ দাস, আজ্ঞাকারী [পরিচালক] শ্রীমাণিকচাঁদ চোপাড়ু (?), শিল্পকারী [architect] গোবিন্দদাস···*

গ্রাউস্ সাহেব ইহার অনুবাদ করিয়াছেন :—

"In the 34th year of the era inaugurated by the reign of the Emperor Akbar, Sri Maharaj Man Sinh Deva, Son of Maharaj Bhagavan Das, of the family of Maharaj Prithiraj, founded, at the holy shrine of Brindaban, this temple of Govind Deva. The head of the work Kalyan Das, the Assistant Superintendent, Manik Chan Chopar (?), the architect, Govind Das of Delhi, the sculptor, Gorakh Das" (*ibid.*, p. 145.)

উক্ত অনুবাদে "শকবন্ধ" শব্দটি বাদ পড়িয়াছে। হিন্দুরা আকবর বাদশাহ্‌কে শকবন্ধ বা "শকারি বিক্রমাদিত্য" বলিয়া অভিহিত করিত। "কর্ম্মকুল" সংস্কৃত কূর্ম্মকুল বা রাজস্থানী "কচ্ছবাহ্"-বংশোদ্ভব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "কাম-উপরি" রাজস্থানী কারবারী এবং মারাঠা "কারভারী" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। টাকাপয়সার হিসাবরক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) অর্থে ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে। "আজ্ঞাকারী" বোধ হয় অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নয়; ইহা আজ্ঞাকারক অর্থাৎ পরিচালক (supervisor) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। "Chopar" কোন শব্দ নাই, মাণিকচাঁদ চোপ্‌রা ক্ষত্রী হইতে পারে। চোপ্‌রা পঞ্জাবী ক্ষত্রী [বৈশ্য]দের মধ্যে এখনও প্রচলিত উপাধি। "দীলবলি" শব্দটি গ্রাউস সাহেব "দেহেল্‌বী" অর্থাৎ দিল্লীওয়ালা অর্থে লইয়াছেন। আমার মনে হয়, ইহা ভুল। যদি এই শব্দদ্বারা উহাই প্রকাশ করা লেখকের অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে শুধু "দীলবি" লেখা হইত। "দীলবলি" মুসলমানী নাম Dilwar [দিলবর] বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ আছে। কারণ, দঃ [Peace be on him !] এই আশীর্ব্বাণী কোন মুসলমানের নামের পর লিখিবার প্রথা আছে। দ্বিতীয়তঃ, সম্রাট্ আকবর হিন্দু ও মুসলমান উভয় স্থাপত্যধারার অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়া ভারতবর্ষের জাতীয়তাদ্যোতক নূতন যে স্থাপত্যকলা প্রচলিত করিয়াছিলেন এবং যাহার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন তাঁহার ফতেপুর সিক্রী—সেই নূতন ধারা অনুসারে গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। গম্বুজাদি-নির্ম্মাণে মুসলমানেরাই অধিকতর দক্ষ ছিল। সুতরাং মনে হয়, হিন্দু গোবিন্দ দাস ছিল architect এবং "দিলবর" নামক ব্যক্তি ছিল কারিগর অর্থাৎ প্রধান রাজমিস্ত্রী।

---

* কাম-উপরি = মারাঠা কারভারী, হিন্দী কারবারী; আজ্ঞাকারী = আজ্ঞাকারক অর্থাৎ পরিচালক অর্থে অবহৃত হইয়াছে; চোপাড়ু = চোপরা, পঞ্জাবী ক্ষত্রী অর্থাৎ বৈশ্যদিগের মধ্যে এই
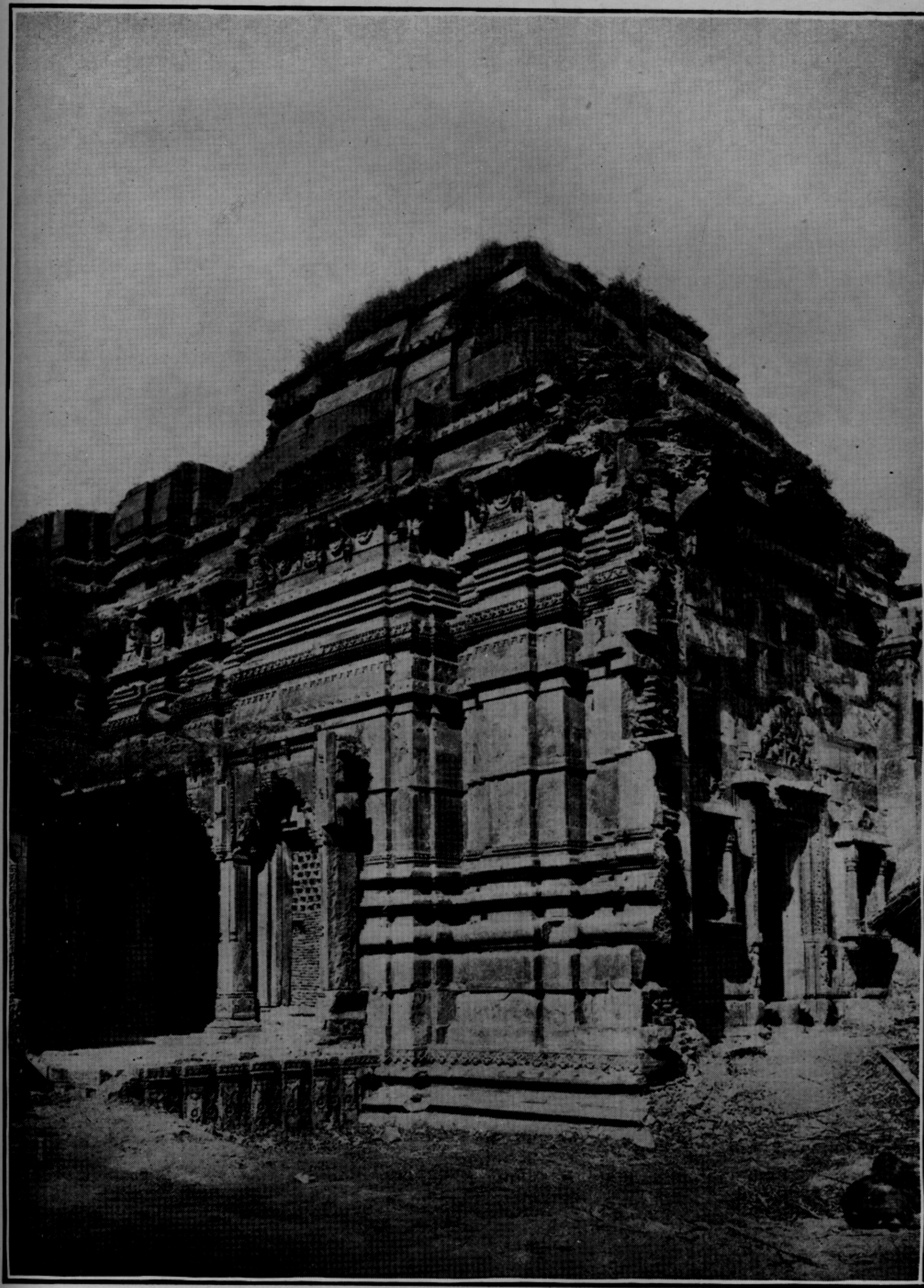
গোপীনাথজীর মন্দির—বৃন্দাবন

যাহা হউক, এই দ্বিতীয় শিলালিপিদ্বারা নিঃসংশয় প্রমাণিত হইতেছে, মহারাজ মানসিংহ আকবরের রাজত্বের ৩৪ বর্ষে অর্থাৎ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গোবিন্দজীর মন্দিরের দক্ষিণ-মণ্ডপের সম্মুখে একটি "ছত্রী" ছিল। বর্ত্তমানে উহা পশ্চিমাংশে নূতন করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। মহারাণা অমর সিংহের দ্বিতীয় পুত্র রাজা ভীমের বিধবা পত্নী রম্ভাবতী এই চৌখণ্ডী বা ছত্রী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সম্রাট্ শাহ্জাহানের রাজত্বে ১৬৯৩ বিক্রম-সংবৎ (১৬৩৬ খ্রীঃ) কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে উহার প্রতিষ্ঠা হয়। ছত্রীর একটী স্তম্ভের গাত্রে রাজপুতানী ভাষায় লিখিত একটি শিলালিপি পাঠে উক্ত বিবরণ জানা যায় (*ibid.*, **p. 146**)। শাহ্জাহানের দরবারী ইতিহাস আব্দুল হামিদ লাহোরী-লিখিত বাদশাহ্নামায় উল্লেখ আছে—জাহাঙ্গীর তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে এক আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে, হিন্দুরা তাঁহার রাজ্যে কোথাও নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। এই নিষেধ প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে হিন্দুরা যে সমস্ত মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিল, শাহ্জাহানের রাজ্যারোহণের পর সেই অর্দ্ধনির্ম্মিত মন্দিরগুলি সম্পূর্ণ করিবার প্রার্থনা করিয়া তাহারা এক আবেদন করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে ফল হইল বিপরীত। সম্রাট্ আদেশ দিলেন, নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করা দূরে থাক্, পূর্ব্বকৃত মন্দিরগুলিও ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। বাদশাহ্নামার এক স্থানে লেখা আছে—অমুক তারিখে খবর পৌঁছিল, একমাত্র কাশীর আশপাশে ৭২টি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হইয়াছে। সুতরাং এরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান সম্রাটের রাজত্বে রাণী রম্ভাবতী-কর্ত্তৃক এই ছত্রী নির্ম্মিত হওয়ার পশ্চাতে হয়ত কিছু ইতিহাস আছে। রাজা ভীম জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী খুর্‌রম বা শাহ্জাহানের বিশেষ বন্ধু এবং বিপৎকালের সহচর ছিলেন এবং তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিয়া মারা গিয়াছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় শাহ্জাহান কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া তাঁহার বিধবা বন্ধুপত্নীর এই শরিয়ৎ-বিরোধী কার্য্য অনুমোদন করিয়াছিলেন। ইহার অবশ্য নজীরও ছিল। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর কাংড়ার জ্বালামুখী-মন্দিরে গোহত্যা করিয়া উহাকে মসজিদে পরিণত করিয়াছিলেন; কিন্তু আবার তিনিই আবুলফজলের হত্যাকারী বীরসিংহ দেব বুন্দেলা কর্ত্তৃক মথুরায় সুবিশাল কারুকার্য্যখচিত কেশবজীর মন্দির নির্ম্মাণ অনুমোদন করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে বাদশাহী খেয়াল; কিন্তু আওরঙ্গজেব ছিলেন শরিয়তের একনিষ্ঠ সাধক।

মহারাজা মানসিংহ গোবিন্দজীর সেবার জন্য বিপুল ভূসম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছিলেন। জয়পুরের মহারাজারা এই মন্দিরের পুরুষানুক্রমিক অভিভাবক। ইহার জমিদারির আয় প্রায় ৪৫০০৲ টাকা। জয়পুর এলাকায় একটি ও আলোয়ার রাজ্যে একটি গ্রাম এই জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। বৃন্দাবনে রাধাবাগ এবং অনেক বাড়ীও গোবিন্দজীর সম্পত্তি। লালাবাবুর মন্দিরের জমিও গোবিন্দজীর জমিদারি হইতে খরিদ করা হইয়াছে। এ জন্য লালাবাবুরা প্রতিবৎসর ১০২৲ টাকা জমা দিয়া থাকেন।

গোপীনাথজীর মন্দির

গোপীনাথজীর মন্দির মদনমোহনজীর মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার প্রতিষ্ঠাতা শেখাবতী-রাজ্যের কচ্ছবাহ্ সামন্ত রায়সালজী। আকবরনামায় ইনি রায়সাল দরবারী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ইহাঁর মণ্ডপটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হইয়াছে। এই মণ্ডপের স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যও অপূর্ব্ব ছিল। ইহার উত্তরাংশে গোপীনাথজীর বর্ত্তমান মন্দির অবস্থিত। আকবরনামা, মাসির-উল-উমারা ও টডের রাজস্থানে রায়সালজীর জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই মন্দিরের নির্ম্মাণকাল অবশ্য আকবরের রাজত্বসময়ে। কিন্তু সঠিক তারিখযুক্ত কোন শিলালিপির অনুসন্ধান এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। ইহার দেবোত্তর সম্পত্তির আয় বার্ষিক ১২০০৲ টাকা। গোপীনাথজীর দেবোত্তর হইতে বার্ষিক ১৮৲ টাকা জমায় শেঠ-উদ্যানের জমির কিছু অংশ ক্রয় করা হইয়াছে।

যুগলকিশোরজীর মন্দির

বৃন্দাবনে মধ্যযুগের হিন্দু স্থাপত্যের আর একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যুগলকিশোরজীর মন্দির। কেশীঘাটের নিকট এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। ইহার গর্ভগৃহ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। গ্রাউস্ সাহেব এই মন্দির ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ তিনি উল্লেখ করেন নাই। জনশ্রুতি অনুসারে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা নোন্-করণ (বা লুনকরণ) নামক একজন চৌহান ঠাকুর। এই নামের কোন চৌহান ঠাকুরের ঐতিহাসিক পরিচয় তাঁহার জানা ছিল না বলিয়াই তিনি লিখিয়াছেন—এই নোন্-করণ বোধ হয়, গোপীনাথজীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শেখাবৎ রায়সালজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নোন্-করণ। জনশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া এইরূপ অনুমানের পক্ষে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। নোন্-করণ বা লুনকরণ নামে রাজপুতানায় সম্ভরের এক রাজা ছিলেন। আকবরনামায় এই নোন্-করণ বা লুনকরণের একাধিক বার উল্লেখ আছে। মারবাড়ের রাও মালদেব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় ইনি নাগোরের শাসনকর্ত্তা মীর্জা শরফ-উদ্দীনের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন; পরে তিনি কচ্ছবাহ্-রাজ ভড়মলের [বিহারী মল] সহিত একত্র হইয়া আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। আকবরের সামন্তশ্রেণীভুক্ত হইয়া তিনি অনেক যুদ্ধে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার সময়—আকবরের রাজত্বের প্রথম ভাগ। শূরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরাজের সময় হইতে সম্ভর-রাজ্য চৌহানকুলের অধীন ছিল। পৃথ্বীরাজও হিন্দী কাব্যাদিতে সম্ভরী-রায় * বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সুতরাং এই চৌহান-বংশীয় নোন্-করণই যুগলকিশোরের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া যে জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে, উহা ঐতিহাসিক সত্য সন্দেহ নাই। স্থাপত্যধারার দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলেও ইহা প্রমাণিত হয় যে, এই মন্দির আকবরের সমকালীন।

---

* চাঁদকবির পুত্র জল্হন্ পৃথ্বীরাজের মৃত্যুবর্ণনায় লিখিয়াছেন :—

পরিয়ো সংভরী রায় দীসৈ উতংগা ;
মনো মের বজ্রী কিয়ঁ শৃংগ ভংগা।

অর্থাৎ সংভর-পতি ভূপতিত হইলে অষ্ট দিক্ কাঁপিয়া উঠিল ; মনে হইল, যেন বজ্রধারী ইন্দ্রদেব
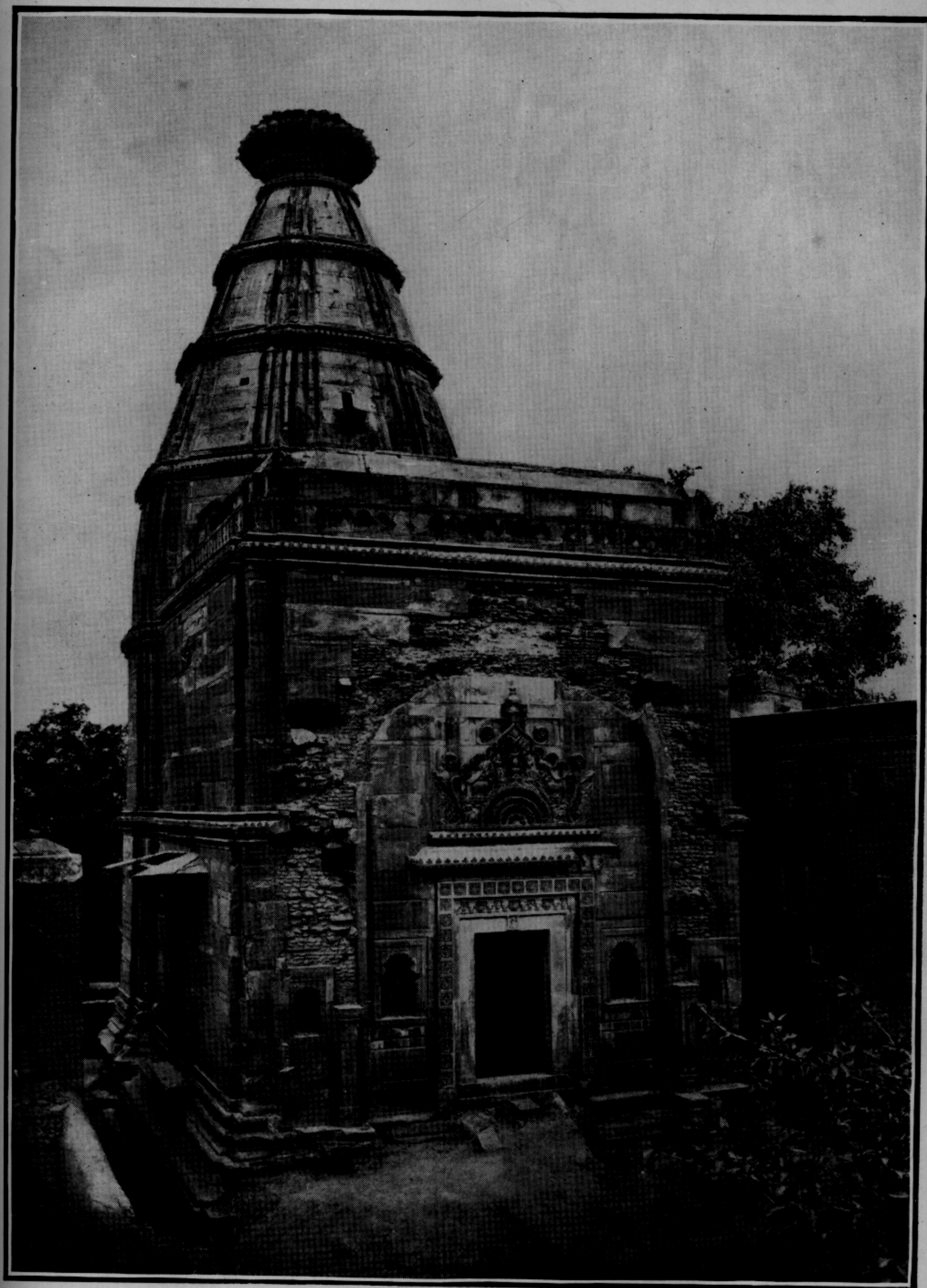
যুগলকিশোরজীর মন্দির—বৃন্দাবন

চোরের পাঁচালি

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ,

'চুরিবিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা,' এই প্রসিদ্ধ প্রবাদের দৃষ্টান্ত হিসাবে বহু গল্প বাংলার পল্লীতে পল্লীতে প্রচলিত রহিয়াছে। চোরের বুদ্ধির প্রখরতা এই সকল গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই জাতীয় কোন কোন গল্পের সহিত অনেকেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। বাংলার নানা প্রান্তে চুরিবিদ্যার উৎকর্ষ ও চোরের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন উপাখ্যান বা রূপকথার প্রচলনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'সন্দেশ' নামক অধুনালুপ্ত শিশুদের মাসিক-পত্রে 'চোরচক্রবর্ত্তী' নামে এইরূপ একটি উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছিল। গুরুর নিকট চুরিবিদ্যায় উৎকর্ষ লাভ করিয়া পাখীর ডানার তলা হইতে পাখীকে না জানাইয়া ডিম চুরি করা, কোনও দ্বীপের রাজাকে পূর্ব্বে সতর্ক করিয়া চুরির উপদ্রবে তাঁহার রাজ্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা প্রভৃতি পরীক্ষায় সর্বথা কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া চাষীর ছেলে কিরূপে 'চোরচক্রবর্ত্তী' উপাধি ও রাজ্য লাভ করিয়াছিল, তাহার বিবরণ এই উপাখ্যানে আছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তি-প্রণীত 'চোরচূড়ামণি'[১] নামক এক পুস্তকে এক রাজপুত্রের চুরিবিদ্যায় কৃতিত্বের বিবরণ পাওয়া যায়। সমস্ত বিদ্যা অধিগত হইবার পর রাজপুত্র চুরিবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পাখীকে না জানাইয়া তাহার ডানার তলা হইতে ডিম চুরি, রাজার গলা হইতে হার চুরি, এবং দেশান্তরের রাজাকে খবর দিয়া তাঁহার কন্যার গলা হইতে বহুমূল্য হার চুরি করা প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সকলকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করেন। যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়-লিখিত 'মজার গল্প' নামক পুস্তকেও চোরের কৃতিত্ববিষয়ক একটি গল্প আছে। বস্তুতঃ চোরের পাঁচালি বা চোরের উপাখ্যানমূলক এক জাতীয় পুস্তক পুরান বাংলা-সাহিত্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। পুরান বাংলায় রচিত এইরূপ একাধিক পাঁচালির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। একখানি পাঁচালি কয়েকবার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার নাম 'চোরচক্রবর্ত্তি'। ইহার চতুর্থ সংস্করণের ১৩১৩ হিজরি বা ১৮৯৫-৬ খ্রীষ্টাব্দের গোলাম মওলা নামাঙ্কিত মোহরযুক্ত এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকালয়ে আছে। ইহার পাতা-গুলি তথাকথিত 'মুসলমানী বাংলা পুথি'র মত ডান হইতে বাঁ দিকে সাজান। মূল পুস্তকের রচয়িতা, প্রাপ্তিস্থান ও প্রকাশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে প্রকাশকের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

এই পুস্তকের মুসাবিদাকারক মৃত পশুপতি এবং স্থানে স্থানে বির কাসিস্বর সন্ধ লেখা আছে২।

১। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাসও 'চোরচূড়ামণি' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

২। কালিকাপ্রসাদে রচে কবি কালিদাসে—পৃঃ ৩। বলে বীর কাশীশ্বর সদয় ভগবতী—পৃঃ ১০। বলে বীর কাশীশ্বর দেবীর চরণে—পৃঃ ২০। গোলাম মওলা কয়—পৃঃ ২৩। বলে বীর কাশীশ্বর কালিকার বরে—পৃঃ ২৮। গোলাম মওলা বলে—পৃঃ ৭৬।

এই চোর চক্রবর্তির পুস্তক জেলা বগুড়ার কলুমগাড়ি সাকিনের শ্রীজুত মুন্সি সহরুল্লা ও উক্ত সাহেবের সাগ্রেদ শ্রীমুন্সি জমিরদ্দি আখন্দ সাহেবানদিগের সম্পুর্ণ সাহায্যে ও মেহেরবানিতে ঐ মুসবিদা আনাইয়া আমি শ্রীগোলাম মওলা অনেক পরিশ্রমে ঐ মুসবিদার কাপি সংসোধনপূর্ব্বক এবং স্থানে ২ নিজে রচনা করিয়া নিজ খরচ পত্রে সিবাদহ হাজিপাড়া সাকিনে আমার হবিবি প্রেসে চতুর্থবার ছাপাইয়া প্রকাশ করিলাম।

এই পুস্তকে 'চোরচক্রবর্তী' উপাধিধারী প্রসিদ্ধ চোরের চমকপ্রদ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। এই চোরচক্রবর্তীর কাহিনী অবলম্বনে লিখিত আর একখানি পুস্তকের পুথি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় আছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা প্রসঙ্গে পরিষৎ-কর্তৃপক্ষ ইহাকে একখানি মূল্যবান্ পুথি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই পুথির আলোচ্য বিষয়ের কোনও পরিচয় এ যাবৎ কেহ প্রদান করেন নাই; কি হিসাবে ইহার মূল্য, তাহাও নির্ণীত হয় নাই। বর্তমান প্রবন্ধে এই দুই প্রসঙ্গেরই যথাসম্ভব আলোচনা করা হইবে।

এক প্রসিদ্ধ সুচতুর চোরের চৌর্য বর্ণনাই এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়—ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তবে পূর্বকথিত মুদ্রিত পুস্তকের সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকিলেও মিল নাই।[৩] এই পুথিতেও বীর কাশীশ্বরের ভণিতা আছে সত্য, তথাপি ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ। বোধ হয়, পুথিতে প্রাপ্ত কাশীশ্বরের গ্রন্থাবলম্বনে মুদ্রিত গ্রন্থখানি পশুপতিকর্তৃক রচিত ও গোলাম মওলা কর্তৃক সংস্কৃত হইয়াছিল। পুথির নকলের তারিখ ১১৭২ সাল। দুই পুস্তকেই চোর কালীর উপাসক—মুদ্রিত পুস্তকের মতে কালীর নিকট হইতেই চোর চুরিবিদ্যা শিক্ষা করে (পৃঃ ৩)।[৪] উভয় পুস্তকের বর্ণনীয় বিষয় এক—খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু কিছু পার্থক্য আছে মাত্র। এই সকল পার্থক্যের কথা পুথিখানির বর্ণনাপ্রসঙ্গে নিম্নে যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। মনে হয়, এক যুগে চোর-চক্রবর্তীর নাম বাংলা দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার কীর্তিবিষয়ক নানা উপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্বে উল্লিখিত 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত উপাখ্যান ও চোরচূড়ামণির উপাখ্যান এই বহুপ্রচলিত বিক্ষিপ্ত উপাখ্যান-সমষ্টির অংশবিশেষ বলিয়া মনে হয়। এই উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত এক গ্রন্থের

৩। মাঝে মাঝে দুই এক পংক্তি প্রায় মিলিয়া যায়ঃ—

> এক হাতে গুআ পান আর হাতে ঝাড়ি।
> স্বামীকে ভেটিতে জায় সাধুর কুমারী॥ (১৮ খ, পৃঃ ৩১)।
> অকুলীন ধন হৈলে হয়ত কুলীন।
> কুলীন নির্ধন হৈলে হয় বড় হীন॥ (১৯ ক, পৃঃ ৩২)

৪। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে মহাদেবের পুত্র দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে চৌর্যশাস্ত্রের প্রবর্তক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

কথা ১২১৩ সনে রাজা পৃথ্বীচন্দ্র-রচিত 'গৌরীমঙ্গল' নামক গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে।[৫] আমাদের উল্লিখিত কোনও গ্রন্থের সহিত পৃথ্বীচন্দ্রের উল্লিখিত গ্রন্থ অভিন্ন কি না, বলিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাদের কোনখানিরই রচনা-কাল নির্ণয় করাও সম্ভবপর নহে। তবে এই দুইখানি পুস্তক হইতে দেবতার পাঁচালিপরিপূর্ণ পুরান বাংলা সাহিত্যে এক নূতন ধরণের পাঁচালির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, প্রাচীন সাহিত্যামোদীর নিকট ইহাদের কিছু মূল্য আছে। তাই ইহাদের একটু বিস্তৃত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল। রূপকথার ইতিহাসের দিক্ হইতেও এই সমস্ত গল্পের মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশে প্রচলিত এই জাতীয় গল্পগুলি সুশৃঙ্খল আলোচনার অভাবে পণ্ডিতসমাজের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাই ব্লুমফীল্ড নামক প্রসিদ্ধ মার্কিন পণ্ডিত "The art of stealing in Hindu fiction"[৬] নামক বিস্তৃত প্রবন্ধে বাংলা দেশে প্রচলিত উপাখ্যানের বিশেষ বিবরণ প্রদান করিতে পারেন নাই।

চোরের রীতিনীতি সম্বন্ধে সাধারণকে সচেতন করাই আলোচ্য পুস্তকের উদ্দেশ্য—চোরের প্রশংসা বা চৌর্যের উৎসাহ প্রদান ইহার কাম্য নহে। তাই গ্রন্থকার প্রথমেই বলিয়াছেন,—

চৌরচক্রবর্তিকথা শুনিতে মোধুর।
জে কথা শুনিলে লোক হয় ত চতুর।[৭]

চোরের নাম খরবর—পিতা বিজয়নগরের রাজার পাত্র উগ্রসেন, মাতা গুণবতী (পত্র ১ খ, ২ খ)।[৮] কাব্য, জ্যোতিষ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া খরবর 'কৌতুকে শিখিল উত্তম অধম চৌরবিদ্যা' (৩৬ ক)।[৯] অতঃপর, চম্পাবতী নগরীর কর্তৃপক্ষের

৫। চোরচক্রবর্ত্তীকীর্ত্তি ভাষায় রচিল।
বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি পয়ার করিল॥—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৩, পৃ. ৫০।

এই কবিতায় দুইখানি গ্রন্থের কথা ('চোরচক্রবর্তিকীর্তি' ও 'বিক্রমাদিত্যকীর্তি') উল্লিখিত হইয়াছে মনে হয়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মনে করেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১ম সংস্করণের ভূমিকা, পৃ. ১৩) ইহাতে চোরচক্রবর্তিরচিত বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যানের উল্লেখ করা হইয়াছে।

৬। *American Journal of Philology*, ৪৪শ খণ্ড, পৃঃ ৯৭-১৩৩, ১৯৩-২২৯।

৭। মুদ্রিত গ্রন্থের মতে—'চোরচক্রবর্তি নাম রহে জার ঘরে। চোরে না দেখিবে চক্ষে তাহার মন্দিরে' (পৃঃ ২)। 'এই পুথি যেই জন ঘরেতে রাখিবে। তার ঘরে চোর চুরি করিতে নারিবে' (পৃঃ ৭৯)।

৮। মুদ্রিত পুস্তকে রাজার নাম রত্নেশ্বর বা বাণেশ্বর, পাত্রের স্ত্রীর নাম কলাবতী, চোরের বাড়ী বিক্রমপুর—'সোনার গ্রাম বিক্রমপুর মোর বাড়ীঘর' (পৃঃ ১১)। পুথিতেও এক স্থানে (৩৬ ক) কলাবতী নাম আছে। এই স্থানে চোরের আসল নামের উল্লেখও আছে—'বাছিএগ্রা রাখিল মোর নাম কৃষ্ণ করি।'

৯। যে চতুঃষষ্টিকলা লোকের নিকট বিশেষ আদর ও সম্মান পাইত, তাহার মধ্যে চুরি-

অত্যাচারে ত্রস্ত হইয়া চোরের দল চোরচক্রবর্তীর নিকট নিজেদের দুঃখের কথা জানাইলে

শুনিঞা প্রতিজ্ঞা কৈল চৌর থরবর। তবে চৌরচক্রবর্ত্তী নাম সাফল।
জতেক চৌরের মধ্যে আমি নরপতি। চাম্পাবতী পুরীখান করিমু বিকল॥
আমা বিগুমানে করে এতেক দুর্গতি। নগরিঞা লোক সব করিমু ভিখারী।
শুনিঞা চৌরের কথা কোপিল প্রচণ্ড। কেমতে রাখিবে রাজা আপনার পুরী॥ (১খ)
চাম্পাবতী পুরীখান করিমু লণ্ডভণ্ড॥

গোপনে যাওয়া লজ্জার বিষয় মনে করিয়া চোর, এক পত্র দ্বারা নিজের প্রতিজ্ঞার কথা প্রথমে রাজাকে জানাইয়া দিল। তার পর চোর 'উর্দ্ধজানু করিঞা' কালীর ধ্যান করিল এবং দেবীর বরে বলীয়ান্ হইয়া প্রত্যুষে যাত্রা করিল। তপস্বীর বেশে চাম্পাবতী পুরীতে প্রবেশ করিয়া চৌকিদারের নিকট নিজের পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিল—

শিশুকাল হইতে আমি হইলাউ সন্ন্যাস।
অযোধ্যাতে ঘর আমার নাম কৃষ্ণদাস॥
নানাতীর্থ ভ্রমিতে আমি হাবিলাস করি। (৩খ)

তীর্থভ্রমণের দীর্ঘ বিবরণে সন্তুষ্ট না হইয়া চৌকিদার চোরকে রাজার নিকট লইয়া যাইতে চাহিলে চোর কপট ক্রোধের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ভয়ে চৌকিদারও তাহাকে ছাড়িয়া দিল। নগরের মধ্যে রাজার মালীর নিকট নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়া, চোর তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিল। মালীও তাহাকে অভয় প্রদান করিল—

রাজার প্রসাদে অমি কাকো না ডরাই। মহাসুখে থাক তুমি না ভাবিহ ডর।
বিশেষে রাজাকে আমি পুষ্প জোগাই॥ নির্ভয়ে থাক তুমি আমার ঘর॥ (৭খ)

চোর তখন তপস্বীর বেশ ত্যাগ করিয়া, সাধু বা সদাগরের বেশ ধারণ করিল।

কর্ণের কুণ্ডল খসাঞা মালির হাথে দিল।
বিচারিঞা কেশ মাথে লোটাঞা বান্ধিল। (৮ক)

বিদ্যারও স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। মল্লিখিত Two New Lists of kalas—*Indian Historical Quarterly* (৮।৫৪৭) দ্রষ্টব্য। রাজকুমারেরা অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় চুরিবিদ্যায়ও শিক্ষালাভ করিতেছেন, এরূপ বর্ণনা দশকুমারচরিত (কানের সংস্করণ, পৃঃ ২২) প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই বিদ্যাসম্বন্ধে প্রাচীন যুগে সংস্কৃতে বই লেখা হইয়াছিল। দুই একখানি বইয়ের পুথি এখনও পাওয়া যায়। একখানির নাম ষণ্মুখকল্প, আর একখানির নাম চৌরচর্যা বা চৌর্যস্বরূপ। প্রথমখানির পুথি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটীতে ও দ্বিতীয়খানির পুথি পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটে আছে। কর্ণীসুত বা মূলদেব ছিলেন এই শাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থকার। মূলদেব লিখিত কোন বই এখন পাওয়া যায় না। তবে তামিল সাহিত্যে মূলদেবকৃত একখানি চৌর্যশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। তিনি নিজেও একজন প্রসিদ্ধ চোর ছিলেন। তাঁহার চুরির গল্পও এক যুগে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার কিছু বিবরণ কথাসরিৎসাগর নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়।

এইরূপ সাধুর বেশ ধারণ করিয়া চোর প্রথম দিন বাজারের গোয়ালিনীকে ঠকাইয়া প্রচুর দধিদ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি করিল—দ্বিতীয় দিন নাপিতকে ঠকাইয়া ক্ষৌরকার্য সমাধা করিল এবং তাঁতীদের ফাঁকি দিয়া বিবিধ মূল্যবান্ বস্ত্র সংগ্রহ করিল। ইহার পর সে নগরের ঘরে ঘরে নিয়মিত চুরি আরম্ভ করিল।

রাত্রি চুরি করে চোর দিনে যায় নিন্দ। নগরিঞা লোক কান্দে মাথে হাথ দিঞা।
প্রভাতে উঠিঞা দেখ সর্ব্বঘরে সিন্ধ। হায় হায় করে লোক বিকল হইঞা। (১৩ ক)

কিন্তু এত সব করিয়াও চোরের মনে তৃপ্তি হইল না—সে রাজগৃহে চুরি করিবার জন্য কালিকার আরাধনা করিতে লাগিল—

নিশিকালী মহাকালী উন্মত্তকালী নাম।
চরণে পড়হ মাতা আইস এই ধাম। (১৪ খ)

দেবী বর দিলেন—'যাহ রাজঘরে আমি থাকিব সঙ্গতি' (১৪ খ)। কিন্তু চোরের ধনের আকাঙ্ক্ষা ছিল না—

চোর বোলে ধন লৈঞা আমি কি করিব।
রানি চুরি করি আমি কলঙ্ক থুইব। (১৫ ক)

চোর 'রাজার মন্দিরে গিঞা নিদানি ভেজাইল।' সকলে নিদ্রায় অচেতন হইলে

রানিক লইঞা চোর বাহির করিল। চিড়াকুটির স্ত্রীকে নিল সঙ্গেত করিঞা।
পথেত যাইতে চোর মোনেত ভাবিলা। ত্বরায় আইল চোর রাজার পুরিতে।
চিড়াকুটির[১০] বাড়ি জাঞা প্রবেশ হৈলা। চিড়াকুটির স্ত্রীকে থুইল রাজ্যাতে [রাজার শয্যাতে।]
চিড়াকুটির শয্যাতে রানিক থুইঞা।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাজা দেখিলেন—পাশে শুইয়া এক রাক্ষসী। 'গুণী' ডাকা হইল—তাহারা মন্ত্র পড়িয়া রাক্ষসী তাড়াইতে চেষ্টা করিল। এ দিকে চিড়াকুটি ভাবিল—তাহার ঘরে দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাই পাড়াপড়সী সকলে মিলিয়া পূজার আয়োজন করিতে লাগিল। খবর পাইয়া রাজাও আসিলেন এবং তখন সকলে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন।

এবার চোর ঠিক করিল, কোটাল দোসাহুর ঘরে চুরি করিয়া নিজ নামের সার্থকতা প্রতিপাদন করিবে।

তবে চৌরচক্রবর্ত্তী নাম পাড়াব।
জাতিনাশ ধননাশ কোটালের করিব। (১৬খ)

দরোয়ানের সহিত কথাপ্রসঙ্গে চোর জানিতে পারিল—কোটালের একমাত্র কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করিয়া সদাগরকুমার বিদ্যাধর দীর্ঘকাল বিদেশে গিয়াছে। কয়েক দিন পরে সদাগরের বেশ ধারণ করিয়া চোর কোটালের বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং কোটালের

১০। মুদ্রিত পুস্তকে চিড়াকুটির স্থানে সূত্রধরের কথা বলা হইয়াছে (পৃঃ ৪৪)।

জামাতা বলিয়া নিজের পরিচয় দিল। পরম আদর যত্নে সে সেখানে রাত্রি যাপন করিল—লীলাবতী 'যৌবনের মদে পতি না চিহ্নে আপনার' (২০ক)। প্রাতঃকালে কোটাল রাজবাড়ী গেলে চোর রটাইয়া দিল—রাজা কোটালকে বন্দী করিয়াছেন—

হাথেতে বান্ধিঞা রাখিল কারাগারে।
না জানিএ রাজা কিবা করে আরে॥
জাতিপ্রাণ লঞা বুলিল পালাইতে মোরে॥ (২১ ক)

সুতরাং চোর কোটালের দুই স্ত্রী, কন্যা, ধনরত্ন লইয়া পলায়ন করিল। এদিকে রাজা চোর ধরিবার কোনও উপায় করিতে না পারিয়া কলাধর নামক সর্বজান বা সর্বজ্ঞকে আনাইলেন। লোক লইয়া কলাধর চোর ধরিবার জন্য যাত্রা করিল।

বেস্ত হঞা জায় চোর স্থান নাই পায়।
পলাইঞা চোর ধোবার ঘাটে জায়॥ (২৪ খ)

ঘাটে মনোহর ধোপা কাপড় কাচিতেছিল। চোর তাহাকে বলিল,—'রাজার আদেশে কোটাল তোমাকে কাটিতে আসিতেছে।'

চোর বোলে শুন ধোবা আমার বচন। এক গোটা পাতিল মুণ্ডের উপর দিঞা।
জলেত প্রবেশ করি থাকহ এখন॥ জলের ভিতরে তুমি থাকহ লুকাঞা॥ (২৫ ক)

প্রাণের ভয়ে ধোপা চোরের পরামর্শানুযায়ী কাজ করিল—চোর তাহার জায়গায় কাপড় কাচিতে লাগিল। কলাধর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে ধোপা-বেশী চোর তাহাকে জানাইয়া দিল যে, চোর জলের মধ্যে লুকাইয়া আছে। তাহার কথামত রাজার লোকেরা ধোপাকে জলের ভিতর হইতে উঠাইয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। এদিকে চোর ধোপার সমস্ত কাপড় লইয়া পলায়ন করিল।

আসল চোর ধরিতে না পারায় কোটাল কলাধরকে উপহাস করিতে লাগিল। কলাধরও সাহঙ্কারে বলিল—

তবে মোকে সর্বজান বুলিহ কলাধর।
কালি ধরিঞা দিমু চোর খরবর॥ (২৭ ক)

এদিকে চোরচক্রবর্তীও চিন্তিত হইয়া চণ্ডী দেবীকে ডাকিতে লাগিল। রাত্রিতে 'গুয়াপান' ও একখানি কাটারি লইয়া চোর কলাধরের বাসায় উপস্থিত হইল। অনেক ডাকাডাকির পর কলাধর জাগরিত হইলে চোর তাহাকে বলিল—'রাজায় গুআপান তোমাকে পাঠাইল।' তখন "গুয়া পান" গ্রহণ করিবার জন্য কলাধর হাত বাড়াইবা মাত্র কাটারির এক আঘাতে চোর তাহা দুই খণ্ড করিল। তার পর সেই কাটা হাত লইয়া রাজবাড়ীতে গেল এবং রাজার ঘরে সিঁধ কাটিল। কেহ জাগরিত আছে কি না, দেখিবার জন্য যেই চোর সেই কাটা হাতখানি ঘরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিল, অমনি রাজা তাহার উপর খড়্গাঘাত করিলেন। চোরও কাটা হাত ফেলিয়া পলায়ন করিল। রাজা ভাবিলেন—এইবার চোরকে সনাক্ত করিবার উপায় হইল।

প্রাতঃকালে চোর গণকের বেশ ধারণ করিয়া রাজার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। চোরের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়া সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া—

পাজি পুথি এড়ি দৈবক মালসাট মারে। আজিত ধরিঞা দিব চোরচক্রবর্ত্তি।
তবে রুদ্রখড়ি গোসাই বুলিহ আমারে॥ নৃপতি বলিল তবে বুজিব তোমার শক্তি॥ (৩০ক)

তার পর রাজাকে সঙ্গে লইয়া চোর কলাধরের বাসায় উপস্থিত হইয়া বলিল—'এই ঘরে চোর আছে।'

নৃপতির আজ্ঞা পাইয়া সান্ডাইল ঘরে। কাটাহাত দেখিঞা সবে বোলে চোর করি।
দেখে শুতিয়া আছে সর্ব্বজান কলাধরে। রাজার সাক্ষাতে লঞা আইলেন ধরি॥ (৩১ ক)

রাজা তাহাকে দেখিয়া অনেক তিরস্কার করিলেন এবং তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন। পাইকগণ কলাধরকে বাঁধিয়া লইয়া গেল—নগরের লোকে তাহাকে মনের সুখে প্রহার করিল।

সর্ব্বজানের হাথ টুটা করিল চৌরবরে।
নড়িতে না পারে তবে লোকে প্রহার করে॥ (৩৪ খ)

ইহা দেখিয়া চোরচক্রবর্তীর মনে দুঃখ হইল এবং রাজার নিকট পূর্বাপর সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। কোটালকে শিক্ষা দেওয়াই যে তাহার উদ্দেশ্য—চুরি করা যে তাহার উদ্দেশ্য নহে, এ কথা সে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিল। কোটালের চোর তাড়াইবার বিপুল আগ্রহকে উপহাস করিয়া সে বলিল—

হেন ছাড় বড়াই করিলে কিসের কারণ।
কন্যা গেল নারী গেল তোমার ব্যর্থ জীবন॥ (৪০ খ)

সমস্ত শুনিয়া রাজা সন্তুষ্টচিত্তে চোরের সহিত নিজ কন্যা মালাবতীর বিবাহ দিলেন। চোরও কিছু জিনিষ মালীকে দিয়া অপহৃত সমস্ত জিনিষের বাকী অংশ ফিরাইয়া দিল। কোটালের স্ত্রীকন্যাকেও ফিরাইয়া আনিল।

নাগরিকগণ মুক্তকণ্ঠে চোরের প্রশংসা ও কোটালের নিন্দা করিতে লাগিল—

হারাইলে বস্তু সব কেবা দিতে পারে। অল্প মনিষ্য হঞা কোটাল বড় সাদ।
ধন্য ধন্য চক্রবর্ত্তী আইল নগরে॥ এমন জনার সনে মরিতে করে বাদ॥
নগরিঞা লোক বোলে ধন্য নাম খরবর। রাজা[র পু]ত্র হইঞা জেবা করে চুরি।
বটকের বস্তু না নেহ আপন ঘর॥ অন্য জন তার সনে নহে বরাবরি॥ (৪১ খ)

নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া চোর স্বদেশে গমন করিল। সেখানে ব্রাহ্মণগণকে অনেক টাকা দক্ষিণা দিল এবং সকল চোরকে উপহার প্রদান করিল। তার পর চোরদের উপদেশ দিয়া বলিল—

আপনার সুখে তোমরা জথা তথা জাও। ব্রাহ্মণ সজ্জন দাতা বৈষ্ণব তিন জন।
ব্রাহ্মণ সজ্জন এড়ি চুরি করি খাও॥ ইহার ঘরে চুরি না করিহ কখন॥ (৪১ খ)

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে কয় জন খ্যাতনামা পণ্ডিতের সন্ধান পাওয়া যায়, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তাঁহাদের অন্যতম। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল; তিনি এক সময় রামমোহন রায়ের সহিত শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত হন নাই। বাংলা-গদ্যের লেখক হিসাবেও তাঁহার স্থান উচ্চে। তাঁহার গদ্য-রচনা অতি সরস ছিল। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র ও সমসাময়িক সংবাদপত্রাদি হইতে তাঁহার জীবনকথা যেটুকু উদ্ধার করিতে পারিয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব।

কাশীনাথের কর্ম্মজীবন

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে-সকল ইংরেজকে শাসনকার্য্য পরিচালনের জন্য এদেশে পাঠাইতেন, তাঁহাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া যে অবশ্যপ্রয়োজন, গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮০০ সনের শেষাশেষি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০১ সনের ৪ঠা মে তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের অধিবেশনে এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন—পাদরী উইলিয়ম কেরী। তাঁহার অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ('তর্কালঙ্কার' নহে) প্রধান পণ্ডিতের পদে এবং রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে যথাক্রমে দুই শত ও এক শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া মাসিক ৪০৲ বেতনে আরও ছয় জন সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হন; কাশীনাথ ইহাঁদের মধ্যে এক জন।

কাশীনাথ এই পদে প্রায় ২৪ বৎসর নিযুক্ত ছিলেন।* ৭ ডিসেম্বর ১৮২০ তারিখে কলেজ-কাউন্সিলকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য্যবিবরণ-পুস্তকের মধ্যে পাইয়াছি। পত্রখানি উদ্ধৃত করিতেছি :—

---

* সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গের নাম, বয়স, পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা প্রভৃতির বিবরণযুক্ত একটি তালিকা প্রতিবৎসর সংস্কৃত কলেজ হইতে শিক্ষা-পরিষদে প্রেরিত হইত। ১ মে ১৮৪৭ তারিখের

মহামহিম শ্রীযুত কালেজ কৌন্‌সলের সাহেবান বরাবরেষু

কালেজের পণ্ডিত শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের নিবেদনমিদং আমি ন্যায়দর্শনের ভাষাপরিচ্ছেদ পুস্তকের গৌড়দেশীয় সাধুভাষাতে সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রভৃতি টীকায় অনুসারে স্পষ্টরূপে অর্থপ্রকাশ করিতেছি যে শাস্ত্রের অতি কাঠিন্যপ্রযুক্ত অর্থপ্রকাশ করণে অদ্যাপি কোন পণ্ডিত প্রবৃত্ত হয়েন নাই—মেস্তর পিয়র সাহেবের মুদ্রাগৃহে এই পুস্তকের মূলসহিত মুদ্রাকরণে পঞ্চ শত মুদ্রা ব্যয় হইবেক পুস্তকের মূল্যে [?] শ্রীযুতেরদিগের বিবেচনায় নির্ভর করিয়া দৃষ্টি করিবার নিমিত্তে পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সমর্পণ করিতেছি এইরূপ বিংশতি ভাগ হইবেক তাহাতে শ্রীযুতেরা অনুগ্রহপূর্ব্বক এক শত পুস্তক গ্রহণ করিলে পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে ও আমার পরিশ্রম সফল হয় এবং কালেজের পাঠার্থি সাহেবদিগের অল্পায়াসে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে বিদ্যা ও বাঙ্গালাভাষাতে নৈপুণ্য হইতে পারে অতএব নিবেদন যে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই প্রতিপাল্য ব্যক্তির প্রতি সফলা আজ্ঞা হয় ইতি ১৮২০ সাল তারিখ ৭ দিসম্বর

শ্রীকাশীনাথশর্ম্মণঃ।

কলেজ-কাউন্সিল দশ খণ্ড পুস্তক ৫০৲ মূল্যে ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক

১ জানুয়ারি ১৮২৪ তারিখে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভ হয়।*

এইরূপ একটি তালিকায় (কাশীনাথ তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক) কাশীনাথ পূর্ব্বে যে-যে চাকরি করিয়াছিলেন, তাহার এইরূপ বিবরণ আছে :—

Pundit of the College of Fort William from 1813 to 1824. Professor of Smriti in the Government Sanscrit College from 1825 to 1826. Pundit and Sudder Ameen of the District of 24 Purganahs from 1827 to 1831.

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কাশীনাথ ১৮০১ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

* গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ প্রথমে ৬৬ নং বহুবাজারে অবস্থিত ছিল; ১৮২৬ সনের ১ মে পটলডাঙ্গার নূতন বাটীতে স্থানান্তরিত হয়। এই বাটী গবর্মেণ্টের খরচে ১৮২৪-২৫ সনে বার্ণ কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু কলেজও এই বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এই বাটীর কোন্ অংশে হিন্দু কলেজ প্রথমে অবস্থিত ছিল, ২৮ জুন ১৮৩৭ তারিখে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশুনকে লিখিত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রামকমল সেনের পত্র হইতে তাহা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

". . . . the Buildings attached to the Hindoo College are occupied as follows :—The Centre upper roomed house by the Sanscrit College. The two wings lower roomed houses by the Hindu College."

১৯ মে ১৮৩৫ তারিখে রামকমল সেন মাসিক ১০০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী ও সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন এবং এই পদে তিনি ১৮৩৮ সনের শেষ পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এই সময় হইতে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পর-বৎসর নবেম্বর (?) মাসে বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হইলে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। শিমুল্যা-নিবাসী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন এই পদের জন্য আবেদন করেন এবং প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ৮০৲ বেতনে এই শূন্য পদে নিযুক্ত হন। কাশীনাথের এই পদপ্রাপ্তি উপলক্ষে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি প্রকাশিত হয়:—

> পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত ।—শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সংস্কৃত কালেজে শিমুল্যানিবাসি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন যে কর্ম্ম ৺রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের ছিল।······
>
> শুনা গেল বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের পরলোক গমন হইলে তৎপদপ্রাপ্তি প্রত্যাশায় অনেক স্মৃতিশাস্ত্রব্যবসায়ি অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যেরা ঐ পাঠশালার কর্ম্মনির্ব্বাহক সাহেবেরদিগের নিকট কর্ম্মাকাঙ্ক্ষাসূচক পত্র অর্থাৎ দরখাস্ত দিয়াছিলেন তাহাতে ঐ বিজ্ঞ বিচক্ষণাপক্ষপাতি সাহেবেরা তাবতের দরখাস্ত লইয়া তাঁহারদিগের বিদ্যা পরীক্ষার্থে প্রত্যেকে কএক প্রশ্ন লিখিয়া দিয়া কহিয়াছিলেন যে এই প্রশ্নের যিনি সদুত্তর লিখিয়া প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন তাঁহাকেই ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবেক। অনন্তর সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রায় তাবতেই লিখিয়া দিয়াছিলেন তন্মধ্যে তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের উত্তরে সন্তোষ পাইয়া তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।—৩ ডিসেম্বর ১৮২৫ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গের বেতনের রসিদ-বইয়ে প্রকাশ, কাশীনাথ ১৯ নবেম্বর ১৮২৫ তারিখ হইতে বেতন লইয়াছিলেন। তিনি ১৮২৭ সনের পুরা এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

চব্বিশ-পরগণার জজ-পণ্ডিত ও সদর আমীন

বৎসরাধিক কাল সংস্কৃত কলেজে যোগ্যতার সহিত অধ্যাপনা করিবার পর, ১৮২৭ সনের মে মাসে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ২৪-পরগণা জেলার জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই সংবাদে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন :—

> পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিয়োগ ।—সিমুল্যা নিবাসি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত কালেজের স্মার্ত্তাধ্যাপক ছিলেন তিনি ২১ বৈশাখ ৩ মে বৃহস্পতি বারে জেলা চব্বিশ পরগণার পাণ্ডিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।—১২ মে ১৮২৭ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

১৮২৭ হইতে ১৮৩১ সন পর্য্যন্ত কাশীনাথ ২৪-পরগণার পণ্ডিত ও সদর আমীনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন—সংস্কৃত কলেজের নথিপত্র হইতে ইহা জানা গিয়াছে। ইহার পর তিনি চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন। কাউন্সিল অব এডুকেশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ তারিখের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে প্রকাশ—

> He was dismissed by order of the Sudder Dewany Audalat but by a subsequent proceedings of that Court it appearing that the said order did not prohibit his future employment . . . his name was registered in the Council's list for employment . . .

১৮৩২ হইতে ১৮৪৬ সন পর্য্যন্ত কাশীনাথ কি করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই।

গবমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপক

সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ শ্রেণীতে ছাত্রাধিক্য হওয়ায়, চারিটি শ্রেণীতে কুলাইতেছিল না। এই কারণে ব্যাকরণের পঞ্চম শ্রেণী স্থাপিত এবং মাসিক ৪০৲ বেতনে ঐ শ্রেণীর জন্য এক জন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটরী রসময় দত্ত ২৯ জানুয়ারি ১৮৪৭ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লেখেন। পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট এই প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। সেক্রেটরী রসময় দত্ত* এই পদে কাশীনাথকে নিযুক্ত করিবার জন্য শিক্ষা-পরিষদ্‌কে সুপারিশ করিয়াছিলেন; কাশীনাথের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণা ছিল। শিক্ষা-পরিষৎ ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ তারিখের অধিবেশনে কাশীনাথের নিয়োগ মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

কাশীনাথ ১২ই মার্চ ১৮৪৭ হইতে মাসিক ৪০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের ৫ম শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ

কাশীনাথ যখন ৫ম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তখন তাঁহার বয়স ৫৯ বৎসর—একরূপ বৃদ্ধ হইয়াছেন। এই কারণে অধ্যাপনা-কার্য্য আশানুরূপ ভাবে তাঁহার দ্বারা চলিতেছিল না। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইবার প্রাক্কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও অস্থায়ী সেক্রেটরীরূপে সংস্কৃত কলেজের আমূল সংস্কারকল্পে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন; কাশীনাথকে ব্যাকরণের অধ্যাপক-পদ হইতে সরাইয়া গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদে, এবং গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদ হইতে ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব এই রিপোর্টে ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

> The 5th Grammar Professor, Pundit Kashinath Tarkapanchanana, is not quite equal to discharge the duties of his class. He is an old Pundit and seems to be in his dotage. He is altogether unacquainted with that discipline which is absolutely required for so young a class as his. Being an old man, he will not bear to be directed, as is usual with all Pundits of his age.
>
> From all these circumstances his class is the most irregular of all. Therefore, I beg leave to propose that he be placed in charge of the library with his present salary, Rs. 40 a month, ...

বিদ্যাসাগরের এই প্রস্তাব শিক্ষা-পরিষৎ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। কলেজের বেতনের রসিদ-বইয়ে প্রকাশ, কাশীনাথ ১৮৫১ সনের জুন মাস হইতে "গ্রন্থাধ্যক্ষ" হিসাবে বেতন লইয়াছিলেন।

মৃত্যু

অভাবের তাড়নায় বৃদ্ধ বয়সে অপটু স্বাস্থ্য লইয়া কাশীনাথ অতিকষ্টে পদব্রজে সংস্কৃত কলেজে আসিতেন। ইহাতে তাঁহার অতিশয় ক্লেশ হইত। এই কারণে ১৯ জুলাই

* রসময় দত্ত ১৭ এপ্রিল ১৮৪১ তারিখে মাসিক ১০০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই পদে তিনি ১৮৪৯ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৮৫১ তারিখে তিনি যানারোহণে গমনাগমনের সুবিধার জন্য মাসে মাসে অতিরিক্ত কুড়ি টাকা প্রার্থনা করিয়া কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আবেদন করিলেন। তাঁহার আবেদনপত্রখানি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয় পণ্ডিতপ্রধান—
> শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়েষু—
>
> গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয় পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন পণ্ডিতের সাময়িক বিজ্ঞাপন—
>
> ইং ১৮২৫ শালে এই সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আমি স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনাকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলাম আমার শিষ্যশাখায় এই বিদ্যালয় এবং দেশে দেশে ধর্ম্মাধিকরণ শোভিত হইয়াছে ইডুকেশন গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয় ও বঙ্গীয় অধ্যক্ষ মহাশয়েরা প্রায় সকলেই আমার বিদ্যাবুদ্ধি বয়স ও দুরবস্থা বিশেষরূপে জ্ঞাতা আছেন এইক্ষণে আমি এই কর্ম্ম ত্যাগ করিলে অন্নাভাবে সপরিবারের মৃত্যু হয় কর্ম্ম করিলে পদব্রজে গমনাগমন করিতে পথমধ্যেই মৃত্যু উপস্থিত হয় উভয়থাই মৃত্যুসম্ভাবনায় মহাশঙ্কট উপস্থিত অতএব এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে আমাকে যানারোহণে গমনাগমনার্থ ২০ টাকা মাস২ দিতে আজ্ঞা হয় পুস্তকাধ্যক্ষের বেতন পূর্ব্বে ৬০ টাকা ছিল সে বিবেচনায় ইহাতে অধিক ব্যয় হইতে পারে না এবং ফোর্ট উলিয়ম কালেজে বৃদ্ধ পণ্ডিত ও মৌলবির প্রতি এমত রীতি আছে পরন্তু আমাকে অধিক কাল পর্য্যন্ত দিতে হবে এমত বোধ হয় না অথবা সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের বার্ষিক পরীক্ষার্থ আমাকে নিযুক্ত করিলে ঐ বেতনে আমার যানারোহণ স্বচ্ছন্দ রূপ নির্ব্বাহ হইতে পারে অথবা সংস্কৃত কালেজের লেখকদ্বারা যেসকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে ও হইতেছে সে সকল পুস্তকের শোধনবিনা বৃথাব্যয়মাত্র অতএব ঐ সকল পুস্তকশোধনার্থ আমার তদুপযুক্ত বিশিষ্ট বেতন স্থির হয়। আমার এই নিবেদনপত্র আপনি ইংলণ্ডীয় ভাষায় শ্রীযুত দয়াময় অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের চক্ষুঃকর্ণগোচর করিলে পূর্ব্বলিখিত যে আমার উভয়থাই মৃত্যুশঙ্কট উপস্থিত তাহার আবশ্যক নিবারণ হইতে পারে ইহাতে এই প্রাচীন বৃদ্ধ পণ্ডিতের প্রতি যেমত অনুমতি হয় বিজ্ঞাপনমিতি ইং ১৮৫১ ১৯ জুলাই—
>
> সংস্কৃতবিদ্যালয় পুস্তকাধ্যক্ষস্য—
> শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননস্য

পরবর্ত্তী ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে শিক্ষা-পরিষদের নিকট ইংরেজী অনুবাদ-সমেত আবেদনপত্রখানি পাঠাইয়া বিদ্যাসাগর মন্তব্য করিলেন :—"If his old age be taken into consideration the applicant deserves the kind attention of the Council." কিন্তু শিক্ষা-পরিষদের মন ভিজিল না; তাঁহারা ১০ সেপ্টেম্বর তারিখের অধিবেশনে কাশীনাথের অনুরোধ রক্ষা করিতে অসামর্থ্যসূচক মন্তব্য করিলেন।

এই ঘটনার পর দুই মাস যাইতে-না-যাইতে ৮ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে কাশীনাথ সকল যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর* হইয়াছিল। ১০ই নবেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা-পরিষদকে লিখিলেন :—

I have the honor to report for the information of the Council of Education, that on the 8th Instant, Pundit Kasinath Tarkapanchanan the Librarian expired.

রচনাবলী

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার যে-কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান করিতে পারিয়াছি, নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

১। বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ। পৃ. ২৮

১৮১৮ সনে রামমোহন রায় সহমরণের বিরুদ্ধে 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' প্রকাশ করিলে তাহার উত্তর-স্বরূপ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ১৮১৯ সনের মাঝামাঝি 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' প্রকাশ করেন; ইহাতে সহমরণের অনুকূলে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি উদ্ধৃত হইয়াছিল।

এই পুস্তকের কোনরূপ আখ্যা-পত্র নাই; মলাটের উপর হস্তাক্ষরে লিখিত নিম্নাংশ হইতে জানা যাইতেছে যে, কালাচাঁদ বসু মহাশয়ের আদেশে কাশীনাথ এই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন:—

॥ নত্বা শ্রীশং বিরচিতং শ্রীকাশীনাথশর্ম্মণা ॥
আদেশাদতুল শ্রীল কালাচাঁদ বসোরিদং ॥

১৮১৯ সনের জুলাই মাসের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে পুস্তকখানির প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা হইতেও গ্রন্থকারের নাম ও পুস্তকের প্রকাশকাল জানা যায়। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লেখেন:—

On the Burning of Widows.

. . . . a small work in defence of this practice just published in quarto without name or date; but a manuscript note on the first blank leaf informs us that it is published by *Cassee-nat'h-turkubagish,* by the desire of Cala-chund-bhose. It is in the form of a dialogue, written in Bengalee with an English Translation. This work we shall carefully examine in a future Number.—*The Friend of India* for July 1819, pp. 332-33.

পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে (পৃ. ৪৫৩-৮৪) এই পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদের বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল:—

প্রথম বিধায়কের বাক্য

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদিতে বিহিত আছে যে সহমরণ ও অনুমরণ এবং সত্য ত্রেতাদ্বাপরকলি এই চারি যুগে মহাপ্রামাণিকেরা যে বিষয়ের ব্যবস্থা দিতেছেন এমন বিষয়ে যে তোমরা প্রতিবন্ধক হও এ বড় অনুচিত

নিষেধকের উত্তর

তোমরা শাস্ত্র না জানিয়া কহিতেছ যে এ অনুচিত কিন্তু শাস্ত্র জানিলে এমন কহিবা না

বিধায়ক

আমরা শাস্ত্র জানি না ইহা তুমি কহিতেছ অতএব সহমরণ অনুমরণ বিষয় শাস্ত্র কহি শুন। অঙ্গিরার বচন ॥ * ॥ মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনং। সারুন্ধতীসমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥·· ···(পৃ. ১)

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের বাংলা অংশের দুইটি খণ্ড আছে।

২। A | System of Logic ; | written in Sunscrit by | The Venerable Sage Boodh, | and explained in a Sunscrit commentary by | The Very Learned Viswonath Turkaluncar. | Translated into Bengalee | By | Kashee Nath Turkopunchanun. | মহর্ষি গোতমকৃত | **ন্যায়দর্শন ;** | মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কারকৃত তদীয় | ভাষাপরিচ্ছেদঃ। | শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকৃত তদীয়ার্থ সাধুভাষা সংগ্রহঃ। | **গ্রন্থনাম পদার্থকৌমুদী।** | স্কুলবুক সোসাইটি দ্বারা কলিকাতা মিসন মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইল। | C. S. B. S. | Calcutta : | Printed for the Calcutta School-Book Society, | At the Baptist Mission Press, Circular Road. | 1821. | [পৃ. ১৪৫]

এই পুস্তকের আখ্যা-পত্রের পর-পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের নিবাস ও গ্রন্থের সঠিক প্রকাশকাল এইরূপ দেওয়া আছে :—

শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কার কৃত তদীয় ভাবাপরিচ্ছেদ। |

আরিয়াদহ গ্রামনিবাসি শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কৃতঃ গৌড় | দেশ প্রচলিত সাধুভাষা রচিত, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী সম্মত, তদীয়ার্থ | সারসংগ্রহ। |

গ্রন্থনাম পদার্থ কৌমুদী

কলিকাতা নগরে মিসন মুদ্রাযন্ত্রে বাঙ্গালা সন ১২২৭ শালের | চৈত্র মাসে ২ তারিকে মুদ্রিত হইল। |

রচনার নিদর্শন :—

বুদ্ধি দুই প্রকার হয় অনুভব ও স্মরণ। সেই অনুভব চারি প্রকার প্রত্যক্ষ অনুমিতি উপমিতি ও শাব্দ। এই প্রত্যক্ষাদি অনুভব চতুষ্টয়ের করণ যে প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ তাহার নাম প্রমাণ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় করণক যে অনুভব তাহার নাম প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষের করণ যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাহার নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ব্যাপ্তি জ্ঞান করণক যে অনুভব তাহার নাম অনুমিতি। সেই অনুমিতির করণ যে ব্যাপ্তি জ্ঞান তাহার নাম অনুমান প্রমাণ। সাদৃশ্য জ্ঞান করণক যে অনুভব তাহার নাম উপমিতি। সেই উপমিতির করণ যে সাদৃশ্য জ্ঞান তাহার নাম উপমান প্রমাণ। পদ জ্ঞান করণক যে অনুভব তাহার নাম শাব্দ।

৩। শ্রীশ্রীহরিঃ।—| শ্রী আদি পুরুষায় নমঃ।—| উৎপত্তি স্থিতি লয়, জগতের যাঁয় হয়, পুনর্জন্ম হরে যাঁর | জ্ঞান। অনাদি অনন্ত শান্ত, যাঁর মায়ায় জগ|দ্ভ্রান্ত, স্মরি সেই পুরুষ প্রধান।| গ্রন্থনাম **আত্মতত্ব কৌমুদী**।| শ্রীশ্রীকৃষ্ণমিশ্র কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীকাশীনাথ | তর্কপঞ্চানন শ্রীগদাধরন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি | কৃত, সাধুভাষা রচিত তদীয়ার্থ সংগ্রহ।| গ্রন্থের সংখ্যা ছয় অঙ্ক, প্রথমাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যম, | দ্বিতীয়াঙ্কের নাম মহামোহোদ্যোগ, তৃতীয়াঙ্কের নাম পাষ|ণ্ডবিড়ম্বন, চতুর্থাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যোগ, পঞ্চমাঙ্কের নাম | বৈরাগ্যোৎপত্তি, ষষ্ঠাঙ্কের নামে প্রবোধোৎপত্তি, এই | গ্রন্থের নাট্যশাস্ত্রোক্ত সংজ্ঞাশব্দের অর্থ এবং মোহবিবেকা|দির লক্ষণ তত্তৎ শব্দার্থের নির্ঘণ্টপত্রে অকারাদিক্রমে দৃষ্টি | করিয়া অবগত হইবা। পুস্তকের মূল্য ৪ মুদ্রাচতুষ্টয় মাত্র। | মহেন্দ্রলাল প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল। | সন ১২২৯ শাল।| [পৃ. ১৮৯+শব্দার্থে নির্ঘণ্ট পত্র ৫]

'আত্মতত্ব কৌমুদী'র রচনার নিদর্শনস্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

> একি আশ্চর্য্য অজ্ঞানিলোকেরা অজ্ঞান দৃষ্টিতে নারীতে কিং আরোপিত না করিতেছে দেখ মুক্তা রচিত হার, শব্দায়মান মণিময় স্বর্ণনূপুর, কুঙ্কুমের রাগ সুগন্ধি কুসুম রচিত আশ্চর্য্য মাল্য এবং আশ্চর্য্য বসন পরিধান, অর্থাৎ মুক্তাহারাদির শোভাতে শোভিতা কিন্তু ফলতঃ রক্ত মাংসময়ী যে নারী তাহাকে দর্শন করিয়া এই এই নারী কি পরমা সুন্দরী এইরূপ ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত লোকেরা মুগ্ধ হইতেছে কিন্তু জ্ঞানিলোকেরা জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই নারীকে নরকরূপে দর্শন করিতেছেন যেহেতু তাঁহারা তাবৎ বস্তুর বাহ্য ও অন্তর জ্ঞাত আছেন এবং নারীর কনকচম্পক সদৃশ যে শরীর তাহাও ফলতঃ মলমূত্রাদিতে পরিপূর্ণ আছে। (পৃ. ১০০-১০১)

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এক খণ্ড 'আত্মতত্ব কৌমুদী' আছে। এই পুস্তক ১২৬৯ সালে 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক' নামে পুনর্মুদ্রিত হয়।

৪। মুগ্ধবোধ কৌমুদী।

২ জুন ১৮২১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এই "ইস্তাহার" মুদ্রিত হয়—

> মুগ্ধবোধ কৌমুদী অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও গণ। গৌড় দেশীয় সাধু ভাষায় অর্থ। শ্রীবোপদেব গোস্বামির কৃত এতদ্দেশে প্রচররূপে চলিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও তৎকৃত কবিকল্পদ্রুমনামক গণের পশ্চাৎ বক্ষ্যমাণ রীতিক্রমে এতদ্দেশীয় সাধুভাষায় গদ্যতে দুই খণ্ডে অর্থ প্রকাশ করা গিয়াছে।······
>
> ···কোন বিজ্ঞ ভদ্রলোক স্বপ্রয়োজনার্থে···মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ও গণের গৌড়দেশীয় সাধু ভাষায় গদ্যেতে অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তেঁহ স্বয়ং বা স্বার্থ এ পুস্তক ছাপা করিয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক কিন্তু পরোপকারার্থ ঐ পুস্তক আমাকে দিয়াছেন তাহা আমি বহু পরিশ্রমে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ রামতর্কবাগীশ প্রভৃতির টীকানুসারে মূল ও ভাবার্থ শুদ্ধ এবং বাহুল্য করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি ইহাতে গুরূপদেশ ব্যতিরিক্ত অনায়াসে সংস্কৃত পদ পদার্থ বোধ হইতে পারিবেক সংস্কৃত জ্ঞানেচ্ছুক ব্যক্তির মহোপকার হইবে।

পুস্তকের পরিমাণ ছোট আড়ার পুস্তকের ৫০০ পাঁচ শত পৃষ্ঠা হইবেক···উত্তম বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইবেক প্রতিপুস্তকের মূল্য ছাপার ব্যয়ানুসারে প্রথম খণ্ড ব্যাকরণ ৫ পাঁচ টাকা দ্বিতীয় খণ্ড গণ ১ এক টাকা সর্ব্বশুদ্ধ ৬ ছয় টাকা। ছাপার ব্যয়ের সংস্থান হইলে ছাপা করিতে উদ্যুক্ত হইতে পারি।···শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণঃ। কলিকাতা শিমুল্যা।

এই গ্রন্থ ছাপা হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমি কোথাও দেখি নাই।

৫। শ্রীশ্রীদুর্গা॥—| জয়তি॥—|(পাষণ্ডপীড়ন নামক প্রত্যুত্তর)| A | **Reply, Entitled** | **"A TORMENT TO THE IRRELIGIOUS"** | কোন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি কর্ত্তৃক কোন পণ্ডি- | তের সহায়তায় স্বদেশীয় লোক হিতার্থ | প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইল | **PREPARED AND PUBLISHED WITH THE ASSISTANCE** | **OF A PUNDIT,** | ***By a Person, wishing to defend and disseminate*** | ***Religious principles.*** | **FOR THE BENEFIT OF HIS COUNTRYMEN.** | সমাচার চন্দ্রিকা মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল॥ | [**Printed at**] **the Sumachara Chundrica Press.** | **CALCUTTA,** | **1823.** | কলিকাতা সন ১২২৯ ২০ মাঘ। | [পৃ. সংখ্যা ২৮৫]

'পাষণ্ডপীড়ন'-রচনার ইতিহাস এইরূপ। ৬ এপ্রিল ১৮২২ তারিখে শ্রীরামপুর মিশনরীদের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" এই ছদ্ম স্বাক্ষরে এক ব্যক্তি চারিটি প্রশ্ন করেন; এই প্রশ্নচতুষ্টয়ের ইঙ্গিত রামমোহন রায়কে লক্ষ্য করিয়া। ১৮২২ সনের ১১ই মে রামমোহন কর্ত্তৃক এই চারিটি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশিত হয়; উহা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে 'চারি প্রশ্নের উত্তর' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রত্যুত্তর-স্বরূপ ১৮২৩ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি 'পাষণ্ডপীড়ন' পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাতে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী"র চারি প্রশ্ন, "ভাক্তুতত্ত্বজ্ঞানী"র উত্তর, এবং "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী"র প্রত্যুত্তর একত্র মুদ্রিত হয়।

'পাষণ্ডপীড়ন' উমানন্দন (বা নন্দলাল) ঠাকুরের নির্দ্দেশে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক রচিত হয়। উমানন্দন ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠীর হরিমোহন ঠাকুরের পুত্র। পুস্তকে গ্রন্থকাররূপে কাশীনাথের নাম না থাকিলেও, রামমোহনের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তকে তাহার ইঙ্গিত আছে; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "আর যদি এক ব্যক্তি বহু কাল ম্লেচ্ছসেবা ও ম্লেচ্ছকে শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া এবং ন্যায় দর্শনের অর্থ ভাষাতে রচনাপূর্ব্বক ম্লেচ্ছকে তাহা বিক্রয় করিতে পারে সে আস্ফালন করিয়া অন্যকে কহে যে তুমি ম্লেচ্ছের সংসর্গ কর ও দর্শনের অর্থ ভাষায় বিবরণ করিয়া ম্লেচ্ছকে দেও অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত হও তবে সে ব্যক্তিকে কি কহা উচিত হয়।"

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'পাষণ্ডপীড়নে'র প্রকৃত রচয়িতা কে, জানিতেন না, কিন্তু তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' "সংবাদপত্র ও দেশীয় ভাষা এবং রচনা" প্রসঙ্গে 'পাষণ্ডপীড়নে'র ভাষা সম্বন্ধে এই মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

দেওয়ানজী [রামমোহন রায়] জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না। ৺বাবু উমানন্দন ঠাকুর, যিনি নন্দলাল ঠাকুর নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি 'পাষণ্ডপীড়ন' প্রভৃতি যে কয়েক খানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহা সর্ব্বাংশেই উত্তম অর্থাৎ শব্দের লালিত্য ও মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য সর্ব্বদিগেই উত্তম হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে অনেকেই সরস রচনায় শিক্ষিত হইয়াছেন।—'সংবাদ প্রভাকর', ১৩ মার্চ ১৮৫৪।

'পাষণ্ডপীড়ন' সম্প্রতি "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালায়" পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৬। সাধু সন্তোষিণী।

মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের তালিকায় পাদরী লং এই পুস্তকের নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়াছেন :—

In 1826, the *Sadhu Santoshini* to prove that AFFIDAVITS on the Ganges water are forbidden by the Hindu Law, by Kashinath Tarkapanchanan. (Long's *Descriptive Catalogue* . . . ., p. 56).

এই পুস্তকখানি এখনও পাওয়া যায় নাই।

৭। শ্যামাসন্তোষণ

কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'শ্যামাসন্তোষণস্তোত্র' নামে একখানি পুথি আছে। পুথিতে ইহার রচনাকাল—চৈত্র ১৭৫৬ শক (=১৮৩৫ সন) এইরূপ দেওয়া আছে :—

রসশরমুনিচন্দ্রে রক্ষিতেঽস্মিন্ শকাব্দে
গগনগুণমিতাংশে সৌরচৈত্রে শুভাহে।
স্তুতিরিয়মতিসাধ্বী সম্মুখাম্ভোজজাতা
ভবতু চিরমবন্ধ্যাং

চতুর্থ পংক্তির শেষ অংশটুকু পুথিতে নাই। পরবর্ত্তী কালে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন বঙ্গানুবাদ-সমেত স্তোত্রটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। ১ পৌষ ১৭৬৮ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় 'শ্যামাসন্তোষণ' পুস্তকের উল্লেখ আছে :—

…শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন স্বকৃত শ্যামাসন্তোষণ নামক গ্রন্থে ইহার স্পষ্ট বিবরণ করিয়াছেন যথা…। (পৃ. ৩৮৫)

বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন স্বকৃত শ্যামাসন্তোষণ গ্রন্থে দুই প্রকার গৃহস্থ অবধুতেরপ্রসঙ্গ লেখেন,…। (পৃ. ৩৮৭, পাদটীকা)

ভারতের মানব ও মানব-সমাজ

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, রাঁচি

পাশ্চাত্যে নৃতত্ত্ব-অনুশীলনের ইতিহাস

এক শতাব্দী মাত্র হইল, পাশ্চাত্য দেশে নৃতত্ত্ব বা Anthropology নামে বিজ্ঞানের একটি অভিনব শাখার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারিস নগরে *Societe Anthropologie de Paris* নাম দিয়া একটি নৃতত্ত্ব-সমিতি গঠিত হয়। ইহার পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরীতেও "এথ্‌নলজিক্যাল সোসাইটি" নামে একটি নৃতত্ত্ব-সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতিদ্বয় প্রধানতঃ বিভিন্ন দেশের, বিশেষতঃ ইউরোপের বিভিন্ন জাতির, মানবের দৈহিক গঠনের সাদৃশ্য ও বৈষম্য বিচারপূর্ব্বক তাহাদের শ্রেণী-বিভাগ ও পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই উভয় সমিতিই উদ্যমহীন হইয়া মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

পরে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মনীষী ডারউইনের *Origin of Species* নামক যুগান্তকারী পুস্তক প্রকাশিত হইলে উক্ত উভয় সমিতিই পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে। ডারউইন এবং ওয়ালেসের প্রচারিত বিবর্ত্তনবাদ নৃতত্ত্বসেবীদিগকে নূতন দৃষ্টি ও লক্ষ্য, নব উদ্যম, নব ঔৎসুক্য ও আশায় অনুপ্রাণিত করিল। কিন্তু ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের নৃতত্ত্ব-সমিতির সভ্যগণের মধ্যে নৃতত্ত্বের মুল উদ্দেশ্য ও সমিতির নাম লইয়া মতভেদ উপস্থিত হয়। তখন উহার সভ্যমণ্ডলীর এক দল মূল-সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া "এন্‌থ্রপলজিক্যাল সোসাইটি অব লণ্ডন" নামে একটি স্বতন্ত্র সমিতি স্থাপন করিলেন।

ইহার দুই বৎসর পরে, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, এডোয়ার্ড টাইলর তাঁহার *Researches into the History of Mankind* নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে বিভিন্ন অসভ্য জাতিদের রীতিনীতি, আচার ও ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বহুল দৃষ্টান্তদ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, সভ্য মানবের বহুবিধ সামাজিক আচার-ব্যবহার, পূর্ব্বপুরুষাগত সংস্কার ও ধারণা, ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মক্রিয়ার মূলের পরিচয় অসভ্য বা অনুন্নত জাতিদের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে, সুতরাং ঐ সমস্ত জাতির জীবনধারা ও রীতিনীতি, সংস্কার ও বিশ্বাসের সহিত সম্যক্ পরিচয় না হইলে সভ্য মানব আপনাদিগের বহুবিধ সামাজিক আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস, সংস্কার ও ক্রিয়াকলাপের তাৎপর্য্য ও মূল উদ্দেশ্য যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। নৃতত্ত্বের এই প্রথম পুস্তক পাঠে পাশ্চাত্য নৃতত্ত্বসেবীদের দৃষ্টির প্রসার ও অনুশীলনের ক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি হইল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এন্‌থ্রপলজিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি ডকটর হাণ্ট তাঁহার অভিভাষণে এই মত ব্যক্ত করিলেন যে, "অনতিবিলম্বে সামাজিক মনস্তত্ত্ব

দৈহিক নৃতত্ত্বের আলোচনার অনুগমন করিবে" ("After a time, I think, it will be found that the study of physical anthropology will be followed by researches in psychological anthropology")। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের *Anthropological Review* (Vol. V, p. LXVII) পত্রিকায় তাঁহার ঐ অভিভাষণটি প্রকাশিত হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পত্রিকাতে L'Owen Pike নিশ্চয়তার সহিত, জোর কলমে লিখিলেন, "মনস্তত্ত্বের জ্ঞান ব্যতিরেকে নৃতত্ত্বের অনুশীলন অসম্ভব" ("Without psychology, there is no anthropology")। ঐ বৎসর টাইলরের *Primitive Culture* নামক সুপ্রসিদ্ধ দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইল। তাহার পর বৎসরেই ইংলণ্ডের নৃতত্ত্বসেবী সমিতিদ্বয়, অর্থাৎ "Anthropologists" এবং "Ethnologists", আবার পুনর্মিলিত হইল। এই সম্মিলিত সমিতির নাম হইল "এনথ্রপলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট অব গ্রেট ব্রিটেন"। ইহাই এখন "রয়াল এনথ্রপলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট অব গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড আয়ার্লাণ্ড" নামে পৃথিবীর নৃতত্ত্ব-সমিতিগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে। তখন হইতে পাশ্চাত্য দেশে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব (Prehistoric Archæology), দৈহিক নৃতত্ত্ব (Physical Anthropology) ও সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের (Social বা Cultural Anthropology) একত্রে অনুশীলন চলিতেছে।

এই প্রবন্ধে কেবল ভারতের সামাজিক নৃতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব (Social Anthropology বা Sociology) সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে সামান্য আলোচনা করিব ; বিশদভাবে আলোচনা স্বল্পপরিসরে সম্ভব নয়। সমাজতত্ত্ব বা সামাজিক নৃতত্ত্বের ভিত্তি মূলতঃ মনস্তত্ত্বের উপর অধিষ্ঠিত। মন যন্ত্রী ও সমাজ যন্ত্র। নৈসর্গিক ও সামাজিক আবেষ্টনের ও জনসংখ্যার দ্বারা সমাজযন্ত্রের নির্মাণভঙ্গী ও রূপ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজযন্ত্রের সাহায্যেই ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সুকুমার কলা, ধর্ম্ম, নীতি, রাষ্ট্র প্রভৃতি সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল উপাদান-গুলি গঠিত হয়।

সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু

মানব-জগৎ নিরন্তর আনন্দ-বিষাদ, আশা-নৈরাশ্য, উত্থান-পতন, যুদ্ধ-দ্বন্দ্বের অবিশ্রান্ত কলরবে মুখরিত। ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং কবির ন্যায় সমাজ-বিজ্ঞান-সেবীরও কারবার এই বিশাল জগৎ-মেলার আসা-যাওয়া, ভাঙ্গা-গড়া, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, ভাবধারা, রীতি-নীতি, সংস্কার ও বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠান (institutions), কার্য্যকলাপ ও অবদান লইয়া। ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার সমষ্টি-জীবনের বিবিধ সমস্যা ও বিশেষতঃ ব্যষ্টি-জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাবনা-কামনা, সাফল্য ও পরাভব, অন্তরের দ্বন্দ্ব-বেদনা, তাঁহাদের হৃদয়ের গভীর সমবেদনা, সহানুভূতি ও একাত্মবোধের দ্বারা উপলব্ধি করেন, এবং তাঁহাদের রসানুভূতি ও সৃজনশক্তির সাহায্যে সমাজ-বিশেষের ও ব্যষ্টি-জীবনের বিভিন্ন দিকের বাস্তবানুগত কাল্পনিক খণ্ড চিত্র 'ভাষা দিয়া, ভাব দিয়া, আর ভালবাসা দিয়া' কলা-কৌশলে অঙ্কিত করেন।

আর জগতের রহস্যময় শ্রান্তিহীন কলরোলে উদ্বেলিত কবি-চিত্তে, বিশ্বসংসারের তরঙ্গ-আঘাত যে অনাদি সুখ-দুঃখ, গীতধ্বনি নিরন্তর বহন করিয়া আনিতেছে, কবি প্রতিভাবলে "শতলক্ষ সুরে গুঞ্জরিত" সেই বিশ্বগীতি ও "অসংখ্য ভঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত" সেই বিশ্বনৃত্যকে যথাযথ ভাবে ভাষা ও ভাবসংযোগে মূর্ত্ত করিয়া অসীমের সীমা রচনা করেন—ভাষাতীত অরূপকে রূপ দিয়া ভাষার বাঁধনে বাঁধেন। তাঁহার ঐশ্ব আলোক-দীপ্ত মানসপটে বিশ্বনাট্যের সমগ্র চিত্রই নিত্য নব নব রূপে উদ্ভাসিত হয়।

বস্তুতান্ত্রিক সমাজ-বিজ্ঞান-সেবী কবিসুলভ ঐশী অনুপ্রেরণার ও অপরোক্ষানুভূতির দাবী করিতে পারেন না। অন্ততঃ তাহা লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন না। আর ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারের নিপুণ কল্পনাসৃষ্টিও সমাজ-বিজ্ঞান-সেবীর পক্ষে বিহিত নহে। সুতরাং তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে সামাজিক তথ্যনিচয় যথাশক্তি পর্য্যবেক্ষণ ও সমাহরণ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করিয়া তাহার পুনঃসংযোগ ও সমাবেশের সাহায্যে মানব-সমাজের উদ্ভব, সংগঠন ও গতিপ্রকৃতি, উন্নতি ও অবনতির ধারার যথাযথ রূপ ও কারণ নির্ণয় করিতে প্রয়াস পান। আর শৃঙ্খলাসূত্রের অনুসন্ধানে এই অসীম জগৎ-জনতার বেসুরো জটিলতার মধ্যে সুরের খোঁজ করেন।

আপাতদৃষ্টিতে যাহা মানব-জনতার অশ্রান্ত বিশৃঙ্খলতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষণার দ্বারা তাহার মধ্যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ ও শৃঙ্খলার রহস্য ক্রমে উদ্ঘাটিত হয়, ছন্দ ক্রমে পরিস্ফুট হয়, সুর ধরা পড়ে। এই বিশ্ব-কোলাহলের মধ্যে কবি যে "অপূর্ব্ব গীতি, আলোকছন্দ" ও বিশ্ব-তন্ত্রী-নিঃসৃত "বিশ্ব-প্লাবিনী অমৃত-উৎস-ধারা রাগিণী" শুনিতে পান, সমাজ-বিজ্ঞানের অনুশীলনের সাহায্যে হয়ত সেই রাগিণীর সামান্য প্রতিধ্বনি আমাদের অনুভূতিগম্য হইতে পারে।

অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় সমাজ-বিজ্ঞানও এই বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে যে, ইহার আলোচ্য যে মানব-সমাজ, তাহাও বিশ্বশৃঙ্খলার অঙ্গীভূত, তাহাও শাশ্বত নিয়মাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় সমাজ-বিজ্ঞানেরও কার্য্য বিশ্ব-সৃষ্টির অংশ-বিশেষের কার্য্যপ্রণালী ও নিয়মাবলীর অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও ব্যাখ্যান। সমাজতত্ত্ব যে মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত, ভূমিকাস্বরূপ সে সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা প্রয়োজন।

মানবের জীবন-যাত্রার আদিম সরঞ্জাম

বিশ্ববিজয়ের জন্য অমৃতের সন্তান মানব যখন তাহার কর্ম্মক্ষেত্র এই জগতে আবির্ভূত হইল, তখন মানবের জীবন-যাত্রার আদিম সম্বল ও সরঞ্জাম ছিল কেবল তাহার শরীর ও ইন্দ্রিয়জ বোধশক্তি (senses), মন এবং কতকগুলি স্বাভাবিক সংস্কার বা প্রবৃত্তি (instincts)—যেমন আত্মপোষণ (self-maintenance) প্রবৃত্তি, যৌনপ্রবৃত্তি (sex-instinct), দ্বন্দ্ব-

ঔৎসুক্য (curiosity), সংগঠনশীলতা (constructive instinct), আত্মখ্যাপন ও আত্ম-অবনমনশীলতা (instinct of self-assertion and self-abasement), এবং অর্জ্জনস্পৃহা (acquisitiveness)।

পুনরাবৃত্তির ও অভ্যাসের ফলে সহজাত প্রবৃত্তিগুলির সহিত কতকগুলি সংশ্লিষ্ট সাড়া (conditioned reflex) জড়িত হইল। স্মৃতিশক্তির সাহায্যে ও অভিজ্ঞতা দ্বারা এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা সংস্কারগুলির অল্লাধিক রূপান্তর ঘটিল। স্নায়ুমণ্ডলীর উপর মানসিক ক্রিয়ার (psychic processএর) প্রভাব বর্ত্তায়।

মানবের নৈতিক জীবনের ভিত্তি

মানব-মনের অভিব্যক্তির ফলস্বরূপ এবং আবেষ্টনের সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনের প্রচেষ্টায় সমাজ ও সভ্যতার উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি হয়। মনের তিনটি দিক্ বা রূপ আছে—ব্যক্ত ও জ্ঞানগত (conscious); অব্যক্ত ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন (unconscious); এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রচ্ছন্নপ্রায় মন বা মগ্নচৈতন্য (sub-conscious mind)। মানবের সহজাত সংস্কারগুলি যদিও আবহমান কাল তাহার মনের উপর ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে, তথাপি তাহারা প্রাণিজগতের অন্যান্য জীবের উপর যেরূপ আধিপত্য করে, মানবের উপর তদ্রূপ করিতে পারে না। পশুর সহজাত সংস্কার অপেক্ষা মানবের সহজ সংস্কারগুলির সংখ্যাধিক্য-নিবন্ধন ঐ সংস্কারগুলির পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে ও তাহার ফলে এক সংস্কার অপরাপর সংস্কারকে সংযমিত বা প্রতিহত করিতে পারে, এবং মানব-মনের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা দ্বারা প্রবৃত্তিবিশেষকে নির্ব্বাচন ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবৃত্তিগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিবার অবসর ঘটে। সাধারণতঃ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সংগ্রাম ও জয় পরাজয় মগ্নচৈতন্যেই অভিনীত হয়। একই সহজাত সংস্কার বিভিন্ন আবেষ্টনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির মনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যেমন হঠাৎ কোন অপরূপ বস্তু বা জীব দেখিলে মানবের মনে ভয়, ঔৎসুক্য, ক্রোধ, অথবা বশ্যতার ভাব প্রভৃতি নানাবিধ প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতে পারে, এবং তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ব্যক্তিবিশেষ এই বিভিন্ন প্রবৃত্তির মধ্যে কোন একটিকে গ্রহণ ও অপরগুলিকে অল্লাধিক বা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করে।

মানব সংঘবদ্ধ হইয়া কিরূপে অজ্ঞানান্ধ সহজাত সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত পশুপ্রায় জীবন অতিক্রম করিয়া, বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত ও জ্ঞানালোকে আলোকিত জীবন প্রাপ্ত হয়,—হিন্দুর মনোবিজ্ঞানের ভাষায় কিরূপে অন্নময় কোষ হইতে মানব বিজ্ঞানময় কোষে পৌঁছায়,—তাহারই অনুসন্ধান নৃতত্ত্বের কার্য্য।

মানবের সহজাত সংস্কারগুলির মূল লক্ষ্য আত্মসংরক্ষণ। আত্মসংরক্ষণকল্পে মানবের সহজাত এই সংস্কারগুলি তাহার আত্মশক্তির অপচয় কিংবা অপরের ক্ষতিবৃদ্ধির দিকে

দৃষ্টিপাত করে না। বুদ্ধিবৃত্তিই মানুষকে তাহার শক্তির মিতব্যয়িতা সাধনে তৎপর করে এবং সংযত অথচ প্রশস্ত জীবনযাত্রার পথ নির্দ্দেশ করে।

মানবের সহজাত সংস্কারগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—'আত্মসংরক্ষণকারী' প্রবৃত্তি (self-maintaining instincts) এবং 'সমাজ-সংরক্ষণকারী' প্রবৃত্তি (group-maintaining instincts)। আত্মসংরক্ষণশীল প্রবৃত্তিগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, এবং সমাজ-সংরক্ষণশীল প্রবৃত্তিগুলি সহযোগমূলক।

আত্মসংরক্ষণশীল প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে আত্মপোষণ প্রবৃত্তি, আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি, যৌন প্রবৃত্তি হইতেছে মৌলিক প্রবৃত্তি; এবং যৌন প্রবৃত্তির আনুষঙ্গিক লজ্জা, ঈর্ষা ও আত্মপ্রদর্শন ও শিশুলালন প্রবৃত্তি প্রভৃতি গৌণ প্রবৃত্তি। আত্মপ্রাধান্যস্থাপন, [স্বত্ববোধের মূলীভূত] অর্জ্জন-লিপ্সা, ভয়, বিবাদপ্রিয়তা [যাহা হইতে যুদ্ধপ্রিয়তা, এমন কি, মৃগয়া-প্রিয়তাও জন্মে] এইগুলিও আত্মসংরক্ষণশীল প্রবৃত্তি।

দলসংগঠনপ্রবৃত্তি ও তাহার আনুষঙ্গিক অনুকরণপ্রবৃত্তি, ইঙ্গিত-অনুসরণ-প্রবণতা, বশ্যতা, ভক্তি ও আত্মোৎসর্গ, যৌথ-ক্রীড়া প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি "দলসংরক্ষণকারী"।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর সংস্কারগুলি মানুষকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করে। সমাজ-ধর্ম্মের ও নীতিধর্ম্মের প্রধান কার্য্য—এই সংস্কারনিচয়ের সুব্যবস্থিত পরিচালনা ও সংযমন দ্বারা মানবজীবনের ও সমাজের উৎকর্ষসাধন।

আত্মরক্ষণশীল প্রবৃত্তিগুলি দলরক্ষণশীল প্রবৃত্তিগুলির মূলতঃ কতকটা বিরোধী হইলেও, পরস্পরের সহায়ক হইয়া জাতি বা সমাজ সংরক্ষণের উপযোগী হইতে পারে। সমকক্ষতা-প্রিয়তা এবং আত্মনির্ভরশীলতা, এই উভয় প্রবৃত্তিই কার্য্যতঃ মানবসমাজের উন্নতি-বিধায়ক হইতে পারে।

যখন মানবের জীবনযাত্রার উপযোগী দৈহিক পরিবর্ত্তন ও ক্রমপরিণতি স্থগিত হইল, তখনই আরম্ভ হইল মানসিক ক্রমোন্নতি। অপরাপর কতকগুলি জন্তুর দেহ অপেক্ষা মানবদেহ হীনবল হইলেও মানসিক অভিব্যক্তির সাহায্যে মানবদেহ নব শক্তিতে বলীয়ান্ হইতে লাগিল। বুদ্ধিবলে অস্ত্রাদি উদ্ভাবন করিয়া মানব তাহার বাহুর বল বহুগুণ বর্দ্ধিত করিল। আর কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ-দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়া জড়-জগৎ ও জীবজগতের উপর কতকটা প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হইল।

পরস্পরের সংস্পর্শে বিভিন্ন ব্যক্তির মগ্নচৈতন্যে একজাতিত্ব-বোধ বা স্বজাতি-চেতনা জাগ্রত হইল; আর পরস্পরের সংসর্গে মানব-মনের স্বাভাবিক সংস্কারগুলি রস-সমন্বিত হইয়া চিত্তবৃত্তি বা হৃদয়াবেগ রূপে সাড়া দিল; যেমন যৌনপ্রবৃত্তি হইতে অনুরাগ বা প্রেম; পলায়নপ্রবৃত্তি হইতে ভয়; ঔৎসুক্য হইতে বিস্ময় ও অনুসন্ধিৎসা; বিরুদ্ধতা হইতে ক্রোধ, ইত্যাদি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রত্যেক স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহিত একাধিক

উপস্থিত হইল। ইহা হইতে ব্যক্তিত্বের ও নৈতিক স্বাধীনতার উদ্ভব হইল। ইহাই মানবের নৈতিক জীবনের ভিত্তি।

মানবের সহজাত সংস্কারগুলির সাহায্যে কেবল ইন্দ্রিয়বোধগম্য জগতের সহিত প্রথম পরিচয় ও সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল ; আর চিত্তবৃত্তিগুলি মানবকে ভাব-সংযোগে মানস জগতের সহিত মিলনের বিচিত্র অনুভূতির আস্বাদন দান করিল। মানবের সহিত মানবের নানাবিধ সম্বন্ধ ও সংঘাতের মধ্য দিয়া সমাজ-বন্ধন দৃঢ় হইতে লাগিল।

মানব-সমাজের উৎপত্তি ও অভ্যুদয়

'সমাজ' শব্দের অর্থ, অমরকোষের মতে, "পশুভিন্নানাং সংঘঃ"। প্রকৃতপক্ষে 'সমাজ' কেবল ব্যক্তিসমষ্টি মাত্র নহে ; তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর ও উচ্চতর বস্তু। সমাজের জীবন তাহার অতীতের ও বর্ত্তমানের ভাবধারা, চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারায় পরিপুষ্ট হইয়া তাহার ভবিষ্যতের নিয়ামক হয়। সংগঠনই সমাজের আত্মা। সংগঠনের ফলে সমাজের পরিচালন-ক্ষমতা জন্মে ; শক্তি সঞ্চিত ও বর্দ্ধিত হয়, কার্য্যবিভাগের ফলে শক্তির, উপকরণের ও সময়ের অপচয় নিবারিত হয়। জার্ম্মান দার্শনিক ফিকৃটে (Fichte) যথার্থই বলিয়াছেন, "সমাজের মধ্যেই মানুষ মানুষ হয়", অর্থাৎ পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে উন্নীত হয়। "Man only becomes man among men." বস্তুতঃ সমাজের অঙ্গীভূত বলিয়াই ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট ও রূপায়িত হয়।

মানবের সুদূরতম অতীতের যাহা কিছু নিদর্শন ভূগর্ভ, নদীগর্ভ, গিরিগহ্বর প্রভৃতি হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, মানব-জীবনের প্রাক্কালেই আদিমানব জীবনীশক্তির অনুপ্রেরণায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধভাবে খাদ্যান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইত। সংঘবদ্ধ জীবনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কতকটা ত্যাগ করিতে হয়, আর স্বেচ্ছায় কেহ সে ত্যাগ স্বীকার করে না ; এজন্য অনুমান হয় যে, দলবদ্ধ হইয়া থাকিবার বাসনা মানবের সহজাত নহে। সভ্যতার ইতিহাসের যত গোড়ার দিকে যাওয়া যায়, ততই সংঘের ক্ষুদ্রতা ও জটিলতার ন্যূনতা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, লাটিন ভাষায় 'অপরিচিত ব্যক্তি' এবং 'শত্রু' এই দুই অর্থে একই বাক্য (*hostis*) ব্যবহৃত হয়।

সে যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে, অসহায় আদিম অবস্থায় জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার অনিবার্য্য প্রেরণায়,—বিচার বা চুক্তি দ্বারা নহে,—আদিম মানবের আংশিক বিরোধমূলক সম্বন্ধও অজ্ঞাতসারে সহযোগিতায় পরিণত হইয়া স্থায়ী সঙ্ঘ বা 'সমাজ' গঠিত হইয়াছিল।

কেবল আত্মপোষণ ও আত্মসংস্থিতি (self-perpetuation), এই দুই প্রবৃত্তির প্রণোদনেই আদিম মানবের সমাজ উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে। এই প্রবৃত্তিদ্বয়ের চরিতার্থতার প্রচেষ্টায় খাদ্যসংগ্রহ ও শ্রমসম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপন (economic and industrial organization) ও পারিবারিক সংগঠন প্রভৃতি মূল সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিতে পারে। সমাজের জনসংখ্যার সহিত উপজীব্যের সামঞ্জস্য সাধনকল্পেই স্বত্বের উৎপত্তি

এবং বিবাহ-ব্যবস্থা, দায়ভাগ ও দণ্ডবিধির উৎপত্তি হয়। যদিও আদিম মানব-সঙ্ঘগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ পারিবারিক স্বাতন্ত্র্য ছিল না, ক্রমে তাহা ধীরে ধীরে উদ্ভূত হইল।

আদিম সমাজবন্ধনের একটি প্রধান উপাদান বা সহায় ছিল—আধিভৌতিক ভীতি। মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তির দর্শনে এবং অন্যবিধ অলৌকিক ঘটনার অনুভূতি হইতে ভয় জন্মে। ভয়ে মানুষ পরস্পরকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়; আর ভয়ের কারণ নিরাকরণের জন্য সম্মিলিত হইয়া যাদু ও ধর্ম্মক্রিয়ার উদ্ভাবন ও অনুসরণ করে। সান্নিধ্য ও সাদৃশ্যজনিত মানসিক সহযোগের (associationএর) নিয়মানুসারে আদিম সমাজে যাদুক্রিয়ার উদ্ভব হইল।

আদিম মানব প্রাকৃতিক শক্তির সমগ্রভাবে ধারণা করিতে অসমর্থ হওয়ায় উহাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখে এবং বহুবিধ স্বতন্ত্র দৈবশক্তির কল্পনা করে ও তাহাদিগকে মন্ত্রতন্ত্রের বলে বা কৌশলে বশীভূত অথবা স্তবস্তুতি ও নৈবেদ্য বা বলি দ্বারা প্রীত করিতে প্রয়াস পায়।

ক্রমে নানাবিধ নৈসর্গিক ও সামাজিক শক্তির প্রভাবে মানব-জীবনের ও মানব-সমাজের আদিম সরঞ্জামগুলি পরিবর্দ্ধিত, সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হইল। যখন মৌলিক প্রয়োজন সাধনোপযোগী প্রবৃত্তিগুলির প্রণোদনে জীবনোপায়ের মূল প্রতিষ্ঠানগুলি (maintenance-institutions) গড়িয়া উঠিল, তখন আত্ম-প্রীতিসাধক প্রবৃত্তিগুলি (impulses to self-gratification) জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল হইতে লাগিল। আত্মপ্রশ্রয়, আত্ম-গর্ব্ব ও আত্ম-খ্যাপনের (self-assertion) উপায়-স্বরূপ বেশভূষা, অলঙ্কারাদি, যুদ্ধ ও ক্রীড়াদি, মাদক দ্রব্যের ব্যবহার, শিল্প, চিত্রাঙ্কন, নৃত্যগীতাদি ও অন্যান্য চারুকলার উদ্ভব হইল। যদিও সৌন্দর্য্যস্পৃহা ও সুকুমার কলা সমাজের পোষণ ও রক্ষণের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় নহে, তবু ইহাদের প্রণোদক প্রবৃত্তিগুলি এত প্রবল যে, তাহার জন্য মানব প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত। এই প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে মানবমনের শক্তি ও উদ্যমের অদ্ভুত প্রকাশ দেখা যায়। আত্ম-গর্ব্ব অহঙ্কাররূপে পরিশুদ্ধ হইয়া ব্যক্তিত্বের ও শ্রেণীর বা জাতির বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ সূচিত করে; এক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে অপর আকাঙ্ক্ষা আসে ও ক্রমে আদর্শ-প্রবণতা জন্মে। এইরূপে ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনধারা, আচার-ব্যবহার, প্রকৃতি ও চরিত্র, নীতি, ধর্ম্ম ও শাসন-প্রণালী, সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞানের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি হইল।

মোটের উপর সহযোগিতা এবং আত্ম-বিস্তৃতির বা মিলনের আকাঙ্ক্ষাই মানব-সমাজের মূল স্বর—প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর সহিত মিলন বা সামঞ্জস্য সাধন, মানুষে মানুষে মিলন, সমাজে বৈষম্যের মধ্যেও সাম্য স্থাপন ও আধিভৌতিক জগতের সহিত ঐকতান স্থাপনের প্রচেষ্টাতেই সমাজের উৎপত্তি ও অভ্যুদয়। এই মিলন, সাম্য বা ঐকতান যত নিবিড় ও গভীর হইতে থাকে, সমাজও তত উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়।

প্রাধান্য অধিক, যেমন হিন্দু সমাজে ; আর কোন কোন সমাজে রাষ্ট্রের প্রাধান্য অধিক, যেমন সাধারণতঃ পাশ্চাত্য সমাজে।

নৈতিক জীবনের উদ্ভব ও পরিণতি

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মানবের সহজাত সংস্কারগুলির সংখ্যাবহুলতা মানব-জীবনের মূল্যবান্ সম্পত্তি। ইহারা পরস্পরকে সংযত করিয়া জীবন নিয়মিত করিতে পারে। আর ইহাদের সংখ্যাধিক্যের জন্যই মানবের ইচ্ছা-শক্তি প্রথমে কার্য্যকরী হয় ও সদসৎ বিচার-পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে হিতকরী বা সৎ প্রবৃত্তি নির্ব্বাচন ও অহিতকরী বা অসৎ প্রবৃত্তি পরিহার করিতে পারে। মূল প্রবৃত্তিগুলি লইয়া হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া বিভিন্ন জাতি ও সমাজ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে এবং সেই অভিজ্ঞতানুযায়ী বিভিন্ন জীবনধারা অবলম্বন করিয়াছে। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার সাহায্যে বাহ্য প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপনের বিভিন্ন পন্থা অনুযায়ী বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি বা সভ্যতা বিভিন্ন ছাঁচে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। আদিম সমাজে যুবক-যুবতীদের দীক্ষা ও শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদিগকে স্ব-স্ব সমাজের আদর্শানুযায়ী জীবন ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করে।

অভ্যাস,—নৈতিক জীবনের প্রারম্ভ।—পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তিনিচয়ের তাড়না হইতে আত্মরক্ষার জন্য অবস্থাবিশেষে মানব-মন প্রবৃত্তিবিশেষকে অনুসরণযোগ্য বলিয়া মনোনীত করে; পরে অনুরূপ অবস্থায় সেই প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে; এইরূপে উহা অভ্যাসে পরিণত হয়। ব্যক্তিগত অভ্যাস উত্তরাধিকার-সূত্রে বর্ত্তায় না। কিন্তু সমাজগত অভ্যাস বংশপরম্পরার উপর প্রভাব বিস্তার করে। পিতামাতার শিক্ষা ও শাসন, সমাজের ভয় ও পূর্ব্বপুরুষদের ভয়, দেবতাদের ভয় ও ঋদ্ধি বা সৌভাগ্য অর্জ্জনের স্পৃহা, এই সমস্ত শক্তির প্রভাবে সমাজানুমোদিত অভ্যাসগুলি বদ্ধমূল হয়। প্রচলিত সামাজিক অভ্যাসগুলিকেই সামাজিক রীতিনীতি বা আচারধর্ম্ম বলা হয়। এই রীতিনীতিই মানবসভ্যতার প্রথম অবস্থার নীতিশাস্ত্র। এই ব্যাবহারিক বিধিনিয়মের সামান্য ব্যতিক্রমও সমাজে দণ্ডার্হ হয়। আদিম সমাজে আত্ম-সমালোচনা বিশেষভাবে জাগ্রত হয় নাই। পুরুষানুক্রমিক আচার-ব্যবহারই সনাতন ধর্ম্মরূপে অবশ্যপালনীয়। উহার কোন দফায় কোন ত্রুটি বা অভাব থাকিতে পারে, এই ধারণা মনে অস্পষ্টভাবে জাগ্রত হইলেও, কেহই তাহার সংশোধনের প্রয়াস পাইতে সাধারণতঃ সাহসী হয় না।

আইন ও ধর্ম্ম।—প্রচলিত রীতিনীতিই আদিম সমাজে আইনের পদাভিষিক্ত হয়। প্রত্যেক আদিম সমাজেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নেতার প্রভাব দৃষ্ট হয়। নেতার বা সমাজের প্রভুত্ব ও শাসন প্রত্যেক পরিবারে পিতামাতার প্রভুত্ব ও শাসনের স্থান অধিকার করে। আদিম সমাজে শৈশব কাল হইতে মানব আদেশানুবর্ত্তিতাতে এরূপ অভ্যস্ত হয় যে, সামাজিক আচারনীতি তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক অথবা ঐশ বিধিনিয়ম বলিয়াই

প্রতীত হয় ; আর তাহার ব্যতিক্রম অচিন্তনীয়। বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমের জন্য প্রকৃতিদেবী অথবা দেবতারা অবশ্য শাস্তি দিবেন, এই বিশ্বাস তাহাদের মনে স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ। স্বগোত্রে যৌন সম্বন্ধ বর্জ্জন, স্বগোত্রীয়ের প্রাণহননকারীর বিনাশ-সাধন, তাহাদের নিকট এরূপ স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, এগুলি সমাজ-সৃষ্ট নীতিমাত্র, এ ধারণা তাহাদের কল্পনাতেও স্থান পায় না। বস্তুতঃ যত দিন পর্য্যন্ত উচ্চনীচভেদবিহীন (classless) আদিম (tribal) সমাজের স্থলে উচ্চনীচ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ ও রাজশক্তির উদ্ভব না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত সামাজিক বিধিনিষেধ ও দণ্ডনীতি ধর্ম্মের অংশীভূত বলিয়া গণ্য হয়। অনেক স্থলেই এক হিসাবে আইন অপেক্ষা ধর্ম্ম অধিকতর শক্তিশালী ও সংযমনক্ষম। আদিম সমাজের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ধর্ম্মের নিষেধ (taboo) অমান্য করিলে দৈব অভিশাপ ও দুর্ভাগ্য অনিবার্য্য ; সমাজের বা গোষ্ঠীর ব্যক্তিবিশেষের পাপে, অর্থাৎ সামাজিক বিধি-লঙ্ঘনের ফলস্বরূপ সমগ্র সমাজ বা গোষ্ঠী পাপী, ধর্ম্মভ্রষ্ট, অপবিত্র ও কলুষিত হয় ও দৈব দণ্ডে দণ্ডার্হ হয়। সুতরাং সমাজের বা গোষ্ঠীর অপরাধ ক্ষালনের ও পবিত্রতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অপরাধী ব্যক্তিকে সমাজ হইতে বহিষ্করণ করাই বিধি। আদিম সমাজে সনাতন আচারবিধির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুষ্ঠানের অলংঘ্যতা ও পবিত্রতার ধারণাই আদিম সমাজের আচার-নিষ্ঠতা ও রক্ষণশীলতার মূল কারণ।

আদিম সমাজের ধর্ম্ম-জীবন কেবল নিষেধ-নীতিতে (tabooতে) পর্য্যবসিত হয় না ; তাহাদের বিশ্বাস যে, এই নিষেধ-নীতি-প্রসূত সংযমের ফলে নিগূঢ় শক্তি ('mana') অর্জ্জন করা যায় ; আর ঐ শক্তি সংক্রামক ; এবং উহার প্রভাবে আদিম সমাজগুলি স্ব-স্ব সৌভাগ্য বা ঋদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। এই বিশ্বাস আদিম সমাজগুলির মনে নিশ্চিন্ততা ও বল প্রদান করে। পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহাদের জ্ঞান ও দেবানুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া এই সমস্ত বিধিনিষেধের বিধানপূর্ব্বক স্বজাতির কল্যাণের ও শক্তি সঞ্চয়ের পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন, এই ধারণায় তাঁহাদের প্রতি সমধিক ভক্তিমান্ হয়। এই দৈবী শক্তির বর্ম্মে আবৃত হইয়া আদিম জাতিরা জীবনসংগ্রামে বলীয়ান্ হয়। কিন্তু এই বর্ম্ম একেবারে স্থিতিস্থাপকতাবিহীন।

আদিম সমাজের ন্যায়-অন্যায় বোধ পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান এবং সভ্য মানব অপেক্ষা আদিম মানবের মনের উপর সদসৎ বিবেকের প্রভাব সমধিক প্রবল হইলেও, তাহাদের ন্যায়-অন্যায়ের আদর্শ অনমনীয়, এজন্য তাহাদের স্বাধীন চিন্তার স্থান বা ক্রিয়া-ক্ষেত্র নাই বলিলেই চলে। নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিয়মের তিলমাত্র অন্যথাচরণ করিলে সমাজচ্যুত হইতে হয়। তাহাদের বিশ্বাস যে, নূতন বা অনভ্যস্ত আচরণে মানুষকে অশুচি করে ও তজ্জন্য তাহার সংস্পর্শ অপরকেও অশুচি করিতে পারে বলিয়া ঐরূপ কদাচারী ব্যক্তি সমাজে পরিত্যাজ্য। আদিম সমাজ ব্যক্তিবিশেষের আচরণের উদ্দেশ্য বিচার করে না, স্বাধীন চিন্তা ও আচরণের প্রশ্রয় প্রদান করে না। কেবল অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, সাহস, বদান্যতা প্রভৃতি সাধারণ গুণের উৎকর্ষ অনুসারে ব্যক্তিবিশেষকে দলপতি বা সমাজনেতা মনোনীত

করা হয়; এবং কালক্রমে অনেক স্থলে উত্তরাধিকারিস্থত্রেও দলপতির পদ বর্ত্তায়। এই সমস্ত সমাজ-নেতা সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে সমাজকে স্ব-স্ব পূর্ব্বপুরুষাম্নুক্রমে প্রচলিত নিয়মাম্নুযায়ী পরিচালন করিতে সমর্থ হইলেও, অপ্রত্যাশিত সঙ্কট হইতে সমাজের উদ্ধারের জন্য অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন অন্যবিধ নেতার প্রয়োজন হয়। এইরূপ বিশিষ্ট নেতা দৈবশক্তির সহিত কারকারবারের জন্য জনসাধারণ হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে ও আভ্যন্তরীণ জীবনের দিকে মনোনিবেশ করে। এই জন্য ইহাদেরই স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের স্থবিধা হয়। ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ও বিকাশ হইতেই সভ্যতার স্ফুরণ ও উন্নতি হয়। চিন্তাশীল স্বাধীনচেতা ব্যক্তিই সমাজের প্রকৃত নেতৃত্বের উপযোগী। কিন্তু সেরূপ ব্যক্তি আদিম সমাজে বিরল, এবং সভ্য সমাজেও প্রচুর নহে।

সমাজের জটিলতা বৃদ্ধি

সভ্যতার উন্নতির অনুপাতে সমষ্টিজীবনের যোগস্থত্র ও পরিসর বৃদ্ধি হয়; পরস্পরের কর্ত্তব্যের ও দায়িত্বের বন্ধনও দৃঢ় হয় ও গুণভেদে প্রত্যেকের অধিকার নির্ণীত হয়। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কোন কার্য্য করিতে গেলে নেতার প্রয়োজন হয়। আন্দামান দ্বীপবাসী মিনকোপি জাতির বা লঙ্কাদ্বীপের বেদ্দা জাতির ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা আদিম সমাজে নেতা নির্ব্বাচন করার রীতি বিরল; অপেক্ষাকৃত স্থচতুর ব্যক্তি স্বতঃই দলনেতা হইয়া দাঁড়ায়। অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজে নির্ব্বাচন দ্বারা বুদ্ধিতে, বয়সে ও অভিজ্ঞতায় এবং কোন কোন স্থলে বংশ-মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ এক বা একাধিক ব্যক্তিকে দলপতি বা নায়ক নিযুক্ত করা হয়।

মৃগয়ার জন্য অথবা পশুচারণের জন্য প্রত্যেক মানব-সঙ্ঘের স্ব-স্ব কর্ম্মক্ষেত্রস্বরূপ বিভিন্ন জঙ্গলে বা অধিকৃত ভূমিতে ক্রমে স্ব-স্ব অধিকার বা স্বত্ববোধ জাগ্রত হয়। প্রথমে এই স্বত্ব ছিল অনির্দ্দিষ্ট সাধারণ স্বত্ব; ক্রমে হইল যৌথ স্বত্ব; তাহা অবশেষে পরিণত হইল বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট অংশে ব্যক্তিগত স্বত্বে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির আদান-প্রদানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থচনা হইতে লাগিল। প্রথমে পণ্যবিনিময়, পরে শস্য বা গৃহপালিত পশুপক্ষী, বস্ত্রাদি বা অন্য কোন দ্রব্য (যেমন আসাম-বর্ম্মার সীমান্ত প্রদেশে কোথাও কোথাও পেটা ঘণ্টার আকারে পিত্তলের চাকতি) বিনিময়ের বাহনস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পরে বিভিন্ন প্রাচীন দেশে মুদ্রা ও চীনদেশে প্রথম কাগজের 'নোট'এর উদ্ভব ও প্রচলন হইয়াছিল। বাণিজ্য ও সম্পত্তি বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আর্থিক বৈষম্য ও ধনি-দরিদ্রে সম্প্রদায়ভেদ উপস্থিত হইল।

কালক্রমে যখন বিভিন্ন মানব-সঙ্ঘের গতানুগতিকভাবে কার্য্য-ব্যবস্থা ও জীবন-প্রণালী গতিহীন হইয়া পড়ে, মানসিক জড়তা আসিয়া প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়, জীবন-সঙ্গীতের স্বর কাটিয়া যায়, তাল ভাঙ্গিয়া যাইতে থাকে, এরূপ সময় অনেক স্থলে দেখা যায়

নবচেতনা আসে, ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা উদ্দীপিত হয়। মানবসমাজের প্রকৃত উন্নতির জন্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সমাজানুবর্ত্তিতা, উভয়েরই পুষ্টি অবশ্য-প্রয়োজনীয়। সমাজের কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তি অভ্যস্ত বিধিনিষেধের তুলনামূলক বিচার দ্বারা তাহাদের আংশিক পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হন ও অনেক সময় তাহাতে কৃতকার্য্য হন, আর আগন্তুকদের সমস্ত রীতি-নীতি, মত ও বিশ্বাস অনুমোদন না করিলেও তাহাদিগকে তাহা মানিয়া চলিতে দিয়া এবং নিজেরাও আগন্তুক জাতির কোন কোন বিশেষ প্রথা, আচার বা মত আপন সমাজে গ্রহণ করিয়া উদারতার পরিচয় দেন। ব্যক্তিত্বের স্ফুরণই উন্নতিশীল সমাজের লক্ষণ। এইরূপে নৈতিক স্বাধীনতার প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চলিতে থাকে। বিভিন্ন জাতি বা সংস্কৃতির দ্বারা আনীত নূতন ভাব, চিন্তা ও রীতিনীতির সংস্পর্শে স্বাধীন চিন্তা জাগ্রত হইলে দেখা যায় যে, একাধিক মনীষাশালী পুরুষ স্বীয় সমাজে নূতন ভাবধারা, নূতন আদর্শ ও শক্তি আনয়ন করেন ও সময়ের অনুপযোগী কোন কোন বিধিনিষেধের পরিবর্ত্তন সাধন ও নূতন নিয়ম বা প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া সমাজের উন্নতির গতি উন্মুক্ত করিয়া দেন। এইরূপ এক বা একাধিক পুরুষসিংহের সাময়িক আবির্ভাবের অভাবে যে সজ্যগুলি সময়োপযোগী সামাজিক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া আপনাদিগকে নূতন সামাজিক আবেষ্টনীর সহিত সমীকরণ করিতে সমর্থ না হয়, তাহারা জীবন-সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইয়া ধ্বংসোন্মুখী হয়; ইহা কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। যেমন সমাজের মধ্যেই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ও পরিপুষ্টি হয় ও মানুষ গড়িয়া উঠে, তেমনই আবার বিশেষ বিশেষ শক্তিমান্ মানুষই স্বীয় সমাজকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে।

সভ্যতর জাতির সংস্পর্শে বা সংমিশ্রণে যে সজ্যগুলির উন্নতির গতি উন্মুক্ত ও বেগ বর্দ্ধিত হয়, তাহাদের মধ্যে অনেক স্থলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন গ্রামের স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে, সজ্যে সম্মিলিত এক বা একাধিক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন গ্রাম-নেতাদের নেতৃত্বে ক্রমে ক্রমে ঐরূপ রাষ্ট্রের স্বায়ত্তশাসন লুপ্ত হয়। রাজশক্তি এক বা একাধিক নেতার হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় এবং সামন্ত বা অভিজাত-বংশের উদ্ভব হয়। অনেক স্থলে জায়গীর-প্রথা (feudalism) প্রবর্ত্তিত হয়। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবিভাগ বৃদ্ধি হয়। অনেক স্থলে দাস শ্রেণীর উদ্ভব হয়। শ্রমশিল্পের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্তর পরিবর্ত্তন বা গতিশীলতা (class-mobility) উপস্থিত হয়। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি স্ব-স্ব শক্তি বা যোগ্যতা অনুসারে নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হয় এবং কেহ কেহ যোগ্যতার অভাবে উচ্চতর শ্রেণী হইতে নিম্নতর শ্রেণীতে অবনমিত হয়। অধুনা পাশ্চাত্য প্রদেশে যদিও উচ্চ-নীচ শ্রেণীভেদ বর্ত্তমান, তথাপি প্রায় সর্ব্বত্রই ঐ শ্রেণীবিভাগ এইরূপ গতিশীল বা পরিবর্ত্তনশীল। তবুও এই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান অসাম্যের জন্য তথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে বিভিন্ন রাষ্ট্রতান্ত্রিক মতের মধ্যে—যেমন ধনসাম্যবাদ,[১] বিপ্লবী সাম্যবাদ,[২] বিপ্লববাদ,[৩]

শ্রমিক সমাজতন্ত্রবাদ,[৮] এক-নায়কত্ববাদ,[৯] ধনতান্ত্রিকতা,[১০] রাষ্ট্রচালিত ও রাষ্ট্রপরিকল্পিত ধনতন্ত্রবাদ,[১১] অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ও ব্যক্তিগত বণ্টননীতি [১২] এবং শ্রেণীগত বৈষম্যহীন সমাজ বা শ্রেণীহীন সমাজ।[১৩]

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের প্রাচীন ঋষিরা ভারতে বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন স্তরের জন-সমষ্টি লইয়া বৈষম্যের মধ্যে এমন সাম্যবিশিষ্ট শাশ্বত ধর্ম্মাশ্রিত রাষ্ট্র ও সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন যে, ভারতে এ সমস্ত সমস্যার উদয় এত কাল হয় নাই। কিন্তু প্রায় এক সহস্র বর্ষ যাবৎ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাইয়া ও গতানুগতিক ভাবে জীবন যাপন করিবার পরে সম্প্রতি প্রায় দুই শত বর্ষ যাবৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এখন এইরূপ সমস্যার আবির্ভাব হইতেছে। আমাদের সমাজের গতিশীলতা ক্রমে প্রায় বিলুপ্ত হওয়াতে এই সব সমস্যা সম্প্রতি ঘনীভূত হইতেছে।

ভারত-সমাজের বিভিন্ন উপাদান

যুগে যুগে ভারতমাতা নানা জাতিকে সন্তাননির্ব্বিশেষে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন। বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির বিচিত্র সুরের ধারা এখনও ভারত-শোণিতে ধ্বনিত রহিয়াছে।

সর্ব্বসমন্বয়কারিণী ভারতমাতা এই সমস্ত বিভিন্ন সুরের যথাসম্ভব ঐকতান সাধন করিয়া এক অনন্যসাধারণ মহিমামণ্ডিত বিশাল হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন ঋষিদের ভাবনা, সাধনা ও সুচিন্তিত ব্যবস্থার ফলে বহু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে মহান্ বিচিত্র হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাহার প্রভূত অবনতি ঘটিলেও তাহার বহুযুগব্যাপী সজীবতা, বিশিষ্টতা, বিশিষ্ট রূপ ও বিশিষ্ট উচ্চ আদর্শ প্রণিধানযোগ্য। প্রাচীন ভারতে এক বিরাট্ সমাজে বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একতানের, বহুত্বের মধ্যে একত্বের যে বিচিত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছিল পৃথিবীতে অন্য কোথাও তাহা দেখা যায় নাই।

নিম্নে ভারত-সমাজের বিভিন্ন মৌলিক জাতীয় উপাদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিতেছি, ইহা হইতে এ ধারণা ভুল হইবে যে, বর্ত্তমানে ভারতের কোন জাতি নিছক অমিশ্র 'নর্ডিক-আর্য্য' বা অমিশ্র 'আল্পাইন-আর্য্য,' বা অমিশ্র 'প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড' বা অমিশ্র 'ইন্দো-মেডিটেরানিয়ান' বা অমিশ্র 'মঙ্গোলিয়ান'। বস্তুতঃ ভারতে বা জগতে অমিশ্র জাতির অস্তিত্ব বহুকাল যাবৎ লোপ পাইয়াছে; হয়ত আণ্ডামানদ্বীপবাসী নেগ্রিটোদের ন্যায় দুই

১। Communism; ২। Revolutionary Communism; ৩। Bolshevism; ৪। Socialism; ৫। Democratic Socialism; ৬। Democracy; ৭। Republicanism; ৮। Syndicalism; ৯। Fascism; ১০। Capitalism; ১১। State-controlled and State-planned Capitalism; ১২। Economic democracy and Individual appropriation; ১৩। Classless Society.

একটি মাত্র জাতি খানিকটা অমিশ্র অবস্থায় আছে। এ প্রবন্ধে কেবল জাতি-বিশেষের আনুমানিক মৌলিক উপাদান (radical element) হিসাবে 'নর্ডিক', 'আল্পাইন' প্রভৃতি নামে তাহাদিগকে অভিহিত করিয়াছি।

ভারতের বিলুপ্ত নেগ্রিটো-প্রায় জাতি

আধুনিক পণ্ডিতদের গবেষণার আলোকে যখন ভারতের তমসাচ্ছন্ন সুদূরতম অতীতের যবনিকা অপসারিত হইল, তখন পাওয়া গেল, দক্ষিণ ও মধ্য-ভারতে কতকগুলি অমার্জ্জিত প্রস্তরায়ুধ এবং সামান্য কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক গুহা-চিত্র। ঐগুলি ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসীদের নিদর্শন বলিয়া সুধীসমাজে গৃহীত হইয়াছে। আর দক্ষিণ-ভারতে কাডার, পুলাঁয়া, উরালি প্রভৃতি লুপ্তপ্রায় দুই চারিটি বন্য অসভ্য জাতির মধ্যে অল্পসংখ্যক খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণকায়, অনুন্নতনাসিকা ও উর্ণাসদৃশ, কেশ-যুক্ত ব্যক্তির দেহাবয়ব দেখিয়া ও তাহাদের পরিমাপ লইয়া কোন কোন নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন যে, উহাদের ধমনীতে এখনও নেগ্রিটো-রক্তের ক্ষীণ ধারা বহিতেছে। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে, ভারতের সর্ব্বপ্রথম অধিবাসী ছিল এক বা একাধিক নেগ্রিটো জাতি। আসামের কোনিয়াক নাগাদের মধ্যেও নেগ্রিটো-শোণিতের ক্ষীণ ধারা বর্ত্তমান, এই মর্ম্মে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে গৌহাটী অনুসন্ধান-সমিতিতে ডাঃ হাটনের একটি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। * উত্তর-ভারতে ও বাংলা দেশেও এক সময়ে ঐ নেগ্রিটো জাতির অবস্থিতি অসম্ভব নহে। যদি কাডার প্রভৃতি জাতির অথবা আণ্ডামানের কিংবা মেলেনেসিয়ার আধুনিক নেগ্রিটো জাতিদের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে ভারতের বিলুপ্ত নেগ্রিটো-সমাজের অবস্থা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া বন্য ফল-মূল আহরণ এবং মৃগয়া ও মৎস্য-শিকার করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। তাহাদের মধ্যেও দল-নেতা ছিল; যৌন সম্বন্ধ বিধি-নিয়মের দ্বারা নিয়মিত হইত, মৃতদেহ সংকারের ব্যবস্থা ছিল, সুতরাং পরলোকে বিশ্বাস ও ভূতের ভয় ছিল। হিন্দুর সমাজ-বিজ্ঞানের গুণ-বিভাগ অনুসারে উহারা তমোগুণ-প্রধান জাতি ছিল। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান ভারতের সংস্কৃতিতে ঐ বিলুপ্ত নেগ্রিটো জাতি কোনও ছাপ রাখিয়া গিয়াছে, এরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। ডাক্তার হাটন বলেন যে, অশ্বত্থবৃক্ষের পূজা এবং তীর-ধনুকের ব্যবহার এই নেগ্রিটো জাতির দান। কিন্তু তীর-ধনুর ব্যবহার অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসী ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আদিম মানবের

---

* ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের *Man in India* পত্রিকায় ২৫৫-২৬২ পৃঃ "A Negrito Substratum

মধ্যে প্রচলিত থাকার প্রমাণ আছে। আর অশ্বত্থবৃক্ষের পূজা আওামানিজ* প্রভৃতি বর্ত্তমান নেগ্রিটোদের মধ্যে দেখা যায় না।

ভারতের দ্রাবিড়-পূর্ব্ব বা প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড জাতি

এই অধুনাবিলুপ্ত কৃষ্ণকায় নেগ্রিটো জাতির জীবন-নাট্য অভিনয়ের শেষভাগে ভারত-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল—প্রস্তরের অস্ত্রাদি হস্তে বর্ত্তমান মুণ্ডা, ভীল, সাঁওতাল, ওরাঁও-খণ্ড-গন্দ প্রভৃতি জাতিদের পূর্ব্বজরা। ইহারা সম্ভবতঃ ছিল ককেশীয় জাতির একটি অধস্তন শাখা।† ইহাদের বংশধরেরা বর্ত্তমানে 'কোল', 'ধাঙ্গড়' প্রভৃতি নিন্দাত্মক আখ্যায় পরিচিত। পণ্ডিতদের মতে ইহারা অষ্ট্রেলিয়ার বর্ত্তমান অসভ্য জাতিদের নিকটতম জ্ঞাতি; সেই জন্য তাঁহারা ইহাদিগকে 'প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড' জাতি বলেন এবং ইহাদের ভাষাকে 'অষ্ট্রিক' ভাষার অন্তর্ভুক্ত করেন। 'দ্রাবিড়ী' জাতিদের পূর্ব্বে ইহারা ভারতে আগমন করিয়াছিল বলিয়া ইহাদিগকে 'দ্রাবিড়-পূর্ব্ব' বা Pre-Dravidian জাতিও বলা যায়। ইহারা আপনাদিগকে 'হোড়', 'হোড়ো' 'হো', 'কোড়-কু', 'কোড়োয়া' প্রভৃতি মানবসংজ্ঞাত্মক নামে অভিহিত করে; কারণ, ইহাদের ধারণা, নিজেরা ছাড়া আর সকল জাতিই এত হেয় যে, 'মানব' নামের যোগ্য নহে।

ইহারা ক্রমে সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া বহুকাল ভারতে আধিপত্য করে। অনুমান হয় যে, ইহারা পূর্ব্বতন নেগ্রিটো অধিবাসীদিগকে আংশিক নাশ ও আংশিক গ্রাস করিয়াছিল এবং তাহাদের সহিত রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে এই নবাগত "প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড" মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির দৈহিক আকৃতির অপকর্ষ ঘটিয়াছিল।

এই দ্রাবিড়-পূর্ব্ব বা প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড জাতিগুলিকে ভারতের বর্ত্তমান অধিবাসীদের মূল-স্তবক (substratum) বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহাদের বিভিন্ন শাখা, প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবেষ্টনের সহিত সামঞ্জস্য সাধনের পরিমাণ অনুসারে, সংস্কৃতি বা সভ্যতা ও সমাজ-নীতির উৎকর্ষাপকর্ষ হিসাবে বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। কোন কোন শাখা মৃগয়াজীবী, কোন শাখা পশুপালক, কোন শাখা অস্থায়িভাবে কৃষিকার্য্য করে। কয়েকটি শাখা স্থায়ী কৃষিজীবী, কোন কোন শাখা অমার্জ্জিত হস্ত-শিল্পী অথবা শ্রম-শিল্পিরূপে জীবিকা অর্জ্জন করে। আর কতকগুলি শাখা জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া ক্ষেত্রদাস রূপে কিংবা নানাবিধ উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

---

* E. A. Man : *On the Original Inhabitants of the Andaman Islands,* p. 95.

† বর্ত্তমান মানবজাতির (*Homo sapiens*এর) আদিম নমুনাস্বরূপ যে কয়েকটি কঙ্কাল যবদ্বীপের Pleistocene স্তরে পাওয়া গিয়াছে, ঐ Wadjak জাতির সহিত বর্ত্তমান অষ্ট্রেলিয়ার আদিমনিবাসীদিগের সাদৃশ্য থাকায় ইহাদিগকে Wadjak জাতির অধঃপতিত একটি শাখা বলিয়া অনুমিত হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্ত Talgai skull এই দুই জাতির মধ্যবর্ত্তী যোগসূত্র বলিয়া অনুমান করা হয়। আর কেহ কেহ মনে করেন যে, এই Wadjak race দক্ষিণ-ভারতের কতকগুলি

তবে এই বৃত্তিবিভাগ অনমনীয় বা দৃঢ় নহে। ইহাদের মধ্যে গ্রাম-নেতা ও গ্রাম-পুরোহিত সম্মানিত হইলেও সামাজিক উচ্চ-নীচ শ্রেণীবিভেদ বিশেষ দৃষ্ট হয় না। কেবল কয়েকটি অপেক্ষাকৃত উন্নত কৃষিজীবী শাখার মধ্যে দেখা যায় যে, কোনও বিশেষ গোষ্ঠী জঙ্গল আবাদ করিয়া গ্রাম স্থাপন করিলে তাহাদিগকে 'ভুঁইহার' বা 'খুঁটকাট্টিদার' প্রভৃতি সম্মানসূচক আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু সে জন্য সামাজিক ব্যবহারের বিশেষ তারতম্য দেখা যায় না। যদিও ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ কোন কোন শাখা সম্ভবতঃ সভ্যতর দ্রাবিড় জাতিদের সহিত সংঘর্ষে ক্লিষ্ট ও অধঃপতিত হইয়াছিল, ইহাদের অপেক্ষাকৃত উন্নত শাখাগুলি দ্রাবিড়দের সংমিশ্রণে ও সাংস্কৃতিক সংস্পর্শে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির পথে চালিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান অসমীচীন হইবে না।

ইহাদের কৃষিজীবী শাখাগুলির মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতা ও সম্মিলনের বা ঐকতানের অপেক্ষাকৃত নিবিড়তা পরিস্ফুট হইয়াছিল। কৃষিজাত খাদ্যের অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য্যের জন্য উহাদের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও কোন কোন পরিবার আর্থিক স্বাচ্ছল্য ও অবসরবহুলতার জন্য মনের অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ সাধনে অল্পাধিক মনোযোগী হয়। বাহ্য সম্পদ্ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় শাখার সামাজিক ও ব্যক্তিগত আত্মপ্রসার ও মানসিক সম্পদ্ বৃদ্ধি হইয়াছিল। যদিও এই 'দ্রাবিড়পূর্ব্ব' কৃষিজীবী জাতিগুলির সমাজের কেন্দ্র গ্রামেই ছিল, তথাপি ইহাদের মধ্যে মুণ্ডা, ওরাঁও প্রভৃতি কয়েকটি অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল জাতির সমাজ-বন্ধন স্বগ্রামেই আবদ্ধ হয় নাই। অনেকগুলি গ্রাম মিলিয়া এক একটি গ্রামসঙ্ঘরূপ বৃহত্তর সমাজ স্থাপন করিয়াছিল ; ইহার ('পারহা' বা 'পট্টি') নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান। আর ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতির কিংবদন্তী আছে যে, এক সময়ে ভারতে ইহাদের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গণতন্ত্র রাজ্য ছিল। রাজশক্তির চিহ্নস্বরূপ মুণ্ডা-ওরাঁও প্রভৃতি জাতির প্রত্যেক গ্রাম-সঙ্ঘে ও গ্রামে এখনও বিভিন্ন চিহ্ন-অঙ্কিত পতাকা সযত্নে ও সসম্মানে রক্ষিত হয়। মধ্যপ্রদেশে দ্রাবিড়পূর্ব্ব গন্দ-জাতির শক্তিশালী সমৃদ্ধ রাজ্য আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ছিল। গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় রাজ্যাধিকারের কিংবদন্তী মুণ্ডা প্রভৃতি কয়েকটি জাতির মধ্যে এখনও বর্ত্তমান। আসামের খাসী জাতির ও বর্ম্মার মনখেমরদের ভাষার সহিত মুণ্ডা-ভাষাগুলির সাদৃশ্য দেখিয়া অনুমিত হয় যে, দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিগুলি হিমালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম পাদদেশ হইতে গঙ্গা-যমুনার উপত্যকা হইয়া মধ্যদেশ, বঙ্গদেশ ও আসাম হইয়া, বর্ম্মা ও কাম্বোজ বা ক্যামবোডিয়া প্রভৃতি দেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারত-পুরাতত্ত্ববিৎ পার্জিটার সাহেব পৌরাণিক গবেষণার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মুণ্ডা প্রভৃতি দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিগুলির পূর্ব্বজরাই পুরাণ-বর্ণিত "সৌদ্যুম্ন" জাতি ; "ঐল" বা "আর্য্য-নর্ডিক" জাতির প্রাধান্যের পূর্ব্বে, এই সৌদ্যুম্ন জাতি এবং "মানব" বা বর্ত্তমান দ্রাবিড় জাতির পূর্ব্বজরা ও "আনব" জাতি অর্থাৎ বর্ত্তমান বাঙ্গালী, গুজরাটী,

সে যাহা হউক, 'ঐল'-আর্য্যজাতির ভারত অধিকারের পর এই দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিগুলির অধিকাংশ শোণ নদের ও গঙ্গা-যমুনা প্রভৃতি নদীর উপত্যকার উর্ব্বর ভূমি পরিত্যাগ করিয়া বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু এখনও তাহাদের অতীত প্রাধান্যের চিহ্ন কোন কোন স্থানের ও নদ-নদীর নামে এবং বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার কোনও কোনও শব্দে পাওয়া যায়। যেমন বাংলা 'দহ'* অর্থাৎ নদীগর্ভে গর্ত্ত, দ্রাবিড়পূর্ব্ব মুণ্ডা প্রভৃতি ভাষার 'দা' (অর্থাৎ 'জল') শব্দ হইতে উৎপন্ন; সুতরাং 'শিয়ালদহ', 'ঝিনাইদহ', 'বাঁশদহ' প্রভৃতি স্থানের নামও দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিদের ভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। "দামোদর" নদীর আসল নাম 'দামু দা'। মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে 'দামু' ব্যক্তিবিশেষের নাম এবং 'দা' শব্দের অর্থ জল। এইরূপ মুণ্ডা 'ঢেঙ্কি' শব্দ হইতে বাংলা 'ঢেঁকি', মুণ্ডা 'মোটো' হইতে বাংলা 'মোটা', ইত্যাদি। মুণ্ডা ভাষায় 'উপুণ' অর্থে 'চারি', ইহা হইতে কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন যে, বাংলা 'পোণ' অর্থাৎ 'চারি কুড়ি' এবং 'চারকে' এক একক ধরিয়া (গণ্ডা হিসাবে) সংখ্যা গণনার প্রথা এই দ্রাবিড়পূর্ব্ব মুণ্ডা জাতিদের নিকট হইতেই গৃহীত।

এই দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিদের সমাজ ও শাসন-প্রথায় এখনও গণতান্ত্রিকতা প্রবল। 'পঞ্চায়ত' প্রথা সম্ভবতঃ ভারতে প্রথম ইহাদেরই প্রবর্ত্তিত। পঞ্চায়তকে ইহারা সত্য সত্যই ধর্ম্মাধিকরণ জ্ঞানে মান্য করে। এখনও আদালতে সাক্ষ্য দিবার পূর্ব্বে কোনও মুণ্ডা সাক্ষী তাহার জাতি-প্রথা অনুসারে 'পঞ্চের' নাম লইয়া এই বলিয়া শপথ করে, "সিরমারে-সিঙ্গবোঙ্গা ওতেরে পঞ্চ" অর্থাৎ—আকাশে সূর্য্যদেবতা, পৃথিবীতে পঞ্চায়ত। ইহাদের দেবতারা প্রায় সমস্ত স্ত্রীজাতীয়। ভারতে শক্তিপূজার প্রবর্ত্তন সম্ভবতঃ ইহারাই প্রথমে করে। ওরাঁও প্রভৃতি জাতির 'চাণ্ডী' নামক দেবতার সহিত হিন্দু চণ্ডী দেবীর সাদৃশ্য দেখা যায়। অর্দ্ধরাত্রে উলঙ্গ হইয়া 'চাণ্ডীর' ওরাঁও অবিবাহিত যুবক পূজারী 'চাণ্ডীস্থানে' গিয়া পূজা করে। আমাদের লক্ষ্মী দেবীর মত ওরাঁও মুণ্ডাদের 'সরণা' দেবীর চিহ্ন 'ধান্যশীর্ষ', তাঁহার মাথায় ধান্য-শীর্ষের জটা কল্পিত হয়। আর পিতৃপুরুষদের পূজা ইহাদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ।

ইহাদের মধ্যে বিভেদ-প্রবণতা এত অধিক যে, কোন কোন জাতি নিজ গোষ্ঠী ছাড়া অপর গোষ্ঠীর অন্ন খায় না। দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিদের নিম্নতম স্তরের শাখাগুলি তমোগুণ-প্রধান; অপেক্ষাকৃত উচ্চতর জাতিদের জীবন-সুর রজোমিশ্রিত তমোগুণান্বিত। তবে তাহাদের কতক অংশ হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া সংসারে উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাহারা কেহ কেহ 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়, 'সিং' উপাধি গ্রহণ করে ও উপবীত ধারণ করে। সম্ভবতঃ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রকারদের সময় এই সব জাতির উচ্চতর স্তরগুলির মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্য ছিল। তাই উক্ত হইয়াছে :—

শবরাঃ পুলিন্দাঃ ভীলাঃ এতে ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বম্ উপগতা ব্রাহ্মণানাম্ অদর্শনাৎ ॥

প্রত্ন-দ্রাবিড় ও দ্রাবিড় জাতি

এই দ্রাবিড়পূর্ব্ব সমাজের গৌরব যখন উচ্চতম সীমায় উঠিয়াছিল, তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ভেদ করিয়া "রণধারা বাহি, জয়গান গাহি, উন্মাদ কলরবে" আবির্ভূত হইল—প্রাচীন স্থমেরীয়, ব্যবিলনিয়ন, ইজিপশিয়ান প্রভৃতি জাতির জ্ঞাতি, সম-সাময়িক সভ্যতায় সমুন্নত প্রত্নদ্রাবিড়, অর্থাৎ বর্ত্তমান দ্রাবিড়ী জাতিদের পূর্ব্বজরা। প্রাচীন ভারতে ইহাদের পরবর্ত্তী নর্ডিক-আর্য্যরা ইহাদের নাম দিয়াছিলেন "অস্থর"। "দৈত্য", "দানব" প্রভৃতি আখ্যায়ও এই পরাক্রান্ত জাতি অভিহিত হইত। ইহারা ইউরোপের মেডিটারেনিয়ান জাতির পূর্ব্বজদের জ্ঞাতি বলিয়া ইহাদিগকে 'ইন্দো-মেডিটারেনিয়ান' নাম দেওয়া যাইতে পরে। ভারতে প্রবেশ করিয়া ইহাদের কয়েক দল পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া স্থানে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিল; অনেক স্থলে দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতির সহিত সংমিশ্রিত হইল। ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য প্রদেশ উহাদের একটি কেন্দ্র হইয়াছিল এবং সেখানে উহাদের অনেক প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়। পুরাকালে বর্ত্তমান আসাম প্রান্তেও উহাদের উপনিবেশ ও প্রভুত্ব স্থাপনের কিংবদন্তী আছে। মহিরাঙ্গ দানব, হাটক অস্থর ও তাহার বংশধর সম্বর অস্থর, রত্ন অস্থর, নরক অস্থর প্রভৃতির নাম জনশ্রুতিতে স্থবিদিত।

উত্তর-পূর্ব্বভারতে ইহাদের কোন কোন দল উপনিবিষ্ট হইলেও গঙ্গা-যমুনা প্রভৃতি নদীর স্থজলা স্থফলা উপত্যকাগুলি মুণ্ডা প্রভৃতি দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিদের অধিকৃত থাকায় এই 'প্রোটো-ড্রাভিডিয়ান' বা 'ইন্দো-মেডিটারেনিয়ান' অস্থর জাতির অধিকাংশ দল ক্রমে বিন্ধ্য গিরি অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে গেল ও ধীরে ধীরে সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিল। ইহারাই বর্ত্তমান তামিল, তেলেগু, মালায়ালি প্রভৃতি জাতিদের পূর্ব্বপুরুষ।

সকলেই জানেন যে, দক্ষিণ-ভারতে ইহাদের স্থাপিত অন্ধ্র, রাষ্টিক (রাষ্ট্রকূট), চের, চোল বা কেরল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্য প্রবল ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এবং সমুদ্র-পথে মিশর প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের সহিত ইহাদের বাণিজ্য চলিত। সভ্যতার উন্নতির সহিত শ্রেণীবিভাগের বৃদ্ধি হইয়াছিল। দ্রাবিড় সমাজের শ্রেণীবিভাগে সর্ব্বোচ্চ ছিল "মাল্লের" বা রাজা, তার পর পর্য্যায় অনুসারে 'বল্লাল' বা সামন্ত রাজা, তার পর 'বেল্লাল' বা ক্ষেত্রস্বামী বা কৃষক, তার পর 'বণিজ' বা ব্যবসায়ী। এই সব শ্রেণী ছিল উচ্চ বা 'মেলোর'; তার পর শ্রমজীবী বা 'বিনইবলার', আর সর্ব্বনিম্নে দাস-জাতি বা 'আদি-ওর'। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আবার বহু বিভাগ ছিল। উচ্চনীচ ভেদ-প্রবণতা দ্রাবিড় জাতির মধ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। উহাদের অস্পৃশ্যতা-বোধ ক্রমে ভারতের বর্ত্তমান অনমনীয় বংশগত জাতিভেদ প্রথায় পরিণত হইল। সম্ভবতঃ দ্রাবিড় জাতির মধে হঠযোগের প্রচলন হওয়ায় এই অস্পৃশ্যতা-বোধ আরও প্রবল হইয়াছিল। পরিশেষে

জন্য অপরিচ্ছন্ন দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিদের সংস্পর্শ বর্জ্জনের প্রচেষ্টা করিতেন। তাহাতে এই দ্রাবিড়দের বাহ্য শুচি-বোধ আরও উত্তেজিত হইল।

পার্জিটার সাহেব পুরাণাদির গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই 'মানব' বা দ্রাবিড় জাতি হইতে অযোধ্যার ইক্ষ্বাকু রাজবংশ, বিদেহের জনক রাজার বংশ, বৈশালীর বৈশালক বংশ, আনর্ত্ত (গুজরাট) দেশের কুশস্থালীর সরয়াত বংশ এবং মাহিষ্মতীর করুষ-বংশ ও আরও কয়েকটি রাজবংশ উদ্ভূত হইয়াছিল। শেষে এই দ্রাবিড়-'মানব' বা পৌরব শাখার প্রাচীন বংশগুলির মধ্যে কেবল দক্ষিণ-ভারতের পাণ্ড্য, চোল, চের বা কেরল বংশ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল; আর সকলেই 'ঐল' বা আর্য্য-নর্ডিকদের কবলিত বা অধীন হইয়াছিল। ক্রমে প্রায় সমগ্র ভারতের সকল জাতির উচ্চতর বংশগুলি 'ঐল' বা 'আর্য্য' জাতির সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। কোন কোন স্থলে আর্য্য-শোণিতের সংমিশ্রণও ঘটিয়াছিল।

এই দ্রাবিড় বা অসুর জাতিই সম্ভবতঃ ভারতে প্রথম তাম্র ও পরে লৌহ গালাইয়া অস্ত্র অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করে, মৃৎপাত্র পোড়াইয়া নানা আকারের বাসনপত্র প্রস্তুত করে, ইষ্টক পোড়াইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করে; মৃত ব্যক্তির জন্য প্রস্তরের কবর ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করে, জল-যাত্রার জন্য অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করে, গম ও যবের চাষ প্রবর্ত্তন করে এবং জলসেচনের দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতি করে। ভারতে দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন এবং দেবোদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান সম্ভবতঃ ইহারাই প্রবর্ত্তন করে। সর্পপূজা, লিঙ্গপূজা ও মাতৃকাপূজাও হয়ত এই জাতিরই প্রবর্ত্তিত; তবে ইহা পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতির মধ্যেও প্রচলিত ছিল; আর ধরিত্রীমাতার পূজা দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতির মধ্যেও বিশেষভাবে প্রচলিত আছে।

সাহিত্য ও সুকুমার কলার অনুশীলনে দ্রাবিড় জাতি সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহাদের এ বিষয়ে উৎকর্ষ প্রাচীন কাল হইতে বিশ্রুত। ময়াসুরের ন্যায় স্থপতি প্রাচীন ভারতে আর দ্বিতীয় কেহ ছিল বলিয়া উল্লেখ নাই। ইহাদের সঙ্ঘ-শক্তি ও কর্ম্ম-শক্তি প্রবল; তামিল জাতির বাস্তবের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও তেলেগু জাতির ভাব-প্রবণতা উল্লেখযোগ্য।

ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, 'নারিকেল', 'মীন', 'খাঁরা', 'কালা', 'কাণা', 'খোকা', 'খুকি', 'গোটা' (সমস্ত), নোলা (জিহ্বা) প্রভৃতি বহু শব্দ বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় ভাষা হইতে গৃহীত।

সকলেই জানেন যে, সম্ভবতঃ এই 'অসুর' জাতিরই একটি অপেক্ষাকৃত উদ্যমশীল ও ভাগ্যবান্ শাখা সিন্ধুনদের উপত্যকায় উপনিবিষ্ট হইয়া বিশেষ অনুকূল প্রাকৃতিক আবেষ্টনের প্রভাবে ও নানা জাতির সংস্কৃতির সহিত সংস্পর্শের সুবিধা লাভ করিয়া ক্রমে একটি সমুন্নত সমাজ ও সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল ও জগতের তৎকালীন সভ্য জাতিদের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল। মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পায় প্রাগৈতিহাসিক 'অসুর'-সভ্যতার বহুমুখী প্রতিভা ও

ঐশ্বর্য্যের যে সমস্ত নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে লিঙ্গপূজা, সর্পপূজা, বৃক্ষদেবতার পূজা, মাতৃকাপূজা ও যোগ-সাধন প্রভৃতির বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

কালক্রমে আনুমানিক পাঁচ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের সেই বিপুল 'অসুর'-সভ্যতাও সামান্য চিহ্নমাত্র রাখিয়া ইতিহাসের রঙ্গস্থল হইতে বিলুপ্ত হইল। দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়-সভ্যতার ন্যায় উত্তর-ভারতের এই অসুর-সভ্যতার মূল সুর ছিল রজস্তমোগুণাত্মক।

মঙ্গোলীয় জাতি

প্রাচীন কাল হইতে অলক্ষিতে ধীরে ধীরে তরঙ্গাকারে কয়েকটি পীতাভ মঙ্গোলীয় জাতি ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে হিমালয়ের পাদদেশে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের কেন্দ্র আসামে। এখানে আছে 'বোড়ো' শাখা; ও গারো, কাচারি, রাভা, কোচ, টিপ্রা, লালুং, 'হাজোং'; 'তাই' শাখার খামটি, শান ও আহোম; কুকি-চীন শাখার প্রাচীন ও নূতন কুকি, ও মাইথি বা মণিপুরী; কাচিন বা সিংফো শাখা; মনখেমর শাখার খাসি ও সিংটেঙ্গ; ভোটচীন (Tibeto-Burman) শাখার আবর, মিরি, আকা, ডাফলা ও মিসমি এবং বিভিন্ন নাগা জাতি (আও, রেঙ্গমা, সেমা, লোহটা, ইত্যাদি)।

নেপালের লিম্বু জাতি এবং নেপাল ও সিকিমের রোঙ্গপা বা লেপ্‌চা জাতি মিশ্র মঙ্গোলিয়ান জাতি।

দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে বাস করিলেও এই জাতিগুলির অধিকাংশই সমাজ-ব্যবস্থায়, সংস্কৃতিতে, রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত নহে।

আসামের হিন্দুদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, যাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বঙ্গদেশ হইতে বহুকাল পূর্ব্বে আসিয়াছিল। আসামে এইরূপ বহু পরিবারে কালে মোঙ্গলীয় শোণিতের অল্পাধিক সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজভুক্ত আসামের আদিম অধিবাসী। তৃতীয়তঃ, বাংলা দেশ হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সমাগত ও আসামে উপনিবিষ্ট বহু পরিবার।

রাজা ভাস্কর বর্ম্মার নিধানপুর তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, প্রায় দেড় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে মহাভূতি বর্ম্মার রাজত্বকালে (খ্রীঃ ৪৯০-৫২০) অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণ-পরিবার রাজার নিকট লাখরাজ ভূমি পাইয়া আসামে বসবাস করেন। আর দেশজ আদিম নিবাসী কতকগুলি পরিবার হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। মণিপুরবাসী অনেক ব্রাহ্মণের বিবাহ ক্ষত্রিয় রমণীর সহিত হইয়া থাকে। নেপাল তরাই-এর থারু ও বোগসা জাতির মধ্যেও মঙ্গোলয়েড রক্তের সংমিশ্রণ অনুমিত হয়।

ভারতের সমাজ ও সভ্যতায় মঙ্গোলিয়ান জাতির দান উপেক্ষণীয়।

বাঙালী প্রভৃতি 'আনব' বা আলপাইন জাতি

দ্রাবিড় জাতির ভারতে আগমনের পরে এবং নর্ডিক আর্য্যজাতির আগমনের পূর্ব্বে

মধ্য-এশিয়ার পার্ব্বত্য অধিত্যকা হইতে পামীর গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া শ্বেতাঙ্গ আলপাইন জাতির একটি শাখা একাধিক দলে ভারত-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। ইহারাই বাঙালী, গুজরাটী, মাহরাট্টী প্রভৃতি কয়েকটি জাতির পূর্ব্বজ। সম্ভবতঃ হিমালয়ের উত্তরে অবস্থানকালীন ইহারা ইন্দো-এরিয়ান গোষ্ঠীর ভাষা অবলম্বন করিয়াছিল।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইল, সর্ হারবার্ট রিজলি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বাঙালী জাতি দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। এই মত অধুনা সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এখন এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, বাঙালী জাতি ও উহাদের জ্ঞাতি গুজরাটী মাহরাট্টী প্রভৃতি জাতি মূলতঃ আলপাইন-বংশোদ্ভূত। শ্বেতাঙ্গ আলপাইন জাতির এই ভারতীয় শাখা, ভারতে কৃষ্ণত্বক্ দ্রাবিড়পূর্ব্ব ও কৃষ্ণাভ বা ধূসরবর্ণ দ্রাবিড় জাতির সহিত অল্পাধিক সংমিশ্রণ সত্ত্বেও ইহাদের শোণিতের মূল-ধারা আলপাইনই রহিয়াছে। আর তাহাদের মধ্যে উচ্চতর ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য শ্রেণীগুলি হয়ত কোথাও কোথাও সামান্য আর্য্যশোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে, এবং পূর্ব্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীতে কোথাও কোথাও সামান্য মঙ্গোলিয়ান রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়া থাকিতে পারে।

ইউরোপের ফরাসী, ইটালীয়ান, আলবেনিয়ান, এবং রুষ ও জার্ম্মানের কতক অংশ এবং মধ্য-এশিয়ার ওয়াখি, শিঘনি, রোসনানি, ইসকাশানি, খোটানি ও পাকফো জাতিরাও আলপাইন জাতিভুক্ত।

পুরাণোল্লিখিত বংশানুক্রমগুলির সমীকরণ করিয়া পার্জিটার সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এক কালে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, সৌবীর, মদ্র, বাহ্লীক ও শিবি, এই দেশগুলি 'আনব' জাতির অধিকৃত ছিল। নৃতত্ত্বের সিদ্ধান্তের সহিত এই পৌরাণিক সিদ্ধান্তের বিশেষ সঙ্গতি দৃষ্ট হয়।

বাঙালী জাতির শ্বেতাঙ্গ 'আলপাইন' কুলজীর সমর্থনকল্পে আর একটি তথ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।১) 'বঙ্গ' শব্দের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ :—"ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চের-পাদান্যন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি।" অর্থাৎ—বঙ্গ, বগধ ও চেরপ্রমুখ ত্রিবিধ প্রজা বিস্তৃতি লাভ করিয়া বিহঙ্গমরূপে সূর্য্যাভিমুখে গিয়াছিল। এই শ্লোকে 'বঙ্গ' প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদিগকে 'পক্ষী' বলা হইয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যখন আর্য্যগণ মধ্য-এশিয়া হইতে পঞ্জাবে উপনীত হন, তখন বাংলা সভ্য ছিল। আর্য্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদে উপস্থিত হন, তখন বাংলার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহারা বাঙালীকে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।" কিন্তু আমার মনে হয়, এই "পক্ষী" আখ্যা প্রদানের অধিকতর সমীচীন কারণ আছে।

আলপাইন জাতিদের মধ্যে আলবেনিয়ানরা সেদিন পর্য্যন্তও জাতীয়তা লাভ করে নাই, শ্রেণী-পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। এখনও অন্যান্য পাশ্চাত্য আলপাইন জাতিদের

অপেক্ষা ইহারা পশ্চাৎপদ; এখনও উহারা প্রাচীন রীতিনীতি কিছু রক্ষা করিয়া চলে। উহারা "Shkypetars" বা "ঈগলপক্ষীর জাতি" বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়। তাহাদের দেশকেও "ঈগলপক্ষীর দেশ" (the Land of the Eagle) বলা হয়। ডারহ্যাম্ (M. E. Durham) তাঁহার *Some Tribal Origins, Laws and Customs of the Balkans* পুস্তকে (১৬ পৃঃ) তাহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "It is noteworthy that even to-day a large proportion of the people···identify themselves with birds, and a mass of traditional ballads shows that the custom is ancient." ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আজ পর্য্যন্ত এই জাতির অধিকাংশ (আলবেনিয়ান) লোক আপনাদিগকে পক্ষীর সহিত অভিন্ন মনে করে এবং তাহাদের বহু লোকসঙ্গীত হইতে বুঝা যায় যে, ইহা তাহাদের প্রাচীন প্রথা। এই তথ্য হইতে এই অনুমান কি অসঙ্গত হইবে যে, ভারতের বৈদিক যুগে বাঙালীরাও তাহাদের জ্ঞাতি আলবেনিয়ানদের মত আপনাদিগকে "পক্ষী" তুল্য মনে করিত, কিংবা হয়ত "পক্ষী" অঙ্কিত জাতীয় পতাকা ব্যবহার করিত? এই অনুমানের সমর্থক আর একটি তথ্য এই যে, বাঙালীদের জ্ঞাতি মাহরাট্টা প্রভৃতি জাতির একটি গোষ্ঠীর নাম "গরুড়ে" অর্থাৎ গরুড় পক্ষী; অপর একটি গোষ্ঠীর পদবী "বহিরে" অর্থাৎ শ্যেনপক্ষী (B. A. Gupte : *The Bombay Kayastha Prabhus* ২৯ পৃঃ)। রায় বাহাদুর গুপ্তে স্বয়ং জাতিতে মাহরাট্টা প্রভুকায়স্থ ছিলেন। তিনি এই 'গরুড়ে' শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, মাহরাট্টা 'গরুড়ে' গোষ্ঠী তাহাদের গোষ্ঠ-পতাকায় গরুড় পক্ষীর চিত্র অঙ্কিত করে। এই সম্পর্কে ইহা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য যে, প্রত্যেক আলবেনিয়ান গোষ্ঠীকে অমুক "bairakh" বা পতাকা এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী-পতিকে "bairakhtar" সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

এই সম্পর্কে প্রাচীন রোমকসাম্রাজ্যের ঈগলপক্ষীর মূর্ত্তিযুক্ত পতাকা উল্লেখযোগ্য। রোমকেরাও আলপাইনজাতীয়। মধ্য-ইউরোপের আরও কয়েকটি আলপাইন জাতি যাহারা এক সময় রোমকসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহাদের পতাকাচিহ্নও ঈগলপক্ষীর প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত, যাঁহারা সভ্যতার উদ্ভব প্রধানতঃ পরিব্যাপ্তিমূলক (diffusionist theory of culture) এবং সভ্যতার অধিকাংশ উপাদান প্রাচীন মিশর হইতে উদ্ভূত ও সর্ব্বদেশে পরিব্যাপ্ত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা প্রাচীন মিশরবাসীদের সূর্য্যদেবতা ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন শ্যেন ও শকুনির সমবায়ে ঐ পতাকা উৎপন্ন, এইরূপ মনে করেন।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন তাম্রলিপ্তিভূমির (সুহ্মপ্রদেশের) প্রাচীনতম রাজাদের নাম তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, হংসধ্বজ ইত্যাকার ছিল। আর বর্ত্তমান বাংলা দেশে তাম্রলিপ্তি প্রদেশ অর্থাৎ বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলা 'ইন্দো-আলপাইন' জাতির একটি প্রথম উপনিবেশ হইয়াছিল, এইরূপ মনে করিবার সমীচীন কারণ আছে। সে যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুর "গরুড়ধ্বজ" নামের কথা স্বতঃই মনে আসে। হয়ত এ অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন না হইতে পারে যে, "বিষ্ণুই" বাঙালী প্রভৃতি

ভারতীয় আলপাইন জাতির আদিদেবতা এবং হয়ত শিব "শিশ্নদেবাঃ" অস্থর বা দ্রাবিড় জাতির আদিদেবতা ছিলেন ও ব্রহ্মা নর্ডিক হিন্দু জাতির আদিদেবতা ছিলেন; পরে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী হিন্দুধর্ম্মে এই তিন দেবতা একমেবাদ্বিতীয়ং ভগবানের ত্রিমূর্ত্তি বলিয়া খ্যাত হন।

এইরূপে বহু শতাব্দীব্যাপী দেশদেশান্তর ভ্রমণ ও বসবাসে বিভিন্ন দেশের ও জাতির সংস্পর্শে ও অল্পাধিক সংমিশ্রণে বাঙালী প্রভৃতি জাতির সংস্কৃতি পরিপুষ্ট হইতেছিল।

কোন কোন 'আলপাইন' দল হিমালয়ের পাদদেশ ধরিয়া হিমালয় এবং গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী কোন কোন প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। পার্জিটার সাহেব পুরাণ হইতে দেখাইয়াছেন যে, পাঞ্জাবে উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত বাদ দিয়া কোন কোন "আনব"-দল সিন্ধু-সৌবীর, কৈকেয়, মদ্র, বাহ্লীক, শিবি এবং আম্বষ্ঠ প্রদেশও অধিকার করিয়াছিল।

যখন এই আলপাইন জাতি ভারতে প্রবেশ করিল, তখন গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীগুলির উপত্যকায় দ্রাবিড়-পূর্ব্ব ("সৌহ্ম") জাতির প্রাধান্য ছিল; হয়ত তখনও সিন্ধু-উপত্যকায় ইন্দো-মেডিটেরানিয়ান জাতির আধিপত্য বর্ত্তমান ছিল; আর দক্ষিণ-ভারত প্রত্নদ্রাবিড়দের অধিকৃত ছিল। নবাগত ইন্দো-আলপাইন জাতির কোন কোন দল বর্ত্তমান গুজরাট ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে অধিষ্ঠিত হইল; কোন কোন দল বর্ত্তমান মহারাষ্ট্র প্রদেশে অবস্থান করিল, কোন কোন দল দক্ষিণে বর্ত্তমান কন্নাদ প্রদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। অন্য দলগুলি মধ্যপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান ছোটনাগপুরের ধলভূম পরগণা হইয়া এক দল মানভূম জেলায় ও অপরাপর দল তাম্রলিপ্তি প্রদেশ বা বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করিল। ঐ ইন্দো-আলপাইন জনতার এক অংশ বর্ত্তমান মেদিনীপুর, হাবড়া প্রভৃতি সুহ্মপ্রদেশে উপনিবিষ্ট হইল, এক অংশ ভাগীরথী অতিক্রম করিয়া ক্রমে পূর্ব্বাভিমুখে বঙ্গ, অর্থাৎ বর্ত্তমান মধ্য-বঙ্গ ও পূর্ব্ব-বঙ্গে গমন করিল; আর এক অংশ বর্ত্তমান বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি জেলায়, অর্থাৎ রাঢ়দেশে অবস্থান করিল। কোন কোন দল রাঢ়দেশ অতিক্রম করিয়া উত্তরে বর্ত্তমান মালদহ জেলা প্রভৃতি পুণ্ড্রদেশ ও রাজশাহী, বগুড়া প্রভৃতি বরেন্দ্রভূমিতে অধিষ্ঠিত হইল। আর এই ইন্দো-আলপাইন জন-প্লাবনের কোন কোন উচ্ছ্বসিত অংশ পশ্চিমে বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়া জেলায়, উত্তরে বর্ত্তমান আসামের কামরূপ প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইল। সুহ্মপ্রদেশ হইতে কতকগুলি ইন্দো-আলপাইন গোষ্ঠী ওড্র ও উৎকলে গিয়া ক্রমে উচ্চশ্রেণীর উড়িয়া জাতির মধ্যে পরিগণিত হইল; আর ইন্দো-আলপাইন কৃষি কুড়মী জাতি পশ্চিমে বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ইন্দো-আলপাইন বাঙালী জাতির প্রকৃত "বাংলা" রাষ্ট্রীয় "বাংলা দেশ" অপেক্ষা অনেক বৃহৎ।

সুজলা সুফলা বাংলা দেশে জীবিকা অর্জ্জন সহজসাধ্য হওয়ায়, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনও অনায়াসসাধ্য। বাংলা দেশে আগত ভাবপ্রবণ, কল্পনাশীল, মেধাবী ও

কর্মঠ আলপাইন সঙ্ঘগুলি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার এক বিশিষ্ট সভ্যতা লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিল।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, "প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, বড় বড় খাঁটি আর্য্য রাজগণ, এমন কি, যাঁহারা ভরতবংশীয় বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেন, তাঁহারাও বিবাহসূত্রে বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। যখন লোকে লোহার ব্যবসায় জানিত না, তখন বেতে বাঁধা নৌকায় চড়িয়া বাঙালীরা নানা দেশে ধান চাউল বিক্রয় করিতে যাইত, সে নৌকার নাম ছিল 'বালাম' নৌকা। তাই সে নৌকায় যে চাউল আসিত, তার নাম 'বালাম'। 'বালাম' বলিয়া কোনও ভাষায় কথা আছে কি না জানি না। কিন্তু তাহা সংস্কৃতমূলক নহে। তমলুক বাংলার প্রাচীন বন্দর। অশোকের সময়, এমন কি, বুদ্ধের সময়ও তমলুক বাংলার বন্দর ছিল। তমলুক হইতে জাহাজ সকল নানা দেশে যাইত।"

বাংলা দেশের সম্বন্ধে মহাভারতাদির সব কথা কত দূর প্রামাণ্য বলা যায় না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ আর্য্যদের পরিত্যাজ্য ছিল। পরে বৌদ্ধ প্রচারকগণের বঙ্গে আগমনকাল পর্য্যন্ত বাঙালীর প্রাচীন ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। বৌদ্ধ ও জৈন প্রচারকগণের আগমনের পর হইতে গণতন্ত্রবাদী বাঙালী সমাজ-অনুকূল উপাদান সংগ্রহ ও সমীকরণ করিবার সুযোগ পাইয়া সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথে ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইল।

সাম্রাজ্য-স্থাপনে বাঙালী জাতি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে নাই বটে, কিন্তু সংস্কৃতিতে বাঙালী ক্রমে ভারতে অগ্রণী হইয়াছে। নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর, শান্ত রক্ষিত, অভয়াকর গুপ্ত প্রভৃতি বাঙালী পণ্ডিতদের খ্যাতি সুবিদিত। বাঙালী পণ্ডিতগণ প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যাদির চর্চ্চা করিতেন, পরে প্রাকৃত ভাষায়। প্রাকৃত ভাষায় প্রসিদ্ধ গৌড়ী রীতি উদ্ভাবন বাঙালীর কৃতিত্বের একটি পরিচয়।

পরে বরেন্দ্রভূমিতে পালরাজবংশের অভ্যুদয়ে বাঙালী জাতির বহুমুখী প্রতিভা আরও বিকশিত হইতে লাগিল। নবদ্বীপের "নব্য ন্যায়" ও "গৌড়-মগধ" রীতির ভাস্কর্য্য, যাহা বরেন্দ্রভূমিতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল এবং বাংলার নানাবিধ কলাশিল্প কারুকার্য্য প্রভৃতি বাঙালীর সমীকরণশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। সামান্য গৃহকর্ম্মে ও আমোদ-প্রমোদেও বাঙালীর বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়; যেমন আলিপনা, পটঅঙ্কন, কাঁথা সেলাই, সুক্তো, ডাল্‌না, ঘণ্ট রন্ধন, সন্দেশ রসগোল্লা, ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রতকথা, কবির গান, যাত্রা, কীর্ত্তন প্রভৃতি।

সমাজের আত্মা বা সুর সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধ গুরুদের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি হইল ও উত্তরোত্তর তাহা সমৃদ্ধ হইতে লাগিল। বাংলা দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোভাবের পর তন্ত্র প্রাধান্য লাভ করে। পরে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণবীয় ভক্তিধর্ম্মের প্লাবন আসে। সম্প্রতি পাশ্চাত্য

শিক্ষার পরোক্ষ প্রভাবে বেদান্তধর্ম্ম ও মতের উপর বাঙালীর পক্ষপাতিত্ব লক্ষিত হয়। সমীকরণশীল বাঙালী জীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য করিবার পক্ষপাতী। এই এক শতাব্দীর মধ্যে ধর্ম্মক্ষেত্রে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানক্ষেত্রে, রাজনীতি ও অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙালী জাতির মধ্যে যত অধিক মনীষাসম্পন্ন লোকোত্তর পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, ভারতে আর কোন প্রদেশে এত হয় নাই।

উদারতা বাঙালী সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। যদিও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা ও আন্তঃপ্রাদেশিক ঈর্ষা দেখা যায়, বাঙালী এই প্রাদেশিক ভাব হইতে সাধারণতঃ মুক্ত।

বাঙালী ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-প্রিয়

কিন্তু যদিও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ফলে স্বাধীন চিন্তা, নব নব ধর্ম্মমত, নূতন বৈজ্ঞানিক মত, যন্ত্রাদি উদ্ভাবন, ইত্যাদি নানা বিষয়ে বাঙালীর প্রতিভা দেদীপ্যমান, তথাপি পরিতাপের বিষয় এই যে, যৌথ কর্ম্মক্ষেত্রে এ পর্য্যন্ত বাঙালী পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। সাংসারিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে বাঙালীর যৌথ-পরিবারগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ইহার জন্য আংশিকভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বর্ত্তমান চাকুরী-জীবিকা দায়ী। আর সম্ভবতঃ জীমূতবাহন-প্রণীত বাঙালীর দায়ভাগ আইনও যৌথপরিবারের পরিবর্ত্তে পারিবারিক স্বাতন্ত্র্যের পোষকতা করিতেছে। সম্প্রতি এই সামাজিক আইনকে রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা আরও পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

সে যাহা হউক, বিষ্ণু ও কালীর সাধক বাঙালী-জীবনের মূল সূত্র সত্ত্ব-মিশ্রিত রাজসিক। তবে সকল জাতিরই নিম্ন স্তরে তামসিক গুণের অল্পবিস্তর আধিক্য দেখা যায়; তাহাও বাঙালী সমাজে অপেক্ষাকৃত কম; বস্তুতঃ সকল হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীদের পক্ষেই এ কথা খাটে। সকল হিন্দু সমাজেরই ভিত্তি সত্ত্বগুণে, কোন সমাজে সেই মূল সুরের ঝঙ্কার সমধিক পরিস্ফুট, কোন সমাজে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, কোন সমাজে বা অস্পষ্ট ও লুপ্তপ্রায়। তথাপি ইহা মগ্নচৈতন্য হইতে বিলুপ্ত হয় না।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে ফরাসী প্রভৃতি পাশ্চাত্য এক শ্রেণীর উপন্যাসাদি-লেখকদের অনুকরণে বাস্তবতার কদর্য্য নগ্ন মূর্ত্তি কখন কখন চিত্রিত হইতে দেখা যায়। ইহা বাঙালীর সমাজ-জীবনের ও সাধারণতঃ হিন্দু সমাজের মূল সুরের বিরোধী। সুতরাং এই শ্রেণীর সাহিত্য এ সব সমাজের অনিষ্টকর হইবে বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ যেমন জাতীয় ও সামাজিক আদর্শই সর্ব্বত্র সাহিত্য ও সুকুমার কলাকে প্রভাবান্বিত করে এবং তাহার ছন্দ ও সুরকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি সাহিত্য ও সুকুমার কলাও আবার জাতি ও সমাজের আদর্শকে অলক্ষিতে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। তবে ভরসা এই যে, সাত্ত্বিক ভাব হিন্দুসমাজের মজ্জায়

এরূপ প্রগাঢ়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে যে, এরূপ সাহিত্য ভারতে স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা অল্প। যে সাহিত্য সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রকাশ করিবে, ভারতের ও বাংলার জীবনের সুরের সহিত কেবল তাহারই সঙ্গতি হইবে, সমাজ-জীবনের যথার্থ প্রকাশ ও স্ফুরণ তাহা দ্বারাই হইবে।

"ঐল" বা ভারতের নর্ডিক-আর্য্য জাতি

যখন দ্রাবিড়-পূর্ব্ব দ্রাবিড় ও আলপাইন জাতির পরস্পর সংমিশ্রণে বহু জাতি ও বর্ণসঙ্কর ভারতের বিভিন্ন ভাগে স্ব-স্ব স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও সমাজ লইয়া বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে দ্বন্দ্ব, কলহ, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া দিন যাপন করিতেছিল, তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হইতে সবিতৃদেবের বরেণ্য ভর্গ-ধ্যানপরায়ণ চিত্তে উদ্গীত বেদগাথায় গগন ধ্বনিত করিয়া একটি প্রতিভাবান্, মহাশক্তিশালী, বিশিষ্ট ধীশক্তিসম্পন্ন, অপূর্ব্ব কল্পনাশীল অথচ কর্ম্মপরায়ণ জাতি ভারত-রঙ্গস্থলীতে আবির্ভূত হইল।

এই নর্ডিক আর্য্যজাতির আদি আবাসভূমি ও ভারত-আগমনের কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। সে যাহা হউক, ঋগ্বেদের বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায়, উত্তর-ভারতে অধিকার-স্থাপনকল্পে 'অসুর'দের সহিত দীর্ঘকাল এই নবাগত জাতি সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল। এই 'অসুর' সংজ্ঞায় প্রধানতঃ পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধ দ্রাবিড় জাতিদিগকেই সূচিত করিত; তবে সম্ভবতঃ দ্রাবিড়-পূর্ব্ব জাতিদের কোন কোন উন্নততর শাখার যোদ্ধারাও দ্রাবিড়-অসুরদের সহিত সম্মিলিত হইয়া 'আর্য্য' নর্ডিকদের গতিরোধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। অবশেষে আগন্তুকেরাই জয়ী হইল। তাহাদের দ্বারাই হউক কিংবা নৈসর্গিক বিপর্য্যয়েই হউক, সিন্ধু-উপত্যকাবাসী 'অসুরেরা' যে গৌরবময় সভ্যতা-সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছিল, সামান্য কিছু বাস্তব নিদর্শন রাখিয়া তাহা লুপ্ত হইয়া গেল।

এই বেদবাহী আর্য্যজাতি বাস্তব সভ্যতায় অসুরদের ন্যায় সমৃদ্ধ ছিল না, কিন্তু সংস্কৃতিতে, ভাষা-গৌরবে, প্রতিভায়, কল্পনাশক্তিতে, আদর্শ-প্রবণতায় ও আধ্যাত্মিকতায় সমধিক গরীয়ান্ ছিল।

যখন পরস্পর যুদ্ধ ও বিরোধ প্রশমিত হইয়া শান্তি স্থাপিত হইল ও কিছু দিন পরস্পরের সংস্রব, সাহচর্য্য ও অল্পাধিক সংমিশ্রণ এবং আদান-প্রদান চলিতে লাগিল, তখন আসুরিক বল ও বাস্তব সভ্যতার উপর মানসিক ও আধ্যাত্মিক বল এবং সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠতা প্রাধান্য লাভ করিল। দ্রাবিড়-অসুরেরা ক্রমে নর্ডিক আর্য্যদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। অসুর-সভ্যতা এবং পরে আলপাইন সভ্যতা ও আর্য্য-সভ্যতার সমবায়ে এবং আর্য্য গুরুদের নেতৃত্বে এক বিশাল হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু সমাজে গঠিত হইল। বৈদিক হোম যজ্ঞাদির সঙ্গে বৈদিক-পূর্ব্ব পূজাদি সংমিশ্রিত হইল। অসুরাদি

অনার্য্যের ধর্ম্ম মার্জ্জিত ও পরিশোধিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মে স্থান পাইল। ভারতের বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতির ক্রিয়াকর্ম্মের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক স্তর ও অধিকারভেদ অনুসারে বিবিধ শ্রেণীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব নির্দ্ধারিত হইল। তখন এই স্তর-বিভাগ অনমনীয় ছিল না। এইরূপ স্তর-বিভাগ ও অধিকার-ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া সমাজ-সংস্কারের ও সকল শ্রেণীর ক্রমোন্নতির পথ সুগম করা হইল।

পাশ্চাত্য সমাজের ন্যায় হিন্দুসমাজের স্তর-বিভাগ ধনগত নয়, ইহা গুণগত। ত্যাগ, শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, জ্ঞানবিজ্ঞান ও আস্তিক্য ব্রাহ্মণের গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গুণানুসারে প্রাচীন কালে এক বর্ণ হইতে নিম্নতর বর্ণে অবনমিত ও উচ্চতর বর্ণে উন্নীত হওয়ার দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন 'নর্ডিক'-আর্য্য-সমাজনেতারা আর্য্যাবর্ত্তে ও পরে দ্রাবিড়-ভারতে বংশগত ও ব্যবসায়গত বহু শ্রেণী-বিভাগকে তাঁহাদের আদর্শানুযায়ী গুণগত চাতুর্ব্বর্ণ্যের কাঠামোতে থাপ খাওয়াইয়া সংস্কৃত করিতে প্রয়াস পাইলেন, তখন সে প্রয়াস সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। কালক্রমে এই শ্রেণী-বিভাগ অনমনীয় জাতিভেদে পরিণত হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে ঐ জাতিভেদবোধ কিছু মন্দীভূত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতে ঐ ধর্ম্মের গ্লানি ও অবশেষে বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদের কঠোরতা বর্দ্ধিত হইয়া ও অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হইয়া সমগ্র হিন্দু সমাজকে বিকলাঙ্গ ও বিকারগ্রস্ত করিয়া ফেলিল।

সমাজ গঠন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও হিন্দু পণ্ডিতদের মত

যে নানাবিধ নৈসর্গিক ও সামাজিক শক্তির প্রভাবে সমাজের পরিপুষ্টি হয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে তাহা প্রধানতঃ চারিটি :—

(১) প্রাকৃতিক আবেষ্টনী (natural environment);

(২) বংশানুক্রম ও পূর্ব্বপুরুষাগত সংস্কার (heredity, বা hereditary tendencies);

(৩) সামাজিক আবেষ্টনী (social environment), যেমন জাতীয় ঐতিহ্য, পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষা;

(৪) অপরাপর জাতির ও সংস্কৃতির সহিত সংস্পর্শ ও সংমিশ্রণ (contact of cultures and races)।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বহু যুগ পূর্ব্বে প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা যে প্রত্যেক মানবের ও সমাজের দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণের দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা সমাজ-বিজ্ঞানের এই মূল তথ্যেরই জ্ঞাপক। আর উক্ত চারিটি শক্তি ছাড়া মহাপুরুষদের প্রভাব সমাজের নবজীবন প্রদানের পক্ষে যে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকারী, এই তথ্য হিন্দু ঋষিরাই প্রথমে বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাই গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

> যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানম ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। (৪ অধ্যায়, ৭ম শ্লোক)

ব্যষ্টিজীবনের ও সমষ্টিজীবনের উৎকর্ষ সাধনের পন্থাস্বরূপ প্রত্যেক মানবের নিত্যকর্ত্তব্যরূপে তাঁহারা যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাহার ভিত্তি সমাজতত্ত্বের এই মৌলিক তথ্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বরং হিন্দু ঋষিদের এই সম্বন্ধে ধারণা আরও গভীর, ব্যাপক ও বিশাল ছিল। আর হিন্দু ঋষিরা কেবল সামাজিক মনস্তত্ত্বের তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া তৃপ্ত হন নাই; জ্ঞানলব্ধ তথ্য ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ দ্বারা ব্যষ্টিজীবনের ও সমষ্টিজীবনের উৎকর্ষ সাধনোপযোগী বিধিনিয়মের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, ঐ সমস্ত বিধিনিয়মের মধ্যে যেগুলি তৎকালীন অবস্থার উপযোগী ছিল, দেশের সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও সেগুলির অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তন সাধিত না হওয়ায় সমাজের উন্নতির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইল। পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি যে বিধিনিয়ম সনাতন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অপর অনেকগুলি বিধি-নিষেধ যাহা সনাতন বা মৌলিক নহে, কেবল সময়োপযোগী মাত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া সকল প্রচলিত আচার ও বিধিনিষেধকে ভগবৎ-আদিষ্ট ও দেশকাল-পাত্রনির্ব্বিশেষে অবশ্যপালনীয় বলিয়া গ্রহণ করাতেই সমাজের উন্নতির গতি রুদ্ধ হইয়া অবনতির দিকে চালিত হইতেছে। আমার মনে হয়, হিন্দুশাস্ত্রে দেবঋণ প্রভৃতির ও পঞ্চ মহাযজ্ঞের ধারণা এবং ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে বিরাট্ পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে যজ্ঞোৎপন্ন বিভিন্ন বর্ণের কল্পনা, তাহাই হিন্দু সমাজ-বিজ্ঞানের মূলসূত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

হিন্দুর দেবযজ্ঞের উদ্দেশ্য—বিশ্বের ও বিশ্বজীবের নিয়ামক প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের সহিত যজমানের বা যজমান-সঙ্ঘের আত্মসমীকরণ ও ঐকতান স্থাপন। তাই 'স্বাহা' এই আত্মযোজক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হবির্দানের বিধি, দেবতাদের সহিত, কিংবা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভাষায়, প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর সহিত—ঐকতান স্থাপনের উদ্দেশ্যে। আদিত্য, বসু ও রুদ্রাদি দেবতারা বিশ্বনিয়ামক নৈসর্গিক শক্তিরূপে ভগবৎশক্তিরই প্রতীক।

পিতৃযজ্ঞে—পিতৃগণের প্রদত্ত দেহ ও দেহাশ্রিত গুণাবলীর (heredityর) অধিকারী যজমান, 'স্বধা' মন্ত্রে পিতৃগণের সহিত স্বীয় একত্বের ধ্যান ও উপলব্ধি করেন ও আত্মানুস্মৃতির কামনা করিয়া তর্পণ করেন।

ঋষিযজ্ঞের উদ্দেশ্য—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু ও অন্যান্য জ্ঞানদাতাদের সহিত স্বাধ্যায়, মন্ত্রজপ ও ধ্যানদ্বারা অখণ্ড জ্ঞানের নিত্য সান্নিধ্য লাভ। ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নির্ণীত সামাজিক আবেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহা অতিক্রম করিয়া যায়, সামাজিক আবেষ্টনীর ধারণাকে আরও ব্যাপকতা প্রদান করে। সমাজের উপর মহাপুরুষদের প্রভাবের গুরুত্ব পাশ্চাত্য সমাজ-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা সম্প্রতি স্বীকার

নৃযজ্ঞে আতিথেয়তা ও প্রীতি দ্বারা শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়া সমাজের ও বিশ্বমানবের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিবার বিধি। বিশ্বমানবের ও বিভিন্ন মানব-সমাজের সহিত সংস্পর্শ এবং প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তাহাদের প্রভাব ব্যষ্টিজীবন ও সমাজ-জীবনকে প্রভাবান্বিত করে বলিয়াই নৃযজ্ঞের প্রবর্ত্তন।

বিশ্বমানবের সহিত সম্বন্ধের এই ধারণা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির পরস্পরের আন্তর্জাতিক ও সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ ও সংমিশ্রণের (contact of races and cultures) ধারণা অপেক্ষাও অধিকতর ব্যাপক ও মহান্।

আর ভূতযজ্ঞের ধারণা ও অনুষ্ঠান হিন্দুসমাজের বৈশিষ্ট্য। ভূতযজ্ঞের উদ্দেশ্য—আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত বিশ্বের সমস্ত জীবের সহিত মানবের বিচিত্র সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শন ও পবিত্র দৃষ্টিতে সর্ব্বভূতের সেবা। হিন্দু সমাজনীতি মতে এইরূপে ক্রমিক আত্মপ্রসারের দ্বারা বিশ্বমানবের ও পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হওয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

কিন্তু প্রায় সহস্র বর্ষ হইল, ভারত-সমাজের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। কবির ভাষায়,—

আমাদের কর্ম্মেরে করেছে পঙ্গু নিরর্থ আচারে,
জ্ঞানেরে করেছে হত শাস্ত্রকারাগারে।

আজ আমাদের ধর্ম্ম প্রাণহীন, সমাজ অর্থহীন আচারের চাপে বিকলাঙ্গ ও জীবন্মৃত। অপর দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভোগবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ভারত-সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। একমাত্র সুলক্ষণ এই যে, অধুনা পাশ্চাত্যের কৃষ্টির সংস্পর্শে আসাতে আমাদের দীর্ঘ-সুপ্ত জাতীয়তা ও স্বদেশ-প্রেম পুনরুদ্দীপিত হইতেছে ও তাহারই প্রণোদনে ভারতবাসী অন্তরের যে অমূল্য সম্পদ্‌রাজি হেলায় হারাইয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধারের প্রয়াস দেখা যাইতেছে।

যে ভারতে নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ মানবজীবনের পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে পরিগণিত হয় ও যে দেশে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মন্ত্রের প্রচলন আছে, সেখানে জাতীয়তার অভাব হইতে পারে না। অবস্থাবিপর্য্যয়ে কয়েক শতাব্দী অর্দ্ধসুপ্ত অবস্থায় কেবল মগ্নচৈতন্যে বর্ত্তমান ছিল মাত্র। বর্ত্তমানে অবস্থার পরিবর্ত্তনে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আবার জাগ্রত হইতেছে। কিন্তু উহাকে 'পরমধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল হইবে।

এই প্রসঙ্গে জাতীয়তা সম্বন্ধে ঋষিতুল্য স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—"ইয়ুরোপীয় সমাজের সহিত তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা ভারতবাসীর জাতীয় ভাবটি পরিস্ফুট হয় নাই মনে করেন, তাঁহারা ঐ ভাবের তথ্যটি ভাল করিয়া বুঝেন বলিয়া মনে হয় না। জাতীয় ভাবটি মনুষ্য-হৃদয়ের খুব উচ্চ ভাব বটে, কিন্তু উহা সর্ব্বোচ্চ ভাব নহে। জাতীয় ভাব একটি মিশ্র পদার্থ। ইহাতে ভাল এবং মন্দ, প্রশস্ততা এবং অপ্রশস্ততা, দুই-ই আছে। কোন

ভাবের সহিত তুলনায় ইহা অতি উদার ভাব ; আবার কোন ভাবের সহিত তুলনায় ইহা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ভাব। জাতীয় ভাব সম্বন্ধে আমাদিগের বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র সকলের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, ঐ ভাবটি অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু উহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ভাব আছে— উহা মনুষ্যের হৃদয়োন্নতি-সোপানে একটি উচ্চ স্থান, কিন্তু উহাই উচ্চতম বা চরম স্থান নয়। (১) নিজের প্রতি অনুরাগ, (২) নিজ পরিবারের প্রতি অনুরাগ, (৩) বন্ধুবান্ধব স্বজনের প্রতি অনুরাগ, (৪) স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ, (৫) নিজ প্রদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ,—এই পাঁচটি ধাপ ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া উঠিয়া, তবে (৬) স্বজাতিবাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূল কথায়, প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয়দিগের অধিকার এই পর্য্যন্ত। আবার পর্য্যায়ক্রমে ইহার উপরে, (৭) স্বজাতি হইতে অনধিক ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের প্রতি অনুরাগ। অগষ্ট কোমটি মতানুযায়ীদিগের প্রকৃত অধিকার এই পর্য্যন্ত। (৮) মানবমাত্রের প্রতি অনুরাগ। সরল-মনা যিশুর এবং মহাত্মা মহম্মদের দৃষ্টির এই সীমা। (৯) জীবমাত্রের প্রতি অনুরাগ, বৌদ্ধদিগের এই সীমা। (১০) সজীব-নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, ইহাই আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আসন,—আর্য্যেরা তাহারও উপরে, সেই অবাঙ্‌মনসগোচরে আত্মনিমজ্জন করিতে চাহেন। ভারতবাসীর হৃদয়ে ঐ উচ্চতম ভাব স্থান. পাইয়াছে বলিয়াই তাহার নিম্নতর যে জাতীয় ভাব, সেটি আবৃত হইয়া আছে। সম্প্রতি এই আবরণের মোচন হইতেছে।”

কিন্তু আক্ষেপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, বর্ত্তমানে কোন কোন প্রান্তীয় সরকার মুখে ভারতীয় জাতীয়তার গর্ব্ব করিলেও কার্য্যতঃ প্রান্তীয় জাতীয়তা-ভাবের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। কোথাও কোথাও দেশজ এবং উপনিবিষ্ট (native and domiciled) জাতিদের সম্পর্কে প্রভেদমূলক নীতির প্রবর্ত্তন দৃষ্ট হয়।

উপসংহার

সমাজ-বিজ্ঞানের যথাযথ অনুশীলনে এই শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি হয় যে, ব্যক্তিগত জীবনে ঐকতান, সমাজ-জীবনে ঐকতান, বিশ্বমানবের ঐকতান, ইহাই বিশ্ব-লীলা-রহস্যের উদ্দেশ্য—ইহাই সম্ভবতঃ হইবে বিশ্বনাট্যের শেষ অঙ্ক, মানবজগতের বিধিনির্দ্দিষ্ট পরিণাম।

বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতি বিশ্ব-প্রাণের আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন ধারা বা ছন্দ। প্রাচীন ভারত-সভ্যতা আর্য্য, দ্রাবিড়, আলপাইন, মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির ও সংস্কৃতির সমাবেশ ও সংযোগে গঠিত হইয়া পার্থক্য-সমন্বিত এক মহান্ একত্বে গৌরবান্বিত হইয়াছিল।

কালক্রমে প্রতিকূল ঘটনাবলীর ও ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের ফলে আর্য্যসভ্যতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র শ্লথ হইয়া এবং অনৈক্য ও বিভেদ বা বিচ্ছেদ-প্রবণতা উদ্ভূত হইয়া ভারতকে অধঃপাতিত করিয়াছিল। পুরুষপরম্পরাগত অনেক আচার ও বিধি-নিষেধ অবস্থার পরিবর্ত্তনে, বর্ত্তমান

অবস্থার ও কালের অনুপযোগী, সুতরাং অর্থহীন ও প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের কঠিন শৃঙ্খল হইতে সমাজকে মুক্ত করিতে হইবে, এবং আত্মসংযম, ত্যাগ, ফলেচ্ছাহীন কর্ম্ম, বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি যে অন্তরের সম্পদ্ আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, তাহার পুনরুদ্ধার করিতে হইবে।

অধুনা ভগবদ্‌বিধানে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে এবং ভারত-সন্তানগণ তাহাদের অর্দ্ধ-লুপ্ত সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সেই সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য এখন প্রয়োজন—ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান-সম্মত পন্থার অনুসরণ। ভারতের সমাজনেতাদের ও রাষ্ট্রনেতাদের কর্ত্তব্য, বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সমঞ্জসীভূত, সুচিন্তিত সামাজিক ব্যবস্থা ও কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করা এবং অবিচলিতচিত্তে সেই পথে অগ্রসর হওয়া ও ভারত-সমাজকে চালিত করা। তাহা হইলেই ভারত আবার জগৎসভ্যতার জয়যাত্রায় অগ্রণী হইতে পারিবে।

অন্যান্য দেশের সমাজ-সংগঠনের সহিত ভারতের সমাজ-সংগঠনের মৌলিক প্রভেদ এই যে, অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই মূলতঃ সমজাতীয়। কেবল ভারতেই বিভিন্ন জাতির বা বর্ণের অনন্যপূর্ব্ব একত্র সমাবেশ হইয়াছে। আর একমাত্র আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে কতকটা এইরূপ বিভিন্ন জাতির একত্র উপনিবেশ ঘটিয়াছে বটে। কিন্তু সেখানে শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও বিরোধ বিরল নহে। অপর পক্ষে ভারতের প্রাচীন ঋষিরা তাঁহাদের উদারতা, সম্মিলন-প্রবণতা, সমীকরণশীলতা, সার্ব্বজনীন প্রীতি ও একাত্মানুভূতির প্রণোদনে ভারতে উপনিবিষ্ট প্রত্যেক জাতির স্ব স্ব প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একটি বিরাট্, বিচিত্র, ঐশ্বর্য্যশালী ভারত-সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই সংযোগ ও সামঞ্জস্য যান্ত্রিক সংমিশ্রণে নহে। ভাব-সামঞ্জস্যে, ধর্ম্ম-সামঞ্জস্যে ও আদর্শের একত্বে অচ্ছেদ্য মানসিক বা আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক যোগ।

সমাজ-সংগঠনে স্তরবিন্যাস অনিবার্য্য। অন্যত্র এই স্তর-বিনিবেশের উচ্চনীচ পারম্পর্য্য প্রধানতঃ বৈশ্যশক্তি বা ধনের তারতম্য কিংবা ক্ষাত্রশক্তি বা শৌর্য্যবীর্য্যের তারতম্যের উপর অধিষ্ঠিত; কেবল ভারতেই উহা ত্যাগ ও ব্রহ্মণ্য বা সত্ত্বগুণের তারতম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের বিভিন্ন সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক রীতি, ব্যাবহারিক কর্ম্ম-প্রণালী, আচার-ব্যবহার, বেশভূষা, আহার-বিহার, বিভিন্ন প্রদেশের ও সামাজিক আবেষ্টনের ও ঐতিহাসিত ঘটনাপুঞ্জের প্রভাবে অসংখ্য রূপ ধারণ করিলেও, এই জাতির প্রাকৃতিক ও বিরাট্ হিন্দু সমাজের আদর্শ বা মূল স্বর ছিল আত্মসংযম, আত্মত্যাগ, অনাসক্তি, তিতিক্ষা, সন্তোষ ও শান্তি। বিভিন্ন রাগরাগিণীর মধ্যেও ছিল এই একই মূল স্বর।

সমাজ-তত্ত্বের আলোচনা হইতে এই অনুভূতি আসে যে, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি বিরাট্ পুরুষের আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন রূপ, স্বর বা ছন্দ। এই ছন্দ হারাইয়া ভারতবাসী এখন ছন্নছাড়া হইয়াছে। আবার সেই ছন্দের বা স্বরের পুনরুদ্ধারের জন্য

ভারত-সন্তানদের প্রাণপণ সাধনার প্রয়োজন ; সর্ব্বাঙ্গীন সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ভারতবাসী প্রত্যেক জাতির ও সমাজের স্ব স্ব সুর বা বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং তাহাদিগকে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সমান অধিকার প্রদান করিয়া হিন্দুসমাজের মৌলিক আদর্শের দিকে পরিচালিত করা সমাজবিজ্ঞানসম্মত পন্থা এবং প্রকৃষ্ট রাজনীতি। আমাদের প্রাদেশিক দেশ-নেতারাও ইহা স্মরণ রাখিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব প্রান্তে উপনিবিষ্ট স্বদেশী প্রবাসী বিভিন্ন জাতির এবং তাহাদের ভাষার ও সংস্কৃতির উন্নতিতে বাধা প্রদান না করিয়া যদি যথাশক্তি উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা ভারত-সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে আবার এক দিন ভারতের বিভিন্ন জাতির ও সংস্কৃতির বিভিন্নতার মধ্যে মহান্ মৌলিক একত্ব সংস্থাপিত হইবে। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ছন্দ বা সুরের সমন্বয়ে ভারতমাতা আবার তাঁহার পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন। তখন মাহরাট্টার রুদ্রবীণা ও শঙ্খনিনাদ, পঞ্জাবীর জয়ভেরীর গম্ভীর নির্ঘোষ, বাঙালীর ও অসমীয়া হিন্দুর বংশীধ্বনির মধুর নিক্কণ, হিন্দুস্থানীর করতালের ঝনৎকার, দ্রাবিড়ীয় তানপুরার করুণ স্বর, আর আসাম, ছোটনাগপুর ও মধ্য-প্রদেশের আদিম নিবাসীদের মৃদঙ্গের উল্লাস-ব্যঞ্জক ধ্বনি প্রভৃতির সম্মিলিত একতানবাদ্যে ভারতভূমি আবার মুখরিত হইবে। তখনই বহুত্বের মধ্যে একত্বের পরিচয়ে ভারতে একজাতীয়ত্বের যথার্থ অনুভূতি আসিবে। আর সেই একতানের আত্মাস্বরূপ, সকল রাগিণীর মূর্চ্ছনাস্বরূপ ভারতমাতার মহা-ওঙ্কারধ্বনি ভারতে ও জগতে নিরন্তন ধ্বনিত ও শ্রুত হইবে। সেই ধ্যান-মন্ত্রে "কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্ব্ব-জাতি",—আর তখনই সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে—

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
বাজিবে বিশ্ব-বাজনা,
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য,
বিস্মৃত হবে আপনা।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৪)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

উইলিয়ম কেরী

কেরীর প্রতিভা বহুমুখী, জীবন বহুধাবিস্তৃত ছিল; বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় দিতে গেলে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে ততখানি বিস্তারের স্থান নাই। ধর্ম্মপ্রচারার্থ বঙ্গদেশ যাত্রা করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের সামান্য পরিচয় দিয়া, বঙ্গদেশে তাঁহার কার্য্যকলাপের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। কারণ, কেরীর জীবনের এই অংশের ইতিহাস (১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ নবেম্বর অর্থাৎ কলিকাতায় পদার্পণ-দিবস হইতে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুন মৃত্যু-দিবস পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৪১ বৎসর) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বাংলা-গদ্যের প্রাথমিক ইতিহাসের সহিত জড়িত। এই কালের মধ্যে বলিতে গেলে তিনি এক দিনের জন্যও বঙ্গদেশ ত্যাগ করেন নাই—মদনাবতীতে অবস্থানকালে টমাসের সঙ্গে একবার ভুটান গিয়াছিলেন; বঙ্গদেশের পরিধি তখন ভুটান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই ৪১ বৎসরের প্রথম ছয় বৎসর তাঁহার শিক্ষানবিশীর কাল; শিক্ষক—জন টমাস ও রামরাম বসু। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতির আগমনকাল হইতেই মিশনরী-গোষ্ঠীর তিনি পরিচালক, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের সূত্রপাত হইতেই শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন; কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার সংশ্রব। এই শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহায়তায় বাংলা-গদ্যের বিকাশ ও পরিণতি এবং উভয় ক্ষেত্রেই উইলিয়ম কেরী প্রধান।

প্রবন্ধ-লেখকের এখানে একটু জবাবদিহি করিবার আছে। উইলিয়ম কেরী পৃথিবী-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। শুধু এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকাতেই তাঁহার বিস্তৃত জীবনী স্থান পায় নাই; ব্রাউন, কে, কার্ণ, লং, হাগ, মার্শাল, শেরিং, ডাফ প্রভৃতি-লিখিত ভারতের বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় মিশনের ইতিহাসে কেরী অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছেন; সি. বি. লিউসের জন্‌ টমাস-জীবনী, ডব্লিউ এইচ কেরীর ওরিয়েণ্টাল ক্রিশ্চিয়ান বায়োগ্রাফি, স্যামুয়েল ষ্টেন্নেটের উইলিয়ম ওয়ার্ড-জীবনী, উইলিয়ম্‌সের শ্রীরামপুর-পত্রাবলী (*Serampore Letters*) প্রভৃতি অসংখ্য পুস্তকে কেরীর জীবনের বহু কথা লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিজস্ব জীবনীর সংখ্যাও কম নয়। ইউষ্টেস কেরীর *Memoir of William Carey, D. D.* (১৮৩৬); ডক্টর বেলচারের *Life of William Carey* (১৮৫৬); জন ক্লার্ক

(১৮৫৯); জে. কালরসের *William Carey* (১৮৮১); জর্জ্জ স্মিথের *The Life of William Carey, D. D* (১৮৮৫); পীয়ার্স কেরীর *William Carey* (১৯২৩); ডিয়াভিল ওয়াকারের *William Carey* (১৯২৬); মহেন্দ্রনাথ চৌধুরি-সঙ্কলিত 'আদর্শ চরিত' (১৮৮০); বি. বি. শাহ-অনূদিত 'কেরি সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী' (১৮৯৪); অমৃতলাল সরকার-প্রণীত 'ভারতবন্ধু ডাক্তার উইলিয়ম কেরী' (১৯৩৪) প্রভৃতি বহু পুস্তকে কেরীর জীবন বহু ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এইগুলির উল্লেখ করিলেই প্রবন্ধ-লেখকের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেরীর উপরি-উল্লিখিত কোনও জীবনীতেই বাংলা সাহিত্যের সহিত তাঁহার সম্পর্কের বিস্তৃত বিবরণ নাই—এগুলি খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক পাদরি কেরীর জীবনের কাহিনী মাত্র। শুধু ইউষ্টেস কেরীর জীবনীর পরিশিষ্টে অধ্যাপক এইচ. এইচ. উইলসন "প্রাচ্য পণ্ডিত ও অনুবাদক" কেরী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং বাংলা-গদ্যের সহিত কেরীর সম্পর্কের ইতিহাস আমাদিগকে তাঁহার এবং তাঁহার সঙ্গীদের চিঠিপত্র ও জর্ণাল ইত্যাদি হইতে বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। আমরা মূলতঃ শ্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরির "বোর্ড রুমে"ই অধিকাংশ উপকরণ পাইয়াছি; এই কাজে শ্রীরামপুর কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এই সংখ্যায় মুদ্রিত প্লেটগুলিও সেখান হইতে গৃহীত।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট তারিখে নরদামটনশায়ারের পলার্সপিউরি গ্রামে উইলিয়ম কেরী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এডমণ্ড কেরী তখন স্বহস্তে তাঁত বুনিয়া অন্নসংস্থান করিতেন। উইলিয়মের বয়স যখন ছয় বৎসর, এডমণ্ড তখন তন্তুবায়বৃত্তি ত্যাগ করিয়া স্থানীয় অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা সুরু করেন এবং স্থানীয় প্যারিশের কেরাণী নিযুক্ত হন। পিতার এই জীবিকা-পরিবর্ত্তন উইলিয়মের পক্ষে শুভ ফলদায়ক হইয়াছিল, শিক্ষক পিতার আদর্শে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার অসাধারণ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। ইতিহাস, ভূগোল অর্থাৎ পৃথিবীর নানা দেশের বিবরণ, ভ্রমণকাহিনী, বিশেষ করিয়া কলম্বসের আবিষ্কার-বৃত্তান্ত এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন করিবার আগ্রহ ও উৎসাহের কথা সকলেই উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়ের অধীত বিদ্যা উত্তরকালে বঙ্গদেশে অবস্থানসময়ে স্থানীয় পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতাদি সম্পর্কে গবেষণাকার্য্যে তাঁহার সহায় হইয়াছিল। ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটির প্রথম ছয় খণ্ড 'পিরিয়ডিকাল অ্যাকাউণ্টসে' ইহার বহু পরিচয় আছে। পুস্তকগত জ্ঞান ছাড়াও বাল্যকাল হইতেই তিনি হাতে-কলমে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান আলোচনা করিতেন। এই বিজ্ঞানে তিনি এমনই দক্ষ হইয়াছিলেন যে, এক সময় তাঁহাকে কলিকাতার কোম্পানীর বাগানের তত্ত্বাবধায়করূপে নিয়োগ করার প্রস্তাব উঠিয়াছিল এবং বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ ডক্টর রক্সবার্গের অকালমৃত্যুতে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ *Flora Indica* পুস্তক উইলিয়ম কেরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কলম্বসের জীবনী ও ভ্রমণকাহিনী বালক কেরীকে এমনই আবিষ্ট করিয়া রাখিত যে, তিনি

দিনের পর দিন তাঁহার সহপাঠীদের কাছে কেবলই কলম্বসের গল্প বলিতেন; তাঁহার উৎসাহাতিশয্য দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে কলম্বস নামে ডাকিয়া উপহাস করিত। অন্যান্য বিষয়ে কেরী সাধারণ ছাত্রদের মতই ছিলেন, কেবল তাঁহার পিতা বাল্যে তাঁহার পাটীগণিত বিষয়ে দক্ষতার উল্লেখ করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়।* বার বৎসর বয়সে কেরী পলার্স পিউরির তন্তুবায়-পণ্ডিত টমাস জোন্‌সের নিকট বিশেষ মনোযোগের সহিত লাটিন ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে যে, তিনি মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই একটি লাটিন শব্দকোষ ('Vocabularium') কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। পীয়ার্স কেরী লিখিয়াছেন,—

Nature and he were Sister and brother.···To watch things grow was his dear recreation.···In the Paulerspury lanes and fields and forest, and in the moat between his father's schoolhouse and the rectory, little was hidden from his eyes. Bird—their forms, colours, changes, calls, songs, haunts, nests, flight, eggs···And plants—their times and seasons, their leaves and buds and flowers, their soil and roots, their devices and their seeds—he eagerly and patiently discovered....He became a recognized encyclopædia amongst his Paulerspury mates on all things curious.

এডমণ্ডের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, সুতরাং বার বৎসর বয়স হইতেই বালক কেরীকে উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হয়। প্রথম দুই বৎসর তিনি কৃষিকার্য্য শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ চর্ম্মরোগের জন্য রৌদ্রতাপ মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না বলিয়া এই জীবিকা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। তিনি হ্যাকেলটনের জুতা-নির্ম্মাতা ক্লার্ক নিকল্‌সের সহযোগী হিসাবে জুতা-সেলাইয়ের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়া চার বৎসর শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রত্যহ রবিবারে পলার্সপিউরি আসিয়া টমাস জোন্‌সের নিকট তিনি গ্রীকভাষা শিখিতে সুরু করেন। ক্লার্ক নিকল্‌সের দোকানে কয়েকটি ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ ছিল, কেরী সেগুলিও মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে থাকেন। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্লার্ক নিকল্‌সের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার আত্মীয় টি. ওল্ডের দোকানে কেরী শিক্ষানবিশ হন। এই ভদ্রলোক একাধারে মস্তপ, বদমেজাজী ও ধর্ম্মবাতিকগ্রস্ত ছিলেন; বালক কেরীর সহিত প্রায়শঃ তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক হইত। তর্কে জিতিবার জন্য কেরী প্রাণপণে ধর্ম্মগ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিতে থাকেন, এবং লাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শিক্ষায় অধিক মনোযোগী হন। এই সকল তর্কমূলক ধর্ম্মচর্চ্চা সত্ত্বেও কেরীর নৈতিক চরিত্র সংসর্গদোষে কলুষিত হইয়া পড়ে। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ আগষ্ট তারিখে ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে তিনি নিজের বাল্যজীবন সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

---

* মিঃ টমাস ব্লাণ্ডেলের নিকট এডমণ্ড কেরীর ৯ আগষ্ট, ১৮১৫ তারিখের চিঠি—"He was always attentive to learning when a boy, and was a very good arithmetician."

My companions were at this time such as could only serve to debase the mind, and lead me into the depths of the gross conduct which prevails among the lower classes in the most neglected villages : so that I had sunk into the most awful profligacy of conduct.

এই সময়ে জন্ ওয়ার (Warr) নামক এক জন সহ-শিক্ষানবিশের আদর্শ তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়, তাঁহার মনে সত্যকার ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয়; চার্চ অব ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্রচারক রেভারেণ্ড টমাস স্কটের সহিত তাঁহার এই সময়েই ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে মনিব ওল্ডের শ্যালিকা নিরক্ষরা ডরোথি প্ল্যাকেটের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে নরদামটনশায়ারের ব্যাপটিষ্টমণ্ডলীর পালকসঙ্ঘে যোগদান করিয়া রাইল্যাণ্ড, সাটক্লিফ, ফুলার ও পীয়ার্সের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মূলটনে একটি অবৈতনিক পাঠশালার শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া কেরী পিডিংটন (হ্যাকেলটন) ত্যাগ করেন; জুতা-সেলাইয়ের ব্যবসায় তিনি তখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তৎপূর্ব্বেই ক্যাপ্টেন কুকের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়, এই পুস্তক মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া পৃথিবীর অখ্রীষ্টান হিদেন জাতিসমূহের অনন্ত নিগ্রহের কথা ভাবিয়া তাঁহার মনে বেদনা জাগে ও তাহাদের মুক্তির উপায় তিনি চিন্তা করিতে থাকেন। মূলটনে আসিয়া তিনি স্বহস্তে পৃথিবীর একটি বৃহৎ মানচিত্র প্রস্তুত করেন ও সেটিকে দেওয়ালে টাঙাইয়া হিদেনদের উদ্ধার-চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। তিনি এই সময়ে ডাচ, ইতালীয়ান ও ফ্রেঞ্চ ভাষাও শিখিতে থাকেন এবং ডাচ ভাষার একটি পুস্তক ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তাঁহার এই প্রথম রচনা এখনও পাণ্ডুলিপি আকারেই আছে। ধীরে ধীরে জুতা-সেলাই ও শিক্ষকতাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কেরী ধর্ম্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন ও ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লীষ্টার শহরের হার্ভি লেনে পাকাপাকি রকম পাদ্‌রিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে এখান হইতেই তাঁহার *An Enquiry*... পুস্তক প্রকাশিত হয় এবং ঐ-সালের ২রা অক্টোবর তারিখে কেটারিঙের ঐতিহাসিক সভায় **The Particular Baptist Society for propagating the Gospel amongst the Heathen** নামক সমিতি গঠিত হয়। গত সংখ্যায় এই সভার কয়েকটি অধিবেশন ও জন্ টমাসের সহিত কেরীর প্রথম সংযোগের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদেশে রওয়ানা হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেরীর জীবন সম্বন্ধে ইহার অধিক তথ্য আমাদের ইতিহাসের পক্ষে অনাবশ্যক। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন ক্যাপ্টেন ক্রিসমাসের অধীনে পরিচালিত ডেনিশ ইণ্ডিয়াম্যান 'প্রিন্সেস মারিয়া'-যোগে জন্ টমাসের নেতৃত্বে উইলিয়ম কেরী—পত্নী ডরোথি, শ্যালিকা ক্যাথারিন প্ল্যাকেট, পুত্র ফেলিক্স, উইলিয়ম, পিটার ও সদ্যোজাত জ্যাবেজকে লইয়া বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে ৪১ বৎসর নানাকীর্ত্তিবিভূষিত জীবন যাপন করিয়া ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন তাঁহার মৃত্যু হয়। আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে কেরীর জীবনের তিনটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব—ভাষা শিক্ষায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা, শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অপরিসীম অধ্যবসায় এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার প্রবল কৌতূহল।

কেরী, টমাস ও রামরাম বসু

(১৭৯৩ নবেম্বর—১৭৯৯ অক্টোবর)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেরী ও টমাসের ধারাবাহিক জীবনী আমার প্রবন্ধের বিষয় নয়; কৌতূহলী পাঠককে ইহার জন্য অন্ততঃ জর্জ্জ স্মিথ ও সি. বি. লিউসের শরণাপন্ন হইতে হইবে। রামরাম বসু সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যবশতঃ সামান্য উপকরণই আমাদের হস্তগত হইয়াছে; খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলে মিশনরীদের কৃপায় প্রথম বাঙালী লেখকের জীবনের বিস্তৃততর বিবরণ আমরা পাইতে পারিতাম। শ্রীরামপুরের পাদরিদের সহিত কয়েক বৎসরের সম্পর্কবশতঃ তাঁহার সামান্য যেটুকু পরিচয় তাঁহাদের চিঠিপত্র ও জর্ণাল মারফৎ পাওয়া যায় তাহাতে আমাদের ঔৎসুক্য মিটে না। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র ৩য় গ্রন্থ রামরাম বসু-লিখিত 'রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র' গ্রন্থের ভূমিকায় সেই পরিচয়টুকু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, রামরাম বসু সম্বন্ধে তাহার অধিক জানিবার উপায় নাই। স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায়-সম্পাদিত 'রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্রে'র ভূমিকায় রামরাম বসু সম্বন্ধে আরও অনেক কাহিনী আছে বটে, কিন্তু অনুসন্ধানে জানিয়াছি, সেগুলির অধিকাংশই ভুল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কেরী-সমভিব্যাহারে তৃতীয় বার বঙ্গদেশ অভিমুখে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বেই টমাস বাংলা দেশ, বাঙালী ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, বিকৃত উচ্চারণ লইয়াই তিনি বাংলায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় বার স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই রামরাম বসুর সহায়তায় বাইবেলের ম্যাথু, মার্ক, জেম্‌স, জেনেসিসের কিয়দংশ, সাম্‌স (Psalms) ও প্রফেসিজ-এর বিভিন্ন অংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়া মূল পাণ্ডুলিপির নকলের সাহায্যে মালদহের হিন্দুদের মধ্যে তাহার প্রচারও করিয়াছেন।* এই অনুবাদের অসংস্কৃত রূপ আমাদের হস্তগত হইলে মিশনরী বাংলার আদিমতম নিদর্শন হইতে পরবর্ত্তী পরিণতির একটা ইতিহাস রচনা করা সহজ হইত। তবে শ্রীরামপুর মিশনযন্ত্রে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' পুস্তকের প্রথম সংস্করণে (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ ১৮ মার্চ মুদ্রণ আরম্ভ) টমাস-রামরাম বসুর অনুবাদ কতকটা অবিকৃত আছে বলিয়াই অনুমান হয়। মার্ক, জেম্‌স, জেনেসিস প্রভৃতির টমাস-বসুকৃত অনুবাদকে ভিত্তি করিয়া কেরীকৃত সংস্করণ পরে মুদ্রিত হইয়াছিল।

---

* They have Matthew, Mark, James, some part of Genesis, and the Psalms, with different parts of the Prophecies, in Bengalee manuscript: three or four of them have all the above, and some only a single, part, which they lend to one another and copy."
—Thomas's "Narrative of Himself," *Rippon's Baptist Register,* No. V.

মালদহ হইতে দ্বিতীয় বার স্বদেশে ফিরিবার সময় টমাস সঙ্গে করিয়া কেটারিঙের ব্যাপটিষ্ট-মণ্ডলীর সম্পাদকের নিকট লিখিত "শ্রীপার্ব্বতী ব্রাহ্মণ, শ্রীরামরাম বসু, কায়স্থ" লিখিত ১১৯৮ বঙ্গাব্দের ৭ই মাঘ তারিখের একটি বাংলা নিমন্ত্রণপত্র সঙ্গে লইয়া যান; টমাস ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই ঐতিহাসিক পত্রটির মূল বাংলা রূপ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মার্চ তারিখে লীষ্টারে ব্যাপটিষ্ট ভ্রাতৃমণ্ডলীর সভায় সকলে মিলিয়া এই পত্রের একটি জবাব প্রস্তুত করেন—

"A letter was drawn up, addressed to the Hindoo Christians in India, to whose conversion brother Thomas had already been instrumental......"

এই পত্রে লিখিত হইয়াছিল—

You requested in your letter sent to one of our brethren, that "Missionaries might be sent to preach the Gospel among you, and to half-forward the translation of the word of God." For these purposes we recommend to you our much esteemed brethren Thomas and Carey, men who are persuaded, are willing to hazard their lives for the name of the Lord Jesus......

W hope that upon the arrival of our brethren, you will be solemnly baptized......

Be subject to the laws of your country, in all things not contrary to the laws of God....Be faithful in all your relative connections......

রামরাম বসুকেও ১৭৮৮ সনের জুন মাসে রচিত তাঁহার খ্রীষ্ট-স্তবটির * জন্য ধন্যবাদ দিয়া একটি পত্র লিখিত হয়। এই দুইটি পত্র সঙ্গে লইয়া ১৩ই জুন তাঁহারা যাত্রা করেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ আগষ্ট গিল্‌স্‌বরোতে অনুষ্ঠিত মণ্ডলীর সভায় বঙ্গদেশগত মিশনরীদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—

That as it will be necessary for sometime, that they should have the assistance of some of the natives, in order to enable them to learn the *Sanskrit* and *Bengal Languages,* the sum of 20 l. per annum be allowed to each, towards the discharge of those extra expenses.

কেরী জাহাজেই টমাসের নিকট বাংলা শিখিতে সুরু করেন, টমাসও জাহাজে বসিয়াই হিব্রু-ভাষাভিজ্ঞ কেরীর সাহায্যে জেনেসিসের অনুবাদ শেষ করেন। ১১ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতা পৌছিয়াই রামরাম বসুর সহিত জাহাজঘাটে কেরীর পরিচয় হয়, টমাসের মুন্‌শী রামরাম সেই দিন হইতেই মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে কেরীর মুন্‌শী নিযুক্ত হন। প্রকৃত পক্ষে টমাসের সহিত বাংলা-গদ্যের সম্পর্ক এই দিন হইতেই ঘুচিয়া যায়, অধিকতর পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শীল এবং নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির হাতে এই ভার অর্পিত হয়; রামরাম বসুর মধ্যস্থতায় বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিৎ উইলিয়ম কেরী বাংলা-গদ্যনির্ম্মাণে তাঁহার অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান লইয়া অগ্রসর হন। ১১ই নবেম্বর, ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৬

---

* "কে আর তারিতে পারে লর্ড জিজছ ক্রাইষ্ট বিনা গো। পাতক সাগর ঘোর লর্ড জিজছ ক্রাইষ্ট বিনা গো।" ইত্যাদি।

খ্রীষ্টাব্দে মালদহের মদনাবাটীতে * একটি অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য মুন্‌শীত্ব হইতে বরখাস্ত না-হওয়া পর্য্যন্ত রামরাম বসু বরাবরই কেরীর সহিত যুক্ত থাকিয়া ভাষা-শিক্ষায় এবং অনুবাদ-কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। খামখেয়ালী, অমিতব্যয়ী, এবং জুয়াড়ী টমাস মিশন-প্রদত্ত যাবতীয় অর্থ অপব্যয় করিয়া নিজে নানা বিপদের মধ্য দিয়া শেষ পর্য্যন্ত জর্জ্জ উড্‌নির আশ্রয়ে মালদহের মহীপালদীঘি নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়া ১৭৯৪ সনের মার্চ মাসে সেখানে পৌঁছিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হন। বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়া পূরা সাড়ে সাত মাস কাল কেরী হালভাঙা নৌকার মত সমগ্র পরিবার এবং মুন্‌শী সমেত সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় কলিকাতা হইতে ব্যাণ্ডেল, ব্যাণ্ডেল হইতে নদীয়া, নদীয়া হইতে ব্যবসায়ী নেলু দত্তের বদান্যতায় তাঁহার মাণিকতলার বাগান-বাড়ীতে এবং শেষ পর্য্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের † দেবহাট্টায় তাড়িত-বিতাড়িত হন। এই সময়ে শারীরিক ও মানসিক অত্যধিক যন্ত্রণায় কেরী-পত্নী ডরোথি অর্দ্ধোন্মাদ হইয়া যান। এই সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যেও কেরী এক দিনের জন্যও তাঁহার আসল উদ্দেশ্যের কথা বিস্মৃত হন নাই এবং ভাষা শিক্ষা ও অনুবাদের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই। অনুতপ্ত টমাস মহীপালদীঘিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহারই-দোষে-বিপন্ন কেরীকে বাঁচাইবার জন্য জর্জ্জ উড্‌নিকে ধরিয়া মদনাবাটীর নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়কের পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া সংবাদ পাঠান। ১৫ই জুন ১৭৯৪ তারিখে কেরী সপরিবারে রামরাম বসু সহ নৌকাযোগে ইছামতী, জলাঙ্গী, গঙ্গা, পদ্মা ও মহানন্দা নদীপথে মদনাবাটী পৌঁছান। পথিমধ্যে সুন্দরবনের কাছাকাছি চান্দুরিয়া নামক স্থানে কেরী সর্ব্বপ্রথম বাংলায় বক্তৃতা করেন। কেরীর চিঠিপত্র ও জর্ণাল হইতে এই সাড়ে সাত মাসের প্রয়োজনীয় বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

Calcutta, Nov. 25, 1793......I see one of the finest countries in the world, full of industrious inhabitants; yet three-fifths of it are an uncultivated jungle, abandoned to wild beasts and serpents........

I have had several conversations with a Brahmin who speaks English well, and being unable to defend himself against the Gospel, he purposes to come, attended by a Pundit, and try the utmost of their strength......It will be of very great service to us if the society can send out a *Polyglot Bible* by the next conveyance. *Ram Boshoo* is a good Persian scholar, and it will certainly help us much........

Bandell, Dec. 16, 1793......We have been near a month at *Bandell,* which is a Portuguese settlement, but are now going further up the country, perhaps, to *Nuddea, Cutwa, Gowr,* or *Malda;* at present it is uncertain which.

---

* ইংরেজী Mudnabatty ইতিপূর্ব্বে "মদনাবতী" রূপে বাংলায় লিখিত হইয়াছিল। পরে জানিয়াছি (Ward's *Journal*) "মদনাবাটী" উচ্চারণ হইবে।

† ইহা রামরাম বসুর খুড়ার জমিদারিভুক্ত ছিল। ইহা হইতে অনুমান করা চলিতে পারে যে, রামরাম বসুর বাড়ী এই অঞ্চলেই ছিল।

Bandell, Dec. 26, 1793....I entertain a very high opinion of him [Ram Ram Boshoo] as a converted person : He is a man after my heart. He is a faithful councellor and a discerning man, and very inquisitive, sensible and intelligent. If he wants anything it is zeal;......

Maniet-tullo, Jan. 1, 1794.....The utmost harmony subsists between me and Mr. Thomas. Several Brahmins and Pundits, have been very pressing with us to settle at *Calcutta*, and preach to them; accordingly Mr. T. resides there, and I live at a house belonging to a blackman [Nelu Dutt], who generously offered it to me for nothing, till I am otherwise accomodated.

I am about renting a small quantity of land of a native, some miles east of the city [Debhatta], so that we may have opportunities of preaching the gospel all over the most populous part of *Bengal*. The city of Calcutta is very large; I have no doubt but there may be 200,000 black people there, besides the Europeans......I had fully intended to devote my eldest son to the study of Shanscrit, my 2d to the Persian, and my 3d Chinese.

Maniet-tullo, Jan. 3-5, 1794....Both Moors and Hindoos are very industrious, and in many branches of manufacture excellent workmen. The cultivated part of the country bears a great resemblance to some of our English countries......

The Moors, who are Mahometans, are more rigid and fierce than the Hindoos.....

The Hindoos acknowledge but one Supreme Being, but they make offerings to a variety of imaginary subordinate beings........

To the honour of the Government I may observe, that the black people here are as free as the natives of England, and the courts of law seem to favour them full as much as the Europeans.

Their national character is that of avarice, to this we may add a strong propensity to lying. The first of these seems to be the effect of the oppressive dealing which they have experienced under former governors. But the whole police has assumed a very different aspect under the government of Lord Cornwallis, and especially in favor of the natives.

Deharta, Feb. 15, 1794......My ear is somewhat familiarized to the *Bengalee* sounds. It is a language of a very singular construction, having no plural except to pronouns, and not a single preposition in it; but the cases of nouns and pronouns are almost endless, all the words answering to our prepositions being put after the word, and forming a new case. Except these singularities, I find it, an easy language.

এই সময়েই তিনি নিজের সুবিধার জন্য নিজেই বাংলা ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ ও একটি ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

উপরের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিগুলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকের বাঙালী ও বাংলা দেশের যে সামান্য পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতেই তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসাবে কেরী ও টমাসের এই পত্র ও জর্ণালগুলি যে কত মূল্যবান্ তাহা উপলব্ধি হইবে। উত্তরবঙ্গে এই দুই জন মিশনরীর কার্য্যকলাপের কাহিনীও কম চিত্তাকর্ষক নয়।

১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ আগষ্ট তারিখে মদনাবাটী হইতে কেরী সোসাইটিকে লিখিতেছেন—

"I cannot speak the language so well as to converse much, but begin a little."

তাঁহার ৯ আগষ্ট তারিখের পত্রে (মিঃ সাট্‌ক্লিফের নিকট লিখিত) দেখিতে পাই—

The language is very copious, and I think beautiful. I begin to converse in it a little; but my third son, about five years old speaks it fluently. Indeed there are two distinct languages spoken all over the country; the *Bengalee,* spoken by the Brammhans, and higher Hindoos; and the *Hindostanie,* spoken by the Musselmans, and lower Hindoos. This last is a mixture of Bengalee and Persian.

ঐ বৎসরের শেষে মদনাবাটীতে কেরীর এই তৃতীয় পুত্রটি (পিটার) মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সূত্রপাত হইতেই কেরী বাংলা ভাষায় বেশ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছেন, লিখিতে ও বলিতে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হয় না। এই সময়েই তাঁহার মাথায় বাইবেল মুদ্রণের খেয়াল চাপে, তিনি ইংলণ্ড হইতে হরফ প্রস্তুত করাইয়া আনিতে মনস্থ করেন। ৬ জানুয়ারির পত্রে তিনি লিখিতেছেন,—"I intend soon to send specimens of Bengalee letters, for types. A considerable part of this expense I hope to be able to bear myself." মদনাবাটীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি স্থানীয় কৃষক ও প্রজাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন; যত দূর জানা যায়, ইউরোপীয় মতে দেশীয় লোকদের শিক্ষা দিবার চেষ্টা ইহাই দ্বিতীয়। মালদহের গোয়ামাল্‌টির জন্ এলার্‌টন ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

২৭ জানুয়ারি তারিখেই কেরী ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লিখিতেছেন—

It will be requisite for the society to send a printing press from *England;* and, if our lives are spared, we will repay them. We can engage native printers, to perform the press and compositor's work.

কেরীর জর্ণালে ঐ বৎসরের ১৪ই জুন তারিখে লিখিত আছে—

The Translation also goes on—Genesis is finished and Exodus to the XXIII d. Chapter. I have also for the purpose of exercising myself in the language, begun translating the gospel by John; which Moonshee afterwards corrects......

এই পর্য্যন্ত কেরীর অনুবাদের খবর মাত্র আমরা পাইতেছি, নমুনা দেখিতে পাই না। মদনাবাটী হইতে ১৩ আগষ্ট লিখিত একটি পত্রে তিনি স্বয়ং নমুনা দিয়াছেন, কেরী-লিখিত বাংলার ইহাই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। কেরী লিখিতেছেন,—

Ram Ram Boshoo and Mohun Chund are now with me....I often exhort them, in the words of the apostle, 2 Cor. VI. 17, which in their language I thus express :—

বাহিরে আইস এবং আলাদা হও এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না এবং আমি কবুল করিব তোমারদিগকে এবং তোমরা হইবে আমার পুত্রগণ এবং কন্যাগণ এই মত বলেন সর্ব্বশক্ত ভগবান।*

কেরী এই সঙ্গেই লিখিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড হইতে হরফ আনাইবার ইচ্ছা তিনি ত্যাগ করিয়াছেন; কারণ, বাংলা দেশেই যে বাংলা হরফ পাওয়া যায়, ইহা তিনি অবগত হইয়াছেন। এখানকার মামুলি প্রথাতেই অবশ্য ইংলণ্ড হইতে দশগুণ বেশী খরচ করিয়া ক্রিসমাসের মধ্যেই বুক অব জেনেসিস পর্য্যন্ত ছাপান যাইবে, তিনি এরূপ আশা করেন।

* "Forth come and separate be : and unclean thing touch not : and I accept will

ঐ বৎসরের ২রা অক্টোবর তারিখেও তাঁহাকে দুঃখ করিতে দেখি—

One of my great difficulties arises from the common people being so extremely ignorant of their own language, and the various dialects which prevail in different parts of the country. Though I can preach an hour with tolerable freedom, so that all who speak the language well, or can read or write, can perfectly understand me; yet the laboring people can understand but little. Notwithstanding the language itself is rich, beautiful, and expressive; yet the poor people,......have scarce a word in use about religion.

বাংলা-গদ্যের অন্যতম প্রবর্ত্তক উইলিয়ম কেরীর সাধনা পরবর্ত্তী কালে এই কল্পিত বাধার দ্বারাই মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়, তিনি জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থাৎ চল্‌তি ভাষা শিক্ষা ও রচনা পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় যাবতীয় ভাষার মূল, সংস্কৃতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

From his second Mudnabati year Carey gave a third of his long working day to this language, which Ram Ram Basu extolled as almost divine. It was India's hall-mark of culture, the franchise of her real aristocracy; the tongue wherein her scriptures and classics were all enshrined; the speech which unlocked her very soul; the mother and queen of her many vernaculars. To conquer this was to lay open a dozen derivatives; to take this stronghold was to win a multifold domain........ (S. P. Carey).

ঠিক এই সময়েই কেরী (৩১ ডিসেম্বর ১৭৯৫) মদনাবাটী হইতে মিঃ পীয়ার্সকে সংস্কৃত, বাংলা এবং প্রচলিত ভাষার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন—

Should you pursue the knowledge of the Hindoo language, it will no doubt have its use; but could you learn to read, and understand, and pronounce well all the books that are written in that language, yet not one in a hundred of the people would understand you, nor could you understand them, so different is the language called Bengalee (which is spoken by the higher ranks of Hindoos) from the common language of the country, which is a mixture of Bengalee, Hindoostanee, Persian, Portuguese, Armenian, and English, that is a mere jargon. I much question whether Moonshee can translate the Bible so as to be understood by the common people, and the less so as there is an alteration in their dialect every ten or twelve miles; and if he could I am persuaded that he would be ashamed of writing language so completely ungrammatical.

নিজের অনুবাদের ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার মনে যথেষ্ট সন্দেহ জাগিতেছিল বলিয়া তিনি ঐ চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—

I have translated the gospel by John, and the Epistle to the Galatians myself, without his [Ram Ram Boshoo's] help; and the common people understand it much better than his; but it would be scouted by all above the rank of a farmer......

সংস্কৃত ও চল্‌তি বাংলা, এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া কেরী কিছু কাল অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং কোনও ব্যাকরণ-অভিধানের আশ্রয় না পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত নিজেই সংস্কৃতের আদর্শ ধরিয়া ব্যাকরণ-অভিধান রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। ফর্ষ্টারের অভিধান তখনও প্রকাশিত হয় নাই এবং যে কারণেই হউক, হাল্‌হেডের ব্যাকরণ ও

আপ্‌জনের অভিধান তিনি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন (৩১ ডিসেম্বর, ১৭৯৫)—

I have been trying to compose a compendious grammar of the language, which I send you, together with a few pages of the Mahabharat, with a translation, which I wrote out for my own exercise in the Bengalee......I have also begun to write a dictionary of the language, but this will be a work of time;......

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসেই কেরী রাইল্যাণ্ডের নিকট পত্রে লিখিতেছেন—

I have read a considerable part of the 'Mahabharata,' an epic poem written in most beautiful language, and much on a par with Homer. And were it, like Homer's 'Iliad' only considered as a great work of human genius, I should think it one of the finest productions in the world.

বাংলা ভাষা শিক্ষা ও গদ্য রচনার কাজ এই ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল, হঠাৎ মুন্‌শী রামরাম বসুর দুশ্চরিত্রতা প্রকাণ্ড বাধার সৃষ্টি করিল, ১৭৯৬ সালের জুন মাসে কেরী নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে রামরাম বসুকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইলেন, বসুর সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালার পণ্ডিতটিও পলায়ন করিলেন। সকল কাজ একসঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। কেরীর মানসিক অবস্থা এই সময়ে এত খারাপ হইয়াছিল যে, তিনি প্রায় হাল ছাড়িয়া দিবেন ভাবিয়াছিলেন। ঐ বৎসরের ১৭ই জুন একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—

With respect to printing the Bible, we were perhaps too sanguine. Means have hitherto failed. I think it will be well for the society to send at least one hundred pounds per annum, which shall be applied to the purposes of printing the Bible, and educating the youth.

I think it very important to send more missionaries hither, as we may die soon....

ঐ বৎসরের ১০ই অক্টোবর তারিখে জন ফাউন্‌টেন নামক এক জন যুবক প্রচারক কেরীর সহকারিরূপে মদনাবাটীতে উপস্থিত হইলেন। এই যুবকের উৎসাহে কেরী আবার নূতন উদ্যমে কাজ সুরু করিলেন, ফাউন্‌টেন অতি অল্প কালের মধ্যে বাংলা ভাষা শিখিয়া লইয়া স্কুলের কাজ ও অনুবাদের কাজে কেরীকে সাহায্য করিতে লাগিলেন, ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হইবার পূর্ব্বেই নিউ টেষ্টামেণ্ট সম্পূর্ণ অনূদিত হইয়া গেল, তখন শুধু ছাপার অপেক্ষা। কিন্তু তাহাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, হিসাব করিয়া দেখা গেল, এদেশে ১০০০০ কপি ছাপিতে ৪৩৭৫০৲ টাকা খরচ হইবে। সুতরাং ইংলণ্ড হইতে একটি মুদ্রাযন্ত্র ও হরফ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া কেরী ১৬ই নবেম্বর তারিখে ফুলারকে পত্র দিলেন, এক জন দক্ষ মুদ্রাকরকেও ঐ সঙ্গে পাঠাইতে বলিলেন।

এই পত্রের জবাব আসিবার পূর্ব্বেই কেরী ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি কলিকাতা রওনা হইলেন—"To make the necessary enquiries about the expence of printing it here..." তিনি তখনও সংস্কৃত শিখিতেছেন এবং প্রত্যহ হিন্দুস্থানীতেও পাঠ লইতেছেন। কলিকাতার মুদ্রাকর হিসাব করিয়া জানাইলেন যে, নিউ টেষ্টামেণ্ট ছাপার অক্ষরে মোট ৬০০ পৃষ্ঠা হইবে, তাঁহারা সম্পূর্ণ নূতন সেট টাইপ কাটাইয়া সেই হরফে ১০০০০ কপি

ছাপিয়া দিতে প্রায় ৪০ হাজার টাকা লইবেন। অত টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব জানিয়া কেরী দুঃখিতচিত্তে মদনাবাটী ফিরিয়া আসিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জুলাই তারিখে ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লিখিত পত্রে দেখিতেছি—

I am forming a dictionary, Shanscrit, Bengallee and English, in which I mean to include all the words in common use. It is considerably advanced; and should my life be spared, I would also try to collate the Shanscrit with the Hebrew roots, where there is any familiarity between them........

মূল সমিতি কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র ও হরফের কোনই ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না, সুতরাং মুদ্রাকরের সন্ধানও প্রয়োজন হইল না। মদনাবাটীতে কেরীর জীবনযাত্রাও নিরুপদ্রবে চলিতেছিল না। অনাবৃষ্টি অথবা অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর নীলকুঠির কাজ প্রায় বন্ধ ছিল। খামখেয়ালি টমাসের কাজও ভাল চলিতেছিল না, মিশনের সহিত তাঁহার সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হইয়া আসিয়াছিল, ঝড়ের মত তিনি মদনাবাটীতে আসিতেন ও চলিয়া যাইতেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দেই টমাস মহীপালদীঘির কুঠি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। সেখানে কয়েক মাস অবস্থান করার পর তিনি রাজমহল পাহাড়ের পাদদেশে সেরাসিং নামক স্থানে সাঁওতালদের মধ্যে প্রচারকার্য্য করিতে যান। সদয়হৃদয় উড্‌নি বিপন্ন কেরীকে সাহায্যের জন্য আরও দুই এক বৎসর কুঠির কাজ চালাইতে মনস্থ করিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সংবাদ পাওয়া গেল যে, কলিকাতায় দেশীয় ভাষার হরফ প্রস্তুতের একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে—

A Letter-Foundry has lately been set up at Calcutta for the country languages, and I think it will be cheaper and better to furnish ourselves with types for printing the Bible in this country, than to have them cast in Europe......W. Carey, Jan. 1, 1798.

এই কারখানার কর্ত্তা কে ছিলেন জানা যায় না বটে, কিন্তু উইলকিন্স-শিষ্য পঞ্চানন যে এখানে কাজ করিতেন, জে. সি. মার্শম্যান সে কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

All trace of the author or the result of this project has been lost except the fact that the punches were cut by the workman whom Sir Charles Wilkins had trained up. Mr. Carey immediately placed himself in communication with the projector of this scheme, and relinquished all idea of obtaining Bengalee types from England.—*The Life and Times of Carey, Marshman and Ward,* Vol. I, p. 80.

এইখানেই পঞ্চাননের সহিত ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর পরিচয় হয় এবং তাহারই ফলে শ্রীরামপুরে ছাপাখানা স্থাপিত হইবার পর পঞ্চানন কেরীর সহিত যোগদান করেন।

ইহারই কিছু দিন পরে ইংলণ্ড হইতে সদ্য-আগত একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত মুদ্রাযন্ত্র কলিকাতায় নিলামে বিক্রয় হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়, মাত্র ৪৬ পাউণ্ড (জে. সি. মার্শম্যানের মতে ৪০ পাউণ্ড) মূল্য ধার্য্য হইয়াছিল। বাইবেল-মুদ্রণের সাহায্যের জন্য ধর্ম্মপ্রাণ উড্‌নি উহা ক্রয় করিয়া আনাইয়া কেরীকে দান করিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে (১৭৯৮) মুদ্রাযন্ত্রটি মদনাবাটী-ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের

প্রারম্ভে কেরী টাইপ অর্ডার দিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিলেন।* মদনাবাটীতে আসিয়াই তিনি একটি বিপদে পড়িলেন। জর্জ্জ উডনির নিকট হইতে মদনাবাটী কুঠির কাজ বন্ধ করিবার আদেশ আসিল। বিপন্ন কেরী নিকটবর্ত্তী খিদিরপুর গ্রামে নিজের এত দিনের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া উডনির নিকট হইতে একটি নীলকুঠি ক্রয় করিলেন, কেরী ও ফাউন্‌টেন মুদ্রাযন্ত্রটি সমেত সেখানে নূতন সংসার পাতিতে গেলেন।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ব্রান্সডন, গ্রাণ্ট প্রভৃতি নূতন মিশনরীদল কলিকাতায় আশ্রয় না পাইয়া ডেনিশ রাজ্য শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন। জন ফাউন্‌টেন তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য পূর্ব্বেই কলিকাতা গিয়াছিলেন। ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা নিজেরা স্থির করিতে না পারিয়া সকলের পরামর্শমত কেরীর মতামতের জন্য ফাউন্‌টেন ও ওয়ার্ড ১৪ই নবেম্বর নৌকাযোগে খিদিরপুর রওয়ানা হইলেন। ১৭৯৯ সালের ১লা ডিসেম্বর তাঁহারা কেরীর গৃহে পৌছিলেন। নিজের ও মিশনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে কেরী তিন সপ্তাহ সময় লইলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত বহু কষ্টে উপার্জ্জিত খিদিরপুরের সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রটি সহ নৌকাযোগে ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে শ্রীরামপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মুদ্রাকর ওয়ার্ড তাঁহার সঙ্গে রহিলেন।

But what of John Thomas through all the upheaval of these days?....With his wife and daughter he moved hither and thither; never in one stay. Now living in a boat, now in a bamboo hut; now in Nadia, now in Birbhum; now preacher, now sugar-refiner and distiller, and now again indigo-venturer: A rolling stone: a warm heart, a wayward judgment and will! (S. P. Carey).

শ্রীরামপুর মিশন—কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড

(১০ জানুয়ারি ১৮০০ হইতে ৮ এপ্রিল ১৮০১)

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর রবিবার ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির দ্বিতীয় দল শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। শ্রীরামপুর তখন ডেনমার্কের অধীন। গঙ্গার ধারে এখন যেখানে কলেজটি অবস্থিত, তাহারই সন্নিকটে 'মায়ার্স ট্যাভার্ণ' নামে একটি ডেনিশ

---

* Carey to Ryland, April 1, 1799—"I wrote to the society that I had reason to hope that a copy of the whole Old and New Testament might be completed, by the time the paper mentioned by brother Fuller, for printing 2,000 copies of the New Testament would arrive....We have a press, and I have succeeded in procuring a sum of money sufficient to get types cast. I have found out a man who can cast them, the person who casts for the Company's press; and I have engaged a printer at Calcutta to superintend the casting. The work is now begun, and I hope may be completed in less than six months, by which time the copy will be in forwardness to begin upon........

I went to Calcutta in company with Mr. F [ফারনাণ্ডেজ]

সরাইখানা ছিল ; পাদরিরা সেই সরাইখানায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ওয়ার্ড তাঁহার দিনপঞ্জিকায় লিখিয়াছেন—

প্রকৃতি এখানে সহজ সাজে সজ্জিত ; তাঁহার সম্পদের মধ্যে কুটীর ও কুঞ্জোদ্যানগুলি। নদীতরঙ্গে তিনি খেলা করেন, জীবধাত্রী হইয়া এখানে বিরাজ করেন ; এখানে সব কিছুর উপর কে যেন মায়ার পরশ বুলাইয়াছে ; হিন্দুর ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে ইতিমধ্যেই আমার বাসনা জন্মিয়াছে ; এই সুন্দর নদীর তীরে কুটীর এবং কুঞ্জ-কাননমধ্যে আমি থাকিতে চাই। এই ভদ্র এবং শান্ত হিন্দুদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিব, এই চিন্তায় আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই নদী-তীরস্থ সামান্য কুটীরগুলির যে সৌন্দর্য্য, ইংলণ্ডের পরম রমণীয় উদ্যানের সৌন্দর্য্য তাহার অর্দ্ধেকও নহে। স্থানীয় অধিবাসীরা উচ্চতায় নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, তাম্রবর্ণ এবং অনেকে দেখিতে সুন্দর। সম্পূর্ণ সমতল এই দেশ, স্থানে স্থানে অরণ্যসঙ্কুল, মাঝে মাঝে জানালাবিহীন খড়ের ছাউনি-দেওয়া কাদায়-গাঁথা কুড়েগুলি ; গৃহপালিত পশুর প্রাচুর্য্য—দলে দলে চরমান তাহাদের দেখিলে চোখ জুড়ায়। মাথায় এবং কোমরে জড়ান এক এক টুকরা কাপড় ইহাদের পরিধেয় ; ফলমূল, মৎস্য ও অন্ন ইহাদের প্রধান আহার্য্য এবং ধূমপান প্রধান বিলাস···এই দেশ এবং ইহার অধিবাসীদের দেখিয়া আমরা সত্যই আনন্দ পাইতেছি ; নয়নমনোহর মূর্ত্তির সংখ্যা ইংরেজদের অপেক্ষা ইহাদের মধ্যে অধিক···।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি কেরীর শুভাগমনে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হইল। দলের প্রথম টমাস ও প্রধান কেরীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ফাউন্‌টেন, গ্রাণ্ট ও ব্রান্সডন অল্পকালমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। টমাসও এই গোষ্ঠীতে ঘনিষ্ঠ ভাবে যোগ দিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র মার্শম্যান ও ওয়ার্ড দীর্ঘকাল জীবনের শেষ পর্য্যন্ত মিশনের কাজে কেরীর সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

জোশুয়া মার্শম্যান ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ এপ্রিল উইল্‌টশায়ারের ওয়েষ্টবেরি লে'তে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জন্‌ মার্শম্যান তন্তুবায়ের কাজ শিখিয়া কিছু কাল নাবিকবৃত্তি অবলম্বন করেন, পরে তাঁতের কাজ ও ধর্ম্মচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। জোশুয়া মার্শম্যান বাল্যকালে ইতিহাস এবং বীর ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী পড়িতে ভালবাসিতেন। তাঁহার পুস্তকপ্রীতি দেখিয়া কেটর নামক এক জন পুস্তকবিক্রেতা তাঁহাকে মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে লণ্ডনে তাঁহার পুস্তকের দোকানে সহকারী (পিওন) নিযুক্ত করেন ; নানা বই পড়িবার লোভে এই কাজে প্রথমটা তাঁহার আনন্দ হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি দেখিতে পান, কাজের চাপে পড়িবার অবসর মিলে না। পাঁচ মাস কাজ করিয়া তিনি ওয়েষ্টবেরি লে'তে ফিরিয়া আসেন ও পৈতৃক তাঁতবোনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, বই-পড়ার বদঅভ্যাস বশতঃ তিনি তখন গল্প-উপন্যাস, কবিতা, ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি যাহা কিছু হাতের কাছে পাইতেন, বিনা-বিচারে পড়িয়া ফেলিতেন। পরবর্ত্তী দশ বৎসর তাঁহার ধর্ম্মজীবনের শিক্ষানবিশীর কাল। ১৭৯১ সালে হ্যানা শেফার্ডের সঙ্গে তাঁহার বিবাহে তিনি ব্যাপটিষ্ট-মণ্ডলীভুক্ত হইবার সুবিধা পান, হ্যানা বিখ্যাত ব্যাপটিষ্ট পরিবারের সন্তান।
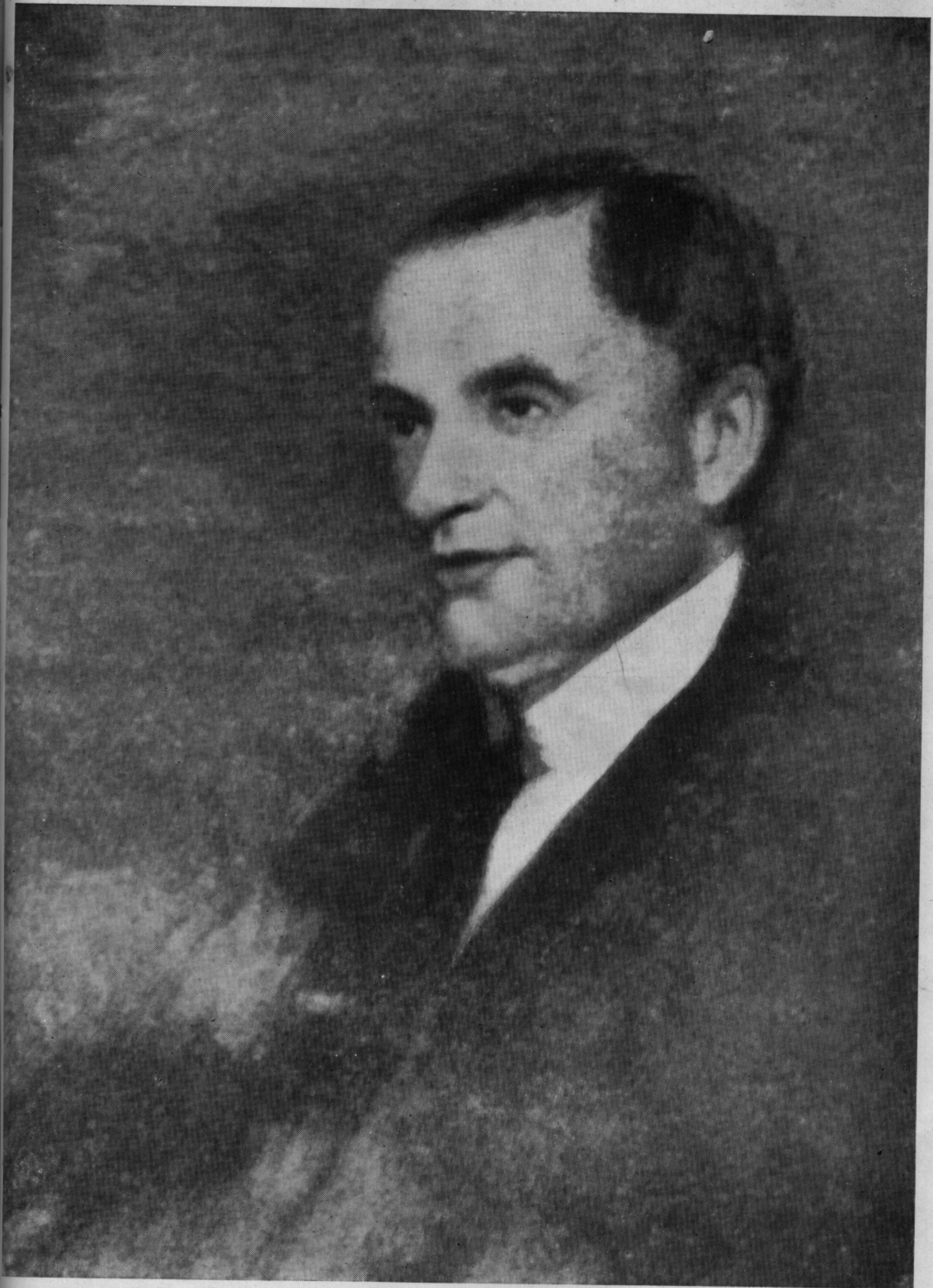
জোশুয়া মার্শম্যান

প্রেসিডেণ্ট ডক্টর রাইল্যাণ্ডের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এখানেই তিনি লাটিন, গ্রীক, হিব্রু ও সিরিয়াক ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাণ্টস'গুলি পাঠ করিয়া এবং তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র গ্রাণ্টের উৎসাহে তিনিও মিশনরীরূপে ভারতবর্ষ যাত্রা করেন। শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার কাল হইতেই তিনি সস্ত্রীক শিক্ষা-বিভাগের তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন; চীনা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। সংস্কৃত রামায়ণের ইংরেজী অনুবাদে তিনি কেরীর প্রধান সহকারী ছিলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার স্বদেশ যাত্রা করেন এবং ইউরোপ ঘুরিয়া ১৮২৯ সালে শ্রীরামপুর প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৩৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর শ্রীরামপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উইলিয়ম ওয়ার্ড ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ অক্টোবর ডার্বিতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবাবস্থাতেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, মাতা পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নাই। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াই তিনি ডার্বির মিঃ ড্রুরির ছাপাখানায় কিছু কাল শিক্ষানবিশ ছিলেন। ইহার পরেই তিনি 'ডার্বি মার্কারি' নামক পত্রিকা সম্পাদনের ভার পান। এই সময়ে তিনি ফরাসী বিপ্লবের সাম্য ও স্বাধীনতাবাদের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ওয়ার্ড শেষ পর্য্যন্ত 'হাল্ অ্যাডভার্টাইজার'-এর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং হালে অবস্থানকালেই (১৭৯৬, আগষ্ট) ব্যাপটিষ্ট মিশন দলে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে জর্ণালিজম ও পলিটিক্সে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মে ও তিনি এক বৎসরকাল বিখ্যাত প্রচারক ডক্টর ফসেটের শিক্ষাধীনে থাকেন। কেরীর ভারতবর্ষ-যাত্রার প্রাক্কালে এক দিন ওয়ার্ডের সহিত তাঁহার দেখা হয় এবং প্রয়োজন হইলে তিনি বাইবেল-মুদ্রণের কাজে এই যুবকের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন, এই আশ্বাস দিয়া যান। স্বদেশে থাকিয়াই (১৭৯৯) ওয়ার্ড শুনিতে পান, বাংলা দেশে কেরী বাইবেলের অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত মুদ্রাকরের অভাবে ধর্ম্মগ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে না। তিনি অবিলম্বে মিশনের কাজে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস সম্পূর্ণ তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। শ্রীরামপুরের কাগজ-প্রস্তুতের কারখানাও তিনিই স্থাপন ও পরিচালন করেন। *Account of the Writings, Religion, and Manners, of the Hindoos including Translations from their Principal Works* (In four volumes, Serampore, 1811) তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। ওয়ার্ড বাংলা খুব ভাল না শিখিলেও খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্পর্কে কয়েকটি চটি প্রচার-পুস্তিকা বাংলায় লিখিয়াছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ শ্রীরামপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১১ই জানুয়ারি (১৮০০) হইতে মিশনের কাজ সুরু হইল। ওয়ার্ড, ব্রান্সডন ও কেরীর প্রথম পুত্র ফেলিক্স ছাপাখানা লইয়া পড়িলেন। সুদক্ষ মুদ্রাকর ওয়ার্ডের পরিচালনায় অত্যল্পকালমধ্যে খিদিরপুর হইতে আনীত কাঠের মুদ্রাযন্ত্রটি মিশনবাড়ীর

ব্রান্সডন ও এক জন দেশী কম্পোজিটর নিউ টেষ্টামেণ্টের ম্যাথুলিখিত সমাচার কম্পোজ করিতে এবং কপি ও প্রুফ সংশোধনের জন্য অবিরত কেরীর পিছনে ধাওয়া করিতে লাগিলেন। ১৮ই মার্চ তারিখে প্রথম শীট (sheet) মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হইল। মার্চ মাসের গোড়ায় কলিকাতা হইতে পঞ্চানন আসিয়া শ্রীরামপুর মিশন-ছাপাখানার কাজে যোগদান করিয়াছিলেন; সুতরাং টাইপের অসুবিধা যেটুকু ছিল, তাহাও দূর হইয়াছিল। ওয়ার্ডের জর্ণালে ১৮ মার্চ তারিখে লিখিত আছে—

This day brother Carey took an impression at the press of the first page in Matthew.

সেদিন মিশন-গোষ্ঠীর উৎসাহের আর সীমা ছিল না। বাংলা দেশের আকাশ-আচ্ছন্ন-করা কুসংস্কারের মেঘ ধীরে ধীরে কাটিয়া আসিতেছে, ইহা মানস নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া সেদিন তাঁহারা উৎসব করিয়াছিলেন।

মিশনের সমস্ত বিভাগের কার্য্যকলাপের পরিচয় দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই ছাপাখানার সহিতই আমাদের সম্পর্ক। সুতরাং এই ইতিহাসের ধারাই আমরা অনুসরণ করিয়া চলিব। ওয়ার্ডের জর্ণালে ১৬ই মে তারিখের লিখন এইরূপ—

This week we have begun to print the first sheet of the New Testament. We print 2,000 copies, of which 1,700 are on Patna paper, and 300 on English. We also print 500 of Matthew to give away immediately, which will nearly be an expense of paper only, and so will not cost more than two or three pounds.

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের গোড়ায় * 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন-ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত ইহাই সর্ব্বপ্রথম গন্ত-পুস্তক।† এই পুস্তকটি নানা দিক্ দিয়া উল্লেখযোগ্য। ইহার পাণ্ডুলিপি ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতের সাহায্যে কেরী কর্ত্তৃক সংশোধিত ও মুদ্রাযন্ত্রের জন্য প্রস্তুত হইলেও টমাস ও রামরাম বসুর অনুবাদকে ভিত্তি করিয়াই এই পাণ্ডুলিপি রচিত হয়। রামরাম বসু, টমাস ও কেরীর নাম একত্র গ্রথিত করিয়া এই পুস্তকটি বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১২৫ পৃষ্ঠায় (ডিমাই আটপেজী) সম্পূর্ণ এই পুস্তকের একটি মাত্র কপি শ্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরির বোর্ড-রুমে (শো-কেসে) রক্ষিত আছে। আমরা এই প্রবন্ধে উক্ত পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি মুদ্রিত করিলাম। ভাষার নমুনা এইরূপ—

---

* ওয়ার্ডের জর্ণাল, ১৫ই আগষ্ট, ১৮০০

—"and also 500 additional copies of Matthew for immediate distribution; to which are annexed, some of the most remarkable prophecies in the Old Testament respecting Christ. These are now distributing........"

† খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী কর্ত্তৃক গেয় কতকগুলি সঙ্গীত ও রামরাম বসুর 'হরকরা' (কবিতা) ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সঙ্গীতগুলির কয়েকটি কেরী কর্ত্তৃক রচিত।

দের কিং আবশ্যক আছে তাহা তোমারদের যাচনের
৯ পুর্ব্বে তোমারদের পিতা জানেন। অতএব তোমরা
এই মত প্রার্থনা করহ হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতঃ
১০ তোমার নাম পুন্য করিয়া মান্য যাওক। তোমার
রাজ্য আইসুক তোমার ইচ্ছা যে মত স্বর্গেতে সেই
১১ মত পৃথিবীতে পালিত হওক। আমারদের দিব
১২ সিক আহার এই দিবসে দেও। ও যেমত আমরা
আপনারদের দায়ীরদিগকে ক্ষমা করিতেছি সেই
১৩ মত আমারদের দাওয়া সকল ক্ষমা করহ। এবং
আমারদিগকে পরীক্ষায় লওয়াইও না কিন্তু মন্দ
হইতে রক্ষা করহ কেননা রাজত্ব ও পরাক্রম ও
১৪ গৌরব তোমার সদা সর্ব্বক্ষনে আমেন। অতএব
যদি তোমরা মনুষ্যেরদের অপরাধ ক্ষমা করহ তবে
তোমারদের স্বর্গীয় পিতা তোমারদিগকেও ক্ষমা
১৫ করিবেন। কিন্তু যদি তোমরা মনুষ্যেরদের অপরাধ
না ক্ষমহ তবে তোমারদের পিতা তোমারদের অপ
১৬ রাধও ক্ষমা করিবেন না। অপর যখন তোমরা
উপবাস কর তখন কপটীবর্গের মত বিষণ্ণ বদন হইও
না কেননা তাহারা মনুষ্যেরদিগকে উপবাসী দেখাই
বার কারন আপনারদের মুখ বিকৃতি করে সত্য
আমি তোমারদিগকে কহি তাহারা আপনারদের
১৭ প্রতিফল পাইয়াছে। কিন্তু যখন তুমি উপবাস করহ
তখন আপন মস্তকে তৈলমর্দন কর ও মুখপ্রক্ষালন
১৮ করহ। তাহাতে যেন তুমি মনুষ্যেরদের প্রতি উপবাসী

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত মঙ্গল সমাচার মতিউর রচিত পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত।

আবরহামের সন্তান দাউদ তাহার সন্তান য়িশু খ্রীষ্ট তাহার পূর্ব্ব পুরুষাখ্যান।
আবরহাম হইতে য়িসহকের উদ্ভব ও য়িসহক হইতে য়াকুবের উদ্ভব·······

অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করহ হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতঃ তোমার নাম পুণ্য করিয়া মানা যাউক। তোমার রাজ্য আইসুক তোমার ইচ্ছা যে মত স্বর্গেতে সেই মত পৃথিবীতে পালিত হউক। আমারদের দিবসিক আহার এই দিবসে দেও। ও যেমত আমরা আপনারদের দায়ীর-দিগকে ক্ষমা করিতেছি সেই মত আমারদের দাওয়া সকল ক্ষমা করহ। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় লওয়াইও না কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করহ কেননা রাজত্ব ও পরাক্রম ও গৌরব তোমার সদা সর্ব্বক্ষণে আমেন।

২৫ মে তারিখে রামরাম বসু আসিয়া মিশনরী-গোষ্ঠীতে যোগ দিলেন এবং খ্রীষ্টমহিমাসম্বলিত 'হরকরা,' 'জ্ঞানোদয়' প্রভৃতি কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়া পুনরায় তাঁহাদের দলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে কেরী বার্মিংহামের স্যামুয়েল পীয়ার্স-লিখিত *A Letter to the Lascars* নামক পুস্তিকার অনুবাদ ও মুদ্রণ করেন।

উদাসীন টমাসও বীরভূমের চিনি ও নীলের কুঠি পরিত্যাগ করিয়া অক্টোবর মাসের শেষে "খ্রীষ্টের খোঁয়াড়ে প্রবেশেচ্ছু ফকির নামক বীরভূমের একটি মেষ"কে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামপুরে উপস্থিত হইলেন। ফকির শ্রীরামপুরে কয়দিন অবস্থান করিয়া আত্মীয়দের শেষ দেখা দেখিবার জন্য টমাসের সঙ্গেই বীরভূমে গিয়া আর ফিরিল না। মর্ম্মাহত টমাস শ্রীরামপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এইবারে ভগবান্ টমাসের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। কৃষ্ণ পাল নামক এক জন ধর্ম্মপ্রাণ ছুতারের গঙ্গাতীরে পদস্খলনের ফলে হাত ভাঙিয়া যায়। ডাক্তার টমাসের চিকিৎসায় সে আরোগ্য লাভ করে এবং যীশুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার শরণাপন্ন হইতে স্বীকৃত হয়। ২৮ ডিসেম্বর মিশনের সম্মুখস্থ গঙ্গার ঘাটে কৃষ্ণ পাল কেরীর নিকট দীক্ষা লাভ করে। আনন্দে অর্দ্ধোন্মাদ টমাস সম্পূর্ণ উন্মাদ হইয়া যান। তাঁহাকে মিশনের একটি ঘরে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। এই অবস্থায় ১৮০১ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে দিনাজপুরে জন্ ফার্ণাণ্ডেজের গৃহে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৮০১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি বাংলা নিউ টেষ্টামেণ্টের মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়। 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' পুস্তকের ভাষা অল্পকালের মধ্যে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া কেরী এইরূপ দাঁড় করান—

এ আবরহামের সন্তান দাউদের সন্তান যেশু খ্রীষ্টের পূর্ব্ব পুরুষের পুস্তক—
আবরহাম জন্ম দিল য়িছক্ষককে এবং য়িছক্ষক জন্ম দিল যাঁকুবকে···

অতএব এই মত কামনা কর আমারদের পিতা তিনি স্বর্গে পবিত্র হউক তোমার নাম তোমার রাজ্য আগমন করুক তোমার ইচ্ছা হউক যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীর উপরে অদ্য আমারদিগকে দিও আমারদের নিত্য ভক্ষ এবং মর্য্যাদা কর আমারদিগকে আমারদের দেনা যে মত আমরা মর্য্যাদা করি আমারদের দায় গৃহস্থের দিগাকে এবং আনয়ন করিও না আমারদিগকে পরিক্ষায় কিন্তু পরিত্রাণ কর

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কেরী ভাষার বিন্দুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। বাইবেল-মুদ্রণের ইতিহাস কেরীর শেষ জীবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলেও প্রাসঙ্গিকজ্ঞানে এইখানেই বর্ণন করিতেছি, শ্রীরামপুর মিশনেরও ইতিহাস এইখানেই শেষ।

১৮০১ সালের ১ম সংস্করণ নিউ টেষ্টামেণ্ট ডিমাই আটপেজী আকার, কোনও পৃষ্ঠা-সংখ্যা নাই। ইহার ২য় সংস্করণে "১৮০৩" সাল ছাপা থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮০২ সালে ওল্ড টেষ্টামেণ্টের The Pentateuch অংশ, ১৮০৩ Job, Song of Solomon, 1807 Isaiah-Malachi, ১৮০৯ Joshua—Esther। ১৮০৭ St. Luke's Gospel, Acts and Romans। ১৮১১ সালে নিউ টেষ্টামেণ্টের তৃতীয় ফোলিও সংস্করণ, ২য় সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ। ১৮১৩ The Pentateuch দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৮১৬ নিউ টেষ্টামেণ্ট ৪র্থ সংস্করণ। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে এইরূপ ৭টি সংস্করণ হয়।

মার্ডকের ক্যাটালগ হইতে জানা যায় যে, 'হরকরা', 'জ্ঞানোদয়', লাশকারদের প্রতি ও বিভিন্ন খণ্ড বাইবেল ছাড়া মিশন প্রেস হইতে নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলিও মুদ্রিত হইয়াছিল—

ওয়ার্ডের The Missionaries' Address to the Hindoos, কেরী-কৃত অনুবাদ।

পীতাম্বর সিংহের The Sure Refuge (কবিতা)

কেরী-কৃত A Short Summary of the Gospel.

মার্শম্যান-কৃত Address to the Hindoos.

মার্শম্যান-কৃত The Difference : or Krishna & Christ compared.

Watt's Historical Catechismএর অনুবাদ (কবিতা)

পীতাম্বর সিংহের Good Advice ও The Enlightner.

ইত্যাদি এইরূপ অসংখ্য পুস্তিকা।

মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্বেই কেরী সম্পূর্ণ বাইবেলের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন, সংশোধনে পূরা ১২ বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যে নিউ টেষ্টামেণ্টের ৮ম সংস্করণ স্থান পাইয়াছে। কেরীর শেষ সংশোধিত ভাষা এইরূপ—

অতএব এই মত প্রার্থনা কর হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতা তোমার নাম পবিত্ররূপে মান্য হউক। তোমার রাজ্যের আগমন হউক। যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতে তোমার ইষ্টক্রিয়া করা যাউক। অদ্য আমারদের নিত্য ভক্ষ্য আমারদিগকে দেও। এবং যেমন আমরা আপনারদের ঋণধারির দিগকে মাফ করি সেই মত আমারদের ঋণ মাফ কর। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় চালাইও না কিন্তু আমাদিগকে আপদ হইতে পবিত্রাণ কর কেন না সদা সর্ব্বক্ষণে রাজ্য ও শক্তি ও গৌরব তোমার। আমিন।

ভাষার দিক্ দিয়া কেরী যে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। মুন্শী ও পণ্ডিতদের প্ররোচনা দিয়া ও উৎসাহিত করিয়া তিনি যাহা করিয়াছেন, তাঁহার নিজের কীর্ত্তি তাহার তুলনায় সামান্য। তথাপি তাঁহার নিউ টেষ্টামেণ্টের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ফলেই ১৮০১ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল মার্কুইস ওয়েলেসলি কর্ত্তৃক পূর্ব্ববৎসরে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বঙ্গভাষার অধ্যাপক (teacher)-পদে নিয়োগের প্রস্তাব ডেভিড ব্রাউন মারফৎ তাঁহার নিকট পৌঁছে। ভ্রাতৃমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিয়া কেরী ৪ঠা মে ঐ পদ গ্রহণ করেন। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের স্থান আমার পরবর্ত্তী অধ্যায়ের বিষয়।

আলোচনা

কৃষ্ণকীর্ত্তনের সুর ও তাল

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইলেও উহার সঙ্গীত-অংশের যাচাই বাস্তবিকই এ-যাবৎ হয় নাই। শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উপরি-উক্ত প্রবন্ধে ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৪৫শ ভাগ, ১ম সংখ্যা) সেই অভাব পূরণ করিয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আলোচ্য পুঁথির প্রত্যেক পদের পূর্ব্বে রাগ-রাগিণী এবং প্রায়শঃ একাধিক তালের নির্দেশ আছে। 'ভৈরবীরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকম্বা ॥', 'বিভাষরাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥ রূপকম্বা ॥', 'বিভাষরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ব্বা ॥' প্রভৃতি উক্তি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এক একটি পদ একটি মাত্র রাগ বা রাগিণী এবং উল্লিখিত তালসমূহের যে কোন একটিতে গেয়। অধিকন্তু প্রবন্ধ নামক গীতে আস্থায়ী আদি চারি তুকে পৃথক্ পৃথক্ তালের ব্যবহার বিহিত; এবং রাগমালা গীতের ভিন্ন ভিন্ন কলিতে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীরও সন্নিবেশ স্বীকৃত। যাহা হউক একটু অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে রাগ-রাগিণী ও তালের তথাকথিত বিস্তৃত সমাবেশজনিত অভিনবত্বের কুয়াশা অচিরে কাটিয়া যাইতে পারে। খুব সম্ভব একাধিক তালের উল্লেখই যত গণ্ডগোল বাধাইয়াছে। পুঁথিলেখকেরা সময় সময় কিরূপ বিভ্রাটে ফেলেন, ইহা তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

অতঃপর মিত্র মহোদয় রাগ-রাগিণী ও তাল-সন্নিবেশের যে কয়টি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। পা হা ড়ী আ (পহাড়িকা বা পহাড়ী), গু জ্জ রী (গুর্জ্জরী), রা ম গি রী (রামকিরী, রামকলী বা রামকেলী), বি ভা ষ (বিভাষিকা, বিভাষী বা বিভাষা) প্রভৃতি রাগিণী সর্ব্বজন-সুপরিচিত। কো ড়া রাগিণী নারদ-সংহিতার মতে মল্লার রাগের অনুগতা। মা ল ব (মালবী) হনুমন্মতে শ্রীরাগের রাগিণী; কিন্তু নারদ-সংহিতায় মালব ছয় রাগের অন্যতম। অপ্রসিদ্ধ হইলেও ক্রী ড়া, কু ড়ু ক্ক প্রভৃতি তাল যখন সঙ্গীত-রত্নাকরে গৃহীত হইয়াছে, তখন তাহাই পর্য্যাপ্ত। অ ঢ়ু ক্ক লিপিকরপ্রমাদ। রূ প ক, ল গ্ন ক আদি তালও অপ্রধান নহে। জ য় জ য় জয় বা জয়শ্রী'র মধ্যে একটি তাল হইতে পারে। প্র কী র্ণ ক মনে হয়, শব্দটি সঙ্কীর্ণ তাল অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। মহোদয় উইলসন (H. H. Wilson) তাঁহার সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধানে প্রকীর্ণক শব্দের একটি অর্থ দিয়াছেন, Any collection of heterogeneous objects not arranged under any distinct classes or heads। চি ত্র বা চি ত্র ক প্রাচীন তালের মধ্যে ধৃত হইয়াছে; এবং লিপিকরের লেখনী অগ্রে বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে ও উহার পরে দুই দাঁড়ি পড়িয়া গিয়াছে। দ ণ্ড ক সম্ভবতঃ একটি ছন্দাত্মক তাল। ধ্রুপদের একটি বিভাগই ছন্দ। রূ প ক থা নহে, শব্দটি রূপকম্বা। ইত্যাকার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য গ্রন্থ-সম্পাদকও অবশ্য কম দায়ী নহেন। এখন অসঙ্কোচে

বলা যাইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ ব্যবহৃত সুর ও তালের কোনটিই অর্ব্বাচীন অথবা অশাস্ত্রীয় নয়।

প্রবীণগণের মুখে শুনিয়াছি, অসংখ্য রাগ-রাগিণী ও তালের অধিকাংশই কালের কুক্ষিগত হইয়াছে; কতক বা নামে মাত্র আছে এবং অল্প কতিপয় নামকের করিয়া কারবার চালাইতেছে। প্রাদেশিক প্রণালী ব্যতীত সাময়িক সংস্কার সত্ত্বে সঙ্গীতের একটি প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ছিল, যাহার আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল মার্গ সঙ্গীত (Music par-excellence)। এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ সেই রীতি অনুসৃত হইয়াছে বলিয়াই অনুমান হয়। মিত্র মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ দেশীয় বা স্থানীয় রীতির কি পরিচয় পাইয়াছেন, আমরা জানি না। তাঁহার কথার ভাবে মনে হয়, চর্য্যাপদে তালের অনুল্লেখই যেন প্রাচীন ও সরল রীতির পরিচায়ক। তাহা হইলে বিদ্যাপতির পদাবলী, এমন কি রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক প্রভৃতিও গীতগোবিন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়ে। কেন না, বিদ্যাপতির পদাবলী ও রাম রায়ের গীতে কেবল সরল সুরের উল্লেখ আছে, তালের উল্লেখ নাই। চর্য্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর মধ্যে ব্যবধানও ৪০০।৫০০ বৎসর। আর চর্য্যাপদ এক মরমী সম্প্রদায়ের সাধন-সঙ্গীত। সঙ্গীতের কলা-কৌশল প্রদর্শনের প্রকৃত ক্ষেত্রও উহা নহে। আমরা উপরে দেখাইয়াছি, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ ব্যবহৃত সুর ও তাল প্রাচীন এবং শাস্ত্রসম্মতও বটে। তবে উহার সঙ্গীত-প্রণালীর উপর দেশ-কালের প্রভাব আদৌ পড়ে নাই, বলাও সঙ্গত নয়। সুতরাং উক্ত রীতি বেশী প্রাচীন নহে, কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে?

একাধিক তালের উল্লেখ থাকিলেও যখন এক একটি পদ একটি সুর ও একটি তালে গীত হইবার ইঙ্গিত রহিয়াছে, তখন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও গীতগোবিন্দে একই রীতির অনুবর্ত্তন করা হইয়াছে, বলা চলে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অনেক স্থলে জয়দেবের একান্ত অনুকরণ বলিয়া সর্ব্বত্র যে তাহা করিতে হইবে ইহারও কোন মানে নাই। গীতগোবিন্দ অপেক্ষা বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রন্থে ব্রজলীলার অনেকখানি বেশীই পাওয়া যায়। পণ্ডিতসমাজে একটা মতও প্রচলিত আছে যে, গীতগোবিন্দের রচয়িতা এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকার উভয়েরই উপজীব্য কোন এক প্রাচীনতর প্রাকৃত-অপভ্রংশ আদর্শ।

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর সাঙ্গীতিক পদ্ধতি অনুসৃত না হইবার প্রধান কারণ, বইখানা মোটেই গীতিকবিতার নয়। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, ভাগবতাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থেও ঐরূপ সুরের উল্লেখ আছে, তালের নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর পুঁথিখানা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী হইলে অবশ্যই তাঁহার প্রসঙ্গ থাকিত। তাহা থাকা দূরে যাউক, একটা তিলক-ফোঁটার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। বরং উহাতে এমন সব কথা আছে, যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের আদপে অনুকূল নহে। এবং তাহাই পুঁথির প্রাচীনত্বের একতম প্রবল প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যেহেতু পুঁথিখানা বিষ্ণুপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে এবং খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকে বিষ্ণুপুর সঙ্গীতচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে, সেই হেতু পুঁথির দেশ বিষ্ণুপুর ও কাল ১৭শ শতক, সিদ্ধান্তটা কেমন যেন শোনায় না কি? বিষ্ণুপুর রাজগণের ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায়, ১৩শ শতাব্দীর শেষ ও ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভেও বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতচর্চ্চা ছিল। তর্কের অনুরোধে না হয় মানিয়া লওয়া গেল, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থখানা চৈতন্য-পরবর্ত্তী। এখন জিজ্ঞাস্য, মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের কোন্ পদগুলির আস্বাদ লইতেন? শ্রীসনাতন গোস্বামীর বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীতে চণ্ডীদাসের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ আছে। ঐ দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের খোঁজ আমরা পাইয়াছি কি?

যদি তাহা পাইয়া থাকি, তবে কোন্ দুইটি পালা ? আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই পুরাতন সমস্তায় আসিয়া পড়া গেল। যাহা হউক, সম্যক্ সমাধান বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর আবিষ্কৃত দুইখানি পুঁথিই কীর্ত্তনের তালের পুঁথি। সুতরাং তাহাতে মার্গ সঙ্গীতের তালের প্রত্যাশা করা যায় না। আর পুঁথি দুইখানিতে উদাহরণস্বরূপ বড়ু চণ্ডীদাসের পদ উদ্ধৃত করিবার উদ্দেশ্য, ওগুলিকে কীর্ত্তনে আদায়ের প্রয়াস। পূর্ব্বে বিদ্যাপতি, জয়দেব প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের গীতের ন্যায় বড়ু চণ্ডীদাসের পদও কীর্ত্তনে গীত হইত না। অনেকেই শুনিয়াছেন, পুরীর শ্রীমন্দিরে আজও গীতগোবিন্দ কীর্ত্তনে গাওয়া হয় না। রায় বাহাদুরের স্মরণ থাকিতে পারে, তিনিও প্রদেশান্তরে জয়দেবের গীত শুনিয়া আসিয়াছেন, নিশ্চিতই তাহা কীর্ত্তনে নয়।

মাঙ্গএ সুরতি দান সান দেই মাথে। (২য় সংস্করণ, পৃ. ৪০)

রায় বাহাদুর 'সান দেই মাথে' পাঠে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা জোর করিয়া মস্তক সঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেত করা অর্থ করিয়াছি। বস্তুতঃ পাঠে ভুল নাই, অর্থও সোজা। উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটির অর্থ, [শ্রীকৃষ্ণ] মস্তক দ্বারা ইঙ্গিত দিয়া সুরতি দান মাগিতেছেন। অন্যত্র,

মিছাই মাথাএ পাড়এ সান। (২য় সংস্করণ, পৃ. ২)

সা ন প্রা° সণ্ণা, সন্না (সংজ্ঞা) ; সিন্ধী সৈনা, হিন্দী সৈন। (১) বংশীধ্বনি-পূর্ব্বক কামাচার অনুজ্ঞা বা আমন্ত্রণ ; (২) হস্তাদি সঞ্চালন সহকারে আহ্বান-চেষ্টা ; (৩) হর্ষামর্ষাদির অভিব্যঞ্জক সঙ্কেত-ভেদ। পদাবলীতে যাইতে হইবে কেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

ঘাঅত উপর ঘাঅ বাঁশীর সান। (২য় সংস্করণ, পৃ. ১৩৮)

কাহ্নাঞি বাঁশীত দিল সানে। (ঐ, পৃ. ১৩৯)

এখানে আরও কএকটি উদাহরণ সঙ্কলিত হইল।

শঙ্খদত্ত তারে কর জলের পরীক্ষা নয়

পথিক সহিতে ছিল সান। (কবিকঙ্কণ)

দেই রামা হাত সান ধনপতি ত্যজি মান

দণ্ডবতে পড়িল চরণে। (ঐ)

দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ বিদ্যমানে।

নিকটে যাইতে রাজা দিল হাত সানে।

(কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ)

ওড়ন কাড়ে বলে সানে।

তাক লইয়া ঘর কেনে। (ডাক)

পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় এখন দেখিবেন, 'সান দেই' কথাটির কেমন চমৎকার অর্থসঙ্গতি হয়। বীরভূমে কেন, মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশ, বাঁকুড়া, মানভূম অঞ্চলেও ঘোমটা দেওয়া অর্থে সান কাড়া কথা চলিত আছে।

ভাষার বিচারে শ্রকৃষ্ণকীর্ত্তন ও প্রাপ্ত পুঁথি দুইখানির মধ্যে যদি বেশী দিনের ব্যবধান অনুমিত না হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে লিপিকর প্রাচীন রূপটি রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, পরীক্ষা প্রয়োজন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের সহিত বৈষম্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রচারে একটা প্রকাণ্ড অন্তরায় হইয়াছিল। আমরা পুঁথির অপ্রাপ্তি জন্ম অনুযোগ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন, প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির যথোচিত অনুসন্ধান হইয়াছে ? জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, শূন্যপুরাণ, চর্য্যাপদ প্রভৃতির পুঁথিই বা কয়খানা পাওয়া গিয়াছে ? কীর্ত্তনের তালের পুঁথিদ্বয়ে উদাহৃত গীতগুলির মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাবের অস্তিত্ব কল্পনা করিবার মত কিছু আমরা পাই নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের কএকটি গীত কীর্ত্তনে আদায়ের প্রচেষ্টাই সঙ্কলন-পদ্ধতিতে প্রকাশ পায়। অতি-বড় দুঃসাহস কি না জানি না, 'এক কাল হইল মোর জমুনার জল।' ইত্যাদি বিকৃত, রূপান্তরিত, আধুনিকতাপাদিত পদটার মূল বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়াই আমরা মনে করি। পদটা বড়ু চণ্ডীদাসের নামে চালাইবার চেষ্টা নয়, দ্বিজ চণ্ডীদাসই 'একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।' পদে বড়ুকে অনুকরণ করিয়াছেন, বলা যায়। পদটা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ না থাকিবার কারণ, পুঁথি খণ্ডিত।

রায় বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও নবাবিষ্কৃত পুঁথির মধ্যে ভাবধারার সাম্য লক্ষ্য করিয়াছেন, করিবারই কথা। পুঁথি দুইখানিতে উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত পদগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর) পদের নকল। নকলে অল্প-শিক্ষিত পুঁথি-লেখক দ্বারা যাহা বা যেমনটি হয়, তাহার অতিরিক্ত ভাবধারার বৈচিত্র্য বা বৈলক্ষণ্য ইত্যাদি কামনা করা যায় না।

আলোচনার সার্থকতা আপেক্ষিক, মীমাংসাও বাহিরের বস্তু নহে।

প্রত্যুত্তর

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ আমার উপরিউক্ত প্রবন্ধের যে 'আলোচনা' করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে পরিষৎ-পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় আমার বক্তব্য বলিবার সুযোগ দিয়া আমার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

বসন্ত বাবু বলেন, প্রবন্ধ ও রাগমালা গীতের "ভিন্ন ভিন্ন কলিতে বিভিন্ন রাগ রাগিণীরও সন্নিবেশ স্বীকৃত। যাহা হউক, একটু অভিনিবেশ সহকারে পর্যালোচনা করিলে রাগ রাগিণী ও তালের তথা-কথিত বিস্তৃত সমাবেশজনিত অভিনবত্বের কুয়াশা অচিরে কাটিয়া যাইতে পারে।" তার পরক্ষণেই বলিতেছেন "খুব সম্ভব একাধিক তালের উল্লেখই যত গণ্ডগোল বাধাইয়াছে। পুথিলেখকেরা সময় সময় কিরূপ বিভ্রাটে ফেলেন, ইহা তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।" কিন্তু এই দুইটি উক্তি যে কতখানি পরস্পর-বিরুদ্ধ, তাহাও একটু অভিনিবেশ সহকারে পর্যালোচনা করিলে বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেন। কারণ, যদি 'গণ্ডগোল বাধাইয়াছে' ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে 'তথাকথিত' শব্দের ব্যবহার চলে না। এবং পুথি-লেখক যদি 'বিভ্রাটে ফেলিয়া থাকেন' তাহা হইলে একটু অভিনিবেশে তাহার কুয়াশা কিরূপে কাটিতে পারে ? একখানি তথাকথিত প্রাচীন পুথি যখন

এক্ষেত্রে এক মূল পুথির কল্পনা করিয়া লিপিকারের স্কন্ধে দোষ চাপাইবার চেষ্টা করিলে তর্ক অগ্রসর হইতে পারে না এবং সত্যনির্ণয়ের চেষ্টাও ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনের পুথিখানি যে নকল, আমার প্রবন্ধ বাহির হওয়ার পরে বসন্ত বাবুর এই স্পষ্ট স্বীকৃতি দেখিয়া আন্তরিক সুখী হইলাম। পুথিখানির বয়স যে ২৫০।৩০০ বৎসরের অধিক নহে এবং উহাই যে তাহার রচনাকালও বটে, এই সন্দেহই আমরা বরাবর করিয়া আসিতেছি।

বসন্ত বাবু প্রবন্ধ সঙ্গীত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। "প্রবন্ধ নামক গীতে আস্থায়ী আদি চারি তুকে পৃথক্ পৃথক্ তালের ব্যবহার বিহিত"; ইহা তিনি কোথায় পাইলেন? প্রবন্ধ সঙ্গীতের চারিটি অংশ আছে—যথা উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ।

প্রবন্ধাবয়বো ধাতুঃ স চতুর্ধা নিরূপিতঃ।
উদ্‌গ্রাহঃ প্রথমস্তত্র ততো মেলাপকধ্রুবৌ॥
আভোগশ্চেতি তেষাং চ ক্রমাল্লক্ষ্মাভিদধ্মহে॥—সঙ্গীতরত্নাকর

ধাতু অর্থে গেয়, অর্থাৎ যাহা গান করিতে হয়। তাহার প্রথমাংশ অর্থাৎ 'ধরতা'কে উদ্‌গ্রাহ বলে। গানের মধ্যে যাহা নিত্য, তাহাকে বলে ধ্রুব। উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুবের মধ্যে যে অংশ, তাহাকে মেলাপক বলে। সব শেষের অংশের নাম আভোগ।

উদ্‌গ্রাহঃ প্রথমো ভাগস্ততো মেলাপকঃ স্মৃতঃ।
ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবঃ পশ্চাৎ আভোগস্ত্বন্তিমো মতঃ॥—সঙ্গীতরত্নাকর

ধ্রু কলি ও আভোগের মধ্যে যে অংশ থাকে, তাহাকে 'অন্তরা' বলে।

ধ্রুবাভোগান্তরে জাতো ধাতুরন্যোঽন্তরাভিধঃ।—ঐ

এইরূপ চতুস্কন্ধ সঙ্গীতের বিভিন্ন অংশ যে ভিন্ন ভিন্ন সুর তালে গীত হইত, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। এখনও মার্গ সঙ্গীতে স্থায়ী অন্তরা আভোগ সঞ্চারী আছে। কিন্তু সেগুলি একই সুরে ও একই তালে গীত হয়।

আমরা যত দূর জানি, তাহাতে 'তাল ফেরতা' আছে শুধু কীর্তনে। কিন্তু কীর্তনের বর্ত্তমান পদ্ধতি মহাপ্রভুর পরবর্তী কালে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। সুতরাং সেদিক্ দিয়াও কৃষ্ণকীর্তনের বয়স বেশী হইতে পারে না। বসন্ত বাবু বিভাষ, মালকোষ, পাহাড়ী, কোড়া প্রভৃতি কয়েকটি সুপরিচিত রাগরাগিণীর শাস্ত্রমূলকতা দেখাইয়া বলিতেছেন, "এখন অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এ ব্যবহৃত সুর ও তালের কোনওটিই অর্ব্বাচীন অথবা অশাস্ত্রীয় নহে।" এরূপ উক্তি একেবারেই যুক্তি-সঙ্গত নহে। কারণ, তিনি কোনওটিকে বলিতেছেন লিপিকরপ্রমাদ, কোনওটিকে 'সম্ভবতঃ', 'হইতে পারে' ইত্যাদি পর্যায়ে ফেলিয়াছেন, অথচ তাঁহার 'অসঙ্কোচে' বলিতে দ্বিধা হইতেছে না—ইহা কিরূপে সম্ভবে?

কৃষ্ণকীর্তনের সুর ও তালের মধ্যে যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি, তাহা আলোচ্য প্রবন্ধে আমি দিতে ত্রুটি করি নাই। যেগুলির সন্ধান আমি পাই নাই, তাহারই প্রতি বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। বসন্ত বাবু সে সম্বন্ধে কোনও আলোকপাত করিতে পারেন নাই।

'রূপকপ্থা' কি বস্তু? আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। বসন্ত বাবু বলিয়াছেন 'রূপকস্থা' হইবে।

রূপান্তরিত হইয়া থাকে, তবে তিনি নিজের স্কন্ধে দোষ চাপাইতে প্রয়াসী কেন? কেননা, তিনি বলিয়াছেন, "ইত্যাকার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য গ্রন্থ-সম্পাদকও কম দায়ী নহেন।" এত দিন আমাদের ধারণা ছিল যে, কৃষ্ণকীর্তন একখানি সুসম্পাদিত গ্রন্থ, কিন্তু বসন্ত বাবুর এইরূপ অপ্রত্যাশিত স্বীকারোক্তিতে আমরা উদ্বিগ্ন না হইয়া পারি না। কিন্তু তিনি যে 'রূপকম্বা'কে রূপকথায় পরিণত করিয়াছেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস্য হইতে পারে? গ্রন্থখানিতে অন্ততঃ দুইবার 'যতির্ব্বা' আছে, কাজেই তাঁহার পক্ষে তুলনা করা কঠিন ছিল না।

'জয়জয়' কি? জানিতে চাহিয়াছিলাম। বসন্ত বাবু "জয় বা জয়শ্রীর মধ্যে একটি তাল হইতে পারে" বলিয়াছেন। কিন্তু কোনো প্রমাণ দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। 'লগ্নক তাল অপ্রসিদ্ধ নহে'—তাহাই বা তিনি কোথায় পাইলেন? কোনও একটি বিষয় যখন বিবদমান, তখন প্রমাণপ্রয়োগ ব্যতীত কিছু বলা সঙ্গত নহে।

'প্রকীর্ণক' শব্দের যে অর্থ তিনি উইলসনের অভিধান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন (heterogeneous বা miscellaneous) তাহার সমালোচনা আমি আমার মূল প্রবন্ধে করিয়া দেখাইয়াছি যে, ঐ অর্থ সমর্থিত হইতে পারে না। যেখানে তালমানের যথেষ্ট বিবরণ দেওয়া আছে, সেখানে 'বিষয়-বিভাগেন বিনা প্রবৃত্তত্বম্' (সঙ্গীতরত্নাকর) প্রকীর্ণকের অবকাশ কোথায়? বসন্ত বাবু বলেন, "প্রকীর্ণক মনে হয় শব্দটি 'সঙ্কীর্ণ তাল' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।" প্রকীর্ণ অর্থে সঙ্কীর্ণ, ইহা সাধারণ বুদ্ধিগম্য নহে। তার পর 'সঙ্কীর্ণ তাল' অর্থ কি? সঙ্কীর্ণ বা মিশ্র রাগ বুঝা যায়, তাল আবার সঙ্কীর্ণ হইতে পারে না কি? যদি প্রকীর্ণক অর্থ সঙ্কীর্ণ তাল হয়, তাহা হইলে 'কাব্যোক্তি প্রকীর্ণক' (কৃ-কী, ৩৮০ পৃ.) শব্দের অর্থ কি হইবে, তাহা কি বসন্ত বাবু ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

বিন্দুমাত্র প্রমাণ-প্রয়োগ না দিয়া বসন্ত বাবু অবলীলাক্রমে বলিতেছেন, "প্রাদেশিক প্রণালী ব্যতীত সাময়িক সংস্কার সত্ত্বেও সঙ্গীতের একটি প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ছিল, যাহার আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল মার্গ সঙ্গীত (music par excellence) এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এ সেই রীতি অনুসৃত হইয়াছে বলিয়াই অনুমান হয়।" যে বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারসাপেক্ষ, তাহাকে 'অনুমান হয়' বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে সত্যের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সমস্যাই এখানে এই যে, ঐ পুথিতে এমন সব সুর ও তালের সন্ধান পাইতেছি, যাহা মার্গ অথবা দেশী আখ্যাযুক্ত সঙ্গীতের মধ্যে মিলিতেছে না। সেই জন্য আমি আমার মূল প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, সম্ভবতঃ কৃষ্ণকীর্তন বাঁকুড়া অঞ্চলের তৎকাল-প্রচলিত কোনও সাম্প্রদায়িক পদ্ধতির ইঙ্গিত দিতেছে।

আমি ঐ প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, প্রাচীন কোনও পুথিতে কৃষ্ণকীর্তনের ন্যায় সুর-তালের বিস্তৃত উল্লেখ নাই। চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে এরূপ পদ্ধতি অনুসৃত হয় নাই। তাহার উত্তরে বসন্ত বাবু বলিতেছেন, গীতগোবিন্দে সুর ও তালের উল্লেখ আছে, কিন্তু বিদ্যাপতির পদাবলীতে, রামরায়ের গীতে শুধু রাগরাগিণীর সরল উল্লেখ আছে, তাহা হইলে কি ঐগুলি জয়দেবের পূর্ববর্তী? বস্তুতঃ আমি এরূপ বলি নাই যে, সরল হইলেই তাহা প্রাচীন বা প্রাচীনতর হইবে। আমি বলিয়াছি যে, চর্যাপদে রাগরাগিণীর, গীতগোবিন্দে একটি রাগিণী বা একটি রাগিণী ও তালের উল্লেখ আছে। কোথায়ও কৃষ্ণকীর্তনের অত্যদ্ভুত রীতি দেখিতে পাই না। ইহার উত্তর কি?

বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত পুথি হইতেও এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত হইতেছে। ঐ পুথির আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহাতেও সুর-তালের প্রতি ঐকান্তিক মনোযোগ (emphasis) দেওয়া হইয়াছে। এই জন্যই আমি বলিয়াছি যে, কৃষ্ণকীর্তন ও ঐ পুথি দুইখানির প্রাচীনতর পুথির মধ্যে কালের ব্যবধান খুব বেশী নহে। এই দুইখানি পুথি ব্যতীত আর কোথায়ও কৃষ্ণকীর্তনের পদ অবিকল উদ্ধৃত হয় নাই। সুর-তালের উদাহরণ হিসাবে একমাত্র বড়ু চণ্ডীদাসের পদই ঐ পুথিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমার বোধ হয়, সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে ঐ গীতগুলির অনুশীলন ছিল। এই প্রকার সাম্প্রদায়িকতা স্বীকার না করিলে কৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে ঐ পুথির সম্বন্ধ নির্ণয় কঠিন হইয়া পড়ে।

বসন্ত বাবু অন্য একটি সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, কৃষ্ণকীর্তনে "মার্গ সঙ্গীত অনুসৃত হইয়াছে" আর মণীন্দ্রবাবুর পুথিতে সেই "পদগুলিকে কীর্তনে আদায়ের প্রয়াস"। "বিদ্যাপতি জয়দেব প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের গীতের ন্যায় বড়ু চণ্ডীদাসের পদও কীর্তনে গীত হইত না।" ইহা তিনি কোথায় পাইলেন? আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, এখন কীর্তন যে-প্রণালীতে গীত হয়, পূর্বে সেরূপ নিশ্চয়ই হইত না। কারণ, বর্তমান কীর্তন-সঙ্গীতরীতি মহাপ্রভুর পরবর্তী সময়ে উদ্‌ভাবিত হইয়াছে। তাঁহার পূর্বে জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদাবলী কোন্ প্রণালীতে গীত হইত, তাহা জানিবার উপায় নাই। কৃষ্ণকীর্তনের অনেকগুলি সুর ও তাল কীর্তনে বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়; সুর যথা: বিভাষ, শ্রী, ধানশী (ধানুষী), মল্লার, রামকেলি (রামগিরি), বেলাবলী, বরাড়ী, কেদার, ললিত, বসন্ত, ভৈরবী ইত্যাদি; তাল যথা: রূপক, একতালী, যৎ (যতি), অষ্টতাল (আঠতাল) ইত্যাদি। প্রাপ্ত পুথি দুইখানিতে কৃষ্ণকীর্তনের অনেকগুলি সুর ও তাল আছে; সুর যথা: পাহিড়া, বরাড়ি (বাড়ারি), ধানশী, বসন্ত, শ্রী ইত্যাদি। তাল যথা: রূপক, যতি (জোতি)। এই দুইখানি পুথিতে আবার এমন সুর ও তাল পাইতেছি, যাহা কীর্তনে অপরিজ্ঞাত; সুর যথা: বাগেশ্রী (বাগশ্রী), পাহিড়া ইত্যাদি। তাল যথা: চুটখিলা (বা ছোটখিলা), আলুটি, অপূর্ব কলিকা, জলদকান্তি ইত্যাদি। সুতরাং ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, কৃষ্ণকীর্তনের মার্গসঙ্গীত পরবর্তী পুথিতে কীর্তনে আদায় করিবার চেষ্টা হইয়াছে? আমার বোধ হয়, বসন্ত বাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অনুসন্ধিৎসা এক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলেই তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিতেন।

অতঃপর সঙ্গীতের দিক্ ছাড়িয়া তিনি মামুলি যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের "পরবর্তী হইলে কৃষ্ণকীর্তন-এ অবশ্যই তাঁহার প্রসঙ্গ থাকিত। তাহা থাকা দূরে যাউক, একটা তিলক কোঁটার চিহ্ন পর্যন্ত নাই।" 'তিলক কোঁটা'র চিহ্ন না থাকিলেও খোল-করতালের অভাব নাই। খোল করতাল মহাপ্রভুর নামের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। কোনও গ্রন্থে চৈতন্যের নামগন্ধ না থাকিলেই যে তাহা তাঁহার পূর্ববর্তী, এরূপ বলিতে পারা যায় না। ভবানন্দের হরিবংশেও ত মহাপ্রভুর নামগন্ধ নাই; তবে তাহাও কি চৈতন্য-পূর্ববর্তী বলিব? এমন হইতে পারে যে, যে-কারণে হরিবংশে 'তিলক কোঁটার চিহ্ন' নাই, সেই কারণেই হয়ত কৃষ্ণকীর্তনেও নাই। পক্ষান্তরে কৃত্তিবাসের রামায়ণে এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তিলক-কোঁটার চিহ্ন বর্তমান, সেগুলিকে কি আমরা চৈতন্য-পরবর্তী বলিব? আমার বোধ হয়, বিশ্ববল্লভ মহাশয় একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, ভবানন্দের হরিবংশ এবং চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন, উভয় গ্রন্থই চৈতন্যবর্জিত সম্প্রদায়-বিশেষের গ্রন্থ। এরূপ সম্প্রদায়ের অভাব এ দেশে পূর্বেও ছিল না এবং এখনও হয়ত নাই।

হরিবংশে এবং কৃষ্ণকীর্তনে যে ভাবধারা দেখিতে পাই, তাহার সঙ্গে তিলক-ফোঁটার তাদৃশ সামঞ্জস্য নাই। এই সম্প্রদায়ের মতবাদ চৈতন্যধর্ম-বিরোধী। ইহাদের মতে একমাত্র কাম্য—যৌন সম্মিলন ; তাহাতে সম্বন্ধ-বিচারের প্রয়োজন নাই। ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য এ সবই মিথ্যা, লোকাচার মাত্র।

তোহ্মার বচন রাধা সবই আতত।
পরদারে পাপ নাই মুনির সমত॥

*   *   *

নিজ পর নারী দোষ নাহিক সংসারে।
যত সতীপণ সব মিছা জান তারে॥

—কৃষ্ণকীর্তন, ৬৬ পৃ. (১ম সং)

নিজপর নারি দোশ নাহিক শংশারে।
জত শতিপনা শব মিছা জান তারে॥

—প্রাচীনতর পুথি (সাঃ পঃ পত্রিকা, পৃঃ ১৯৪)

কৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ মাতুলানীর অঙ্গসঙ্গ করিতে ব্যস্ত। ভবানন্দের কৃষ্ণ রাধিকার ননদিনী অর্থাৎ যশোদার ভগ্নী (তথা কৃষ্ণের মাসী) মহোদার সহিত রতি উপভোগ করিতেছেন। (হরিবংশ—৪৪ পৃ.) বসন্ত বাবু ইহার পরও তিলক-ফোঁটার প্রত্যাশা করেন ?

আরও তুলনা করুন :

প্রথম প্রহর রাত্রি ফুটিল লবঙ্গ।
যৌবন থাকিতে প্রিয়া কর রস রঙ্গ॥
ভাল কিবা মন্দ বোলি মনে ভাবি চাও।
যার থাকে ধনকৌড়ি খাও আর বিলাও॥—হরিবংশ, ৩৪ পৃ.

মাতুলানী-লঙ্ঘন যে বিশেষ দোষের নহে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ভবানন্দ বহু উদাহরণ জোগাড় করিয়া শেষে বলিতেছেন :

বাপ পুত্র খুড়া ভাই ছোট ভাইয়ে লঙ্ঘে।
সকল গোষ্ঠীর রতি এক জনার সঙ্গে॥—ঐ, ৯৮ পৃ.

হরিবংশেও বড়াই ঘটকী। একটু প্রভেদ এই যে, ভবানন্দের বড়াই বুড়ী নিজেও কামমোহিতা।

গোবিন্দের রূপ দেখি কন্দর্প সমান।
কামে জর্জরিত বড়াই হত হৈল জ্ঞান॥—ঐ, ২৩ পৃ.

বসন্ত বাবু একটু অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন যে, চৈতন্যের প্রসঙ্গাভাব প্রাচীনত্বের লক্ষণ বিবেচিত হইতে পারে না। তাঁহার অবগতির জন্য আরও কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি :

(১) চৈতন্য-সম্প্রদায়ে ভাগবতকে প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য করা হয়। 'ভাগবতং প্রমাণমমলম্।' কৃষ্ণকীর্তনে কবি ভাগবতের অনুসরণ করেন নাই। ঐ গ্রন্থে কেশাবতারত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, যাহা 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই বাক্যের বিরোধী। যমলার্জুনকে কংশচর অসুর বলা হইয়াছে। ইহা ভাগবতের মতবিরুদ্ধ। কৃষ্ণকীর্তন যে ভাগবতের পূর্ববর্তী, এ কথা ত কেহ বলেন না।

(২) কৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ রাধাকে যেরূপ শালী, পামরী, ছিনারী, আছিদরী॰ইত্যাদি গালি দিয়াছেন, তাহার নিদর্শন প্রাচীন সাহিত্যে মিলে কি ?

(৩) দানঘাটের কলহে যে ভাব দেখিতে পাই, তাহার অনুরূপ কোনও প্রামাণিক গ্রন্থেই নাই। কৃষ্ণ রাধার উপর বলপ্রয়োগে উদ্যত হইলে রাধা বলিতেছেন যে, আমরা ষোল শত গোয়ালিনী বিকে (বিক্রয়ার্থ) যাই ; তোমাকে 'মাগু কিলে কিলাআঁ মারিবো তোক্ষা বাটে।' কৃষ্ণ তাহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর করিতেছেন :

ছাওয়াল না দেখ মোরেঁ মাথা ষোড়া চুলে।
মুণ্ডেঁ মুণ্ডেঁ ডুসাঞাঁ মারিবোঁ তোক্ষা হেলে॥

এরূপ কিলানো, ডুসানো ইত্যাদি রুচির দিক্ দিয়া যাহাই হউক, আধুনিকতাগন্ধী মনে না করিয়া পারা যায় না।

(৪) রাধাকে কৃষ্ণ শেষ পর্য্যন্ত মারিয়াই ফেলিলেন।

বাম হাতে ধনুক ডাহিণ হাথে বাণ।
রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধান॥

তার পর কৃষ্ণ ঝাড় ফুঁক করিয়া তাঁহাকে পুনরায় বাঁচাইয়া দিলেন বা তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন করিলেন। ইহাও প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

(৫) শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধার বিরহ-বর্ণনা পদাবলী সাহিত্যে দেখিতে পাই। কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনে 'রাধা বিরহ' সম্পূর্ণ অন্যরূপ। মদনবাণে জর্জরিতা রাধা কৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ করিবার জন্য ব্যাকুল। ইহাই রাধাবিরহ। কৃষ্ণ তাঁহার কাকুতি মিনতি প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেছেন, 'আমি এখন যোগে মন দিয়াছি, মনপবন স্থির করিতে ব্যস্ত (প্রাণায়াম ?), আমাকে ও-সব কথা বলিও না।' কোনও প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের উল্লেখ আছে কি ?

(৬) এই বিরহের পর ক্ষণিক মিলনান্তে কৃষ্ণের অকারণ মথুরা-প্রস্থানের কথা আছে। রতিশ্রান্তা নায়িকা যখন নায়কের উরুতে মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রাগতা, সেই অবসরে নায়ক উঠিয়া মথুরায় চম্পট দিলেন। বড়াই বুড়ী তখন তাঁহাকে গাছের ডালে ডালে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। প্রাক্-চৈতন্য যুগের সাহিত্যে এরূপ ব্যাপার কোথাও পাওয়া যায় কি ?

এরূপ দৃষ্টান্ত অধিক দিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, বসন্ত বাবু নিজেই বলিতেছেন যে, "কৃষ্ণকীর্তনে এমন সব কথা আছে, যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের আদপে অনুকূল নহে। এবং তাহাই পুঁথির প্রাচীনত্বের একতম প্রবল প্রমাণ।" এইরূপ উক্তির মূলে একটি ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে। এবং তাহা এই যে, মহাপ্রভুর পূর্বে বৈষ্ণব ধর্ম বা বৈষ্ণব সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল না। বিদ্যাপতি শ্রীচৈতন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়াও যদি লিখিতে পারিয়া থাকেন, 'মাধব হম পরিণাম নিরাশা', 'হে হরি বন্দোঁ তুয়া পদ-নায়' এবং এইরূপ বহু কবিতা, তাহা হইলে কৃষ্ণকীর্তনের কবি চৈতন্য-পূর্ববর্তী হইলে, তাঁহার নিকটই বা আমরা সে ভাব প্রত্যাশা করিব না কেন ? বিদ্যাপতির অবিসংবাদিত পদগুলির সহিত কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা ও ভাব তুলনা করিলে, বসন্ত বাবুর 'একতম প্রবল প্রমাণ' টিকিতে পারে না। মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত বা জয়দেব, ইহাদের কাহারও না কাহারও অনুসরণ করিলে প্রাচীনত্বের দাবী সমর্থিত হইতে পারিত। পক্ষান্তরে কৃষ্ণকীর্তনে এমন শব্দ আছে, এমন ছন্দ আছে, এমন পদ আছে, যাহা পরবর্তী সাহিত্যের সাক্ষ্য দিতেছে। বৈষ্ণবশাস্ত্রবিরোধী

বৈষ্ণবসাহিত্যবহির্ভূত এবং সর্বকালে মানবের রুচিবিগর্হিত ব্যাপার আছে বলিয়াই আমার ধারণা যে, কৃষ্ণকীর্তন চৈতন্য-পরবর্তী কোনও সম্প্রদায়-বিশেষের গ্রন্থ। এবং সঙ্গীতের দিক্ দিয়াও সেই মত সমর্থিত হইতেছে।

'মাজে সুরতি দান সান দেই মাথে।'—এই কলিটির অর্থ লইয়া আমি আমার প্রবন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় পাদটীকায় তাহার একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি মনে করেন, "উত্তমপুরুষে 'দেই' ক্রিয়ার প্রয়োগ সেকালের সাহিত্যে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে 'সান দেই' কথাটির চমৎকার অর্থসঙ্গতি হয়।" কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, বসন্ত বাবু এই অর্থটির সুখ্যাতি করিলেও তিনি তাঁহার পূর্বপ্রদত্ত অর্থই সমর্থন করিতে চাহেন। বসন্ত বাবু 'দেই'কে অসমাপিকা ক্রিয়া ধরিয়া অর্থ করিতেছেন 'মস্তক সঞ্চালন করিয়া'। বস্তুতঃ প্রাচীন সাহিত্যে এইরূপ প্রয়োগই প্রসিদ্ধ। কিন্তু বসন্ত বাবুর পাঠ যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে মণীন্দ্রবাবুর পুথিতে অন্যরূপ পাঠ আসিল কেমন করিয়া? মণীন্দ্র বাবুর উভয় পুথিতে 'সান' স্থলে 'অস্থানে' এবং 'মাথে'র স্থলে 'হাথে' আছে।

বসন্ত বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের কোন্ পদগুলির আস্বাদ লইতেন?' এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে কৃষ্ণকীর্তনের কালনির্ণয় করা আবশ্যক। যদি কৃষ্ণকীর্তন মহাপ্রভুর পরবর্তী হয়, তাহা হইলে তিনি যে কৃষ্ণকীর্তনের পদ আস্বাদন করিতেন, একথা উঠিতেই পারে না।

শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁহার ভাগবতের টীকায় চণ্ডীদাসের দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদির উল্লেখ করিয়াছেন সত্য। বসন্ত বাবু ঠিকই বলিয়াছেন, 'তাহার খোঁজ আমরা পাইয়াছি কি?' কিন্তু সেগুলির খোঁজ না পাইলেই আমরা কৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড বুঝিব, ইহাই বা কিরূপ যুক্তি? প্রথমতঃ গোস্বামীপাদ দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নামক দুইখানি কাব্যের কথা বলিয়াছেন. কৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্গত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড তাহাতে বুঝায় না। যদি এই কাব্যখানি তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণকীর্তনেরই নাম করিতেন। কালিদাসের কুমারসম্ভবের চতুর্থ সর্গ রতি-বিলাপ—অতি সুন্দর। কিন্তু কেহ কি বলিবে যে, কালিদাসের রতিবিলাপ একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য? তার পর কৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ড নৌকাখণ্ড কি সত্যই এত উৎকৃষ্ট যে, বৈষ্ণবতোষণীর ন্যায় প্রসিদ্ধ টীকায় শ্রেষ্ঠ কাব্যের নিদর্শনস্বরূপ সুকবি সনাতন গোস্বামী কর্তৃক উল্লিখিত হইতে পারে? আসল কথা সম্ভবত এই—চণ্ডীদাসের যে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড সনাতন গোস্বামীর অভিপ্রেত, তাহার সন্ধান আমরা পাই নাই।

পরিশেষে 'এক কাল হৈল মোর জমুনার জল।' এই পদটি বসন্ত বাবুর মতে, 'বড়ু চণ্ডীদাসেরই বটে, দ্বিজ-চণ্ডীদাস তাহা অনুকরণ করিয়াছেন বলা যায়।' কিন্তু প্রমাণ কি? একখানি অতি অর্বাচীন পুথিতে উহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। ঐ পুথি যখন পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হয় (১৩৪০ সাল), তখন এই পদটি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এখন আমার সন্দেহ হইতেছে যে, উদ্দেশ্য করিয়াই, তর্কের হাত এড়াইবার জন্যই উহা বাদ দেওয়া হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই পদটি কৃষ্ণকীর্তনের কবিতার সহিত খাপ খায় না। তার পর পদকল্পতরু এবং নীলরতন বাবুর আদর্শ পুথিতে ইহা দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় আছে। প্রাচীন পুথির পাঠ পরিত্যাগ করিয়া অর্বাচীন পুথির পাঠ গ্রহণ করা বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত কখনই সমীচীন নহে। 'কৃষ্ণকীর্তনে পদটা না থাকিবার কারণ, পুঁথি খণ্ডিত।' এ যুক্তি ঠিক নহে।' কিন্তু দেখা যাউক, কোথায় কোথায় পুথি খণ্ডিত এবং তত্তৎস্থলে পদটি থাকার সম্ভাবনা কতদূর? দানখণ্ডে ১৬—১৭।১ এবং ৪১ পৃষ্ঠা মিলিতেছে না। কিন্তু পৌর্বাপর্য বিচার

করিলে দেখা যাইবে যে, এই পদটি সে স্থানে থাকা সম্ভব নহে। যমুনাখণ্ডে কয়েকটি পাতা নাই (১৪৫-১৫১); কিন্তু তাহাতেও উপরিউক্ত পদটির কোনও প্রসঙ্গ থাকিতে পারে না। রাধাবিরহ খণ্ডিত নহে। রাধা-বিরহের পরে পুথি খণ্ডিত বটে। কিন্তু ঐ পদের অস্তিত্ব সেই লুপ্ত অংশেও সম্ভব নহে। কারণ, উহাতে আছে,—

আর কাল হইল মোরে বড়ায়ের সঙ্গ।
আর কাল হইল দানি করে কত রঙ্গ।—মণীন্দ্রবাবুর পুথি।

ইহা অবশ্য রাধাবিরহখণ্ডের উক্তি হইতেই পারে না। নৌকাখণ্ডে এবং ভারখণ্ডে এই পদ থাকিলেও থাকিতে পারিত, ইহাও বলিবার উপায় নাই। কারণ, নৌকাখণ্ড সম্পূর্ণই আছে। ভারখণ্ডের যে দুই একটি পাতা পাওয়া যায় না, তাহার ভাব অন্যরূপ।